দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ ।   শনিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 17th April, 1943.   । ২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙালীর নববর্ষ

বর্ষচক্র ঘুরিয়া গেল। ১৩৪৯-এর পর আসিল ১৩৫০। আশায় মানুষ বাঁচে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে সে আশার আলো দেখে; নহিলে জীবন বহন করা দুষ্কর হইয়া উঠে; এজন্য বর্ষের আকারে কালের বুকে মানুষে ছেদ কাটিয়া লইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতের ভরসার সে মূর্তি যদি বর্তমানের মধ্যেই ব্যক্ত হয়, তবে আগ্রহ সেক্ষেত্রে নষ্ট হয়; আশার আলোক নিভিয়া যায়। আমাদের অবস্থাও দাঁড়াইয়াছে তাহাই; বর্তমানের দুঃখ-কষ্টকে অতীতের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াও আমরা কোন ভরসা দেখিতেছি না; পক্ষান্তরে ভবিষ্যতের ভীষণতাই সংশয়াতীতভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জগৎ-জোড়া যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে, তাহার অবসান কতদিনে হইবে কে জানে, অন্তত আগামী নববর্ষের মধ্যে যে তাহা সম্ভব হইবে, এমন কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের মুখেও শুনিতেছি এখনও দেরি আছে, আজিও উল্লসিত হইও না। চার্চিল সাহেব বলিয়াছেন, আগামী বৎসরে তো নয়ই, তাহার পরের বৎসরে জার্মানি জব্দ হইলেও হইতে পারে, তারপরে আছে জাপান। রুশ দূত লিটভিনফ বলিয়াছেন শত্রুপক্ষের এখনও শক্তি খর্ব হয় নাই, সুতরাং বিজয় গর্বে অধীর হইও না। এরূপ অবস্থায় আর আশা বা ভরসা কোথায়? আমরা বাঙালী, আমাদের সমস্যা বিশেষভবে উত্তরোত্তর জটিল আকার ধারণ করিতেছে। হক সাহেবের মন্ত্রিমণ্ডল বজায় থাকাতে আর কিছু হউক বা কেন, সাম্প্রদায়িকতার ভাবটা দেশ হইতে দূর হইয়াছিল; বাঙলার সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার বর্বর মনোবৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক পথে আসিতেছিল; কিন্তু বাঙলার লাট সাহেব চঞ্চল হইয়া পড়িলেন হক-মন্ত্রিমণ্ডল না ভাঙ্গিলে আর চলে না। নববর্ষের মুখে হক-মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া গেল; শুধু তাহাই নয়, গভর্নর বাঙলার শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তারপর মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য তলব পড়িল স্যার নাজিমুদ্দীনের। লোকে উদ্বিগ্ন হইল, আবার বুঝি লীগের মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলার বুকে দুষ্টগ্রহের মত চাপিয়া বসে। নববর্ষের এই সন্ধিক্ষেত্রে বিশেষ রকমের উদ্বেগ আজ আমাদের বুকে আলোড়ন তুলিতেছে। জাতির বৃহত্তর আশা-আকাঙ্ক্ষা—স্বাধীনতার আদর্শ; সে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে আসন্ন দুর্দিনের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য আগাইয়া যাইব—সেদিকেও আমাদের অনুপ্রেরণার সকল উৎস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলে অবরুদ্ধ। আশা নাই, ভরসা নাই, তবু নববর্ষ আসিয়াছে। কালের চাকা ঘুরিবেই, তাহা বন্ধ থাকিবে না। আজ এই অন্ধকারের মধ্যেই যাহা অনিবার্য, যাহা অপ্রতিহত, তাহাকে অভিনন্দন করিব। আলো না পাই, অন্ধকারেরই জয়গান করিব। তুচ্ছ আশার প্রলোভন হইতে তাহা আমাদিগকে মুক্ত করুক; দিগন্তব্যাপী দুর্দৈব আমাদের তপস্যাকে দুরন্ত করিয়া তুলুক।

ভাবী মন্ত্রিমণ্ডল

বাঙলার গভর্নর শাসনতন্ত্র বিরোধীভাবেই বাঙলা দেশের

শাসনতন্ত্র নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সেইখানেই তাঁহার কর্তব্য তিনি শেষ করিতে পারেন নাই; শাসনতন্ত্রের বিধানকে আর এক দফা পদদলিত করিয়া তিনি লীগ-[illegible]া স্যার নাজিমুদ্দীনকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার চেষ্টায় নিয়োগ করিয়াছেন। স্যার নাজিমুদ্দীন চেষ্টার ত্রুটি রাখিতেছেন না। মন্ত্রিত্বের মেওয়া এমন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভুবর্গের প্রাসাদে এতদিনে যখন হাতে আসিয়া পাড়বার উপক্রম করিয়াছে, তখন সে সুযোগ এমন দিনে কোন্ মূর্খ ছাড়িতে চায়? স্যার নাজিমুদ্দীন বাঙলার বিভিন্ন দলের দ্বারে দ্বারে গিয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। তিনি যান নাই কেবল কৃষক-প্রজা দলের কাছে—সুবে বাঙলার মুসলমান সমাজের তিনিই একমাত্র নেতা, তিনি অপর কোন মুসলমান প্রধান দলের কাছে গেলে যে প্রকারান্তরে সে দাবী টিকে না। দল ভাঙ্গিবার চেষ্টা নানান কায়দায় হইয়াছিল; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। পরিষদের লীগ এবং শ্বেতাঙ্গ দল ছাড়া অন্য সব দল মৌলবী ফজলুল হককেই সমর্থন করিয়াছেন। তবে তাঁহারা স্যার নাজিমুদ্দীনকে এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন যে, সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে তাঁহাদের আপত্তি নাই। সে মন্ত্রিমণ্ডলে কোন দলকেই বাদ দেওয়া চলিবে না এবং প্রধান মন্ত্রী কে হইবেন, সকল দলের প্রতিনিধিরা মিলিয়া তাহা ঠিক করিবেন। আসল কথা হইল এই যে, স্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলে কোন দলই যোগদান করিতে স্বীকৃত হন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডলের নামে হক সাহেবকে সরাইয়া ইউরোপীয় দলের ভরসায় স্যার নাজিমুদ্দীনকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের যে ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইতেছে তাহা কার্যকর হওয়া কঠিন। স্যার নাজিমুদ্দীন অনেক চেষ্টা করিয়াও নিজের দলের সংখ্যালঘিষ্ঠতাকে গরিষ্ঠ করিয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই। এমন অবস্থায় সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে গভর্নরের সত্যই যদি আগ্রহ থাকে, তবে অন্যান্য সকল দলের কর্মনীতি স্বীকার করিয়া লইতে স্যার নাজিমুদ্দীনকে রাজী করানো উচিত। বাঙলার স্বার্থের জন্য সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু 'সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল' এই নামের মোহে আমরা ভুলিতে চাহি না। এক্ষেত্রে দেশের স্বার্থই আমাদের কাছে বড়। দেশের স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া দেশের জনমতকে অবৈধভাবে পদদলিত করিয়া সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডলের নামে লীগ-শ্বেতাঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলা দেশ কিছুতেই সমর্থন করিবে না। স্যার নাজিমুদ্দীন আজ হাতে হাতে আমাদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিতে চাহিলেও বাঙলা দেশ তাঁহার কৃপার ভিখারী হইবে না। আমরা জনমতের মর্যাদা চাই, জনগণের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা আমরা চাই। ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভনে বাঁধা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রভুত্ব বাঙালী স্বীকার করিবে না; তাহার চেয়ে শাসনতন্ত্র স্থগিত থাকে, তাহাও ভাল।

সাংবাদিকের সম্বর্ধনা

সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্ধনার জন্য আয়োজন করা হইতেছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। রামানন্দবাবু তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার ফলে এ দেশে সংবাদপত্র-সেবার ক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সম্প্রতি তিনি বার্ধক্যভারে পীড়িত এবং আর কত দিন সংবাদপত্র সেবার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সম্পর্কে থাকিয়া কাজ করা তাঁহার পক্ষে কতটা সম্ভব হইবে আমরা তাহা জানি না। বাঙলার সংবাদপত্র সেবার ক্ষেত্রে তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনা সকলেরই আদর্শ [illegible]। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এ দেশের সংবাদপত্র সেবার আদর্শকেই উজ্জ্বল করা হইবে। সংবাদপত্র সেবার প্রকৃত সমাদর পরাধীন এই দেশে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জাতি গঠনে, দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রভাবের গুরুত্ব এখনও এ দেশে স্বীকৃত হয় না। সং সঙ্ঘের এমন উদ্যম এই দিক হইতে সর্বাংশেই সময়োচি

খাদ্য-মূল্য সমস্যা

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে এবং কমিতেছে, বাঙ সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে কিছুদিন হইল উৎসাহভরে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করা হইতেছে। বাঙলা দেশে ব গম, চাউল আসিয়া পৌঁছিতেছে, সরকারী বিজ্ঞাপনে অ নয়নমুগ্ধকর চিত্রও দেখিতেছি; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মূল্য কিছুই দেখিতেছি না। শহরে গমের দাম কিছু কমিয়াছে যে মূল্য এখনও আছে, তাহাও গরীবের পক্ষে সাধ্যাতী দাম শহরে এ পর্যন্ত মণকরা এক টা টাকা মাত্র নামিয়াছে, ইহা ধর্তব্যের বিষয় সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে দেখিতেছি, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্র চাউলের মূল্য নাকি মণকরা আঠারো-ঊনিশ টাকায় দাঁড়াই এ মূল্যও কি কম? বাঙলা দেশে চাউলের এমন মূল্য কো নাই। সিভিল সাপ্লাই বিভাগের রিজিওন্যাল কমিশনার ব্রণ্ড কিছুদিন পূর্বে বেতারবার্তাযোগে আমাদিগকে দিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের জন্য কোন চিন্তা নাই, মাত্র ভাগ ঘাটতি। এ সামান্য ব্যাপার; এজন্য উদ্বেগের কারণ ব্রহ্মদেশের বিচার বিভাগীয় অভিজ্ঞতা লইয়া ব্রণ্ড সাহেব বিবৃতি দিয়াছেন, ইহাতে আমাদের সান্ত্বনা কিছুই না কাগজপত্রের হিসাব চাই না; আমরা বর্তমান খাদ্য-সম সমাধানই কামনা করি; কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হয় না সমস্যা সমাধানের পক্ষে যাহা একান্তই অবান্তর, এমন অ হিসাবই আমরা সরকারের দপ্তর হইতে পাইতেছি; পক্ষ সমস্যা বস্তুত উৎকট আকার ধারণ করিতেছে। বাঙলা দে দেখিতেছি, ইতিমধ্যে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কর্মকর্ত করিয়া আমদানী করিয়াছেন। পূর্বের দলবলকে অন্যত্র সং হইয়াছে; ইহাতে সমস্যার কতটা সমাধান হয়, তাহা ল বিষয়। কর্তারা সমস্বরে বলিতেছেন, অসাধুতা একে করিব, লাভখোরদিগকে সাজা দিব; আইন-কানুনে ে অভাব অবশ্য নাই; কিন্তু মূল কর্মপন্থায় যদি ত্রুটি থাকে এড়াইবার মত ফন্দীর অভাব লোভীদের পক্ষে হইবে না। বাজারে একটা অস্থায় ভাব আনা সকলের আগে দরকার ভাব বিদ্যমান থাকিলে খাদ্যদ্রব্য মজুতের ঝোঁকও বন্ধ ক এবং অসাধুতাও রোধ করা কঠিন হইবে। সেই অনাস্থা করিতে হইলে খরিদ্দারেরা যাহাতে প্রচুর খাদ্যশস্য পায়, হইবে; সরবরাহের সূত্র স্বচ্ছন্দ রাখিতে হইবে এবং সে নীতি অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।

পরলোকে বেগম আজাদ

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদের সহধর্মিণী পরলো জাতি বিশেষভাবে মর্মাহত হইয়াছে। গত দুই বৎসর দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে হ অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুকালে স্বামীর সাক্ষাতের জন্য বেগম সাহেবা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি গভর্নমেণ্টের নিকট সেজন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, ফল হয় নাই। স্বর্গীয়া কমলা নেহরু ইউরোপে যখন স পীড়িত হইয়া পড়েন, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহ অবরুদ্ধ ছিলেন। তৎকালে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পত্নীর সাক্ষাতের সুযোগ দান করিয়াছিলেন; কিন্তু নিতান্ত আবেদনও এক্ষেত্রে অগ্রাহ্য হইয়াছে, মৌলানা আজাদ ত

পত্নীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার সুযোগও লাভ করেন নাই। পরাধীন দেশের রাজনীতিক নেতা ও কর্মীর সহধর্মিণীর জীবনে দুঃখের অবধি থাকে না। এক্ষেত্রে মৌলানা সহেবকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। সমগ্র জাতি তাঁহার এই গভীর শোকের অংশ গ্রহণ করিবে, ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী

গত ২৬শে চৈত্র, শুক্রবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বাঙলার বর্তমান সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মূলে কতখানি রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা পরিমাপ করিয়া উঠাই কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রকে নব্য-বঙ্গের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। বাঙালীকে তিনি সাহিত্যই শুধু দেন নাই, জীবন দান করিয়াছেন। বাঙালী জাতির মধ্যে আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং বাঙালী জাতির সংস্কৃতির ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের শক্তি এখনও অমোঘভাবেই কাজ করিতেছে। তিনি ঋষি-স্বরূপে বাঙালীকে 'বন্দে মাতরমের' যে মন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, বাঙালীকে যদি বর্তমান জগতে কোনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়, সেই মন্ত্রের সাধনাই করিতে হইবে, নহিলে বিশ্ব-সৌভ্রাত্র্য কিংবা আন্তর্জাতীয়তাবাদের কোন থিওরীই এদেশের মাটিতে টিকিবে না। আমরা বাঙালীর জাতীয় জাগরণের গুরু, বর্তমান বাঙালী জাতির স্রষ্টা, সেই বরেণ্য পুরুষের পায়ে এই উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আবার উইল্কী

ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া মিঃ উইণ্ডেল উইল্কী একবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মহলে গুরুতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মার্কিন মুলুকে প্রচারকার্যে রত ঠাক-কটক তাহাতে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কেন্দ্র হইতে মিঃ উইল্কীর উক্তিকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা করিবার কূটকৌশলের কেরামতি দেখা গিয়াছিল। মিঃ উইল্কী সম্প্রতি তাঁহার প্রাচ্য দেশের ভ্রমণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন—'আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমি আলাস্কা পর্যন্ত স্থানে যেখানেই গিয়াছি, সকলেই ভারতের সম্বন্ধে কি হইবে, এই প্রশ্ন করিয়াছেন। চীনে বিজ্ঞতম ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতার দাবী পূরণের জন্য যদি ভবিষ্যতের বরাত দেওয়া হয়, তবে ভারতের লোকের দৃষ্টিতে গ্রেট ব্রিটেনের কোন ক্ষতি হইবে না? আমেরিকারই নিন্দা হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, বর্তমান মার্কিন-গভর্নমেণ্ট এই নিন্দা এড়াইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করিবেন কি? আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়া ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এডেন পার্লামেণ্টে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। মিঃ এডেন বলিয়াছেন, আমেরিকা যাইবার পূর্বে আমেরিকা সম্বন্ধে যে ধারণা লইয়া সেখানে গিয়াছিলাম, সে ধারণা এখন আর নাই, সম্পূর্ণ নূতন ধারণা লইয়া সেখান হইতে ফিরিতেছি। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে আমেরিকাকে ব্রিটিশ নীতির অনুকূল মতাবলম্বী দেখিয়াই এডেন সাহেব আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়াছেন এক্ষেত্রে ব্রিটিশের ভারত-সম্পর্কিত নীতি বর্তমান মার্কিন গভর্নমেণ্ট সমর্থন করেন নাই, ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ মিঃ এডেনের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্রিটিশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনায় ভারতের কথা নিশ্চয়ই উঠিয়াছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ সামনার ওয়েলসের উক্তিতে আমাদের এই ধারণাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি বলিয়া দিয়াছেন মার্কিন গভর্নমেণ্ট ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারতীয় নীতিরই সমর্থক। ভারতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সম্বন্ধে ভবিষ্যতের অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিশ্রুতিই উত্তম। ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

বার্নার্ড শ'র আশংকা

জিরো, ওয়ালেস, চার্চিল ও হিটলারের সম্বন্ধে রচিত একটি প্রবন্ধে ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী মিঃ বার্নার্ড শ লিখিতেছেন "প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান, জাপানী ও ইটালীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবার পর রুশ-চীনা ফ্রণ্ট ও ইঙ্গ-মার্কিন ফ্রণ্টের মধ্যে যে আপোষ হইয়াছে, তাহা ভাঙিয়া যাইবে। মতভেদের উপর দিয়াই কাটিয়া যাইতে পারে, আবার আব একটি বিশ্ব যুদ্ধেও পরিণত হইতে পারে। মিঃ বার্নার্ড শ' আজ যে কথা বলিতেছেন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে রাজনীতিসম্মত বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। একদিকে রুশ ও চীন অপর দিকে মার্কিন ও বৃটেন সম্মিলিত পক্ষের মধ্যে এমন একটা রেখা অতীত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলীর আলোচনা করিলে সকলের চোখে ফুটিয়া উঠিবে। বর্তমান যুদ্ধের পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, আমরা বলিতে পারি না। তবে সাম্রাজ্য লিপ্সা যতদিন পর্যন্ত শক্তিবর্গের মনে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত যে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের আশংকাও দূর হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত; এরূপ ক্ষেত্রে জগতে সর্বত্র যদি জনশক্তি জাগিয়া উঠিবার ফলে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবিধা না থাকে, অর্থাৎ জগতে যদি কোন দেশ বা জাতি দুর্বল থাকে, তবেই বিশ্বের বুক অন্তত কিছুকালের জন্য শীতল থাকিতে পারে। শোষণের ফিকিরে যাহারা সদাসর্বদা ঘুরিতেছে, তাহাদের মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলির সিকি পয়সাও মূল্য নাই। ইহাদের স্বার্থগৃধ্নুতার আগুনে যে দুর্বল তাহাকেই জ্বালাইবে। কোনরকম নীতির দোহাইও পৃথিবীতে দুর্বলকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কথার জাঁকে আমরা যেন সত্য কোন দুর্বল মুহূর্তে বিস্মৃত না হই এবং সেই সব বড় কথা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ না করি।



মা ও ছেলে — শান্তিরঞ্জন বসু



মাতঙ্গ দম্পতি — নিরঞ্জন মিশ্র

দিদি

শ্রীসন্তু সেনগুপ্ত

(১)

অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শরৎ চৌধুরী যেদিন বুঝতে পারলেন তাঁর ওপারের ডাক আসতে আর বেশী দেরি নেই, সেদিন তাঁর কন্যা উমা দেবীকে ডেকে বললেন—মা আমার যাবার সময় হল, এর জন্যে দুঃখ করে কি করবে, খোকাকে রেখে গেলাম, তুমি ছাড়া আর তো তার কেউ নেই। তোমরা মা হারিয়েছ আজ বিশ বছর, খোকার দু'বছর বয়েস থেকে তুমি তাকে মানুষ করছ, মার অভাব তাকে বুঝতে দাওনি, তাই আজ নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার হাতেই তার সম্পূর্ণ ভার দিয়ে যাই। একটু থেমে আবার বললেন—একটি কথা মা, তাকে ছেড়ে কোথাও যেও না।

আর বেশী কথা তিনি বলতে পারলেন না। উমা দেবী চুপ করে বাবার বিছানার ওপর বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

আজ দু'বছর হল শরৎ চৌধুরী চলে গিয়েছেন,—রেখে গিয়েছেন একটি পুত্র শ্রীমান কুণাল আর কন্যা উমা দেবী, বালীগঞ্জের এই বিরাট বাড়ি আর প্রচুর অর্থ। কন্যার বিয়ে দিয়ে জামাইকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

কুণালকে বাবা চলে যাবার পর বেশী দিন দিদির স্নেহাঞ্চলে বাস করতে হল না। বছর তিনেক বাদেই উমা দেবীও চলে গেলেন স্বামী, পুত্র, কন্যা আর ভাইকে রেখে। কুণাল দিদিকে হারিয়ে ভেঙে পড়ল। উমা দেবীর স্বামী মনোজ গাঙ্গুলী স্তব্ধ হয়ে পুত্র কন্যা নিয়ে বসে রইলেন। কুণালকে সান্ত্বনা দেবেন কি, নিজেই থেকে থেকে উতলা হয়ে ওঠেন।

সময় মানুষের সব সুখ দুঃখকে দূরে সরিয়ে দেয়। কুণালদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। লক্ষ্মী-হারা সংসার দু'দিনেই ভেঙে পড়ত, কিন্তু পড়ল না শুধু কুণালের রঘুদার জন্যে। সে তাদের বাড়িতে এসেছে প্রথম তার মার ভৃত্যরূপে আজ এই বৃদ্ধের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল, কুণালের মা, বাবা আর দিদি। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে তার মনটা পাথরের মত কঠিন হয়ে গিয়েছে। কুণাল উতলা হয়ে উঠলে বৃদ্ধ তাকে দেয় সান্ত্বনা, উমা দেবীর ছেলে মেয়েদের নিয়ে আদর করে।

রঘু বাড়ির গৃহিণী, ভৃত্য একাধারে সব। সংসার সে মাথায় করে রেখেছে।

কুণাল এই দুঃখের আবহাওয়ার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে নিজেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়, একা একা পথে পথে ঘুরে এসে একান্তে নিজের ঘরখানিতে শুয়ে থাকে।

রঘুদা একদিন কুণালকে ডেকে বলল—খোকা এত বড় বাড়ি একা একা আর পেরে উঠিনে, এক কাজ করি, একটা অংশ ভাগ করে ভাড়া দিয়ে দি।

—বেশ তো রঘুদা দাও না। বলে কুণাল তার কর্তব্য শেষ করে। রঘু উঠে পড়ে লেগে যায়, অর্থের অভাব নেই, কাজ আটকায় না।

(২)

ভাড়াটে আসতে বেশী দেরি হল না। এলেন বিহারের অবসরপ্রাপ্ত জেলা হাকিম এক রায় বাহাদুর।

পরিবার তাঁর খুবই ছোট, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলে বিলেতে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে, জামাইটিও বিলেতে।

একদিন রায় বাহাদুর এলেন কুণালের সাথে আলাপ করতে। কুণাল লোকের সাথে না মিশে এমন এক রকম স্বভাবের হয়ে গিয়েছিল যে, লোকজন কেউ এলে বড় কেমন কেমন লাগত। এই লাজুক প্রকৃতির মানুষটির সাথে আলাপ করে রায় বাহাদুর বিশেষ তৃপ্তি পেলেন না, তবু বৃদ্ধ খুশি হয়ে গেলেন, বাড়ির মালিককে দেখে খুব আনন্দিত হয়ে ফিরলেন।

কুণালের মাঝে মাঝে ছাদে বেড়ান অভ্যাস ছিল। দিদি বেঁচে থাকতে দু'জনে প্রায়ই ছাদে বেড়াত। দিদি যাবার পর সে আর ছাদে বড় বিশেষ যায়নি একা একা তার ভালও লাগে না। সেদিন বিকেলে কি ভেবে, ধীরে ধীরে ছাদের ওপর এসে উঠল। সে ছিল খুব অন্যমনস্ক। ছাদে ছিলেন রায় বাহাদুরের কন্যা চিত্রা দেবী।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজ পেয়ে কুণালের চমক ভাঙল। ফিরে চাইতেই দেখতে পেল চিত্রা দেবী নীচে নেমে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। কুণালকে দেখে চিত্রা দেবী একটু থমকে দাঁড়ালেন। তাকে ওইভাবে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত হয়ে নীচে চলে গেলেন। চিত্রা দেবী চলে যেতে কুণালের চমক ভাঙল, সে অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়েছিল, ভুলেই গিয়েছিল কোন মেয়ের দিকে ও-ভাবে চাইতে নেই।

ছাদে আর তার বেড়ান হল না। নিচে নেমে এল। মনটা তার চিন্তায় পরিপূর্ণ। নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। হঠাৎ চমকে উঠল রঘুদার ডাকে।

—হ্যাঁরে খোকা এই ভর সন্ধ্যেবেলা ঘরে শুয়ে আছিস কেন, অসুখ করেনি ত?

—না রঘুদা এমনি, কিছু হয়নি, এই বলে পাশ ফিরে শুলো বেশী কথা তার ভালও লাগছে না।

(৩)

ভোরে কুণালের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল রঘুদা নিচের বাগানে কার সাথে গল্প করছে। আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসল, জানলা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখতে পেল রঘুদা একটা কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আর চিত্রা দেবী কতগুলো গাছের চারা হাতে নিয়ে রঘুদার সাথে কথা বলছেন।

হঠাৎ চিত্রা দেবী ওপরের দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন কুণাল চেয়ে আছে। বিরক্ত হয়ে সরে গেলেন। মনে মনে বলে উঠলেন কি অসভ্যর মত চেয়ে থাকে।

কুণাল চিত্রা দেবীকে সরে যেতে দেখে বিছানা ছেড়ে বাথরুমে চলে গেল। তোয়ালে হাতে করে যখন ফিরে এল তখন সে এত অন্যমনস্ক, হাতের তোয়ালে হাতেই রইল মুখ মুছতে ভুলে গিয়েছে। রঘুদা ঘরে ঢুকে তাকে ওই অবস্থায় দেখে বলল—ও কিরে খোকা এখনও মুখ মুছিসনি? কুণাল অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে রঘুর হাত থেকে কাপটা তুলে নিল।

রঘু খাবারের প্লেটটা নামিয়ে রেখে সেখানে ভাল ভাবে বসল।

—খোকা ভাই তুই আজকাল এত কি ভাবিস বলত?

—কই কি ভাবি রঘুদা? তোমার যা কথা, কি আবার ভাবব?

—দেখ ভাই, আর সবাইকে ফাঁকি দিতে পারিস কিন্তু এই বুড়োর চোখকে ফাঁকি দিতে কি তুই পারবি দাদা?

কুণাল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। খেতে খেতে কি ভেবে রঘুদাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা রঘুদা, তোমার রায় বাহাদুরদের সকলের সাথেই বেশ আলাপ হয়েছে, না?

তা হয়েছে বইকি, সবাই আর কে; বুড়ো কত্তা আর মেয়ে। একা একা আর কি করি, একজনের সাথে কথা বলে সময় কাটাতে হবে তো?

—রায় বাহাদুরের মেয়ের সাথেও তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না রঘুদা?

—তা হয়েছে বই কি, তাঁকে যে দিদি বলি।

কুণাল চুপ করে বৃদ্ধ রঘুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। খাবারের প্লেট হাতের ওপরেই বসান। রঘু তার চাওনি দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে কুণালের একখানা হাত ধরে বলল—কি ভাবছিস ভাই বলতো? মনের কথা চেপে লাভ কি? এই বুড়োকে বলতে তোর কি আপত্তি আছে দাদা?

না রঘুদা কিছু না। তারপর ম্লান হয়ে হেসে বলল,—জান রঘুদা, প্রথম যেদিন রায়বাহাদুরের মেয়েকে ছাদে দেখলাম, চমকে উঠেছিলাম, ভাবলাম—আমার দিদি কোথা থেকে এল? সেই সিঁথির সিঁদুর, কপালের সিঁদুরের বড় টিপ—সব দিদির কথা মনে করিয়া দিতে লাগল। ভুলেই গিয়েছিলাম রঘুদা,—দিদি নেই।

রঘুর বুকটা ব্যথায় দুলে উঠল, নিজেকে সামলে নিল কিন্তু কখন যে দু ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়েছে টের পায়নি।

(৪)

কুণালের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে রঘু বলল—চল্ না দাদা আলাপ করবি? দিদি আমার ভাল মেয়ে, খুব খুসী হবে। —না না রঘুদা, তুমি জান না, তিনি আমায় দেখলে কি রকম বিরক্ত হয়ে ওঠেন। না রঘুদা, তুমি কিছু বল না। এই বলে সে ঠান্ডা কাপটা তুলে নিল।

চিত্রাদেবী খুব অসন্তুষ্ট হলেন কুণালের উপর। দিন নেই রাত নেই, হাঁ করে অসভ্যের মত চেয়ে থাকে। ঠিক করলেন—তাঁর বাবাকে একথা বলবেন, আর রঘুদাকেও বলে দেবেন তার মনিবটিকে একটু সাবধান হতে।

সন্ধ্যের সময় রায়বাহাদুর তাঁর ঘরে বসে বই পড়ছিলেন, এমন সময়ে চিত্রাদেবী এলেন ঘরের ভেতর। পিতা কন্যাকে দেখে বই রেখে বললেন,—কি মা, কিছু বলবে? চিত্রাদেবী একটু ইতস্তত করে বললেন—আচ্ছা বাবা, কুণালবাবুর সাথে তোমার আলাপ হয়েছে না?

—হাঁ মা হয়েছে বই কি?

—কেমন মনে হয় এই ভদ্রলোককে তোমার বাবা?

—ভালই তো মনে হয় মা, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বলতো?

—আমার কিন্তু ভাল লাগে না। যখন হঠাৎ সামনে গিয়ে পড়ি, অথবা চোখোচোখি হয়, ভদ্রলোক এমন অসভ্যের মত চেয়ে থাকেন, ভয়ানক বিরক্ত লাগে।

রায় বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা তো জানি না মা, ছেলেটিকে ভাল বলেই তো জানি। চিত্রাদেবী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন কুণাল বেরিয়ে যাচ্ছে।

(৫)

পুজোর সময়, দূরে কোন বাড়িতে সানাই বাজছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল হল্লা করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। সানায়ের সুরে কি মাখান ছিল কে জানে, মনটাকে এমন উদাস করে দিল। ধীরে ধীরে মনে পড়ল বহুদিন আগেকার কথা মা বেঁচে; সবে চিত্রাদেবীর বিয়ে হয়েছে। সেবার কি আনন্দ সবার। মা আজ নেই, স্বামী, ভাই বহুদূরে। সেদিন আর আসবে না। চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কি ভেবে এসে ঢুকলেন কুণালদের বাড়ির ভেতর, কুণাল বাড়ি নেই। রঘুদা নীচে বসে। চিত্রাদেবীকে দেখে উঠে দাঁড়াল। —এস দিদি।

—কি করছ রঘুদা?

কি আর করব দিদি চুপ করে বসেছিলুম। চিত্রাদেবী আস্তে আস্তে ওপরে উঠলেন, রঘুদা পেছনে পেছনে এল। প্রত্যেকটি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

বাঃ, বেশ সুন্দর সাজান, —ছেলেটি তো বেশ সৌখীন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন কুণালের দিদি উমাদেবীর ঘরে। প্রকান্ড একখানা Oil Painting ঘরে। কি শান্ত সৌম্য মূর্তি। সিঁদুরের টিপটি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি অঙ্গ তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চিত্রাদেবী খানিক সেই ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে নীচে চলে এলেন। কি যে বলতে এসেছিলেন, বলা হ'ল না।

(৬)

সেদিন ছিল বিজয়া;—চিত্রাদেবীর মনটা খারাপ। সমস্ত বাড়িখানা ঘুরে বেড়িয়ে আর কত ভাল লাগে? হাতে কোন কাজও নেই যে, তাই নিয়ে ভুলে থাকেন। সানায়ের সুরটা এমন কাঁদন-ভরা যে, মনটাকে চঞ্চল করে তোলে। চিত্রা জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, নিচে পায়ের আওয়াজ পেয়ে দেখলেন—কুণাল বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে ওপরের দিকে চাইতেই চিত্রাদেবীকে দেখতে পেল। চিত্রাদেবী বিরক্ত হয়ে সরে এলেন।

মুখে একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কুণালদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। রঘু ছিল ওপরে, চিত্রাদেবীর সাড়া পেয়ে ডাকল—দিদি ওপরে আসুন। চিত্রাদেবী দেখলেন, রঘু কুণালের পরিত্যক্ত জামা-কাপড়গুলো গুছিয়ে তুলে রাখছে। যা বলবার জন্যে এসেছিলেন, একটু ইতস্তত করে শেষকালে বলে ফেললেন।

—রঘুদা, তোমায় একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

—রাগ করব কেন দিদি? কি এমন কথা তুমি বলবে? বলে চিত্রাদেবীর মুখের দিকে চাইল।

—রঘুদা, তোমার দাদাটি কি রকম লোক বলত? তাঁকে বলে দিও, কোন বয়স্থা মেয়ের দিকে অসভ্যের মত চেয়ে থাকলে তাকে ভাল বলে না। এটুকু বোঝার মত তাঁর বয়েস হয়েছে।

রঘু এ কথার জবাব কিছু দিল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চিত্রাদেবী তার মুখের পানে চেয়ে একটু এগিয়ে এলেন।

—তুমি রাগ করলে রঘুদা?

—না দিদি রাগ আমি করিনি, তবে তাকে তুমি ভুল বুঝেছ। একটু থেমে আবার সে বলল—জান দিদি, প্রথম যেদিন তোমায় খোকা ছাদে দেখে, আমায় কি বলে জান, রঘুদা আমি এমন চমকে উঠেছিলাম, দিদি আমার কোথা থেকে ফিরে এল, সেই রকম কপালের সিঁদুরের টিপ, সিঁথির সিঁদুর, চাউনিও ঠিক দিদির মত। জাননা দিদি, ভাইটি দিদির কত আদরের ছিল, এই দিদিকে হারিয়ে সে কি রকম পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, আর তাকে সামলাতে এই বুড়োর যে বেগ পেতে হয়েছিল, তা তুমি যদি দেখতে দিদি।

কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধের দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

চিত্রাদেবী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটা ঘন কুয়াশার পরদা আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে সরে যেতে লাগলো।

যে আঘাতের জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে থাকে না, আর সেই আঘাত যখন হঠাৎ এসে কঠিনভাবে লাগে, তখন মানুষ হয়ে যায় মূক, ব্যথায় তাকে বিচলিত করে তোলে। চিত্রাদেবী ভাবতে লাগলেন, এ কি করেছেন তিনি—যে চেয়েছে দিদির আদর, দিদির স্নেহ—আর কিছু নয়, তার প্রতিদানে তিনি কি দিয়েছেন? পাছে চোখের জল রঘুর সামনেই ঝরে পড়ে, এই ভয়ে সেখান থেকে ছুটে চলে গেলেন।

(৭)

রাত দশটা; চিত্রাদেবী অন্ধকারে বারান্দায় চুপ করে বসে ছিলেন, পায়ের আওয়াজ পেয়ে চেয়ে দেখলেন কুণাল বাড়ি ফিরছে। সে তাঁকে দেখতে পায়নি। কুণালকে দেখে চিত্রাদেবীর বুকটা কেমন

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দর্শনের ক্রমবিকাশ

শ্রীসুশীলকুমার গাঙ্গুলী, বি এস্-সি, বি কম্

অতি প্রাচীনকাল হইতেই দার্শনিকদিগের ভিতর নানা-প্রকার মতভেদ বর্তমান এবং আনুপূর্বিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, দার্শনিকদিগকে মূল দুই ভাগে ফেলা যাইতে পারে—আদর্শবাদী ও জড়বাদী। আদর্শ-বাদীরা সমগ্র বিশ্বজগতের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন পরম-ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে। আর যা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সে সমস্ত পরমাত্মার ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। জড়-বাদীদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উৎস হইল প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতেই যা কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হইতেছে।



কাণ্ট্



স্পাইনোজা



হেগেল

প্রাচীন গ্রীক্ দেশীয় দার্শনিকরা জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্য ও মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে আমরা বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হইতে পারিব। সক্রেটিস্ জন্মিবার পূর্বে গ্রীসদেশে যে সমস্ত চিন্তানায়কগণের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের ভিতর এনৌক্সিমেণ্ডার (৬১০—৫৪৫ খৃঃ পূঃ) একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মতে "The universe is made up of 'boundless' or 'undeterminate' out of which such determinate substances air, water etc., seperated out or were differentiated."

অর্থাৎ "এই বিশ্ব এক সীমাহীন অনন্ত প্রকৃতি বা সাধারণ বস্তুর দ্বারা গঠিত। উহা হইতেই বায়ু, জল প্রভৃতি বিশেষ বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে। দার্শনিক পিথাগোরাস্ পৃথিবীর উৎপত্তির একটা গণিতীক ব্যাখা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "The unit of number was easily identified with dot or point; now lines can be analysed into points; planes into lines and solid into planes. This made it appear that points make lines, which make solids. So the identification of the point with the unit of number readily made it appear that 'all things are numbers' or 'made of numbers."

অর্থাৎ "একক সংখ্যাকে সহজেই বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, রেখাগুলিকে বিন্দুর সমষ্টি বলা যায়, তলকে রেখার সমষ্টি এবং ঘন বস্তুকে তলের সমষ্টি ধরা যায়। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সকল বস্তুই সংখ্যার সমষ্টি মাত্র।" এই সমস্ত দার্শনিকগণ পৃথিবীর উৎপত্তি বা ঐরূপ ধরণের নানাপ্রকার সমস্যা নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। বস্তুত মানব সমাজ অথবা মানব মনের সঙ্গে দর্শনের কি যোগাযোগ, দার্শনিক নানাপ্রকার সূত্রগুলিকে সময়োপযোগী সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত করা যাইতে পারে কিনা সে বিষয়ে তাঁহারা বড় একটা ভাবিতেন না।

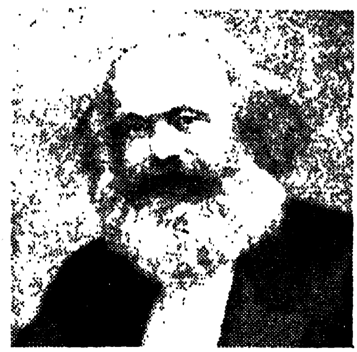
বহু যুগ পরে স্পাইনোজা, কাণ্ট, ফয়েরবাখ্ এবং হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দার্শনিক চিন্তাধারার মোড় ফিরাইলেন। তাঁহারা মানব মনের বিভিন্ন অবস্থাকে তাঁহাদের মতবাদ দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতদের সহিত মার্ক্স দর্শনের অনেকটা ব্যবধান রহিয়াছে। তাহা পরে আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

স্পাইনোজা একটি বাস্তব জগতের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুকেই অপরিবর্তিত (Static) রূপেই দেখিয়াছেন, এইজন্য তিনি একজন ঘোর জড়বাদী। তাঁহার দর্শনকে এককথায় বলা যাইতে পারে 'mechanistic materialism'। মার্কস্ অবশ্য জড়বাদী ছিলেন কিন্তু তিনি জগতের সব বস্তুকেই স্থিতিশীল ভাবেন নাই। তিনি হেগেলের ন্যায় সমস্ত বিশ্বকে সতত পরিবর্তনশীল বলিয়া মনে করিতেন। এখানেই স্পাইনোজার সঙ্গে মার্কসের অনৈক্য। কাণ্ট্ বিশ্বের প্রত্যেক জিনিসের ভিতর একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কি কল্পনা রাজ্যে কি বাস্তব রাজ্যে তিনি সামঞ্জস্যহীন কিছুই দেখেন নাই। তাঁহার মতে মানব মনের বিভিন্ন ভাবের কোন অসামঞ্জস্য পূর্বে হইতেই বর্তমান থাকে না। যদিবা কোন অসামঞ্জস্য মানব মনে উপস্থিত হয় তাহা শুধু জগতের প্রকৃতিগত বৈষম্যের জন্য। তাই কাণ্ট্ মনে করেন "Contradictions in the concepts of things are impossible"। হেগেল কিন্তু এই বিষয়ে কাণ্টের ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে বৈষম্যই জগতের সমস্ত বিপ্লব ও পরিবর্তনের মূল কারণ। এবং বৈষম্যের দ্বারাই জগৎ প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে—"Contradictions lead forward"। ফয়েরবাখ্ হেগেলের

ন্যায় আদর্শবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতবাদ অনেকটা জড়বাদ হইলেও উহা প্রকৃত জড়বাদ হইতে কিছু পৃথক। তাঁহার দর্শনকে এক কথায় "Organism" বা "Organic materialism" অর্থাৎ জৈব জড়বাদ বলা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "For us exists only organic life, organic activity, organic thinking"। তাঁহার দর্শন দ্বারা জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের ভিতর একটা সমন্বয় আনা হইয়াছে। ফয়েরবাখ্ তাঁহার দর্শন হইতে ধর্মকে বাদ দেতে পারেন নাই। তাঁহার মতে মানব সমাজের বিবর্তন নির্ভর করে ধর্মগত পরিবর্তনের উপর।

মার্কস-দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে হেগেলবাদের সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কেন না হেগেল-দর্শন হইতেই মার্কস তাঁহার মতবাদ গঠনের অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। যদিও হেগেল ও মার্কস দর্শনের ভিতর কিছুটা ব্যবধান রহিয়াছে তথাপি উভয়েই dialecticএর সাহায্যে আপনাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হেগেল ছিলেন আদর্শ-বাদী আর মার্কস ছিলেন জড়বাদী। হেগেলই সর্বপ্রথম dialecticএর গোড়া পত্তন করেন। তাঁহার সময়ে জার্মান আদর্শ-বাদীদের তিনিই ছিলেন নেতা। হেগেলের পূর্বে প্রায় সমস্ত আদর্শবাদী ও জড়বাদী দার্শকিই বিশ্বজগৎকে স্থিতিশীলরূপে কল্পনা করিয়াছেন। হেগেলই সর্বপ্রথম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ত পরিবর্তনশীল বলিয়া প্রচার করেন। এই পরিবর্তনের তিনি একটি বিশেষ ধারা নির্দেশ করিয়াছেন dialecticএর সাহায্যে। তিনি পরমাত্মাকে বিশ্বশক্তির কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়াছেন এবং পরমাত্মা বিকাশের একটি ধারা প্রচার করিয়াছেন। হেগেলের মতে মানব মনের কোন 'idea'ই স্থিতিশীল নয়। 'Idea'র বিবর্তন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, মানব মনে প্রথমে একটি 'idea' রূপ গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত আর একটি 'idea' সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তিতে মনে স্থান পায়। অবশেষে এই দুই পরস্পরবিরোধী 'idea'র একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষকে হেগেল dialectic নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকার সংঘর্ষের ফলে একটি সমন্বয় বা Synthesisএর আবির্ভাব হয়। এই সমন্বয় আবার পূর্বের নিয়মে পরিবর্তিত হইয়া পুনরায় আর একটি Synthesisএ পরিণত হয়। এই প্রকারে পরমাত্মা নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হেগেল দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর ঐতিহাসিক বিবর্তন dialecticএর সাহায্যে সংঘটিত হইয়া থাকে।

মার্কস দর্শনে হেগেল এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। হেগেলকে মার্কসের গুরু বলা যাইতে পারে। মার্কস হেগেলীয় মতবাদের মোহ কাটাইয়া এক নব ধর্মে



কার্ল মার্কস্

দীক্ষিত হইয়াছেন। অতীতের নানাবিধ জটিল সমস্যার বাক্‌বিতণ্ডায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। বর্তমান জগতের ধারাবাহিক যুক্তিবাদ ও পৌরাণিক আদর্শবাদও তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার মতবাদ দ্বারা এক আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "Philosophers have only explained the world in various ways, the task is to change this"। জড়বাদকে তিনি সমস্ত মানব সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। হেগেল বলিয়াছেন, পরস্পর দুইটি বিরোধী 'Thesis' হইতে একটি নূতন সমন্বয় বা Synthesisএর উদ্ভব হয়। মার্কস ঠিক হেগেলের ন্যায় মানব সমাজের ক্রমপরিবর্তনকে dialectic-এর সাহায্যে ব্যাখা করিয়াছেন। হেগেল যেখানে দেখিয়াছেন দুইটি 'idea'র সংঘর্ষ, মার্কস সেখানে দেখিয়াছেন পরস্পর বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষ। এই শ্রেণী সংঘাতের ফলে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় ও আর একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মার্কস দেখাইয়াছেন, জগতের ক্রমপরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে—শ্রেণী সংঘাত এবং পৃথিবীর ইতিহাস শ্রেণী সংঘাতের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। Dialectic-এর সাহায্যে তিনি মানব ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত বৈষম্যের মূলে রহিয়াছে শ্রেণীগত স্বার্থ। অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য হইতেই এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর উৎপত্তি। সমস্ত সমস্যার মূলেই তিনি একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে সোসিয়ালিজম, অর্থাৎ শ্রেণী বর্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই পৃথিবী হইতে এই সমস্ত জটিল সমস্যা দূর করা যাইবে এবং এই একমাত্র উপায়েই বিশ্বশান্তি স্থাপন সম্ভব হইবে।

সমুদ্র-মন্থন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পিসতুতো ভাই ভবানীদার বিয়েতে বর ও বরযাত্রীদের বিয়ে-বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ল আমার উপর এবং ভবানীদা এই বিয়ের হ্যাঙ্গামাটা যতদিন থাকে, ততদিনের জন্য বিশেষ করে আমাকে তাঁর অনেকটা বলা চলে 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর' পদে নিযুক্ত করলেন।

বিয়ে-বাড়ি চল্লিশ মাইলের পথ; কিছুটা ট্রেনে বাকীটা বাসে যেতে হবে। পিসেমশায় আমার হাতে বেশ কিছু মোটা টাকা দিয়ে বললেন, 'বর-বরযাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার হ্যাংগাম থেকে আমি রেহাই নিলুম, দিসু।' বলে, আমার পিঠে কয়েকটা মৃদু চাপড় দিলেন এবং ভবানীদা' করলেন কি—গোপনে আমার হাতে তার মনিব্যাগটি-ই গুঁজে দিয়ে মনোভাব ব্যক্ত করলেনঃ 'যা দরকার বুঝবি খরচ করবি, বন্ধুবান্ধবরা যেন নিন্দে না করতে পারে, সেক্রেটারী।'

বিয়ে-বাড়ি পেঁৗছালুম বিকাল পাঁচটা লাগাৎ।

বর ও বরযাত্রীদের বসিয়ে তাদের জন্য চা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে দিয়ে বাহিরে উঠানের উপর একখানা চেয়ারে বসে একান্তে এ পর্যন্ত খরচের হিসাবটা নোট্ বইতে টুকে নিচ্ছি—এমন সময়—

'মিস্টার!'

চেয়ে দেখি, একটি বারো তেরো বছরের ছেলে, আর চাইবার সংগে সঙ্গে পুনঃ 'মিস্টার, আপনাকে ডাকছে।'

ছেলেটির এরূপ সম্বোধনে আমি তো অবাক্!

সে আমাকে একটা ঠেলা মারলঃ 'শুনেছেন, আপনাকে call করছে।'

কিছু বলবার আগেই তাকে বলতে শুনলুম, 'শুনতে পাচ্ছেন না? কানে খোল আছে নিশ্চয়।' সে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

কি আর বলব, অতি কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা রেখে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে ডাকছে?'

'ওহো!' চোখ দুলিয়ে ঘুরিয়ে সে বলল, 'আপনি দেখছি আবার কথাও বলতে পারেন, বাঃ! ভারী মজা তো!'

একটু থেমেঃ 'ডাকছে my mother.' সে আগের মতন আবার দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

'তোমার মা মানে?'

'আরে মশায় চলুন না,' সে আমার হাত ধরে এক টান মারলঃ 'বসে থাকলে কখনও কিছু জানা যায়? বলুন না মিস্টার!' সংগে সংগে সেই রকম দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

'Get up, Get up!' আমার জামার কলার ধরে ফস্ করে এমন এক টান মারল যে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতুম আর একটু হলে। এমন অবস্থা হল তখন যে, আর একটু হলে ঠাস্ করে এক চড় দিয়ে বসতুম, সামলে নিলুম কোনরকমে।

'লাগল?' বলে সে আমার পিঠে হাত বুলাতে লাগলঃ 'আপনারা মশায় young man, এইতেই চোখে জল আসে!'

এই বখাটে ছেলেটার কাণ্ডকারখানায় আমি যেন অনেকটা "হিপ্নোটাইজড্" হয়ে গেলুম, অর্থাৎ তখন মনের আমার ঠিক যে কি অবস্থা তা আমার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য ঠেকছিল, অন্তত আমার তাই মনে হল বলা চলে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে কোনরকমে বললুম, 'চল, কোথায় যেতে হবে।'

'Follow me.' বলে ছেলেটা অন্দরের দিকে এগুল, পিছনে পিছনে আমি। খুব উঁচু একটা বারান্দার উপর উঠে কাঠের এক "ভেঙেগ পড়ল বুঝি" গোছের সিঁড়ি ঠেঙিগয়ে উঠলুম বিয়ে-বাড়ির দেতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকে একখানা ঘর।

'Come.' বলে ছেলেটা ঘরখানার ভিতর প্রবেশ করল। কিন্তু আমি ফট্ করে ঘরের ভিতর ঢুকতে দ্বিধা বোধ করলুম, দাঁড়িয়ে পড়লুম তাই। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য।

'আরে লজ্জা কি, আসুন না মশায়' বলে এগিয়ে এসে ছেলেটি আমার হাত ধরে টানল।

বাধা দিতে পারলুম না, ঢুকে পড়লুম ঘরের ভিতর। আর ঢোকা মাত্রই—

'কি রে তুই যে বড়?'

দেখলুম, একখানা খাটের উপর বসে দিদি, অর্থাৎ বন্ধু সুকুমারের দিদি। মুখ দিয়ে আমার বিস্মিত কণ্ঠস্বর বের হলঃ 'তুমি এখানে!' গিয়ে প্রণাম করলুম।

'কেন,' দিদি হাসতে হাসতে বললেনঃ 'আমার এখানে আসতে নেই না-কি?'

'না-না, সে কথা নয়, মানে—'

'আগে বস্', দিদি বলে উঠলেন, 'মানেটা কি, তা পরে বলছি।' বলে, যার সংগে এসেছি সেই ছেলেটিকে আদেশ করলেনঃ 'নকু পাশের ঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে আয়তো।'

নকু আমাকে ঠেলা মেরে বলল, 'আরে মশায় খাটের উপর বসে পড়ুন না, লজ্জা কি।'

'নকু!' দিদি তেড়ে উঠলেনঃ 'আবার বাঁদরে তুলেছিস?' একটু থেমেঃ 'এই যে তখন ওরকম করে মার খেলি তাতে কি একটুও লজ্জা নেই।'

'না, নেই।' বলে নকু চলে গেল।

তার চলে যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দিদি আমায় বললেন, 'ছেলেটা এমন বেয়াড়া হয়েছে যে কি বলব। একেবারে গোল্লায় গেল।'

'কার কথা বলছ?' বলতে হয় বলে বললুম।

'এই আমার গুণধর পুত্রের কথা।'

একটু তামাসা করলুম, 'সে আবার কে?'

'আহা নেকা যেন! তুই এ-ঘরে এলি কার সংগে?'

'যাকে চেয়ার আনতে বললে তার সংগে!'

'তা,' দিদি বললো, 'ঐটি হচ্ছেন আমার ছেলে।'

'তাই না কি?' ইয়ারকি করলুম, 'তা, ও ছেলে তোমার দেখবে ভবিষ্যতে একটা কিছু হবে।'

'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তবে গুণ্ডা বা বদ্মাস্ ছাড়া আর কিছু না।'

'কি যে তুমি বল।' বলে হো হো করে হেসে উঠলুম।

এইসময় নকু উপস্থিত হল একখানা চেয়ার নিয়ে।

'নিন্ মশায়, বসুন। জ্বালিয়ে খেলেন আপনারা। কেন, খাটে বসলে কি মান যায়?' বলেই ভীষণ এক শব্দের সংগে চেয়ারখানা মেঝেতে ঠকাস্ করে ফেলে দিল।

'দাঁড়া, তোর আজ আমি কি করি।' দিদি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো।

'আরে যাও—যাও, সবাই সব করবে, বাকী আছ তুমি। দেব এ্যায়সান্ এক রদ্দা—!' নকু দিদিকে ঘুসি দেখিয়ে অদৃশ্য হল।

'নাঃ, ও দেখছি আমায় পাগল করে তুলবে,' দিদি পুনঃ খাটের উপর বসলঃ 'কি যে করব ওকে নিয়ে—।'

ও-ছেলে সম্বন্ধে আমার নিজেরও যথেষ্ট আশংকা থাকা সত্ত্বেও মুখে বললুমঃ 'ও বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে,' চেয়ারখানা ঠিক করে বসিয়ে তাতে আসীন হলুমঃ 'এখন বল, তুমি এখানে—'

'বাবারে বাবা!' কপট ক্রোধ প্রকাশ করল দিদিঃ 'আমায় তাড়াতে চাস্?'

হঠাৎ হাসিমুখে খুব শান্তস্বরে বললঃ 'আমার ননদের বিয়ে যে।—এ'র খুড়তুতো বোন।—আমার তো শুনলি, এবার তোরটা বল্?'

'আমার কথা শুনবে?' একটু থেমে বললুম, 'আমার মা'র আপন বড় ননদের বড় ছেলে আজ তোমার ননদটিকে বিয়ে করতে

এসেছেন।' একটু হেসে আরম্ভ করলুমঃ 'আর সেই সঙ্গে হ্যাংলার মতন দুখানা লুচি আর দুখানা বেগুনভাজা খাবার লোভে আমিও।' বলে, বেশ একটু জোরে হেসে উঠব উঠব করছি—এমন সময় একটি মেয়ে এসে দিদিকে প্রশ্ন করলঃ 'বৌদি, চা হয়েছে। খাও যদি, নিয়ে আসি তাহলে।'

হাসা আমার আর হল না, আমি শুধু, আমি শুধু—।

মেয়েটিকে দিদি বললঃ 'হ্যাঁ নিয়ে আয়।—আর দেখ্, আর এক কাপ চা আনবি, অমনি প্লেটে করে দুটো দুটো করে সবরকম মিষ্টি যা আছে তা-ও।'

মেয়েটি চলে গেল।

আর আমি আমার অজ্ঞাতেই তার চলে যাওয়ার দিকে হাঁ করে—।

'হ্যাঁ, তারপর?' দিদির প্রশ্নে আমি আবার পৃথিবীতে ফিরে এলুম।

বললুম, 'তারপরটা কি, বল?'

'কেমন আছিস্?'

'দেখছ কেমন?'

'দেখছি তো একটা হুমড়ো-চুমড়ো পুরুষমানুষ হয়ে গেছিস।'

'মেয়েমানুষ ছিলুম কবে?' জিজ্ঞাসা করলুম।

'বাবারে বাবা,' দিদি বললঃ 'তর্কে পেরে উঠবে তোদের সঙ্গে—কার সাধ্যি! যেমন সুকুমার তেমনি তুই তার বন্ধুটি হয়েছিস্ উঃ!'

এতক্ষণ যে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম, এখন দিদির কথায় তা মনে পড়ে গেল, জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভাল কথা, দিদি সুকুমার আসে নি?'

'না, কাল যখন এখানে আসবার জন্যে রওনা হব—এমন সময় মা'র চিঠি পেলুম। বিয়েতে আসবার ব্যাপারে লিখেছে, সেখান থেকে কেউ আসতে পারবে না, কি না-কি ধানকাটা নিয়ে প্রফুল্লকাকার সঙ্গে খটমটি লেগেছে।—ওঃ, কাল আসার সময় কি বিপদ বাবা! আর একটু হলে ট্রেন পেতুম না। তা ট্রেন যা-ও-বা পেলুম—উনি আবার বমি-টমি করে একাক্কার করলেন গাড়ি।'

অনুসন্ধিৎসু হলুমঃ 'উনি অর্থে? জামাইবা—'

কথা অসমাপ্ত রইল দিদির জন্য, বলে উঠল হঠাৎঃ 'না—না, আমি বলছি, দিদি দরজার দিকে আঙুল বাড়ালেন, 'এই যে ইনি! অনেক দিন বাঁচবে।'

চেয়ে দেখলুম সেই মেয়েটি, তার দুহাতে দুটো ডিস্। একটায় দু' কাপ চা, অন্যটায় অনেকগুলি মিষ্টি।

কিন্তু চা ও মিষ্টির চেয়ে লোভনীয় হয়ে উঠেছিল—।

এগিয়ে আসতে আসতে সে বলল, 'আমি আবার কি করলুম বৌদি, যে—অনেকদিন বাঁচব বলছ।' বলে একটু দাঁড়াল।

সে আরও এগিয়ে এল একটু পরেঃ 'কি, চুপ যে, বল!'

'বলছি,' একটা ঢোক গিলল দিদিঃ 'কাল আসবার সময় গাড়িতে তুই—'

'বৌদি! বৌদি!! বৌদি!!!' মেয়েটি চা ও মিষ্টির প্লেট দুটো যেন ফেলে দিল এমনিভাবে মেঝের উপর কোনরকমে স্থাপন করেই ছুট্ দিল ঘর থেকে।

সে "বৌদি বৌদি" বলল, আমার মনে হলঃ একটি কোকিল কুহু-কুহু করে উঠল; সে চলে গেল যেন বসন্ত চলে গেল,—আমি, অন্তত তা-ই অনুভব করলুম; অনুভব করলুমঃ আমি যেন নেই, আমি অস্তিত্বহীন—আমি যেন কি-একটা! সব কিছু নিয়ে কথাটা এই দাঁড়ায়ঃ আমি যেন মরে গেলুম।

হাসতে হাসতে দিদি বললেন, 'লজ্জা পেয়ে গেছে, তুই আছিস কি না,' এগিয়ে মেঝের থেকে খাবারের ডিসটা উঠিয়েঃ 'নে ধর।' বলে, ডিসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

হাত পেতে নিলুম। চা'র ডিসটা দিদি খাটের উপর স্থাপন করে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেনঃ 'ওমা!' আমার দিকে চেয়েঃ 'তোকে হাত ধোয়ার জল দেওয়া হয়নি, দেখেছ মুখপুড়ীর কান্ড!' দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

দিদি চলে গেল, আর আমি—

আর আমি ভাবতে লাগলুম, ভাবতে ভাবতে আমি মরিয়া হয়ে উঠলুম, মরিয়া হয়ে উঠলুম একটা অদম্য পাওয়ার ইচ্ছায়, মুহূর্তে মধ্যে আমি যৎপরোনাস্তি লোভী হয়ে উঠলুম; এবং যে-মুহূর্তে যৎপরোনাস্তি লোভী হয়ে উঠলুম, সেই মুহূর্তে লোভী হওয়ার "কারণ" আমার সামনে এসে উপস্থিত হল, মেয়েটি বলল, 'জল নিন্।'

হাত বাড়ালুম, জলের গেলাসটা নিয়েই আমি কি রকম যেন হয়ে গেলুম, আমি যেন নিজে খেলুম না, কে যেন খাইয়ে দিল এমনিভাবে গেলাসটা নিয়েই ঢকঢক্ করে সমস্ত জলটা পলকে খেয়ে ফেললুম, আমার তাই মনে হল, অন্তত, অনেকটা। জলটা খেলুম, অনুভব করলুম ঃ আমি জুড়িয়ে গেলুম; অনুভব করলুম—আমার ভাল লাগছে, ভাল লাগছে, ভাল লাগছে কেন যেন!

চমক্ ভাঙল দিদির কথায় ঃ 'কি রে, আগেই জল খেয়ে ফেললি, বাঃ!'

লজ্জিত হয়ে পড়লুম, কি বলি, শেষে বললুম—যেন বলতে পা-রি-না ঃ 'ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল।' জলের গেলাসটা মেঝেয় নামিয়ে রাখলুম।

'মিষ্টি খাবিনা?'

'খাচ্ছি,' আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম ঃ 'বাবাঃ, এতগুলো মিষ্টি।' বলেই একটা রসোগোল্লা মুখে পুরে ফেললুম।

'ইতি!' দিদি খাটের উপর বসে চা এক কাপ তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিলে তাতে, পরে ঃ 'আর এক গেলাস জল নিয়ে আয়।'

ইতি অর্থাৎ মেয়েটি চলে গেল মেঝেয় থেকে গেলাসটি তুলে নিয়ে। সে যখন চলে যাচ্ছিল তখন আর একটা রসোগোল্লা মুখের কাছে তুলেছিলুম, সে যখন অদৃশ্য হয়ে গেল রসোগোল্লাটা মুখে পুরলুম, কিন্তু রসোগোল্লাটা রসহীন মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে আমি এক কথায় যাকে বলে, চলতি কথায় গোল্লা দেখতে লাগলুম, নিজেকে সেই মুহূর্তে অসুস্থ বোধ করলুম। মোট কথা ঃ আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু পাছে ধরা পড়ে যাই, তাই অতিকষ্টে রসোগোল্লাটা চিবাতে লাগলুম ও দিদিকে কিছু বলা উচিৎ—এ জ্ঞান হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'তারপর, আমি এখানে এসেছি তা জানলে কোত্থেকে?'

'দেখলুম জানলা দিয়ে, বর যখন এল তখন খুব কর্তাপনা করছিস, তারপর ওখানে ঐ উঠোনে বসে-বসে কি সব', দিদি মুখ টিপে হেসে জোরে উচ্চারণ করল ঃ 'লেখাপড়া করছিস।'

'তুমি এমন লজ্জা দিতে পার লোককে।' গদগদ স্বরে বলে উঠলুম, আমি যার রীতিমত বিরোধী। বুঝলুম ঃ এ সেই "লোভের" প্রতিক্রিয়া!

একটু পরেই ইতি প্রবেশ করল, আমি রণরণিত হয়ে উঠলুম। সে আর এক গ্লাস জল মেঝের উপর রেখেই প্রস্থান করল; তৎক্ষণাৎ মনে হল ঃ ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল ও সেই মুহূর্তে নিভে গেল। আমি অন্ধকার দেখলুম, বলা চলে।

'ওটিকে পার করতে পারলেই এখন আমার শ্বশুর মশায় নিশ্চিন্ত হন', দিদিকে বলতে শুনলুম ঃ 'বিসু; তোর জানাশুনা ছেলে আছে?'

বোকার মতন না-জিজ্ঞাসা করে পারলুম না ঃ 'কেন'

'ইতির বিয়ের ঝঞ্ঝাটটা তাহলে মিটিয়ে ফেলতুম।'

দিদির এ কথায় আর একটু হলে বলে ফেলছিলুম আর কি,

'আমি ইতিকে বিয়ে করতে চাই',—খুব জোর সামলে নিলুম ও জলের গেলাসটায় হাত চুবিয়ে এগিয়ে গিয়ে খাটের থেকে আমার জন্য নির্দিষ্ট চা'র কাপটা তুলে নিলুম।

নকু এসে উপস্থিত হল : 'বসে বসে গল্প জমাচ্ছেন, এদিকে যে বর মশায় আপনাকে খুঁজছে। রে আছেন মিস্টার! সে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

ভবানীদার উপর ভারী রাগ হল ; অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত মনে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলুম।

ভবানীদা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিছলিরে?'

সবই প্রকাশ করলুম—শুধু অপ্রকাশ রাখলুম—ইতির কথাটা। ইতির কথাটা অর্থে, প্রাঞ্জল করলে এই দাঁড়ায় যে, আমি যে এই সামান্য সময়ের মধ্যে একটি উপভোগ্য সমস্যা-জটিল সুমধুর জগতে প্রবেশ করেছি অর্থাৎ আমার যে ইতিকে ভাল লেগেছে,—আমি, সহজ কথায় আমার মন যে বর্তমানে একমাত্র ইতির চিন্তায় ভরপুর—সব কিছু মিলে স্পষ্ট ও এক কথায় আমি যে ইতিকে ভালবেসে ফেলেছি—ঠিক এই চরম কথাটাই ব্যক্ত করলুম না। ব্যক্ত করলুম না গোপন রাখবার উদ্দেশ্যে নয়, কি যেন কিছুতেই বোঝা যায় না গোছের কেমন এক ধরণের চমৎকার আবেগ আমাকে ও-কাজে প্রবৃত্ত করল।

ভবানীদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বরযাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম। কিন্তু মনশ্চক্ষু কেবল ইতিকে দেখবার জন্য আমাকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলল। অন্যদিকে কিছুতেই মন বসতে চায় না। আমার সব কিছু কেমন বিশ্রী-বিশ্রী ঠেকতে লাগল। পা দুটো কেবল দোতলার সেই ঘরখানার দিকে ছুটতে চায়, আমি বেশ অনুভব করলুম। সত্য কথা বলতে কি আমার মন গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।........

সন্ধ্যাবেলায় আবার দোতলার সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

উপস্থিত হয়েই বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম, কারণ, সেখানে প্রায় আট দশটি বিবাহিতা এবং কুমারী মেয়ে মিলে এক হাট বসিয়েছে। দেখেই পিছিয়ে যাচ্ছিলুম। দিদি পিছন থেকে আমায় ধরল, বলল, 'কি রে চলে যাচ্ছিস্ কেন, আয়। এখানে লজ্জা করবার মতন কেউ নেই।'

সুতরাং আবার এগলুম।

একটি বিবাহিতা যুবতী বলে উঠল : 'আর গেলেই বা চলবে কেন, শুনলুম আপনিই একরকম বরকর্তা। তা বরকর্তার সঙ্গে আমাদের পাওনাগণ্ডার কথা আছে। বলনা তুই!' বলে, একটি কুমারীকে ঠেলা মারল।

ঠেলা-খাওয়া কুমারীটি বলল : 'আমি বলতে পারব না বাবা! একটু থেমে, শেষে যদি "না" শুনতে হয়।' মুখে তার চাপা হাসি।

হাটের মধ্য থেকে একটি গোলাপ ফুল নড়ে-চড়ে উঠল : 'হ্যাঁ, না বললেই হল', ইতি একটু এগিয়ে এল : 'বসুন, কথা আছে। নট্ ছাড়ন-ছুড়ন।' সে একখানা চেয়ার মৃদুভাবে ঠেলে দিল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমি চেয়ারে বসলুম।

দিদি বলল, 'শোনরে, ওদের না-কি কি দাবী আছে।'

মৃদু হেসে বললুম, 'আমার কাছে আবার কি দাবীরে বাবা, এ্যাঁ?' বলে অপাঙ্গে—।

'ও "এ্যাঁ-উঁ"তে চলবে না, আমরা দশজন জাগব, দশ কুড়িং দু'শ' টাকা আপনার দিতে হবে।' ইতি এমন চমৎকার করে বলল যে কি বলব!

এই প্রথম ইতির সঙ্গে কথা বললুম, 'কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক আমি—' আনন্দে গদগদ হয়ে কথাটা আর শেষ করতে পারলুম না। আমি কেমন ঘেমে উঠলুম, তার শীতলতার অনুভূতি আমার সমস্ত শরীরকে অদ্ভুত এক পুলকের আস্বাদ দিল।

কে যেন বলে উঠল : 'ও ইতিদি! ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওনা বাপু।'

'আজ তো,' ইতি সুন্দরভাবে আরম্ভ করল, 'বাসর-ঘরে আমরা মেয়েরা জাগব,' সে আমার দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে আমাকে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে গড়্‌গড় করে বলে গেল' তা, যারা বাসর জাগে তাদের 'বাসর-জাগানি' দিতে হয়, জানেন তো?' বলে সে আবার আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

কি করব কিয়ৎক্ষণ বুঝে পেলুম না। তাকে দেখব, না তার কথার উত্তর দেব!—দু'টাই লোভনীয়। আমি যেন কেমন ধাঁধাঁ খেয়ে গেলুম।

একটু সময় কেটে গেল......

তারপর একসময় বলে উঠলুম, 'ওঃ, বাসর-জাগানি? হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয় দেব।'

'মনে থাকে যেন!' চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলল ইতি।

'কেন মনে থাকবে না!' এ কথাটা বলার সময় কণ্ঠস্বরে এমন এক আবেগ প্রকাশ পেল যে তাতে বেশ কিছুটা থতিয়ে গেলুম। যদি কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকে—এই আশঙ্কায় চাইতে পারি-না যেন, এমনিভাবে ঘরের প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। এবং সকলকেই স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে সুস্থ হলুম। মনে হলঃ খুব বাঁচোয়া! স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফস্ করে নাক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইতি একটা মন্তব্য করে বসল : 'কাল সকালেই আবার ফাঁকি দিয়ে টাকা দেবার ভয়ে পালিয়ে যাবেন না যেন!'

তার এই কথার মধ্যে এরকম একটা সপ্রতিভতা প্রকাশ পেল যা আমাকে বাস্তবিক বলতে কি মুগ্ধ করে দিল এবং আমি ইতি সম্বন্ধে অনেকটা আশান্বিত হয়ে উঠলুম। সেই মুহূর্তে তাকে আমার যেন কতদিনের জানা মনে হল, কেমন একটা মধুর অবসাদ আমাকে পেয়ে বসল। মনে-মনে ভাবলুম : তোমায় ফাঁকি দেব ইতি, তুমি যে আমার সমস্ত-কিছু!

একটি মোটা, সারা মুখে ব্রণের দাগ-আলা কুমারী মেয়ে আমাকে বলল : 'খবর্দার, টাকা না-দিয়ে যদি কেটে পড়েন তাহলে কিন্তু আমার মুখ জানেন তো, আমি—'

দিদি তাকে নিরস্ত করল : 'আঃ, বাণী, চুপ কর!'

ইতিও যেন মেয়েটিকে কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়—এমন সময় নকুর প্রবেশ। এসেই আমায় এক ঠেলা মারল, বলল, 'মিস্টার!'

স্বর্গ-সুখ যখন অনুভব করছি তখন এরকম বাধা আমার গায়ে ছুঁচ্ ফুটাল। চড় উঠিয়ে-ও ছিলুম, শেষে এক কেলেঙ্কারী বাধাব, এই ভয়ে তাকে বললুম : 'কি?'

'এখন বিয়ে হবে, আপনাকে আপনাদের পুরুত না ফুরুৎ কে যেন ডাকছে!'

কি আর করব, উঠে পড়লুম।

যাবার সময় শুনলুম নকু বলছে : 'মা আর তোমরা মেয়েরা তোমাদের নতুন কাকীমা ডাকছেন, আর আড্ডা মারতে হবে না।'

মুহূর্তপরেই সে আমার পাশ দিয়ে ভোঁ দৌড় দিয়ে চলে গেল। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আবার এক ঠেলা মারল, 'আরে জলদি যা-না।'

মনে-মনে বললুম : 'দাঁড়াও উল্লুক, তোমাকে বাগে পাই!' এবং ইতির সম্বন্ধে আমার মনের কথাটি কিভাবে দিদিকে বলে

ফেলা যায়, তা-ই চিন্তা করতে করতে বরযাত্রীদের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

মহাসমারোহে তখন বিবাহ-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। বিয়ের মন্ত্র-ধ্বনিতে চতুর্দিক গমগম করছে। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আমি।

হঠাৎ ভবানীদা'র এক বন্ধু আমার কাছে মুখ দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'দয়া করে একটু ছাতে যাবেন?'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন?'

তিনি যা বললেন তার সারাংশ হচ্ছে—ছাতে যেখানে বরযাত্রীরা খেতে বসেছে সেখানে না-কি ভয়ানক বিশৃঙ্খল দেখা দিয়েছে। পরিবেশন করবার সেরকম লোক নেই, তাই পরিবেশন ভাল করে হচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেজন্য বরযাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়েছে, অগ্ন্যুদগীরণ হল বলে।

শুনেই ছাতে যাবার জন্য একপ্রকার বলতে গেলে দৌড় দিলুম। দোতলায় সিঁড়ির মুখে দিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এক বুদ্ধি খেলে গেল। গায়ের সিল্কের জামাটা ও মনিব্যাগটা তার হাতে দিয়ে বললুমঃ 'ছাতে আমি পরিবেশন করতে যাচ্ছি, জামাটা আর ব্যাগটা সাবধান করে রেখে দেও।' বলেই, ছাতের সিঁড়ি ধরলুম। দিদি যেন কি একটা বলে উঠল—শুনতে পেলুম না।

আমি পরিবেশন করব এ-ব্যাপারে কন্যাপক্ষের কেউ-কেউ প্রথমে অমত প্রকাশ করলেন কিন্তু নিবিড় আত্মীয়তা দেখিয়ে দু'একটা কথা বলায় তাঁরা আর কিছু বললেন না।

বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে পুরো এক ঘণ্টার উপর সময় নিল; আর একটা নতুন 'ব্যাচ্' বসবে-বসবে করছে, আমি ছাতের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছি—এমন সময় এক গোলমাল!

অনুসন্ধান করলুম, গোলমালের কারণ কি। প্রথমে অনেক্ষণ চেষ্টার পর জানলুম ঃ চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় চুরি হয়েছে, কি চুরি হয়েছে তা যখন অবগত হলুম ঃ তখন আমি টলে পড়ি আর কি।

কোনরকমে কাঁপতে কাঁপতে দোতলায় নেমে গেলুম। দেখলুম ঃ দোতলায় দিদির ঘরে ভীষণ ভীড়; সকলে হৈ-চৈ করছে। দিদির মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। আমাকে দেখেই প্রায় কেঁদে ফেললোঃ 'বিসু, এ আমার কি সর্বনাশ হল!'

কি বলব, বুঝে পেলুম না, আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে।

দিদি বলে যেতে লাগলোঃ—

'তুই জামা, ব্যাগ দিয়ে গেলি, আমার আবার তখন নীচে বিয়ের ওখানে যেতে হবে বলে—ইতির মাথা ধরায় ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে দেখে ওর কাছে জামাটা আর ব্যাগটা দিয়ে চলে যাই। হঠাৎ এখন ইতির চীৎকার শুনে নিচের থেকে এসে শুনি, সে না-কি জামাটা আর ব্যাগটা শিয়রের কাছে রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতে পারে নি, এখন ধরফড়িয়ে জেগে উঠে দেখে জামাটা আছে কিন্তু—'

দিদি যেন আমার হৃদপিণ্ডে একটা লাথি মারল ঃ 'কিন্তু ব্যাগটা নেই। এখন কি উপায় করি বলতো?' দিদি কাঁদতে লাগলো।

কি যে করব, কি যে বুঝব, কি যে বলব—কিছুই মাথায় আসছিল না। এক আধটা টাকা না, পিসেমশায়ের গোটা সত্তর টাকা, ভবানীদা'রও টাকা পঞ্চাশের কম না—তা ছাড়া আমারও নেহাৎ কম ছিল না—সব মিলে টাকাগুলো ব্যাগটার মধ্যে রেখেছিলুম। আর এ কি হল—!

চুরির সংবাদটা সারা বাড়িময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক বুদ্ধি খরচ হয়ে গেল—কিন্তু চোরকে ধরা গেল না। সত্য কথা বলতে কি আমি একেবারে ভেঙে পড়লুম এবং এতসত্বেও ইতি বেচারীর সংকটাপন্ন অবস্থা মনে-মনে উপলব্ধি করে তার জন্য এই বিপদের মধ্যেও ব্যাকুল হয়ে উঠলুম রীতিমত। দিদি আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, মাঝে মাঝে বলে উঠছিল ঃ 'কি হবে?' আশেপাশে আরও অনেক লোক। এমন সময়—

এমন সময় নকু এসে আমায় বলল, 'জানেন, কে চুরি করেছে, আমি জানি।'

আমি কিছু বলবার আগেই দিদি জিজ্ঞাসা করল ধড়মড়িয়ে, 'কে রে, কে রে, নকু?'

'বলব? বলব?'

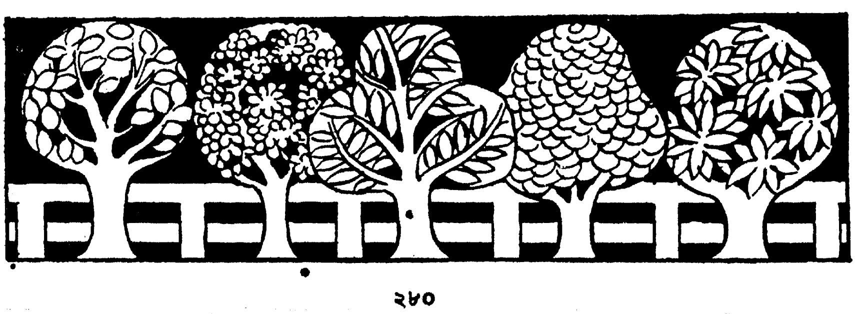
ভবানীদা'র শ্বশুর দাঁড়িয়েছিলেনঃ 'বলব-বলব কি, শীগ্গির করে বল।' তাঁর অবস্থাও তখন কাহিল, মাথা তুলতে পারছিলেন না।

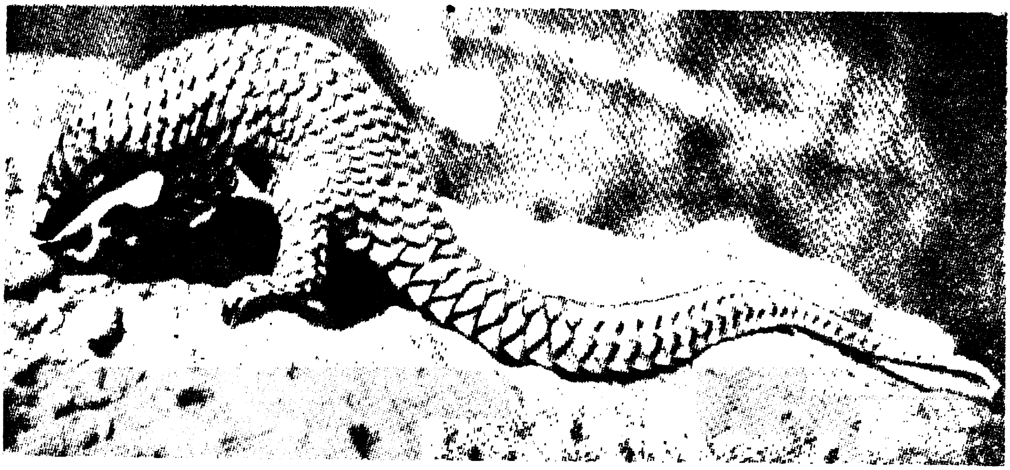
'চুরি করেছে ইতিপিসিমা,' নকু চোখ-ঘুরিয়ে বলল 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি। করেছে কি জানেন, ঐ যে আমাদের সঙ্গে বামুনদি' এসেছে না—ওর কাছে লুকিয়ে রেখেছে। আমি তখন ছাতে পান নিয়ে যাচ্ছিলুম, দেখলুম ইতিপিসিমা বামুনদিকে ব্যাগটা দিয়ে দিল। আমাকে ওরা দেখতে পায় নি, আমি মশায় সর্বদিকে দারুণ দৃষ্টি রাখি—আমরা দেউলটির ছেলে মশায়, হুঁ-হুঁ।'

সেই মুহূর্তে বামুনদিকে ডাকা হল।

তিনি কেঁদে ফেললেন ঃ 'বাবা আমি দোষী নই। আমি যাচ্ছিলুম, আমাকে লোভ দেখালে—আমি, আমি, আমি—' কেঁদে ফেললেন হাউ-হাউ করে।

নকু বলল, 'আরে আমি-আমি, চালাকির জায়গা পাওনি!' আমার দিকে ফিরেঃ 'জানেন মিস্টার, ইতিপিসিমা আবার কি রকম চালাক! নিজে চুরি করে নিজেই আবার 'চোর-চোর' করছে। বিচ্ছু মেয়ে বাবা!'



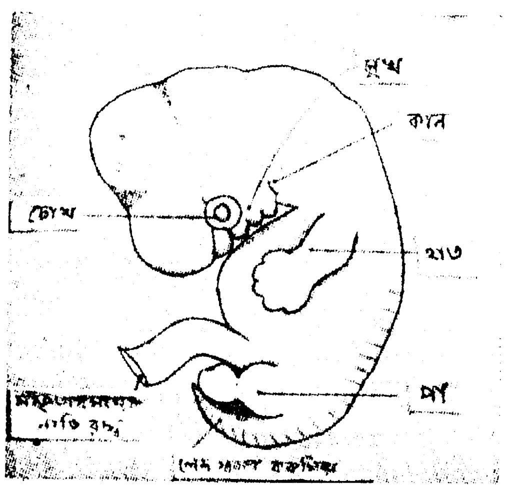


প্যাঙ্গোলিন বা পিপীলিকাভুকের এই বৃহৎ লেজটি দ্বাররক্ষীর কাজ করে

লেজ মাহাত্ম্য

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এস্-সি

পুরাণে নাম মাহাত্ম্যের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। কেমন করিয়া কৃষ্ণ-প্রিয়া সত্যভামা তুলসীপত্রে কৃষ্ণ নাম লিখিয়া দেবর্ষি নারদকে তাহা সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণ-দানের ফল লাভ করিয়াছিলেন ও সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইবার আশু সম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন সে সব কথা আমাদের অবিদিত নাই। যদিও মহামতি শেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "What's in a name?"—



মাতৃজঠরে লেজ বিশিষ্ট মানব-ভ্রূণ

নামে কিবা আসে যায়? তথাপি আমরা নামের উপর অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকি। আমাদের মতে নাম-মাহাত্ম্যের পরেই লেজ মাহাত্ম্য এবং পূর্বোক্ত ইংরেজ-কবি নাম-মাহাত্ম্যে শ্রদ্ধান্বিত না হইলেও লেজ-মাহাত্ম্যের উপর তাঁহাকে যে নিশ্চয়ই আস্থা স্থাপন করিতে হইত সে কথা জোর গলায় বলিতে পারি। রামায়ণ বর্ণিত হনুমানের লঙ্কা-দহন ব্যাপারটি কিশোর বয়সে চিত্তকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিত যে লেজের মহিমায় চমৎকৃত হইতাম। পুরাণের কাহিনী গল্পমাত্রে পর্যবসিত হইলেও লেজ-মাহাত্ম্যের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। তাই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

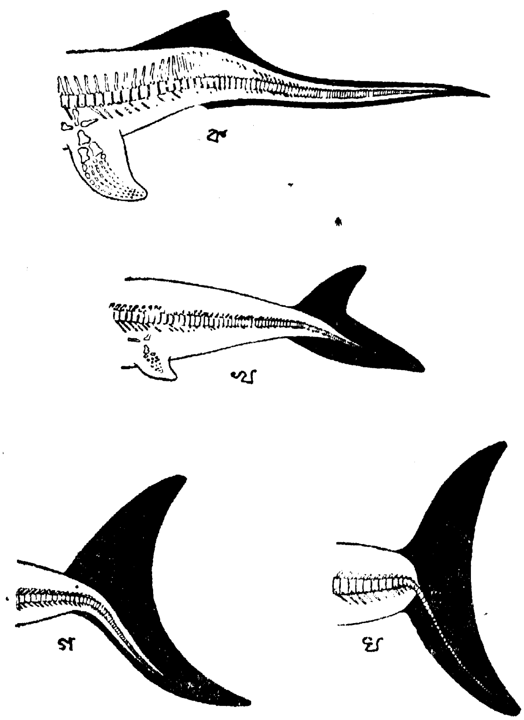
লেজ অথবা পুচ্ছ বলিতে আমরা সাধারণত শরীরের পশ্চাদ্দেশের বিলম্বিত অংশটিকেই বুঝি; তাই "আরশুলার লেজ" অথবা "চিংড়ী মাছের লেজ" বলিতে আমরা ইতস্তত করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরশুলা বা চিংড়ীর লেজ নাই এবং চিংড়ীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছই বলা চলে না। উহাদের পক্ষে বরং "পুচ্ছাংগ" কথাটি ব্যবহার করা চলে, কিন্তু "লেজ" বা "পুচ্ছ" কথাটি কোনমতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ অমেরুদণ্ডী কোন প্রাণীরই লেজ নাই। মেরুদণ্ডের যে অংশ পায়ু (anus) অতিক্রম করিয়া ক্রম-ক্ষীণায়মান ও ক্রম-বিলীয়মানভাবে বিলম্বিত রহিয়াছে একমাত্র তাহাকেই লেজ বলা চলিতে পারে। এই প্রকার লেজের ধারণা আমরা সাধারণত "লাংগুল" শব্দটি হইতে পাইয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া লেজের প্রতিশব্দ হিসাবে "লাংগুল" কথাটি ব্যবহার করিতে পারি না। লাংগুল এক প্রকার বিশেষ লেজ। সিংহ ও মাছ উভয়েরই "লেজ" আছে, কিন্তু সিংহের "লাংগুল" থাকিলেও মাছের "লাংগুল" নাই। যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত লেজ কী এবং কতটুকু তাহা বুঝিতে আশা করি কাহারও অসুবিধা হইবে না।

লেজকে প্রধানত সঞ্চালক যন্ত্র বলা যাইতে পারে। আজ যে বিশ সহস্র জাতির মাছ আমরা দেখিতে পাই তাহাদের অধিকাংশই লেজের সাহায্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। মাছের দেহ সাধারণত দুই পার্শ্বে ক্রমে ক্রমে চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে, তাই তাহার লেজও এক প্রকার সমতল পাতে পর্যবসিত হইয়াছে। এইরূপ ব্লেডের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পুচ্ছকে একবার এ-পাশে একবার ও-পাশে

আন্দোলিত করিয়া মাছ জলের মধ্যে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়।

জল-জীবের লেজে একপ্রকার পাখনা যুক্ত থাকে। এই পাখনা কখনও দ্বিধাবিভক্ত (রুহিতাদি মৎস্য), কখনও অখণ্ডিত (কই) আবার কখনও-বা অর্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে (ইফথায়োসর) শোভা পাইতে থাকে। কেমন করিয়া এই পাখনাযুক্ত লেজের ক্রম-বিকাশ হইয়াছে তাহা চিত্রে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাছের ন্যায় কুমীর এবং অন্যান্য অধিকাংশ জলজন্তুই লেজের পার্শ্ব-সঞ্চালনের দ্বারা সঞ্চরণ করিয়া থাকে। স্তন্যপায়ী তিমি ও ম্যানাটির লেজ উপর নীচে চ্যাপ্টা; তাই উঁহারা পাশা-পাশি পুচ্ছ আন্দোলন না করিয়া উপর নীচে লেজ আছড়াইতে থাকে ও এইভাবে জল কাটিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়।



মাছের বিভিন্ন আকারের লেজ

সাধারণত সঞ্চালক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলেও লেজকে কোন কোন প্রাণী অন্য কাজেও লাগাইয়া থাকে। হাঙর তাহার লেজের ঝাপ্টায় মাছের ঝাঁককে আপনার কবলিত করে। আসন্ন বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য তিমি আপনার লেজের আস্ফালনে জলে ভীষণ বিক্ষোভ তুলে। কই মাছ তাহার অখণ্ডিত লেজের সাহায্যে জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া থাকে। সিন্ধু ঘোটক মাছ (Hippocampus) লেজের সাহায্যে আপনাকে কোন কিছুতে নোঙর করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করে।

লেজ আত্মরক্ষা ও শিকারের এক প্রকার অস্ত্র বিশেষ। অনেকের লেজেই কাঁটা অথবা তীক্ষ্ণ শল্ক বিদ্যমান থাকে। অতিকায় গিরগিটি ও কুমীর আপন পুচ্ছের আঘাতে অনায়াসে একজন সবল লোককে ধরাশায়ী করিতে পারে।

হাঁস প্রভৃতি কয়েক জাতীয় জলচর পাখিতে হালের কাজ করে। পেঙ্গুইন ও কাঠ-ঠোকরা পাখির লেজ তৃতীয় পদরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্যাঙ্গারুর লেজকেও তৃতীয় পদ বলা চলিতে পারে। দেহের প্রায় সবটুকু ভারই তাহার লেজকে বহিতে হয়। যখন দুইটি পুরুষ ক্যাঙ্গারু পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের সমগ্র দেহভারই লেজের উপর গিয়া পড়ে এবং হস্তপদ পরস্পরকে আঘাতের উদ্দেশ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়।

লেজ না থাকিলে বৃক্ষচারী জীবকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয় এবং বন-মানুষ ব্যতীত কোয়ালা, শ্লথ, প্রভৃতি যে কয়েকটি বৃক্ষচারী জীবের লেজ নাই তাহাদিগকে অঙ্গুলির দ্বারা গণনা করিতে পারা যায়। বহুরূপী গিরগিটির ন্যায় আকর্ষী-লেজের সাহায্যে বৃক্ষচারী জীব আপনাকে বৃক্ষ-কাণ্ডে দৃঢ়-সন্নিবিষ্ট রাখে। মধুপায়ী ভল্লুক বা কিংকাজু আপনার দীর্ঘ লেজকে গাছের ডালে জড়াইয়া মস্তক নীচের দিকে করিয়া যেভাবে মৌচাক হইতে মধু আহরণ করে ও যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত আপনার লেজ বাহিয়া রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ব্রেজিলের লোমশ বানর লেজের সাহায্যে অতি সুন্দর দোল খাইতে পারে। ইহারা আবার সময় সময় লেজকে বৃত্তাকারে কুণ্ডলীকৃত করিয়া তাহার উপর এমনভাবে চাপিয়া বসে যে দেখিয়া মনে হয় তাহারা যেন সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া আছে। গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর লেজ মাছি তাড়াইবার জন্য নিয়োজিত হয়। কাঠ-বিড়ালের লেজ ঘন লোমে আবৃত থাকে এবং তাহা গদীর ন্যায় ব্যবহৃত হয়; এই লেজের উপর শয়ন করিয়া সে পরম সুখে নিদ্রা যায়। লেজের দ্বারা কুকুর যে কিভাবে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করে তাহা আমাদের অবিদিত নাই এবং এ স্থলে লেজ ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এণ্টিলোপ ও খরগোস আপনাদের লেজকে সাংকেতিক চিহ্ন-রূপে ব্যবহার করে। আসন্ন বিপদকালে ইহারা পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া বিপদ-বার্তা জ্ঞাপন করে ও দলের অন্যান্য সকলকে একত্রীভূতভাবে চলিবার নির্দেশ দেয়। শল্কাবৃত পিপীলিকাভুক প্যাঙ্গোলিন ভূগর্ভস্থ গহ্বরে গিয়া যখন নিদ্রা সুখ উপভোগ করে তখন তাহার লেজটি বিবর-প্রান্তে সংস্থাপিত রাখে যাহাতে বাহির হইতে কোন অবাঞ্ছিত অতিথি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতে না পারে।

লেজ-মাহাত্ম্য লিখিতে বসিয়া মানুষের লেজ নাই বলিয়া দুঃখ করিব না। কারণ যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে লেজ একটি বোঝা ও জঞ্জাল স্বরূপ। প্রকৃতিদেবী সেইজন্যই মানুষকে লেজ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের দেহ হইতে আদিম পূর্ব-পুরুষের বিশিষ্ট আকৃতিটি একেবারে অবলোপ করিতে পারি নাই। তাই জীবনের সূচনায় মাতৃ-জঠরে মানব-ভ্রূণ লেজবিশিষ্টরূপেই অবস্থান করে। জনৈক ইংরেজ লেখক যথার্থই বলিয়াছেন, "with our tails we swam supremacy"—লেজ লইয়াই আমরা শ্রেষ্ঠত্বের পথে সন্তরণ করিয়াছি। সুতরাং লেজ-মাহাত্ম্যের গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারি না।

বাঁকাস্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

[উপন্যাস]

(১)

জীবনের হাটে সবাই লাভের অংকটা লইয়া মাথা ঘামায়। সকলের নজরে প্রথমেই পড়ে কাহার ব্যবসায় কিরূপ জোর চলিতেছে, কে কতখানি ধনী হইয়াছে, কে একটি পয়সা মূলধন না লইয়া কলিকাতায় কতগুলি বাড়ি ও গাড়ি করিয়াছে। সকলে যখন ইহা লইয়া চিন্তা করে আমার তখন মনে পড়ে সেই হতভাগ্যের কথা—যে একই ব্যবসায়ে নামিল অথচ সবচেয়ে বেশী লোকসান খাইয়া সকলের পিছনে পড়িয়া রহিল অখ্যাত ও অজ্ঞাত। মাঝে মাঝে মনে হয়—কেন আমার এমন হয়? কেন আমি অন্য সকলের মত লাভটাকে আগে দেখিতে পাই না? উঁচু জিনিসের প্রতি কেন আমার নজর আগে পড়ে না? ধনীর উচ্চশির অট্টালিকার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে আমি তাকাইতে পারি না। শত শত গৃহহারার ক্রন্দন মনে হয় যেন জমাট হইয়া আছে তাহার ভিত্তির অন্ধগহ্বরতলে, সুকঠিন দেওয়ালের পঞ্জরে পঞ্জরে। স্বর্ণরথের উড্ডীয়মান ধ্বজের দিকে চাহিয়া সবাই যখন জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে, আমি তখন নিরীক্ষণ করি—কেহ তাহার চক্রতলে পিষ্ট হইল কিনা। অগ্রহায়ণ মাসে যখন মাঠে মাঠে ধান কাটা চলিতে থাকে—ভারে ভারে ফসল লইয়া চাষীরা হাসিমুখে ঘরের দিকে ছুটিয়া যায়, তখন সহসা আমার মনে পড়ে সেই জমির কথা যাহাতে চাষ হইল না, ফসল ফলিল না। কাহার দোষে কি হইল তাহা ভাবিতে পারি না—গভীর আলস্য, জমির অনুর্বরতা, ক্রুদ্ধ প্রকৃতির নৃশংস পক্ষপাতিত্ব, কিংবা অন্য কিছু যাহা হয়ত মানুষ চোখে দেখিতে পায় না, যাহা হয়ত তাহার চিন্তার বাহিরে। মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। একেবারে যে সেরকম কোন কারণ থাকিতে পারে না তাহাও মন অস্বীকার করিতে চায় না। চুপ করিয়া ভাবি, ইহা কি আমারই মনের দোষ? মনটাকে চিরিয়া চিরিয়া দেখি। হঠাৎ উহার একটা জবাবও পাই।

মনে পড়ে কিছুদিন পূর্বে এক আত্মীয়া আমায় বলিয়াছিলেন, 'তুই যে এমন হবি একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তিরিশ বছর বয়েস হলো। কিন্তু তিরিশটা পয়সা কোন দিন রোজগার করতে পারলিনি। অথচ যারা তোর সংগে পড়তো, তারা কেউ উকিল, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ডাক্তার হয়ে বিয়ে থা করে কেমন সংসারী হয়েছে।'

আত্মীয়ার কণ্ঠে সহানুভূতির সুর ছিল বলিয়া কিনা জানি না, ভাল করিয়া তাহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কে যেন ভিতর হইতে আমার গলাটা টিপিয়া ধরিতে লাগিল। মনে হইল, সত্যই বলিয়াছেন তিনি, আমার সহপাঠিরা সবাই পাইয়াছে জীবনে প্রতিষ্ঠা শুধু আমিই কিছু করিতে পারিলাম না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিলাম—না পাইলাম অর্থ, না পাইলাম যশ, না জীবনের অবলম্বন; অথচ জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অপব্যয়িত হইয়া গেল।

সারা রাত ধরিয়া ঘর পুড়িয়া যাইবার পর প্রভাতে গৃহস্বামী যেমন তাহার ভস্মের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আমিও সেইরূপ অতীতের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কিছু বলিতে পারিলাম না। যাহা হয়ত বলিবার ছিল তাহাও তাঁহাকে বলিতে প্রবৃত্তি হইল না এইজন্য যে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিবেন ত না-ই হয়ত বা উল্টা অর্থ করিয়া আমারি জীবনকে আরো দুর্বহ করিয়া তুলিবেন। তাই এক কথায় তাঁহার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য শুধু নিঃশব্দে কপালটা তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলাম, 'সবই বরাত।'

তিনি ইহা হইতে কি বুঝিয়াছিলেন জানি না। বহুক্ষণ মাথা ঘামাইয়া যেন দর্শনের অতি জটিল তত্ত্বের মর্মোদ্ধার করিতে পারিয়াছেন—এইভাবে সশব্দে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, যা বলেছিস বাবা, ভাগ্য ছাড়া পথ নেই।

সেদিন মুখের একটি ছোট কথায় যে বিষয়টির নিষ্পত্তি এক-মুহূর্তে এমনি করিয়া হইয়া গিয়াছিল সেটি কিন্তু আসলে তত ছোট নহে। ছোট একটি ফল দেখিতে নেহাত তুচ্ছ হইলেও তাহার পিছনে যেমন থাকে দীর্ঘকালের ইতিহাস—বীজ হইতে অংকুর, অংকুর হইতে গাছ আবার তাহা হইতে ডাল পাতা ফুল ও ফল। সেইরূপ এই ছোট কথাটির পিছনেও ছিল একটি ইতিহাস!

তাই সেদিন যে কথাটি বলিতে পারি নাই, লজ্জায় মন: সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম—লোককে আমার এই ব্যর্থ জীবনের কাহিনী শুনাইয়া লাভ কি? যাহা আমার তাহা আমারই থাকুক। কিন্তু আরো দশ বৎসর ধরিয়া তাহাকে নিঃশব্দে বহন করিবার পর আজ হঠাৎ মনে হইতেছে—যাহাকে আমি এতদিন ভাংগাচোরা জীবনের বিকৃত ইতিহাস বলিয়া লোকের সম্মুখে বাহির করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলাম উহা ত মিথ্যা নহে—সুস্থ, সবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের মতই স্পষ্ট ও সত্য। অন্ধকারের পাশে যেমন আলো, অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাংগের কাছে যেমন স্বাস্থ্যবান ও পূর্ণাকৃতি মানব, তেমনি ব্যর্থতার কাছে সার্থকতা—জয়ের কাছে পরাজয়। একজন আছে বলিয়াই ত আর একজনের এত কদর। সত্য দুইটাই—এই ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণই ত মানুষের ইতিহাস!

সেইজন্য আজ কেবলই মনে হইতেছে—আমি যে কাহিনীকে আমার বলিয়া লজ্জাবোধ করিতেছি উহা ত আমার একার নহে, আরো বহু সাফল্যমণ্ডিত গৌরবোজ্জ্বল জীবনের কাহিনী আমারই অন্ধকারময় জীবনের পটভূমিকায় আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া বরং পাঠকের চক্ষুকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। আমি শুধু প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বলতর করিবার কাষ্ঠদণ্ডের মত মাঝে মাঝে সলিতাটিকে ঠেলিয়া দিয়া নীরবে পশ্চাতে অবস্থান করিব। যাহারা আলোর শিখা দেখিবে তাহারা হয়ত আমাকে দেখিতেই পাইবে না। যাহা হউক, ভূমিকা দীর্ঘতর করিয়া পাঠকের বিরক্তিভাজন না হইয়া এইবার আসল কথাটা শুরু করি।

আমি যে একদিন বড় হইব—বিদ্যায় বুদ্ধিতে যশে অর্থে দশজনের একজন হইয়া সমাজের উপরতলায় যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের উপরে না হউক অন্তত একসংগেও যে থাকিত

পারিব, একথা কেমন করিয়া জানি না,—আমি ছাড়া অন্য সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সমবয়সী আত্মীয়স্বজন ত বটেই এমন কি অনাত্মীয় অশিক্ষিত গ্রামবাসী, বৃদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে, সকলের মনেই সেই ধারণা হইয়া গিয়াছিল।

বাল্যকালে আমি যখন কলিকাতা হইতে বাবার সঙ্গে মাত্র দুই একদিনের জন্য বেড়াইতে যাইতাম তখন এইসব বিস্মিত ও কৌতূহলী দর্শকদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে গর্ব অনুভব করি নাই একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। হাফ-প্যান্ট পরিয়া, জুতা-মোজার সঙ্গে গার্টার আঁটিয়া, সাহেবী ধরণে উন্মুক্ত-বক্ষ কোটের মাঝে 'নেকটাই' ঝুলাইয়া দশ বছর বয়সে আমি যখন সেক্সপীয়ার, বায়রন, মিলটন হইতে অর্থ-না-বুঝিয়া অনর্গল ইংরেজী আবৃত্তি করিয়া যাইতাম তখন আমার পিতার কাছে গাঁয়ের বহু প্রবীণ লোককে বলিতে শুনিয়াছি, 'ধন্য তোমার ছেলে, আমাদের দেশের নাম রাখবে,—এতটুকু ছেলের কি ইংরেজী বুলিরে বাবা, একেবারে সাহেবকেও হকচকিয়ে দেয়—কৈ আমাদের গাঁয়ের আর একটা ছেলেও ত এরকম পারে না—ইংরেজী ত দূরের কথা বাঙলাই ওদের জিবে জড়িয়ে যায়।'

স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধ—সকল বয়সের নরনারী আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যেন যাত্রা থিয়েটার শুনিতেছে, এইভাবে অস্ফুট ও স্ফুটতর কণ্ঠে আমার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সেদিন যে-সব উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছিল সেকথা মনে হইলে আজ হাসি পায়।

আবার দুই একটি বালককে চুপিচুপি ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, আলোকের মত আমরাও কলকাতায় থাকলে ওরচেয়ে ভাল ইংরেজী বলতে পারতুম। ওঃ ভারী ত শক্ত, কত যে ভুল বলছে, আমাদের হেড মাস্টার থাকলে এখুনি ধরে দিতে পারতেন, এখানকার সবাই ত পণ্ডিত!

পিছন দিক হইতে এইসব শুনিয়া যখন আমার মুখ অপমানে রাঙা হইয়া উঠিত, আমার বাবার উৎসাহ তখন কিন্তু আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি আমাকে বলিতেন, আলোক সেই গানটা এদের একবার শুনিয়ে দাও ত?

আমি গান গাহিতাম। আমার কণ্ঠস্বর নাকি সুমিষ্ট ছিল। আবার যখন সবাই বাহবা দিত তখন তিনি বলিতেন, আলোক তোমার ব্যাগ থেকে ছবিগুলো এনে একবার এদের দেখাও ত?

আমি ছবিও আঁকিতাম। পিতার আদেশ ছিল আমার কাছে শিরোধার্য। আমার জন্মের পরই মা মারা যান। তখন হইতে তিনি আমায় বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, মায়ের অভাব কোনদিন জানিতে দেন নাই। আমাকে সর্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন এবং সর্বদা বড় আদর্শ আমার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতেন।

কলিকাতার সাহেবী পাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া করিয়া আমরা থাকিতাম। আমি সাহেবী স্কুলে পড়িতাম, মেম নার্স আমায় মানুষ করিত। বাবা চাকরী করিয়া যাহা কিছু রোজগার করিতেন সমস্তই খরচ করিতেন আমাকে সত্যিকারের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য। সেইসব দিনের কথা আজ শুধু স্বপ্নের মত মনে হয়।

দেশে আসিয়া যখন চলিয়া যাইতাম তখন জ্যাঠাইমাকে চোখ মুছিতে মুছিতে প্রায়ই বলিতে শুনিতাম ঃ ঠাকুরপো ওকে দিনকতকের জন্যে এখানে রেখে যাও, এখন ত গরমের ছুটি, আম কাঁঠাল দুটো বাছা খাক্।

ইহার উত্তরে বাবা কি বলিতেন, স্মরণ নাই। তবে একদিনের ঘটনা আজো মনে পড়ে; জ্যাঠাইমা এইরূপ অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এখানে থাকলে সব বদছেলের সঙ্গে মিশে দুদিনে উচ্ছন্ন যাবে বৌদি,—তুমি কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে, ওকে হয়ত চোখে চোখে রাখতে পারবে না—তাহলে আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে!

জ্যাঠাইমার ছেলেমেয়ে অনেকগুলি ছিল। পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ—পেটগুলি বড়, মাথা ডাগর ডাগর, হলুদবর্ণ চক্ষু কোটরগত ও স্তিমিত দৃষ্টি, মসিকৃষ্ণ রঙ, গায়ের চামড়া ফাটাফাটা—খড়ি উঠিতেছে। ধূলোকাদা মাখিয়া, পানাপুকুরে মাতিমাতি করিয়া, গাছে চড়িয়া, বনজঙ্গল ছিঁড়িয়া লুটিয়া পুটিয়া কি সব বুনো ফল আনিয়া তাহারা তাহাদের একমাত্র ইন্দ্রিয় সর্বভুক ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিত। তাহারা আমার ভাইবোন হইলেও তাহাদের দেখিয়া আমার মনটা কেমন ঘিন ঘিন করিত।

বাবার সেই কথা শুনিয়া প্রথমেই জ্যাঠাইমার মনে হইল, তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে মিশিলে পাছে আমি খারাপ হইয়া যাই, বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন এইভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটু মিষ্ট প্রলেপ দিয়া। তাই তিনি বলিলেন, আমার ছেলেদের সঙ্গে মিশলে যদি তোমার ছেলে খারাপ হয়ে যায় মনে করো, তাহলে অবশ্য আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু ছোট বৌ মরবার সময় আলোককে আমার হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিল, 'দিদি, আমার আলোককে আজ থেকে তোমার ছেলে মনে করো।' এই বলিয়া চোখে কাপড় দিয়া, কণ্ঠে একপ্রকার অদ্ভুত সুর টানিয়া আনিয়া তিনি কান্নায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

জ্যাঠাইমার এই কান্না দেখিয়া কিংবা মার শেষ-অনুরোধের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না, বাবার চক্ষু দুটি মুহূর্তে করুণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন জ্যাঠাইমার কাছে গিয়া আমাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, বৌদি চুপ করো, কেঁদো না, এই নাও তোমার আলোককে, আমি আবার আসছে শনিবার এসে নিয়ে যাবো। এই বলিয়া জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আমার ব্যাগটি নামাইয়া রাখিয়া তাঁহার নিজেরটা হাতে লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পাল্কী প্রস্তুত হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। স্টেশন সেখান হইতে নয় মাইল দূরে। একখানি ট্রেন ফেল করিলে আর একখানি—সেই রাত্রে। সমস্ত দিনে মাত্র দুইখানি গাড়ি যায় ও দুইখানি আসে। কাজেই কিছু বেশী সময় হাতে লইয়াই বাহির হইতে হয়। তাহার উপর মানুষের যান একসঙ্গে আর কতক্ষণ বহিতে পারিবে! মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিবার জন্যও কিছু সময় দরকার। তাই পাল্কীর বেহারাও ইতিমধ্যে বারদুই তাগাদা করিয়া গিয়াছিল।

এদিকে বাবা প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠাইমার কান্না থামিয়া গেল। চোখ হইতে কাপড় নামাইয়া এক হাতে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তখন বাবাকে আগাইয়া দিবার জন্য পাল্কীর কাছ পর্যন্ত আসিলেন। বাবা আমার গালে একটি চুমু খাইয়া পাল্কীতে গিয়া বসিলেন এবং দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, আসি বৌদি।

এসো ভাই। বলিয়াই জ্যাঠাইমা আমাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, আলোক যাও,—বাবাকে নমস্কার করে এসো।

আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া বাবার দুই পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেই তিনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলাম, আমি এখানে থাকবো না বাবা, আমায় নিয়ে চলো।

জ্যাঠাইমা যাইয়া আবার আমাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইতেই আমি উচ্চৈস্বরে কান্না ধরিলাম—কিছুতেই সেখানে থাকিব না বলিয়া। তাঁহারা দুইজনে তখন যত আমায় বুঝাইতে লাগিলেন সেখানে

থাকিবার জন্য তত আমার কান্না বাড়িতে লাগিল। সে কি দৃশ্য! মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো কত যে সেখানে জড় হইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে আবার মন্তব্য করিতে লাগিল। ছেলেমেয়েগুলি আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া হাসিতে লাগিল এবং মেয়েদের ভিতর হইতে কেহ কহ বলিল, বুড়ো খোকা লজ্জা করে না কাঁদতে? জ্যাঠাইমা কি তোর পর? তোকে খেয়ে ফেলবে নাকি?

খাইয়া ফেলিবে কি না বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে দেখিলে আমার ভয়ানক ভয় করিত, কি বীভৎস চেহারা! যেমন কালো, তেমনি মোটা, চোখগুলি ভাঁটার মত গোল গোল, নাকে এক বিরাট নথ। রমণীর সৌন্দর্যের বহু বর্ণনা কবিরা করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহের অঙ্গ বিশেষের বিবরণ দিতে গিয়া তাঁহাদের লেখনী মুখর হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আমি কবি নহি তবুও এটুকু নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সৌন্দর্য ত দূরের কথা এত কুশ্রী যে কোন রমণী হইতে পারে চোখে না দেখিলে—আর কেহ বলিলে আমি হয়ত বিশ্বাস করিতাম না। বোধ হয় ভয় নহে, তাঁহার এই সৌন্দর্যহীনতার জন্যই আমার মন এইরূপে বিরাগ হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার প্রতি।

বাবা আমার এই কান্না দেখিয়া বলিলেন, থাক তবে বৌদি, ও এবার আমার সঙ্গে যাক্—পরে বড় ছুটি পেলে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসে এখানে থাকবো।

জ্যাঠাইমা বাবার এই কথার কোন উত্তর না দিয়া শুধু রুক্ষ কণ্ঠে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, ভুতো মুখপোড়া—চোখ দুটো কি তোর কাণা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না—যা-না ছুটে ওর ব্যাগটা ঘর থেকে এনে দে না?

ভুতো এতক্ষণ তাঁহারই কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া মাতৃআজ্ঞা পালন করিল। বেহারারা পাল্কীটি কাঁধে তুলিয়া লইলে বাবা আর একবার বলিলেন, বৌদি তবে আসি, কিছু মনে করো না।

জ্যাঠাইমা কোন উত্তর দিলেন না। তবে পাল্কী কিছুদূর চলিয়া যাইবার পর আমাদের কানে আসিল, আলোক না হয় ছেলেমানুষ সে ত কাঁদবেই—তুমি বাপ, তোমার কি তা'বলে সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত, দিদি?

দিদিদের মধ্য হইতে কে একজন খপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওগো, ওরা যে শহুরে লোক, আমাদের মত জঙ্গলীদের সঙ্গে থাকলে যে মান যাবে—তা বোঝ না?

জ্যাঠাইমার গলা আরো কিছুদূরে চলিয়া যাইবার পরও আমরা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিতেছেন, বুঝি না আবার, আমায় কি কচি খুকী পেলি ভুতির মা—সব বুঝি তবে ঠাকুরপোর আক্কেলটা দেখছিলুম!

ইহা শুনিয়া বাবা একবার নীরবে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, আমি একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। কেহ কাহাকে কোন প্রশ্ন করিলাম না। পাল্কী চলিতে লাগিল। আমরা দুইজনেই দরজা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমশ

ইসারা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আমার নয়নতলে নীলস্বপ্ন ভীড় করে আসে,
বিহ্বল পাখীর চোখে যে স্বপন না পায় সীমানা,
যে স্বপ্ন ঘুরিয়া মরে জানিবারে নির্দিষ্ট ঠিকানা
অনাগত ভবিষ্যের, শতাব্দীর আকাশে আকাশে।
স্বপ্ন দেখিঃ ফুল ফোটে মৃত্তিকার ধূলিম্লান ঘাসে,
রাত্রির দুর্য্যোগশেষে দেখি চোখে প্রশান্ত সকাল।
থেমে গেছে মহাযুদ্ধ। পড়ে নেই কোথাও কঙ্কাল।
স্বপ্ন দেখি—যে স্বপ্নরা দোল খায় বাতাসে বাতাসে।

বহুকাল পরে মোর চক্ষুভরে নেমেছে স্বপন,
বহুযুগ পরে দেখি পশ্চিমের আরক্ত আকাশ,
চতুর্দিকে হাস্যোজ্জ্বল উন্মাদনা প্রাণে দেয় সাড়া।
পূর্বাকাশে জাগে ফের নবোদিত প্রদীপ্ত তপন,
জীবনের মহাযজ্ঞে সিদ্ধিলাভ,—সত্যের প্রকাশ,
সতন্দ্র স্বপ্নালু চোখে দেখি আমি তাহারি ইসারা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(১৮৪০—১৮৭০)

শ্রীজহরলাল বসু

পাশ্চাত্য দেশে খ্যাতিমান্ সাহিত্যসেবিগণ মৃত্যুর পরে পরবর্তিগণের নিকট হইতে দেবতার মত পূজা পাইয়া থাকেন, এমন কি অনেক স্থলে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মর্মর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে সকল প্রাচীন লেখক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা শুধু ভারতে কেন ভারতের বাহিরেও তাঁহাদের প্রাপ্য পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশে পরবর্তী যুগে যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি বিধানকল্পে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে—বিদেশে তো দূরের কথা, স্বদেশেও—সমুচিত পূজা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন কি? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে—পূর্বে বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যসেবীর প্রতি সমুচিত সমাদর বা শ্রদ্ধাপ্রদর্শনরীতি প্রচলিত ছিল না; অধুনা সে রীতি কথঞ্চিৎ প্রবর্তিত হইলেও, বেশ ব্যাপকভাবে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অনেক বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্যানুরাগী মহানুভব ব্যক্তি এখনও দেশবাসীর নিকট হইতে প্রাপ্য সম্মান পান নাই বা পাইতেছেন না। জনকয়েক বঙ্গসাহিত্যসেবীর জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইলেও সকল বিশিষ্ট সাহিত্যিকের প্রতি সে সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। সুপণ্ডিত রাসবিহারী ঘোষ একদিন বলিয়াছিলেন—

A nation that does not take a just pride in its own annals must be wanting in self-respect.

এক সময়ে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিধানার্থ কত যে অর্থ ব্যয়, কত যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন—তাহা অধুনা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিতপ্রায়। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য, বাঙালী সাহিত্যসেবিগণকে উৎসাহদানার্থ তাঁহাদিগের সম্বর্ধনার জন্য, বঙ্গভাষায় সদ্ গ্রন্থ প্রচারের জন্যও এবম্বিধ নানা সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ আমাদের দেশের সকলের মনে জাগরূক থাকিলে দেশবাসী নিশ্চয়ই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহার স্মৃতিপূজা করিতেন, এমন কি, সম্ভব হইলে তাঁহার মর্মর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই কালীপ্রসন্নের জন্মের তারিখ তো জানা দূরের কথা, সাল পর্যন্ত অদ্যাবধি অবিসম্বাদিতরূপে অবধারিত হয় নাই।

বংশ তালিকা

দেয়ান শান্তিরাম
- প্রাণকৃষ্ণ
- জয়কৃষ্ণ
  - নন্দলাল (সাতুবাবু)
    - কালীপ্রসন্ন
      - বিজয়চন্দ্র (পোষ্যপুত্র)

যে বহুমুখী প্রতিভা লইয়া মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অকালমৃত্যু তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া না লইলে, দেশের চিরকল্যাণকামী কালীপ্রসন্ন তাঁর প্রিয় দেশের জন্য আরও কত যে মঙ্গলজনক কার্য করিতে পারিতেন তাহা কে বলিতে পারে? ইংলণ্ডের প্রতিভাবান কবি কীট্সও অল্প বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার নাম বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই। একটু অনুসন্ধান করিলেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই—দেশের তৎকালীন যাবতীয় মহদনুষ্ঠানের সহিত কীর্তিমান কালীপ্রসন্নের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। দেশের এবং দেশবাসীর যাবতীয় গৌরবজনক অনুষ্ঠানকে প্রাণপণে উৎসাহ দিতে ও সাহায্য করিতে এবং অপর পক্ষে অকীর্তিকর যাবতীয় প্রয়াসকে সমূলে বিনষ্ট করিতে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য।

তাঁহার সময়ে দেশ ছিল অনাচারে অমিতাচারে পূর্ণ; পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শিক্ষার প্রতি অনাস্থা, ধনিগণ কুৎসিৎ বিলাসব্যসনাদিতে ব্যয় করিতে মুক্তহস্ত কিন্তু কোন সৎ কর্মে অর্থ ব্যয়ে একান্ত পরাঙ্মুখ। এই সমস্ত দেখিয়া দেশের পরমহিতৈষী কালীপ্রসন্নের প্রাণ যথার্থই কাঁদিয়াছিল। তখনকার দিনে ধনীর দুলালরা কদাচারপূর্ণ বিলাসসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া যেরূপ কুৎসিৎভাবে কালাতিপাত করিতেন, কুবেরের মত ঐশ্বর্যবান দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র কালীপ্রসন্ন কিন্তু ঐ সমস্ত ন্যক্কারজনক কদাচরণের কুফল প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক 'হুতোমে' উহার ভূয়সী নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। আমরা অদ্য অতি সংক্ষেপে এই কালীপ্রসন্নের চিরগৌরবময় জীবনের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—কালীপ্রসন্নের জন্ম তারিখ ঠিক নির্ণীত হয় নাই। খুব সম্ভব, ১৮৪০ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। বিপুল ধনের অধিকারী কালীপ্রসন্ন অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াও তৎকালীন প্রচলিত প্রথামত বিলাসপঙ্কে নিমগ্ন হন নাই। পরন্ত শৈশবে উপযুক্ত অভিভাবকের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তিনি মনোযোগ সহকারে যথাসম্ভব শিক্ষালাভ করেন। খুব উচ্চ শিক্ষালাভ না করিলেও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ তাঁহার চিরদিন ছিল। কালীপ্রসন্নের বিবাহ হয় খুব অল্প বয়সে—বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু পরিবারের বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনতিকাল পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন; এবারে তিনি বিবাহ করেন (রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌহিত্রী) চন্দ্রনাথ বসুর কন্যাকে।

কালীপ্রসন্নের সময়ে বাঙালী সমাজে ঘোর দুর্দিন। একদল গোঁড়া হিন্দু—তাঁহারা হিন্দুর সনাতনী রীতিনীতি আচার ব্যবহারকে অচলায়তনের মত আঁকড়াইয়া ছিলেন, অপর দল—সংস্কারপন্থী; খৃস্টান পাদরীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা আপাত চমকপ্রদ খৃস্টানী হাবভাবকে বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াসী ছিলেন; তৃতীয় দল—প্রকাশ্য অনাচারী; খৃস্টান পাদরীগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, মদ্যপ, গোমাংসাশী; চতুর্থ দল—গোঁড়া সনাতনী হিন্দু ও অনাচারী খৃস্টমতাশ্রয়ীদের প্রচণ্ড বিরোধের মধ্য হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে এদেশে এক মধ্যপথাবলম্বী ধর্ম ক্রমশ প্রচার লাভ করে। তৎকালে দেশের অনেক বিশিষ্ট ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পূর্বোক্ত প্রথম দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শোভাবাজারের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজবংশের মধ্যমণিস্বরূপ স্বনামধন্য রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর* এবং তাঁহার সহায়ক ছিলেন তাঁহার অন্যতম জ্ঞাতি-ভ্রাতা রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (লেখকের শ্বশুরের পিতামহ); জোড়াসাঁকোর জমিদার কালীপ্রসন্নও চিরদিন এই দলভুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই দলেরই মত সমর্থন করিতেন।

একাধিকবার দার পরিগ্রহ করিলেও পুত্র মুখ দর্শন লাভ

*এই রাজা রাধাকান্তকে মনীষী কৃষ্ণদাস পাল "Veteran scholar and venerable patriarch of Indian Society" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নের ভাগ্যে ঘটে নাই। যে বয়সে অনেকে সবেমাত্র কর্ম-জীবনে প্রবেশ করে সেই বয়সের মধ্যেই জীবনের বহু আরব্ধ কার্য সমাপন করিয়া, বহু সৎকর্মের পথ নির্দেশ করিয়া প্রচুর সম্মানে ভূষিত হইয়া কালীপ্রসন্ন যখন ১৮৭০ খৃস্টাব্দে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন তখন তাঁহার বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর!

তাঁহার কর্মবহুল জীবনের বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা একদিকে দেখিতে পাই—তিনি অসুরের মত উদ্যমে বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধানার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ইহার জন্য তিনি কত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অপর দিকে দেখিতে পাই—বাঙালীর, বিশেষত হিন্দুর সামাজিক ও নৈতিক জীবন সমুন্নত করিবার জন্য তিনি যেন সতত উৎসুক।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগের আলোচনা করিতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখতে পাই—প্রাসাদোপম নিজ বাসভবনে তিনি যে সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নামই ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদের প্রথমভাগে এই সভা আরম্ভ হয়। কালীপ্রসন্ন এই সভার শুধু সম্পাদক ছিলেন না; তিনিই ছিলেন এই সভার মূলভিত্তি বা প্রধান স্তম্ভ। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধন। রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল, 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র; কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ বহু মনীষী ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। এই সভার অধিবেশনে বহু তথ্যপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইত এবং যাহাতে ভাল ভাল সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিতে অধিক লোকে অগ্রসর হ'ন তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে এই সভা হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হইত। এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে গুণী ব্যক্তিদিগকে মানপত্রাদি দ্বারাও সংবর্ধনা করা হইত। কবিবর মাইকেলের সংবর্ধনা এতন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য; ঐ সংবর্ধনা সভায় কবি বাঙলায় উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। পরে এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—"Fancy! I was expected to speechify in Bengali!"

কালীপ্রসন্নের জীবনী অনুশীলন করিতে গেলে তাঁহার মধ্যে একটা জিনিস আমরা বরাবর দেখিতে পাই (এই মনোবৃত্তিটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে তাঁহার মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল)—কালীপ্রসন্ন জীবনে কোন-প্রকার ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি—কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভট্টাচার্যদিগের শিখাচ্ছেদন করিয়া প্রত্যেকের নাম ঠিকানা লিখিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন এবং তজ্জন্য কাহাকে কত অর্থ দিতে হইল তাহাও লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে কর্তিত শিখাগুলি তিনি প্রকাশ্য স্থানে সাজাইয়া রাখিতেন জনসাধারণকে দেখাইবার জন্য যে যাঁহারা আশানুরূপ অর্থশুল্কের বিনিময়ে শিখাচ্ছেদনে সম্মতিদান করিতে পারেন, তাঁহারা ধর্মের প্রতি ঐকান্তিকী আস্থাবশত শিখা রাখেন না; শিখা রাখেন শুধু লোক দেখানর জন্য। অতএব কালীপ্রসন্নের বিবেচনায়—ভণ্ডধার্মিকের পক্ষে শিরোপরি শিখাধারণ না করাই ভাল। কালীপ্রসন্নের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক "হুতোম প্যাচার নক্শা" অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে তাঁহার উক্ত মনোবৃত্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনা ও সুধীসংবর্ধনা করিত না। তৎকালীন বহুজনহিতকর কার্যের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাম সংশ্লিষ্ট ছিল। পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার ফলে বিধবা-বিবাহ আইন (Act XV of 1856) বিধিবদ্ধ হইবার পর বিধবা-বিবাহকে উৎসাহ ও প্রসার দানোদ্দেশে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন বিধবা-বিবাহেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহস্র মুদ্রা পর্যন্ত উপহার ঘোষণা করেন!

উক্ত বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদকরূপে কালীপ্রসন্ন অপর একটি মহতী প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইতেছে— সারা-রাত্রিব্যাপী মদ্যপান ও গীতবাদ্যাদির কোলাহল অপনয়নের জন্য কলিকাতা মহানগরীর মধ্যভাগ হইতে শহরের উপকণ্ঠভাগে বার-বনিতাগণের স্থান নির্দেশ।

বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের উন্নতি বিধানকল্পে তাহাকে উৎসাহ-দান বিদ্যোৎসাহিনী সভার অন্যতম গৌরবজনক প্রয়াস। বলা-বাহুল্য, তখন পর্যন্ত বাঙলায় রচিত অভিনয়যোগ্য নাটক ছিল না। বঙ্গ ভাষায় নাটক রচনায় অপরকে শুধু উৎসাহ দিয়া কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হ'ন নাই। "Example is better than precept"—নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি নিজেও বাঙলা নাটক রচনা করিয়া সুধীসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকও এই বিদ্যোৎ-সাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে অভিরূপভূয়িষ্ঠ পরিষৎ সমক্ষে বহু কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার জনহিতকর অন্যতম অনুষ্ঠান—সাময়িক পত্র প্রকাশ ও পরিচালন। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে 'বিদ্যোৎ-সাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; ইহার সম্পাদক ছিলেন—কালীপ্রসন্ন স্বয়ং। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই মাসিক পত্রিকা অধিক দিন চলে নাই।

তৎকালীন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ-সংগ্রহের" সম্পাদনা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কিছুদিনের জন্য কালীপ্রসন্ন ইহার সম্পাদনাভার বহন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—কত যে জনহিতকর অনু-ষ্ঠানের সহিত এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পর্কিত ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সভার নামকরণ যথার্থ সার্থক হইয়াছিল।

কালীপ্রসন্নের মত একাধারে উদারচেতা, বদান্য, বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী ধনীর সন্তান রাজা রাধাকান্ত ব্যতিরেকে তখনকার দিনে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীর দুলালরা তখন বিলাসসাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। জনহিতকর অনুষ্ঠানের দিকে তাঁহারা মনোনিয়োগ করিতেন না। তৎপূর্বে তাঁহার অগ্রজোপম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়* যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কালী-প্রসন্নও যথাসম্ভব সেই পথেই চলিয়াছিলেন। ভবানীচরণ যেমন তৎকালীন পারিবারিক বা সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে তৎপর ছিলেন এবং ঐ কার্যেই তাঁহার লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী প্যারীচাঁদ মিত্র এবং তৎপরে কালীপ্রসন্ন সিংহ—যেন যথাক্রমে একই ব্রত লইয়া লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটু প্রসারিত দৃষ্টি সহকারে বিচার করিতে গেলে, ইহা বলিতে পারা যায় যে, ভবানীচরণের 'নব বাবুবিলাস' প্রভৃতি রচনা যেন একই আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলাল' প্রভৃতি যেন তাহার দ্বিতীয় অধ্যায় এবং কালীপ্রসন্নের 'হুতোম' যেন তাহার শেষ অধ্যায়।†

কালীপ্রসন্নের রচনাবলীর মধ্যে হুতোম এবং মহাভারতই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই মহাভারতই তাঁহার গৌরবকেতন। তদানীন্তন সংস্কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায়,

---

*লেখক প্রণীত 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধ চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত ও ১৩৪৬ সালের মাঘ মাসের গল্প-লহরীতে প্রকাশিত হয়।

†মনীষী কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছেন—

"*Hootumpacha* marks an era in the history of fiction-writing in Bengalee. He has introduced a familiar and graphic style in drawing sketches from real life hitherto unknown among Bengalee writers."

বিভিন্ন স্থান হইতে মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রণীত সংস্কৃত মূল মহাভারতের বিভিন্ন বিরোধী পাঠের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য করিয়া এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া অমিত উদ্যমে তিনি এই সুমহান কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি সংস্কৃত মূল মহাভারতের গদ্যানুবাদ তিনজনের দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে বর্ধমানের ভূতপূর্ব মহারাজা মহাতাব্ চান্দ বাহাদুর বহু অর্থব্যয়ে সংস্কৃত মূল মহাভারতের যে গদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা অনবদ্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই; বর্ধমান মহারাজও বহু পণ্ডিত-মণ্ডলীর সাহায্যে বহু শ্রমসাধ্য কার্যে ব্রতী হন। কিন্তু সব দিক হইতে বিচার করিলে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত মূল মহাভারতের যতগুলি বঙ্গানুবাদ আছে তন্মধ্যে কালীপ্রসন্নের পুস্তকই সব চেয়ে উত্তম। ইহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল বিষয়ও তেমনি মূল হইতে অবিকৃত। ইতিপূর্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অল্পাংশ মাত্র অনুবাদ করিবার পর যখন শুনিতে পাইলেন যে, কালীপ্রসন্ন এই মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখনই তিনি স্বয়ং এই অনুবাদের ইচ্ছা পরিহার করেন; বরং কালীপ্রসন্নকে এই অনুবাদ কার্যে মধ্যে মধ্যে সহায়তা করিতেন। তখনকার বহু খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই অনুবাদ কার্যে কালীপ্রসন্নকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, দীর্ঘ আট বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া তবে কালীপ্রসন্ন তাঁহার জীবনের চির-বাঞ্ছিত মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে সমর্থ হ'ন।

উক্ত দুইখানি পুস্তক ব্যতীত আরও ছোট খাট কয়েকখানি পুস্তক ও প্রবন্ধ তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সবগুলি এখন পাওয়াও যায় না; তন্মধ্যে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী এবং ভবভূতির মালতীমাধবের বঙ্গানুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি—তাঁহার সময়ে বাঙলায় নাটকের একান্ত অভাব ছিল; এই অভাব আংশিকরূপে দূরীকরণার্থ তিনি উক্ত নাটকদ্বয় প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—কালীপ্রসন্ন বহু গুণের আধার ছিলেন; তন্মধ্যে দানশৌণ্ডতা অন্যতম। তাঁহার দানের দু'একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহাভারত প্রকাশে তাঁহার অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছিল—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বিরাট অমূল্য মহাভারত গ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, বিক্রয় করেন নাই! বিদ্যার্থীর সুবিধার জন্য এবং শিক্ষা প্রসারকল্পে তিনি কত যে দান করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার দান ছিল সংকীর্ণতা বর্জিত; দেশ বিদেশে দুর্ভিক্ষোপলক্ষে তিনি হাজার হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরেজিতে প্রচার করার অভিযোগে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে পাদরী লঙ্ সাহেবের সহস্র মুদ্রা জরিমানা ও এক মাস কারাবাসের আদেশ হইলে দানবীর কালীপ্রসন্ন অবিলম্বে জরিমানার সহস্র মুদ্রা আদালতে জমা দেন।

এক সময়ে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ বাঙালী জাতিকে অসত্যভাষী ও প্রতারক বলিয়া অভিহিত করায় নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী কালীপ্রসন্ন তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। অচিরে তিনি কলিকাতার বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত প্রকাশ্য সভায় ইহার আলোচনা করিয়া উক্ত ওয়েলস সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের স্বাক্ষরসহ এক দীর্ঘ আবেদনপত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র মারফৎ বিলাতে সেক্রেটারী অফ্ স্টেটের নিকট প্রেরিত করান।

ভারতের জনপ্রিয় বড়লাট লর্ড ক্যানিঙের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কালীপ্রসন্ন হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন! তাঁহার সময়ে কলিকাতায় যত কিছু জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কালীপ্রসন্নের নাম তাহার প্রতিটির সহিত বিজড়িত ছিল। কিছু-দিনের জন্য তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হ'ন; এই কার্যও তিনি যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখনই মনে হয় যে, মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক এত জন-হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন, তখনই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। কালীপ্রসন্ন মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জড়দেহ দগ্ধ হইয়া পঞ্চ ভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যশোদেহে আজিও তিনি আমা-দিগের সমক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যত-দিন বঙ্গবাসী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের প্রতি প্রাপ্য মর্যাদা প্রদর্শন করিতে থাকিবে, ততদিন একমাত্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদই কালীপ্রসন্নের নাম আমাদিগের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

দিদি

(২৭৪ পৃষ্ঠার পর)

করে উঠল। কি ভেবে খানিক বাদে সেখান থেকে উঠে ঘরে এসে ঢুকলেন।

রায় বাহাদুর চুপ করে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। মেয়ে বাপের পায়ের ওপর হাত রাখতেই তিনি দু হাত দিয়ে মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন। বাবার বুকের ওপর মাথা রেখে খানিক পড়ে' রইলেন চিত্রাদেবী। তারপর টেবলের ওপরে ছিল ধান, দুর্বার প্লেটখানা, সেখানা তুলে নিয়ে সোজা এলেন—কুণালদের বাড়িতে। রঘু নিচে বসেছিল, তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

—দাঁড়াও দিদি প্রণাম করি। চিত্রাদেবী কিন্তু সেখানে অপেক্ষা করলেন না, সোজা কুণালের ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন, কুণাল চুপ করে বিছানায় শুয়ে। পায়ের জুতাটা পর্যন্ত ছাড়েনি। চিত্রাদেবী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি করবেন, ঠিক করতে পারছেন না। রঘু ডেকে উঠল পেছন থেকে—'খোকা ভাই।' কুণাল উঠে বসতেই চিত্রাদেবীকে দেখে নির্বাক হয়ে রইল। এবার চিত্রাদেবী আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালেন। রঘু কি ভেবে দৌড়ে গেল রায় বাহাদুরের কাছে। দুজনে যখন এসে দাঁড়ালেন দ্বারের সামনে, কুণাল চিত্রাদেবীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছে। চিত্রাদেবীর ডান হাতখানা কুণালের মাথার ওপর। দুজনেই নির্বাক। কুণালের বহুদিনের যে কান্নাগুলো জমা ছিল, আজ তা ঝরে পড়ল; হঠাৎ সে দিদি, দিদিগো, বলে কেঁদে উঠল। চিত্রাদেবী আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, কি যে হ'ল,—দুহাত দিয়ে কুণালের মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরলেন। ভুলেই গেলেন, তিনি কুণালের কেউ নন, তাঁর বয়সের সঙ্গে কুণালের বয়সের পার্থক্য বেশী নেই। দুটি কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'দাদা, ভাই।' তিনি আজ আর কেউ নন—কুণালের হারানো দিদি।

রায় বাহাদুর যখন এই দৃশ্য দেখে রঘুর দিকে মুখ ফেরালেন, দেখতে পেলেন, বৃদ্ধের দুই চোখ বেয়ে অজস্রধারায় জল ঝরছে। নিজের দুটি চোখ বেয়ে কখন যে জল গড়িয়ে এসেছে টের পাননি।

বৈষ্ণব সাধনায় গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্রের বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অমর অবদান রয়েছে, আপনারা সে সম্বন্ধে বড় বড় সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে অনেক কথাই শুনলেন। বৈষ্ণব সাধনায় তাঁর অবদানের দিকটা সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলবার জন্যে আদেশ হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে যেমন দুই-একদিনে সব কথা বলা যায় না, তেমনই বৈষ্ণব সাধনায় তাঁর অবদানের সম্বন্ধে সামান্য রকমে বলতে গেলেও দুই-একদিনে কোন কিছুই বলে উঠা যায় না; বিশেষভবে তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও অতি সামান্য। এসব চরিত্র অত্যন্ত দুর্গম। জ্ঞানীকে বরং বোঝা যায়, আমাদের লৌকিক রীতিনীতি দিয়ে কর্মীকে বরং আমরা মাপতে পারি; কিন্তু ভক্তকে বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন। প্রেমের গতি সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র-গভীর এবং অন্তস্তল-সঞ্চারী। আমরা সাধারণত মানুষের ওজন করি, তার বাইরের আচার-বিচার দেখে; কিন্তু এ মাপকাঠি দিয়ে ভক্তকে মাপা যায় না; বৈষ্ণবকে বিচার করা চলে না। মনের গভীর গহনে তাদের গতি। বাস্তবিক পক্ষে বাইরের আচার-বিচার তো মানুষের সব নয়; এ সবই তো অবস্থা এবং দেশ কাল পাত্রের প্রতিবেশ প্রভাবের ওপর এগুলো নির্ভর করে এবং এগুলো প্রাদেশিক; মানুষ এ সবের ওপরে। তার জীবন নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সে জীবন অবস্থাকে অতিক্রম করে আপনার মহিমা ঘোষণা করতে চায়; জীবন কালিন্দীর এ কলধ্বনি অবস্থার বিপাকে পড়ে আমাদের অনেকেরই কানে অবশ্য পৌঁছে না; কিন্তু কোন কোন ভাগ্যবান শুনতে পান। তাঁরা রসের উৎসের ভিতর ডুবে অমৃতের বাণী বাইরে নিয়ে আসেন। মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে ব্যক্ত করেন। এদের জীবনই জীবন, এরা আর মরেন না। আমাদের ঋষিদের মতে যাঁরা এমনভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অনন্ত জীবনে ইহলোক এবং পরলোকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরাই বৈষ্ণব। গিরিশচন্দ্রের বৈষ্ণবতা এইখানে। তিনি মরেন নাই, জাতির অন্তরে তিনি বেঁচে আছেন, দেশের অন্তরে বেঁচে আছেন, শুধু তাই নয় জগৎবাসীর অন্তরেও তিনি বেঁচে থাকবেন। এখন কথা উঠতে পারে, বৈষ্ণব না হয়েও কি এমন বেঁচে থাকা যায় না। এর উত্তরে সোজাসুজি বলা চলে যে না, যিনি মধুর তিনিই বেঁচে থাকবেন—"সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর, নয়নে শ্রবণে মনে বচন মধুর।" গিরিশচন্দ্র এই মধুর হয়েছিলেন। প্রতিবেশ-প্রভাবের সংস্কার কাল পরিমাণে যতই পিছিয়ে যেতে থাকবে আমাদের প্রাদেশিক রীতি নীতিতে তাঁকে মাপবার বাতিক ততই কেটে যাবে, আর তিনি অধিক মধুর হয়ে উঠবেন। তাঁর গরিমাই বাড়বে, আমাদের সংস্কারের দৃষ্টি দোষ কাটিয়ে উঠে আমরা তাঁর উজ্জ্বলতর মূর্তি দেখবো। বৈষ্ণবতার নিরিখ এইখানে, অন্য সকল দিকের সাধনাতেই কালের ছোপে কাল রং ধরতে পারে, কিন্তু মধুর রসের যাঁরা ভাণ্ডারী তাঁদের পক্ষে এটি ঘটে না। গিরিশচন্দ্র এ রস নিজে পেয়েছিলেন এবং আমাদের সে রস তিনি দিয়ে গেছেন। ইচ্ছা করলেই এ রসের কেউ অধিকারী হতে পারে না, নিজে চেষ্টার দ্বারা এ বিত্ত অর্জন করা সম্ভব নয়; আর এ রসে একবার সত্যিই যে মজেছে, বাইরের আচার বিচার বা বিধি বিধানের সে দাস থাকে না। তার গতি হয় সে রসের টানে, কোন যুক্তির ক্ষেত্র তার আছে আর থাকে না। পরাপেক্ষার উপরে তিনি চলে যান। নিন্দা স্তুতির তিনি ঊর্ধ্বে। নিন্দা স্তুতি বিচার করে চলতে চাইলেও তিনি তা পারেন না। এ জিনিস সোজা জিনিস নয়। এই যে অবস্থা, এই অবস্থার সম্বন্ধে ভক্ত রালফ ওয়ালডো ইমার্সন বলেন, 'মধুর দেবতার সঙ্গে কথোপকথনের অর্থাৎ যোগের ফলে মানুষের চিত্তে প্রেমের একটা জোয়ার উঠে; এমন অবস্থায় ভাবকে চেপে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়; সে গভীর ভাব ভাষায় ভেঙ্গে বাইরে আসতে চায়। অপরকে দিবার ইচ্ছা একান্ত হয়। এমন অবস্থায় বাক্য প্রকাশ যদি রুদ্ধ করা হয়, তবে লব্ধ সে অনুপ্রাণন অন্তরে বোঝার মত হয়ে পীড়া দেয়। সাধককে উপদেষ্টা হইতেই হয়। যে কোন প্রকারেই হউক, তিনি যা দেখেছেন, তাঁকে তা বলতেই হয়। মহাভাবে আপন-ভোলা এমন মানুষই উপদেষ্টা বা কবি হ'তে পারেন। এই অনুপ্রাণনা না পেয়ে পুঁথি বা পাণ্ডিত্যের সাহায্যে, দশজনের মন যোগাবার জন্যে কিংবা প্রচলিত প্রথার অনুরোধে বা স্বার্থপ্রণোদিত হ'য়ে যারা বলবার চেষ্টা করে, তাদের কথা আবোল তাবোল হ'য়ে পড়ে। লোকের মন ভিজে না। বাতাহত শুষ্ক তৃণের মত তাদের কথা উড়ে চলে যায়। লেখা হয় ব্যর্থ। সমাজের প্রশংসা লাভের জন্য যে সাধুতা, সে জিনিস বড় জিনিস নয়, সমাজের প্রচলিত সাধুতার আদর্শ অনায়াসেই লাভ করা যায় এবং পুণ্যের নামে সে জিনিস অনেকেই পায়; কিন্তু ধর্ম অনেক উপরের বস্তু। সে জীবনে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি বাঁধা বুলি আওড়ান না। তাঁকে যন্ত্র করে মহৎশক্তি উচ্ছ্বসিত হয়। তিনি শক্তিকেন্দ্র। সাজানো গোছানো কৃত্রিমতাকে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে কাজ করেন; প্রকৃতপক্ষের এঁরাই উপদেষ্টা, এঁরা কবি এঁরা ছন্দবিৎ এবং এঁরাই বৈষ্ণব। গিরিশচন্দ্র এমন বড় অবস্থায় গিয়েছিলেন; গিয়েছিলেন কিসের জোরে? উত্তরে বলতে হয় গুরুর কৃপায়, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে। ভগবানের কৃপাকে অকুণ্ঠভাবে যেমন করে স্বীকার করতে হয়, তিনি তা করেছিলেন। নিজের উপর আর কোন ঝুঁকি রাখেন নি। তিনি বুঝেছিলেন এই পরম সত্যকে যে, তাঁর কৃপা যখন রয়েছে, তখন আর আমার কিছু করতে হবে না। আমাকে ভাল হতে হবে না, মন্দতেও আমার কোন ভয় নেই। কৃপাকে এমন সত্য করে ধরলে কৃতের দিকে নজর থাকতে পারে না; ও সবই গৌণ হয়ে যায়। কৃপাই অভয়ত্বময় আপ্যায়নে দিবারাত্র অন্তর জুড়ে থাকে, সাধক তখন তন্ময় এবং বিভোর হয়ে পড়েন। তিনি প্রত্যাদিষ্টের অবস্থায় যান। গুরু কৃপার মাধুর্যই তাঁকে চালিত করে। বাইরের অপেক্ষার বন্ধন থেকে এইভাবে মুক্ত হয়ে তাঁর হৃদয়ের দল খুলে যায়। নিত্য মাধুর্য লীলার সঙ্গে হয় তাঁর সংযোগ। সে অযাচিত কৃপার মাধুর্যের চমৎকারিত্ব তিনি আর চেপে রাখতে পারেন না, তাঁকে ডুবিয়ে সে রস বাইরে এসে পড়ে। কবিত্বের মূলে হল এই লীলা। মধুর বৃন্দাবনধামের সে লীলার খেলা হৃদয়ে না জাগলে প্রকৃত কবিত্বের স্ফুরণ ঘটে না। এজন্য কথাই রয়েছে যে কানু ছাড়া গীত নাই। দয়াল ঠাকুরের কৃপায় গিরিশচন্দ্র লোকধর্ম, বেদধর্ম, গৃহধর্ম কর্ম—সুদুস্ত্যজ আর্য পথের ওপরে এই মধুর লীলা রসের রাজত্বে প্রবেশ করবার অধিকারী হয়েছিলেন। আর এটি তখন দরকারও হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের সংস্কৃতির ধারা দেশের অন্তরের সূত্র হতে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা মন্দ আমি বলছি না; কিন্তু পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রভাবে সে শিক্ষায় পাণ্ডিত্যাভিমানীদের মধ্যে যদি এমন মতিগতি দেখা দেয় যে, এদেশের সংস্কৃতি সব খারাপ, এদেশের গরীব কাঙালেরা সব বর্বর, কুশিক্ষিত, এরা মানুষ নয়, ঘৃণারই যোগ্য; তবে তার ফলে জাতির সর্বনাশ ঘটে। এ অপরাধ বৈষ্ণব অপরাধ, বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলেছেন, বড় বৈষ্ণবের অপরাধ, ঠাকুর তবু ক্ষমা করেন। কিন্তু ছোট বৈষ্ণব, অধম বৈষ্ণব, পতিতরূপী, মূর্খরূপী বৈষ্ণব, এদের

প্রতি অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন না। জাতি এ অপরাধে মরতে বসেছিল। ঠাকুরের কৃপাধারা গিরিশচন্দ্রের ভিতর দিয়ে কাজ করে', এই পরম বৈষ্ণব অপরাধের থেকে জাতিকে রক্ষা করল। গিরিশচন্দ্র অভিমানের গতি ঘুরিয়ে দিলেন আত্মনিবেদনের পথে।' নিত্য রসের উৎসের সঙ্গে জাতির চিত্তকে আবার যুক্ত করে দিলেন। প্রেমের অবতার মহাপ্রভুকে নিয়ে এলেন আবার গিরিশচন্দ্র। আবার কাঙালের ঠাকুর গোরাচাঁদের গুণ শুনালেন তিনি জাতিকে। আবার অধমতারণ, পতিতপাবন সকলের পায়ে পড়ে হরিবোলা নিতাইয়ের রূপ তিনি সামনে এনে দেখালেন জাতিকে। জাতি ভুলতে বসেছিল কৃষ্ণতত্ত্বের নিত্যত্বকে। কৃষ্ণকে মানুষ বলে রাজনৈতিক কর্মী বলে বুঝে নিত্য রসের উৎস হারাতে বসেছিল জাতি, সে হারানিধিকে নিয়ে এলেন আবার গিরিশচন্দ্র, দেখালেন তিনি জাতিকে এ সত্য, চিত্তে মধুর রসে সিক্ত করে দিলেন তিনি এই তত্ত্বকে যে, বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ নেই। "কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হইতে" শ্রীরূপের কাছে মহাপ্রভু যে আদেশ করেছিলেন, সে আদেশ কৃপা রসের কি আবেশে ভেসে এলো আবার গিরিশচন্দ্রের কাছে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সূত্র গত 'ইউনিভার্সালিজম' বা 'হিউম্যানিজমকে;' তিনি অপূর্ব ছন্দোবন্দে মধুর দেবতার নিত্য রসলীলার সঙ্গে জাতির চিত্তে যুক্ত করে দিলেন। গিরিশচন্দ্রের বীণায় দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্রের মূর্ছনা বেজেছে, কিন্তু সর্বত্র সে স্বরলহরী বিলীন হয়েছে মধুময় বৃন্দাবনের কুঞ্জ-কুটীরে গিয়ে। কুরুক্ষেত্রে কর্মের প্রচণ্ডতার দীপ্তিতে জাতি মুগ্ধ হতে বসেছিল। জাতি এসত্য ভুলতে বসেছিল যে, সে কর্মের শক্তি রয়েছে বৃন্দাবনে। কুরুক্ষেত্র বিলাস, বৃন্দাবন তত্ত্ব স্বরূপতত্ত্ব। বৃন্দানের রস না ধরতে পারলে কুরুক্ষেত্রের যত কথা সবই ফাঁকা থেকে যায়, বস্তুনিষ্ঠা তাতে জাগে না; এ বিভ্রম থেকে জাতিকে রক্ষা করলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি কুরুক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে দেখালেন বৃন্দাবনের মাধুর্য। প্রেমের রসে কর্মশক্তিতে বলিষ্ঠ করবার উৎস তিনি ধরিয়ে দিলেন, ভাষাকে নিয়ে গেলেন ভাবের রাজ্যে, যেখানে হানি নাই, গ্লানি নাই—এ সত্যে তাকে সুদৃঢ় করলেন, বহিরাপেক্ষার সংশয় এবং অবীর্য থেকে জাতিকে নিয়ে গেলেন অনপেক্ষ অমৃত-তত্ত্বের অভিমুখে। গিরিশচন্দ্রের সে সৃষ্টি অপূর্ব এবং বৃন্দাবনের মধুর রসের সিঞ্চন পেয়ে সেই যে তাঁর সৃষ্টি, এর ভিতর দিয়ে, অন্য কথায় এই বৈষ্ণবতাকে আশ্রয় করেই তাঁর কবিপ্রতিভা সত্যতা এবং নিত্যতা লাভ করেছে। বৃন্দাবনতত্ত্বের অখণ্ড মাধুর্যই গিরিশ-চন্দ্রের লেখার মূল ধ্বনি এবং এই ধ্বনিই তাঁর কাব্যের প্রাণ। এ প্রাণ রস যে দেয় জাতি তাকে ভুলে না, ছাড়ে না। এই বৈষ্ণবতার জোরেই গিরিশচন্দ্র আমাদের নিন্দা স্তুতির ঊর্ধে থেকে অমরত্ব উপভোগ করবেন। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টির এ বৈশিষ্ট্য এখন ভেঙ্গে বলবার সময় নেই। সংক্ষেপে দুই একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। দেখুন, গিরিশচন্দ্রের কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের কথা বলছেন—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের সে চিত্র নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকেরই স্মৃতিপথে এখনো জাগ্রত রয়েছে। কৃষ্ণ এসে সখী কৃষ্ণার কাছে বসেছেন। সখীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন,—

'কারাগার জন্মস্থান মম
ঘোরতর বারি বরিষণ,
অশনি-নিঃস্বন।
ঘোর বাতে শনশনি প্রলয় দুর্যোগ
কংসচর অসংশয়ে নিদ্রাগত যবে
দীনের নন্দন
দীন-ক্ষীণ কোলে আইনু যমুনা পার
দীন বৃন্দাবনে।
দেখিলাম দীন-হীনগণে
দীন নন্দ দীন মা যশোদা।
দীনা বাল্যসখা দীনা সহচরীগণে
দীন গোপাল বালক
বুঝিয়াছি দীনের বেদনা।
শুনো সতী! জ্বালাব অনল
দুরন্ত ক্ষত্রিয় দল
জ্বালাইব সে আগুনে।
ধর্মরাজ্য করিব স্থাপনা।
তুমি সখী পার্থ সখা সে কার্য সাধিতে।'

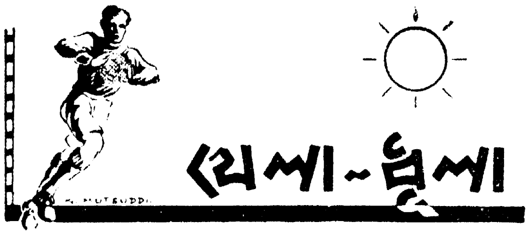
কুরুক্ষেত্রের এর পর মরণের যে ঊর্মিমালা উঠেছিল, তার বীর্যময় আবর্ত বলা যেতে পারে ভীমকর্মা বৃকোদরাকে। বাহুশক্তি বা বহিঃশক্তির বাহ্য সৃষ্টিতে সব চেয়ে বড় বিকাশ এই ভীমের মধ্যে। ভীমসেনের সে শক্তি উৎস ছিল কোথা? শুনুন সে কথা কবিরই মুখে—'পাণ্ডব গৌরবের' ভীমসেনের কানে বৃন্দাবনেরই বাঁশী বাজছে,—

'এ কি, কোথায় এ মুরলীর ধ্বনি?
দূর হতে আসে যেন ভেসে
যেন মৃদু স্বরে করিতেছে আশ্বাস প্রদান,
সত্য, কি কল্পনা!
উচ্চতর বাঁশরীর ধ্বনি
কালাচাঁদ এলো কি এ পুরে?
বংশীধ্বনি হয় হৃদি মাঝে
বাজান মুরলীধর, হৃদয়ে আমার।'

কবি ভীমসেনের চরিত্র অনুধ্যানে নিজের অন্তরের সুরই কি শুনতে পাচ্ছেন? অকম্পিত বিশ্বাস। আর সে বিশ্বাসের ফলে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্যে অনপেক্ষভাবে প্রবল সরল এবং স্বচ্ছন্দ সামর্থ্যে অকৈতব আত্মনিবেদন। গিরিশের লেখনীতে আগাগোড়া এই বাঁশীর সুর বাজছে। আর সে ধ্বনিতে মধুর রস উথলে উঠছে। তাঁর চৈতন্য লীলা এ বাঁশীর সুরে ভরপুর হয়ে হরি হরি বোলে উপচে পড়ছে। কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে সে সুর একেবারে চিত্তে লগ্ন হয়ে যায়। ভাগবতের মতে উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে প্রণয় বাষ্পে চক্ষু নিরুদ্ধ করে শুদ্ধ মাধুরীর ভঙ্গী দেখায়। ঐশ্বর্য সরিয়ে আনে আলিঙ্গন। আলিঙ্গনেও আশা মিটে না আনে চরণ। জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের সে লীলা একবার ভাবুন তো—"কিশোরীর প্রেম নিবি আয়" "প্রাণভরে আয় হরি বলে।" এ সুর যে বাঙলার অন্তরে একেবারে বসে গেছে। আচার-বিচারের নীতি আর যুক্তিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে! প্রতিষ্ঠিত করছে উদার মানব মহিমাকে। এ কি সোজা দান—এ তো ভূরিদান এবং বৈষ্ণব না হলে এমন দান আর কে করতে পারে?

তারপর 'বিল্বমঙ্গলের' কথা। সে কথা বোধ হয় বিশেষ করে আর বলতে হবে না। অল্পপরিসরের মধ্যে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার তত্ত্বকে কবি কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, ভাবলে বিস্ময়ে ডুবে যেতে হয়। প্রত্যক্ষতার কি পরম বল রয়েছে—রূপ কি উজ্জ্বল, উচ্ছল এবং ঢলঢল। করুণার ধারা কি অজস্রভাবে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আপনারা বলবেন, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র কথা, বলবেন 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র কথা। কিন্তু মাধুর্যের বল, প্রত্যক্ষতার বল, সে জিনিস ধার করে সৃষ্টি করা যায় না। তা পরোক্ষ নয়। সোজাসুজি তাকে পেতে হয়। গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব কাব্যগুলি পড়েছিলেন কিনা, এ বিষয় সন্দেহ আছে। আসল কথা হ'ল মূল উৎস থেকে তিনি এ রস পেয়েছিলেন, রূপসাগরে ডুবে তিনি নিজে এ মধু আস্বাদন করেছিলেন, নইলে এতখানি ভাব ভাষার মধ্যে ধরা পড়ে না। নিজে স্পর্শ না পেলে অন্যের হৃদয়ে রসের স্পর্শ দেওয়া যায় না। আর বৃন্দাবন রসের এ স্পর্শ আবার যেমন তেমন স্পর্শ নয়—একেবারে অভিস্পর্শ, সকল কামনা বাসনার শাখাপ্রশাখাকে

(শেষাংশ ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)



বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা

ভারতের খ্যাতনামা বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। এই পর্যন্ত যতগুলি খেলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাহিরের কোন দলকেই খেলিতে দেখা যায় নাই। ঐ সকল দল সম্পর্কে এখনও কিছু বলা যায় না। স্থানীয় দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ান রেঞ্জার্স ক্লাব প্রতিযোগিতার সূচনায় বিশেষ ভাল খেলিতে পারিতেছে না। এই দলটি শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় খেলিতে পারিবে কি না, সেই বিষয়ে সন্দেহ জাগিতেছে। খেলোয়াড়গণের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। ভবানীপুর দল দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, বেটন কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে নাই। প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই এই দলটিকে বি এন আর "বি" দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হইতে হইয়াছে। প্রীমিয়ার স্পোর্টিং প্রথম ডিভিসনের দল। অথচ এই দল শক্তিহীন হাওড়া ইন্সটিটিউটের নিকট পরাজয় বরণ করিয়াছে। কাস্টমস দল লীগের বিভিন্ন খেলায় সুবিধা করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু বেটন কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় "ভাল খেলে" এই যে খ্যাতি আছে, তাহার কিছু পরিচয় যে দিবে, তাহার প্রমাণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং লীগের খেলায় নৈরাশ্যের পরিচয় দিলেও বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় ভালই খেলিতেছে। তবে এই দল দ্বিতীয় রাউণ্ডে দিল্লী দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিজয়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিভিন্ন দিনের খেলা দেখিতে বিশেষ জনসমাগম হইতেছে না। বাহিরের দলসমূহের খেলা আরম্ভ হইলে এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

টেনিস খেলোয়াড় সিয়ার্স পরলোকে

আমেরিকার প্রাচীনতম বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় রিচার্ড সিয়ার্স সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। সিয়ার্সের মৃত্যুর সময় ৮১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৮৮১ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম আমেরিকান ন্যাশনাল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রবর্তিত হইলে রিচার্ড সিয়ার্স ঐ বৎসর বিজয়ীর সম্মানলাভ করেন। ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত তাঁহাকে কোন খেলোয়াড়ই ঐ স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। ১৮৮৯ সালে হেনরী শ্লগাম সিয়ার্সকে পরাজিত করিয়া ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান হন। ডাবলস বিষয়েও ১৮৮২ সাল হইতে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আমেরিকা হইতে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ফাইনাল পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হন। তাঁহার ক্রীড়ানৈপুণ্য ও সাফল্য আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড়গণকে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে, তাহার ফলেই কয়েক বৎসর পরে আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড়গণ পৃথিবীর ক্রীড়াক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম হন।

মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী

পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই বর্তমানে আমেরিকার সৈনিক হিসাবে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। মুষ্টি-যুদ্ধ অনুশীলন অথবা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার মত তাঁহার অবসর নাই। তিনি সৈন্য-বিভাগে যোগদান করিবার পূর্বে যতবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন, ততবারই বিজয়ী হইয়াছেন। কোন মুষ্টিযোদ্ধাই জো লুইর বিরুদ্ধে খাড়া হইয়া অধিকক্ষণ লড়িতে পারেন নাই। সৈনিক হিসাবেও জো লুইকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং তিনি তাহাতেও নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার অবর্তমানে যুদ্ধ যতদিন চলিবে, ততদিন একজন তরুণ নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাকে চ্যাম্পিয়ান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে এই মুষ্টিযোদ্ধাকেও যুদ্ধের পরে জো লুইর সহিত লড়িতে হইবে। সম্প্রতি নিউ জার্সীর আর এক সংবাদে প্রকাশ, টনি গ্যালেণ্টো জো লুইর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে গ্যালেণ্টো জো লুইর বিরুদ্ধে লড়িয়া চতুর্থ রাউণ্ডে পরাজিত হন। তিনি সেই সময় তৃতীয় রাউণ্ডে একবার জো লুইকে ভূতলশায়ী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময় পরাজিত হইয়া গ্যালেণ্টো পুনরায় লড়িবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই ইচ্ছা পূরণের আশায় তিনি ১৯৪১ সালে বাড্ডী বেয়ারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু বেয়ার গ্যালেণ্টোকে পরাজিত করেন। ফলে গ্যালেণ্টো আর লড়িবেন না বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু পুনরায় তিনি জো লুইর সহিত লড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। গ্যালেণ্টোর ওজন ১৮ স্টোন। জো লুইর ওজন ইহা অপেক্ষা অনেক কম। যুদ্ধকার্যে লিপ্ত থাকিয়া জো লুই শক্তিহীন হইয়া পড়িবেন এবং সেই সুযোগে গ্যালেণ্টো তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, ইহাই হয়তো তাঁহার ধারণা। কিন্তু সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি যে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন ইহা মনে হয় না।

৭ই এপ্রিল

ভারতীয় সমরবিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য অপরাহ্নে জঙ্গী বিমানসমূহের পাহারায় এক ঝাঁক শত্রুপক্ষীয় বোমারু বিমান দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় একটি বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে। সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং কিছু লোক হতাহত হইয়াছে।

ভারতীয় সমরবিভাগের যুক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, আরাকান রণক্ষেত্রে বুথিডংয়ের পূর্বদিকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের তেমন পরিবর্তন হয় নাই। ডনবাইক হইতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সরাইয়া লইয়া মায়ু উপদ্বীপে ইন্দিনের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে কিয়াক-পান্ডুস্থিত ঘাঁটিতে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইজিয়ুমের দক্ষিণে প্রতিপক্ষ সোভিয়েট ঘাঁটিগুলি আক্রমণের জন্য কয়েক দফায় চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুশ সৈন্যেরা পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ জার্মান ঘাঁটি দখল করিয়াছে। চুগিয়েভ এলাকায় শত্রুপক্ষ রুশ সৈন্যদিগকে কিছুটা পিছনে হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়।

কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, তিউনিসিয়া রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী নূতন জয়গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। এতাবৎ ছয় সহস্রাধিক সৈন্য বন্দী হইয়াছে। রোমেল বাহিনী উত্তর-দিকে পলায়ন করিতেছে এবং উঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে। সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে, এই সাফল্যমণ্ডিত আক্রমণের ফলে বৃটিশ বাহিনী ও মার্কিন বাহিনীর মধ্যে সংযোগ সম্ভবপর হইবে। মার্কিন বাহিনী ক্রমাগত পশ্চিম দিক হইতে শত্রু-বাহিনীর উপর চাপ দিতেছে।

৮ই এপ্রিল

মিঃ ওয়েন্ডেল উইল্কী "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" নামক পুস্তকে তাঁহার সাম্প্রতিক পৃথিবী পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাদি বিবৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি প্রবলভাবে ভারতের স্বাধীনতার পোষকতা করিয়াছেন।

জার্মান বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইজিয়ুমের দক্ষিণে রাশিয়ানরা ট্যাঙ্ক বহরের সহযোগিতায় শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী লইয়া পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে। খারকভ এবং বিয়েলগোরডের পূর্বে জার্মান ও রাশিয়ানরা প্রভূত শক্তি সমাবেশ করিতেছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য ৯৮ খানি জাপানী বিমান গুয়াদালকানারে মার্কিন জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। জাপানীদের ৩৭ খানি বিমান ধ্বংস করা হয় এবং ৭ খানি বিমান বিনষ্ট হয়।

৯ই এপ্রিল

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পত্নী বেগম আজাদ যক্ষ্মারোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর হইয়াছিল।

ভারতীয় সমরবিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য প্রাতে জাপ বোমারু বিমানবহরের একটি দল চট্টগ্রামের দক্ষিণে একটি বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। কেহই হতাহত হয় নাই।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত দ্বীপমালায় জাপানীরা অন্তত ০টি বিমান ঘাঁটি করিয়াছে এবং সেগুলিতে এখন তাহারা বহু বিমান আনিতেছে। অস্ট্রেলিয়ার নৌ ও অস্ত্রসচিব মিঃ মেকিন এই সংবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এখন জাপানের স্ট্র্যাটিজি হইতেছে দ্বীপমালার মধ্য দিয়া প্রবেশ করা এবং ভূমি-ঘাঁটির বিমানের সমর্থনে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশে পদার্পণ করা'।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা মস্কো হইতে জানান যে, খারকভের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বালাক্লেয়ার দক্ষিণে জার্মানগণ ডোনেৎস নদীর উজান অঞ্চলের সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করে; কিন্তু জেনারেল গোলিকভের বাহিনী উহা ব্যর্থ করিয়াছে।

১০ই এপ্রিল

ভারতীয় সমরবিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য অনুমান দ্বিপ্রহরের সময় শত্রুপক্ষের জঙ্গী বিমানের একটি দল দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে দেখা দেয়। বৃটিশ বিমানবহর উহাদিগকে বিতাড়িত করে।

আলজিয়ার্স রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্তৃক স্ফাক্স অধিকৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-তিউনিসিয়ায় স্ফাক্সই রোমেলের প্রধান ঘাঁটি ছিল। বার্লিন বেতারে বলা হইয়াছে যে, রোমেলের সৈন্য উত্তর দিকে সরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কুবান হইতে প্রাপ্ত জার্মান সংবাদে প্রকাশ, নভোরোসিস্ক অবরুদ্ধ হইয়াছে।

১১ই এপ্রিল

উত্তর-আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টারের এক সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ফন্ডুক গিরিবর্ত্ম দখল করিয়াছে। আলজিয়ার্স হইতে বেতারযোগে বক্তৃতা করিয়া জনৈক মন্তব্যকারী বলেন যে, মধ্য তিউনিসিয়ার যুদ্ধ কার্যত শেষ হইয়াছে। জেনারেল রোমেল পূর্ণবেগে পলায়ন করিতেছেন এবং তিনি তাঁহার সমগ্র বাহিনী সুসের উত্তরে পর্বতমালার পিছনে লইয়া যাইতেছেন।

১২ই এপ্রিল

অদ্য চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার স্যার কিংসলী উড পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করেন। বাজেটের মোট পরিমাণ প্রায় ছয়শত কোটি স্টার্লিং। ১৯৪০ সালে বৃটিশ যুদ্ধের জন্য প্রত্যহ ৫০ কোটি স্টার্লিং ব্যয় করিয়াছে; গত বৎসরের বাজেটে ইহা দৈনিক এক কোটি পঁচিশ লক্ষ স্টার্লিংয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ স্টার্লিং দৈনিক ব্যয় হইতেছে।

জার্মান নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছে যে, গত ৭ই হইতে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা এবং উভয়ের যুদ্ধ-চালনাসংক্রান্ত প্রশ্নগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সকল প্রশ্নেই উভয়ের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উত্তর-আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, তিউনিসিয়ায় মিত্রপক্ষ কর্তৃক সুসে এবং কাইরুয়ান অধিকৃত হইয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বালাক্লেয়ার দক্ষিণে এক্সিস সৈন্যদল কয়েকবার আক্রমণ চালায়; সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত হয়। ইস্তাম্বুলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, লেনিনগ্রাদ রণক্ষেত্রে জার্মানদের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে জার্মানদের এক ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে।

সাহিত্য সংবাদ

২৫৲ টাকা ও বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা

কাঙগাল সাহিত্য ও সংগীত .সমাজের পক্ষ হইতে ১টি প্রবন্ধ ও ১টি কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিষয়ঃ—**বঙ্গ সাহিত্যে কাঙগাল হরিনাথের স্থান।** উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে ২৫৲ পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং সাধারণ প্রবন্ধের সর্বপ্রথম স্থান অধিকারীকে ১টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। "কাঙ্গাল হরিনাথ" শীর্ষক ১টি উৎকৃষ্ট কবিতাও এই সঙ্গে আহ্বান করা যাইতেছে। কবিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকেও ১টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। সর্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়। বিস্তারিত বিবরণাদি জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মজুমদার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ পত্র লিখুন ।১৩৫০ সালের ১৫ই বৈশাখ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রবন্ধাদি প্রেরণের শেষ দিন। ইতি

প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

বড়দল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি পাঠাগারের উদ্যোগে প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। সন ১৯৪৩ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঠাগারের অফিস গৃহে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ আবৃত্তির বিষয় ২০শে এপ্রিলের মধ্যে অবগত করাইবেন।

২। প্রবন্ধ—(ক) বেকার-সমস্যা সমাধানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবদান। (খ) একটি ছোট গল্প (যে কোন বিষয় অবলম্বনে)। (গ) বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান।

৩। যে কোন একটি বিষয়ে লিখিতে হইবে। ফুলস্কেপ কাগজে (উভয় পৃষ্ঠা) পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে এবং ৪ পৃষ্ঠার অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

৪। ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে কোন স্ত্রী-পুরুষ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

৫। প্রবন্ধাদি ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ২টি ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ৩টি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিনীত—**শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়,** পোঃ—বড়দল, জেলা—খুলনা।

বাঙলায় মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল আন্দোলন

হিন্দু সমাজের সংস্কার ও সংগঠনমূলক কার্যের জন্য "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের" মিলন মন্দির ও রক্ষীদল আন্দোলনঃ বিগত কতিপয় বৎসরের মধ্যে বাঙলার ২৭টি জেলার পল্লী অঞ্চলে এই আন্দোলনের প্রায় সহস্রাধিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র বাঙলার নিভৃততম পল্লী অঞ্চল হইতে যেরূপ অসংখ্য আহ্বান আসিতেছে এবং সঙ্ঘের কার্য যেরূপ দ্রুত প্রসারিত হইতেছে, তাহাতে শত শত কর্মীর প্রয়োজন। হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত, ত্যাগনিষ্ঠ, চরিত্রবান, কর্মঠ, বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত বা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক; লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতিতে সুদক্ষ বা উহা শিক্ষা করিতে চাহেন, পূর্বে জাতিগঠনমূলক কোন প্রতিষ্ঠানে কার্য করিয়াছিলেন অথবা বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের সেবা করিতে আগ্রহশীল এইরূপ উৎসাহী যুবকগণকে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি। এই সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জানিতে চাহিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাৎ বা পত্র ব্যবহার করিতে হইবে ঃ—

স্বামী বেদানন্দ

সাধারণ সম্পাদক,

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ,

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

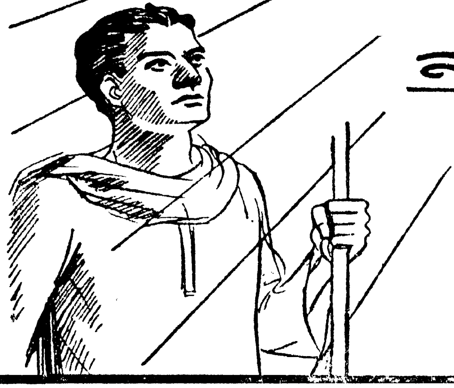
বৈষ্ণব সাধনায় গিরিশচন্দ্র

(২৯০ পৃষ্ঠার পর)

তলিয়ে একেবারে মূলে গিয়ে এ স্পর্শ—শুধু বৃন্দাবনের বাতাসে. সেখানকার লীলাপরিমলোদ্গারী সঞ্চারী সমীরে আছে। গিরিশচন্দ্রের অন্তরের আকাশে সে বাতাসের হিল্লোল উঠেছিল, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মানলে এ সত্যকে স্বীকার করতেই হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন কিছু নেই, তর্ক কিছু নেই, হতে পারে এ রকম— 'কোচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবানুকম্পয়া।' অনুকম্পায় এমন হয়— মন মুখ এক করে, নিজের জানাজানি, বোঝাবুঝি, ছেড়ে দিয়ে শরণ নিতে পারলেই এটি হয়। দয়াময় তিনি, কৃপাময় তিনি, তিনি তো হাত বাড়িয়েই আছেন। বুদ্ধির ঘাঁটি, যুক্তির ঘাঁটি বিচারের ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে, শুধু তাঁর কৃপার দিকে নিজের অন্তরকে খুলে ধরলেই সে চন্দ্রকিরণ অঙ্গে এসে পড়ে, আর প্রেম-তরঙ্গে সব কৃত্য নিঃশেষে ভেসে যায়। কিন্তু অনাদি কাল গ্রথিত অবিদ্যাময় কর্মগ্রন্থি রাজসিকতার আলোড়ন তুলছে, অহঙ্কার যে আমার মধ্যে চিটমিট করে উঠছে, আর কর্তব্য বুদ্ধির বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। তা ফেলে একেবারে কৃপার উপর নির্বিচারে নির্ভর করবার উপায় কোথায়? জগতের কর্মচক্রের ঘানি এইভাবেই ঘুরছে, কেউ কদাচিৎ রেহাই পেয়ে যায়—"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভাগ্যবানে", "ব্রহ্মান্ড ভ্রমিয়া কোন ভাগ্যবান জীব, গুরুকৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ।"

গিরিশচন্দ্র এমন ভাগ্য নিয়ে এসেছিলেন। আমার মত লোকের কাছে এমন বিশেষ ভাগ্যবানদের বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত লাগবেই। তাই গিরিশচন্দ্রের সব অদ্ভুত, তাঁর জীবন অদ্ভুত, কর্ম অদ্ভুত, তাঁকে চেনা দুষ্কর। ভক্তের এমন জীবন দুর্লভ, দুর্লভ বলেই তা অগম্য; কিন্তু অগম্য হলেও অমোঘ। বৃহত্তের মধ্যে, ব্যাপ্তির মধ্যে তাদের কাজ ধরা পড়বেই। গিরিশচন্দ্রের অবদান বাঙলার জনচিত্তে ব্যাপ্ত হয়ে অমোঘ হয়েছে। আমাদের সকল আশা আজ মোঘ, সকল কর্ম আজ মোঘ, দুঃখ দৈন্যের তাপে আমরা দগ্ধ হচ্ছি; আসুন গিরিশ-চন্দ্রের সে অমোঘ অবদানকে একবার অন্তরপূর্ণ করে আস্বাদ করি। সে মাধুর্যের উৎসে নিজেদের চিত্ত সিক্ত করে নিই। অভিমান ছেড়ে করতে শিখি আত্মনিবেদন। যতই অভাজন হই না কেন, প্রেমের দেবতা জাগবেন, তাঁর মধুর হাসিতে আমাদের সকল ভয় ভেঙ্গে যাবে। সকল ঘটে মধুর হরিনাম রটবে, আর বৈষ্ণব অপরাধে থেকে আমরা মুক্ত হয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অযাচিত দান বসে খেয়ে নেচে গেয়ে যেতে পারবো। *

* সিঁথি বৈষ্ণব সম্মেলনীর উদ্যোগে আহূত গিরিশ শত-বার্ষিকী সভায় 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা।



নব ভারতের

পথ প্রদর্শক শিক্ষিত লোক

জাতি গঠনের শক্তি যোগায় জ্ঞান যত রাজনীতি তত নয়। গ্রাম থেকে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী উচ্ছেদ করবার দায়িত্ব শিক্ষিত লোকদের নিজেদের নিতে হবে। আর আজকের দিনে এটা একটা জরুরী দায়িত্ব।

জমির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এ-রকম আত্মীয়-বন্ধু থাকলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন—**দেশের খাদ্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের অবহিত করুন।** যাতে এ-বছর পল্লী-অঞ্চলে খাদ্যের প্রাচুর্য্য বজায় থাকে সেজন্য এই পঞ্চবিধ কার্য্য তালিকা প্রচার করুন ঃ—

১ রপ্তানীর বাজার এখন বন্ধ হয়ে গেছে—এ রকম নগদী ফসলের চাষ বন্ধ করে তার পরিবর্ত্তে খাদ্যশস্য ফলান;

২ পুরনো সেচ-ব্যবস্থার সংস্কার করুন, নতুন সেচ-ব্যবস্থা স্থাপন করুন;

৩ উৎকৃষ্ট বীজ ছাড়া অন্য বীজ ব্যবহার করবেন না;

৪ এক হাত পতিত জমিও ফেলে রাখবেন না, সবটায় চাষ দিন;

৫ জমির উপর অযথা বোঝা চাপাবেন না, বাড়তি গবাদি পশু রাখবেন না।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারতের জমি থেকে এমন ফসল আমাদের ফলাতে হবে যে যুদ্ধকালীন খাদ্যের প্রয়োজন তো মিটবেই, অধিকন্তু **খাদ্যের এমন স্থায়ী প্রাচুর্য্য ঘটবে** যে দেশের সব লোক সব সময়েই যথেষ্ট খেতে পাবে।

চাষীকে সাহায্য করুন যাতে সে আপনার জন্য আরও খাদ্য জন্মাতে পারে।

লাভের ব্যাপার

যুদ্ধের ফলে পৃথিবী এখন অনাহার ও ধ্বংসে পূর্ণ। খাদ্যশস্যের চাহিদার তাই আজ কোন সীমা নেই। এই সময়ে কূয়া, পুকুর, বাঁধ সেচ-কার্য্যের সহায়ক যে-কোন জিনিসে টাকা খাটালে তা ভাল লাভ দিতে বাধ্য। চাষীরা যাতে উপযুক্ত মূল্য পায় সে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নীতি গভর্ণমেণ্ট মেনে নিয়েছেন।

লোকসানের ব্যাপার

গ্রামে বা অন্য কোথাও গোপনে শস্য সঞ্চয় করে রাখা এখন লোকসানের ব্যাপার। কারণ ফটকাবাজ এবং গোপনে সঞ্চয়কারীদের গভর্ণমেণ্ট কঠোর সাজা দেবার মনস্থ করেছেন। এদিকে অযথা সঞ্চয়ের ফলে দাম এতই বেড়ে গেছে যা খরিদ্দারের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। ন্যায্য এবং আশু লাভ — এই হচ্ছে এখনকার বুদ্ধিমান চাষী ও ব্যবসায়ীদের নীতি।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী • সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ । শনিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 24th April, 1943. । ২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত সম্বন্ধে মাদাম চিয়াং কাইসেক

ব্রিটিশের ভারতীয় নীতির সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মনের মত কথা না বলিতে সকলেরই মুখে বাধে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সে ক্ষেত্রে মৌন থাকাই শ্রেয় মনে করেন; স্টালিন সে দিক দিয়াও কোনদিন যান না। এরূপ অবস্থায় সম্মিলিত পক্ষের অন্যতম শক্তি চীনের জাতীয় দলের গভর্নমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশিলষ্ট থাকিয়াও মাদাম চিয়াং কাইসেক সেদিন নিউইয়র্কে ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহাতে সত্যই স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ কবে এবং কতটা স্বাধীনতা পাইবে তাহাই পৃথিবীর বর্তমান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মুক্তিদান করা কর্তব্য। পণ্ডিতজী আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ভারতের যুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকে মিত্ররাষ্ট্রের অনুকূলে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধীর কথা উল্লেখ করিয়া মাদাম বলেন, মিঃ গান্ধীর চিন্তা কিছুটা অস্পষ্ট এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টি তাঁহার নাই। ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নই তাঁহার কাছে বড়। মাদাম চিয়াং কাইসেকের সম্পূর্ণ বক্তৃতা আমরা পাই নাই। বক্তৃতাটি যেভাবে এ দেশে আসিয়াছে, তাহা কতকটা গোলমেলে। মাদাম নেহরুর মুক্তির উপরই জোর দিয়াছেন; কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কিংবা অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন নাই। মহাত্মাজী যথেষ্ট আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-সম্পন্ন নহেন—এই কথা তিনি বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই ইহা বুঝেন যে, আন্তর্জাতিকতার ভাষাগত কোন মূল্য নাই। ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ না করে, তবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিও সমরোদ্যমে সম্মিলিত পক্ষের সাহায্যের ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসিবে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই পণ্ডিতজী মহাত্মাজীর নীতি সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রশ্নই এক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন। সে যুক্তির উপযোগিতা স্বীকার করিলে কংগ্রেস নেতাদের সকলকেই মুক্তিদান করা কর্তব্য। মাদাম চিয়াং কাইসেকের বক্তৃতার শেষের দিকটাই বেশী গোলমেলে; তাঁহার পূর্ববর্তী উক্তির সঙ্গে শেষাংশের সামঞ্জস্য রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। বোধ হয়, তাঁহার বক্তৃতার এই শেষাংশের দিকে ভারতবাসীদের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্যই প্রথমাংশে ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন এবং পণ্ডিত নেহরুকে মুক্তিদানের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও উহা এদেশে আসিতে সমর্থ হইয়াছে; প্রথম ভাগের দোষটা, পরের অংশের গুণে কাটিয়া গিয়াছে। মাদাম তাঁহার বক্তৃতায় এই শেষ-অংশে বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, বর্তমানে পরাধীন অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার ন্যায়, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত রাখা কর্তব্য। যুদ্ধ শেষ হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, রুশিয়া এবং চীন একটি বিশ্বরাষ্ট্র পরিষদ গঠন করিবে। এই পরিষদ পরাধীন দেশগুলির সকল কার্যে নিঃস্বার্থ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে এবং পরিশেষে সেই সব দেশ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে। মাদামের বক্তৃতার এই অংশ ভারতবাসীদিগকে সম্পূর্ণই

নিরুৎসাহিত করিবে ; কারণ তিনি যাহাকে নিঃস্বার্থ বলিয়াছেন, সে যে কি বস্তু, আমাদের তাহা বুঝিতে বাকী নাই। এমন নিঃস্বার্থ কর্তৃত্বের লাঞ্ছনা এবং অবমাননা হইতে ভগবান পরাধীন দেশসমূহকে রক্ষা করুন।

মহাত্মাজী ও গভর্নমেণ্ট

'হিন্দু' পত্রের নয়াদিল্লীস্থ সংবাদদাতা একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক গোলযোগের দায়িত্ব সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত কর্তৃপক্ষের পত্রালাপ চলিতেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যে-সব অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন, গান্ধীজী সেগুলির অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ চাহেন। এই পত্রালাপের পরিণতি সম্পর্কে গান্ধীজী নাকি আমরণ অনশনের কথাও চিন্তা করিতেছেন। 'হিন্দু'র সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রচারিত সংবাদ হইতেই তিনি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাটা কত দূর সত্য আমরা জানি না; শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, কিছুদিন পূর্বে স্যার জাফরুল্লা খান আমেরিকার সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদিগকে 'ব্রিটিশ বিরোধী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এই পত্রালাপ 'ব্রিটিশ-বিরোধী' বলিয়া বিবেচিত হইবে কি না আমরা জানি না; যদি তাহাই হয়, তবে ব্রিটিশ-সংবাদপত্রসমূহের মধ্যেও কোন কোনটি সেই দোষে দোষী বলিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট যেসব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলি সবই একতরফা। ব্রিটিশ নিরপেক্ষ সমালোচকগণও কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তিই কামনা করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, যদি সেগুলির নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ কংগ্রেসকে দেওয়া হইত, তবে ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধানের পথই প্রশস্ত হইত। সাধারণ ন্যায় এবং নীতির দিক হইতে বিচার করিতে গেলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্টের স্থান

কলিকাতা আর্ট ও কালচার সোসাইটির উদ্বোধন উৎসবে সেদিন শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী আর্টের গুণগ্রাহিতাকে সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একটি কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, বাঙলা ভাষা কালচারের প্রধান বাহন।' চৌধুরী মহাশয়ের গোটা বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় বাঙলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের কথাটা ভাঙিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সৌন্দর্যবোধই সংস্কৃতির মূল কথা। তিনি বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফলে মানুষের প্রকৃতিগত যে লাবণ্যের উন্মেষ ঘটে তাহাকেই বলে কালচার বা সংস্কৃতি। ছিন্নমস্তা যেমন নিজের হাতে নিজের রুধির পান করিতেছে সেইরূপ মানুষে আজ নিজের হাতে তাহার সভ্যতা ধ্বংস করিতেছে। মানুষ আসুরিক প্রকৃতির দাস হইতে বসিয়াছে ; কিন্তু চিরদিন সে কামনা করিয়াছে সৌন্দর্য, সভ্যতা ও জ্ঞান। এগুলিই তাহার দৈবী প্রকৃতি। সহজ কথায় ইহাই বলা যায় যে, সংস্কৃতির মূল হইল রস এবং সেই রসোপলব্ধির ফলে মানুষের অন্তরবৃত্তিনিচয় স্বচ্ছন্দভাবে ফুটিয়া উঠে। সে প্রেম বা ভালবাসার অধিকারী হয়। সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারে এবং প্রশস্ততর আত্মীয়তার ক্ষেত্রের মধ্যে নিজেকে পাইয়া নিরুদ্বিগ্ন হয়। বাঙলার সংস্কৃতির মূলে পরকে আপনার করিবার এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। বাঙালী জাতি সুন্দরেরই জয়গান করিয়াছে। বৈষ্ণব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য এই সংস্কৃতির ধারাই বহন করিয়া চলিয়াছে।

সাম্রাজ্যের মহিমা

দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরের সাহেব-পাড়া হইতে ভারতীয়দের বিতাড়নের জন্য আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীরা টাকা পয়সার জোরে সাহেব পাড়ায় বাড়ি করিবে, সাহেবদের সঙ্গে শেষটা টেক্কা দিয়া চলিবে, ইহা কি বরদাস্ত করা যায় ; কারণ হাজার হইলেও ভারতবাসীরা কুলি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটস্ ডারবান অঞ্চল কুলীদের প্রভাবমুক্ত করিবার পুণ্যব্রতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারতীয় নেতারা যথারীতি আবেদন নিবেদন পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হইয়াছে। এই আইন সমর্থন করিতে গিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যতম মন্ত্রী স্টালার্ড সেদিন বলেন, ভারতবর্ষের অন্যতম শহর বারাণসী ধামে যদি শ্বেতাঙ্গেরা এইভাবে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে বারাণসীর লোকেরা নিশ্চয়ই বাধা দিত। যুক্তির মত যুক্তি বটে ; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ডারবানের স্থানীয় লোকেরা ভারতবাসীদের সেখানে বাড়িঘর করিতে বাধা দিতেছে কি? ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই শ্বেতাঙ্গদের জমি চড়াও হইয়া সেখানে বাড়িঘর করে নাই। শ্বেতাঙ্গদের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়াই এবং তাহাদের ইচ্ছা ক্রমেই তাহারা সাহেব-পাড়ায় বসতি করিতে গিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, ভারতবাসীরা যে সকল অংশে শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে হীন এই ধারণা তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া রাখিতে হইবে এবং পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ অভিভাবকত্বের মহিমাকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। কিন্তু এমন সর্দারী চালাইবার দিন কাটিয়া গিয়াছে ; সাম্রাজ্য নীতির ধারক বাহক এবং পরিপোষকদের ইহা এখনও উপলব্ধি করা কর্তব্য। সাম্রাজ্যের সকল জায়গা হইতে ভারতবাসীদিগকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়ান হইবে, আর ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যের প্রেমে মসগুল থাকিবে, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য

বাঙলাদেশের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এপ্রিল মাসে কলিকাতার বাজারে কম পক্ষে ৬০ হাজার মণ আটা ছাড়া হইবে। এই সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে আটার মূল্য হ্রাস পাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং জনসাধারণ যেন প্রতি সের আটা ছয় আনার অধিক মূল্যে ক্রয় না করেন। আটার মূল্য হ্রাস পাইবার এই আশ্বাস পাইয়াই বোধহয় কলিকাতা কর্পোরেশনের 'খাদ্য সরবরাহ বিশেষ কমিটি' চাউলের নিয়ন্ত্রিত দরের চেয়ে আটার দর যাহাতে কম হয়, গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। কলিকাতা শহরে প্রভূত পরিমাণে আটা আমদানী হইতেছে, ইহা আমরা জানি ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আটার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় নাই। সিভিল সাপ্লাই বিভাগ ছয় আনার বেশী দর না দিতে বলিয়াছেন ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে পূর্ববৎ সমস্যা দেখা দিয়াছে। দোকানদারেরা ঐ দরে মাল দিতে পারিবে না বলিতেছে। প্রকৃত পক্ষে ছয় আনা দরে কোথায়ও আটা পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মাল যাহাতে লাভখোরদের গুদামজাত না হয় এবং তাহারা চোরা বাজারে ঐ মাল বিক্রয় করিবার সুবিধা না পায় সরকারের সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আটার দাম যদি সত্যই চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অপেক্ষা নীচে নামে, তবে চাউলের মূল্যও হ্রাস পাইবে, ইহা একরূপ

নিশ্চিত ; কিন্তু সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও আটার মূল্যে তেমন নামিবার এখনও কোন পরিচয় আমরা পাইতেছি না। ইহা ছাড়া নিয়ন্ত্রিত দোকানগুলিতে অ-ব্যবস্থার অভিযোগ সমানভাবেই আমরা শুনিতে পাইতেছি।

মায়ামৃগের পশ্চাতে

বাঙলার গভর্নর সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া মৌলবী ফজলুল হককে পদত্যাগে সম্মত করাইলেও—কার্যত লীগ-মন্ত্রিত্ব গঠনের চেষ্টাই চলিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মৌলবী ফজলুল হককে অথবা সকল দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের না ডাকিয়া গভর্নর স্যার নাজিমুদ্দীনকেই মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে আমন্ত্রণ করেন—এ সংবাদ পাঠকবর্গ জানেন। পরিষদের কংগ্রেসী দল এবং হিন্দু জাতীয় দল স্যার নাজিমুদ্দীনের লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ না দিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। ইহাই ছিল বাঙলার পার্লামেণ্টারী পরিস্থিতি। কিন্তু সহসা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের মিঃ বরদা পাইন ও মিঃ তুলসী গোস্বামী প্রমুখ কয়জন সদস্য উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করায় পরিস্থিতির রূপ বদলাইবার কতক সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মিঃ গোস্বামী ও মিঃ পাইন স্বীয় দলের আভ্যন্তরীণ কোন মতভেদের জন্যই যদি এই পদত্যাগ করিতেন তাহা হইলে কোন কথা ছিল না, মতভেদের কারণ দূর হইলেই দলের সংহতি পুনঃস্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী মহাশয় যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা যে লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলে প্রবেশেরই সূচনা মাত্র তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই সম্পর্কে তাঁহাদের কারারুদ্ধ শরৎচন্দ্রের আদর্শের কথা টানিয়া আনার প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। গোস্বামী মহাশয় নিজেই জানেন যে, শরৎচন্দ্র মুসলিম লীগকেই মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না, মুসলিম লীগের পাকিস্থান এবং দুই জাতিত্বের মারাত্মক পরিকল্পনাকে বাঙলার হিন্দু মুসলমানের সর্বনাশেরই হেতু মনে করেন; অথচ গোস্বামী মহাশয়েরা লীগ নেতা স্যার নাজিমকে বাঙলার মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি মানিয়া লইয়া এবং সর্বনাশা দুই জাতিত্বের থিওরীর নিকট মস্তক অবনত করিয়াই স্যার নাজিমকে ক্ষমতার সিংহাসনে বসাইতে যাইতেছেন। দেশ ও জাতির অকল্যাণকর কার্য করিতে হইলে, তাঁহারা স্বীয় দায়িত্বে করুন, কিন্তু বাঙলা দেশের শ্রদ্ধার পাত্র শরৎচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিবেন না। মিঃ পাইন এবং মিঃ গোস্বামীর সহসা এই মত পরিবর্তনের কারণ লইয়া আমরা আর আলোচনা করিতে চাহি না। আমরা তাঁহাদের এখনও প্রতিনিবৃত্ত হইতেই অনুরোধ করি। স্যার নাজিমুদ্দীনের প্রোগ্রাম বড়ই উৎকৃষ্ট—এই অজুহাতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথা বলিয়া আত্মবঞ্চনা করা চলে—কিন্তু বাঙালীকে ভ্রান্ত করা চলিবে না। কারণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 'উদ্ধার' অথবা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি—শরৎচন্দ্রকে বাঙলায় ফিরাইয়া আনা যে স্থায়ী সিভিলিয়ানীচক্রেরই হাতে এ-কথা না জানিবার বা না বুঝিবার মত স্থূল বুদ্ধি মিঃ পাইনও নহেন, মিঃ গোস্বামীও নহেন। আমরা এখনো গোস্বামী মহাশয়দের প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় দলের সংহতি রক্ষা করিতে—বাঙলার কল্যাণ সাধন করিতে—বাঙলাকে সাম্প্রদায়িক অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া তাঁহারা যেন অশুভকে বরণ না করেন।

শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়

সুদীর্ঘকাল লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদকতা করিবার পর শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলাদেশের বাহিরে বাঙালীর সুখ্যাতিকে যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রায় মহাশয় অন্যতম। 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। ১৯১৫ সালে তিনি পাঞ্জাবে যান এবং তৎকালীন 'পাঞ্জাবী' পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি ট্রিবিউন পত্রে যোগদান করেন। এই পত্রের সম্পাদক স্বরূপে তাঁহার সুখ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পাঞ্জাবে জঙ্গী আইন যখন জারী হয়, তখন তিনি একটি প্রবন্ধের জন্য সামরিক আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতার সহিত যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিবার দক্ষতা তাঁহার লেখার বিশিষ্টতা। তিনি একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী। প্রবাস জীবন যাপন করিবার পর তিনি বাঙলাদেশে ফিরিতেছেন, আমরা বাঙলাদেশের এই স্বদেশ প্রেমিক সন্তানকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা

আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তিথি উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য 'দেশ' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত বহু পত্রাবলী 'এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ এবং বাঙলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রবন্ধ-রচনা এই সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

নূতন প্রচ্ছদপট ও নানা চিত্রে শোভিত এই সংখ্যাটি সংগ্রহের জন্য এখন হইতে সচেষ্ট হউন।

—ম্যানেজার 'দেশ'

জাপানের মতিগতি

জাপানীরা শুনিতেছি, এইবার তোড়জোড় বাঁধিয়া অস্ট্রেলিয়া আক্রমণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা রণতরী, বিমানবল এবং প্রথম শ্রেণীর সৈন্যদল অস্ট্রেলিয়ার আশে পাশের দ্বীপপুঞ্জলিতে সন্নিবিষ্ট করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইউরোপের সংগ্রামে জার্মানেরা অসুবিধায় পড়িলে তাহাদিগকে সেই সংকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাপান এশিয়ার দিকে চাপ দিবে, সামরিক বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেকেই এইরূপ আশংকা করিতেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জাপানের শক্তি এখনও বিশেষ রকমে দুর্বল হয় নাই। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নাই। এরূপ অবস্থায় শুধু ইউরোপের যুদ্ধের দিকে জোর দিলেই চলিবে না ; সমভাবে জাপানের বিরুদ্ধেও সমরশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ইউরোপীয় যুদ্ধের গতি দেখিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বোধ হয় শেষ হইয়া আসিল, জাপানের নূতন আক্রমণাত্মক উদ্যম তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করিবে। প্রকৃতপক্ষে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ শেষ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।



দর্শন

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেকার জীবন। চিৎপাত শুয়ে টানি তামাক
আরশুলো ওড়ে পাখা মেলে দিয়ে নিরুদ্বেগে,
বুড়ো বাসুকীটা এবার পৃথিবী নীচে নামাক,
আরো কতোকাল রইবে এম্‌নি রাত জেগে?

দেয়ালের মাটি ঝরছে আমার অনেক কালই
একটা বিড়িই কানে গুঁজে ফিরি সরাটা পাড়া,
চায়ের দোকানে 'হাফ কাপ' চায়ে আগুনে জ্বালি
'পলিটিক্‌স্‌'এর ঝুঁটি ধ'রে দিই প্রবল নাড়া!

শত্রু-বিমান আস্‌বেই নাকি দুদিন পরে,
প্রাচীর-পত্রে সারাটা শহর পড়লো ঢাকা,
বাড়ির সামনে দুই তিন হীন দিন ধ'রে
'ট্রেঞ্চ' জন্মালো।—বাঁচবার আশা হোল পাকা!

সাহিত্য লিখি; কেরাণীরা বলে, "কী এলোমেলো
রবিঠাকুরের মতনোই দুর্বোধ্য—আহা!"
আমি শুনি আর হেসে হেসে মরিঃ সুদিন এলো,
আজ এক হোল রবিঠাকুর আর বংকু সাহা!

বেকার জীবন। চিৎপাত—হাই—চোখ বুজে,
পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো জড়াজড়ি করে,
পাইস-হোটেলের ম্যানেজার বৃথা যায় খুঁজে,
—কলা দেখিয়েছি তাকে তিন চার দিন ধ'রে!

শেষ বিড়িটাই কান থেকে খুলে মুখে গুঁজি
লাল আগুনের আভায় আমার মুখ খোলে,
আজ্‌কে এখনি শেষ হোল মোর শেষ পুঁজি,
বেঁচে গেছি হায়!—এই ধোঁয়াতেই মন ভোলে!

চোখ খুলে দেখি সাম্‌নে বিরাট বিজ্ঞাপন
শত্রু এসেছে। মন ঠিক করি। ষাট টাকা!
সাগর পারেতে ডাস্‌বারো আছে আমন্ত্রণ,
শেষ বিড়ি টেনে আর কি উচিত চুপ থাকা?

বিড়ির আগুন 'প্লেটো'র গায়েতে অন্যমনে
ঝেড়ে ফেলে দেখি—'শোপেনহায়ার' ওখানে মোলো,
—সার 'দর্শন' আমি যে প'ড়েছি বিজ্ঞাপনে,
—হায় শংকর! তোমার ভাষ্য ব্যর্থ হোল!

জয়পরাজয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এ খেলা তো বারবার খেলেছি জীবনে।
আজি এ নিঃসংগ সাঁঝে শুধু হয় মনে—
সে খেলা খেলাই ছিল—তার বেশী নয়;
সমান আনন্দ দিত জয়-পরাজয়!
সকৌতুকে উভয়েরে করেছি বরণ
কতদিন!! চঞ্চল হ'তনা কভু মন।

আজিকার পরাজয় সেদিনের মত
নহে আর উপেক্ষার। সাথে-সাথে যত
অপমান-গ্লানি তার জ্বালা হয়ে ফুটে,
ব্যর্থতার ব্যথা যেন উগ্র হয়ে উঠে!

এ প্রভেদ কেন আজি? ভেবে দেখি মনে—
খেলা যে খেলাই ছিল সেদিন জীবনে,
তুমি সঙ্গে ছিলে বলে'। আর আজিকার?
এই হার জীবনের চরম ধিক্কার!

প্রলয়ান্তিকা

শ্রীআদিত্য ঘোষ

স্বপন চঞ্চল নিশি অশ্রু মাখি দেহে
বিস্মৃত হইয়া গেলো দেবতার স্নেহে
আজিকার দুষ্ট-লগ্নে হায়!
চলিয়া সে যায়—
গৃহহারা, ত্যাগ-গর্বে রক্ত-টিকা আঁকি,
বিচারের মানদণ্ডে নাহি দিয়া ফাঁকি,
নাহি রাখি কোনো শংকা।
পুনর্বার জয়ডংকা—
তার ধ্বনিত হইবে, যবে প্রলয়ের পারে,
ধ্বংসের করাল-গ্রাসে আকীর্ণ-আঁধারে
নিদ্রা যাবে শ্মশানের শিবা;
আলোকিত জীবনের দিবা—
যবে, বিস্মৃতির তমসায় হবে অস্তমিত,
নিঃশ্বাসের কোলাহল যবে হইবে স্তম্ভিত
সর্বহারা সে মহাশূন্যেতা;
মিথ্যায় হারায়েছিলো যা কিছু পুণ্য তা—
বারেকে ফিরিয়া পাবে প্রাণ-শক্তিখানি;
প্রলয়ের পর্বশেষে সবে লবে মানি
পুণ্যের প্রভাবখানি যবে,
স্বপ্নের ক্রন্দন শেষে সত্য জেগে রবে।

ক্রৌঞ্চী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিলেতের ঝোঁকটা তখনো কাটেনি সুব্রতর, ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ সেটাকে 'হাইড পার্ক' বলে ভ্রম হয়, রেস্তোরায় এক কাপ চা খাওয়ার পরে বয়কে একটা সিকি বকশীষ দিয়ে ফেলে রাস্তায় এসে আপশোষ করে মরে, আর সকালবেলায় যখন তার ঘরের দরজায় টোকা পড়ে, ঘুমের আমেজ-জড়ানো চোখে সুব্রত ভাবে প্রাতরাশ নিয়ে ল্যান্ডলেডী ডাকছে বুঝি—তারপর দরজা খুলে বাড়ির বুড়ো চাকর শুক্‌রামকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবে ল্যান্ডলেডী মিসেস্ বার্ডেল আর শুকরামের চেহারায় এত অসামঞ্জস্য!

এমনি সময় একদিন এলো নীলিমার চিঠিঃ সুব্রতকে তার সংগে দেখা করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে সে আর শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালী মেয়ের মতোই মাথা খাওয়ার দিব্যিটা দিতেও ভোলেনি।

নীলিমাকে সুব্রত চিনতো ছোটবেলা থেকেই। কাজে অকাজে সুব্রতদের বাড়িতে এসে মুহূর্তের ভিতরে যেন সকলকে মাতিয়ে তুলতো। সুব্রত হয়তো জিওমেট্রিখানা টেবিলের ওপরে খুলে রেখে বসে ঝিমুচ্ছে, হঠাৎ চোখ খুলে দেখলো সামনে থেকে বই উধাও, কিংবা সন্ধ্যার সময় মাস্টার মশাইকে হোমটাস্ক দেখাতে গিয়ে আবিষ্কার করলো—কে যেন চমৎকারভাবে হোমটাস্কের খাতা থেকে কয়েকখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। এই ছিলো নীলিমা।

তারপর অনেকগুলো ডিগ্রী নিয়ে সুব্রত চলে গেলো বিলেতে, আর নীলিমা ভীড়ের ভিতর মিলিয়ে গেলো আর পাঁচজন মেয়ের মতোই। —নীলিমার বিয়ের খবর বিলেতে থাকতেই সুব্রত পেয়েছিলো, তবে সে জন্য মনের ভিতর এতটুকু চাঞ্চল্য অনুভব করেনি সে,—শুধু ভেবেছিল, এতদিনের চেনা মেয়েটা এবারে পর হয়ে গেল! চঞ্চল হওয়ার সংগত কারণও ছিলোনা তার পক্ষে, কারণ একই আবেষ্টনীর ভিতর সহজভাবেই দুজনে বেড়ে উঠেছিল, ভালোবাসার সলজ্জ জড়তা তাদের এসে আশ্রয় করেনি; শুধু একদিন, সুব্রতর মনে পড়লো, অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে সে নীলিমাকে বলেছিলো—তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগে নীলিমা। —উত্তরে চটাস্ করে একটা কল্পিত মশকের প্রাণ সংহার করে নীলিমা বলেছিল—কি ভীষণ মশা তোমার ঘরে, উঃ! এবং তারপরেই ভেঙে পড়েছিলো অজস্র হাসির মাঝখানে।

সুব্রতর মতে একে ঠিক্ প্রেমবিনিময় বলা চলেনা, তবে এতে দুঃখিত হয়নি সে একটুও।

সেই নীলিমা চিঠি লিখেছে—না হোক্ তো দশবার স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেনি, সুব্রত হয়তো এতদিনে ভুলে গেছে তাকে। আজো কি সে আমসত্ত তেমনি ভালোবাসে? আর তেঁতুল-কাসুন্দি? খেতে বসে কাউনের পায়েস না পেলে আজো কি সে মার উপরে তেমনি রাগ করে? নীলিমার সংগে সে যেন শীগ্‌গীরই একবার দেখা করে। —ঠিকানা তো চিঠির উপরেই দেওয়া রইলো। চিনতে মোটেই কষ্ট হবেনা সুব্রতর, এর্লগিন রোডে নতুন যে জাহাজী প্যাটার্নের বাড়ি তুলেছেন স্যার নীলাদ্রী রায়, একেবারে তার সামনের বাড়িখানা, ল্যাম্পপোস্টের পাশে।

সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সুব্রত বুঝলো নীলিমার খুব ভালো ঘরেই বিয়ে হয়েছে, এর্লগিন রোডে বাড়ি, আর তা ছাড়া স্যার নীলাদ্রীর পড়শী হয়ে নীলিমার স্বামীর পক্ষে পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় কোনো সওদাগরী অফিসের কেরাণীগিরি করা অসম্ভব। স্যার নীলাদ্রীকে চিনলোনা সুব্রত তবু তার দৃঢ় প্রত্যয় হোলো যে, তিনি নিশ্চয়ই কোনো মস্ত বড় বিখ্যাত লোক। খানদশেক শেভ্রোলে, ক্যাডিল্যাক আর ডেমলার হয়তো ঝক্‌ঝক্ করছে তাঁর গ্যারেজে, বাড়ির মেঝে হয়তো এত মসৃণ যে, আনাড়ী লোকে পিছলে খেয়ে পড়বে তার উপরে হাঁটতে গিয়ে, প্রায়ই বাগানবাড়িতে পার্টী দেন তিনি, আর হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই সেণ্ট্রল এ্যাসেম্বলীর মেম্বার। —এহেন লোকের সামনের বাড়িতে থাকে নীলিমারা,—সুব্রত যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, নীলিমাদের বাড়ির সামনে এক টুকরো সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমি, বিকেলবেলা সেখানে একটা বড় টেবিলের চারদিকে চেয়ার পেতে নীলিমা, তার স্বামী আর দু'একজন বন্ধুবান্ধব চা খেতে বসে—নীলিমাই চা পরিবেশন করে হয়তো, —তাদের ছোট মেয়েটার দৌরাত্মিতে যেন তোলপাড় হয়ে ওঠে বিকেলের শান্ত আবহাওয়া, তার কলকণ্ঠের আঘাতে যেন অস্তাভ সূর্যের লাল জমাট-বাঁধা রশ্মি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে—একটা নিশ্চিন্ত আরামে নীলিমার আয়ত চক্ষু বুজে আসে, আর পড়ন্ত রোদ্দুরের আভা মেখে চিক্‌চিক্ করে তার কানের দুল।

সুব্রতরাও যথেষ্ট বড়লোক,—শ্বশুরের টাকায় নয়, বাবার টাকাতেই সে বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে, বাবার রুচির সংগে পার্টীর খাপ না খেলেও মাঝে মাঝে বিরাট জলসার আয়োজন করেন তিনি, কখনো কখনো সে জলসায় কাশী, দিল্লী আর লক্ষ্মৌ থেকে বাঈজীও আসে, আর মোটর জিনিসটা বাবার দুচক্ষের বিষ হলেও সদ্য মণিপুর থেকে আমদানী করে তাদের ল্যান্ডোতে যুতে-দেওয়া যে টাট্টু দুটোর পেশীগুলো উত্তেজনায় এখনো ঝিমঝিম করছে, তাদের উপেক্ষা করা চলে না—কিন্তু তবু, তবু যেন নীলিমার কাছে নিজেকে পরাজিত মনে হয় সুব্রতর। এই প্রকান্ড বাড়িটা যার প্রত্যেকখানা ইঁটে প্রাচীন বুনিয়াদী বংশের সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে, এর বিরাট নাচঘর, ঠাকুর দালান, আর অশেষ ঐশ্বর্যের ভোঁতা আভিজাত্য সব কিছু যেন একটা অর্থহীন অপরিসীম শূন্যতা বলে মনে হয়।

সুব্রত ঠিক করলো, সে নীলিমার বাড়ি যাবে। আর যাওয়ার সময় একখানা বাংলা ব্যাকরণ কিনে নিয়ে যাবে,—এত বানান ভুল করে নীলিমা একখানা চিঠির মধ্যে!

বেলা একটু পড়ে আসতেই সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলো সুব্রতর ল্যান্ডো,—সিংহদ্বারে এখনো সিংহ থাকে, যদিও বহু ঝড়-ঝাপটায় তার লেজ গিয়েছে উড়ে আর চূণবালি ধ্বসে বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের কঙ্কাল।

অনেক রাস্তা ঘুরে এবং আরো অনেক রাস্তা দুপাশে ফেলে রেখে গাড়ি ঢুকলো এর্লগিন রোডে। কে এখন এই বিরাট রাস্তায় হাতড়ে বেড়াবে স্যার নীলাদ্রীর বাড়ি! একটা শালকরের দোকানের সামনে বসে একজন লোক নিবিষ্ট মনে একটা আলোয়ান রিপু করছিল, গাড়ি থেকে মুখ বার করে সুব্রত তাকে জিজ্ঞেস করলো—

—এদিকে নোতুন জাহাজী প্যাটার্নের বাড়ি উঠেছে কোথায় বলতে পারো?

মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলো লোকটি—কি বল্লেন?

—বলতে পারো এদিকে স্যার নীলাদ্রী রায়ের বাড়ি কোনটা?

—কি জানি মোশায়, কত বাড়িই তো উঠ্‌চে আর ভাঙচে—কে কার খোঁজ রাখে বলুন? এই সেদিনই তো......

সুব্রত ততক্ষণ অনেক দূর চলে এসেছে।......অবশেষে পাওয়া গেলো স্যার নীলাদ্রীর বাড়ি। জাহাজী প্যাটার্নের বাড়ির সংগে এর আগে পরিচয় ছিলোনা সুব্রতর, তবু চিনে নিতে বিশেষ কষ্ট হোলোনা তার, আর মুহূর্তের মধ্যে নীলিমার নির্দেশমত সুব্রতর চোখ ঘুরে এলো রাস্তার অপর পারে। সুব্রত যা কল্পনা করে রেখেছিলো তার চেয়ে ভালোই লাগ্‌লো নীলিমাদের বাড়িখানাকে। সাম্‌নে লন নেই, তার বদলে রাশি রাশি আইভিলতার ঝাড় উঠে আষ্টেপৃষ্টে যেন ছেয়ে ফেলেছে বাড়িখানাকে।

নীলিমাই এসে খুলে দিল দরজা, টলমল করে উঠ্‌ল খুসীর আমেজ ওর চোখে।

"থাক্ থাক্ প্রণাম করতে হবেনা" সুব্রত বললো, "অত সম্মান সইবে না আমার; আগে তো এত ভক্তি ছিলোনা নীলিমা?"

"চিরকালই কি সমান যায় নাকি কারও? কিন্তু বিলেত থেকে তো স্বাস্থ্য ভালো করে আস্‌তে পারোনি সুব্রতদা,—ভালো কথা, বৌদিকে কি বাড়িতেই রেখে এসেছো নাকি?"

"বৌদি? আমি আবার বিয়ে করলুম কবে নীলিমা?"

"মানে, বিলেত থেকে কাউকে আনোনি সাথে করে? চিরকালই তো ফর্সা চেহারার উপরে টান ছিলো তোমার।....."

নীলিমা একবার অপাংগে নিজেরই দিকে তাকালো।

"কোথায় আর আন্‌তে পারলাম বলো? কে পছন্দ করবে এই কালো জৌলুসকে?"

"সত্যি বল্‌ছো, বিয়ে করে আনোনি?"

"সত্যি। কেন, হতাশ হলে নাকি?" অপরাধীর মতো শুক্‌নো মুখে বল্‌লো সুব্রত।

হতাশ? নীলিমার আনন্দ যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো একরাশ কথার মাঝখানে।

"ভালো কথা, চাক্‌রী নিলে কোথায়? তা হলে আগ্রা কলেজেই প্রোফেসরি ঠিক? কেন, আমাদের কল্‌কাতার কলেজগুলো দোষ করলো কি?"

"তাদের দোষ নয় নীলিমা, আমার কপাল। কল্‌কাতায় চাক্‌রী পেলে কে আর সাধ করে আগ্রায় যায় বলো?"

এই সহজ কথাটা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি বলে ক্ষুণ্ণ হলো নীলিমা, বল্লো, "ঐ দ্যাখো, এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি তোমাকে! ওপরে চলো সুব্রতদা।" উপরে এসে নীলিমা তার ঘুমন্ত খুকীকে ডেকে তুল্‌লো দোল্‌না থেকে--

"দ্যাখো খুকু, তোমার মামা এসেছেন,—সাহেব মামা। কি গো খুকুর মামা, চুপ করে রইলে যে? কথা বলো।"

"দরকার হবেনা নীলিমা, তোমার খুকু ঘুমিয়ে পড়েছে আবার; তার চেয়ে এসো তোমার সাথে গল্প করা যাক্,—ভালো কথা, কর্তাকে যে দেখ্‌চিনে?"

"ক্লাবে গেছেন।"

"কখন ফিরবেন?"

"রাত বারোটা নাগাদ, কিছু বেশীও হতে পারে।"

"তোমার সময় কাটে কি করে নীলিমা? থাকো তো এক্‌লা!"

"কেন? খুকু আছে, আর তা ছাড়া তুমিই তো আছো আজ।"

"আজ তো বুঝলাম আমি আছি, কালকের সময় কেমন করে কাট্‌বে?"

"সে ভাবনা কাল ভাববো, আর তা ছাড়া সময় কারো জন্যে বসে থাকে না, যে ভাবেই হোক ঠিকই কেটে যাবে।" নির্বিকার উত্তর নীলিমার।

"এইটে বুঝি তোমার শোবার ঘর?" প্রসঙ্গ পালটায় সুব্রত, "কিন্তু ও ফটোটা কার? চিন্‌লাম না তো,—কে ও মেয়েটি?"

টেবিলের উপর সযত্নে-রাখা কালো ফিতে দিয়ে বাঁধানো ফটোটা তুলে নিল সুব্রত, আর গভীর মনোযোগের সংগে তাকে চিন্‌তে চেষ্টা করলো।

সুব্রতর প্রশ্নে যেন থতমত খেয়ে গেল নীলিমা।

"ও হচ্ছে, মানে আমাদের—কি বল্‌বো?" নীলিমা যেন একটা উত্তর খুঁজে পাবার জন্য নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগ্‌লো।

"কিছু বল্‌তে হবেনা, বুঝতে পেরেছি।" সুব্রত বললো।

"কি বুঝতে পেরেছো? কিছু বুঝতে পারোনি। ও হচ্ছে আমার ননদ।"

"কিন্তু তোমার ননদের ফটো এতো যত্ন করে তোমার স্বামীর টেবিলে রাখা থাকে? ভারী ভগ্নীবৎসল দেখ্‌তে পাচ্ছি ভদ্রলোক!" শ্লেষের সুরে সুব্রত বললো, "আর ফটোর কোণে এই যে তোমার স্বামীর নাম ধরে লেখা "আমাকে ভুলোনা।" এও কি তোমার ননদেরই কাজ নাকি?"

"থামো, আর ইত্‌রামো কোরোনা। কেন, কি দোষ হয়েচে তাতে?"

"দোষ? কিছু হয়নি। কিন্তু আমাকে বাজে কথায় ভুলিয়োনা নীলিমা, স্বামী তোমার কখন ফিরবেন সত্যি করে বলো আমাকে।" নীলিমার একখানা হাত অসহ্য আবেগে চেপে ধরলো সুব্রত—"সেল্‌ফে রাখা বোতল দুটো চোখ এড়ায়নি আমার, আর ওর গায়ে লাগানো লেবেল দুটোও আমার চেনা......।"

ক্ষোভে, দুঃখে আর অসহ্য লজ্জায় কেঁদে ফেল্‌লো নীলিমা।

"ছাড়ো, ছাড়ো হাত আমার—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি সুব্রতদা?"

"পাগল আমি নই নীলিমা। নিজে বুঝ্‌তে পারোনা কে পাগল? একটা নিশ্চিত ফাঁকীর উপরে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকাকে কি বলো তুমি?"

নীলিমার চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌লো।

"কেন, মদ কি কেউ খায়না নাকি? কি দোষ তাতে? মাতাল বল্‌তে যা বোঝো তা আমার স্বামী নন,—জানো, অজস্র টাকা-পয়সা তার? ঐশ্বর্যের আড়ালে কোথায় তলিয়ে গেছে দুর্নাম!"

একটা ঝট্‌কা মেরে সুব্রতর মুষ্টি থেকে হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিলো নীলিমা, তার মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে।

"আমি তোমার কাছে মিনতি করছি নীলিমা, আমাকে মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়োনা,—সত্যি কি তুমি সুখী?"

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল নীলিমা, বল্লো—

"কেন নই? আমার স্বামীর গাড়ি আছে বাড়ি আছে, আর আছে অজস্র টাকাকড়ি—এতেও কি আমি সুখী হবোনা?"

"কিন্তু তাই কি সব নীলিমা? টাকাপয়সাই কি সব? আরো কি কিছু কাম্য নেই তোমার......?"

"কেন, খুকুই তো রয়েছে আমার। এতেও কি তুমি কিছু বুঝতে পারোনা? আর কোন্ অভাবটা রইলো আমার বলো?"

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে বসে রইলো সুব্রত—আর কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা করলো বিলেতের গল্প ফাঁদিতে,—

"এ সময়ে যা শীত পড়ে বিলেতে, আর আকাশে অসম্ভব কুয়াশা—সূর্যকে কোনোদিন এক নিমেষের জন্যে দেখতে পেলে তো তোমার ভাগ্য বলে মানতে হবে......।"

"হুঁ।"

"বিলেতে আমাদের পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে ছিলো নীলিমা, সে এত উঁচু টুপি পরতো মাথায়, এক দেখবার মতো ব্যাপার।"

(শেষাংশ ৩০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জ্ঞান-বিজ্ঞান

সুধীর বসু

যুদ্ধ ও বিজ্ঞান

যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হয়েছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তার অনেকগুলো যে মানুষের জীবনযাত্রায় অভিনব পরিবর্তনের সূচনা করবে, তা আন্দাজ করা শক্ত নহে। সম্প্রতি ওয়াশিংটনের 'সায়েন্স টেলেণ্ট ইনটিষ্টিউটে" বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়। যুদ্ধের হুজুগে এক বিমান-বিজ্ঞানেই যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী ফল আমরা এখনই আন্দাজ করতে পারি। ইনস্টিটিউট অব এ্যারোনটিক্যাল সায়েন্সের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হিউ এল ড্রাইডেনও তাঁর অভিভাষণে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ১৯৩৯ সালে যেখানে বছরে অল্প কয়েকখানি মাত্র বিমানপোত প্রস্তুত হ'ত, আজ সেখানে যুদ্ধের প্রয়োজনে অসংখ্য বিমান বিভিন্ন দেশে প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ৭৮ খানি বিমান আতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করার চেষ্টা করে। তার মধ্যে ১১ খানি বিমান মাত্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে সমর্থ হয়, ২৮ খানি বিমান পথিমধ্যেই অন্যত্র অবতরণ করে' আত্মরক্ষা করে, বাকি ৩৯ খানি বিমানই খোয়া যায়। কিন্তু আজ ৭০ টন ওজনেরও অধিক বড় বড় বিমানপোত ঘণ্টায় চার শত মাইল অনায়াসেই অতিক্রম করে চলে যায়। এমন দিন কমই বাদ যায়, যেদিন তাদের কোনও না কোন দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে না হয়। মালপত্র বহনকারী থেকে আরম্ভ করে' বিভিন্ন প্রকারের বিমান আজ যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে কম ব্যবহৃত হচ্ছে না। বিমান বিহারে পূর্বের তুলনায় বিপদের আশঙ্কা যেমন কম, বিমান ধ্বংস হলে যাত্রীদের বাঁচবার বিভিন্ন উপায়ও তেমনি অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্রুত পরিভ্রমণে আজ বিমানের তুলনা নেই। তাই রাষ্ট্র ধুরন্ধরগণও বিমানেই ছুটোছুটি করেন এবং ছ' মাসের পথ ছ'ঘণ্টায় সেরে আসেন। যুদ্ধ শেষে বিমানের এই উন্নতির ফল বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবে এবং দূর-দূরান্ত দেশে যাতায়াতের প্রধান বাহনরূপে বিমান যে বিশেষভাবেই প্রচলিত হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কল কারখানায় শ্রমিকেরা আজ যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণে ব্যস্ত। যাতে তাদের কোনরূপ স্বাস্থ্য হানি না ঘটে এবং তারা পুরো উদ্যমে কাজ করবার সুযোগ পায়, এজন্য কলকারখানাগুলিতে নানাবিধ সুব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়েছে। বাহিরের ধূলিকণা মিশ্রিত বায়ু যাতে পরিশুদ্ধভাবে কারখানাদিতে প্রবেশ লাভ করে, তার ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষিত হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই সব ব্যবস্থা করা হলেও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তার ফল সকলেই ভোগ করবে এবং লোকের বাসগৃহ, কলকারখানা, যানবাহন সর্বত্র এভাবে পরিশ্রুত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হওয়া অসম্ভব নহে। 'ব্ল্যাক আউট' বা নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থায় আলো সম্পর্কেও আমরা নূতনভাবে অভ্যস্ত হয়েছি। কম আলোতে চলাফেরা, কাজ-কর্ম করার এই অভ্যাস আমাদের জীবনযাত্রায় যেমন পরিবর্তন আনবে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে আমরা স্বদীপক (Fluorescent) আলোতে অভ্যস্থ হওয়ায় তারও বহু প্রচলন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আশা করা যেতে পারে। 'টেলিভিসন' বা দূরদর্শনেও যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং যুদ্ধের পরে আমরা এ বিষয়ে আরও অনেক ধাপ অগ্রসর হতে পারব বলে আশা করি।

পরমাণু হতে 'ইলেকট্রন' বা তড়িৎকণাসমূহ বিচ্ছিন্ন করার উপায় আবিষ্কৃত হওয়াতে বর্তমানে 'ইলেকট্রনিকস' নামে বিজ্ঞানের এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। এই বিভাগের গবেষণার ফলে যেসব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে যুদ্ধের বিভিন্ন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করার পথ যেরূপ সুগম হয়েছে, বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধানও ইহা হতে একদিন সম্ভবপর হবে বলে মনে হয়। 'ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের' সহায়তায় বর্তমানের অজানা বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রেরও সন্ধান লাভ হবে বলে বৈজ্ঞানিকগণ আশা করছেন। তাগিদটা যুদ্ধের হলেও, এই হুজুগে এভাবে যা কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হচ্ছে, তার কোন কোনটার প্রভাব যে যুদ্ধোত্তর কালেও মানুষের জীবনে অনুভূত হবে তা বলাই বাহুল্য।

জীবন ও মৃত্যুর সমস্যা

বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার যুদ্ধের বিবিধ মারণাস্ত্র নির্মাণে যেরূপ ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি লোকের জীবনরক্ষার নিত্য নূতন কৌশলও তাঁরা কম উদ্ভাবন কচ্ছেন না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভালোমন্দ উভয় প্রকারের ব্যবহারই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। একদিকে হানাহানি, অপরদিকে রোগ ও মৃত্যুযন্ত্রণা উপশমের নানা প্রক্রিয়া—বিজ্ঞানকে দুই মূর্তিতেই লোকের নিকট প্রতিভাত করে বটে; কিন্তু তার কল্যাণজনক রূপটিই যে আসল রূপ বিজ্ঞানীরা তা কখনও ভুল করেন না; আজও তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু বিজ্ঞানী মানব সেবার সাধনায় নিমগ্ন আছেন।

মানুষ অনেক বিষয়ে উন্নতি করেছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর হাত এড়াতে পারেনি। মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব কিনা—মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে পুনর্জীবিত করা যায় কিনা,—বিজ্ঞানীগণ সে বিষয়ে বহু দিন পরীক্ষা করে আসছেন। মানুষ যখন মারা যায়, দেখা যায় তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয় এবং অক্সিজেনের অভাবে সে চেতনা হারিয়ে ফেলে। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও 'টিসু'গুলি মৃত্যুর পরেও কিছুকাল পর্যন্ত সজীব থাকে; যদি কোনও উপায়ে অবিলম্বে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঞ্চরণ করা সম্ভব হয়, মৃতব্যক্তি আবারও বেঁচে উঠতে পারে। আমাদের মস্তিষ্কে যে 'নার্ভসেল' থাকে তা হতে শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রে নির্দিষ্ট সময়ান্তর সিগন্যালের মত প্রেরিত হয় এবং ইহার ফলে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। অক্সিজেনের অভাবে কিংবা আমাদের রক্তে 'কার্বন ডায়োক্সাইডে'র পরিমাণের বিভিন্নতায় উপরোক্ত 'নার্ভসেণ্টার' বিশেষভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং নানাপ্রকার ঔষধের প্রয়োগে ঐ নার্ভসেণ্টারের কাজ বন্ধ করা কিংবা উহাকে ইচ্ছা মত চালু করা যেতে পারে। সম্মোহন ঔষধের (এনেস্থেটিকের) অতি প্রয়োগে কোনও রোগীর যখন অপারেশন কক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, অনেক সময় ইঞ্জেকসনের দ্বারায় এভাবে

তার শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনা হয়,—এ আমরা অবগত আছি।

নিউইয়র্কের দুইজন বিজ্ঞানকর্মী বর্নবম এবং টমসন সম্প্রতি এ বিষয়ে গবেষণা করে মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চারের নূতন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তারা অবশ্য পশু দেহেই তাদের পরীক্ষা করেছেন। 'নাইট্রোজেন' বা 'হিলিয়ম গ্যাস প্রভাবে প্রাণীদের দম আটকে যখন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্তসঞ্চলন স্তব্ধ হয়ে আসে, তখন তাদের দেহ একটি মোটরের সহিত সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এই মোটর ফুসফুস হতে একবার গ্যাস বাহির করে ও পরক্ষণে উহাতে চাপ দেয়—ফলে ফুসফুস একবার স্ফীত ও পরক্ষণে অবনত হতে থাকে। ফুসফুসের স্ফীত টিসু হতে মস্তিষ্কের নার্ভে যে বাণী বাহিত হয়, তাহা হতে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র কার্যকরী হয়ে উঠে, রক্ত সঞ্চালনও শুরু হয়। উপরোক্ত প্রণালীতে দেখা যায় বাহির হ'তে কোনও বাতাস বা অক্সিজেন চালনা না করলেও তিন মিনিটকাল শ্বাসপ্রশ্বাস বেশ চলতে থাকে। অক্সিজেন চালনা করলে অবশ্য অতি সত্বরই প্রাণীরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সে যাহা হউক, ফুসফুস হতে 'নার্ভ ইমপালস' শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া শুরু করতে গোড়ায় এরূপ কার্যকরী হয় যে, পরে 'রিফ্লেক্স একসন' দ্বারাই বাকি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রাণীদেহের ঐরূপ মৃতাবস্থা থেকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় যে সময়ে ওদের ফিরিয়ে আনা যায়, মানবদেহে সে সময়ের পরিমাণ কিরূপ হবে, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। তবে মানুষের বেলায় মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হতে ততটা হয় না, যতটা দেখা যায় প্রয়োজনীয় রক্ত সঞ্চালনের অভাব হতে কিংবা হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা ও মেদপূর্ণ (fibrous) হৃদ্‌যন্ত্র হতে। সুতরাং ক্রমনিস্পন্দ হৃদ্‌যন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের উপরেই বেশী কিছু নির্ভর করছে। হয়তো এমন উদ্ভাবন একদিন সম্ভব হবে, যেদিন মোটর দুর্ঘটনায় সদ্যমৃত ব্যক্তির ভাল 'হার্ট' অন্য লোকের জীর্ণ দুর্বল হার্টের স্থানে বদলে দেওয়া যাবে। মস্কোতে মৃত ব্যক্তিদের ভাল চক্ষু হতে টিসু সংগ্রহ করে অন্ধ ব্যক্তিদের নূতন চোখ লাগিয়ে অন্ধত্ব ঘুচাবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। কে জানে হার্ট বদল করে দেবার পদ্ধতিও একদিন না আবিষ্কৃত হবে এবং মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা না যাবে।

নিগ্রোর রক্ত

সাদা-কালায় ভেদ—শ্বেত ও অশ্বেত জাতির বিভিন্ন বৈষম্যের কথা শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে আছে। কালা আদমীর সংস্পর্শে এলে শ্বেতজাতির মাহাত্ম্য পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়—এ ধারণা বর্তমান জগতে কম গোলযোগ বাধায় নি। 'নর্ডিক' জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষাকল্পে জার্মানীর নাৎসীগণ ইহুদী বিতাড়ন পর্ব দিয়ে তাদের অভিযান শুরু করে বর্তমানের গোলযোগের সূত্রপাত করে। নাৎসীদের কথা ছেড়ে দিলেও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের শ্বেত জাতিরাও নিজেদের জাতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার জন্য অন্য জাতের লোকদের সর্বপ্রকারে পরিহার করবার কম চেষ্টা করে না। আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি মার্কিনদের বিজাতীয় মনোভাব কম পরিস্ফুট নহে। নিগ্রোদের পরিহার করে চলবার নিমিত্ত নানারূপ বিধিনিষেধের দ্বারা ওদেশের শ্বেতজাতিদের সতর্ক করেই এরা ক্ষান্ত হয়নি, এমন কি একথাও এরা এতদিন প্রচার করে আসছে যে, শ্বেত-জাতীয় লোকদের ও নিগ্রোদের রক্তের মধ্যেও প্রাণতত্ত্বের বিচারে দারুণ পার্থক্য রয়েছে। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ মর্মে এক আদেশ পর্যন্ত জারী করা হয় যে, নিগ্রোদের দেহ হতে রক্ত নিয়ে যেন শ্বেতকায় সৈন্যদের জন্য সংগৃহীত রক্ত ভাণ্ডারে (plasma bank) জমা করা না হয়। নিগ্রোদের সম্পর্কে এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হওয়াতে ঐ দেশের এক শ্রেণীর মার্কিনদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন শুরু হয়। শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের রক্তে বাস্তবিকই কোন পার্থক্য আছে কি না, তা নির্ণয় করার জন্য আমেরিকার মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। সম্প্রতি উক্ত এসোসিয়েশনের যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে, তাতে জানা যায় যে, উভয়ের রক্তে পার্থক্য করবার বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই। যেক্ষেত্রে অপরের রক্তদান প্রয়োজন, সেরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে নিগ্রো দেহ হতে রক্ত নিয়ে শ্বেতজাতীয় লোকদের চিকিৎসা করে দেখা গিয়েছে, এরূপ রক্ত দেওয়ার ফলে শ্বেতকায় মার্কিনদের কোনপ্রকার ক্ষতি হয়নি বা অপর কোনরূপ দেহপীড়া বা অনর্থও প্রকাশ পায়নি। নিগ্রোদের রক্ত সম্পর্কে শ্বেতজাতীয়দের ধারণা একান্তই অলীক। বিজ্ঞানের দিক হতে বিচার করলে উহার কোন মূল্যই থাকে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে বা দেহের রঙে পার্থক্য থাকলেও অস্থি-মাংসের আবরণে সুস্থ মানুষের দেহাভ্যন্তরে একই রক্ত প্রবহমান। শ্বেত অশ্বেত জাতির রক্তের তারতম্য করার সংগত কারণ নেই। এ সত্য শ্বেতজাতীয়েরা যত হৃদয়ঙ্গম করবে, পৃথিবীর পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্তু জাত্যাভিমানী শ্বেতকায়দের চৈতন্যোদয় হবে কি?

আমেরিকায় মার্কনির স্মৃতিরক্ষা

বেতারের আবিষ্কর্তা সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কনির প্রতি মার্কিন জাতির শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ওয়াশিংটনের একটি পার্কে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে নিউইয়র্কের 'মার্কনি মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেসন' উদ্যোগী হয়েছেন জেনে আমরা বিশেষ সুখী হয়েছি। যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যেও পরদেশী,—শুধু পরদেশী কেন—শত্রু দেশের একজন বৈজ্ঞানিকের প্রতি জাতীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানীদের মানবহিতকর আবিষ্কারকে যোগ্য সমাদর করবার যে আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে ইহা বিশেষ আশার কথা। বিজ্ঞানীরা যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁদের আবিষ্কারের ফল জাতি-নির্বিশেষে পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই ভোগ করে থাকে,—সে হিসাবে বিজ্ঞানীরাও সব দেশে শ্রদ্ধা লাভ করেন। মার্কনি তাই ইতালীতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর আবিষ্কার মাহাত্ম্যে তিন বিশ্বের দরবারে সম্মানের অধিকারী। তাই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও আমেরিকাবাসিগণ জাতীয়ভাবে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছেন দেখে তাদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৮৭৪ সালে ২৫শে এপ্রিল তারিখে মার্কনি ইতালীর অন্তর্গত বোলোনাতে জন্মগ্রহণ করেন। বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে তিনি কিছুকাল নিজের দেশেই পরীক্ষা করে' পরে ইংলণ্ডে আসেন। এই স্থানেই তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ১৮৯৬ সালের ২রা জুন তারিখে তিনি 'বেতার টেলিগ্রাফির' পেটেণ্ট লন। ১৮৯৮ সালে তিনি ইংলিশ চ্যানেলের এপার ওপার সংবাদ আদান-প্রদান করেন। পরে ১৯০২ সালে আতলান্তিক মহাসাগরের এপার ওপার বেতারে সংবাদ প্রেরণ করে জগতকে বিস্মিত সচকিত করে তোলেন। আজ ঘরে ঘরে বেতারের প্রচলন হয়েছে। দুনিয়ার এক প্রান্তের সংবাদ মুহূর্তমাত্রে অপর প্রান্তে শুনতে পাচ্ছি। সভ্যতার সংগঠনে এ আবিষ্কারের তুলনা পাওয়া ভার। মার্কনির এই আবিষ্কার তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার অধিবাসিগণ জাতীয়ভাবে এই কৃতী বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মার্কিন জাতির গুণানুরাগের পরিচয় দিয়েছেন মাত্র।

কাহিনী

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রবীণ সাহিত্যিক নিরঞ্জন মিত্র নিজের অপরিসর ঘরখানিতে বসিয়া লিখিতেছেন। পঁচিশ বৎসর আগে তিনি এই ঘরখানিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন; ইহার মধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু এই ঘরখানি ঠিক আপনার জনের মত তাঁহার জীবনে একটি স্নিগ্ধ পরিমন্ডল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। ইহার আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, ফাটল-ধরা দেওয়াল, সিমেন্ট-উঠা মেঝে, কড়িকাঠ সবই কত পরিচিত, কত আপনার!

এমন এক সময় ছিল, যখন এই ঘরখানিতে কত লোক আসিত। সাময়িক পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক, উদীয়মান কবি, সাহিত্যরসিক প্রকাশক, রসজ্ঞ সমালোচক, বিদগ্ধ পাঠক, ক্ষমতাবান্ শিল্পী, আরও কত লোক সময় অসময়ে তাঁহার ঘরে আসিয়া মিলিত হইতেন, তাঁহাদের আলাপ হাস্যে ঘরখানি সর্বদার জন্য মুখরিত থাকিত। আজ তাঁহাদের অনেকেই ইহজগতে নাই, যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ নানা দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব-পরিচিতদের মধ্যে দুই-একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, কিন্তু আগের মত আলাপ জমে না। তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ। উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া নিরঞ্জনবাবু হাসিয়া বলেন, 'ভায়া, আমিই হচ্ছি the last of the Romans!'

লিখিতে লিখিতে নিরঞ্জনবাবু অন্যমনস্কভাবে কোণের ইজি-চেয়ারখানির দিকে চাহিলেন। এই চেয়ারখানিতে ত্রিকাল পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বসিতেন। ত্রৈলোক্যবাবু অল্পভাষী লোক ছিলেন, আর সকলের আলোচনায় বড় বিশেষ যোগ দিতেন না। কিন্তু তাঁহার বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সাহিত্যবিষয়ক যে কোন জটিল তর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই সকলে মধ্যস্থ করিতেন। তিনি দুই-একটি কথায় অদ্ভুতভাবে সকল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ত্রিকাল অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। পত্রিকাখানির জন্য ত্রৈলোক্যবাবুর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, উহার জন্য কত ভাল ভাল কাজ তাঁহাকে ছাড়িতে হইয়াছে। বন্ধুবান্ধব প্রায়ই বলিতেন, 'ত্রৈলোক্যবাবু ত্রিকাল শেষ হয়ে যখন এককালে ঠেকবে, তখন কি দশা হবে ভেবেছেন কি? সময় থাকতে শেষকালটার বন্দোবস্ত করুন।' উত্তরে ত্রৈলোক্যবাবু কেবল একটু হাসিতেন, কোন কথা বলিতেন না।

ত্রৈলোক্যবাবু যখন ভাবিলেন, ত্রিকাল এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে, আর কোন চিন্তার কারণ নাই, সেই সময় ত্রিকাল-পরিচালক ব্রহ্মানন্দ মৌলিক ত্রৈলোক্যবাবুর আসনে মাসিক আশি টাকা বেতনে জনৈক নবীন সাহিত্যিককে বসাইয়া ত্রৈলোক্যবাবুকে ত্রিকালের সকল চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, দেড়শত টাকা দিয়া বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যবাবুকে 'পুষিবার' মত অবস্থা তাঁহার নয়। তাহা ছাড়া, ত্রৈলোক্যবাবু থাকিলে কাগজের উন্নতি হইবে না, কেননা ত্রৈলোক্যবাবুর জরাগ্রস্ত মনে বিংশ শতাব্দীর রেখাপাত হয় নাই। তাঁহার কাগজ বিংশ শতাব্দীর আদর্শ কাগজ হইবে। এই রকম আরও কত কথা। কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, ব্রহ্মানন্দবাবুর নিজের ধারণা হইয়াছিল, তিনি একজন সাহিত্যিক, অথচ তাঁহার কোন লেখাই ত্রৈলোক্যবাবু পছন্দ করিতেন না। এই লইয়াই গোলমাল আরম্ভ হয়।

ত্রিকালের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবার পর ত্রৈলোক্যবাবু এখানে সেখানে ঘুরিয়া শেষকালের ব্যবস্থা কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে কয়জন সহৃদয়ী বন্ধুর সাহায্যে দিগন্ত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দিগন্ত প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন আগেই ত্রৈলোক্যবাবুর জীবনের দিগন্তে মৃত্যুর অন্ধকার নামিয়া আসে। শেষ দিন পর্যন্তও ত্রৈলোক্যবাবু নিরঞ্জনবাবুর ঘরে আসিয়া ঐ ইজি-চেয়ারখানিতে বসিতেন। নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁহাকে কেহ কখনও বিচলিত হইতে দেখে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ত্রিকালের সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্যারাগ্রাফ ছাপা হইয়াছিল।

নিরঞ্জনবাবুর মনে হইল মহেশ্বর আচার্যের কথা। মহেশ্বরবাবু ঘরে ঢুকিয়াই নিরঞ্জনবাবুর তক্তপোষের উপর টান হইয়া শুইয়া পড়িতেন। তাঁহার একটি ছোট বইয়ের দোকান ছিল। দোকানখানিতে বহু সাহিত্যিকের যাতায়াত ছিল, প্রায় সকলেই বাকিতে বই লইতেন এবং শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি টাকা শোধ করিতেন না। মহেশ্বরবাবুর ইচ্ছা ছিল, তিনি নূতন সাহিত্যিকদের বই প্রকাশ করিবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হইবার আগেই দোকানে লালবাতি জ্বালিতে হয়। বই ছাপিবার সঙ্কল্প মহেশ্বরবাবুর শেষ পর্যন্তও ছিল। অনাহারে এবং অচিকিৎসায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমরেন্দ্রজিৎ রায় নিরঞ্জনবাবুর চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিত। মহেশ্বরবাবু ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'সমরবাবু, তোমার ও-কাজটা কিন্তু আদৌ শিল্পীজনোচিত নয়।' সমরেন্দ্রজিৎ হাসিয়া কি যেন একটা রসিকতা করিত। সমরেন্দ্রজিৎ ছবি আঁকা লইয়া বেশ ভালই ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর কোন ছবি সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করার পর হইতে তাঁহার দুর্গতি শুরু হয়। সমরেন্দ্রজিতের অভিমত নানা রঙে বিচিত্র হইয়া যথাসময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী মহশয়ের কানে পেঁাছিল, তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, 'দেখে নেব।' এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বাৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনী। সমরেন্দ্রজিতের ছবি প্রদর্শনীর গ্যালারিতে স্থান পাইল না। এই ছবিখানি সমরেন্দ্রজিৎ বহুদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রমে আঁকিয়াছিল।

আরও দুই একটি ব্যাপারে সমরেন্দ্র বুঝিতে পারিল শিল্পী-প্রবরের ক্রোধ উপশম না করিতে পারিলে সে কোন দিক দিয়াই সুযোগ সুবিধা করিতে পারিবে না। কিন্তু সে যে হাতে শিল্প সরস্বতীর পূজা করিতেছে তাহাই মানুষের পূজায় সে কি করিয়া নিয়োজিত করিবে। ধীরে ধীরে সমরেন্দ্রজিতের মাথা খারাপ হইল। সে এখন উন্মাদ আশ্রমে বসিয়া শিল্প-সাধনার চরম ব্রত উদ্যাপন করিতেছে।

পাগল হইবার আগে সমরেন্দ্রজিৎ একখানি ছবি আঁকিয়া নিরঞ্জনবাবুকে দিয়াছিল। ছবিখানির নাম 'পৃথিবী', উহা এখনও নিরঞ্জনবাবুর ডান পাশের দেয়ালে ঝুলিতেছে। ছবিখানির বিষয়বস্তু বড় অদ্ভুত। বৃক্ষ লতা গুল্মহীন বিরাট একটি প্রান্তর, তাহারই উপর কয়েকটি বীভৎস নরকঙ্কাল মারামারি করিতেছে। মাথার উপর আদি অন্তহীন তাম্রবর্ণ আকাশ; কোথাও এতটুকু দয়ামায়ার লেশ পর্যন্ত নাই, যেমন রুক্ষ তেমনি নির্দয়। প্রান্তরের সব রসটুকু যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কোনখানে সবুজের নামগন্ধ নাই। ছবিখানির দিকে চাহিলেই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া একজনের পর এক জনের কথা নিরঞ্জনবাবুর মনে আসিতে লাগিল। আগে তাঁহার ঘরে লোক ধরিত না, সকলের ঠাসাঠাসি করিয়া বসিতে হইত। প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী চা এবং পান দিতে ভৃত্য গোবর্ধন হাঁফাইয়া উঠিত। আজকাল বড় বিশেষ কেহ আসে না, আসিলেও বেশিক্ষণ থাকিতে চায় না। আগে যাহারা আসিয়া আড্ডা জমাইত এই ঘরখানি তাহাদের স্মৃতি নীরবে রক্ষা করিতেছে। নিরঞ্জনবাবুর মনে হয় তিনিও যেন তাহাদের সঙ্গে নিছক স্মৃতি হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন এই ঘরখানিই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। ইহার বাহিরে যাইতে তাঁহার মন সরে না। তাঁহার ধারণা বাহিরে যাহা কিছু দেখিবেন সবই তাঁহার অপরিচিত, এখন আর অপরিচিতের প্রতি

তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় না। তাঁহার বিরাট পৃথিবী, তাহার আকাশ বাতাশ, তাহার সাজসজ্জা, তাহার বর্ণ গন্ধ সব লইয়া ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতে হইতে যেন এই ঘরখানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, এক দিন হয়ত একেবারেই মিলাইয়া যাইবে।

ভাঙ্গা আলমারীতে তাঁহার বহু পঠিত মলিন বইগুলির উপর ধূলো জমিতেছে; তক্তপোষের তলায় স্তূপীকৃত খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রে পোকা লাগিয়াছে। টেবিলের উপর দুইটি দোয়াতের মধ্যে একটির কালি শুকাইয়া গিয়াছে। দোয়াতের পাশেই গোটা তিনেক কলম। টেবিলের উপর এলোমেলোভাবে কাগজপত্র ছড়ান; একদিকে একটি খালি পেয়ালা, পেয়ালার মাঝে চায়ের একটু তলানি পড়িয়া আছে, একটি মাছি তলানির মধ্যে ভাসিতেছে। বাম ধারের দেয়ালে ব্র্যাকেটের উপর খানকয়েক অর্ধমলিন জামাকাপড় ঝুলিতেছে। নিরঞ্জনবাবু চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার খদ্দরের র‍্যাপারখানি ব্র্যাকেট হইতে মেঝেতে পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বদিকের জানালার উপরে একখানি ইংরেজি ও বাঙলা ক্যালেন্ডার। তাহার পাশে খানিকটা জায়গায় চুণ বালি উঠিয়া গিয়াছে, দেখিতে বাঘের মুখের মত মনে হইতেছে।

সকালে কে একজন কয়েকটি দোলন চাঁপা দিয়াছিল, ফুলগুলি তক্তপোষের এক ধারে শুকাইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের গন্ধ মৃদু হইয়া আসিলেও এখনও মাঝে মাঝে নাকে আসিতেছে। গোবর্ধন আগে প্রত্যহ ঘরখানির সংস্কার করিত, এখন নিরঞ্জনবাবু তাহাকে কোন জিনিসে হাত দিতে দেন না। তাঁহার ধারণা কেহ হাত দিলেই হয়ত বহু স্মৃতি বিজড়িত এই ঘরখানির সুনিবিড় স্তব্ধতাটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। এখানকার এই স্তব্ধতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন—The lasl of the Romans!

মার্তণ্ড পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিপ্রকাশ মজুমদারের অনুরোধেই আজ নিরঞ্জনবাবু লিখিতে বসিয়াছেন। লিখিবার অনুরোধ আগে বহু সম্পাদকের নিকট হইতে আসিত। আজকাল তাঁহার কলমের জোর কমিয়া আসিয়াছে, লিখিবার জন্য খুব কম সম্পাদকই এখন অনুরোধ করেন। এমন একদিন ছিল যখন তাঁহার গল্প পড়িয়া পাঠক পাঠিকা কত মুগ্ধ হইয়াছে। কতজন তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছে; কেহ কেহ নানা সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন করিয়াছে—অমুক গল্পের নায়ক কি সত্যই কাল্পনিক, অমুক মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় কি ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন উৎসাহী পাঠক, এমন কি দুই চারিজন পাঠিকা পর্যন্তও তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছে। বেশ মনে আছে জনৈক পাঠক তাহার ডায়েরি পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করিয়াছিল তাহার জীবন কাহিনী লইয়া নিরঞ্জনবাবু যদি গল্প রচনা করেন, তাহা হইলে সে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। দুই-একজন চিঠির সঙ্গে তাঁহাকে ফুলও পাঠাইয়াছে। সে সব কত দিনের কথা! আর আজ তিনি উৎসব শেষের ভগ্ন ভাণ্ডের মত অনাদরে এক ধারে পড়িয়া আছেন, কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। তবুও মার্তণ্ড পত্রিকার সম্পাদকের মত সামান্য কয়জন আছেন যাঁহারা তাঁহার কথা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু ইঁহাদের ব্যবহারে কোথায় যেন একটু কৃপার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা নিরঞ্জনবাবুর আদৌ সহ্য হয় না।

আজ তাঁহার বড় সমস্যা, কি লিখিবেন। এতদিন তিনি গল্পের পর গল্প রচনা করিয়াছেন। তাহাদের সবই যে নিছক কল্পনাপ্রসূত তাহা নয়, বহু গল্পের উপাদান তিনি বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিদের জীবন হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। জগতে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিনিয়ত কত হাসি কান্নার পালা চলিয়াছে তাহার খবর কয়জন রাখে। কতজনের জীবনে দিনের পর দিন ধরিয়া রুদ্ধ অশ্রু জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, একটির পর একটি করিয়া সকল আশা শূন্যে বিলীন হইতেছে, কত স্বপ্ন মরীচিকায় পরিণত হইতেছে—ইহার দিকেই বা কয়জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংসারের লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া আত্মাভিমানের বাষ্পীয় শকট নির্মমভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার চাকার তলায় পড়িয়া কত হতভাগ্য নিষ্পেষিত হইতেছে—সে কথাই বা কাহার মনে হয়। আবার অভাবনীয় আবির্ভাবে কি করিয়া তুচ্ছতম ব্যক্তির জীবনও পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, অপ্রত্যাশিতভাবে কতজন কত দিক দিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছে—সে সন্ধানও কেহ রাখে না। এই রকম কত বিষয় লইয়া তিনি গল্প লিখিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, গল্পের উপাদানও আর নজরে পড়ে না। কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া তো আর লেখা যায় না।

বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসা দিনগুলির দিকে নিরঞ্জনবাবু দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। সব দিনগুলি ভাল করিয়া নজরে পড়িল না। কতকগুলি পড়িল, কিন্তু সে সকল দিন হইতে তিনি কি আহরণ করিবেন? বাবা মা কত কাল হইল মারা গিয়াছেন, স্মৃতির পটে তাঁহাদের মুখ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, যে দুই চারিজন আছেন তাঁহাদের সঙ্গেও দীর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ নাই। বাহিরের দিক দিয়া তাঁহার একার জীবন বৈচিত্র্যহীন ঘটনার ভিতর দিয়া কাটিয়া আসিয়াছে। সংসারে থাকিয়াও তিনি সংসারের একজন হইতে পারেন নাই। তাঁহার পৃথিবী খানিকটা বাস্তব খানিকটা স্বপ্ন লইয়া গঠিত, ফলে কিছুই আঁকড়িয়া ধরা সম্ভব হয় নাই। মুঠি যেখানে দৃঢ় করা দরকার সেখানে কেমন করিয়া তাহা শিথিল হইয়া আসিয়াছে, শেষ পর্যন্ত কিছুই হাতে থাকে নাই। ক্ষমতা ছিল না তাহা নয়, কিন্তু যে সামঞ্জস্যের উপর ক্ষমতার প্রয়োগ নির্ভর করে তাহা তিনি কোন দিনই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

পড়াশুনা খানিকটা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দেখিতেছেন সবই প্রায় ভুলিতে বসিয়াছেন, লিখিতে গেলে তাঁহার এত দিনের পড়াশুনা একখানি ফুলস্ক্যাপ কাগজে অনায়াসে লিপিবদ্ধ করা যায়। বহু বইএর নামের সঙ্গে লেখকের নামের গোলমাল হইয়া গিয়াছে। একখানি বইএর কথা উঠিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিতে হয় পড়িয়াছেন কিনা। কোন বই-এর দুই একটি অধ্যায়, কোন কবিতার সামান্য কয়েকটি ছত্র, কোন নাটকের বা দুই-চারিটি দৃশ্য, এত পড়াশুনার ভিতর হইতে ইহার বেশি আর কিছু মনে নাই। এটুকু ভুলিয়া গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না। পড়াশুনা না করিলেই বা কি লোকসান হইত।

অর্থোপার্জনও এমন কিছু করেন নাই। কোন মতে দিন কাটাইবার মত টাকা হইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। লিখিয়া অন্যান্য সাহিত্যিক যে রকম উপায় করেন নিরঞ্জনবাবু তাহা করেন নাই। বিল করিয়া পত্রিকার অফিস হইতে টাকা আদায় করা হইয়া উঠে নাই; প্রকাশকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করাও সম্ভবপর হয় নাই। যে যাহা দিয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখন লেখার ব্যাপারে ভাঁটার টানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের দিক দিয়াও ভাঁটার টান আসিয়াছে।

এক সময়ে গভীর আন্তরিকতা লইয়া গল্পের পর গল্প রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল গল্প আজ এই জীবনে কতটুকু কাজে লাগিতেছে? একদিন তিনি মনে করিতেন তাঁহার গল্প বাঙলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে, আজ সে ভুল ভাঙিয়াছে। আর গল্পের অমরত্বই বা তাঁহাকে এখন কি সান্ত্বনা দিবে? না লিখিলেই বা কি হইত? শাদা কাগজের উপর কাল কাল অক্ষর সাজাইলেই জীবন ভরিয়া উঠে না—আজ এ সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সাহিত্য চর্চার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা হইল কোথায়? যে চাষা রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়া অসীম পরিশ্রমে আপনার সামান্য জমিটুকু চাষ করে এবং যথাসময়ে উৎপন্ন ফসল ঘরে লইয়া যায় তাহার জীবন কি কম সার্থক?

বৃহত্তর জীবনের সহিত তিনি আপনাকে মিলাইতে পারেন নাই। জীবনে সে সুযোগ যে একেবারে আসে নাই তাহা নয়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া ভাবিয়াছিলেন হয়ত তাহার ভিতর দিয়াই জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সমগ্র দেশের নাড়ীর স্পন্দনের মাঝে তিনি দেশ কালের অতীত এমন কিছু পাইবেন যাহা তাঁহার অন্তর বাহিরের সকল দৈন্য সকল অভাব দূর করিয়া অপূর্ব মাধুর্য সৃষ্টি করিবে। তাই তখন কোন দিকে তাঁহার চাহিবার অবকাশ ছিল না। তাঁহার আকাশ বাতাস কেমন করিয়া এক অভূতপূর্বভাবে ভরিয়া উঠিয়াছিল, এই ক্ষুদ্র ঘরখানি তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। সে কি উন্মাদনা, আত্মত্যাগের সে কি অসীম আগ্রহ। সে সব দিনের স্মৃতিও আজ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জনবাবুর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

জীবনের এমনি একটি অধ্যায় যেন তাঁহার চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কোন্ অধ্যায়ের কথা আজ তিনি লিখিবেন? নিজের কাছে তাহাদের সবগুলিই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। জীবনের ধাবমান দিনগুলি তিনি কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। এজন্য কাহাকে তিনি দোষী করিবেন? ভগবান তো তাঁহাকে সবই দিয়াছিলেন। এই বিরাট পৃথিবী—রূপে রসে বর্ণে গন্ধে চির নূতন চির চঞ্চল; মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশ আপন মহিমায় অনির্বচনীয়—ইহারই মাঝে তাঁহার জীবন এমন বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন হইল কেমন করিয়া? নিজের উপর নিজের অসীম ধিক্কার জন্মিল।

হঠাৎ শুষ্ক দোলন চাঁপার গন্ধে নিরঞ্জনবাবু চমকিয়া উঠিলেন। এ গন্ধ যেন তাঁহার কত পরিচিত, ইহার সহিত তাঁহার নিগূঢ় যোগ। পৃথিবীর নানা পরিবর্তনের মাঝেও এই গন্ধ এখনও তাঁহার জীবনের একটি স্মৃতি বহন করিয়া ফিরিতেছে, যে দিনগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া হাহাকার করিলেও যাহাদের একটিকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহাদের দীর্ঘনিশ্বাস যেন এই গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া রহিয়াছে। নিরঞ্জনবাবুর মন কেমন করিয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি আলো নিভাইয়া পূর্বদিকের খোলা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন হেমন্তের শিশিরার্দ্র ম্লান জ্যোৎস্না পৃথিবীর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে, খানিকটা জ্যোৎস্না জানালা দিয়া ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে। এই তো সেই জ্যোৎস্না—তাঁহার স্মৃতির আবেশে জড়িত। ধীরে ধীরে তাঁহার সব মনে পড়িয়া গেল।

জীবনে কেবলমাত্র একজন তাঁহার সমগ্র সত্তাকে নাড়া দিয়াছিল। তাঁহার প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণ তাঁহাকে বারে বারে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাঁহার সকল কাজকর্ম সকল ভাবনা চিন্তার মাঝে সেই একটি ব্যক্তির অদৃশ্য উপস্থিতি তিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারই উপস্থিতি তাঁহার হৃদয় বীণার সকল তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। তখন তিনি ভাবিতেন ইহাই বোধ হয় চরমের আবির্ভাব। সহসা নিজের কাছে নিজের মূল্য কেমন করিয়া বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে সময়ে পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কিছুই ছিল না। মনে হইত একটি সুরের মত তাঁহার জীবনও যেন অসীমের মাঝে ছড়াইয়া পড়িবে।

মেয়েটির হৃদয় স্পন্দন তিনি যেন শুনিতে পাইতেন। কতদিন মনে হইয়াছে দুইজনের মাঝে রহিয়াছে কেবল মাত্র একখানি হাল্কা পর্দা, একটি নিশ্বাসেই হয়ত তাহা সরিয়া যাইবে, তাহার পরে দেখা দিবে দুইজনের জীবনের পরম লগ্ন। অনন্তকালের মধ্যে বিধাতা যেন কেবল তাঁহাদের জন্যই এই লগ্নটি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। সেই শুভ লগ্নটির মাঙ্গলিকের সূচনা দেখা দিয়াছে আকাশে বাতাসে। তখনকার প্রতিদিনের কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রতিদিনের সূর্যোদয় কেমন করিয়া তাঁহার কাছে নূতন নূতন বার্তা আনিত, সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় কেমন করিয়া তাঁহার সমস্ত ভিতরটা রঙীন হইয়া উঠিত, সন্ধ্যাতারা কেমন করিয়া তাঁহার অন্তরে উৎসবের দীপ জ্বালিয়া দিত—এমনি কত কথা। আগেও পৃথিবীতে ঋতু উৎসব চলিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া কোন ঋতুর আবির্ভাব আর কখনও ঘটে নাই। আরও কত ঘটনা। মেয়েটিকে প্রতিদিনই দেখিয়াছেন, কিন্তু প্রতিদিনের দেখা হইতে সে দেখা কত স্বতন্ত্র কত অপরূপ।

কিন্তু বলি বলি করিয়াও বহু দিন পর্যন্ত তিনি মেয়েটিকে মনের কথা বলিতে পারেন নাই। প্রতিদিনই ভাবিয়াছেন আজ বলিবেন; সাহস করিয়া কাছেও গিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ দিয়া কথা বাহির হয় নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার ভয় হইত, হয়ত সবই ভুল সবই মিথ্যা। কতদিন অত্যন্ত সাধারণ কথাও বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়াছেন। গ্রহের কাছাকাছি থাকিয়াও উপগ্রহ যেমন গ্রহের একান্ত নিকটে আসিতে পারে না, নিরঞ্জনবাবুও তেমনি মেয়েটির কাছে আসিয়াও যেন খানিকটা দূরে রহিয়া গেলেন। ঐ সামান্য দূরত্বটুকু আর ঘুচিল না।

নিরঞ্জনবাবু অনেক কিছু আশা করিয়া মেয়েটির কাছে যাইতেন, ফিরিবার সময় তাহার দুই একটি কথার টুক্‌রা, হাসির একটু রেশ, কখনও বা চুড়ির খানিকটা শব্দ কানে লইয়া ফিরিতেন এবং তাহাই থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ে ঢেউ তুলিত। মেয়েটির চোখের সুদূর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাঁহার মন কোথায় উধাও হইয়া যাইত। দমকা হাওয়ায় তাহার লাল রঙের শাড়িখানির ঈষৎ আন্দোলিত অঞ্চল প্রান্ত, তাহার স্নিগ্ধ হাসি, তাহার ধীর মন্থর গতি—এই সমস্ত লইয়া মানস পটে কতদিন কত ছবি আঁকিয়াছেন! মনে পড়ে একদিন ফুলদানির সংস্কার অন্তে মেয়েটি মেঝের উপর ফেলিয়া দেওয়া কয়েকটি শুষ্ক ফুল ও পাতার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল, তাহাদের উপর অনেকের পদধূলি পড়িয়াছে, আর কিছুক্ষণ পরেই ঘরের অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে সেগুলি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে। নিরঞ্জনবাবু এক ফাঁকে সেই ধূলি মলিন শুষ্ক ফুল ও পাতাগুলি কুড়াইয়া লইয়া সযত্নে নিজের পকেটে রাখিয়াছিলেন। সে সময় মেয়েটির দৃষ্টি যেখানে পড়িত সেখানকার ধূলিও নিরঞ্জনবাবুর কাছে অমূল্য হইয়া উঠিত।

নিরঞ্জনবাবু ভাবিতেন হয়ত এমন একদিন আসিবে যেদিন কোন বাধা কোন সংকোচ থাকিবে না, সেদিন নিজের অন্তরের কথাটা তিনি নিঃসংকোচে ব্যক্ত করিতে পারিবেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি এই বিশেষ দিনটির অপেক্ষা করিয়াছেন। একদিন সুযোগ আসিল, সেদিন হেমন্তের ম্লান জ্যোৎস্না পৃথিবীর উপর যেন অপরূপ মায়া রচনা করিয়াছিল। দোতলার পূর্বদিকের বারান্দা চন্দ্রালোকে ভরিয়া গিয়াছে। বারান্দার এক কোণে একটি টবে কয়েকটি দোলন চাঁপা ফুটিয়াছে, তাহাদের গন্ধ মাঝে মাঝে নাকে আসিতেছে, বাতাসে আসন্ন শীতের মৃদু স্পর্শ লাগিয়াছে। নিরঞ্জনবাবু ভাবিলেন, এই তো সেইদিন, এই তো সেই মুহূর্ত। তিনি সংকোচ কাটাইয়া ধীরে ধীরে মনের কথা নিবেদন করিলেন। কি বলিবেন আগে বহুবার মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিবার সময় একটু যেন গোলমাল হইয়া গেল, গলা একটু কাঁপিয়া উঠিল। মেয়েটি নীরবে সব কথা শুনিল।

বলা শেষ হইয়া গেলে নিরঞ্জনবাবু একবার মাত্র তাহার ডান হাতখানি নিজের দুই হাত দিয়া ধরিয়াছিলেন। মেয়েটি নিজের হাতখানি ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া খানিকটা দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। নিরঞ্জনবাবু হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বুঝিলেন তাঁহারই ভুল হইয়াছে। ইহার পরে আর কোন তর্কের প্রয়োজন হয় না, নিরঞ্জন-

বাবুও করেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল, ঘূর্ণায়মান নক্ষত্র যেমন হঠাৎ একটি নক্ষত্রের কাছে আসিয়া অনন্তের মাঝে আবার কোথায় চলিয়া যায় তেমনি করিয়া মেয়েটিও একটিবার মাত্র তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ জীবনে আর তাহাকে নিকটে পাওয়া যাইবে না।

প্রত্যাখ্যানের আঘাত যত বড়ই হউক, নিরঞ্জনবাবু তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, কাহারও নিকট হইতে ভালবাসা যদি স্বতঃউৎসারিতভাবে না আসে সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তর অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিত, সে সময় তিনি নানা কাজের মাঝে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিতেন। স্থির করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র মনপ্রাণ নিজের সমগ্র সত্তা দিয়া একবার যখন ভালবাসিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তখন সেই ভালবাসার অনির্বচনীয় শুভ্রতাটুকু চিরদিন রক্ষা করিবেন। এত বড় সৌভাগ্যই বা কয়জনের হয়?

নিরঞ্জনবাবু আর ভাবিতে পারিলেন না, এমন সুস্পষ্টভাবে তিনি এই দিনগুলিকে আর কখনও তো দেখিতে পান নাই। এতদিনের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া তাঁহার কানে যেন দুই একটি কথার টুক্‌রা, হাসির খানিকটা রেশ আর চুড়ির একটু শব্দ থাকিয়া থাকিয়া বাজিতে লাগিল। জীবনের এই ঘটনা তিনি আর কাহাকেও বলেন নাই। জানালার ধার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আলো জ্বালিয়া তিনি এই কাহিনীই লিখিতে বসিলেন।

মাসখানেক পরের কথা। কাজে নিরঞ্জনবাবু বাহিরে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে ভাবিলেন, মার্তণ্ড পত্রিকার অফিসে খবর লইয়া যাইবেন তাঁহার গল্পটির কি হইল। দোতলায় পত্রিকার অফিস, সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডান দিকে খানিকটা গেলেই সম্পাদকের ঘর। নিরঞ্জনবাবু পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিবেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহার নাম করিতেছে; তিনি ঘরে না ঢুকিয়া খানিকটা সরিয়া দাঁড়াইলেন। একজনের কথা কানে আসিল : 'আমি তোমায় কতদিন বলেচি, আগে ক্ষমতা ছিল গল্প লিখ্‌তেন এখন আর লিখ্‌তে পারেন না। আগের দোহাই দিয়ে এই বাজে গল্পগুলো ছাপ্‌তে হবে? তোমারও যেমন কাজ নেই।' জ্যোতিঃপ্রকাশবাবুর গলা শুনা গেল : 'আরে আমি কি আর ছাই এই সব গল্প লিখ্‌তে বলি? বলেছিলাম, আপনি জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেচেন, তাই বলি এখন ধীরে ধীরে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখেন—আর তাঁর প্রতিও তো আমাদের একটা কর্তব্য আছে।'

নিরঞ্জনবাবু আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া আসিলেন। গেটের কাছে পরিচিত বৃদ্ধ দারওয়ান সেলাম করিল, তাহা নিরঞ্জনবাবুর নজরেও পড়িল না।

বিশ্বের সমস্ত ক্লান্তি যেন আজ তাঁহার সারা দেহমনে নামিয়া আসিয়াছে। আর যেন চলিতে পারিতেছেন না। খানিক দূরে আসিতে একটি পার্ক পাইলেন, তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া গাছতলার একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। আজ তাঁহার শেষ আশ্রয়টুকুও ভাঙিগয়া গিয়াছে। এখন দিনের পর দিন তিনি কেমন করিয়া কাটাইবেন? ভিতরে ভিতরে তাঁহার জীবনে কত বড় মরুভূমি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যেন আজ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার অন্তরে বাহিরে এ কি অপরিপূর্ণতা, এ কি দৈন্য! সমরেন্দ্রজিতের ছবিখানির কথা মনে হইল। পৃথিবী কি সত্যই ঐ রকম? ত্রৈলক্যবাবু, মহেশ্বরবাবু, সমরেন্দ্রজিৎ একে একে সকলের কথা মনে হইল। সকলের জীবনেই তো চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে নিদারুণ বৈষম্য। কাহারও জীবন তো সার্থক নয়!

অন্যের জীবন কাহিনী বা কল্পিত ঘটনা লইয়া তিনি এতকাল লিখিয়াছেন, সে সব গল্প পড়িয়া কত জন মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ যখন নিজের কাহিনী বলিতে গেলেন তখন তাহা নির্মমভাবে উপেক্ষিত হইল। ইহার অপেক্ষা বড় পরিহাস আর কি থাকিতে পারে? পার্কে ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছিল। ভাবিলেন তিনিও যদি এমনি সব ভুলিয়া খেলিতে পারিতেন! কিন্তু ইহাদের খেলাই বা কয়দিন চলিবে। দেখিতে দেখিতে ইহারাও বড় হইবে, ইহাদের জীবন হইতে ক্রমশ সকল হাসি মিলাইয়া যাইবে। ইহারা তো জানে না পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। এখানে না পাওয়াটাই একমাত্র সত্য, পাওয়া সত্যের ব্যতিক্রম। নিষ্পাপ ছেলেমেয়েদের কচি কচি মুখের দিকে চাহিয়া সহসা তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। উত্তর জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট সকল আঘাত সংঘাত হইতে তিনি কি ইহাদিগকে কোনমতেই রক্ষা করিতে পারেন না?

ক্রৌঞ্চী

(৩০০ পৃষ্ঠার পর)

"হুঁ!"

মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলো সুব্রত।—

"এতো ভীড় ওদের পথেঘাটে! একবার তো আর্টগ্যালারীতে আমার মানিব্যাগই তুলে নিলো পকেট থেকে—পনেরো পাউন্ডের একখানা নোট ছিলো তাতে,—পুরো এক মাসের খরচ আমার।"

"হুঁ।"

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলো সুব্রত,—অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তারপর একসময় আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললো, "আজ তা হলে উঠি নীলিমা, আসবো আর একদিন।"

আর যে আসবে না তা সুব্রত এবং নীলিমা দু'জনেই জানে—তবু কথা খুঁজে না পেয়ে সুব্রত বললো, "বাড়িতো চেনাই রইলো......।"

সিঁড়ির নীচে আস্তে আস্তে মিলিয়ে এলো সুব্রতর পায়ের শব্দ, আর বহুক্ষণ স্থাণুর মতো, বজ্রাহতের মতো অপলক দৃষ্টি মেলে বসে থেকে এক সময় শয্যার উপর লুটিয়ে পড়লো নীলিমা, আর তার সুন্দর গৌর দেহ থেকে থেকে অসহ্য কান্নার রুদ্ধ আবেগে মুমূর্ষু সরীসৃপের মত কেঁপে উঠতে লাগলো।

স্পুনারিজমের ইতিকথা

শত্রুঘ্ন রায়

সত্যভামা ব্যাংকের ম্যানেজার ভোলা চাটুয্যের মনের অবস্থা কদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। ব্যাংকে মজুত সোনা রুপো কোথায় যে গেল তার ঠিকানা নেই। আপাতত দেখা যাচ্ছে খালি নোট আর নোট। আপিসে বসে চাটুয্যে নোটের শ্রাদ্ধ করছে মনে মনে, এমন সময় তাঁর বাড়ির চাকর রামশরণ প্রবেশ করল টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে। লুচি সন্দেশ সাজিয়ে দিয়ে রামশরণ প্রস্থান করল। চাটুয্যে হিসাবে মগ্ন, মনে মনে নোটের বাপান্ত করছে। সামনে রয়েছে এক তাড়া নোট। চাটুয্যে আনমনে চিবুতে লাগল আনকোরা এক টাকার নোট। উপেক্ষিত লুচি টেবিলের কোণে শুকিয়ে গেল।



ডক্টর স্পুনার

বৈকালে চাটুয্যে আপিস ফেরৎ গেল নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনে। সেখানে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা। যথারীতি বক্তৃতা আরম্ভ করল চাটুয্যে,—চারদিকে রব শোনা যাচ্ছে নোট আর নোট, কাগজের নোট। লোকের হাততালি ও চীৎকারে চাটুয্যে রেগে বেরিয়ে এল সভা থেকে। বাড়ি ফিরে দেখে ছোট ছেলে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছে,—ক্যাট মানে বেড়াল, ক্যাট মানে বেড়াল, ব্যাট মানে কেড়াল। ছেলের গালে সশব্দে চড় বসিয়ে দিল চাটুয্যে।

চাটুয্যেদের মত কথায় ও কাজে আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি। দুটি পাকা তেল, সরিষার বেল, চিনিপাতা কৈ, ডিমভরা দৈ, ইত্যাদি কথার ওলট পালট আমাদের অনেকের জীবনের ঘটে থাকে। যশুরে কৈ শিশু বিদ্যাসাগরও কশুরে জৈ হয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সকলের ওপর টেক্কা দিয়েছেন ডক্টর স্পুনার। তাঁর নাম থেকে ইংরেজি ভাষায় একটা শব্দই হয়ে গেছে,—স্পুনারিজম। এর অর্থ হচ্ছে,—বক্তার অথবা লেখকের অজ্ঞাতসারে পর পর কথার মধ্যে শব্দের ওলট পালট হওয়া। এক কাপ চা দাও, এর বদলে অনেকেই বলে ফেলে, এক চাপ কা দাও।

স্পুনারের মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁর নাম সারা ইংলণ্ডে প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্পুনারিজম কথাটা তখনই অভিভাষণে স্থান পায়। অবশ্য শব্দের ওলট পালট আমরা সকলেই সময় সময় করে থাকি। এ রকম লোকও আছে যে, ইচ্ছে করেই কথার মধ্যে শব্দের ওলট পালট করে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, এর জন্য শুধু স্পুনারকেই দায়ী করা হয় কেন? আরও মজা হচ্ছে যে, শব্দের যত রকম ওলট পালট হয়েছে, সেগুলি সবই স্পুনারের সৃষ্টি বলে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডক্টর স্পুনার ছিলেন অক্সফোর্ডের নিউ কলেজের ওর্ডেন। তাঁর তেষট্টি বৎসর কর্মজীবনের মধ্যে একটি টার্মেও তিনি অনুপস্থিত থাকেন নি। লোক হিসাবে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁর সারা দেহ ধবল ছিল। চোখের দৃষ্টি ছিল ক্ষীণ। আকৃতিতে তিনি ক্ষুদ্র ছিলেন। গলার স্বর ছিল আশ্চর্য রকম মোলায়েম। তাঁর সেরা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি প্রায়ই কথায় কাজে ও লেখায় অদ্ভুত ব্যাপার করে বসতেন। পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহে বললেন, এ ব্যাপারের মূলে রয়েছে তাঁর মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে গোলযোগ। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এর জন্য কলেজের গুরু কর্তব্য পালনে তিনি কখনও ভ্রষ্ট হন নি।

ডিক্সনারী মতে প্রকৃত স্পুনারিজমের ধার দিয়েও তিনি যান নি। যাহোক একবার তিনি একটা গানের প্রথম লাইন 'Conquering kings their titles take'-এর বদলে 'kinkering congs' বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু স্পুনারিজমের মধ্যে প্রায় সমস্ত পুরাতন কাহিনী অন্যের দ্বারা রচিত হলেও তাঁকেই এদের সৃষ্টিকর্তা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দু'একটা গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার একটা বেড়াল চার তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল। এক ভদ্র মহিলা স্পুনারকে জিজ্ঞেসা করলেন,—তারপর বেড়ালটার কি হল? স্পুনার উত্তর দিলেন,—'Oh, she just popped on drawers and away she went.' তাঁর কলেজে একজন অলস প্রকৃতির ছাত্র ছিল। তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি তাকে বলেছিলেন,—

You have hissed all my mystery lectures, in fact you have tasted two whole worms and you must leave Oxford this afternoon by the town drain.

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জুলিয়ান হাক্সলী স্পুনারের ছাত্র। একবার অকসফোর্ডের ছাত্রদের স্পিজবার্জেনে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। হাকসলী স্পুনারকে বললেন,—জায়গাটা অনেক উত্তরে হলেও আমাদের যাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না, কেননা গালফ্ স্ট্রীমটা ওই জায়গা দিয়েই প্রবাহিত হয়। হাকসলী বিদায় নিলে স্পুনার তাঁর স্ত্রীকে বললেন,—ল্যান্ডস্ এন্ড থেকে স্কটল্যান্ডের উত্তর উপকূলের দূরত্ব আর স্পিজবার্জেন থেকে নর্থ পোলের দূরত্ব প্রায় সমান। আর একবার হাকসলীরা বেজওয়াটার ফার্ম নামক পল্লীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্পুনার মিষ্ট হেসে বললেন,—খুবই অদ্ভুত

ব্যাপার হাক্‌সলী, এই ফার্মটার নাম কিন্তু পিক্কাডিলি। আর একটা ঘটনা। তাঁদের কলেজের একজন ফেলো অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মতামতের অপেক্ষা না করেই কলেজ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারের সিদ্ধান্ত হয়। দু'একদিন পরে স্পুনারের সঙ্গে দেখা হল সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে। কুশল প্রশ্নের পরে স্পুনার বললেন,—আপনার স্বামী কিন্তু কলেজের এই ব্যাপার শুনলে "he'll gnash his tail."

কৃষ্ণমূর্তি ও অ্যানি বেসান্টের ব্যাপার অনেকেরই মনে আছে। সেই কৃষ্ণমূর্তি গেলেন নিউ কলেজে ভর্তি হতে। স্পুনার বললেন—মিস্টার কৃষ্ণমূর্তিও খৃষ্টের নবকলেবররূপে গণ্য হয়েছেন, কাজেই নিউ কলেজে আমরা তাঁকে ভর্তি করতে পারি না। স্পুনার একদিন কোন গ্রামে ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অ্যারিস্টটল সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বসলেন। বক্তৃতা শেষে প্ল্যাটফোরম থেকে নেমে আসছেন, এমন সময় কি মনে হল আবার উপরে উঠে বললেন,—আমার একটু গোলমাল হয়েছে। আমার বক্তৃতায় যেখানে অ্যারিস্টটলের নাম আছে সেখানে হবে সেণ্ট পলের নাম।

স্পুনারের লেখাতেও এরকম গোলমাল হয়ে যেত। হাকস্‌লীর এক ছাত্রের নাম ছিল উইলসন। তিনি যখন নিউ কলেজের টিউ-টর, সেই সময় উইলসন স্পুনারকে চিঠি লিখে জানাল সে তার টিউটরের কাছে পড়াশুনো করতে চায়। স্পুনার উইলসনকে উইলফোর্ড বলে সম্বোধন করে জানিয়েছিলেন,—তুমি বাড়িতে থেকে তোমার বাবার কাছে পড়াশুনো করলেই ভাল হবে। সময় সময় লেখার ভুল তাঁর নজরে পড়ত এবং তখনি কেটে দিতেন। একবার তিনি একজনকে চিঠি লিখে শেষ করলেন yours very poorly বলে। অবশ্য তখনি কেটে truly কথাটা বসিয়ে দিলেন। কখন কখন তাঁর কাজের মধ্যে স্পুনারিজমের ছায়া পড়ত। অকস্‌ফোর্ডের কোন অধ্যাপক পত্নী স্পুনারদের বাড়িতে একবার নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন। খাওয়া শেষ করে এক কাঠের পালিশ করা সিঁড়ি দিয়ে তিনি নেমে যাচ্ছেন, এমন সময় স্পুনার বললেন—একটু অপেক্ষা করুন; ও সিঁড়িটা বড় পিছল, আমি আপনাকে সিঁড়ি পার করে দিচ্ছি। এই না বলেই স্পুনার সিঁড়িতে যে একটি মাত্র আলো জ্বলছিল সেটি নিভিয়ে দিলেন। সৌভাগ্যবশত তাঁর মেয়ে সেখানে থাকাতে কোন দুর্ঘটনা হয়নি।

স্পুনারের এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে স্পুনারিজম কথাটা ১৮৮৫ সালে অকস্‌ফোর্ডে চলিত হল এবং ১৯০০ সালের আগেই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। স্পুনার সম্বন্ধে শত শত গল্প প্রচলিত আছে। একবার দক্ষিণ লণ্ডনে কোন হোটেলে একজন লোকের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন। দিনের শেষে তিনি ত ফিরলেন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে। তার ওপরে লোকটির খোঁজ পান নি। শেষে জানা গেল, তিনি গ্রীনিজে ডান ম্যান নামক হোটেলের খোঁজ করছিলেন। আসলে হোটেলটির নাম ও অবস্থান হচ্ছে গ্রীনম্যান, ডালিজ। আর একটি গল্পে ডক্টর স্পুনারের অসহায় ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অধ্যাপকের টুপি উড়ে গেছে ঝড়ো হাওয়ায়। তিনি পেছন পেছন ছুটছেন আর বলছেন—oh, please, will nobody pat my hiccup! একবার অকস্‌ফোর্ডে এক চশমা-বিক্রেতার দোকানে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস কিনতে গিয়ে তিনি চেয়ে বসলেন সিগনিফায়িং গ্লাস।

স্পুনার নিজেও তাঁর খ্যাতির কথা জানতেন। একবার তিনি কলেজে এক রি-ইউনিয়নের বক্তৃতা এই বলে শেষ করলেন,—আমার এখন কথা শেষ করাই ভাল। আর বেশী বললে আমি হয়ত ভুল করতে আরম্ভ করব। চারদিকে হাততালির ধুম পড়ে গেল।

একটা সত্য ঘটনা বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব। নিউ কলেজের কোন উৎসবে স্পুনার আর একটি কলেজের প্রেসিডেণ্টকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে সকলেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। যা হোক প্রেসিডেণ্ট ত অনেক পরে এলেন। এসেই স্পুনারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সকলেই আশা করছিল,—স্পুনার বলবেন, গুড্ ইভনিং প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু তিনি বলে বসলেন—গুড্ বাই ওর্ডেন। আমরাও এখানে তাঁর কাছে বিদায় নিচ্ছি। তাঁকে ধন্যবাদ যে, পৃথিবীর হাস্যরসের খোরাক তিনি অনেকখানি যুগিয়ে এসেছেন এবং পূর্বোক্ত ভোলাবাবু স্পুনারিজমের দোহাই দিয়ে নিজের বিসদৃশ আচরণের ওজর দিতে পারবেন।



ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক মেদিনীপুর হোরখালি কেন্দ্রে বন্যাপীড়িতদের চাউল ও বস্ত্র বিতরণ

বাঁকাস্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

২

ইহার ছয় মাস পরে হঠাৎ টাইফয়েড রোগে একুশ দিন ভুগিয়া বাবা ইহধাম ত্যাগ করিলেন আর আমি আমার একমাত্র এবং শেষ-আশ্রয় এই জ্যাঠাইমার কাছে আসিয়া উঠিলাম। ভগবান যাহাকে মারেন তাহার আর উপায় কি!

বাবার চিকিৎসায় নাকি বহু টাকা ঋণ হইয়া গিয়াছিল। তাই জ্যাঠামশায় আমাদের ঘরের আসবাবপত্র—খাট, বিছানা, গালিচা, টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় যেদিন আমায় সঙ্গে লইয়া দেশের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেদিনের কথা মনে হইলে আজও আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে।

হাওড়া জেলার এক অতি নিভৃত অঞ্চলে এই স্থানটি। হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চাপিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে আমরা একটি স্টেশনে গিয়া নামিলাম। স্টেশন উহাকে বলা চলে না শুধু মাটীর উপর ঈষৎ উঁচু খানিকটা জমি, তাহাতে ছোট্ট একটি টিনের ঘর ও গোটা কতক আলোর খুঁটি পোঁতা, তাহার একটিতে মাত্র আলো আছে। একটি বাবু এবং একটি কুলি গাড়ি আসিবার সময় স্টেশনে উপস্থিত হয় তারপর গাড়ি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাবুটি কোথায় অন্তর্ধান হন, কুলীটি তখন সেখানকার যাবতীয় কাজ চালায়। স্টেশনের ঠিক পিছনে তাহার একটি চালাঘর, ঘরের সম্মুখে বাঁশের খুঁটিতে একটি ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। মেদি গাছের বেড়ার মধ্যে ঈষৎ ফাঁক, তাহারি ভিতর দিয়া তাহার যাতায়াতের পথ।

মাত্র আমরা দুইটি প্রাণী স্টেশনে নামিলাম। আর কোন যাত্রী সেদিন ছিল না। জ্যাঠামশায়কে দেখিয়া স্টেশন মাস্টার প্রশ্ন করিলেন, এই যে ডাক্তারবাবু, কতদূরে গিয়েছিলেন? এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে, আমার জ্যাঠামশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। পাশ করা নহেন—ঘরে বই পড়িয়া শিখিয়াছিলেন। বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করিতেন বলিয়া রোগ যত ভাল হউক বা না হউক নামডাক হইয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশী। যাহা হউক স্টেশন মাস্টারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যখন বলিলেন,—কলিকাতায়। তখন আবার প্রশ্ন হইল—কেন কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায় এইবার বাবার অসুখ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী ত বলিলেনই উপরন্তু আমার জন্ম—মায়ের মৃত্যু হইতে শুরু করিয়া সেইদিন পর্যন্ত আমাদের পারিবারিক অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৎক্ষণাৎ দিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিস্তার পাইলেন না। শেষে মাস্টার মহাশয় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি টাকাকড়ি বাবা রাখিয়া গিয়াছেন—তখন তিনি এই কথাটি বলিতে ভুলিলেন না যে, আমার বাবা টাকাকড়ি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে আমাকে অসহায় অবস্থায় তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছেন। তিনি সেই সঙ্গে আরো বলিলেন, সে আমায় দেখতো না বলে আমি ত আর সত্যি সত্যি ভাইপোটাকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারবো না? আমার কর্তব্য আমি করে যাবো তাতে লোকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক, কি বলো ভায়া?

স্টেশন মাস্টার তখন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নিশ্চয়ই—সে কথা আবার বলতে?

জ্যাঠামশায় তখন টিকিট দুখানি তাঁহার হাতে দিয়া লাইন ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ডানদিকে বাঁকিলেন। দেখিলাম, অদূরে চালাঘরে একটি দোকান দেখা যাইতেছে। তাহাতে দড়ি দিয়া ঝোলান একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। সামনে বাঁশের তৈয়ারী একটি বেঞ্চি, তাহাতে দুইটি লোক বসিয়া বেঁটে ও মোটা কাঁচের গ্লাসে করিয়া চা খাইতেছে। আমি মনে করিয়াছিলাম—উহা বোধ হয় চায়ের দোকান, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম উহার একধারে রহিয়াছে মুড়ি মুড়কি ও বাতাসা, তাহার সহিত একটা কাঠের ছোট বারকোশে সকালের ভাজা গোটাকয়েক বেগুনি ও আলুর চপ। পিছনে একটা ছোট আলমারী তাহার কোনটার কাঁচ ভাংগা, কোনটার বা কাঁচ আছে, কোনটা আবার কাগজ দিয়া জোড়া। ইহার ভিতর থালায় করিয়া সাজানো রহিয়াছে, গজা, জিলিপী ও ছানাবড়া প্রভৃতি ঘিয়ে ভাজা খাবার। আবার দোকানী যেখানে বসিয়া আছে তাহার ঠিক পিছনে একটা কাঁচ দেওয়া টিনের কৌটার মধ্যে কতকগুলো বিড়ির বাণ্ডিল ও আর একটা কৌটায় কতকগুলো হাঁসের ডিম। সামনে একটা থালা সাজা পান রহিয়াছে, তাহার উপর একটা খয়ের-এর দাগ লাগা ভিজা ন্যাকড়া ঢাকা দেওয়া এবং সেই থালার এক কোণে একটা সিগ্রেটের কৌটা।

জ্যাঠামশায় সেখানে যাইয়া বলিলেন, দেখি হরি এক পয়সার বিড়ি দাও ত?

হরি বিড়ি দিবার আগেই প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়াছিলেন ডাক্তারবাবু?

জ্যাঠামশায় আবার একে একে বাবার অসুখ হইতে আরম্ভ করিয়া আমার আসিবার কারণ পর্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন। তিনি বোধকরি অনুমান করিয়াছিলেন, ইহাকেও শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া লাভ নাই, আবার সে একে একে সমস্ত কথা না শুনিয়া ছাড়িবে না—তাই পূর্বাহ্ণে সতর্ক হইলেন। তারপর একটা বিড়ি জ্বলন্ত নারিকেল দড়ির আগুন হইতে ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, টাকাকড়ি ত এক পয়সাও রেখে যেতে পারেনি, উল্টে আমার ঘাড়ে এই ভাইপোটাকে চাপিয়ে গেছে। ভাই আমায় দেখতো না তা-বলে আমি ত আর এই দুধের শিশুকে ভাসিয়ে দিতে পারি না? আমার ত একটা কর্তব্য আছে, তাতে লোকে যা ইচ্ছে বলুক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। তারপর একটু থামিয়া বিড়িতে একটা টান দিয়া বলিলেন, তুমি কি বল হরিচরণ?

আজ্ঞে সে কথা একশো বার। এই বলিয়া সে আবার পানে চূণ লাগাইতে মনোযোগ দিল।

সেই দোকানের পাশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া যে মেটে পথটি গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটা চালা ঘরের সামনে গিয়া তিনি ডাকিলেন—শিবু বাড়ি আছো?

আজ্ঞে আছি—বলিতে বলিতে হুঁকা হাতে করিয়া একটি বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল তারপর জ্যাঠামশায়কে দেখিয়া বিনয়াবনত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আজ্ঞে ডাক্তারবাবু যে—এ সময় কোথা থেকে আসছেন?

তিনি বলিলেন, কলকাতা থেকে।

ব্যস, আর নিস্তার নাই, আবার শুরু হইল একই রকমের প্রশ্ন, ঠিক পূর্বের মত কেন, কি বৃত্তান্ত, কবে গিয়াছিলেন, কি রোগ হইয়াছিল, এখন আমার কি অবস্থা হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি অসম্ভব কৌতূহল প্রত্যেকটি লোকের,—একটা দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা থামে না। জ্যাঠামশায়ও সকল প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিয়া শেষে ইহা উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না যে, আমার বাবা একটি পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, আমাকে একেবারে জলে ভাসাইয়া গিয়াছেন। আমার সামনে, বার বার এই কথাটি বাহিরের লোককে বলিতে শুনিয়া আমার মনটা কেমন হইয়া গেল।

সব কথা শুনিয়া তখন শিবু বলিল, আজ্ঞে গাড়ি চাই কি?

শিবু গরুর গাড়ির গাড়োয়ান—তাহার দুই পুরুষের এই ব্যবসা। জ্যাঠামশায় বলিলেন, হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে শিবু, সন্ধ্যে হয়ে গেল—ছেলেমানুষ, সমস্ত দিন না খেয়ে আছে।

ততক্ষণ একটু তামাক ইচ্ছে করুন বলিয়া শিবু হুঁকা হইতে কলিকাটি খুলিয়া জ্যাঠামশায়ের হাতে দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে শিবু গলায় ঘণ্টা বাঁধা এক জোড়া বলদ লইয়া আসিয়া বাহিরের বাতাবী লেবু গাছের তলায় যে গাড়িটা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে জুড়িয়া দিল, তারপর কালীপড়া এক প্রকার কেরোসিন তৈলের ল্যাম্প গাড়ির নীচে ঝুলাইয়া আমাদের লইয়া মাঠের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। গরুর গলার ঘণ্টার ধ্বনি সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুক মন্থন করিয়া চলিতে লাগল। আমি কান পাতিয়া সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে চলিলাম। বাহিরে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু অন্ধকার—রাশি রাশি অন্ধকার—মাঠে গাছ-পালা জঙ্গল খানা ডোবা পুষ্করিণী সব যেন মসীলিপ্ত একাকার বলিয়া আমার মনে হইতে লাগল।

রাত্রি প্রায় দশটা হইবে আমরা গিয়া বাড়িতে পেঁৗছিলাম। জ্যাঠাইমা আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিও তারস্বরে ইহাতে যোগদান করিল। তারপর আমি যত কাঁদিলাম তাহার সহস্র গুণ বেশী তিনি কাঁদিলেন। আমার বাবার নাম করিয়া কাঁদিলেন, আমার মায়ের নাম করিয়া কাঁদিলেন, আমার ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা এমনি তিনি এই বংশে তিনি বধূ বেশে প্রবেশ করিবার পরে ও আগে যাঁহারা যাঁহারা পরলোক-গমন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম করিয়া পৃথক পৃথকভাবে কাঁদিলেন। আমার শোক দেখিয়া বোধকরি তাঁহাদের সকলের জন্য একই সঙ্গে জ্যাঠাইমার শোক উথলাইয়া উঠিল।

এই সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশী পুরুষ ও স্ত্রীলোক বৃদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত আসিয়া সেই রাত্রে আমাদের বাড়িতে ভীড় জমাইয়া তুলিল। উঠানে, রান্নাঘরের দাওয়ায়, ঘরে বাইরে, লোকে লোকারণ্য! জ্যাঠাইমা উঠানে বসিয়া মর্মভেদী চীৎকার করিতেছেন আর তাহারা সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার শোকার্ত ও করুণ অঙ্গভঙ্গী দেখিবার জন্য কিংবা তিনি উহাদের দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন বলিয়া—তাহা যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারাই জানে।

জ্যাঠামহাশয়ের তখন নির্বিকার ও নির্লিপ্তভাব। ভাবালস ডাগর দুইটি চোখে দার্শনিকের দৃষ্টি—তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। যেন এই সংসার, ইহার মায়া মমতা, স্নেহ বন্ধন, সুখ দুঃখ সকলই তাঁহার কাছে বৃথা—তিনি সকলের ঊর্ধ্বে। এক হাতে তিনি আমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন। আমি কাঁদিতেছিলাম তাঁহার বক্ষের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া। তিনি সাধারণ ব্যক্তির মত কোন সান্ত্বনা, কোন উপদেশ আমাকে দেওয়ার বৃথা চেষ্টা না করিয়া বরং চুপ করিয়া থাকাই তখন তাঁহার কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন—কেন জানি না।

শুধু মনে পড়ে জ্যাঠাইমা যখন বহুক্ষণ পরে একবার কাঁদিয়া উঠিলেন, 'তোমার আলোককে কোথায় রেখে গেলে গো' বলিয়া, তখন কে একজন আসিয়া আমায় লইয়া গিয়া তাঁহার কোলের মধ্যে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, এই ত তোমার আলো—তোমার ছেলে এই নাও বড়বৌ।

জেঠাইমা তখন আমায় বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া উচ্চতর স্বরে আর একবার কাঁদিয়া উঠিয়া চুপ করিলেন। জেঠাইমার বুকে স্থান পাইয়া কিনা বলিতে পারি না—আমিও তখন সজোরে কাঁদিয়া উঠিলাম।

তিনি আমার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, ভয় কি বাবা, আমি যে তোমার মা।

এই সময় একটি ছেলে আসিয়া জেঠাইমার কাছে সিন্দুকের চাবী চাহিল। জেঠাইমা কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে, কোন প্রশ্ন করিলেন না—শুধু একবার জ্যাঠামশায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। জেঠাইমা তখন সেই চাবীটি কোমরে-বাঁধা একটি কালো সুতা হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। ছেলেটি ক্ষিপ্রগতিতে উহা লইয়া গিয়া জ্যাঠামশায়ের হাতে দিল। তিনি চাবীটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উদাসমুখে বাহিরে আসিয়া বসিলেন।

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, দুই-একজন তাঁহার কাছে গিয়া সহানুভূতি দেখাইবার জন্য অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, আহা ছোট ভাই তো নয় যেন লক্ষ্মণ! কি করবে বলো বাবা সংসারের এই নিয়ম! এ-শোক যে তোমার বুকে সবচেয়ে বেশী লাগবে, তা কি আর বলে দিতে হবে।

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর সহসা একটু নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা টাকাকড়ি কত রেখে গেছে তোমার ভাই কালীচরণ?

জ্যাঠামশায় করুণকণ্ঠে বলিলেন, রাখা দূরে থাক, আমার পর্যন্ত কিছু ধার হয়ে গেছে।

আহা-হা তা তো হবেই—তুমি কি তার তেমন ভাই—আমরা কি আর জানিনা সেকথা; বলিতে বলিতে একে একে সবাই প্রস্থান করিল।

৩

আমার যে কি অবস্থা হইল, তাহা বোধকরি না-বলিলেও কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। ছিলাম শহরে শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে, পিতৃস্নেহে গুঞ্জরিত সুন্দর এক আবেষ্টনীর মধ্যে। সেখানে দেখিতাম সুন্দর মানুষ, শুনিতাম তাহাদের মুখের সুন্দর কথা, সাহেবি স্কুলে পড়িতাম, সুসজ্জিত সাহেবি পাড়ায় বাস করিতাম; সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া আমার দিন কাটিত। এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া আমার শৈশব ও বাল্যের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত যাহার মধ্যে থাকিয়া রস আহরণ করিতে করিতে অঙ্কুর হইতে যেমন বৃক্ষোদ্গম হয়, তেমনি-ভাবে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপের মত কোথা হইতে আসিল আমার জীবনের কালরাত্রি; চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম—এ আমি কোথায়? চমকিয়া উঠিলাম যেন এক দুঃস্বপ্ন হইতে। ঘোর পল্লীগ্রাম। চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল—বাঁশ, তেঁতুল ও শ্যাওড়া গাছই বেশী। বড়-ছোট অসংখ্য পুষ্করিণী—কচুরীপানা ও কলমীদলে ভর্তি! কোথাও ভাঙ্গা সানের ঘাট, কোথাও-বা পুকুরে জল নাই, কোথাও-বা পানা পচিয়া পুকুরের জল সবুজবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাঙ্গাচোরা পথ খানিকটা মাঠের ওপর দিয়া—খানিকটা বা বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়া চলিয়া গিয়াছে। লোকজন অধিকাংশই দরিদ্র ও ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট—

তাহাদের কথা বলিবার ভঙ্গী অত্যন্ত বিশ্রী, জামাকাপড় যেমন ময়লা, তেমনি রুচিহীন, ঘর-দোরের কোন শ্রী নাই, আসবাবপত্রও ছন্দহীন। মোট কথা, আমার কাছে সেই আবহাওয়াটা অত্যন্ত কুৎসিত ও অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

জ্যাঠামশায়ের বাড়িটা আরও বিশ্রী—দিনরাত সে আমার চোখে পীড়া ত দিতই উপরন্তু আমার মনকে সর্বদা ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত।

বহুদিনের প্রাচীন একতলা বাড়ি। বাহিরের দেওয়ালগুলো নোনা লাগিয়া অর্ধেক খাইয়া গিয়াছে, তাহারি মধ্যে স্থানে স্থানে কাঁচা গোবর চাপড়াইয়া ঘুঁটে দেওয়া—ঘরের ভিতরে বালিকাম, চূণকাম বোধ-হয় করা হইয়াছিল প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে—দেওয়াল হইতে বালি উঠিয়া গিয়া ইঁট দেখা যাইতেছে, কোথাও-বা মরুভূমির মাঝে ওয়েসিসের মত একটু একটু বালির চাপড়া জাগিয়া আছে, তাহারি উপর শিবদুর্গা ও কালীর ছবি টাঙ্গানো। ছাদ হইতে কয়েকটা টালি ঝুলিয়া পড়িতেছে. বহুদিনের পুরাতন আলকাতরা মাখানো কাঠের কড়ি-বরগায় উই লাগিয়া পুরাতন ঘায়ের মত ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ঘরের মেঝেয় যে সিমেণ্ট এককালে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য দুই-একটি জায়গায় এখনো রহিয়াছে, বাকি সমস্ত মেঝেটা উঁচু-নীচু ও অসমতল। ছোট ছোট গবাক্ষ—ঘরের ভিতর ভালো করিয়া আলো-বাতাস খেলে না। বহুদিনের পুরাতন তক্তপোষ ঘরে ঘরে পাতা তাহার উপর তদোধিক পুরাতন শয্যা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাঁথা, ছেঁড়া শতভালি দেওয়া লেপ ও তৈলাক্ত বালিস তাহাদের আবার অধিকাংশের ওয়াড় নাই, যাহার আছে, তাহাকেও চেনা শক্ত।

এই রকম একটি ঘরে আমি শুইতাম—কেলো, ভুতো, পেঁচো, ও পচার সঙ্গে একত্রে। ইহারা সকলেই জ্যাঠামশায়ের ছেলে। ভুতো আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়, কিন্তু পড়িত আমারই সঙ্গে একই ক্লাশে। তাহাদের বয়সের তফাৎ ছিল খুব কম। ছেলে ও মেয়ে জ্যাঠামশায়ের দশটি। শুনিয়াছিলাম, আরো দুই-তিনটি ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়াছে। চারটি ছেলে ও মেয়ে ছয়টি তখনো সুস্থশরীরে বর্তমান। মেয়েগুলির নাম খেঁদি, পাঁচী, ভূতি, আন্নাকালী প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, মেয়েগুলি তাহাদের মায়ের মত আকৃতি-প্রকৃতি পাইয়াছিল। ইহারা সকল সময় আমায় ঘিরিয়া থাকিত, কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না। তাহাদের কথাবার্তা, তাহাদের ভাবভঙ্গী, তাহাদের আচার-ব্যবহর আমার আদৌ ভাল লাগিত না। আমাকে তাহারা তাহাদের অন্যান্য ভায়েদের মত করিয়া পাইতেছে না বলিয়া জ্যেঠাইমার নিকট নানারূপ প্রশ্ন করিত। জ্যেঠাইমা অমায়িক-ভাবে তাহাদের সে প্রশ্নের জবাব দিতেন বটে, কিন্তু তাহার ভিতরে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকিত, তাহা আমায় অহরহ দগ্ধ করিত, আমি বড়-লোকের ছেলে বলিয়া তাহাদের মনে মনে ঘৃণা করি—ইহাই তাঁহার কথার মূল তাৎপর্য ছিল। যেমন সকালে উঠিয়া সকলের সঙ্গে আমিও পান্তাভাত খাইতে বসিতাম, কিন্তু তাহাদের মত অত খাইতে পারিতাম না বলিয়া জ্যেঠাইমা বলিতেন 'ও বড়-মানুষের ছেলে এসব কি ওর মুখে রোচে—ওর বাবা ওকে কত সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়াত!'

লজ্জায় আমার ঘাড় হেঁট হইয়া যাইত এবং ছেলেমেয়েগুলি সবাই তখন আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। আমি অশ্রুসংবরণ করিতে করিতে প্রাণপণে পান্তাভাত আরো ঠাসিয়া গিলিতাম।

রাত্রে শুইবার সময় কোন কোনদিন মেয়েগুলি বায়না ধরিত, আমার কাছে শুইবার জন্য, জ্যেঠাইমা তখন তাহাদের বলিতেন, 'ওর যে সুন্দর চেহারা, তাই তোদের মত কুচ্ছিৎ বোনেদের নিয়ে শুতে ঘেন্না করে!'

ইহা শুনিয়া দুঃখ ও অভিমানে আমার বক্ষ ফাটিয়া যাইত, কিন্তু তবুও মুখে কোন প্রতিবাদ না করিয়া সব হজম করিতাম। ইহা ছাড়া অন্য কিছু করিবার উপায়ও আমার নিকট আর ছিল না। তাই মনে মনে শুধু সহ্য করিবার শক্তি ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতাম।

তাহার পরের অবস্থা না বলাই ভালো। ছোট ছোট ভাইবোনদের লইয়া সেই মলিন বিছানায় ছারপোকার কামড় সহ্য করিয়া শুইয়া থাকিতাম। রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসিত না, আসিত অশ্রু। ভগবানের নিকট তখন মনে মনে প্রার্থনা করিতাম, হে ঈশ্বর, এর চেয়ে আমার মৃত্যু হলো না কেন?

মানুষকে আমি ঘৃণা করি না, তবে তাহাদের কদর্যতা, কুশ্রীতা প্রভৃতি আমি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতাম না। ক্রমশ

সম্মুখের পথ

তারাকুমার ঘোষ এম-এ, বি-টি

(১)

এ ধরণীর পরে তোর হ'ল না ক স্থান,
তাই বলে করিবি ক্রন্দন? অপমান,
সেই হবে একমাত্র তিমিরে সম্বল?
ওরে অন্ধ মন, তুই মোছ অশ্রুজল।
সম্মুখ সমরে তোরে যে করে আহ্বান,
তারে দে সম্মুখ রণ, পৌরুষের মান।
পশ্চাতের দ্বার তোর নহেক শরনী।
সম্মুখের টানে ভাসি যাইবে তরণী।
দুই পার্শ্বে স্রোত তার আহ্বানিবে তো'র
হ'তে কর্ণধার; পারিস রাখিতে ধরে
যদি হালখানি, তা হলে এ দুঃসময়,
একান্ত সহায় হয়ে দিবে তোর জয়।
আঁধার মিলাবে ক্রমে আলোকের কূলে।
তুই বীর, রাখ তারে সর্বোপরি তুলে।

(২)

ওরে সদা তোর বুকে সত্যের আশ্রয়।
কেন তবে বজ্রপাতে এত আজ ভয়?
আগুনের মাঝে তোরে হ'বে যে ঝাঁপাতে;
যখন রণের ভেরী মেদিনী কাঁপাতে
শত লক্ষ অনিমেষ রুক্ষ আঁখি নিয়ে
করিবে সুষমা পান, এই বুক দিয়ে
অনায়াসে জয় করি যেতে হবে মেতে।
যদি না পারিস কভু সেইভাবে যেতে
তোরে সবে দিবে যে ধিক্কার। তাই আজি
তোর তরে ধরা আছে অপরূপে সাজি।
ওঠ জেগে আয় ছুটে সম্মুখের পথে।
দেখ দেখি যায় কেবা ও কণক রথে
বিজয় গৌরবে। সে যে একমাত্র তুই
তোর তরে আজো ফোটে জাতি-বেলা-যুঁই।

জাপানী চিত্রাক্ষর

শ্রীপণ্ডিত

বহু শতাব্দী যাবৎ জাপান ছিল এক অজ্ঞাত দেশ। একমাত্র চীন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে জাপানের পরিচয় বা যোগাযোগ একশ' বছরের বেশী নয়। এমন কি, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিও সেখানে ছিল মধ্যযুগীয় রীতিনীতি এবং অদ্ভুত এক সমাজ-ব্যবস্থা। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জাপান সম্পূর্ণ-ভাবে ইউরোপীয় রীতিকে অনুকরণ করেছে। ১৯০০ খৃঃ অব্দে জাপানের দিকে তাকালে ইউরোপের কোন উন্নত দেশ থেকে উহার পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু চীনের সাথে জাপানের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে। সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য এবং লিখনপদ্ধতিকেও জাপান চীন থেকেই গ্রহণ করেছে। আর বাকি যা কিছু—জাপান গ্রহণ করেছে ইউরোপ থেকে এবং তাও বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই।

জাপানীদের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় সমস্তগুলি চিত্রাক্ষরই তারা নিয়েছে চীনাদের কাছ থেকে। অবশ্য, অন্যান্য ভাষারও কিছু কিছু শব্দ জাপানী ভাষায় প্রবেশ করেছে। বর্ত-মান যুগে নির্ভেজাল ভাষার কথা চিন্তা করাও নিরর্থক। ইংরেজী বর্ণমালায় ২৬টি অক্ষরই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু জাপানী ভাষায় চিত্রাক্ষরের সংখ্যা হল ২৫ হাজার—আবার প্রত্যেকটি অক্ষর বিশেষ কোন জিনিস বা বিশেষ কোন ভাবের প্রতীক। বাঙলা বা ইংরেজী বর্ণমালার সামান্য সংখ্যক বর্ণ নিয়ে যাদের কারবার, তারা এই বিরাট সংখ্যা দেখে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হয়ে উঠবেন। সে জন্যই বোধ হয়, জাপানী ভাষা সম্পর্কে আগ্রহ সত্ত্বেও এত কম লোক জাপানী ভাষা জানে। কিন্তু জাপানীরা পরমানন্দে এই দীর্ঘ বর্ণমালার বোঝা বয়ে চলে। শুধু কি তাই? তাদের সমস্ত সরকারী কাগজপত্রে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ভাষারই কদর দেখা যায়। সাধারণত দেখা গেছে, জাপানের পণ্ডিত ব্যক্তিরা কুড়ি হাজার অক্ষরের ব্যবহার করে থাকেন। সংবাদপত্রে অন্ততঃ আট হাজার রকমের "টাইপ" ব্যবহার হয় এবং সাধারণ লোকের প্রতিদিনকার কাজেকর্মে অন্তত ছয় হাজার চিত্রাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত থাকতে হয়। চিত্রাক্ষর ছাড়াও জাপানীরা আরও এক প্রকার প্রতীকের আমদানী করেছে তাদের ভাষায়। এগুলিকে বলা হয় "কণা"। চিত্রাক্ষরের সঙ্গে এই সব প্রতীক যোগ করে শব্দ তৈরী হয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝা যাবে।

চীনা অক্ষর "হি"র মানে হল আগুন এবং "কো"র মানে হল "সন্তান"। এর মধ্যে "কণা" সম্বন্ধকারক "নো" বসালে শব্দটা হবে "হিনোকা"—মানে "আগুনের সন্তান", অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা Spark.

御間違い日本語

এতগুলি চিত্রাক্ষরকে যদি আয়ত্ত করা সম্ভবপরও হয়, কিন্তু উচ্চারণের সমস্যা আরও জটিল। প্রত্যেকটি চিত্রাক্ষরের অন্তত ১৪ রকমের বিশুদ্ধ উচ্চারণ-ভঙ্গী আছে। একটি বাক্য বা বাক্যাংশকে দু থেকে দশ রকম কায়দায় লেখা যায়।

জাপানীদের এই শব্দের সঙ্গে আবার প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। পেন্সিল, ছড়ি বা বেত সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রত্যয় ব্যবহার করতে হবে, "হন" (মানে বৃক্ষ-কাণ্ড), মোটরগাড়ি বা অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় "দাই" এবং জন্তু সম্পর্কে ব্যবহার হয় "হিকি" প্রত্যয়। এ সকল প্রত্যয় ব্যবহারে একটু এদিক-ওদিক হলে সমস্ত বক্তব্যটাই ওলট-পালট হয়ে যায়। সামাজিক নিয়মপদ্ধতির গুণে তাদের ভাষাও অনেকটা প্রভাবিত হয়েছে। এটা অবশ্যি অস্বাভাবিক কিছু নয়। "আমি দেখেছিলাম"—জাপানী ভাষায় অনুবাদ হবে, "মিমাসিত", কিন্তু "তুমি দেখেছিলে"—"গোবান নাসাই মাসিতা"; সরল ভাষায় শেষোক্ত কথাটির মানে হয়—'তুমি দয়া করে তাকিয়েছিলে'। ব্যক্তির নামের সঙ্গে সর্বদাই "সান" (সম্মানিত) শব্দটি ব্যবহার হবে, কিন্তু নিজের নামের সঙ্গে কখনও তা ব্যবহার হবে না। "ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট" নামটি জাপানী ভাষায় লেখা হবে—'ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সান'। এ ছাড়া বহু বিশেষ্যপদের সহিত "ও" প্রত্যয় ব্যবহার হয়। ও ইউ, ও চা, ও নাকা ইত্যাদি। বন্ধু-পত্নীর কথা বলতে হলে জাপানীরা 'ওকুসান' (honorable hidden one) শব্দটির ব্যবহার করে, কিন্তু স্বীয় পত্নীর কথা বলতে হলে বলবে, কানা-ই (person within the house)। কাউকে অপদস্থ করতে হলে "ও" প্রত্যয় এবং "সান" শব্দ বর্জন করতে হয়। কিন্তু সম্মান দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ আবার সান শব্দটি দুবারও ব্যবহার করেন। কতকগুলি বিদেশী শব্দ জাপানীরা সামান্য কিছু অদল-বদল করে ব্যবহার করেন। ইংরেজী "টাইপিস্ট" শব্দ জাপানীতে দাঁড়িয়েছে taipisto; রেডিও শব্দটার জাপানী রূপ rajio। অবশ্য এভাবে বিদেশ



ইংরেজী love (ভালবাসা) শব্দটির জাপানী চিত্রলিপি। "হৃদয়" বং "বলা"র চিত্রাক্ষর যুক্ত হয়ে "ভালবাসা"র চিত্রাক্ষর গড়ে তুলেছে। আবার বাক্য" শব্দটি এসেছে অপর কয়েকটি চিত্রাক্ষর সংযুক্ত করে। উদাহরণ বরূপ বলা যেতে পারে, মুখ+মুখ-খোলা (mouth open) যুক্ত হয়ে তরী হয়েছে বাক্য বা word (mouth Saying).

থেকে আমদানী শব্দের সংখ্যা জাপানীতে খুবই কম। যতটা সম্ভব, অনুবাদ করেই জাপানীরা শব্দের ব্যবহার করে থাকে।

আলাপ-আলোচনাকালে প্রশ্নের জবাব দেবার ব্যবস্থাটা একটু কৌতূহলপ্রদ। কোন জাপানীকে যদি প্রশ্ন করা হল, "আপনি আজ কাজে বেরোবেন না?" তাহলে তিনি "না" বলবেন যদি সত্যই তিনি কাজে বের হন ; এবং "হাঁ" বলবেন—যদি তাঁর বাইরে যাবার ইচ্ছা না থাকে। প্রশ্নের মধ্যে "না" বা No থাকাতেই এ ধরণের জবাব দিতে হয়। তাঁর "না" বলবার অর্থ এই যে,—"আপনার না-সূচক প্রশ্ন ঠিক হল না। আমি কাজেই যাচ্ছি।" আবার যখন তিনি "হাঁ" বলবেন, তখন তিনি বুঝাতে চাইছেন,—"আমি কাজে যাচ্ছি না, এই আপনার বক্তব্য। —আপনার বক্তব্য যথার্থ।" বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির ক্ষেত্রে জাপানীরা বিশুদ্ধ চীনা ভাষারই ব্যবহার করে থাকেন। কেননা, বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় যে সকল প্রচলিত শব্দ ভাষায় এসে প্রবেশ করেছে, সবাইর পক্ষে তা বোধগম্য হয় না। কিন্তু তথাপি নিজেদের ভাষা সম্পর্কে জাপানীরা বিশেষভাবেই গোঁড়া। ভাষাকে সরল করে তোলা দূরে থাকুক, বরং এর জটিলতা সম্পর্কেই তাদের খুব গৌরব বোধ আছে। একে তারা তাদের গোপনীয় সাঙ্কেতিক ভাষা বলেই মনে করে এসেছে। কোন বিদেশীকে নিখুঁত অনুবাদ করতে দেখলে তারা বিস্ময় বোধ করে। জাপ সরকারী কর্মচারীদের ধারণা, বহু দলিলপত্র এবং বিবৃতির বিশুদ্ধ অনুবাদ করা অসম্ভব ব্যাপার। লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা জাপানে যদিও খুব বেশী, তথাপি চিঠি-পত্র লেখকের পেশাও সেখানে খুব ভাল চলে এবং এমন কি, কোন কোন সুশিক্ষিত লোকও এই অতি-জটিল ভাষার সাথে পাল্লা না দিয়ে বেতনভুক লোকের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে থাকেন।

সাহিত্য সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

গত সংখ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় কাঙ্গাল সাহিত্য ও সংগীত সমাজের পক্ষ থেকে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই বৈশাখ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইবে। সম্পাদক, কাঙ্গাল সাহিত্য ও সংগীত সমাজ, কুমারখালি, নদীয়া।



কাগজের নৌকার কথা লিখি—তত্ত্বকথা নয়। দুরন্ত নির্বোধ রঙীন মলিন, ছোট ছোট কাগজের নৌকা—ছোট ছোট স্মৃতির টুকরো। স্মৃতি ও কল্পনা দিয়ে গড়া অনুভবের মানুষ আমরা। আমরা কাগজের নৌকা মাত্র, নিজেরাই তাকে গড়ি আর স্রোতের জলে ভাসাই। তারপর হঠাৎ কোন দিন কোন স্রোতের বাঁকে কাশের বনের ভীড়ে সে নৌকা লুকিয়ে পড়ে।

একটি নিয়ে নয়—আমরা কাগজের নৌকার মিছিল। এই শান্ত মুহূর্তে ভাবনার কপাট খুলে দিয়ে একবার পেছু পানে তাকাই। শুধু দেখি এক সুপ্রসারিত স্মরণের আকাশপটে জীবনের অজস্র খণ্ড খণ্ড সমাপ্ত ছবি—কাগজের নৌকারা যেন বানচাল হয়ে আছে। সুমুখ পানে তাকাই—কাগজের নৌকারা নানা আকাঙ্ক্ষায় অস্থির ও অস্পষ্ট, অপূর্ণ ও অতৃপ্ত; কল্পনার আকাশগঙ্গায় পাড়ি দিয়ে চলেছে।

আমরা কাগজের নৌকা ভাসাই এর মধ্যে একটা দুরন্ত আকুলতা যেন মুক্তি পায়। আমাদের অনুরাগের দল যেন যত সব অনির্দেশ্যকে ধরবার জন্য 'দূর হতে দূরে অজানার সুরে' ছুটে যায়। যত দিন মনের পৃথিবী তরুণ থাকে, তত দিন কৌতূহল-চঞ্চল মানুষ শিশুর মতই এক পরম অন্বেষণের পুলকে তার চিন্তাকে কাগজের নৌকার মত ভাসিয়ে বেড়ায়। কোন ঘটের আশ্রয় পেল কি না, সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। এরা শুধু অস্থির—তাই এরা সবই সত্য। কাগজের নৌকা হলো জীবনপ্রভাতের খেলা।

তারপর আসে প্রবীণ দিন। বৈকালী আকাশের আলো ম্লান হয়ে আসে। দিনান্তের ক্লান্ত স্বপ্নে বহু না-পাওয়া আর হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথা কৃষ্ণ নিশীথের আচ্ছন্নতা ডেকে আনে। আয়ুর শেষ অধ্যায় যেন একটি স্তব্ধ অমা-চতুর্দশী। তখন আর কাগজের নৌকা নয়, নদীর জলে শুধু প্রদীপ ভাসিয়ে দিই। বৈতরণীর অপর পারে চিরহেঁয়ালীর দেশে শিথিল জীবনের এক একটি ক্ষীণ দীপশিখার আশ্বাস পাঠিয়ে দিই।

সে আজ বহু দিনের কথা। এমনি এক বৈশাখী দুপুরে কুমার বাবুদের বাগানে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের ছায়ায় বসে আছি। চুনারের ভাঙা দুর্গ আর পাহাড়ের গা রোদে পুড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সেই পাহাড়ী প্রদাহের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উড়ে আসছে বাগানের দিকে।

বাগানের আমগাছগুলি জমা নিয়েছিলাম। নগদ দুশো টাকা সেলামী দিয়েছি, আর বিক্রী থেকে টাকায় দুআনা হারে রেণ্ট দিতে হবে। কলমি আমের গাছগুলি গুনতি শেষ করে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম।

এই ফুলবাড়িটা কুমার বাবুদের। বাড়িটা সেকেলে একটা দরদালান আর বাগানের ত্রিসীমানা প্রায় শ্মশানের নদীটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। পূবের দিকটা কদমের বন, একেবারে ছায়ায় ঠাসা। এই বৈশাখী দুপুরেও সেদিকে তাকালে মনে হয় গত আষাঢ়ের একদল পলাতক মেঘ যেন বন্দী হয়ে আছে। ঐ বাগানটা যেন উদ্ভিদ জাতির একটা উপনিবেশ। সব্জীর ক্ষেত, কুমড়োর মাচান, কলার ঝাড় আর আম, কাঁঠাল ও পেয়ারার সারি। কোথাও একটু জঙ্গলের মত বাঁশের ঝোপ, ময়না কাঁটা আর কুলগাছের রূঢ় রুক্ষ সমারোহ। তার পরেই কিছুদূর পর্যন্ত একটা ঢালু সোঁতা জমি—কচুগাছের বড় বড় মোলায়েম পাতার সবুজ ফিকে হয়ে এসেছে। উত্তর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত সার বাঁধা ছোট ছোট বাসকের গাছ নিঝুম হয়ে আছে—তাদের মাথার ওপর লাফালাফি করছে শত শত হলদে ফড়িং আর প্রজাপতি।

গ্রীষ্মের দুপুরে এই রকমের একটা প্রকাণ্ড বাগানের স্তব্ধতার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক মোহ আছে। এখানে বাতাসে যেন একটা অন্য পৃথিবীর গন্ধ। একটা যুগাতীত বিস্ময় মন্থর হয়ে আছে চারিদিকে। গাছগুলিকে মনে হয়—তারা বুঝি এক ভাষাহীন বনেদী জীবপরিবার।

কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত লাগলো—দেখলাম খানিকটা দূরে ছোট একটি ছেলে একা একা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক এক সময় আলের ঘাসের আড়ালে ছেলেটির ছোট শরীর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হলো। এক এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায় আর নিবিষ্টভাবে মাটীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটাকে দেখে তেমনি আশ্চর্য ও অদ্ভুত লাগছিল; এত ছোট্ট একটি মানুষ আর এই বিরাট অটবীভূষিত উদ্যান—দূর অতীতের একটি ক্ষীণ পথিক-প্রাণ যেন তার আশ্রয় খুঁজে ফিরছে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে রহস্যের আবির্ভাবের মত এই ছেলেটির গতিবিধি দেখছিলাম। ছেলেটি একবার গোলাপ-বাগানের ভেতর ঢুকলো; তারপর বেরিয়ে এসে বাতাবী নেবুর তলায় গিয়ে একবার দাঁড়ালো। ছোট ছেলে কখনো মিছামিছি এভাবে ঘোরে না; কিন্তু কী যে ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। ছেলেটাই বা কে? হাতে গুলতি নেই—তা না হলে বোঝা যেত চড়াই পাখী খুঁজছে। ফড়িংয়ের ঝাঁক উড়ছে—সেদিকেও ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলেটা যেন এক প্রশান্ত অভিযাত্রীর মত কোন পরম অন্বেষণের প্রেরণায় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সামনে এসে দাঁড়ালো ছেলেটি। পাঁচ বছরও বয়স হবে না বোধ হয়। দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা বড় তিল, তাই মুখখানা অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুটী সরু সরু ঘন কালো

পাখা ছড়িয়ে একটা প্রজাপতি যেন ওর কপালের ওপর ঘুমিয়ে আছে।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল; কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করে তাকে আটক করলাম।

ওর নাম নাগেশ্বর—কুমারবাবুর ছেলে। ও খুঁজে বেড়াচ্ছে যাকে তার নাম তিতি—কুমারবাবুদের চাকরের মেয়ে।

অনেক প্রশ্ন করে, নাগেশ্বরের মুখে এলোমেলো উত্তরগুলি গুছিয়ে নিয়ে এইটুকু শুধু বুঝতে পারলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তিতি কোথায়?

নাগেশ্বর আঙুল তুলে বাগানের চারদিকেই একবার দেখিয়ে দিল। ও বলতে চায়—এই দিকে কোথাও আছে।

বললাম—চল, আমিও তোমার সঙ্গে তিতিকে খুঁজবো।

নাগেশ্বর খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললো।

মনে মনে তিতির চেহারাটা একবার কল্পনা করে নিলাম। চাকরের মেয়ে তিতি—নাগেশ্বরের সমানই হবে—খেলার সাথী বোধ হয়।

—তিতি আর তুমি খেলা করতে বুঝি?

প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ্বর বললেন—হাঁ।

তা হলে তিতিও খুব ছোট, গায়ে হয়ত একটা ছেঁড়া পিরান আর পায়ে একজোড়া মল। বোধ হয় দুরন্ত মেয়ে। নইলে এই দুপুরে বাগানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে একা একা। ছেলেটাকে বৃথা কষ্ট দিচ্ছে তিতি। ছেলেটা নেহাৎ থাকতে না পেরেই রোদে পুড়ে পুড়ে খেলার সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার সন্দেহ হলো—এটা বোধ হয় কলহান্তরিতার অভিমান।

—তুমি তিতিকে মেরেছিলে বুঝি?

নাগেশ্বর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো—হাঁ।

আমার অনুমান ঠিক হলো। শিশু তিতির অনুরাগ হয়তো অপমানিত হয়েছে—কোন বয়োধন্যা কুপিতা নায়িকার অভিমানের চেয়ে এই অভিমান কম প্রখর নয়। আর নায়কের অনুশোচনাই বা কী কম! নাগেশ্বরের মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়—এক বিরহবিধুর শিশু রোমিওর মুখচ্ছবি।

—চল ঐদিকে একবার খুঁজে দেখি। নাগেশ্বরকে নিয়ে সারা আমবাগানটা তালাস করে এলাম। কুঞ্জকরা জবাগাছের ভীড়ের ভেতর ঢুকলাম। তিতি নেই কোথাও।

—কই নাগেশ্বর, তোমার তিতি এদিকে আসেনি।

নাগেশ্বর বললো—হাঁ এইখানে আছে। ওকে পুঁতে দিয়েছে।

বুঝলাম। নাগেশ্বরের কথার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঘটনার ইতিবৃত্ত হঠাৎ বেজে উঠলো।—পুঁতে দিয়েছে। অর্থাৎ তিতি আর নেই। তবু নাগেশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গিনীকে। সে তার সমাধিস্থা সঙ্গিনীকে যেন আবার হাত ধরে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে।

নাগেশ্বরকে আবার অনেক প্রশ্ন করলাম। সে তার সাধ্যমত উত্তর দিয়ে গেল। তিতির অসুখ হয়েছিল। তারপর চাকরেরা সবাই মিলে একদিন রাত্রে তিতিকে কাপড় জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে বাগানের ভেতরে আসে। তারা সঙ্গে বড় বড় কোদাল আর লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল। তিতিকে বাগানে কোথাও পুঁতে রেখে গেছে তারা।

নাগেশ্বরের এই অন্বেষণের পেছনে আছে এই ক্ষুদ্র ইতিহাস।

একবার ভাবলাম নাগেশ্বরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই এবার। তিতির সমাধি খুঁজে বের করে আর লাভ কি? তার চেয়ে নাগেশ্বর চিরকাল জানুক—তিতি এই বাগানের কোন নিভৃতে মাটীর নীচে একাকিনী অভিমানিনীর মত বসে আছে। সে আর ধরা দেবে না।

কিন্তু নগেশ্বর আজ যেন প্রতিজ্ঞা করেই বার হয়েছে। তিতিকে না দেখে ফিরবে না।

বললাম,—তিতিকে মাটীতে পুঁতে দিয়েছে। ও মরে গেছে। আর ওকে খুঁজে লাভ নেই নাগেশ্বর। তিতিকে আর পাওয়া যাবে না।

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় পুঁতেছে?

—আচ্ছা, চল খুঁজে দেখি।

তিতির সমাধি খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এই বিরাট বাগানের কোথায় কোন্ নিভৃতে কয়মুষ্টি ধূলির সঙ্গে তিতি মিশে আছে কে জানে!

কত লতামণ্ডপ পার হলাম। বনবাদাড়ের আশে পাশে ঘুরে এলাম। একটা মরা পাতকো'র কাছে দেখলাম নতুন রকম মাটীর ছোট একটা ঢিপি—কিন্তু তিতির সমাধি নয়—একটা খরগোস নতুন বাসা করেছে।

শেষে নাগেশ্বর নিজেই খুঁজতে লাগলো। আমি তার অনুগামী হয়ে রইলাম মাত্র। ঘুরে ঘুরে কদমের বনের কাছে এসেছি. নাগেশ্বর চুপ করে তাকিয়ে দেখছিল মাটীর দিকে। গাছতলায় পুরানো কদমের কেশর আর কাদা মাটী শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে সে চেয়ে চেয়ে কী দেখলো সে-ই জানে। তারপর অন্য পথে এগিয়ে চললো।

আমরা এসে থামলাম একেবারে খালের জলের ধারে এসে। নাগেশ্বর তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে নানাভাবে ভাঁজ করলো—তৈরী হলো একটি কাগজের নৌকা। খালের জলে নৌকাটিকে ছাড়া মাত্র বাঁশঝাড় থেকে একটা ব্যাকুল হাওয়ার দমকা তর তর করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

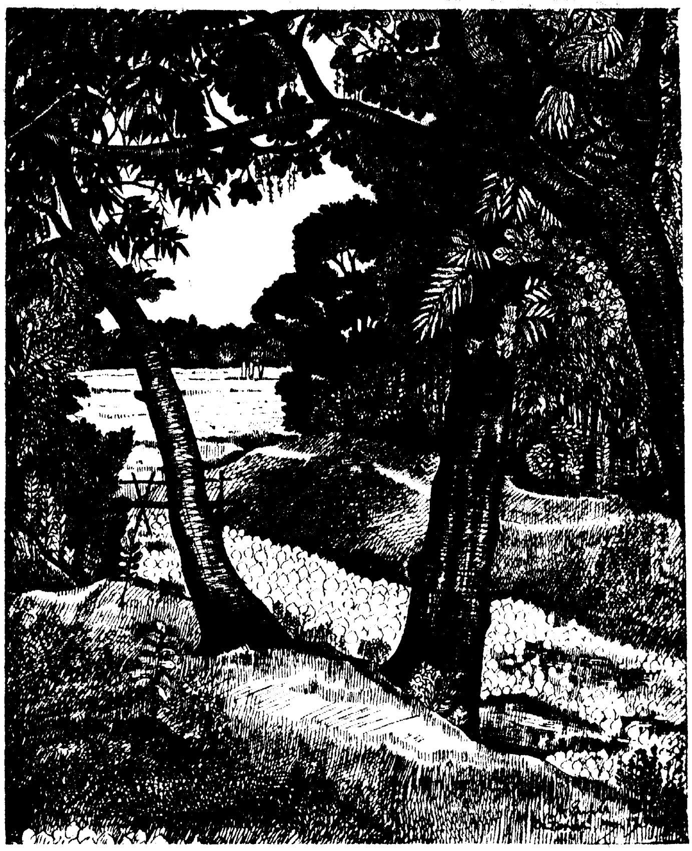
একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাগেশ্বর তেমনি পরিতৃপ্ত ভরা দৃষ্টি দিয়ে কাগজের নৌকাটা দেখছিল। গত শ্রাবণেই বোধ হয় কোন একটি বর্ষণ সজল বৈকালে তারা দুজনে একসঙ্গে কাগজের নৌকা ভাসিয়েছিল।

নাগেশ্বর আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্বেষণ যেন সব দিক দিয়ে এতক্ষণে সার্থক হয়ে উঠেছে। সমাধিস্থা তিতি যেখানেই থাক্, নাগেশ্বর যেন কিছুক্ষণের জন্য তিতিকেই কাছে পেয়েছে। নাগেশ্বরের চোখে সেই শ্রাবণ বৈকালের মেঘঘন ছায়া পড়লো কিছুক্ষণের জন্য।

শিল্পী শ্রীমনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বি টি

গত পয়লা বৈশাখে শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের অঙ্কিত চিত্রের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। মণীন্দ্রভূষণ কলাভবনের প্রাক্তনতম ছাত্র এবং নন্দলাল পরবর্তী নবীন শিল্পীদের মধ্যে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর সরস ও বেগবান চিত্তের নূতনতম পরিচয় পাবার আশায় কলাভবন 'হ্যাভেল হলে' সাগ্রহে গেলাম; নববর্ষের শুভদিন ব্যর্থ যে হয়নি সে কথা সানন্দে জানানো কর্তব্য মনে করি—কর্তব্য শিল্পী এবং সাধারণ উভয়েরই প্রতি।



পল্লী-দৃশ্য (Pen and Ink) : শিল্পী : শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

অধীত শিক্ষা এবং উদার প্রাণের যে সামঞ্জস্য কল্পনাকে পূর্ণতা দেয় এবং কলাকৌশলকে (Technique) সাবলীল করে মণীন্দ্রভূষণের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং ইংরেজি ও ইউরোপীয় নানা সাহিত্যের বিচিত্র রসে চিত্ত তাঁর নিয়ত অভিসিক্ত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর ছাত্রজীবন বালক বয়সে ব্রহ্ম বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে যুবা বয়সে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। শিল্প শিক্ষার অবকাশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসের নিমন্ত্রণ তাঁর চিরদিনই তাই অব্যাহত দেখেছি। তাঁর কোনো কোনো পূর্বতন চিত্র এই কারণেই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে রূপের (form) চেয়ে রূপকে, তথা বর্ণের চেয়ে বর্ণনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এই সাহিত্য প্রবণতাকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন মণীন্দ্রভূষণ তাঁর মুক্ত প্রাকৃতিক বলিষ্ঠ জীবনী শক্তির সাহায্যে। সে জীবন যাপনের সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন জন্মাবধিই। একদিকে তাঁর স্বদেশ বিক্রমপুরের শস্য শ্যামল পল্লী প্রকৃতি অন্যদিকে তাঁর বিদ্যাক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের শষ্পবিরল রূঢ় রুক্ষ উদার প্রান্তর...নৈসর্গিক শোভার এই দুই বিরুদ্ধ প্রভাব তাঁর রক্তের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। এই নৈসর্গিক প্রভাব ব্যাপকতার পূর্ণতা লাভ করেছে শিল্পীর সদা উদ্যমশীল পরিব্রজনের নেশায়। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গমালা থেকে আরম্ভ করে সিংহলের নারিকেল-পল্লব-বীজিত সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। মণীন্দ্রভূষণের দৃশ্য চিত্রগুলির স্বতঃস্ফূর্ত অজস্রতায় এবং রিক্তাভরণ সরল শোভায় সেই উদার অভিজ্ঞতার আনন্দ স্পন্দন প্রতিবিম্বিত দেখতে পেলাম। সবুজের কত বিচিত্র লীলা আলোতে ছায়াতে ধরা দিয়েছে শিল্পীর তুলিকায়। ঘন পল্লবের পুঞ্জে পুঞ্জে দেখলাম নানা বর্ণের যেন পুঞ্জিত কলধ্বনি। দেখে Cezanne-এর কথা মনে পড়ে না এমন নয়, তবু অনুভব করি এ রচনার অন্তরে শক্তি সঞ্চার করেছে পূর্ববঙ্গের রোদে জলে গড়া সবুজ একটি মন—style is the man অন্যে বলে বলুক, আমরা চিনি style-কে ছাপিয়ে ওঠা চেতনাবিশিষ্ট জীবন্ত মানুষটিকে।

কালির-আঁচড়ে আঁকা (Pen and ink sketches) সাঁওতাল রমণী অবাস্তব কোনো কল্পলোকের নয় বলেই চিরন্তনের দাবী নিয়ে দর্শকের কল্পনাকে অধিকার করে। রসের রসায়নে সত্য যেখানে অতি সত্য হয়ে ওঠে শিল্পীর জীবনের অভিজ্ঞতা চিত্রটিকে সেই নিত্যলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, প্রদর্শনী দেখে সেদিন বললেন, "Landscape-এ মণি তার নিজস্ব একটি style পেয়েছে যার সম্ভাবনা সুদূর বিস্তৃত। View point ইত্যাদি বাতিকের থেকে ওর প্রাণের বেগই ওকে রক্ষা করবে।" গুরুর সপ্রশংস এই আশীর্বাদ মনীন্দ্রভূষণের শিল্পী জীবনে রক্ষা-কবচ স্বরূপ হোক, বর্ষারম্ভে এই কামনাই আমরা করি।



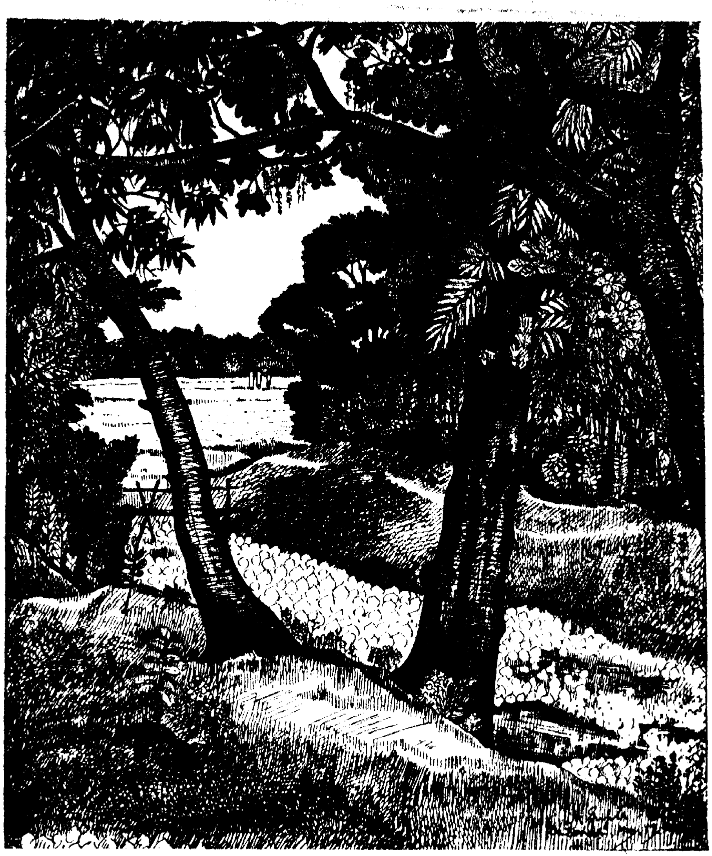
বিশ্রাম সুখিনী — শিল্পী : শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিল্পী শ্রীমনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বি টি

গত পয়লা বৈশাখে শান্তিনিকেতন কলা-ভবনে শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের অঙ্কিত চিত্রের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। মণীন্দ্র-ভূষণ কলাভবনের প্রাক্তনতম ছাত্র এবং নন্দলাল পরবর্তী নবীন শিল্পীদের মধ্যে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর সরস ও বেগবান চিত্রের নূতনতম পরিচয় পাবার আশায় কলাভবন 'হ্যাভেল হলে' সাগ্রহে গেলাম; নববর্ষের শুভদিন ব্যর্থ যে হয়নি সে কথা সানন্দে জানানো কর্তব্য মনে করি—কর্তব্য শিল্পী এবং সাধারণ উভয়েরই প্রতি।

অধীত শিক্ষা এবং উদার প্রাণের যে সামঞ্জস্য কল্পনাকে পূর্ণতা দেয় এবং কলা-কৌশলকে (Technique) সাবলীল করে মণীন্দ্রভূষণের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং ইংরেজি ও ইউ-রোপীয় নানা সাহিত্যের বিচিত্র রসে চিত্ত তাঁর নিয়ত অভিসিক্ত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর ছাত্রজীবন বালক বয়সে ব্রহ্ম বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে যুবা বয়সে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। শিল্প শিক্ষার অবকাশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসের নিমন্ত্রণ তাঁর চিরদিনই তাই অব্যাহত দেখেছি। তাঁর কোনো কোনো পূর্বতন চিত্র এই কারণেই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে রূপের (form) চেয়ে রূপকে, তথা বর্ণের চেয়ে বর্ণনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এই সাহিত্য প্রবণতাকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন মণীন্দ্রভূষণ তাঁর মুক্ত প্রাকৃতিক বলিষ্ঠ জীবনী শক্তির সাহায্যে। সে জীবন যাপনের সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন জন্মাবধিই। একদিকে তাঁর স্বদেশ বিক্রমপুরের শস্য শ্যামল পল্লী প্রকৃতি অন্যদিকে তাঁর বিদ্যাক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের শষ্পবিরল রূঢ় রুক্ষ উদার প্রান্তর...নৈসর্গিক শোভার এই দুই বিরুদ্ধ প্রভাব তাঁর রক্তের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। এই নৈসর্গিক প্রভাব ব্যাপকতার পূর্ণতা লাভ করেছে শিল্পীর সদা উদ্যমশীল পরিব্রজনের নেশায়। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গমালা থেকে আরম্ভ করে সিংহলের নারিকেল-পল্লব-বীজিত সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। মণীন্দ্রভূষণের দৃশ্য চিত্রগুলির স্বতঃস্ফূর্ত অজস্রতায় এবং রিক্তাভরণ সরল শোভায় সেই উদার অভিজ্ঞতার আনন্দ স্পন্দন প্রতিবিম্বিত দেখতে পেলাম। সবুজের কত বিচিত্র লীলা আলোতে ছায়াতে ধরা দিয়েছে শিল্পীর তুলিকায়। ঘন পল্লবের পুঞ্জে পুঞ্জে দেখলাম নানা বর্ণের যেন পুঞ্জিত কলধ্বনি। দেখে Cezanne-এর কথা মনে পড়ে না এমন নয়, তবু অনুভব করি এ রচনার অন্তরে শক্তি সঞ্চার করেছে পূর্ব-বঙ্গের রোদে জলে গড়া সবুজ একটি মন—style is the man অন্যে বলে বলুক, আমরা চিনি style-কে ছাপিয়ে ওঠা চেতনাবিশিষ্ট জীবন্ত মানুষটিকে।



পল্লী-দৃশ্য (Pen and Ink) : শিল্পী : শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

কালির-আঁচড়ে আঁকা (Pen and ink sketches) সাঁওতাল রমণী অবাস্তব কোনো কল্পলোকের নয় বলেই চিরন্তনের দাবী নিয়ে দর্শকের কল্পনাকে অধিকার করে। রসের রসায়নে সত্য যেখানে অতি সত্য হয়ে ওঠে শিল্পীর জীবনের অভিজ্ঞতা চিত্রটিকে সেই নিত্যলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, প্রদর্শনী দেখে সেদিন বললেন, "Landscape-এ মণি তার নিজস্ব একটি style পেয়েছে যার সম্ভাবনা সুদূর বিস্তৃত। View point ইত্যাদি ব্যক্তিকের থেকে ওর প্রাণের বেগই ওকে রক্ষা করবে।" গুরুর সপ্রশংস এই আশীর্বাদ মনীন্দ্রভূষণের শিল্পী জীবনে রক্ষা-কবচ স্বরূপ হোক, বর্ষারম্ভে এই কামনাই আমরা করি।



বিশ্রাম সুখিনী — শিল্পী : শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 1st May, 1943 [২৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা

বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত কেশবলাল পাণ্ড়েকে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুসারে আটক করা হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি এই বিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আবেদন করা হয়। সম্প্রতি ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই মামলার সম্বন্ধে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে ভারত সরকারের আইন বিভাগীয় উপদেষ্টাগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, ২৬ ধারাটি বর্তমানে যে আকারে আছে তাহা বৈধ নহে, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আইনটি ব্যবস্থা পরিষদে প্রণয়ন করা হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তাহার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা উহার ভিতর রহিয়াছে। প্রথমত শাসনবিভাগীয় যে কোন লোকের হাতে এই আইন প্রয়োগের অধিকার ন্যস্ত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় যে সব ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হয়, সে সব ক্ষেত্রেই যে বড়লাট কিংবা প্রাদেশিক লাটগণ কিংবা তাঁহাদের উপদেষ্টাগণ ব্যক্তিগতভাবে বিচার করিতে পারেন, ইহা সম্ভব নহে। এমনভাবে ব্যাপক অধিকার যাহাদের উপর দেওয়া হয়, তাঁহারা সকলেই যে এই বিধান প্রয়োগের যাথার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন—যে সব ব্যক্তির উপর উহা প্রযুক্ত হইতেছে, তাঁহারা সত্যই সন্দেহ করিবার মত কিনা, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন, ইহা ধরিয়া লওয়া কঠিন। দ্বিতীয়ত অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার পূর্বে, সে ব্যক্তি অপরাধ করিতে পারে, এমন সন্দেহ করিয়া তাহাকে আটক করাও কঠিন প্রশ্ন। লোকটি সত্যই যে অপরাধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রে তেমন সন্দেহ করিবার সংগত কারণ থাকা প্রয়োজন। প্রকাশ্য আদালতে বিচারের দ্বারা অভিযোগ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন সেখানে নাই, সিদ্ধান্ত যে ক্ষেত্রে একতরফা সেখানে আইনের অপ-প্রয়োগ ঘটিবার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। ভারতরক্ষা বিধানের এইভাবে অপপ্রয়োগ ঘটিতেছে। কতকগুলি মামলায় আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে যুদ্ধের জরুরী অবস্থার দোহাই দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু বিচারপতি স্যার মরিস গায়ার ইংলণ্ডের অনুরূপ আইনের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতরক্ষা বিধান হইতে সে আইনের পার্থক্য কতখানি। ইংলণ্ডে ছোট বড় শাসন বিভাগের সকলের হাতে এমন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয় না; কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপার ভিন্ন। এখানে হাকিম-মেজাজ তৃপ্ত করার জন্য নিতান্ত নিরপরাধ ব্যক্তির উপর এই আইন প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ খানের আচরণ সে ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কলিকাতা অঞ্চলে রেশনিং

কলিকাতা অঞ্চলের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য রেশনিং-এর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, আমরা এই কথা কিছুদিন হইতে শুনিতেছি এবং এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ একটি ব্যাপক পরিকল্পনাও প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পূর্বাভাসস্বরূপে খাদ্য ও কয়লা বণ্টন সম্পর্কে সম্প্রতি বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে দুইটি আদেশ জারী করা হইয়াছে। এই দুইটি আদেশ প্রধানত লোকজনের হিসাব সম্পর্কে; কিন্তু সংখ্যার হিসাবই রেশনিং ব্যবস্থার প্রধান কথা নয়; প্রধান প্রশ্ন হ'ল সরবরাহের। রেশন কার্ড বাহির করিয়া গভর্নমেন্ট বা ডিরেক্টরদের দেখিতে হইবে যে, কার্ডে লিখিত মাল সত্যই ব্যক্তিবিশেষের বা বাড়িবিশেষের লোকজনদের হস্তগত হইতেছে কিনা। এইরূপ ক্ষেত্রে সরবরাহের উপর সরকারের প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তাঁহারা বলিতেছেন যে কয়েকটি

দ্রব্য সম্পর্কে তাঁহারা এইরূপে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব পরিচালনা করিয়া সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; চিনি এবং কয়লার ক্ষেত্রে তাঁহাদের এই উক্তির যৌক্তিকতা কিছু কিছু আছে; আমরা উহা স্বীকার করি; কিন্তু চাউল বা গম এ সব ক্ষেত্রে তাঁহারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই এবং অন্ন-সমস্যার জটিলতা প্রধানত সেইদিক হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। সরবরাহের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা যদি সুনির্দিষ্ট না থাকে, তবে রেশনিং ব্যবস্থা কতটা সফলতা লাভ করিবে, এ বিষয়ে এখনও আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে।

প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

স্যার নাজিমুদ্দিনের চক্রের পাকে ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকজন ধরা দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এবং বরদাকান্ত পাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা দুইজনে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল ত্যাগের কারণ প্রদর্শন করিয়া বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের মতে, স্যার নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করা বোকামী। অথচ এই গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন পূর্বে পার্লামেন্টারী দলের সভায় বড় গলায় বলিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত হইবে না। কারণ তাহা হইলে কৃষক-প্রজা দলকে চাপিয়া মারা হইবে এবং স্যার নাজিমুদ্দিনের পাকিস্থানী জাতীয়তাবিরোধী পরিকল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দুইদিন যাইতে না যাইতেই গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাননেত্র নূতনভাবে নাজিমুদ্দিনী চেষ্টার মহিমার দিকে ঘুরিয়া গেল। আশ্চর্য কিছুই নয়। মন্ত্রিমণ্ডলের প্রসাদ-ভিক্ষুকের অভাব দীর্ঘ-পরাধীন এদেশে হইবে না, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই ক্ষেত্রে তাঁহারা কারারুদ্ধ নেতা শরৎচন্দ্রের নামের দোহাই দিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য আজ যদি এমন কথা বলা হয়, শরৎচন্দ্র বাহিরে থাকিলে স্যার নাজিমুদ্দিনকে মুসলিম বঙ্গের একমাত্র ডিক্টেটর বলিয়া স্বীকার করিয়া বাঙলা দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাবে প্রভাবিত এবং শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহদের পৃষ্ঠপোষিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সমর্থন করিতেন, তবে শরৎচন্দ্রের আদর্শের অবমাননা করা হয়। স্যার নাজিমুদ্দিন কয়েকজন রাজনীতিক বন্দীকে মুক্ত করা এবং তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে প্রলোভন দেখাইয়াছেন, গোস্বামী মহাশয় এবং মিঃ পাইন সেইগুলিকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া নিজেদের ছেঁদো যুক্তি সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা স্যার নাজিমুদ্দিনের এই সব স্তোকবাক্যের কোন মূল্যই দেখি না। প্রথমত তিনি যে সব আশ্বাসবাক্য বলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থার মধ্যে সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা কতটা তাঁহার হাতে আছে ইহা বিবেচনার বিষয়। আমরা জানি এক্ষেত্রে হক মন্ত্রিমণ্ডলের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; হক মন্ত্রিমণ্ডল যাহা পারেন নাই; শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের মতিগতির প্রতিকূলতা করিয়া স্যার নাজিমুদ্দিন যে সমধিক স্বাধীন চিত্ততা সহকারে তাহা করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না; দ্বিতীয়ত জনকতক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি কিংবা তাঁহাদের আরও কিছু সুখ-সুবিধার প্রশ্নই বড় প্রশ্ন নয়। যে আদর্শের জন্য তাঁহারা আজ দুঃখ-কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, জাতীয়তার সে আদর্শের বিনিময়ে নিজেদের সুখ-সুবিধাকে তাঁহারা ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখিবেন। ক্ষুদ্র স্বার্থের দায়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করিবার এই উদ্যম সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তরে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবে এবং এমন ক্ষুদ্র স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলা দেশে যে দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারিবে না, অন্তর্নিহিত ত্রুটির দোষেই ইহা এলাইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চিত।

যুদ্ধোত্তর ভারত ও কোটম্যান

কংগ্রেস কিসে ধ্বংস হয়, ইহা দেখিবার জন্য একদল ইংরেজ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন এবং কংগ্রেসের প্রভাব হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হইয়া কোন দিন সমগ্রভাবে তাহাদের প্রভুত্বস্পৃহা পরিতৃপ্তির পক্ষে ষোলআনা উপযুক্ত হইবে, তাঁহারা আগ্রহভরে সেজন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কংগ্রেসের কার্যতৎপরতা শুধু দমিত থাকিবে, ইঁহারা এমনটা চাহেন না; ইঁহারা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের উৎখাত কামনা করেন। সম্প্রতি লণ্ডনের একটি সভায় ভারত সরকারের ভূতপূর্ব প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জন কোটম্যান তাঁহার বক্তৃতায় এই শ্রেণীর ইংরেজদের মনোভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যুদ্ধের পর ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানদের পাকিস্থান পরিকল্পনা লইয়া হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলে কংগ্রেসের বিলোপ সাধনও অবধারিত। আমরা জানি, কোটম্যান সাহেবের ন্যায় অনেক ইংরেজই ঐরূপে ভরসায় ভারতের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছেন এবং কোটম্যান যাহা কামনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যে কোন মূল্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। ভারতের ভাগ্যবিধাতা বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের নীতিতে যাহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তৃতা এবং উক্তিতে সে সম্ভাবনাকে অনিবার্য করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টার অবধি নাই। একদিকে কংগ্রেসকে দমিত করা অন্যদিকে পাকিস্থানী প্রবৃত্তিকে প্ররোচনা দান করাই যে ইঁহাদের নীতির তাৎপর্য, আমাদের সে সত্য অবিদিত নাই। মিঃ কোটম্যান হিন্দু এবং মুসলমানদের সংঘর্ষের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পক্ষে সেই শুভদিন কবে আসিবে, তাহা জানাইয়াও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সমাজকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, কিন্তু সে সংঘর্ষ কিভাবে বা কোন পথে ঘটিবে, সে কথাটা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। আমরা এক্ষেত্রে কোটম্যান সাহেবকে বিশেষ ভরসা দিতে পারি না। তিনি এবং তাঁহার সমশ্রেণীর ইংরেজদিগকে আমরা শুধু এই কথাই বলিতে পারি যে, যুদ্ধের পর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সংঘর্ষের কথা বলিয়াছেন, যদি তাহা সত্যই ঘটে, তবে ভারতের স্বাধীনতা যাহারা কামনা করিতেছে, সমগ্র ভারতের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় চেতনাই যাহাদের কাম্য তাহাদের কাজের জন্য তাহা ঘটিবে না। যাহারা জাতির স্বাধীনতার বিরোধী, উন্নতিশীল মনোবৃত্তির পক্ষে যাহাদের কার্য প্রতিক্রিয়ামূলক—উহা ঘটিবে তাহাদেরই কাজের ফলে। মিঃ কোটম্যান যাহা কামনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের সাময়িক বিলোপ হয়ত ঘটিতে পারে; কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শের বিলোপ ঘটিবে না। জাতির অন্তরে সে আদর্শ জ্বালা বিস্তার করিতে থাকিবে এবং সমধিক মানব মহিমায় জাগ্রত যুদ্ধোত্তর জগতের প্রতিবেশ প্রভাবে ভারতের বুক হইতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার বাধিকে উৎখাত করিবার জন্য আবর্তের সৃষ্টি করিবে; ইহার ফল কোটম্যান শ্রেণীর ইংরেজের জন্য আবর্তের সৃষ্টি করিবে; ইহার ফল কোটম্যান শ্রেণীর ইংরেজের পক্ষে নিশ্চয়ই লোভনীয় হইবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবেই, কিন্তু আশংকা এই যে, যাহারা পাকিস্থানী পরিকল্পনার পোষকতা করেন এবং কংগ্রেসের উৎখাত কামনা করেন, তাঁহাদের সহিত সম্প্রীতির পথে নয়, সম্ভবত তাঁহাদের সঙ্গে স্থায়ী বিরোধেরই ভিত্তিতে। মিঃ কোটম্যান শ্রেণীর ইংরেজগণ কি তাহাই কামনা করেন? আমেরিকা এবং আয়র্লণ্ড সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবলম্বিত নীতির অতীত অভিজ্ঞতা হইতে এখনও তাঁহাদের শিক্ষা হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল

স্যার নাজিমুদ্দীন অবশেষে সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। হক্ মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিগয়া যাওয়ায় ৯৩ ধারা অনুযায়ী বাঙলার গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন সপ্তাহেরও অধিককাল স্যার নাজিমুদ্দীনকে মন্ত্রী বাছাই কার্য করিবার সুযোগ গভর্নর দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনজন দলত্যাগী লইয়া স্যার নাজিম ১৩ জন মন্ত্রীই শুধু নহে ১৩ জন সেক্রেটারীও বাছাই করিয়া ফেলিয়াছেন। বড়লাটের অনুমতিক্রমে ৯৩ ধারা প্রত্যাহৃত হইয়াছে, স্যার নাজিমুদ্দীন তাঁহার লুপ্ত মন্ত্রীত্বের গদী পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সমগ্র বাঙলা প্রশ্ন করিতেছে, ইহা কি সেই সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল, যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের কথা বলিয়া মিঃ ফজলুল হককে পদত্যাগ করিতে গভর্নর সম্মত বা বাধ্য করিয়াছিলেন? হক মন্ত্রিমণ্ডল লীগ ব্যতীত পরিষদের সকল দল লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের প্রেরণায় কংগ্রেস, হিন্দু জাতীয় দল, প্রগতিশীল মুসলমান ও কৃষক-প্রজা দল লইয়া গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল একপ্রকার সর্বদলীয়ই ছিল। স্যার নাজিম দলকে গভর্নর মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদানের প্রেরণা দিবে এবং তাহা কার্যকরী হইলেই গভর্নরের ঘোষিত সর্বদলীয় তথা broad based মন্ত্রিমণ্ডল হইতে পারিত। কিন্তু গভর্নর সেই পথে কোন চেষ্টা করেন নাই। হক্ সাহেবের পদত্যাগের পর স্যার নাজিমকেই মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলিলেন। পরে ইউরোপীয় দলের সমর্থনের ভরসায় জনকয় দলত্যাগী সদস্য লইয়া বর্তমানে যেভাবে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, তাহা শাসনতান্ত্রিক বিধিবহির্ভূতই শুধু নহে, তাহা বাঙলার জনমতের কখনো সমর্থন পাইবে না। কলিকাতার জনসভায় ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক্ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন, সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ধোঁকা দিয়া কার্যত একটি মাত্র লীগ দলের মন্ত্রীত্ব কায়েম করা গভর্নরের উচিত হইয়াছে কিনা, তাঁহার এই অভিযোগের সুবিচার তিনি গভর্নরের বিবেকের নিকট চাহিয়াছেন। গভর্নর ইহার উত্তর দিবেন, আমরা আশা করি। মিঃ ফজলুল হক ইহাও বলিয়াছেন, তাঁহার কথা গভর্নর, বড়লাট, ভারত সচিব অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নালিশ জানাইতেছেন—বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের নিকট, বাঙলার জনসাধারণের বিচারই তিনি চাহেন। বাঙলার প্রগতিশীল কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলার আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িক বিষমুক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন—ইউরোপীয় দলের মুখাপেক্ষী না থাকিয়াই মন্ত্রীত্ব করিতে সক্ষম ছিলেন। সেই মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান বাঙালী চাহে নাই। সেই মন্ত্রিমণ্ডল ইউরোপীয় দলের, স্থায়ী আমলাতন্ত্রের অবাঞ্ছিত ছিল—গভর্নরের প্রসন্নতা লাভেও সক্ষম হয় নাই; ইহা আমরা জানি। ইহাও সত্য যে স্যার নাজিমের মন্ত্রীত্ব ইউরোপীয় দলের বাঞ্ছিত। কিন্তু ইউরোপীয় দলের মুখাপেক্ষী মন্ত্রিমণ্ডল কখনো দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে পারে না, ইহা দেশবাসীর অজানা নহে। মিঃ ফজলুল হকের প্রতি তথা গত মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে, বাঙালী তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। গভর্নর মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙগা ও গড়া ব্যাপারে বহু ভুল করিয়াছেন, এখনো এই মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্তে তাঁহারই কথিত ও প্রতিশ্রুত সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের চেষ্টা করিবেন কি? জনমতের সমর্থনহীন মন্ত্রিমণ্ডলকে দেশবাসীর উপর চাপানোর ফল কখনো ভাল হইতে পারে না।

সমরাদর্শে সংক্রান্তির স্থান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট সম্প্রতি মেক্সিকো পরিদর্শনে গমন করেন। এই উপলক্ষে মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট ক্যামাতো যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সম্মিলিত পক্ষের সমরাদর্শের আভাস রহিয়াছে। তিনি বলেন, সম্মিলিত শক্তি সভ্যতার জন্য এবং বিশ্বমানবতার আদর্শ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন, ইহা বুঝিয়াই মেক্সিকো তাহাদের সঙেগ যোগ দিয়াছে। প্রভুত্ববাদীদের চিরন্তন ভীতির আবহাওয়া হইতে মুক্ত হইয়া আমরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে চাই। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে আমরা স্বাধীনতা চাই এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে স্বাধীনতা কামনা করি। রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্ট মনে প্রাণে এই সমরাদর্শ স্বীকার করেন কি? ঘটনার গতি দেখিয়া আমাদের তাহা মনে হয় না। কারণ তিনি যদি তাহা করিতেন, তবে ভারতের দাবী সম্পর্কে তাঁহার এতখানি নির্লিপ্ততার পরিচয় আমরা পাইতাম না। আমরা জানি ভারতবর্ষ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের শাসনাধীন হইলেও সামরিক পরিস্থিতির ফলে ভারতের ব্যাপারে মার্কিন জাতির স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। মার্কিন জাতির স্বার্থের দিক হইতে সাক্ষাৎ সম্পর্কে না হউক, সম্মিলিত জাতির স্বার্থের জন্যও তিনি ভারতের ক্ষেত্রে সম্মিলিত পক্ষের সমরাদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার তেমন মতিগতি নাই; কার্যত মুখে যিনি যাহাই বলুন, সকলেই সুবিধাবাদের নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন।

জাতীয় অবমাননা

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানের শ্বেতাঙগ অঞ্চল হইতে ভারতীয়দিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; পাঠকবর্গ ইহা অবগত আছেন। সম্প্রতি ইহার প্রতিবাদকল্পে বোম্বাইয়ের একটি জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত জয়াকার বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইতেছে, তাহাতে আমার মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইতেছে যে, কৃষ্ণাঙগ জাতিসমূহকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে রাখিবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা বৃথা। শ্রীযুক্ত জয়াকার ইহাও বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইতেছে, তাহাতে সম্মিলিত পক্ষের বহু বিঘোষিত সমরাদর্শের সম্বন্ধে তিনি আস্থা হারাইয়াছেন। বর্তমান সমরোদ্যমে ভারতবাসীদের আন্তরিকতা লাভ করিবার জন্য সম্মিলিত পক্ষের কাহারও যে কার্যত কোনরূপ গরজ আছে, ইহা আমাদের মনে হয় না। এ সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডল যে সহযোগিতার কথা মুখে আওড়ান তাহা ক্রীতদাসের সহযোগিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়; প্রকৃতপক্ষে ইহাদের দৃষ্টিতে ভারতবাসীদের অবস্থা ক্রীতদাসের অবস্থার চেয়ে একটুও উন্নত নয়। যতদিন ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া রাষ্ট্রনীতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই অবস্থাই যে চলিবে, ইহা অবধারিত। ন্যায়ের দোহাই এক্ষেত্রে একান্তই বৃথা। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেণ্ট ভারতীয়দের প্রতি যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ভারত গভর্নমেণ্ট যদি ভারত প্রবাসী দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙগদের প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে উহার কিছু প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির অন্যতম ধারক বাহক এবং পরিপোষক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটসের মন রক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে। স্মাটস্ সাহেবও অনুগ্রহের ভঙগীতে ভারতবাসীদের প্রতি দুই একটা মিষ্ট কথা আওড়াইয়া কিংবা শ্বেতাঙগদের পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টের দুই এক টুকরা ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেন; কিন্তু প্রশ্নটি কেবল সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন নহে, জাতিগত মানমর্যাদার এ প্রশ্ন এবং সেই দিক হইতে শ্বেতাঙগদের সহিত ভারতীয়দের সম-মর্যাদা স্বীকৃত না হইলে অন্য পথে ভারতবাসীরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না; কোন মূল্যেই তাহারা জাতীয় মর্যাদাকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নয়।

এদেশে আগত বিদেশী সৈনিক

শ্রীসুশীলকুমার বসু

যুদ্ধ আমাদের দ্বারপ্রান্তে অনেক নূতন অভিজ্ঞতার মালমসলা উপস্থিত করিয়াছে। যুদ্ধের প্রসাদে আমরা এমন অনেক জিনিস নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, সাধারণ অবস্থায় যাহার সহিত আমাদের পরিচয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। এইসব বৈচিত্র্যের মধ্যে বিদেশ হইতে আগত সৈনিকেরা অন্যতম। শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ সর্বরকমের বিদেশী যোদ্ধা বর্তমানে যত সংখ্যায় এখানে আসিয়াছে পূর্বে তাহা আর কখনও আসে নাই। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত শ্বেত সৈন্যের সংখ্যাই অবশ্য সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রথম প্রথম ইহা আমাদের মধ্যে প্রচুর কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু, এখন ইহা অভ্যস্ত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, অভ্যস্ত ব্যাপারে পরিণত হইলেও, আমাদের সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনের উপর ইহার প্রভাব লঘু হয় নাই।

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, হালচালের উপর এই প্রভাব এখনই কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে। তবে এই প্রভাবের আরও গভীর দিক আছে। সাদা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনে বরাবরই ভয় ও বিস্ময়ের ভাব আছে। সাদা মানুষ এদেশের লোকের মনে ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক। যে অত্যাচার ও শোষণের ভারে এ দেশের লোক প্রতিনিয়ত মাথা নীচু করিয়া আছে, তাহার গোড়ায় রহিয়াছে যে সাদা মানুষ সে কথা সকলেই জানে। সর্ব বিষয়ে তাই এদেশের লোকে সাদা মানুষকে অতিমানুষ বলিয়াই মনে করে। কিন্তু, শুধু শক্তিতে নয় দুর্বলতায়ও এবং হাবভাব ও চাল-চলনে সেও যে সর্বতোভাবে আমাদের মত, সাদা মানুষকে নিকট হইতে দেখিয়া তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া সেকথা জানিবার সুযোগ ইহার পূর্বে আমাদের হয় নাই। কিন্তু, এবার এই সুযোগ অভূতপূর্বভাবে মিলিয়াছে। শুধু যে বড় বড় শহরগুলিতেই এই সকল সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে, তাহাই নহে, দূর দূর মফঃস্বলেও এই সকল সৈন্যেরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা, গ্রাম্য কৃষকেরা পর্যন্ত খুব নিকট হইতে ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহারা বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহারাও তহাদেরই মত মানুষ—তাহাদেরই মত হাসে, কাঁদে, গান গায়—আড্ডা দেয়—তাহাদের মত করিয়াই খায়। ইহারাও তাহাদেরই মত সামাজিক মানুষ, সামাজিক আচার ব্যবহার মানিয়া চলে, সৌজন্য, ভদ্রতায়—তাহাদেরই মত অভ্যস্ত। পার্থক্য যাহা চোখে পড়ে তাহা শিক্ষার, অর্থের এবং উন্নত জীবন যাত্রার। ইহা সকল মানুষেরই অধিকারে আসিতে পারে। কাজেই সাদা মানুষ সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা তাহাদের মধ্যে দৃঢ়তর আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধের সৃষ্টি করিবে। আমরাও যে সর্ব বিষয়ে অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের হইতে স্বতন্ত্র নহি, আমাদের দেশের সাধারণ লোক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এ চেতনা এই প্রথম লাভ করিল। আমাদের জাতীয় জীবনের উপর ইহার গভীর প্রভাব অনুভূত হইবে।

মত। ইহারা সাধারণ সাম্রাজিক সৈন্য নহে। ইহাদের অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং দেশের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্য হইতে। আজ যাহারা সৈনিক হইয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশে আসিয়াছে, কিছুদিন পূর্বেও তাহারা নিজ নিজ দেশে নানাবিধ বৃত্তিমূলক কার্যে নিযুক্ত ছিল।

খাস ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে বহু লোক আসিয়াছে। এই দুই দেশের সাধারণ লোকের উপর আমাদের ভাগ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। অথচ, এই দুই দেশের লোকেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শুধু যে চেতনারই অভাব ছিল তাহা নহে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও কিছুই ছিল না। অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা ছিল প্রচুর।

ভারতবর্ষ বলিয়া যে একটা দেশ আছে ইহা তাহারা ভূগোলে পড়িয়াছে। কিন্তু, সে দেশ কি রকমের দেশ? অসভ্য বন্য মানুষের দেশ। সাপ, বাঘ, জঙ্গলের দেশ—হাঙ্গর, কুমীর, মশা, মাছির দেশ। এ দেশে যে সভ্য মানুষ বাস করে, ইহারাও যে এক বর্ণ ব্যতীত প্রায় সর্বাংশে তাহাদের মত, ইহাদেরও অনেকে যে লেখাপড়া জানে, এমন কি ইংরেজী লেখাপড়াই তাহাদেরই মত জানে—ইহারা যে বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে—ইহা—এই সকল কথা এই সব নবাগত সৈনিকের পক্ষে একান্তই নূতন অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইহারা পরিবর্তিত ধারণা লইয়া ফিরিবে।

এই পরিবর্তিত ধারণার ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সকল দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হইবে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল ও আকর্ষণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। ভারতবাসীদের সম্পর্কে স্বার্থ বিশিষ্ট লোকদের দ্বারা ভুল ধারণা ছড়ান অনেক বেশী শক্ত হইবে। দূর ও নিকট প্রাচ্যে মিত্র দেশসমূহের সেনাদল ভারতীয় সেনাদলের সঙ্গে একত্রে একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে। যে বিপুল সেনা বাহিনী নিযুক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে সাম্রাজ্যিক সৈন্যের অনুপাত খুব বেশী নহে। জাতি, গাত্র, বর্ণ, ভাষা, প্রাচ্য প্রতীচ্য প্রভৃতি সর্ববিধ কৃত্রিম ভেদ রেখার সীমা পার হইয়া যে বিশ্ব মনুষ্যত্ব প্রসারিত সে কথা একত্র বাস এবং সহকর্মিত্বের মধ্য দিয়া বহু লোক প্রতিদিন অনুভব করিতেছে। ইহা যে মানুষকে একত্বের পথে বহু দূরে লইয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু, এই চিত্রের অন্য দিকও আছে এবং সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হইবারও প্রয়োজন আছে। ইওরোপ, আমেরিকা ও চীন হইতে সৈনিক হইয়া যাহারা এ দেশে আসিয়াছেন—এ দেশ সম্পর্কে তাঁহারা সব সময়েই যে খুব ভাল অভিজ্ঞতা লইয়া যাইতেছেন তাহা নহে। সাধারণত ইঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইতেছেন। সমাজের যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের লোক, তাঁহাদের পক্ষে গায়ে পড়িয়া এই সব লোকের সহিত আলাপ করা সম্ভব নহে। শহরের বাহিরে পল্লী অঞ্চলে জীবনের যে স্বাভাবিক ধারা প্রবাহিত তাহার সহিত পরিচয় লাভেরও

(শেষাংশ ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভিক্ষুক

শ্রীসুকুমার রায় এম, এ

গভীর মনোযোগের সহিত বসিয়া ভূপতিবাবু কাগজপত্র পরীক্ষা করিতেছিলেন। আজ রবিবার কোর্টে যাইতে হইবে না। তাই ছুটিটা উপভোগ করা যাক। তাছাড়া আজ জনরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে পাড়ায় একটা বক্তৃতা করিতে হইবে—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসিবেন। বসিয়া তামাক টানিতেছেন আর ভাবিতেছেন। দপ্তরে কেহ নাই। কর্মচারী মাত্র একটি সারাদিনে মুহুরীর কাজ সারিয়া আবার কখনো বাজারে যায়। আবার কখনো বসিয়া ভূপতিবাবুর ছেলেমেয়েগুলিকে ক-খ পড়ায়। এই সমস্ত কারণে মুহুরীকে অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে কিছু পয়সা দিতে হয়। কিন্তু সে পয়সা তিনি আদায় করিতে জানেন। বাহিরের জগতে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত আছেন। তাঁহার মক্কেলদের নিকটে তিনি বেশ ভদ্র এবং কর্মী। তাহাদের রেস্তোরাঁ হইতে চা-পানে পরিতৃপ্ত করাইয়া ছাড়েন। আত্মীয়স্বজন কেহ আসিলে সমাদরে বসাইয়া মিষ্টি মিষ্টি দু কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলেন, ভেতর থেকে একটু খাবার খেয়ে যেও। যা খুকী তোর মাকে বলগে।

খুকীর মা আসিয়া আত্মীয়কে ভিতরে লইয়া বসান। দুই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলেন, খাবারের বন্দোবস্তের জন্য। ভূপতিবাবু বলেন, রেস্তোরাঁ হইতে খাবার আনিতে হইলে ঘরে কর্ত্রী থাকে কেন? স্ত্রী বলেন, ঘরের জিনিসপত্র সমস্তই ফুরাইয়া যায় কেন? কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে। ফলে পর্দার ফাঁক দিয়া আত্মীয় খসিয়া পড়েন। খরচটাও বাঁচিয়া যায়। ভূপতিবাবুর বিস্তর টাকা জমিয়াছে তাই লোকে তাঁহাকে সমাদর করে। তাই তিনি গণ্যমান্য বক্তা, পরহিত ব্রতে তাঁহার ঐকান্তিক কর্মপ্রবণতা পাড়ার লোকেরা আলোচনা করে।

সেদিন মুহুরী মশাই বাজারে গেছেন। ছেলেটির পড়া হইতেছে না। ভূপতিবাবু ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে নালু, তোর পড়াশোনা কিছুই হচ্ছে না যে?

নালু তৎক্ষণাৎ বই লইয়া আসিয়া পাশের চেয়ারে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া বসিল। বসিয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, বাবা তুমি যেমন বুঝিয়ে দিতে পারো—কেউ তেমনটি পারে না। জজের ছেলে গোবিন্দ বলে, তোমার কাছে একদিন পড়তে আসবে—আচ্ছা বাবা দুঃখীজনে দয়া করো। দয়া কি? বলে দাও গল্পটা।

ভূপতিবাবু সাগ্রহে দুঃখীজনের দয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। দুঃখীদের দুঃখ মোচন করা তাহাদের ভিক্ষা, তাহাদের কাজকর্ম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদাহরণ প্রভৃতি সব কিছু। বলিলেন, গরীব দুঃখীকে দয়া করিলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। নালু পড়া বুঝিয়া নিতান্ত ভাল ছেলেটির মতই ভিতরে চলিয়া গেল। ইহার পর ভূপতিবাবু আবার কাগজপত্র ও দলিলাদির মধ্যে মনোনিবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনা গেল, শ্রীরাধে, চাট্টে ভিক্ষা দিন।

কে হে, এ দিকে এসো দিকিন।

বাবুর কণ্ঠের মিষ্টি আওয়াজ শুনিয়া বোষ্টম সামনে আসিল, উচ্চকণ্ঠে রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিল এবং স্মিত হাস্যে ভিক্ষা পাইবার আশা প্রকাশ করিয়া সামনে দাঁড়াইল। ফোঁটা তিলক কাটা, চন্দন চর্চিত, ভক্ত মাফিক মুখটি—পেলবতাহীন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ চোখে মুখে ষোলো আনাই আছে। হাসিয়া প্রকাশ করিল, ভোগের জন্যে ভিক্ষে চাই।

ভিক্ষা আমি অন্‌প্রিন্সিপ্‌ল দেব না।

• বোষ্টম হাসিয়া বলিল, কেন বাবু? দেবতাকে কি উপোস রাখবেন?

তুমি তোমার কথা বলচ?

আমি নই, দেবতা।

ভিক্ষা আমি বন্ধ করেছি।

আমি দেবতার ভোগের জন্যে বেরিয়েছি। আমি উপোস থাকব, কিন্তু মানুষের এই দুঃখ দুর্দশার দিনে দেবতাকে উপোস রাখা যায় না। অকল্যাণ হবে।

ভিক্ষে করো কেন? কাজকর্ম করে ভোগ দাও।

সে কি বাবু? সংযম, নিষ্ঠা এসব কে করবে? চিরকাল দিয়ে এখন যাদের ধর্ম হচ্চে ভিক্ষে, সংসারে যারা সবচেয়ে নীচ হয়ে সবার চরণে—

থাক থাক, সে সব কথা আমি শুনতে চাই নে। দেবতার নামে তোমাদের ভোগ—এতে আমি বিরুদ্ধ। দেশে ধর্মের নূতন আদর্শের প্রচার হওয়া উচিত।

সে কি বাবু আপনি হিন্দু—দেবতার ভোগ আর ভিক্ষে কি তা আপনি জানেন।

যাও, আর হিন্দু ধর্ম শিখিও না বাপু! এ ধর্মে সবার আদর্শই আছে। যে ভোগ দেবে, আর যে ভোগ না দেবে দুজনার জন্যেই পন্থা আছে।

কাতর কণ্ঠে এবার কৃত্রিম আবেগে বলিয়া ফেলিল, হায়, দেবতার ভোগ হবে না! বাবু, সব ঘর থেকেই ফিরে আসচি আজ, চালের দাম—সে জন্যে। দেবতার ভোগ হবে না বাবু?

তা নাই-বা হোল। ভগবান কখনো উপোস যান না—তোমরা ভোগ দাও আর নাই-বা দাও।

বাবু, আমাদের যে সেবা করতেই হবে। সেবাধর্মই যে আমি নিয়েছি। ঐটি না হলে মনুষ্যত্ব যাবে তলিয়ে। দয়া করুন বাবু। —দেবতার নামে দয়া করুন।

বোষ্টমের কণ্ঠে এবার করুণ আকুতির স্বর শুনিয়াও ভূপতিবাবু ভিজিলেন না, বলিলেন, ঈশ্বরের নামে দয়া প্রার্থনা করা—ঈশ্বরকে দয়া করা। অত বড় ক্ষমতা আমার নেই। তোমরাই আমাকে দয়া কর। হবে না এখানে—আর ঘাঁটিও না।

অগত্যা রাধাকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিয়া বোষ্টম চলিয়া গেল। ভূপতিবাবু আবার কাগজ-পত্রে মনোনিবেশ করিলেন। বোষ্টমের যুক্তিগুলি তখনো কানে বাজিতেছিল। কি সব বাজে সেন্টি-মেন্টালিজম! রাবিশ! দেয়ালে জাপানী ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতে-ছিল। দীর্ঘাকৃতি একটি ভিক্ষুক হাতে একটি থলি লইয়া আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। তাহার মুখের উপরের সমস্ত হাড় ও শিরাগুলি চামড়া ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। মুখের দুদিকের চামড়ায় কিছুটা ভাঁজ পড়িয়াছে, লম্বা নাকটি যে দুটি অনতি-গভীর গহ্বরকে অতিক্রম করিয়া রেখাঙ্কিত ললাটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটি মারবলের ন্যায় চক্ষু জ্বলিতেছে। গম্ভীর সুরে কহিল, বাবু চাট্টে চাল দিন।

দৃঢ় স্বরের মধ্যে না ছিল আকুতি, না দয়া ভিক্ষা। ভূপতিবাবু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কি চাই?

চাল দিন, চা-ল, খাব।

ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার ঢঙ্ দেখিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ওফ্ তুমি ভিক্ষা চাও?

দরজার সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চোখ ইসারায় জানাইয়া দিল যে, সে ভিক্ষাই চাহে। বড় বেয়াদব ত! এ যেন ভিক্ষা না চাহিয়া দাবী জানাইতে আসিয়াছে! ভূপতিবাবু বলিলেন, এখানে ভিক্ষা দেওয়া হয় না।

কেন দেওয়া হয় না?

সে জবাব তোমার কাছে দেবার দরকার নেই। সোজা কথা—পাবে না।

পাব না ত' না খেয়ে মরব নাকি?

তা' খেয়ে মরবে—কি না খেয়ে মরবে, সেজন্যে আমি জামিন থাকব না।

ভগবান আমাদেরও খেতে দিয়েছেন।

তা বৈ কি। কিন্তু, তোমাকে খেতে দেওয়ার জন্যে ভগবান আমাকে কোনরূপ নোটিশই দেন নি।

আমি যে আপনাদেরই পাড়াপড়শী, কাছেই থাকি। একটা আপনার জন না খেয়ে মরবে, আর আপনারা বসে বসে দিব্যি খাবেন?

আরে! এ যে মহামুস্কিল। ভারি আমার কুটুম্ব এসেছেন!

কুটুম্ব নই—তার চেয়ে বেশী। না খেতে পেয়ে এসেছি, চাট্টি চাল দিন, চলে যাই। দিলেই যাব।

কাজকর্ম করে খাও গে।

কম্মো নেই বলেই ত।

অত কথা বলতে হবে না। যাও।

যাব না। বসে থাকব।

জোর করে? জানো ট্রেস্‌পাস্ হচ্চে? জানো কি করতে পারি?

সব জানি। আবার না খেতে পেলে কিছুই জানি না। খেতে দিন, চাল দিন চলে যাব—না দিন যাব না। এক সন্ধ্যা নেমন্তন্ন খেয়ে যাব। আপনি দিব্যি আরামে খাবেন—আমি না খেয়ে মরব, এতো হতে পারে না।

দেব না, কিছুই দেব না—কি করবে?

চুরি করব, ডাকাতি করব, লুঠে নেব। বাস—

ভূপতিবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পুলিশ! পুলিশ! চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়াছেন, অতিশয় উত্তেজনায় মুখটি আরক্তিম হইয়াছে। ততক্ষণে ভিক্ষুক এক পা দু পা করিয়া গম্ভীরভাবে সরিয়া পড়িল। ভূপতিবাবু বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলে প্রবেশ করিল, একজন বলিল, সার ও ব্যাটা নামজাদা ভিক্ষুক। কোন বাড়ি থেকে ভিক্ষে না নিয়ে যায় না। ওকে দেখলে দিনের খাওয়া হয় না। আপনার এখান থেকে দয়া করে সরে পড়ল। নয় পুলিশ ডেকেও ওর কিছু করা যায় না। ভূপতিবাবুর স্ত্রী দপ্তরে গোল শনিয়া আসিয়া পর্দার ফাঁকে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ভিক্ষুকগুলি সব ওই রকমের। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বেশী না করাই ভাল।

এতক্ষণ বসিয়া ভূপতিবাবুর মিজাজটা চড়িয়া গিয়াছিল, বলিলেন, সে কথা আমাকে বলতে হবে না। আমি মানুষ চড়িয়েই খাই। তারপর তোমরা সব কি মনে করে?

আজ্ঞে চাঁদা চাই।

চাঁদা চাওয়া is a form of begging, you know?

Begging তো বটেই। তবে আমরা ভিক্ষুক নই এবং পরের জন্যে ভিক্ষে করছি।

যে রকম করেই হোক, ভিক্ষে তো? বুঝলাম তোমরা দেশ-সেবা করছ। কিন্তু তোমরাই আমাকে উপদেশ দাও—যদি কেউ অনু প্রিন্সিপল ভিক্ষে বন্ধ করে দেন, তা হলে সে চাঁদা দেবে কেন? তোমাদের অশ্রদ্ধা আমি করিনে। তোমরা বুঝি বন্যাপীড়িতের জন্য এসেছ?

আজ্ঞে হাঁ!

ভালো, তোমাদের সেণ্টিমেণ্টের প্রতি যথেষ্ট ইয়ে—Faith আছে। কিন্তু বন্যা হচ্চে ভগবানের অভিশাপ। আমাদের সেখানে কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। বন্যা হবেই। আর জনসেবা করবে গভর্নমেণ্ট। আমরা হচ্চি ব্যক্তি এবং ব্যক্তি জীবনকে গড়ব। তা ছাড়া আমি প্রিন্সিপ্‌লকে সবচেয়ে বড় মনে করি। সামান্য প্রিন্সিপ্‌লকেও বড় করে না দেখলে জাতির ভেতরে আদর্শ স্থাপন করা যাবে না।

ছেলের দলের মধ্যে কেহ একজন মুখপোড়া কহিল, বুঝে জল হয়ে গেলাম যে। আপনি তো কখনোই এক পয়সাও দেন না, বাজে ওজর দেখিয়ে বিদেয় করেন। একবার দিয়ে তারপর প্রিন্সিপ্‌ল করুন।

কে হে ছোকরা? তোমার বাবার নামটি কি? তুমি অম[illegible] করে কথাবার্তা বলচ—তোমার কাণ্ডজ্ঞান বলে জিনিসটি মোটেও নেই

আর একজন বলিল, আহা চটবেন না। ও ঐ রকমে[illegible] লোক। আমরা ওকে বুঝিয়ে নেব। কিন্তু আমাদের বিদে[illegible] করুন।

প্রিন্সিপ্‌ল থেকে আমি এক পা'ও নড়ব না—আর যাই বলো তোমাদের থিয়েটার ক্লাবের আনন্দের জন্যে যদি বল তাতে কিন্[illegible] আমার আপত্তি নেই।

তখন যেন বলবেন না—রাত্রি জেগে থেটার দেখা পছন্দ করিনে

মুখপোড়া বলিল, তখন আবার এসে অন্য প্রিন্সিপ্‌ল পাবে।

ছেলের দল কলরব করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িল কেহ নীরব, কেহ চীৎকার এবং কেহ হাই তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গেল। ভূপতিবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া সামনে বসিলেন এবং বলিয়া ফেলিলেন, আজকাল ছেলের দলগুলো য হয়েছে—তা আর বলতে! দল করলে আর চাঁদা আদায় করলেই যদি দেশসেবা হোত! আরে, দেশসেবা করতে হলে বিদ্যের জোর দরকার, জ্ঞান দরকার, জ্ঞান আর মনের ক্ষমতা—দুটোর যোগ হলেই কর্মী হওয়া যায়। আর এরা যে সব হয়েছে, এ জন্যেই অন-প্রিন্সিপ্‌ল এদের সাহায্য করা উচিত নয়।

ভূপতিবাবুর স্ত্রী পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া জানাইলেন, দিনকাল খারাপ। চীৎকার করে ওসব কথা বলো না। এরা দেশের কর্মী—তবুতো কিছু এরা করেছে। কিন্তু যাই বল, ওদের থেটারে চাঁদা দেওয়া আমি মোটেও পছন্দ করিনে। পয়সা খরচা যদি করলাম, তবে বায়স্কোপেই করব—এসব থেটারে কেন?

হ্যাঁ, ওই একটা বলে দিলাম। ওদের দেব চাঁদা, তুমিও ক্ষেপেছ!

এমন সময় পুত্র-কন্যা সহকারে একটি ভিক্ষুনী আসিয়া ভূপতিবাবুর পা জড়াইয়া পড়িল, কাঁদিয়া বলিল, বাবা খাওয়া হয় না। বাচ্চা নিয়ে উপোস আছি।

ভূপতিবাবুর স্ত্রী এবার দপ্তরে আসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, একজন করে যত লোক এল সবাইকে দিতে হ'লে আমাদেরও যে বাচ্চা নিয়ে উপোস থাকতে হবে।

ভূপতিবাবু বলিলেন, ছাড়—পাটি বুলি ছাড়িয়ে দিলে।

বাবু ছেলেপুলে নিয়ে একদম উপোস।

গৃহকর্ত্রীর তীক্ষ্ম স্বর জানাইল, এ মাগী রোজই ভিক্ষে নিতে আসে।

আজ্ঞে না, আমি ক'দিনের মধ্যেও এদিকে আসিনি। না দিলে আমরা পাব কোত্থেকে?

সে জানিনে, ভিক্ষে আমরা দিই না। ইহার পর অনেক কাকুতি, মিনতি ও অনেক করুণা ভিক্ষাই চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। অগত্যা ঘরের বাহির হইয়া গেল। ভূপতিবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রিন্সিপ্‌ল ভিক্ষা দিবেন না—কিন্তু দুর্দশার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, কাজের ফাঁকে তাহাও একবার ভাবিলেন। দীর্ঘাকৃতি সেই লোকটির কথা কখনো বা ভাবনার ফাঁকে আসিয়া নিজের কর্মের ভিতরকার শান্তি ও স্তব্ধতাকে চুরি, ডাকাতি ও লুঠ করিয়া লইতে লাগিল। সহসা দরজার দিকে তাকাতেই দেখিলেন—একটি অন্ধ ব্যক্তি;—বাবা অন্ধকে ভিক্ষা দাও।

ভূপতিবাবু একবার ভাবিলেন, অন্ধকে ভিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু সংসারে অনেক লোক ত' অন্ধ সাজিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়! আর অন্ধকে বাঁচিতে হইলে—কিন্তু সে ভাবনার দরকার কি? সংসারে প্রকৃতির নিয়মানুসারে যাহাদের উপযুক্ততা আছে, তাহারাই বাঁচিবে। মনে পড়িল, 'Servival of the fittest'—সেই কথা,

কলেজের প্রফেসার যাহা লইয়া বিশদ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সমস্ত কিছু আর মনে নাই—কিন্তু যাহা আছে—

বাবা অন্ধ কে ভিক্ষা দাও।

বাপু অন্ধ-টন্ধ বুঝিনে যাও। ভোর বেলা থেকে এ পর্যন্ত সামান্য কাজও করা হয়নি। এ অফিস ঘরে ভিক্ষে হবে না। তিনি দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন। সংসারে কে-বা কাহাকে দয়া করিতে পারে। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারাও আছে শুধু নিজেদের উপযুক্ততার গুণে।

দরজা ভেজান দেখিয়া গৃহকর্ত্রী কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভূপতিবাবু বলিলেন, আজ শুধু আপন মনে আরগুমেণ্ট কচ্ছি,—ভোর বেলা থেকে ভিখিরির জ্বালায় কিছুই কাজ করতে পারছি না।

ভাগ্যিস আমি ছিলাম পর্দার পেছনে। নয় তুমি যে কি করতে—বলা যায় না।

আমি কি মানুষের ধাপ্পায় বিশ্বাস করি? ভিক্ষা আর চাঁদা, হ্যাঃ—!

তা পর গো, তোমরা হিসেব করে চলতে জানো না। দয়া করবার অবস্থা কি আর লোকের আছে?

দরজার বাহির হইতে একটা অস্পষ্ট গোল শুনা যাইতেছিল। মুহুরী ঘরের পর্দা সরাইয়া আসিল। এক হাতে বাজারের ক্রীত জিনিসপত্র এবং অন্য হাতে ধৃত ভূপতিবাবুর পুত্র ও একটা নোংরা ঝুলিতে প্রায় সেরখানিক চাল। পিছনে আসিয়াছে সেই অন্ধ। মুহুরী বলিল, দেখুন কী ভীষণ কান্ড কচ্ছে। বাজার থেকে আসবার পথে দূর থেকে শুনি আমাদের ওদিকের গেটে একটা কিসের গোল। (গৃহকর্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া) আপনার দুলাল নালু মহারাজ সব ভিক্ষুকদের চাল বিলিয়েছে—সের কয়েক নিশ্চয়ই হবে। আবার কা'কে শুনলাম—ঘর থেকে চাঁদা দিয়েছে।

এমন সময় খুকী ভিতর হইতে আসিয়া জানাইল যে, তাহার স্কুলের মাহিনার টাকা হইতে এক টাকা পাওয়া যাইতেছে না।

গৃহকর্ত্রী বলিল, টাকা হাত বাক্সে ছিল।

নালু সভয়ে বলিল, বাবা বলেছেন তাই হাতবাক্স থেকে নিয়েছি।

মুহুরী কহিল, শুনুন কি বলচে। হাতবাক্স থেকে টাকা নিতে বাবা বলেছেন ওকে। জিজ্ঞেসা করলাম, চাল দিচ্ছিস যে তুই? ও বলে—"বাবা দয়া করতে বলে দিয়েছেন। ওরা যে ভিক্ষুক।" হুঃ, ওকে দয়া করতে বলেছেন।

ভূপতিবাবু নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাবিলেন—ভোরের পড়া বুঝাইবার কথাটি। অর্ধাঙ্গিনী হতবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া লইলেন। যেন জ্বলন্ত তুবড়ি ফাটিবার পূর্বাভাষ। শাণিত দৃষ্টি নালুর আপাদ-মস্তকে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

শুধু সেইক্ষণের নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ভিক্ষুকটা বলিল, বাবু আমার ঝুলি, আমার চালটা—বড় দুঃখী বাবু।

এতক্ষণে ভূপতিবাবু রাগিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ ব্যাটা বদমাস—দুখী। ছেলেপিলেদের ঠকিয়ে খাস্! দেখাচ্ছি মজাটা। অন্ধকে মারিতে বেগে ছুটিলেন।

তৎক্ষণে নালুর মাতাঠাকুরাণী নালুর উপর ঝাঁপাইয়া শ্যেন কণ্ঠে হাঁকিলেন "এসো তোমার দয়া আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

শুধু মুহুরী একবার তাহার বাবু এবং অন্যদিকে গৃহকর্ত্রীর নিকটে দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল।

এ দেশে আগত বিদেশী সৈনিক

(৩২৪ পৃষ্ঠার পর)

এই সব আগন্তুকের সম্ভাবনা অল্প। এই সকল লোক সাধারণত যে স্তরের লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় তাহারা এ দেশের কোন শ্রেণীর লোকেরই প্রতিনিধি নহে। রিকসাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, নানা মণিহারি জিনিসের খুচরা দোকানদার প্রভৃতি লোকেরা অতি লাভের আসায় এই সকল সৈনিকের সংস্পর্শে আসেন। যে কোন প্রকারে লাভ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ফেরিওয়ালা ও কাগজ ওয়ালারা অনেক সময় সীমা লঙ্ঘন করিয়া সৈনিকদের বিরক্ত করিয়া তোলে। এই সকল লোকের সংস্পর্শ হইতে নবাগতেরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য, সঠিক এবং বাঞ্ছনীয় হইবে না।

কিন্তু, বিদেশীদের মনে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ধারণা উৎপাদনের পক্ষে ভিক্ষুকেরা, বিশেষত স্ত্রীলোক ভিক্ষুকেরা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। কথাটাকে অবশ্য খুবই নিষ্ঠুর শুনাইবে। কিন্তু ব্যাপারটিও নিষ্ঠুর সত্য। ভিক্ষুকেরা নিঃসন্দেহ সকলের সহানুভূতির পাত্র এবং তাহারা যে এই প্রকার দুরবস্থা ভোগ করিতেছে তাহার দায়িত্বও তাহাদের নহে। তবুও বিদেশীরা এসকল কথা বিচার করিবে না—তাহারা এদেশের লোকের সামাজিক জীবনের উন্নতি মাপিবার সময় এসব কথা মনে রাখিবে এবং এসকলকে এদেশের সামাজিক জীবনের নিম্নমানের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিবে। একথা তাহারা মনে করিবে না যে বৈদেশিক শাসন ও শোষণের কলঙ্কেরই প্রমাণ ইহারা—কোন দেশ বিশেষের সামাজিক প্রতিনিধি ইহারা নহে।

এই নবাগত সৈনাদের যাহারা অপেক্ষাকৃত দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন তাহারা এই পাতলা পর্দা ভেদ করিয়া প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে। বরং এদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, এদেশবাসীর বুদ্ধি, শিক্ষা ও মার্জিত রুচি সহজেই তাহাদের লক্ষীভূত হইবে। এবং তাহার পাশে এই দুর্গতির চিহ্ন দেখিয়া তাহারা ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে এবং ইহার জন্য তাহাদের নিজেদের দায়িত্বের কথা ভাবিয়া বরং লজ্জিত হইবে।

কিন্তু, এদিক দিয়া আমাদেরও বোধ হয় কিছু করিবার আছে। সৈনিকেরা অনেকেই এদেশীয় ইংরেজী সংবাদপত্র কিনিয়া থাকে। এই সকল সংবাদপত্রে এদেশের জীবনযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ, এদেশীয় প্রথাপদ্ধতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা আমাদের গ্রাম্য জীবন-যাত্রার চিত্র এবং এই ধরণের আরও নানারকম বিবরণ এই সকল নবাগতকে এদেশের সহিত পরিচিত করিতে অনেকটা সহায়তা করিবে। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণ এ বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীদের মনে অনেক মিথ্যা ধারণা আছে। বহু স্বার্থান্ধ মিথ্যা প্রচারের ফলে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই মিথ্যা ধারণাকে অটুট রাখিবার জন্য চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের বিরাম নাই। ইহাকে প্রতিহত করিবার মত যথেষ্ট অর্থ ও সুবিধা আমাদের হাতে নাই। হাতের কাছে যেটুকু সুবিধা পাওয়া গিয়াছে তাহার যথাসুন্দর ব্যবহার না করা অন্যায় হইবে। এই সুযোগের ব্যবহার করিয়াই আমরা ঘটনার স্বাভাবিক গতিকে সাহায্য করিতে পারি।

বাঁকা স্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

৪

জ্যাঠামহাশয় আমাকে যে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমার মন আরো খরাপ হইয়া গেল। এ কি স্কুল! হাই স্কুলের এ কি দুর্দশা!

দেড় শত বৎসরেরও বেশী পুরানো একতলা একটি বাড়ি। তাহার বাহির ও ভিতর নোনায় খাইয়া গিয়াছে, জানলার কবাট নাই, দরজাও ভগ্নপ্রায়। কোন রকমের জুড়িয়া আঁটিয়া গরু-ছাগলের হাত হইতে ঘরগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ইহার মধ্যে ঢুকিতে পারে, গায়ের জোরও বোধ করি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া দুই পাশে আরো দুইটি চালাঘর, তাহাদের দরজা জানলার বালাই নাই—খড়ের চাল ও দরমার বেড়া দেওয়া। ইহার মধ্যে মাদুর বিছাইয়া কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে পড়িতেছে, শিক্ষক মহাশয় মাঝখানে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। ছেলে কম বলিয়া এক একটি ক্লাশ দরমার বেড়া দিয়া পার্টিশান করা—কোটাঘরেরও এইরূপ বন্দোবস্ত।

বিদ্যালয়ের দিকে চাহিয়াই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। ইহার পাশে কলিকাতার সেই প্রাসাদোপম শিক্ষানিকেতনটির কথা মনে পড়িল।

পথে আসিবার সময় জ্যাঠামহাশয় এই বিদ্যালয়টির বহু গুণ-কীর্তন করিতে করিতে আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। আশি বৎসরের পুরানো সেই বিদ্যালয়টি, ইহা হইতে পাশ করিয়া কত লোক দেশপূজ্য হইয়াছেন, এমন কি তিনি, আমার পিতা ও পিতামহ পর্যন্ত এই স্কুলে একদিন পড়িয়াছিলেন ইত্যাদি আরো গুণ-কাহিনী সেই প্রাচীন বিদ্যালয়টির সম্বন্ধে আমার কাছে সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই সব শুনিতে শুনিতে আমার মনে প্রথমটা খুব একটা বিস্ময় জাগিয়াছিল; মনে হইয়াছিল, না জানি স্কুলটি কিরূপ হইবে। তাই বাড়ি হইতে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া যখন ইহাকে চোখে দেখিলাম তখন আমার সমস্ত আগ্রহ নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল।

ইহার পর শিক্ষক মহাশয়দের দেখিয়া আরো বিস্মিত হইলাম। কে বলিবে ইঁহাদের শিক্ষক! জরাজীর্ণ, ক্ষয়াঘসা সব চেহারা, বুঝি ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যের আক্রমণে বিপর্যস্ত—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ পয়সার অভাবে বহুদিন কামানো হয় নাই, জামা কাপড়ের অবস্থাও সেইরূপ, মলিন ও বহু সেলাইয়ের চিহ্ন সম্বলিত, কাহারো পায়ে চটিজুতা, কাহারো বা তাহাও নাই। বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক—চেহারা সকলেরই সমান, দেখিলে মনে দয়ার উদ্রেক হয়। এই সব শিক্ষকদের পাশে কলিকাতার স্কুলের শিক্ষকদের সুন্দর ও মার্জিত চেহারা-গুলি মনে করিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম।

প্রথমেই আফিস ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম সম্মুখে একদল বৃদ্ধ, চোখে দড়ি বাঁধা পুরু কাচের চশমা লাগাইয়া চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া হুঁকা টানিতেছেন।

জ্যাঠামহাশয় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, ইনি হেডমাস্টার, নমস্কার কর। আমি এঁর কাছে পড়েছিলুম।

আমাদের দেখিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় চশমাটা তাড়াতাড়ি কপালের উপর তুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুইজনে তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলাম। এমন সময় গাড়ু হাতে করিয়া ও পৈতা কানে জড়াইয়া আর একটি বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন—ইনি হেডপণ্ডিত। তাঁহাকেও আমরা উভয়ে প্রণাম করিলাম। তিনি অস্ফুটস্বরে কি একটা আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—এ ছেলেটি কে হে কালীচরণ?

জ্যাঠামহাশয় বলিলেন, আমার ভাইপো এখানে ভর্তি করে দেবো।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় এইবার আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন। তিনি আমার সম্বন্ধে সমস্ত জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে শুনিলেন। জ্যাঠামশায়ও আবার বাবা যে কিছু না রাখিয়া আমাকে একেবারে তাঁহার ঘাড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় চপাইয়া গিয়াছেন সে কথা বলিতে ভুলিলেন না। হেডমাস্টারমশায় তখন আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি বাবা?

বলিলাম, আলোক রায়।

বেশ, বেশ নাম। বলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোন স্কুলে পড়তে?

সেণ্ট্ জে-ভিয়ার্স।

কলিকাতার এই সাহেবদের স্কুলের নাম শুনিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে—তিনি প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। তারপর মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—বেশ বেশ দেশে ছেলে দেশের স্কুলে পড়বে বৈকি—তোমার বাপ পিতামহ যেখানে পড়েছেন সে ত তোমার কাছে তীর্থস্থান তুল্য! ও সব সাহেবসুবোদের স্কুলে কি আমাদের মত ঘরের ছেলেদের পোষায়—কি বলো কালীচরণ? এই বলিয়া তিনি ঘন ঘন আরো দুই চারিটি টান হুঁকায় মারিয়া হেডপণ্ডিতমশায়ের নিকট সেই বেঁটে ও কড়িবাঁধা ধূম্রপাত্রটি হস্তান্তর করিলেন।

ইহার পর আমাকে পরীক্ষা করিয়া হেডমাস্টার মহাশয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া লইলেন।

জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে ভূতো যদিও আমার চেয়ে চারি বৎসরের বড় তথাপি সেও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। আমাকে সহপাঠী হিসাবে পাইয়া তাহার স্ফূর্তি খুব বাড়িয়া গেল। সে ভাবিল, তবে আমি আর তাহার চেয়ে বেশী কি লেখাপড়া শিখিয়াছি? কলিকাতায় থাকিয়া সাহেবদের স্কুলে পড়িয়া আমি যাহা শিখিয়াছি, গ্রামের স্কুলে পড়িয়া সেও তাহাই শিখিয়াছে।

বলা বাহুল্য, ইহাতে তাহার পিতামাতা কিন্তু খুশী হইলেন না। তাই জ্যাঠাইমা যখন শুনিলেন তাঁহার স্বামীর মুখে যে, তাঁহার ছেলে যে ক্লাশে পড়ে আমিও সেই ক্লাশে ভর্তি হইয়াছি তখন তিনি জ্যাঠামশায়কে একবার নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা এতটুকু ছেলে আলো ও কি ভুতোর সঙ্গে পড়তে পারবে—মুখপোড়া মাস্টাররা কি চোখের মাথা খেয়েছে? বলে আমরা মেয়ে-

মানুষ আমাদের যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাদের কি তাও নেই? ছোট বড় দেখলে বুঝতে পারে না?

জ্যাঠামশায় গৃহিণীর আসল ব্যথাটা কোথায়, বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, লেখাপড়াটা কি বয়েস দিয়ে মাপা যায়, ওর জন্যে মাথায় কিছু থাকা চাই। তোমার ছেলের মাথায় যে কেবল ষাঁড়ের গোবর পোরা তাই বয়েস বেড়েছে কিন্তু জ্ঞান বাড়েনি।

জ্যাঠাইমা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিলেন, বালাই,—ষাট্ আমার ছেলের মাথায় গোবর পোরা হবে কেন, শত্রুর হোক! তোমার অভিসম্পাত লেগে লেগেই ভুতো আমার লেখাপড়ায় দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বলি, আমার ছেলের মাথায় না হয় গোবর আছে; কিন্তু কার মাথায় যে সোনা আছে তা কোন্ চোখে মাস্টাররা দেখতে পেলে শুনি?

এই বলিয়া একটা মুড়ো খ্যাংরা লইয়া তিনি খর খর আওয়াজ করিতে করিতে উঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন। বস্তুত এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে ভর্তি হইতে হইলে যে ছাড়পত্র লাগে এবং তাহাতে যে লেখা থাকে—ছাত্র কোন্ ক্লাশ পর্যন্ত পড়িয়াছে সে খবর তিনি জানিতেন না। জ্যাঠামশায়ও সেকথা প্রথমে তাঁহাকে বলেন নাই। শেষে যখন জ্যাঠাইমা খুবই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, সেই সময় তিনি বলিলেন, এখানকার মাস্টারদের কি দোষ, তাদের তুমি মিছিমিছি গাল পাড়ছো কেন? ওখানে আলোক যে ক্লাশে পড়তো, এখানে এসে সেই ক্লাশেই ভর্তি হয়েছে।

নথ নাড়িয়া তিনি স্বামীর মুখের উপর জবাব দিলেন, বলি ভর্তি ত ও নিজে হয়নি: তা মাস্টাররা একবার পরীক্ষা করে দেখলে না পর্যন্ত যে, সত্যি সত্যি সে এখানকার স্কুলে পারবে কিনা?

জ্যাঠামশায় ইহা শুনিয়া তাঁহার মুখের কাছে আরো সরিয়া গিয়া বলিলেন, তাহলে আরো এক ক্লাশ উঁচুতে ভর্তি হতো! এই বলিয়া কি একটা কাজে তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু খিড়কীর দরজা পার হইতে না হইতেই এই কথাটি তাঁহার কানে তীরের মত গিয়া বিঁধিল—ভুতো যে কারুর চেয়ে বড় হবে তা তুমি বাপ হয়ে যখন সহ্য করতে পারো না, তখন অন্য লোকে পারবে কেন? সবই আমার অদৃষ্ট, তা না হলে আমার ভুতো আজ দুটো পাশ দিতে পারতো।

৫

পরদিন হইতে আমি ভুতোর সঙ্গে একত্রে রোজ স্কুলে যাইতাম। একই বই দুইজনে পড়িতাম। আমার জন্য পয়সা খরচ করিয়া বই কিনিতে হইল না বলিয়া জ্যাঠামশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

প্রথম হইতেই সহপাঠীদের ব্যবহারে আমার মন তাহাদের উপর বিরূপ হইয়াছিল; তাহার উপর যখন কয়েক দিনের মধ্যে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, লেখাপড়ায় তাহাদের সকলের চেয়ে আমি ভাল তখন পুরাতন ছেলেগুলির গাত্রদাহ আরো বাড়িয়া গেল, তাহারা ভিতরে ভিতরে দল পাকাইয়া আমাকে অপমান করিবার জন্য ছলছুতো খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু লেখাপড়ায় তাহারা কোনদিনই আমাকে জব্দ করিতে পারে নাই। সেইদিন হইতে প্রতি সাপ্তাহিক পরীক্ষাতে আমি ফার্স্ট ত হইতামই উপরন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় সেই বছর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৭ম শ্রেণীতে উঠিলাম।

বরাতক্রমে আমি প্রথম হইতেই শিক্ষক মহাশয়দের সুনজরে পড়িয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিতেন—শুধু লেখাপড়ায় নহে, সর্ব-বিষয়েই নাকি আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা অন্য ছেলেদের অপেক্ষা বেশী ছিল। তাই তাঁহাদের নিকট হইতে আমি নানা রকম সাহায্য পাইতাম। তাঁহারা আমাকে লাইব্রেরী হইতে ভাল ভাল বই লইয়া পড়িতে দিতেন, হেডমাস্টার একখানি খবরের কাগজ লইতেন। পরের দিন পড়া হইয়া গেলে সেটি তিনি আমায় দান করিতেন। ভালো ভালো খবরগুলিতে দাগ দেওয়া থাকিত, সেগুলি আমায় পড়িতে হইত।

আমি সহপাঠীদের সঙ্গে মিশিতাম না। তাহাদের খেলাধুলো হাসি-তামাসা কিছুতেই যোগ দিতাম না। ছেলেবেলা হইতেই আত্ম-সম্মান বোধ আমার এইরূপ প্রবল ছিল যে, যাহারা আমায় বিনা-দোষে অপমান করে তাহাদের কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতাম না। তাই সকলের মধ্যে থাকিয়াও আমি যেন ছিলাম একা। ইহার আরো কারণ আছে। সহপাঠীদের ভাবভঙ্গী আমার আদৌ ভাল লাগিত না। তাহাদের কথার মধ্যে যেমন কোন শ্রী নাই, ছন্দ নাই; তেমনি তাহা-দের গ্রাম্য রসিকতা ও চাষাড়েপনা দেখিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইতাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মন সুরুচিসম্পন্ন। সেইজন্য সমবয়সীদের কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতাম না। যতক্ষণ আমি স্কুলে থাকিতাম—নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকিতাম, অবসর সময়-টুকুও কাটাইতাম লাইব্রেরীর বই পড়িয়া।

স্কুলে যেমন আমার কোন বন্ধু ছিল না, বাড়িতেও তেমনি আমি ছিলাম একা—সকলের মধ্যে থাকিয়াও পর। ঘরে ও বাহিরে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল বই—আমার সুখ দুঃখ হাসিকান্নার সাথী! লাইব্রেরী হইতে—কখনো বা শিক্ষক মহাশয়দের নিকট হইতে এইগুলি চাহিয়া আনিয়া আমি পড়িতাম। নতুন নতুন বই আমার চোখের সামনে নতুন নতুন কল্পনার রাজত্ব খুলিয়া ধরিত। আমার মন তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া বেড়াইত—কখনো তেপান্তরের মাঠে, কখনো সাতসাগরের পারে, কখনো বা কত অজানা রাজ্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া। সেখানে কত রাজাউজীর, কত মন্ত্রি সেনাপতি, কত পরি-বনদেবী, কত ফুলকুমারী, পশুপক্ষী, কত দেশবিদেশ, কত আকাশ পাতাল স্বর্গমর্ত্য, কত লোকলস্কর, সেপাই পাহারা! তখন আমার মনে হইত আমি ত একা নহি, এ সংসারে আমার যে-সব সঙ্গী আছে, অন্য কাহারো, তাহা নাই!

আমার সহপাঠীরা যখন দল বাঁধিয়া খেলাধুলো করিত আমি তখন চুপ করিয়া একটা বই লইয়া পড়িতাম। আমার মন হয়ত এ পৃথিবী ছাড়াইয়া কোন্ এক স্বপ্নলোকে চলিয়া যাইত! সেদিন এ সৌভাগ্যের জন্য আমি মনে মনে ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ দিতাম!

ক্রমশ



সংকেত

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জাপান যুদ্ধে নামা মাত্র তিনুর আয় বন্ধ হলো। কাজ করতো একটা বইয়ের দোকানে। ছোট্ট দোকান। এতদিন কোন রকমে দোকানটা দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোলকাতা ইভ্যাকুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের অবস্থা এত সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল যে, ঘর ভাড়া কিংবা তিনুর মাইনে কিছুই দেওয়া আর সীতানাথবাবুর সাধ্য ছিল না।

তাই সীতানাথবাবু একদিন তিনুকে ডেকে বললেন—স্কুল সিজনটায় যদি এক পয়সা বিক্রি না হয় তবে আর দোকান রেখে লাভ কি?

তিনু দোকানের ভিতরকার অবস্থা জানতো, তাই কোন কথা বলেনি। নীরবে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সীতানাথবাবু তুললেন দোকান বন্ধ ক'রে দেওয়ার কথা। তিনিও এখানে থাকবেন না। বোমায় মরার চেয়ে দেশে না খেতে পেয়ে মরা ভাল।

বহুদিনের স্মৃতিজড়িত ছোট্ট বইয়ের দোকানটা একদিন তিনু নিজে হাতে বন্ধ করে দিল। ছোট্ট টিনের সাইনবোর্ডটা নিজে হাতে করেই দিয়ে এল সীতানাথবাবুর বাড়ি।

তার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। দেশ মুর্শিদাবাদের দিকে কোথায় যেন ছিল—এই কথা সে শুনেছে; কিন্তু কোনদিন তাদের বাড়ির কেউ সেখানে যায়নি। আর সেখানে গিয়েই বা তারা কি করবে? অনাহারে মরার চেয়ে কোলকাতায় থাকা অনেক ভাল। তবু তো চাকরীর সন্ধান মিলতে পারে!

দিন দিন দারিদ্র্য প্রকট হয়ে ওঠে। সংসারে চারটি প্রাণী—সে, তার স্ত্রী, বাবা ও মা। এদের ভরণপোষণের জন্য সামান্য চাকরীও আর সে পায় না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় শ্রান্তদেহে ক্ষুধার্ত জঠরে সে ফিরে আসে বাড়িতে—কোথাও আশা নেই। দূর কালো আকাশের থেকে ছোট ছোট তারার হাতছানি ছাড়া কোনও আহ্বানই সে পায় না।

হরিমোহনবাবুকে গিয়ে সে একদিন বলে—বাবা, আপনি একবার যদি সুবোধবাবুকে বলেন তবে আমার একটা চাকরী হয়ে যায়।

হরিমোহনবাবু অবাক হন। কিসের চাকরী, তিনিই বা সুবোধবাবুকে বললে চাকরী হবে কেন? তিনু তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলে—সুবোধবাবুর ছেলেই এ আর পিতে সকলকে চাকরী দিচ্ছেন। সবোধবাবুর সঙ্গে তার এত বন্ধুত্ব। যদি একবার বলেন তবে......

হরিমোহনবাবু শিউরে ওঠেন—এ আর পি! সেখানে গেলে কি আর কেউ ফেরে? চারিদিকে বোমা পড়বে। হয়তো তিনুর গায়েই একটা বোমা পড়লো, তারপর—

মা বলেন—আমার বাপু ভয় করে। না খেয়ে মরবো সেও ভালো, তবু এ আর পিতে যাসনে তিনু। সেদিন বেচুর মা বলছিল—

রাধা রাতে অনুযোগ করে—নাই বা গেলে এ আর পিতে। ওঁরা এত ক'রে বারণ করছেন, আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমারও তোমাকে ওভাবে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে না।

তিনু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে—ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে না! কিন্তু এদিকে যে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছ, সে খেয়ালও নেই।

পরদিন সকালে তিনু বাইরে বেরোবার সময় হরিমোহনবাবু একবার তাকে ডাকলেন, কিন্তু তিনু তাঁর কথা না শুনে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল। হরিমোহনবাবু একবার কি ভাবলেন, তারপর বাড়ির ভিতর গিয়ে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে বললেন—বৌমা, আমি একবার সুবোধের ওখান থেকে আসছি।

সেই দিনই তিনুর এ আর পতে চাকরী হলো।

হরিমোহনবাবু তিনুকে ডেকে বলেন—সত্যিই আর এ আর পিতে ভয় নেই, কি বলিস? নইলে সুবোধের ছেলে সতীশই কি আর ওতে থাকে?

তিনু তার খাকির জামাটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলে—এ খুব আরামের চাকরী বাবা। বোমা কোলকাতায় কোনদিনই পড়বে না, অথচ সরকারের পয়সায় সার্ট, প্যাণ্ট, জুতো-মোজা সবই হলো। আর মাস গেলে ত্রিশ টাকা ক'রে মাইনে।

সতীশের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই হরিমোহনবাবুর দেখা হয়। হরিমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—জাপান কি সত্যিই এদিকে আসবে বলে মনে হয়?

প্রতি সকালেই আজকাল তিনি পাড়ার লাইব্রেরীতে যান খবরের কাগজ দেখতে। জাপানীরা ভারতের বাইরে অভিযান চালিয়েছে। কোন এক রাজনীতিজ্ঞ জানিয়েছেন—জাপানীরা ভারতে আসতেই পারে না। তাদের সে মতলবই নয়। আর তারা সমবেত মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে শীগ্‌গিরই ভীষণভাবে পরাজিত হবে।

হরিমোহনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। এত বড় রাজনীতি বিশারদ কখনও কি ভুল বলতে পারেন? তাঁদের জ্ঞান কত বেশী! এ আর পিতে তবে ভয় নেই।

তিনু এসে একদিন বলে—আজ একবার পরীক্ষা করার জন্য সাইরেন বাজবে। সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকবেন।

হরিমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—জাপানীরা কি সত্যি সত্যি আসবে?

তিনু হেসে ওঠে—পাগল! জাপানীরা কোথায়? এ শুধু কোলকাতার লোকদের এ আর পি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাইরেন বাজবে।

হরিমোহনবাবু স্থির হতে পারেন না। সাইরেন বাজবে অথচ জাপানী আসবে না—এ কখনও সম্ভব? আজ তিনি হয়তো কাগজ ভাল ক'রে পড়তে পারেননি। জাপানীরা হয়তো এতক্ষণে হাওড়া স্টেশনের কাছে এসে বসে রয়েছে, কিংবা শিয়ালদায়;—হয়তো দুজায়গায়ই ঘাঁটি পেতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আজ খবরের কাগজ পড়ার সময় ভোলাবাবু বড্ড বেশী গল্প করছিলেন। ভোলাবাবুর উপর তাঁর রাগই হয়ে গেল।

সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দরজা জানালা আটকিয়ে বসলেন। বৌমা কোথায়? ও কি, মুখে কাপড় দেও, কানে তুলো দিয়েছ তো? দেওনি—বোমা পড়লে বুঝবে মজা!

তিনুর মা বলে ওঠেন—বোমা পড়বে কি? তিনু যে বললে বোমা পড়বে না।

—হ্যাঁ, বোমা পড়বে না। তিনু আমাদের বয়স হয়েছে দেখে ভুল বলেছে। সাইরেন বাজবে আর বোমা পড়বে না! এতক্ষণে জাপানীরা হাওড়া কি শিয়ালদায় বসে আছে দেখো।

এক মুহূর্তে তিনুর মা ও রাধা সচকিত হয়ে ওঠে। ভয়ে তাদের মুখ সাদা হয়ে গেছে। রাধা আস্তে আস্তে বলে—মা, একটা কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

তিনুর মা বলেন—শুনছ, কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে।

দূরে থেকে একটা ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়। বাইরে এ আর পির বাঁশী মাঝে মাঝে বেজে ওঠে। হরিমোহনবাবু দরজাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে আকাশের দিকে তাকান। তারপরই দরজা বন্ধ করে দেন, বলেন—এরোপ্লেন! হয়তো জাপানীরা আসছে।

রাধা শাশুড়ীকে আঁকড়িয়ে ধরে। তিনুর মা হরিমোহনবাবুকে বলেন—শুনছ, এখানে এসে বসো। বোমা পড়লে সকলেই একসঙ্গে যেন মরি।

আবার সাইরেনের শব্দ হয়—মৃত্যুমুখী আর্তনাদের মত। তাঁরা সকলে চমকে ওঠেন। দরজা খোলার সাহস পর্যন্ত তাঁদের আর কারও নেই। কিছুক্ষণ পরে তিনুর গলা শোনা যায়। হরিমোহনবাবু দরজা খুললেন।

মা জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁরে, জাপানীরা পালিয়েছে?

তিনু হেসে ওঠে—জাপানীরা কোথায়? এতো এমনি বাজানো হচ্ছিল তোমাদের সাবধানের জন্য।

মা বিরক্ত হয়ে বলেন—এখন হাসি রাখ। আমরা সবই বুঝি—

তিনু তাঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারলো না যে, এ জাপানী আসার সংকেত নয়।

পরদিন লাইব্রেরী থেকে ফিরে হরিমোহনবাবু বললেন—শুনেছো, জাপানী আসেনি। এমনি মিছিমিছি সাইরেন বাজানো হয়েছিল—কাগজে লিখেছে।

তিনুর মা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠেন—তবে কাল তুমি ও সব বলে ভয় পাইয়ে দিলে কেন?

তারপর প্রায় সাইরেন বাজে, সকলেরই অভ্যাস হয়ে গেছে। আজ আর জাপানীদের ভয় তাঁরা করেন না। জাপানীদের সম্বন্ধে খবরের কাগজে আর নূতন কিছু থাকে না, হরিমোহনবাবুও আর খবরের কাগজ পড়েন না।

একদিন তিনু এসে বলে—জানেন বাবা, চট্টগ্রামে বোমা পড়েছে।

হরিমোহনবাবু চমকিয়া ওঠেন—বলিস কি? তবে তো কোলকাতায় যে কোন মুহূর্তে বোমা পড়তে পরে।

তিনু বলে—হ্যাঁ, তার ভয় তো আছেই।

মা বলেন—তবে এ চাকরী তুই ছেড়ে দে। আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

তিনু মাথা নাড়ে—আর হয় না মা। এখন এখানেই থাকতে হবে।

ভয়ে সকলের মুখই বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনুর মুখেও হাসি নেই।

তিনুর মা হরিমোহনবাবুকে গিয়ে বলেন—আদর করে চাকরী দিলে এখন সামলাও। তোমার জন্যই আমরা বোমা খেয়ে মরবো; ছেলেটাও অপঘাতে মারা যাবে।

ভাত খাওয়ার সময় হরিমোহবাবু লক্ষ্য করেন, রাধার চোখ দুটোও অশ্রুসজল। যে কোন মুহূর্তে হয়তো ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে পারে।

সমস্ত খাবারই যেন বিস্বাদ বলে মনে হয়। সত্যিই তিনি এ কি করেছেন? না হয় এ আর পিতে তিনুর চাকরী হতোই না। তিনু ইচ্ছা করলে কি অন্য কোথাও আর চাকরী জোগাড় করতে পারতো না! সমস্ত পৃথিবীটা আবছা মত হয়ে যায়।

রাত দশটা। হঠাৎ সমস্ত কোলকাতা কাঁপিয়ে সাইরেনগুলো ডেকে ওঠে। তিনু লাফিয়ে উঠে তার জামাকাপড় পরে নেয়। হরিমোহনবাবুকে বলে—আপনারা স্থির হয়ে বসে থাকুন, আমি পোস্টে যাচ্ছি।

তিনু বেরিয়ে যায়। হরিমোহনবাবু দরজা জানালা আটকিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকেন। বহু দূরে এরোপ্লেনের শব্দ শোনা যায়। তারপর বুম বুম করে কয়েকটা শব্দ ভেসে আসে।

হরিমোহনবাবু সেই অন্ধকারে তাকিয়ে দেখেন রাধা তার শাশুড়ীর কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

তিনি বলেন—ভয় পেয়ো না বৌমা। হয়ত জাপানীরা নয়।

রাধার সমস্ত শরীরটা কয়েকবার কেঁপে ওঠে।

তিনুর মা ছলছল গলায় বলেন—বৌমা কাঁদছে।

তাঁরও চোখের কোণ থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে।

ঘণ্টা দুয়ের পরে আবার সাইরেন বাজে—অল্ ক্লিয়ার! তিনুও ফিরে আসে।

হরিমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—জাপানীরা এসেছিল?

তিনু মাথা নাড়ে—হ্যাঁ এসেছিল। বোমাও ফেলেছে।

ভয়ে তাঁদের মুখ পাংশু হয়ে যায়।

তিনুর মা হরিমোহনবাবুকে বলেন—শুনছ? একবার সুবোধবাবুকে বলে তিনুর চাকরীটা ছাড়িয়ে দেও। এর চেয়ে না খেয়ে মরবো সেও ভাল।

হরিমোহনবাবু বলেন—তা হবার নয়। সতীশ বলেছে আর চাকরী ছাড়া এখন যাবে না।

তিনুর মা কেঁদে ফেলেন—তুমি জেনে শুনে এ সর্বনাশ করলে কেন?

হরিমোহনবাবুর গলা কেঁপে ওঠে, কিছু বলতে পারেন না।

পরদিন শেষ রাতে আবার সাইরেন বাজে। তিনু বাড়িতে নেই। হরিমোহনবাবু বার বার বলেও রাধাকে বসাতে পাচ্ছেন না। রাধা বন্ধ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টি জানালায় প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

তিনুর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, অনেক সময় অস্ফুটভাবে হরিমোহনবাবুকে বক্রোক্তি করে। হরিমোহনবাবু

(শেষাংশ ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছিয়াত্তর

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ

দুপুর বেলার কড়া গরমের চোটে ঘুমটি পাকে নাই, আধ-জাগা অবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কমলাকান্ত চক্রবর্তী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। মনে হইল সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম, একটা বিড়ালের বক্তৃতায় বুঝি তাঁহার মৌতাত জীবনের মোড় হঠাৎ ঘুরিয়া গিয়াছিল; মূল্যবান দ্রব্য ও অনুপান কিনিবার জন্য পয়সা ব্যয় করা নিছক স্বার্থপর বিলাস বিবেচনা করিয়া সমস্তই দশের মঙ্গলের জন্য দান করিয়া দেন এবং শেষে দশ হইতে দেশের কাজে নামিয়া পড়েন। জ্বালাময়ী ভাষায় সেই বিড়ালের কথা সভাতে সভাতে ছড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। ফলে কিছুদিন সশ্রম কারাবাসের পর একদম নিঃস্ব অবস্থায় নি-জলা নি-ফলা বাঙলাদেশের গেঁয়ো পথে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুঃসময়ে সেই পরামর্শদাতা বিড়াল বাবাজীর সন্ধান পাইলেন না; বন্ধুবান্ধবও একে একে কোথায় সরিয়া পড়িল। তাই তিনি মনের দুঃখে সংসারই ছাড়িয়া দিলেন।

গৈরিক বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ মালা, আর প্রকাণ্ড একটা ত্রিশূল। ছোট্ট ঝুলির ভিতর হইতে কি যেন একটু দ্রব্য বাহির করিয়া বাম-হাতের মধ্যে রাখিলেন, তারপর ফোঁটা কয়েক জল দিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে তাহা মর্দন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য! এতদিনের সুখদুঃখের সাথী অহিফেনটুকু ছাড়িয়া দিলেন নাকি? সামনেই করযোড়ে এক চেলা বসিয়াছিল, নম্রভাবে প্রশ্ন করিল, গুরুদেব, হঠাৎ এটি ধরলেন কেন?

ব্যোম্, ব্যোম্, শিবশংকর, বলিয়া কমলাকান্ত মৃদু হাস্য করিলেন। লোটা হইতে আরও ফোঁটা কয়েক জল তুলিয়া লইয়া পাশের একটি শীর্ণকায় লোকের প্রতি তাকাইয়া কহিলেন, এই দুর্দিনে না খেতে পেয়ে বেটা বাড়ির সবাইকে নিয়ে মরছিল; তার উপর কাল ওর ঘরবাড়ি, মায় ছেলে বউটা পর্যন্ত পুড়ে শেষ হয়ে গেল। একেবারে পথের ভিখিরী! তবু ওর কোন দুঃখ নাই। কেন? আগে গরীব ছিল বোলে কোনো আশা ছিল না, এখন সব হারিয়ে কোন ভরসাও নাই। কেন? জল দিয়ে ওর বাইরের আগুন নিবিয়েছে, কিন্তু ভিতরের আগুন নিবল কিসে?

প্রভু—

থাম বেটা! যে ওকে নির্বিকার করেছে, সে এই; বলিয়া তিনি হস্তস্থিত দ্রব্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বলি-লেন, শুধু কি তাই? এর গুণ আশ্চর্য রকমের—ভেবে শেষ করা যায় না, তাই আমি এ ধরেচি। ভারতের শতকরা পঁচানব্বইজন খেতে পায় না, কোটি কোটি নিরন্ন বুভুক্ষু লোকের অন্ন-সমস্যা সমাধান করতে আমি এই নূতন পথে এসেছি; আমার একমাত্র আশা—এমন একটি জিনিস আবিষ্কার করব, যাতে আমার দেশ-বাসীর এই ঘোরতর সমস্যার সমাধান হবে। বন্দে মাতরম্—পেয়েছি, সে অমৃত আমি পেয়েছি; বলিয়া তিনি আর একবার জোর দিয়া দ্রব্যটি দেখিতে লাগিলেন। এক টান, ব্যস্—সারাদিন খেতে হবে না। মন নির্মল আনন্দে পূর্ণ হয়ে থাকবে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হবে, দুশ্চিন্তা উড়ে যাবে, মনে হবে—রাজা বাদশা! অথচ খাঁটি স্বদেশী জিনিস। চরকায় কাটা খাদির সামিল বলা চলে। নিজ দেশের নওগাঁ-এ প্রস্তুত, স্বহস্তে তৈরী—গান্ধীজীর পর্যন্ত কিছু আপত্তি থাকবে না এতে।

সত্যই মনে হইল, কমলাকান্তের জীর্ণ শরীরটিতেও যেন একটা দ্যুতি খেলিয়া বেড়াইতেছে। মরা গাঙে বান ডাকিয়াছে বুঝি! অলস প্রাণহীন চারপায়াবাসী ত্রিশূলের সামনে বসিয়া যেন দৃপ্তোন্নত যুবকে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন।

আরও জন কয়েক কৃশ, রুগ্ন লোক আসিয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িল। তিনি তাহাদের দিকে এক-বার হাত তুলিয়া কহিলেন, বৈঠে। তারপর পুনরায় সেই প্রশ্ন-কারীর দিকে দৃষ্টি তুলিয়া কহিলেন, লোকে বলে দেশব্যাপী মহামারী আরম্ভ হয়েচে। কারও ঘরে ভাত নেই; গৃহী ভেবে ভেবে কঙ্কালসার হয়েচে, সংসারে সকলেরই উপবাস; লোকের সে গোলাভরা ধান নেই, কান্তিভরা শরীর নেই, হাসিভরা মুখ নেই; ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এখন আর সে আনন্দের প্রস্রবণ নাই, আছে দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর করাল ছায়া। ঠিক এমনি সময়ে আরও কতকগুলো কৃষ্ণবর্ণ মৃতপ্রায় লোক ছায়ার মত আসিয়া তাঁহার চারিদিকে উপবেশন করিতেই কমলাকান্ত বিকটভাবে হাসিয়া উঠিলেন, সবটাই যেন একটা প্রহসন; বলিলেন, বঙ্কিমে বেটা 'আনন্দ মঠে' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বর্ণনা দেবার জন্যে কষ্ট করে অনেক কল্পনা করেছে। কিন্তু আজ বেঁচে থাকলে আর কল্পনা করতে হোত না। চোখের সামনে সব দেখে লিখতে পারত। ঘরে ঘরে হাহাকার দেখতে পেত, ক্ষুধার তাড়নায় চুরি, ডাকাতি, আত্মহত্যা, দুধের অভাবে শিশুর মৃত্যু—আরও কত কি! ঐ—ঐ ঘরে এক বেটা সাত দিন একদম খেতে না পেয়ে নিজের চার চারটা ছেলেমেয়েকে প্রথমে পিছনের পুকুরটায় ডুবিয়ে মারল, তারপর নিজে গলায় কলসী বেঁধে—ব্যস্। এমনি তো পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে। এই দেখ, কুকুরটা পর্যন্ত তোদের মত ধুঁকছে; বেটার কুটোটি জোটেনি। পুনরায় কমলাকান্ত হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কলিকার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ওধারে উবু হইয়া এক ব্যক্তি বসিয়াছিল; তাহাকে যুবক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যেন বার্ধক্যের স্থবিরতা তাহার কৃশ শরীরে চাপিয়া বসিয়াছে। এক রকম শুষ্ক অস্পষ্ট স্বরে কহিল, গুরুদেব, ঊনপঞ্চাশ সালেই কি ছিয়াত্তর আরম্ভ হয়ে গেল?

কমলাকান্ত মৃদু হাসিলেন, বিজ্ঞের হাসি; কলিকার দ্রব্যটুকু সাজিতে সাজিতে উত্তর দিলেন, ভুল রে বেটা—ভুল; মায়া! ঊনপঞ্চাশ হোলেও এটা ছিয়াত্তরই। আমাদের দেশে এই সাতাশটা বছর সবাই এগিয়ে চলে। তুই পঁচিশ বছর বয়সে তাই সাতান্ন

বছরের বুড়ো। এবার মরলেই হোল! আর যারা চল্লিশ, তারা তো সত্তর। লোকে বলে, এ দেশে বুঝি অকালমৃত্যুর ছড়াছড়ি। তোবা তোবা! সাতাশটা বছর যোগ কর, দেখবি আমাদের গড়-পড়তা আয়ু কোন দেশের চেয়ে কম নয় বরং বেশী। অকাল-মৃত্যু?—ছ্যোঃ!

কিন্তু প্রভু, অন্নাভাব—

—সেই দুঃখেই আমি সন্ন্যাস নিয়েছি। এমন জিনিস আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে চাই, যা ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করবে। পেয়েছি, আমি পেয়েছি সেই জিনিস। তিনি কলিকাটি ঊর্দ্ধ্বে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, ভারতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এর প্রচলন করব; একটান,—সারাদিন নিশ্চিন্ত!

ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই, তাকাইতেই দেখিলাম, দলে দলে শীর্ণ-ম্লান ছায়ার মত নরনারী কমলাকান্তের ধুনির চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে; প্রত্যেকটি যেন এক একটি নরকঙ্কাল, আর্তের করুণ প্রতিমূর্তি। কমলাকান্ত হস্ত দুটি যুক্ত করিয়া কলিকাটি বিশেষ ভঙ্গি সহকারে মুখের উপর চাপিয়া ধরিতেই সেই বুদ্ধের মত যুবক একটু অগ্নি তুলিয়া দিল; অতঃপর ধ্যানগম্ভীর মুখে একবার "ব্যোম্" বলিয়া ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে নাভিমণ্ডল পর্যন্ত জোর দিয়া তিনি টান দিলেন। মনে হইল, সংশ্লুব্ধ জনতা তৃষিত দৃষ্টি মেলিয়া হাত বাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সপ্তকোটী কণ্ঠের কলকল নিনাদ না হইয়া একটা কর্কশ চিঁ চিঁ শব্দ হইল মাত্র। দক্ষিণ করে কলিকা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলাকান্ত যেন হস্ত প্রসারিত করিলেন, কিন্তু এ কি! দেখিলাম, কমলাকান্ত তো নয়, এক অনিন্দ সুন্দর নারীমূর্তি; বদনমণ্ডল বিষাদ-মলিন, অতি ক্ষীণ ক্লিষ্ট হাসি; প্রসারিত কর কাঁপিতেছে; দণ্ডায়মান নরনারীর দিকে তিনি যাহা ধরিয়া আছেন, তাহা কলিকা নয়, শূন্য ভিক্ষার পাত্র।

হঠাৎ কাঁসার বাসন ভাঙ্গার মত একটা খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল, স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। চকিতে চাহিয়া দেখিলাম, স্ত্রী মোলায়েম স্বরে কি বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিতেছেনঃ আজ একমাস ধরে চাল বাড়ন্ত বলছি যে, খেয়াল নেই? আধ-পেটা খেয়ে পড়েও তো, এ বেলায় নিটেকাট উপোষ যে! সন্ধ্যে পর্যন্ত নাক ডাকালেই পেটকটা পুরবে কি?

বাক্যস্ফূর্তি হইল না, ফ্যাল্ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিলাম। অষ্টম বর্ষীয় পুত্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, বাবা, এবেলা ভাতের সঙ্গে ডাল চাই কিন্তু।

তিনি একটু দম লইয়া হাত নাড়িয়া কহিলেন, ছেলে বউকে যে খেতে দিতে পারে না, তার বিয়ে করা কেন? চোখ যেন রাঙা জবা। গাঁজা খেয়েছ নাকি? বেশত, চাল যোগাড় করে দরকার নাই, গাঁজাই দেখ; সবাই মিলে খেয়ে ব্যোম্ ব্যোম্ করে বেরিয়ে পড়ি।

কথাটি না বলিয়া বাহির হইলাম, উপস্থিত চালের চেষ্টাতেই।

সংকেত

(৩৩১ পৃষ্ঠার পর)

অন্ধ অন্ধকারের দিকে নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকেন। এরোপ্লেনের শব্দ শোনা যায় বাইরে, আর বোমার শব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। মনে হয়, এখনই বাড়ির উপর একটা পড়বে। সকলেই চমকে ওঠেন।

বোমার শব্দ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনুর মা'র কান্না শুরু হয়। এবার আরও জোরে।

কিছুক্ষণ পরে আবার এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। এবার খুব কাছে। বাড়ির উপর দিয়েও চলে গেল। তিনুর মা তখনও কাঁদছেন। রাধাও সেভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

চুপি চুপি হরিমোহনবাবু দরজা খুললেন। তারপর বাইরের কুৎসিৎ অন্ধকারের মধ্যে একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন। দু'একটা তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

আবার এরোপ্লেন এগিয়ে আসে। হরিমোহনবাবু উঠানের উপর শুয়ে পড়েন। মনে মনে বলেন,—এইবার বোমাটা শুধু তাঁর মাথার উপর পড়ুক। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক্ তাঁর এই জীর্ণ দেহ; শেষ হোক তিনুর মৃত্যুর আগে তাঁর এই দুঃসহ আয়ু।

অল্ ক্লিয়ার সাইরেন বেজে ওঠে।

হরিমোহনবাবু ভাবেন, হয়তো বোমা পড়ছে। চোখ বুজে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

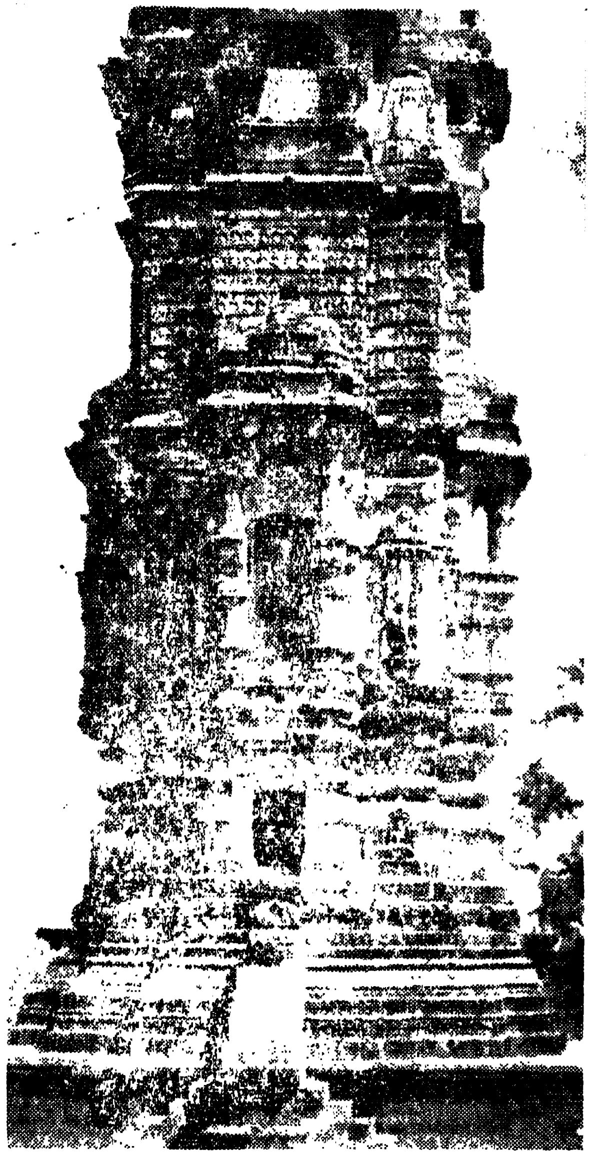
তারাগড়

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভারতের তিনটি দুর্গ ইতিহাস-প্রসিদ্ধঃ তারাগড়, চিতোরগড় এবং সিংহগড়। শিবাজীর সিংহগড়ের সহিত তানাজীর নাম চির-বিজড়িত। শিবাজীর মাতা জিজাবাই পুত্রকে সিংহগড় অধিকার করিবার জন্য আদেশ করিলে শিবাজী তাঁহার বিশ্বস্ত বীর সেনাপতি তানাজীকে মাতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তানাজী স্বীয় পুত্রের বিবাহোৎসব ফেলিয়া যুদ্ধে চলিলেন। তানাজী প্রাণ দিয়া সিংহগড় অধিকার করিলেন। শিবাজী এই সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'হায়! গড় ত আসিল, কিন্তু সিংহ আসিল না'।

কয়েক মাস পূর্বে মহারাষ্ট্র ভ্রমণ কালে পুনরায় সিংহগড় দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। চিতোরগড়ের হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! চিতোর দুর্গে এত রাজপুত নিহত হইয়াছিল যে, তাঁহাদের যজ্ঞ-সূত্ররাশির পরিমাণ হইয়াছিল সাড়ে চুয়াত্তর মণ। রাজপুতনায় এবং বাঙলার কোন কোন স্থানে এখনও চিঠির পিছনে যে ৭৪৷৷৹ লেখা হয় তাহা চিতোরগড়ের বীভৎস ব্যাপারের স্মৃতি। সম্প্রতি তারাগড় পরিদর্শন করিলাম।

তারাগড় আজমীঢ় শহরের প্রান্তে পর্বত-শিখরে অবস্থিত। এই পাহাড়টি আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮৫৫ ফুট উচ্চ। এই দুর্গ প্রাচ্যের অন্যতম প্রধান দুর্গ এবং ভারতের ইতিহাসে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তারাগড়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে জানা যায়, ভারতের বুকের উপর দিয়া কি বিপ্লব ও অত্যাচারের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। তারাগড়টি বীটলি পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহার ইহার আর একটি নাম 'বীটলী গড়'। সম্রাট শাহজাহানের বিশ্বস্ত সেনাপতি বিঠলদাস গড় ১৬৪৪ হইতে ১৬৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত আজমীরের গবর্নর ছিলেন এবং তিনি তাঁহার শাসনকালে তারাগড় একবার মেরামত করিয়াছিলেন বলিয়াও এই দুর্গকে বীটলীগড় বলা হইত। কর্ণেল টড(১) বলেন যে, এই তারাগড় (দুর্গ) ৮০ একর জমি বিস্তৃত, সমতল-



চিতোরগড়

(1) Tods' Rajasthan, vol. 1. (p. 783).

ভূমি হইতে ১৩০০ ফুট ও আজমীঢ় শহর হইতে প্রায় সহস্র ফুট উচ্চ এবং রাজা অজয় পাল কর্তৃক নির্মিত। তারাগড় আজমীরের এক পার্শ্বে সগর্বে শির উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। কেন্ সাহেব(২) এই দুর্গ পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই



চিতোরগড় মন্দির

দুর্গের দৃশ্য অতি মনোহর, বিশেষত প্রাতে। ডাঃ আর্ভিন(৩) লিখিয়াছেন যে, অজয় পাল নির্মিত এই দুর্গের প্রাকারটি বিশ ফুট চওড়া ও বিশ ফুট উচ্চ এবং প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ ছিল। এই প্রাকার বর্তমানে বিলুপ্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দ্বাদশ শতাব্দী যাবৎ এই দুর্গের উপর কত যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজা অজয় পাল ছিলেন আজমীঢ় শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সপ্তম শতাব্দীতে এই দুর্গ নির্মাণপূর্বক ইহার নাম স্বীয় নামানুসারে রাখেন 'অজয়মেরু দুর্গ'। আজমীঢ় শব্দটি অজয়মেরু শব্দের অপভ্রংশ।

বিশপ আর হিবার(৪) বলেন, "তারাগড় একটি অসাধারণ দুর্গ। ইহা এক প্রকার দুর্ভেদ্য এবং দুর্গম বলিলেই চলে। ইহাতে প্রায় বার শত লোক বাস করিতে পারে। এখানে জলের অভাব নাই। ইহাতে যদি ইউরোপীয় শিল্প-নৈপুণ্য লাগান হইত তাহা হইলে ইহা দ্বিতীয় জিব্রাল্টারে পরিণত হইত।"

"আকবার-উল-আখিয়ার" নামক গ্রন্থমতে তারাগড় ভারতের সর্বপ্রথম দুর্গ। সোমনাথ এবং থানেশ্বর মন্দিরদ্বয়ের বিখ্যাত ধ্বংসকারী সুলতান মামুদ গজনী ১০২৪ খৃীঃ তারাগড় আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে আহত ও অকৃতকার্য হইয়া পলায়ন করেন। ইহাই তারাগড়ের উপর প্রথম অভিযান। হুইলার সাহেব(৫) বলেন যে, এই আক্রমণের পর ১৭০ বৎসর তারাগড় শান্তিতে ছিল। ১১৯২ খৃীঃ সম্রাট পৃথ্বীরাজ থানেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইলে সুলতান সাহাবুদ্দিন ঘোরী এই দুর্গ আক্রমণ এবং অধিকার করেন। রাভেটির(৬) মতে সাহাবুদ্দিন আজমীঢ় ত্যাগ করিবার পরেই পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিরাজ পুনরায় তারাগড় দখল করেন এবং আবার ১১৯৫ খৃীঃ কুতুবুদ্দিন উহা অধিকার করিয়া সৈয়দ হোসেন মাশেদিকে উহার গবর্নর নিযুক্ত করেন। গুজরাটের রাজা ভীমদেব কর্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কুতুবুদ্দিন তারাগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজপুতবীরগণ তারাগড় লইবার জন্য দীর্ঘ ছয়মাস ব্যাপী যুদ্ধ করেন কিন্তু আফগানিস্থান হইতে বিপুল সৈন্য আসিয়া পড়ায় দুর্গ অধিকারে অক্ষম হন। ১৩৯৭ হইতে ১৪০৯ খৃীস্টাব্দের মধ্যে মাড়োয়ারের রাজা রণমলের অধীনে শিশোদিয়াগণ তারাগড় অধিকার করেন। কিন্তু ব্রিগ্ সাহেবের(৭) মতে মান্তুর আলাউদ্দিন খিল্‌জি ১৪৫৫ খৃীঃ ইহা আক্রমণপূর্বক তারাগড়ের গবর্নর গজাধর রায়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। ১৫০৫ খৃীঃ মেবারের কানোয়ার পৃথিরাজ মুসলমান গবর্নরকে বধ করিয়া তারাগড় গ্রহণ করেন। ১৫৩৩ খৃীঃ গুজরাটের বাহাদুর শাহ শিশোদিয়াগণকে পরাস্ত করিয়া ইহা গ্রহণ করেন। বেলে সাহেব(৮) বলেন, 'মার্তার রাও বিক্রমদেব ১৫৩৫ খৃীঃ ইহা গ্রহণ করেন; কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে যোধপুরের রাও মলদেব ইহা কাড়িয়া লন।'

১৫৪৪ খৃীঃ তারাগড় অস্থায়ীভাবে শের শাহ শূরের হস্তগত হয়। ইলিয়ট সাহেবের(৯) মতে ১৫৪৫ খৃীঃ শূর রাজবংশের এক সরকারী কর্মচারী হাজি খাঁ উহা কিছুকালের জন্য দখল করেন কিন্তু আকবরের সেনাপতি সৈয়দ কাশিম খাঁ নেশাপুরী উহা গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহ-সময়ে তাঁহার ভ্রাতা দারাশিকো তারাগড়ে থাকিয়া আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু ১৬৫৯ খৃীঃ পরাস্ত হওয়ায় দুর্গটি আওরঙ্গজেব অধিকার করেন। তারপর ১৭২০ খৃীঃ অবধি তারাগড় মোগল অধিকারে ছিল। তৎপরে মহারাজা অজিৎ সিংহ উহা দখল করেন। ১৭২২ খৃীঃ জয়পুরের মহারাজা জয়সিং, হায়দরকুলী এবং ইরাদত খাঁ

(2) Caines' Picturesque India (p. 81).

(3) Dr. R. H. Irvine's Medical Topography of Ajmer.

(4) Heber's Journal, vol. II, (p. 48).

(5) Wheeler's History of India vol. IV (p. 41).

(6) Raverty's Tabgati Nasiri (p. 519).

(7) Brigg's Ferishta, vol. II (p. 222).

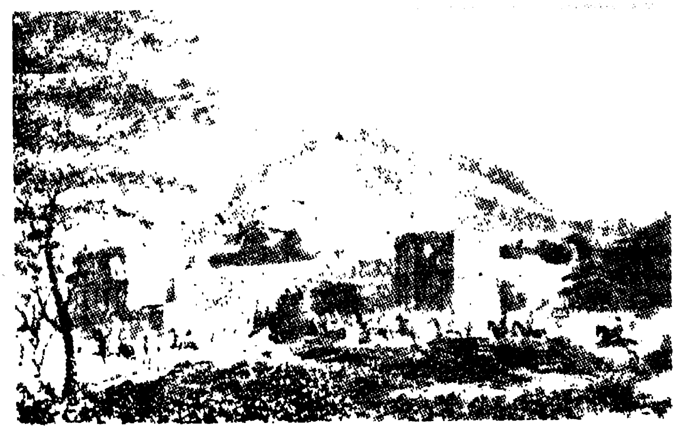
(8) Bayley's Guzrat. (p. 71).

(9) Elliot's History of India, vol. VI, (p. 22).

বান্দাশের সৈন্যগণের দ্বারা এই দুর্গে আক্রান্ত হয়। অজিত সিং ক্রমাগত চারিমাস যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হন। ১৭৪৪ খৃীঃ মাড়োয়ারের মহারাজা অভয় সিংহ তারাগড় গ্রহণপূর্বক ইহাকে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহারাজা বিজয়সিংহের রাজত্বকালে মারাঠা সেনাপতি জয় আপ্পা নাগোরে নিহত হন। সেই ক্ষতি পূরণের জন্য আজমীঢ় (এবং তারাগড়) মারাঠা-দিগকে দেওয়া হয়। কম্পটন সাহেবের (১০) মতে ১৭৮৭ খৃীঃ লালসট যুদ্ধের পরে যখন সিন্ধিয়া পরাজিত হন, তখন রাঠোরগণ সিংহী ভীমরাজের অধিনায়কত্বে তারাগড় আক্রমণ করেন। সেনাপতি ডি বইগ্নের (De Boigne) অধীনে এক সৈন্যদল রাজপুতনায় প্রেরিত হয়। ডি বইগ্নে ১৭৯০ খৃীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আজমীঢ়ে উপস্থিত হইয়া তারাগড় আক্রমণ করেন কিন্তু এই দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া দুই হাজার অশ্বারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য রাখিয়া মার্তার দিকে অগ্রসর হন। শান্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধ করেন এবং ১৭৯১ খৃীঃ তারাগড় প্রাপ্ত হন। ১৮০০ খৃীঃ জেনারেল পেরন (Perron) ডি বইগ্নের স্থানে সিন্ধিয়ার সেনাপতিপদ লাভ করেন। তখন মারাঠা সেনাপতি লাখোয়া দাদা সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় সেনাপতি পেরন মেজর বউরজিয়েনকে (Major Bourguien) আজমীর অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। বউরজিয়েন সাহেব ১৮০০ খৃীঃ ডিসেম্বর মাসের প্রথমে আজমীঢ়ে উপনীত হইয়া ১৮ই ডিসেম্বর তারাগড় আক্রমণ করেন কিন্তু বিতাড়িত হন। দীর্ঘ পাঁচ মাস যুদ্ধের পর কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি ঘুষ দিয়া ১৮০১ খৃীঃ ৮ই মে অন্যায্য উপায়ে তারাগড় দখল করেন। তখন হইতে ১৮১৮ খৃীঃ জুলাই অবধি এই দুর্গ সিন্ধিয়ার অধীন ছিল। তারপর উহা ব্রিটিশ সরকারের হস্তগত হয়। ১৮১৮ খৃীঃ ২৮শে জুলাই কর্নেল নিক্সন এবং স্যার ডেভিড অক্টারলোনি(১১) তারাগড় দুর্গে প্রবেশ করেন।

লা টুকে সাহেব(১২) বলেন ১৮১৮ হইতে ১৮৩২ খৃীঃ অবধি তারাগড় দেশীয় পদাতিকগণ কর্তৃক অধিকৃত ছিল। ১৮৩২ খৃীঃ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তারাগড় পরিদর্শনান্তে ইহার দুর্গত্ব দূর করিবার আদেশ দেন। ১৮৬০ খৃীঃ হইতে ১৯২০ খৃঃ পর্যন্ত তারাগড় ইউরোপীয় সৈন্যগণের স্বাস্থ্যনিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসের কত গৌরব-স্মৃতি যে ব্রিটিশ সরকার এইভাবে লুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন, ভারত-ভ্রমণ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমরা আজমীঢ় শহর হইতে ৪ঠা এপ্রিল প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় তারাগড় যাত্রা করিলাম। শহরের নয়াবাজারে



তারাগড়; আজমীঢ় (১৮১৮ খৃঃ অঙ্কিত)

খ্বাজা দর্গা সাহেবের পেছনেই তারাগড়ে উঠিবার রাস্তা। এই স্থানকে ইন্দ্রকোট বলে। ইন্দ্রকোটে মুসলমানই সমধিক। তারাগড়ের পাদদেশ হইতে শীর্ষে উঠিতে আমাদের এক ঘণ্টা লাগিল। আমরা উঠিলাম একপথে, নামিলাম আর একপথে। উঠিবার বা নামিবার মাত্র এই দুইটি পথ আছে। পাহাড়টি এত খাড়া যে, অন্য দিক দিয়া উঠিবার উপায় নাই। নামিতে আমাদের মাত্র চল্লিশ মিনিট লাগিল। তারাগড়ে আমরা এক ঘণ্টা থাকিয়া সব জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। তারাগড়স্থ হিন্দু-স্মৃতি একেবারে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসার মিঃ এইচ বি ডব্লিউ গ্যারিক (১৩) ১৮৮৩ খৃীঃ তারাগড় দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, জীর্ণ কাছারীটি হিন্দু যুগের এবং উচ্চ ফটকগুলিই খুব প্রাচীন। কাছাড়ীতে হিন্দু যুগে আদালত বসিত। তারাগড়ে এখন একটি বিশাল দর্গা, গির্জা, পাদ্রীদের গ্রীষ্মাবাস এবং ডাক্‌বাংলো প্রভৃতি অবস্থিত। দর্গাটির নাম মিরান সাহেব এবং ইহা ১৫৫৭ খৃীঃ নির্মিত হয়। এই দর্গার অধিক অংশ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর হিন্দুগণ কর্তৃক প্রস্তুত হয়। কর্নেল টড্ (১৪) ১৮১৮ খৃীঃ ৪ঠা জুলাই লিখিয়াছেন—"এই মসজিদটি চৌহানের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষর উপরেই নির্মিতঃ এই চৌহান সাতবার সুলতানকে বন্দী করেন এবং সাতবার মুক্ত করেন।" দর্গার খাদিমগণই বর্তমান তারাগড়ের প্রাচীন বাসিন্দা। প্রায় আশিটি খাদিম পরিবার ওখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত। তাঁহাদের

(10) Compton's European Military Adventurers of Hindusthan (p. 37).

(11) Rajputana Gazetteer, vol. II, (p. 19).

(12) La Iouche's Gazetteer, (p. 54).

(13) Archeological survey Report for 1883-84, (p. 42).

(14) Tods' Rajasthan, vol. I, (p. 782).

সন্তানদের জন্য এখানে একটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলও আছে। ইন্দ্রকোট হইতে তারাগড়ে উঠিতে অর্ধপথে লক্ষ্মী পোল। এইটি দুর্গের প্রথম দরজা। এই পোল সম্বন্ধে আজমীড়ে নিম্নোক্ত প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে।

আনাসাগর পোল বিচ, বড় জিত্‌রো বিস্তার।
লখ গাড়া কো ভার হ্যায়, লীজো কাল দুকাল॥

অনুবাদঃ এই লক্ষ্মী পোল এবং আজমীঢ়স্থিত আনাসাগর হ্রদের মধ্যে এক লক্ষ গাড়ী ধনদৌলত ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। দুর্ভিক্ষে বা দুঃসময়ে এই সম্পদ্ লওয়া যাইতে পারে। এই প্রবাদের প্রকৃত অর্থ এখন আর কে আবিষ্কার করিবে?

প্রথম দর্গা মিরান সাহেব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, ১২০২ খৃীঃ যখন রাজপুতগণ তারাগড় আক্রমণ করেন, তখন এই দুর্গের গভর্নর মিরান সৈয়দ হুসেন খাঙ্গাওয়ার নিহত হন এবং তাঁহাকে ও তৎসঙ্গে নিহত মুসলমান সৈন্যগণকে এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস শর্দা মহাশয় (১৫) বলেন যে, এই প্রবাদ ভিত্তিহীন এবং কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। এই সময়ের সাড়ে চারিশত বৎসর পর্যন্ত কোন দর্গা নির্মিত হয় নাই বা এই স্থানের পবিত্রতা জ্ঞাপন করা হয় নাই। আকবর যখন আজমীঢ়ের খাজা চিস্তি সাহেবের দর্গায় আসিতে লাগিলেন, তখন তারাগড়স্থ মিরানের কবরের কথা লোকে জানিল। আকবরের রাজত্বকালে জব্বর খাঁ এই দর্গা নির্মাণ করান। ১৫৪৫ খৃীঃ পর্যন্ত এই স্থানের কোন মাহাত্ম্য ছিল না। বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায় আজ তাহা তীর্থ! এই-রূপ তীর্থের মাহাত্ম্য সহজেই অনুমেয়। তীর্থের উৎপত্তি এই প্রকারে হইলে এই সকল তীর্থদর্শনে হৃদয় পূত না হইয়া সাংসারিকতায় পূর্ণ হয়। দর্গার দক্ষিণ তিবারীর এক অংশ শ্বেত মার্বেল প্রস্তরের। ইহা আজমীঢ়ের এক হিন্দু গভর্নর বলরাও ইংলিয়া কর্তৃক ১৮০৭-৮ খৃ নির্মিত হয়। এবং পশ্চিমের তিবারীটি গুমানজী রাও সিন্ধিয়া কর্তৃক ১৮১২-১৪ খৃীঃ নির্মিত হয়। দর্গাস্থিত শিলালিপিতে ইহা উল্লিখিত আছে। মহারাজা সিন্ধিয়া এই দর্গার ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি গ্রাম প্রদান করেন। দর্গার একদিকে বহু কবর আছে। তারাগড়ে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

হিন্দু-গৌরবের এই বিলুপ্ত ও বিস্মৃত স্মৃতিস্তম্ভের কথা বিস্মিত মনে ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্তপদে আমরা বাসায় ফিরিলাম। তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত, হিন্দু-গৌরব-রবি কি চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে না পুনরায় উদিত হইবে? ভারতের আকাশে বাতাসে এই প্রশ্ন হুংকার করিয়া উঠিতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে কে জানে?

(15) Ajmer: Historical and Descriptive. (p. 55) by Diwan Bahadur Har Bilas Sorda.

পয়লা বৈশাখ

১৩৫০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা

পয়লা বোশেখ,—
কাল-বোশেখীর,—
কৃষ্ণ-শকুন,—মেল্‌ছে পাখা
পূব কোণে ঐ,—
দিচ্ছে উঁকি,—
সারা আকাশ,—কালোয় ঢাকা;
ঘর দোর সব,—সামাল্ ওরে
উড়্‌বে যে আজ—কোন্ ভাগাড়ে
গলিত্-শবের চিহ্ন বুঝি
লোলুপ-আঁখি,—পাচ্ছে দেখা!

পাশ্‌টে পাখার,—দমকা ঝাপট্
অমঙ্গলের ঘণ্টা নাড়ে
গাছ-পালা সব,—ঝাপটা খেয়ে
অস্থি-ভাঙা লুটায়ে পড়ে।
প্রেত ডাইনী,—ঝঞ্ঝা বায়ু
কা'র কোথা যে,—কাড়্‌বে আয়ু
নষ্ট তারা,—গ্রহের দোষে
কাঁপন-ধরায়,—কঠিন হাড়ে!

কলিযুগের সত্যি কি শেষ,—
নাস্তিকতার শেষ অভিযান?
মিত্র,—নাজি,—সোভি'র বুকে
বিশ্ব-জোড়া বিরাট শ্মশান!
অমঙ্গলের শঙ্খরোলে
যদিও বধির বিশ্ব টলে
ঐ শকুনের পক্ষপুটেই
শকুন্তলার শয্যা বিছান্;
পয়লা-বোশেখ,—লগ্ন ভালো
কাল-প্যাঁচাতে উড়াক্ নিশান!

অশরীরী মূর্তি ও পুনর্জন্ম

হিমাংশু সরকার

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা নগরীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক বি এল আত্রে মহাশয় মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের সভাপতিরূপে বিজ্ঞান কংগ্রেসে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন।

এই অভিভাষণে আত্রে মহাশয় বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, বর্তমান মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে একটা অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হইয়াছে। সেইটি এই যে, আমাদের মনের যেমন প্রাত্যহিক জগতে ক্রিয়া করিবার জন্য সাধারণ অনুভূতি এবং মনোবৃত্তি আছে তেমনি মনুষ্যের মনের মধ্যে এমন অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং মনোবৃত্তি আছে, যেগুলি যদিও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, তথাপি ইহার বহু দৃষ্টান্ত সাধারণের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সংগ্রহ করা যায়। কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে বিশেষভাবে বিকাশ হইয়াছে ইহাও দেখা যায় এবং তাহাদের সাহায্যে এই অনুভূতিগুলির বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা চলে। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলির গবেষণার ফলে আর একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হইয়াছে যে, আমাদের এই পার্থিব জীবন শুধু জড়বস্তুর ঘাত প্রতিঘাত লইয়া নহে। আমাদের এই পার্থিব জীবনের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় জগৎ জড়িত রহিয়াছে বা ক্রীড়া করিতেছে। আমরা এই অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে কতক কতক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা লাভ করিতে পারি এবং এই জ্ঞান হইতে আমরা দুইটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাই,—একটি হইতেছে যে, পৃথিবীতে আমাদের এই নশ্বর দেহ ধ্বংস হইলেও আমাদের ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয় না। আমাদের পার্থিব দেহ ধ্বংস হইবার পর যদিও আমাদের ব্যক্তিত্ব পার্থিব দেহ অবলম্বন করিয়া থাকে না তথাপি যে এই ব্যক্তিত্ব কোন অশরীরীভাবে থাকে তাহার প্রমাণ আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে পাই।

আর একটি বিষয় এই যে, আমরা অনেক সময় এই অপার্থিব জগৎ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে এমন সব তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি যাহার ফলে আমাদের পক্ষে পুনর্জন্মের অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হয়। আমাদের পূর্বের মুনি ঋষিগণও এই সব বিষয় লইয়া যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমরা আমাদের পুরাতন শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখি। বর্তমানে সমবেত বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টার ফলে আমরা এখন এই সব তথ্য আর এক নূতন পথে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতেছি।

যাহা হউক শ্রীযুত আত্রে মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে তিনি অশরীরী মূর্তি এবং পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মোটামুটিভাবে গুটী কতক কথা তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তিনি অভিভাষণে অশরীরী মূর্তি (apparitions) সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

প্রাচীনকাল হইতেই ভূত-প্রেত অশরীরীর আত্মার অস্তিত্ব বিষয় মনুষ্যজাতির উপলব্ধির মধ্যে আসিয়াছে। ১৮৮২ সালে মানসিক গবেষণা সমিতি (Psychical Research Society) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এই সমিতি ইহার পর হইতে অশরীরী মূর্তির স্বপক্ষে বহু বিশ্বাস্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। এই তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাই বলা চলে যে, এই ভৌতিক মূর্তি অবলোকন মনের ভ্রম অথবা মন হইতে উদ্ভূত কাল্পনিক চিত্র নহে। ইহার সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিয়া এই বিশেষ তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে যে, মৃত মানুষের অশরীরী মূর্তি ছাড়াও যে মানুষ মুমূর্ষু এবং এমন কি যে মানুষ জীবিত আছে তাহাদের অশরীরী মূর্তি দেখা যায়। ইহা অপেক্ষাও অত্যাশ্চর্য যে, পরীক্ষা ক্ষেত্রে কোন কোন জীবিত মানুষ তাহাদের নিজেদের ছায়া মূর্তি ইচ্ছানুযায়ী উদ্ভব করিতে পারে। উক্ত সকল প্রকারের অশরীরী মূর্তি সত্য, বাস্তব এবং অনুভবনীয়। Carrington বলেন—"এই ধরণের হাজার হাজার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।" Andrew Lang-এর ভাষায় বলা যায়—"অশরীরী মূর্তি নিশ্চিত এবং যথার্থই আসে, তাহাদের সত্য সত্যই অনুভব করা যায়।"

এখানে প্রত্যেক ধরণের অশরীরী মূর্তি সম্বন্ধে একটি করিয়া উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ—

১। মৃতের অশরীরী মূর্তি—একটি ভদ্রলোক যখন নিজের শয্যার উপরে জাগরিত অবস্থায় ছিলেন সেই সময় তিনি দেখিলেন যে, খাকী পোষাক পরিহিত তাঁহার এক সহকর্মচারী রক্তশূন্যে মুখে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। ভদ্রলোকটি যখন সহকর্মীকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন, তখন সহকর্মী উত্তর করিলেন,—"আমি গুলিবিদ্ধ হইয়াছি।" 'কোন্ স্থানে' এই প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর করিলেন, "গুলী ফুস্‌ফুস্ ভেদ করিয়াছে।" যখন তাঁহাকে আরও প্রশ্ন করা হইল তখন তাঁহার মূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। ভদ্রলোকটি তখন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপেই জাগরিত ছিলেন। তিনি ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তখন সকাল ৮-১০ মিনিট। দুই দিন পরে তিনি এই সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার সহকর্মী, যে রাত্রে তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে নিহত হইয়াছে।

২। মুমূর্ষুর অশরীরী মূর্তি—একটি মহিলা ঘরের মধ্যে বসিয়া সেলাই করিতে করিতে পরিষ্কার দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা, যে ঠিক সেই সময় প্রায় ২৫ মাইল দূরে এক গ্রামে বাস করিতেছিল, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় চাহিতেছে। অশরীরী মূর্তি খুব শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার একদিন কি দুই দিন বাদে মহিলাটি সংবাদ পাইলেন যে, যখন তিনি তাঁহার ভ্রাতার ছায়ামূর্তি দেখিয়াছিলেন ঠিক সেই সময় সে মারা যায়।

৩। জীবিতের অশরীরী মূর্তি—১৮৪৮ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ গভর্নমেণ্টের সামরিক কর্মচারী Major General Richardson মুলতান শহর অবরোধের সময় আহত হন। আহত হওয়ার পর তাঁহার মনে হয় যে, তিনি বোধ হয় আর বাঁচিবেন না। তাঁহার পার্শ্বে ঐ সময় যে উপস্থিত ছিল তাহাকে তিনি বলেন—"আমার আঙুল হইতে আংটীটি লও এবং উহা আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিও।" তাঁহার স্ত্রী Lady Richardson সেই সময় ১৫০ মাইল দূরে ফিরোজপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় Lady Richardsonও তাঁহার স্বামীর আহত অবস্থার ছায়ামূর্তি দেখেন এবং তাঁহার স্বামী আহত অবস্থায় যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন ঠিক সেই কথাগুলি তিনি ছায়ামূর্তির মুখ হইতে শুনিতে পান। Lady Richardson এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার স্বামী সুস্থ হইলে ঘটনাটি তাঁহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া দেখেন যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবিক এবং সত্য।

৪। জীবন্তের পরীক্ষিত অশরীরী মূর্তি—S. P. R. এর

প্রতিনিধি S. H. B. স্বীয় অশরীরী মূর্তি নিজের দেহের বাহিরে সংস্থাপন করা সম্ভব কিনা এই পরীক্ষা করিবার জন্য রাত্রি ১টার সময় তিন মাইল দূরবর্তী তাঁহার পরিচিত দুইটি মহিলার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে সঙ্কল্প করেন। এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তিনি নিদ্রা যান এবং এ সম্বন্ধে পরে আর কিছুই চিন্তা করেন না। ইহার পাঁচ দিন পরে তিনি মহিলা দুইটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। S. H. B. এ সম্বন্ধে নিজ হইতে কিছু বলিবার পূর্বে মহিলাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাটি S. H. B.কে বলেন যে, পাঁচ দিন পূর্বে রাত্রি ১টার সময় তিনি তাঁহাকে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান অনুভব করিয়া যথেষ্ট ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহিলাটি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, সেই সময় তিনি সম্পূর্ণরূপেই জাগরিত ছিলেন।

আমরা সাধারণত কোন জীবিত ব্যক্তির অশরীরী মূর্তি নিম্নলিখিত অবস্থায় দেখিয়া থাকি, যথা সে ব্যক্তি হয় নিদ্রিত, সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত, কোনরূপে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন, সম্মোহিত অথবা সমাধিস্থ অবস্থায় আছে। এইরূপ ধরণের ঘটনাকে বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে যথা—স্বপ্ন সঞ্চরণ, মানসিক ভ্রমণ বা অভিযান, অশরীরী দেহের প্রক্ষেপ ইত্যাদি। F. W. H. Myers এইরূপ ধরণের বহু ঘটনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের যে গভীর স্তর আছে তাহার মধ্যে স্বীয় অশরীরী মূর্তি উপরোক্তরূপে প্রক্ষেপ করার শক্তি নিহিত আছে। এই সমস্ত ঘটনা সেই সমস্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত। Mr. Myers বলেন যে, অশরীরী প্রক্ষেপণের ক্ষমতাই একমাত্র ক্ষমতা যাহার প্রয়োগ মানুষ কি জীবিত কি মৃত উভয় অবস্থায় করিতে পারে। এই অশরীরী প্রক্ষেপণ একজাতীয় চিন্তা সঞ্চরণ, যাহা স্থান কালের উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে চিন্তাগুলির কি অস্তিত্ব কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের কিংবা তাহার মনের বাহিরেও থাকিতে পারে? বাস্তব জগতে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের মতই কি তাহারা অনুভবনীয়? ইহারা কি কোন পরিমিত সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে থাকে? হাঁ। মনোবিদগণ বহু তথ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক Dargel, Dr. Geby, Dr. Joiriদের নাম করা যাইতে পারে। Dr. Lindsay Johnson-এর ভাষায় বলা যায়—"চিন্তা হইতেছে বাস্তব বস্তু, ইহাদের শ্রবণ এবং দর্শন করা যায়, এমন কি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ফটোগ্রাফের প্লেটে চিত্র গ্রহণ করা যায় এবং ইহা দূরে প্রক্ষেপ করাও যায়। ইহা স্থায়ীও হয় ও অনির্দিষ্ট সময়ের পর পুনরাবির্ভূত হয়। বর্তমানে গবেষণার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, 'Astral Body'র অস্তিত্বের দ্বারা অশরীরী মূর্তি ইত্যাদি তথ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে।

ইহার পর শ্রীযুক্ত আত্রে মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পুনর্জন্ম (Reminiscence) সম্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন।

এইরূপ দেখা যায় যে, কোন কোন শিশু তাহাদের পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা হইতে এমন সব ঘটনা, বস্তু, মনুষ্যের, আত্মীয়ের এবং স্থানের কথা বলিতে পারে যাহা তাহাদের এ জন্মের অভিজ্ঞতায় নাই। এইরূপ ঘটনার বিবরণ ভারতবর্ষ ছাড়াও অন্যান্য দেশে পাওয়া যায়।

পুনর্জন্ম যে সম্ভবপর ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ ১৯৩০ সালের মানসিক বিজ্ঞান ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে (Quarterly Journal of Psychic Science) বাহির হইয়াছিল। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ। সিসিলি দ্বীপের Dr. Carmelo Samonaর Alexandrina নামে একটি পাঁচ বৎসরের কন্যা ১৯১০ সালে মারা যায়। কন্যাটির মৃত্যুর তিন দিন পরে কন্যার মাতা স্বপ্নে দেখেন যে, Alexandrina তাঁহাকে বলিতেছে—"মা আর কাঁদিও না, আমি আবার তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব।" এই স্বপ্ন দেখার পর কন্যার পিতামাতা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া মৃত কন্যার আত্মার সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রেতচক্রে (Seances) বসেন। কন্যার আত্মা স্বীকার করে যে, সে স্বপ্নে তাহার মাতাকে দেখা দিয়াছিল এবং সে পুনর্বার বলে—"মা, তুমি আর কাঁদিও না, আমি আবার তোমার সন্তানরূপে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। সে ইহাও বলে যে,—"মা, তোমার গর্ভে আরও একজন আছে।"" অর্থাৎ Alexandrinaর মা যে যমজ সন্তান প্রসব করিবেন ইহাই Alexandrina বলিতে চাহিয়াছিল। অথচ ইহার পূর্বে তিনি আর কোন যমজ সন্তান প্রসব করেন নাই। ইহার পর সত্যই তিনি যমজ কন্যা প্রসব করেন। যমজ দুইটির মধ্যে কনিষ্ঠাটির চেহারা মৃতা Alexandrinaর চেহারার সহিত বহু সাদৃশ্য ছিল। এমন কি মৃতা Alexandrinaর মতই কনিষ্ঠা যমজটি বাম হস্তের দ্বারা সব কাজ করিত। কিছুকাল পরে Alexandrinaর পিতামাতা Monreale নামে একটি শহর ভ্রমণ করিতে যাওয়া স্থির করেন। শহরটি যমজ কন্যা দুইটি কোন দিনই দেখে নাই। কিন্তু মৃতা Alexandrina দেখিয়াছিল। কনিষ্ঠা যমজটি শহরটির নাম শুনিয়া শহরটির সহিত সে যে পরিচিত সে কথা প্রকাশ করে এবং তাহা যে সত্য তাহাও প্রমাণিত হয়।

আরও দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। এই দুইটি ঘটনাতে ইহাই দেখা যায় যে, বহু পূর্বের জন্মের স্মৃতির পুনরুদয় হয়। ইহার মধ্যে একটি ঘটনা Mr. Campbell Praed বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ যে, একটি মহিলা তাহার স্মৃতি শক্তির দ্বারা পরিষ্কাররূপে এবং খুঁটিনাটিভাবে তাঁহার পূর্ব জন্মের প্রাচীন রোম শহরের জীবনবৃত্তান্তের কথা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অন্য ঘটনাটি Rosemary সম্বন্ধে। Rosemary একটি ইংরেজ বালিকা, যে তাহার পূর্ব জন্মের প্রাচীন ইজিপ্ট শহরে জন্মের কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে গ্রন্থকারেরা বলেন—"Rosemaryর ঘটনাটি হইতে পুনর্জন্ম যে সুনিশ্চিত ইহাই প্রতিপন্ন হয়।"

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের দুইটি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যায়।

প্রথমটি বেরিলী কেকয়ৈনন্দন সাহাই-এর পুত্রের সম্বন্ধে। পুত্রটি শৈশব অবস্থায় তাহার পূর্ব জন্মের কাশীবাসের ঘটনা স্মরণ করিতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয়টি দিল্লীর শান্তি দেবীর সম্বন্ধে। তিনি তাঁহার পূর্ব জন্মে মথুরায় যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অনেক অনুসন্ধিৎসুর নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছেন।

এই সব ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের মানব জীবনের মধ্যে যে একটি ব্যক্তিত্ব আছে যাহা আমাদের এই জন্মের পূর্বেও ছিল এবং মৃত্যুর পরেও থাকিবে। এই সব সত্যের আমরা বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যে প্রমাণ পাই।

জাতি বিশ্লেষণে মাথার চুল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

নৃতত্ত্ববিদেরা মাথার চুলকে জাতীয় বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মাথার চুলই জাতি বিশ্লেষণের প্রধান অঙ্গ। খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, মানব জাতির বিশ্লেষণ মাথার চুল এবং কয়েকটি বাহ্যিক আকৃতির দ্বারা করা হইয়া থাকে। বাহ্যিক আকৃতির মধ্যে এই কয়টি প্রধানঃ—

১। মাথার আকৃতি;

২। মাথার চুল;

৩। মুখের চেহারা;

৪। চোখের প্রকৃতি;

৫। নাকের আকৃতি;

৬। গায়ের রঙ;

৭। দেহের উচ্চতার পরিমাণ।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা উপরোক্ত সাতটি বাহ্যিক আকৃতির দ্বারা জাতি-বিশ্লেষণ করেন। এই বিষয়ক শাস্ত্রকে বাহ্যিক নৃতত্ত্ব বা Physical Anthropology নামে অভিহিত করা হয়। প্রথিতযশা নৃতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হ্যাডন্ তাঁহার জাতি-বিশ্লেষণে মাথার চুলকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন।

মাথার চুলকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সিমোট্রিচি (Cymotrichy)। সিমোট্রিচির বাঙলা অর্থ—ঢেউ-খেলান চুল। এশিয়ার অন্তর্গত ভারতের প্রাক্ দ্রাবীড় জাতীয় উপজাতিগণের মধ্যে ঐরূপ চুল দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রধানত সাঁওতাল, ওঁরাও এবং মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিগণের মাথার চুল এই প্রকৃতির। বাঙালীর চুলের সহিত এই প্রকার চুলের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এবং এমন কি আমেরিকার অধিবাসিগণের মধ্যেও এই প্রকৃতির চুল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। লিওট্রিচি (Leiotrichy)। লিওট্রিচির বাঙলা অর্থ—সোজা এবং খাড়া চুল। চীনের অধিবাসিগণের প্রায় প্রত্যেকেরই মাথার চুল এই ধরণের। মঙ্গল-জাতি, এস্কিমো, প্যাটাগোনিয়া ইত্যাদি জাতিগণের মধ্যে এই ধরণের চুল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৩। উলট্রিচি (Ulotrichy)। উলট্রিচির বাঙলা অর্থ—পশমাকৃতি চুল। এই প্রকার চুল আফ্রিকার নিগ্রো, বুশম্যান, হটেনটট্ এবং বাণ্টু প্রভৃতি জাতিগণের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার পেপুয়ো, মেনেশেনিয়া এবং আন্দামান অধিবাসী সিমাং, আয়েতা জাতির মধ্যে এই ধরণের চুল দৃষ্ট হয়।

ইহা হইল চুলের আকৃতি। কিন্তু বাহ্যিক নৃতত্ত্ববিদের (Physical Anthropologist) মতে চুলের আরও তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

১। চুলের পরিমাণ (Quantity)। (ক) পরিমিত (Medium), (খ) কোমল (Fine), (গ) ঘন (Thick)।

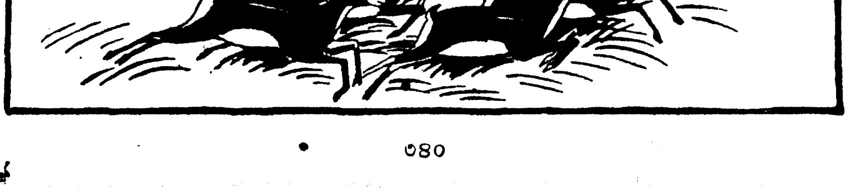
২। চুলের বৈষম্য (Texture)। (ক) মসৃণ (Soft), (খ) কর্কশ (Coarse)।

৩। চুলের রং (Colour)। (ক) সাদা (white), (খ) ধূসর (Grey), (গ) কালো (Black)।

মাথার চুলের রং আবহাওয়ার অনুপাতে হইয়া থাকে। অতি গরম এবং জলীয় আবহাওয়াপূর্ণ দেশের অধিবাসিগণের চুল পশমাকৃতি হইয়া থাকে। অতি শীতপ্রধান এবং আর্দ্রতামুক্ত দেশের অধিবাসিগণের চুল সোজা এবং খাড়া হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে অবস্থিত দেশের অধিবাসিগণের চুল ঢেউ-খেলান হইয়া থাকে।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আরও একটি বিষয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে যাওয়া আসার যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে আর জাতি-বিশ্লেষণ চলিবে না। বিভিন্ন জাতির একত্র বসবাসের ফলে এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। তাঁহারা ভয় করিতেছেন যে, খাড়া-সোজা চুলের অধিবাসিগণের সহিত যদি পশমাকৃতি চুলের অধিবাসিগণের মিলন হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে কি এক কিম্ভূতকিমাকার জাতির সৃষ্টি হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়।

জাতি-বিশ্লেষণের বাহ্যিক আকৃতিগুলি আবহাওয়া এবং বিশেষ করিয়া জন্তুতত্ত্বের উপর নির্ভর করে। তবে কোন্‌টির ক্ষমতা, বিশেষ করিয়া আকৃতির উপর নির্ভর করে, তাহা আজিও জানা যায় নাই।





নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার।
আমাদের অন্ধকার আলো
এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।
এমন অনেক দিন কেটেছে এমনভাবে,—তবে
আবার অনেক দিন তবুও কাটাতে চাই এ রকমই।
হেমন্তে আশ্চর্য শাঁস ফ'লে গেছে কালো জলে, পানিফলে, জাউয়ের ভিতরে;
অথবা ফলেনি কিছু;
ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্রবৌকে দেখে বকে;
চোখ মেলে, চোখ বুজে দেখেছি অনেকবার সে রকম রুগ্ন দুর্ভিক্ষকে,
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে অবশেষে ঘরে
চ'লে গেছি;—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু;—
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়
বিচ্ছেদ, মরণ, ভয় কলের চাকার মত তেমনি ঘুরাবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে;
তেমনি নীরবে;
সাদাসিদে ভাবে।
আমরা জলুষ, জোর, কুকুর বা সিংহের সুরে
বাধা পাই;
পেঁচা যে খড়ের চালে নেমে আসে পৌষের রাত্রির দুপুরে
সেই সুরে শান্তি আছে—শেষ আছে—মৃত্যু আছে জানি,
তবু সেই সুর ভালো।
ঊনিশতিরিশ থেকে ঊনিশচল্লিশ সাল তবু ভালো ছিল;
আজ একচল্লিশে পৌষ মাসে কেমন অসাধ যেন।
মশা মেরে, ধান ভেনে, ইঁদুর তাড়িয়ে
মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে—ঋণ খেয়ে—ঋণ ভুলে গিয়ে,
হাতুড়ের কাছে গিয়ে শিশিরের মত শাদা শিশি—
যা সবের কাছে যা নেবার আছে—নিয়ে যাব;
যা সবের কাছে যা দেবার আছে দিয়ে যাব;
ক্রমাগত পায়ে হেঁটে আমাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে পৃথিবী হাঁটাব।
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হুতেল ঘুঘুদের ঘরে
অথবা ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে—
সেইখানে অসংসর্গ অনুভব ক'রে যাব;—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু।
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়—
বিচ্ছেদ মরণ ভয় কলের চাকার মত তেমন ঘুরাবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে।

(২)

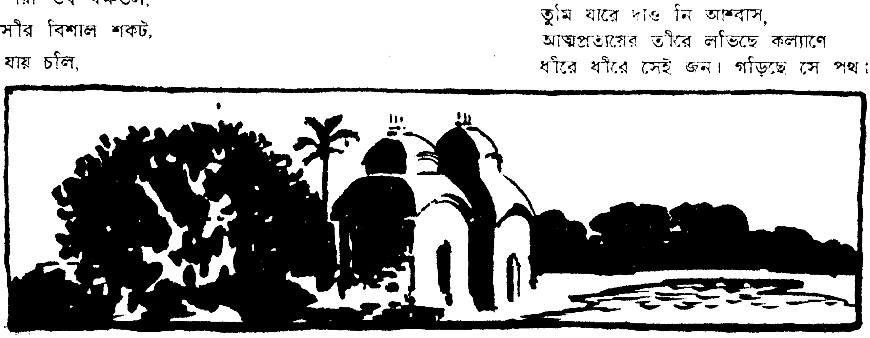
এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
ক্রমাগত মানুষের মরণ হয়েছে।
গরীব, বেচারা, বুড়ো, বিকলাঙ্গ, মহৎ পার্ষদ সব
কি ক'রে কেবলি খ'সে ধুলোসাৎ হয়ে যায়
দেখেছি উদাস, ক্লান্ত—অন্তরঙ্গভাবে;
দেখে দেখে ঘরে ফিরে অন্ধকারে বিকল হতাম,—
যদি না রাত্রির শেষে ভোর, সূর্য, সময়ের পরিস্রুত হাত
মুছে ফেলে দিয়ে যেত সব।
এই সব ছাড়া
এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
সমুদ্রের বুদ্বুদের মত অগণন সমুচ্ছ্বাস
তেমনি প্রবল কিছু চেয়ে গেছে,—পেয়ে গেছে?—রাতে
ফিরেছে বিবিক্তভাবে সুত মিত রমণীর সমাজ জুড়াতে;
ফেরে নি কি?
আমরাও ঘুরে গেছি : আমাদের হৃদয়ের রুচি
আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে
ঘাই হরিণীর মত যে রকম সৃষ্টির জোৎস্নায়
যেমন সহিষ্ণুভাবে ডেকে গেছে,
যেমন নিবিড়ভাবে ডাকে,—
সেই সুরে সাড়া দিয়ে।
কখনো নদীর জলে অদলবদল ক'রে ভেসে গেছে মেঘ, রাজহাঁস;
পুনরপি মেঘগুলো—জলগুলো—আশ্বিনের মাস;
ডুবে গিয়েছিল সব,—নেই ব'লে মনে হয়েছিল :
সুরের ছোঁয়াচে সুর যে রকম হয়ে যেতে চায়
অর্থহীনভাবে অনুপ্রাস।
কখনো ধানের ক্ষেতে ধান নেই।
কখনো ধানের ক্ষেতে কৃষাণের হাসি কোলাহল;
গোলায় গোলায় গঞ্জে ইঁদুরের বৌকাটকীর মত কলরব;
বন্দর বেতার তার টের পায় সব।
কখনো পাটের ক্ষেত লক্‌লক্‌ করে ওঠে বাসুকির মত;
আল কেউটেরা সব কৃষককে কাটে ইতস্তত;
কখনো পাটের জমি চিত্রগুপ্ত বুঝে নিয়ে গেছে;
একটি মূলেও কোনো ভুল নেই, আহা।
তবুও চড়কপুজা, ভাদুপুজা—কত না গাজন গান এল গেল;
কত চাঁদ বড় হয়ে চালার পিছনে রাতে তারপর ছোট হয়ে এল;
গৃহস্থ, কৃষাণ মিলে ধোঁয়াটে জলের শ্যাম পানফল—
পোষলার পিঠে আর মিঠে তাড়ি খেল।
এ সব উৎসব তবু মৃত ইতিহাস;
এ সব উৎসব কিছু নয়।
সর্বদা উৎকণ্ঠা এক জেগে আছে সকল ঘনায়মান পার্বণের মাঝে,
মৃত্যুর উদ্বেগ ছেপে—আরো বেশী কূট;
যে যার নিজের স্থানে উঠে চ'লে ব'সে
কেবলি জীবন, যৌন, নিরাশা, রিরংসা, অর্থ দশ কথা ভেবে
তবুও একটি কথা ভাবে তারপর
নিজের মনের মুদ্রাদোষে।
প্রৌঢ়েরা এখন আরো বুড়ো,
যুবকেরা প্রৌঢ় হয়ে গেছে,
বালকেরা এখন যুবক;
নারীর দেশের থেকে ঢের নারী হারায়ে যেতেছে;
সকলি ভূতের দেশ।

এই সব স্বাভাবিক—সাধারণ কথা;
এখন মানুষ তবু স্বাভাবিকভাবে কথা ভেবে নিতে গিয়ে
কোথায় পেয়েছে সফলতা?
আজ এই চতুঃসীমানার মুখে আমাদের প্রাণে যদি আত্মপ্রত্যয় থেকে থাকে
ঘাই হরিণীর মত জীবনের হরিণকে তবে সে জ্যোৎস্নার পানে—
প্রেতজ্যোৎস্নার পানে ডাকে।
ডাকে নাকি?
নিতান্তই কোনো কিছু ভয়াবহ ভয় যদি আমাদের দিকে
ক্রমে ক্রমে চ'লে আসে আজ,
তবুও তা' ভয় ব'লে মনে হতে দেরী—
যতদিন দেরী হয়—ততদিন ভালো।
আমরা সকালবেলা পেয়ে গেছি সূর্যের আলো,
আমরা রাত্রিবেলা পেয়ে গেছি বাতি;
গণেশ যে সব কূট শ্লোক নিয়ে একদিন বিবেচনা ক'রে গিয়েছিল,
সহজ স্ফূর্তির মত সে সব তোমার প্রাণে জন্মেছিল, ব্যাস,
স্বভাব সুখের মত রাত্রির ফুটপাতে একদিন অগনি গ্যাস
জ্ব'লেছিল—মনে হয়েছিল;—
আমরা সকলে
যে যার নিবিষ্ট জন্ম, প্রসন্নতা, মরণের কাজে
অজানিতে ঘুরে গেছি; কথা
ব'লে ব'লে হয়রাণ মলিন জনতা
হয়ে গেছি;
কেউ তবু হাড়ে-হাড়ে আমাদের অল্পপ্রাণতাকে
চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করে নি।
কি এক সম্পূর্ণ ঈর্ষা কেবলি নিকটে নেমে আসে তবু আজ;
কখনো ধানের ক্ষেতে—কখনো নদীর ভুয়ো জলে
নিরন্ন বছর নামে;—
বর্গাদার—মহাজন—প্রজার মহলে
হুলুস্থুল প'ড়ে যায়;
এখানের ভাগচাষ—শহরের হুণ্ডী—ঠিকাদার
ভুশণ্ডির মাঠ - ঘাঁটি - [illegible] ভূত—ব্যবচ্ছেদাগার—শব—
হাতুড়ে ডাক্তার—
ফিসফিস ষড়যন্ত্র—রাস্তার কাণাচ,—
এই সব সূর্যের -চেয়েও-বেশী-বালুকার-আঁচ;
এরা সব হুলুস্থুল ক'রে যায়।
কোনো কোনো প্রৌঢ় এসে অত্যাচার করে;
অগণন যুবকের ভিড়ে কোনো কাজ নেই,—চিন্তার কুশল র'য়ে গেছে;
চারিদিকে সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য;
জনমানবের মুখে নিজ নিজ শোকাবহ গোপনীয় কথা;
নিজেরই ঘরের জন্যে ঘরন্তী শক্তির নির্মমতা;
মূর্খ দেশ, মেয়ে দেশ, প্রভু দেশ, ভৃত্য দেশ, পাগলের দেশ রয়ে গেছে,
র'য়েছে বালির দেশ;
দার্শনিকদের দ্বিধা—মনীষীর হৃদয়ের প্রেম
সে সব বালির পরে দাগ কেটে অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে;
হৃদয়বিহীন ভাবে ধূর্ত সমুদ্রের কাছে,
প্লোভারের, পায়রার বিণ্ঠার ভিতরে।
সবেরই স্বতন্ত্র বেদনা র'য়ে গেছে।
এক বেদনার মাইল-মাইল জুড়ে তিল
ধারণের স্থান আছে—আছে কিনা অপর ব্যথার?
আমাদের সকলের বেদনা কি মিলেমিশে যেতে চেয়েছিল—
অথবা যে যার প্রাণে চেয়েছে কি—পেয়েছে কি ভীষণ স্বাধীন অন্ধকার?
দেখি না—জানি না—তবু অনুভব ক'রে কোনো সূর্যালোকে অতিমৃত্যু পেলে
পুনরায় ঊষালোক হয় তো বা জীবনে পেতাম;
আমরা পেতাম নাকি?
তবুও অনেক ঊষা এসে গেছে ইতিহাসে,—ঊষা সব নয়;
জনসাধারণ ভাবে আজ আমাদের একাকী হৃদয়
অনেক জেনেছে,—তবু অমেয় বিপ্লব শুরু শেষ হয়ে গেলে
রুটিনের সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয়
মানবজাতির কাছ থেকে চেয়ে নিখিলের মানবেরা পাবে;
না হ'লে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞা ও সন্দেহের দিবাতায় কোথায় দাঁড়াবে।

রাজপথ

তারাকুমার ঘোষ

নগরীর রাজপথে,
বিপণি আঁধারে,
শোভে যেথা অপর্যাপ্ত বিলাস সম্ভার,
সেথা নগ্ন ক্ষুধার্তের বিশীর্ণ কঙ্কাল
বেদনাকাতর চক্ষে চাহি,
রেখে যায় ব্যর্থতার জীর্ণ পরিণাম
জীবনের গ্লানিভার যত।
হে রাজ-শরণি,
প্রকম্পিয়া তব বক্ষতল,
বিলাসীর বিশাল শকট,
যবে যায় চলি,
বিজাতীয় নির্লিপ্ত হেলায়;
তখন দেখেছো কভু
আত্মপ্রসারণ তলে বিদ্যুৎ চমকে,
মৌন শঙ্কা লয়ে,
কুঞ্চিত ললাট পরে, বিগত যৌবনে
চলিয়াছে জয়যাত্রা
অসহায় জনতার বুকে।
আপনারে মানিয়াছে যেথা দৃঢ় করি,
ব্যর্থতা প্রলাপ সেথা লিখিছে কাহিনী।
তুমি যারে দাও নি আশ্বাস,
আত্মপ্রত্যয়ের তীরে লভিছে কল্যাণে
ধীরে ধীরে সেই জন। গড়িছে সে পথ;





যোগাযোগ

এম্, পি, প্রোডাকসন্সের ছবি : কাহিনী : মন্মথ রায় ; চিত্ররূপ : প্রেমেন্দ্র মিত্র ; পরিচালনা : সুশীল মজুমদার ; সুরশিল্পী : কমল দাশগুপ্ত ; প্রধান ভূমিকায় : কানন দেবী, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাংগুলী, সন্ধ্যারাণী, ইন্দিরা রায়, দেববালা, রবীন মজুমদার, পূর্ণিমা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এম্, পি, প্রোডাকসন্সের যোগাযোগ চিত্রখানি দেখে আমরা যতটা আনন্দ পেয়েছি, সে অনুপাতে আমাদের আশা আরও অনেক বেশী ছিল—একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। প্রথমত ছবিখানিতে কানন দেবী, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং জহর গাংগুলীর মত তিনজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী অবতীর্ণ হয়েছেন ; দ্বিতীয়ত চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন সুশীল মজুমদার যিনি ইতিপূর্বে দুই তিনখানি চিত্র পরিচালনা করে খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগাযোগ চিত্রখানি আমাদের আনন্দ দিলেও প্রত্যাশানুযায়ী স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছাতে পারেনি। অবশ্য এ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য পরিচালক এবং অভিনেতা অভিনেত্রী ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী চিত্রখানির অন্তর্নিহিত কাহিনীগত দুর্বলতা। কাহিনীটির সামাজিক সার্থকতা থাকলে এবং চরিত্র-গঠন ও ঘটনা সংস্থাপনে সামঞ্জস্য বোধের অধিকতর প্রাচুর্য থাকলে যোগাযোগ নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর চিত্র বলে পরিগণিত হতে পারত।

যোগাযোগ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম এবং প্রধান আপত্তি হচ্ছে এর নামের ব্যাপারে। কর্তৃপক্ষের বোধ হয় অজানা নাই যে, 'যোগাযোগ' নামে রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস আছে। নামটি শুনে লোকের মনে স্বভাবতই খটকা লাগচে যে এটা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চিত্ররূপ। জানি না কর্তৃপক্ষ হয়ত স্বাভাবিক ব্যবসায়বুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই লোকের মনে ধোঁকা লাগানোর জন্য এ নামকরণ করেছেন। তা' যদি করে থাকেন, তবে তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথের ওপর অবিচার করেছেন একথা স্বীকার করতেই হয়।

কাহিনীকার মন্মথ রায়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, কাহিনীটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে অস্বাভাবিক অবাস্তবতার ওপর। সাধু সরল (এত সরল যে তাঁকে বোকা বললেও অত্যুক্তি হয় না) সখের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জমিদার দীনদয়াল সান্যালকে কাহিনীকার যত বড় করেই আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান না কেন, তাঁর চরিত্র যে একেবারে অবাস্তব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিত্রটির শেষাংশের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন উল্লেখযোগ্য হ'লেও প্রথমাংশের ঘটনা সংস্থাপন একেবারেই দুর্বল। দীনদয়ালের একমাত্র পুত্র কলকাতায় থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে—পিতার উপর তার অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা। তার একমাত্র দোষ সে একটু বেশী খরচে। ঋণের দায়ে সে স্নেহময় পিতার কাছে থেকে একযোগে বেশী টাকা আদায় করার জন্য তাঁকে প্রতারিত করতেও কসুর করে না। পিতাকে সে লিখে জানায় যে সে তাঁর মত না নিয়েই দরিদ্র বন্ধুর বোনকে বিয়ে করে তাকে ভগ্নী-দায় থেকে উদ্ধার করেছে ; বর্তমানে তার স্ত্রী শয্যাশায়িনী, তার টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। জয়ন্ত আশা করে যে, বাবা একথা জানতে পেরে নিশ্চয়ই একযোগে বেশ কিছু টাকা পাঠাবেন আর সেও ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু ফল হয় বিপরীত—দীনদয়াল লিখে জানান যে, তিনি নিজেই পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করতে আসছেন। এর পরেই শুরু হয় জয়ন্ত এবং তার বন্ধুবান্ধবদের বৌ খোঁজার পালা। তারা এমন একটি মেয়ে চায় যে একদিনের জন্য বৌ সেজে জয়ন্তকে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে নাটকীয় উপাদান কিঞ্চিৎ থাকলেও ঘটনাটা একেবারে অবাস্তব। অবশেষে হাসপাতালেরই একটি নার্স বৌ সাজতে রাজী হ'ল। নাম তার প্রতিভা—সে জয়ন্তকে ভালবাসত। সে যে কেন বৌ সাজতে রাজী হ'ল তার যথেষ্ট কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না। জয়ন্ত তাকে অবজ্ঞা করত বলেই শুধু তাকে জব্দ করার জন্যই সে বৌ সাজল এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। যাক, শেষ পর্যন্ত দীনদয়াল বৌ দেখে এত খুশী হলেন যে, তিনি তাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গণ্ডগোলটা আরও বেশী জমাট বেঁধে উঠল—লুকোচুরির খেলা আগের মতই চলল। এর পরের ঘটনা কিছুটা মানময়ী গার্লস্ স্কুলের মত—উদাহরণস্বরূপ জয়ন্তর সঙ্গে প্রতিভার একঘরে শোবার দৃশ্যটা উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত এমন একদিন এল যে নিষ্ঠুর সত্যটি প্রকাশ না করার উপায় রইল না। জয়ন্তের বাবা ইতিমধ্যে সাজানো বৌয়ের গুণে এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, অজ্ঞাতকুলশীলা ধাত্রী প্রতিভার সঙ্গেই তিনি পুত্রের বিয়ে দিতে চাইলেন। জয়ন্তও ধীরে ধীরে প্রতিভার গুণমুগ্ধ হয়ে উঠছিল। ইতিমধ্যে অনাথ আশ্রমের কর্ত্রী যিনি প্রতিভাকে কন্যাস্নেহে মানুষ করেছিলেন—এসে হাজির হলেন জয়ন্তদের গ্রামে। তাঁর সঙ্গে একটি অপরিচিত পুরুষ—তাঁরা দুজন প্রতিভার পিতামাতা বলে পরিচয় দিলেন। দেখা গেল যে, প্রতিভাও সদ্‌ব্রাহ্মণের মেয়ে—দীনদয়ালের জাতকুল রক্ষা হ'ল। এমনি ক'রে সস্তা স্টাণ্ট দিয়ে ছবির পরিসমাপ্তি হ'ল। এই হ'ল ছবির মূল কাহিনী—অবশ্য এর মধ্যে দীনদয়ালের মমতাময়ী হাসপাতালঘটিত অনেক রাজনীতিও জড়িত আছে—বাহুল্যবোধে তার আর উল্লেখ করলুম না। মন্মথ রায়ের কাছ থেকে এমন জোড়াতালি দেওয়া কল্পনা-দীন কাহিনী আমরা আশা করিনি। প্রধানত কাহিনীর এই দুর্বলতার জন্যই যোগাযোগ শ্রেষ্ঠ ছবির পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কাননদেবীর কথা। তিনি তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যে ও সঙ্গীত-মাধুর্যে প্রতিভার চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছেন। অভিনয়-নৈপুণ্যের দিক থেকে এ ছবিতে কেউ তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন না। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত এ ছবিখানির অন্যতম প্রধান সম্পদ। যোগাযোগের সর্বাঙ্গে কানন দেবীর ব্যক্তিগত বিজয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। দীনদয়ালের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী স্থানবিশেষে সুঅভিনয় করিলেও, বেশীর ভাগ স্থানে তাঁর অভিনয় হয়েছে একেবারে মঞ্চ-ঘেঁষা। জহর গাঙ্গুলী যে ধরণের চরিত্রাভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, জয়ন্ত চরিত্রটি সে ধরণের নয় বলে, তিনি তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। স্থানবিশেষ ছাড়া তাঁর অভিনয় হয়েছে প্রাণহীন—কর্কশ। সন্ধ্যারাণীর ভূমিকাটি অত্যন্ত ছোট হ'লেও, তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করা যেতে পারে। ভুজঙ্গ ডাক্তারের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সাধারণ শ্রেণীর। রবীন মজুমদারের অভিনয় করার মত কিছু না থাকলেও তাঁর কণ্ঠসংগীত আমাদের তৃপ্তি দিয়াছে। ইন্দিরা রায়, দেববালা, ইন্দু মুখার্জি প্রভৃতির অভিনয় মন্দ নয়।

যোগাযোগ পরিচালনায় সুশীল মজুমদার খুব বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বটে—তবে মোটামুটি তাঁর পরিচালনা ভালই হয়েছে বলা চলে যদি অবশ্য চিত্রের গল্পাংশের জন্য তাঁকেও কিঞ্চিৎ দায়ী না করি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা এ ছবির সঙ্গীতাংশ অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। কিন্তু সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত সুর-যোজনায় নতুনত্ব কিছু দেখাতে পারেননি। গরমিল, সহধর্মিনী, যোগাযোগ প্রভৃতির সুর-সংযোগ প্রায় একই ধরণের। যান্ত্রিক দিকগুলির মধ্যে শব্দগ্রহণ ভাল হয়েছে—তবে চিত্রগ্রহণ মাঝে মাঝে দোষদুষ্ট। মোটকথা শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে না ফেলতে পারলেও যোগাযোগকে আনন্দদায়ক চিত্রের সম্মান দেওয়া যেতে পারে।



খেলা-ধূলা

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রতিযোগিতার মাত্র তিনটি খেলা বাকী আছে। সেমি-ফাইনাল খেলা দুইটির মধ্যে একটিতে বি এন আর 'এ' দল বি জি প্রেস দলের সহিত এবং অপরটিতে রেঞ্জার্স দলের সহিত জি আই পি রেল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। বি এন আর 'এ' দল প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে যেরূপ খেলিতেছে—তাহাতে এই দল যে ফাইনালে উন্নীত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অপর সেমি-ফাইনাল খেলায় কোন দল বিজয়ী হইবে বলা খুবই কঠিন। রেঞ্জার্স দল স্থানীয় লীগ চ্যাম্পিয়ান। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী জি আই পি দলও এই বৎসরের আগা খাঁ কাপ বিজয়ী। দুইটি দলই খ্যাতনামা। সুতরাং উভয় দলই নিজ নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেও এই দুইটি দলের খেলা দেখিয়া আমাদের ধারণা—জি আই পি দলেরই ফাইনালে উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই দলের আক্রমণভাগের খেলা প্রকৃতই দর্শন-যোগ্য। এই বিভাগের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের মধ্যে দৃঢ়তা ও সহযোগিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

রেঞ্জার্স ক্লাব যদি জি আই পি দলকে পরাজিত করিতে না পারে তবে ফাইনালে বি এন আর দলের পক্ষে বেটন কাপ বিজয়ী হওয়া বিশেষ সহজ হইবে না। ফাইনাল খেলা দর্শনযোগ্যও হইবে।

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতায় বাহিরের খ্যাতনামা ভগবন্ত ক্লাব, লাহোর ওয়াই এম সি এ ও দিল্লী এসোসিয়েশন নাম দিয়াও খেলায় না যোগদান করায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ যেরূপভাবে কমিয়া গিয়াছিল, সেই সময় জি আই পি দলকে গ্রহণ করিয়া বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ভালই করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনেকের নিকট বে-আইনী হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

নববর্ষ দিনে ব্যায়াম প্রদর্শনী



১৩৫০ সাল নববর্ষ দিনে জাতীয় ক্রীড়াসংঘের ব্যায়াম প্রদর্শনী

বাঙলার নববর্ষের প্রথম দিনে ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা রীতি গত ১২।১৩ বৎসর ধরিয়া বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। ১৯৩৮ সালে এই ব্যবস্থা সারা বাঙলা দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সাল হইতে বিশ্বব্যাপী সমরানল এই অনুষ্ঠানের প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করায় অনুষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৪১ সালে বিশ্বগ্রাসী সমরানল ভারতের দুয়ারে উপস্থিত হইলে বাঙলার তরুণ সমাজ এতই ভীত ও সন্ত্রস্থ হইয়া পড়ে যে, নববর্ষ অনুষ্ঠেনের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। ফলে ১৯৪১ সালে মাত্র ২।৩টি স্থানেই এই অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। ১৯৪২ সালে ইহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায়। কলিকাতার কয়েকটি ক্লাব এই অনুষ্ঠেনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু তাহা সাফল্যলাভ করে নাই। ইহাতে সকলের মনে ধারণা হয় যে, নববর্ষ দিনে ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে আর দেখা যাইবে না। কিন্তু একনিষ্ঠ ব্যায়ামোৎসাহিগণের দ্বারা

গঠিত জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ সাধারণের এই ধারণার আমূল পরিবর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা এই বৎসরের নববর্ষের প্রথম দিনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীতে কলিকাতার বিভিন্ন ক্লাব ও স্কুলের প্রায় এক সহস্র বালক ও বালিকা যোগদান করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘের পরিচালকগণ একজন মহিলাকে এই বিরাট ব্যায়াম প্রদর্শনীর সর্বাধিনায়িকার পদে নির্বাচিত করিয়া। বাঙলার ব্যায়াম ইতিহাসে এইরূপভাবে একজন মহিলা সহস্রাধিক বালক ও বালিকাকে পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া দেখা বা শোনা যায় নাই। জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘের পরিচালকগণ স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকার বিশ্বাস করেন--ইহা ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। আরও সুখের ও আনন্দের বিষয় যে তাঁহারা এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কেবল কলিকাতায় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না; যাহাতে বাঙলার প্রত্যেক জেলায় ও শহরে অনুষ্ঠিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হয়তো সেই সকল অনুষ্ঠান কলিকাতার ন্যায় দর্শনযোগ্য হয় নাই; কিন্তু তাহা হইলেও সারা বাঙলা দেশে নববর্ষ অনুষ্ঠানের নূতন প্রেরণা জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের খেলা ৪ঠা মে তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। প্রথম ডিভিসনে গত বৎসর যে কয়েকটি দল যোগদান করিয়াছিল, এই বৎসর তাহারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া জানা গেল। কোন সামরিক দল এই বিভাগে যোগদান করিবে না। ভারতীয় দলসমূহের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।



শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অঙ্কিত দৃশ্যচিত্র (black & white)

২০শে এপ্রিল

রাণাঘাটের মহকুমা হাকিম সুরমা মেল দুর্ঘটনা মামলায় গার্ড জে ডি নাইট এবং এসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার শ্রীহরিবিলাস বিশ্বাসকে ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

টোকিও রেডিও হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, নানকিংস্থিত বর্তমান জাপ রাজদূত মিঃ মামরু সিগমেভসু, মিঃ মাসাউকি তানির স্থলে জাপানের পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

'এসোসিয়েটেড প্রেসের' বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জাপানিগণ শীঘ্রই মংদ এবং বুথিডং পুনরধিকারের জন্য আক্রমণ চালাইবে বলিয়া মনে হয়। বৃটিশ পক্ষীয় বাহিনী ইন্দিন হইতে আরও উত্তরে এবং টংম হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে সরিয়া আসিয়াছে।

বৃটিশ বাহিনী তিউনিসিয়ার উপকূলে স্ফাক্স হইতে ১৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত কেরকেনা দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছে।

২১শে এপ্রিল

ভারতীয় সমর বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গতকল্য অপরাহ্নে জাপ বোমারু বিমানবহরের একটি দল ইম্ফল এলাকায় আক্রমণ চালায়। অধিকাংশ বোমা পল্লী অঞ্চলের চালাঘরসমূহের উপর পতিত হয়। কিছু লোক হতাহত হয়। বৃটিশ জঙ্গী বিমানসমূহ শত্রু বিমানের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়। সম্ভবত দুইখানি বিমান ধ্বংস এবং অন্যান্যগুলি ঘায়েল হইয়াছে।

তিউনিসিয়ায় বৃটিশ অস্টম আর্মি এনফিডাভিল দখল করিয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, কুবান অঞ্চলে জার্মানদের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

২২শে এপ্রিল

ফেডারেল কোর্ট অদ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬নং বিধি বর্তমানে যে আকারে আছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় আইন সভা কর্তৃক কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা লংঘন করা হইয়াছে, সেইজন্য ঐ বিধি অবৈধ। প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ প্রমুখ প্রায় ৮ হাজার লোক বর্তমান সময়ে ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬নং বিধি অনুযায়ী আটক রহিয়াছেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজসেবী রামকৃষ্ণ মহিলা মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সিস্টার সরস্বতী বৎসরাধিককাল রোগ ভোগের পর গত ২১শে এপ্রিল মধ্য রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪০ বৎসর হইয়াছিল।

ভারতীয় সমর বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ, অদ্য প্রাতে জাপ বোমারু বিমানের একটি দল জঙ্গী বিমানের পাহারায় ইম্ফলের উপর আক্রমণ চালায়। বৃটিশ জঙ্গী বিমান উহাদিগকে আক্রমণ করে। উহাদের একখানি বিমান সম্ভবত ধ্বংস হয় এবং অন্যান্য বিমান ঘায়েল হয়। শহরের এক অংশে কিছু ক্ষতি এবং অত্যল্পসংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, নভরোসিস্কের সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। রুশ সৈন্যেরা কয়েকস্থানে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

২৩শে এপ্রিল

নারায়ণগঞ্জের পুলিশ কতিপয় চাউলের গুদাম তল্লাস করে এবং সাতজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় ২০ হাজার মণ চাউল পুলিশ কর্তৃক হস্তগত হইয়াছে।

আরাকান যুদ্ধে বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা অদ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। গত ৪ মাসে আরাকান রণক্ষেত্রে বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর মোট হতাহতের সংখ্যা ৩,৫১৪ (তন্মধ্যে ১,৫৭২ জন বৃটিশ ও ১,৯৪২ জন ভারতীয়)। ইহাদের মধ্যে ৩৯২ জন নিহত হইয়াছে (১৭২ জন বৃটিশ ও ২২১ জন ভারতীয়)। অবশিষ্ট সৈন্যেরা আহত বা নিখোঁজ হইয়াছে।

২৪শে এপ্রিল

বাঙলার গভর্নর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেনঃ—১। খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন—প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র (অসামরিক দেশরক্ষা বিভাগসহ) বিভাগ ; ২। মিঃ হুসেন সহিদ সুরাবর্দী—অসামরিক সরবরাহ ; ৩। মিঃ তুলসীচন্দ্র গোস্বামী অর্থ বিভাগ ; ৪। মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁ—শিক্ষা ; ৫। মিঃ বরদাপ্রসন্ন পাইন—পূর্ত ও যানবাহন ; ৬। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মুয়াজ্জেম-উদ্দিন হোসেন—কৃষি (পল্লী সংস্কারসহ) ; ৭। মিঃ তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব (লোকাপসরণ ও রিলিফসহ) ; ৮। নবাব মুসারফ হোসেন খাঁ বাহাদুর—বিচার ও আইন বিভাগ ; ৯। মিঃ খাজা সাহাবুদ্দিন—বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগ (যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনসহ) ; ১০। মিঃ প্রেমহরি বর্মা—বন ও আবগারী বিভাগ ; ১১। খাঁ বাহাদুর মৌলবী জালালুদ্দিন আহম্মদ—জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ; ১২। মিঃ পুলিনবিহারী মল্লিক—প্রচার বিভাগ ; ১৩। মিঃ যোগেন্দ্র-মণ্ডল—সমবায় ঋণদান ও পল্লী ঋণ বিভাগ। নূতন মন্ত্রিগণ অদ্য শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলার গভর্নর গত ৩১শে মার্চ যে ঘোষণা দ্বারা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার বিধানসমূহ বলবৎ করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি উহা বাতিল করিয়াছেন।

কলিকাতার টাউন হলে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিরাট জনসভায় 'শাসনতান্ত্রিক নিয়মবিগর্হিত উপায়ে' বাঙলায় যেভাবে মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইয়া নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভাকে মন্ত্রীত্বের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। স্যার আব্দুল হালিম গজনবী এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের যে কয়জন মুষ্টিমেয় সদস্য 'আদর্শচ্যুত হইয়া দলত্যাগ করিয়া' স্যার নাজিমুদ্দিনের পক্ষে যোগ দিয়াছেন, সভায় তাঁহাদের কার্যেরও তীব্র নিন্দা করা হয়।

দিল্লীতে মুসলিম লীগের ত্রয়োদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ জিন্না তাঁহার অভিভাষণে যথারীতি গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের অজুহাতে বিষোদ্গার করেন।

ফরিদপুরে মিঃ সামসুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজা সম্মেলনের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।

২৫শে এপ্রিল

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়াম ফিলিপস সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা চালাইতে তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

২৬শে এপ্রিল

আরাকানের অবস্থার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় নাই। তবে গতকল্য শত্রুপক্ষ বুথিডং-এর দক্ষিণে মায়ু নদী ও মায়ু পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাইতে শুরু করিয়াছে। এই এলাকায় যুদ্ধ চলিতেছে।

তিউনিসিয়া রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সমগ্র রণাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানে এক্সিস ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।



পুস্তক পরিচয়

হিন্দু না মুসলিম (সাম্প্রদায়িকতার বাস্তব ব্যাখ্যা)—সুশীলকুমার বসু লিখিত। সমবায় পাবলিসার্স, ৩৩।২, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা এবং উহার অর্থনৈতিক পটভূমিকা লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যে বাঙলা সাহিত্য দরিদ্র; বিশেষত আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির নিরপেক্ষ আলোচনা হয় নাই বলিলেই চলে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লেখক 'অখণ্ড হিন্দুস্থান' এবং 'পাকিস্থান' দাবীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া যথাযথ পথ নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষা সুস্পষ্ট, লেখকের উক্তি কোথাও পাণ্ডিত্যের অথৈ জলে ডুবিয়া যায় নাই। এ ধরণের পুস্তক রচনাতে উহাই সব চাইতে বড় বাহাদুরী। আমরা লেখকের কৃতিত্বের প্রশংসা করি। ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই এ ধরণের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। জাতির দুর্ভাগ্য, সমাজের সর্বস্তরে, সাহিত্যে, শিল্পে, সংবাদপত্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র একটা অতি উৎকট সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি দেশের জনসমাজকে একান্তভাবে পাইয়া বসিয়াছে। ইহা হইতে মুক্তি চাই এবং অবিলম্বেই তাহা প্রয়োজন। সে মুক্তির পথে পুস্তকখানা অন্ততঃ কিছুটা সাহায্য করিতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

"চতুরঙ্গ"—ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক: হুমায়ুন কবীর। কার্য্যালয়: ৩৬নং আহিরীপুকুর রোড, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা বারো আনা, বার্ষিক তিন টাকা।

পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় (চৈত্র) সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর্তমান সংখ্যাখানিতে অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের রচনা স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতির গল্প, লুসিয়ঁ লরা, হুমায়ুন কবীর প্রভৃতির প্রবন্ধ এবং বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতির কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীহাররঞ্জন রায়, সমর সেন, প্রতিভা বসু, গোপাল ভৌমিক, আবুল হোসেন প্রভৃতি এই সংখ্যার নিয়মিত সমালোচনার বিভাগগুলি সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

'মাতৃভূমি'—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক: **শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।** কার্যালয়: ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা সাড়ে ছয় আনা, বার্ষিক পাঁচ টাকা।

এই প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। রচনা বৈচিত্র্যে বর্তমান সংখ্যাখানি পত্রিকার পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বিদেশী ও স্বদেশী পত্রিকা হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি 'মাতৃভূমি'র সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। পত্রিকাখানি চিত্র-সম্পদের দিক হইতে দুর্বল; চিত্রের সংখ্যা বাড়াইলে এই উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকাখানি পাঠকসমাজে অধিকতর সমাদর লাভ করিবে।

ইস্‌লাম

শ্রীসুকুমার রায়

যে ধর্ম মানবতার ভিতর দিয়া সত্য, জাগ্রত এবং জীবন্ত, সেই ধর্ম এই ধরণীর। আমরা মানুষ—এই মর্ত্তেরই। অন্তরকে যাহা স্পর্শ করে, অতি তুচ্ছ জড়ত্বের মধ্যেও অমৃতের প্রাণ সঞ্জীবিত করে, তাহা ইস্‌লামের। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিগ্‌ভ্রান্ত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানের শুষ্ক সভ্যতার ভিতরে শতদেদীপ্যমান আলোকের স্পর্শ নিয়া, সমুন্নত গৌরবে রহিয়াছে ইস্‌লাম। এখানে জাতি বিভাগের দুষ্পাচ্য সঙ্কীর্ণতা নাই, সাম্প্রদায়িকতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠে নাই, শকুনির মত প্রাণ-ছেঁড়া নির্মমতার বর্বরতা মানবের মধ্যে দেখা দেয় নাই—সমাজে যাহারা ঘৃণ্য, মানবের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অস্পৃশ্যদের মধ্যেও যাহারা জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত এবং অবমানিত, তাহাদের সমগ্র গ্লানিভার দূর করিয়া ভ্রাতৃত্বের একত্ববন্ধনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে শান্তির ইস্‌লাম, ত্যাগের ইস্‌লাম এবং শুষ্কমরুভূমির অমৃতসন্ধানি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ। এখানে আছে এক, একের সাধনা, একের মন্ত্র এবং একের দীক্ষা—এইখানেই মানুষ মানুষকে ভাই বলিয়া চিনিয়াছে, এইখানেই একই আসনে, একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন মানব, একের বার্তা নিয়া—"তুমি এবং আমি, এই দুই-এর মধ্যে স্বর্গ নাই, দেবতা নাই, বাহ্যিক উপাচার নাই, শুধু আছে যোগ এবং সংযোগ।" পথকুক্কুরের মত মানবকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া, এই ধর্ম কোনদিন দর্পে এবং অহংকারে প্রচার করে নাই—"তুমি নীচ, তুমি ঘৃণ্য। এই ধরণীর কোমল স্নেহ ও প্রেম তোমার অপ্রাপ্য এবং অজেয়।" সমাজের মহম্মদ, ধর্মের মহম্মদ, মানবতার মহম্মদ এবং তাঁহার প্রচারিত ইস্‌লাম জ্ঞানের আলোকপথ রুদ্ধ করে নাই, ধর্মের সিঁড়িগুলির মধ্যে বিয়োগব্যথার সন্তাপ অন্তরে রাখিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় নাই—সেই কঠিন দুর্ভেদ্য প্রস্তরের বুক চিরিয়া, ইস্‌লাম হইতে চলিয়াছে অমৃতের স্রোত ধারা, নির্ঝরিণীর মত তাপিতের বক্ষে আনিয়াছে সান্ত্বনা ব্যথীতের প্রাণে আনিয়াছে আনন্দের অমৃত কল্লোল, দুর্বলকে জাগাইয়া তুলিয়াছে বীর্য এবং শক্তি নিয়া।

ইস্‌লামের বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, কারণ ইহা প্রেমের বন্ধন। এখানে কর্তা আছে, কর্তৃত্ব নাই। এখানে মানবের সমাজ আছে, কিন্তু সমাজের অস্থিভাঙ্গানো জরাজীর্ণ বিদ্বেষানল অন্তর্জ্বালিত হয় নাই। এই 'বিজ্ঞানের বাহাদুরী করা' এবং 'ধর্মের বড়াই করা' অহংকারদৃপ্ত জাতিদের ইস্‌লাম জিজ্ঞাসা করে—"ধর্ম কি মানবের, না মানবতা বহির্ভূত অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় প্রদেশের?" ইহার উত্তর অনন্তকালের জীবনস্রোতের মধ্যে—যে ইহাকে চায় সে ত আর ফিরিয়া আসে না, ইহার মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বেহেস্তু ও মর্ত্তের বন্ধন দৃঢ় করে, অচল করে না।



বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(১৩শ সংখ্যা হইতে ২৪শ সংখ্যা পর্যন্ত—১৯৪৩)

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৫০ সাল Saturday, 8th May, 1943 [২৬শ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(অপ্রকাশিত)

শ্রীমতী দেবরাণী দেবীকে লিখিত

১

ওঁ

উত্তরায়ন, শান্তিনিকেতন।

কল্যানীয়াসু,

বুড়ি, তোমার চিঠিখানা পেয়ে খুশি হলুম। যেমন দেখে গিয়েছিলে তেমনি চুপচাপ বসে আছি। মাঝে মাঝে কেবল এঘর থেকে ওঘরে যাত্রা করি। শিউলি ফুল তেমনিই ফুটছে ঝরছে, মধুমঞ্জরীর গন্ধে সন্ধ্যার হাওয়া আমোদিত হয়। মাঝে মাঝে দুই একটা ডাকাতি হলে এখানকার একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়—যেটা হয়ে গেছে তারি রেশ এখনো চল্‌চে। বরানগরের ডাকাতের দল সম্প্রতি কি করচে মাঝে মাঝে খবর দিয়ো।

ইতি ২২ অক্টো ১৯৩৫

দাদু।

২

ওঁ

কল্যানীয়াষু,

লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। কোন্ দেশে তুমি চলে গেছ তার কোনো পরিচয় আমার কাছে নেই। দুর্গ নাম শুনে মনে হয় খুব শুকনো দেশটা, গাছপালা বড় বেশি নেই, ধু ধু করচে মাঠ। ওর কোনো ছবি মনে আনতে পারিনে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকটাতে আমাদের এখানে খুব ঘন বর্ষা নেমেছিল। আষাঢ় ফাঁকি দিচ্চে—মেঘ করে আছে কিন্তু বর্ষণ নেই বললেই হয়। কিন্তু চারিদিকে সবুজ রঙের জোয়ার লেগেছে যেন। শ্যামলীর দ্বারের কাছে সেই যে দুটি গোলকচাঁপার যুগলমিলন ঘটেছে, তারা ফুল ছড়াচ্ছে কেবলি। কদমের ডালে ডালে সাড়া পড়ে গেছে। আর কিছুদিন পরেই সাঁওতাল ছেলেরা কেয়াফুল বিক্রি করতে আসবে। বেলফুল অজস্র ফুটেছিল, তাদের দিন ফুরিয়ে গেছে, জুঁইয়ের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। হেনার গাছ থেকে গন্ধের আমন্ত্রণ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে ফুলবনের এই খবর। ফুলবনের কবি চুপচাপ বসে তাকিয়ে থাকে সবুজ ধরণীর দিকে, বসে বসে শোনে পাখির ডাক। কোকিল খুব ডাকাডাকি করচে। বুলবুলিগুলি ইলেক্‌ট্রিকের তারের উপর বসে লেজ দুলিয়ে গান করে—আর একজাতের পাখি আছে, তাকে আমি বলি মধুপায়ী, খুব ছোটো লম্বা সরু ঠোঁট, গান গায় খুব মিষ্টি করে। আমাদের এখানে ইস্কুল খুলল। ছেলেদের কলরব আরম্ভ হয়েছে। কাল সন্ধ্যে বেলায় ওদের কথা ও কাহিনী আর শিশু ভোলানাথ থেকে কবিতা পড়ে শুনিয়েছি। আমি অত্যন্ত কুঁড়ে এবং ক্লান্ত— চিঠিপত্র বেশি আশা কোরোনা মনে রেখো যে তোমাকে স্নেহ করি। ইতি ১২ আষাঢ়, ১৩৪৩।

দাদু।

৩
ওঁ
উত্তরায়ন, শান্তিনিকেতন।

কল্যানীয়াসু,

চিঠিতে তোমার ঠিকানা না পেয়ে তোমাদের বরনগরের ঠিকানায় আশীর্বাদ পাঠাই। তোমার দিদি কিছুদিন আগে এসেছিলেন এখানে। খুব ধুম করে ভাইফোঁটা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন ছিলুম সুরুলের বাড়িতে। সে জায়গাটি খুব সুন্দর, চারিদিকে খোলা। তাঁর হাতের রান্না খেয়ে এখানকার সবাই খুব খুশি হয়েছে—বলচে বৎসরে তিন চারটে ভাইফোঁটার জন্যে পঞ্জিকাকারদের কাছে দরবার করবে। রাণীরা শশিভূষণ-ভিলা শূন্য করে চলে গেছে—ওপাড়ায় আমার যাওয়া আসা বন্ধ হলো। ইতি ৬।১২।৩৬

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
ওঁ
উত্তরায়ন, শান্তিনিকেতন।

কল্যানীয়াসু,

বড়ো চিঠি তোমাকে লিখব যে, তার জন্যে বড়ো ছুটির দরকার। এখন যদিচ বড়োদিনের ছুটি, তবু ছুটির কোনো লক্ষণই নেই। দেশ দেশান্তর থেকে কেবলি অতিথি সমাগম হচ্ছে, তাছাড়া বই লেখা বই ছাপা চলচেই। নদীর ধারে তোমার পেয়ারা বাগানের খবর পেয়ে লোভ হচ্চে। পেয়ারা খাবার লোভ নয়, অপরিচিত দেশের নদী বলো বন বলো তার একটা আহ্বান আছে। আমরা যখন প্রথম বোলপুরে আসি, তখন এ জায়গাটাও তরুহীন রুক্ষ ছিল। চারিদিক শূন্য ধূ ধূ করত, খারাপ লাগত না। তুমি বরনগরে আসচো লিখেচ সেইখানেই চিঠি দিলুম—আমার আশীর্বাদ জেনো।
ইতি ৩০।১২।৩৬

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫
ওঁ
শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

কিছুকাল পূর্বে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু তাতে ঠিকানা ছিল না। আমার অন্য যে কোনো শক্তি থাক্ স্মরণশক্তি নেই, তাই তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। আজকাল চিঠিপত্র লেখা আমার পক্ষে কঠিন হয়েছে, চোখে কম দেখতে আরম্ভ করেছি—শরীরও দুর্বল। কালিম্পং পাহাড়ে গিয়ে গ্রীষ্ম কাটাবার সংকল্প করেছি। এবারে অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়াতে উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর—তোমাদের ওখানেও বোধ হয় গরম আরো বেশী।
ইতি ৫ বৈশাখ ১৩৪৫

শুভার্থী—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬
ওঁ
শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে মন উদ্বিগ্ন হোলো। আশা করেছিলুম কখনো কলকাতার অভিমুখে এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি নিজে এখন ভিড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। খবরের কাগজে জানিয়েছিলুম কাউকে চিঠিপত্র আর লিখব না। তাই মাঝখানে কালিম্পঙ পাহাড়ে চলে গিয়েছিলুম—ছুটির জন্যে মন উৎসুক হয়ে থাকে।

তোমাদের বরানগরের কারো চিঠিপত্র অনেকদিন পাইনি। কখনো কখনো রণজিৎ লেখে।

আশ্রমে ঘনঘোরঘটা করে বর্ষা নেমেচে। তোমরা যখন একবার এসেছিলে, তখন সে শুকনো সময় ছিল—এখন আকাশে সজল মেঘ, ভূমিতলে শ্যামল অরণ্য।
ইতি ১৯শে জুলাই, ১৯৩৮

আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭
ওঁ
শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

তোমার রাখীসূত্রখানি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি—পরেছি হাতে—তুমি ছাড়া আর তো কেউ পাঠায়নি। আমার রাখী তোমাকেই পাঠাই ছন্দের সুতোয় গাঁথা

অলখসুতে গাঁথিনু রাখী-ডোর
পরানু তব স্বপন কঙ্কনে,
বাহুতে তব না র'বে স্মৃতি মোর
রাখিয়া দিয়ো মনে।

খুব বর্ষা নেমেছে আমাদের বনভূমিতে—আকাশ শ্যামল ধরণী শ্যামল। ইচ্ছে করে কাজরীগান ধরি মল্লার সুরে—কিন্তু আজকাল বাজে কাজে একটুও সময় পাইনে। বাদলধারার জবাব আমার সুরের ধারায় বরাবর দিয়ে এসেছি এবার বুঝি আর হোলো না। শ্রাবণের নালিশ রয়ে গেল আমার নামে।
ইতি ১২।৮।৩৮

তোমাদের দাদু।

৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। বর্ষামঙ্গলের অয়োজনে ব্যস্ত আছি। শরৎকাল পড়েছে কিন্তু বর্ষা এখনো তার দখল ছাড়েনি। কবির কাছ থেকে বিদায় না পেলে বোধ করি নড়বে না। তোমার পারুল দিদি আমাকে ভাইফোঁটার লোভ দেখিয়ে পত্র লিখেছেন। ফোঁটা কপাল পর্যন্ত পৌঁছবে কিনা সন্দেহ আছে। পুজোর সময় এ অঞ্চলে তোমার আসার সম্ভাবনা আছে—তখন তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হতে পারবে। আমি ছুটিতে সম্ভবত আশ্রমেই থাকব।
ইতি ১০।৯।৩৮

'দাদু'

৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। নৌকাডুবির ভিতর দিয়ে আমার সঙ্গে তোমার নতুন পরিচয় হোলো এ আমার আনন্দের কথা। দেখাসাক্ষাতে কবিকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। আমার হৃদয় রইল আমার লেখার মধ্যে তোমাদের জন্যে। এর মধ্যে যে চেনাশোনা রইল, সে কিছুতে ঢাকা পড়বে না। আশা করি পারুল ভালো আছে। আমার আশীর্বাদ তোমরা গ্রহণ কো।

দাদু।

ইতি ৫।১১।৩৮

১০

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে মনে দুঃখ বোধ হোলো। কঠিন সংসারে বাইরে থেকে সান্ত্বনা দুর্লভ—অন্তরে যদি একান্ত মনে শান্তির সাধনা করতে পারো তবেই পরিত্রাণ।

পারুলের অসুস্থ শরীরের সংবাদে উদ্বিগ্ন রইলুম।

দাদু।

ইতি ১২।১২।৩৮

১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

তোমার বেদনাপূর্ণ পত্র পড়ে পীড়া বোধ করলুম। একান্তমনে কামনা করি তুমি শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ কর।

আশি বছরের প্রান্তে এসে আমার দেহমন অচল প্রায় হয়ে এসেছে। আমার লেখনী গতিহীন হয়ে পড়েছে। কোন মতে তোমাদের একটুখানি আশীর্বাদ পাঠাতে পারি। সংসারের সমস্ত দুঃখকষ্টের সমস্ত অপমানের ঊর্দ্ধে তোমার জীবন উত্তীর্ণ হোক এই কামনা করি।

নববর্ষ ১৩৪৮

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিরঞ্জীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(অমিয় চক্রবর্তী)

সতীর্থের অভিনন্দন

মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী, আইনস্টাইন, জওহরলাল নেহের্

[রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কালে (সমসাময়িক) জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী অনেকেই তাঁদের সতীর্থ রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে শ্রদ্ধার্ঘ লিখে পাঠান; "স্বর্ণগ্রন্থের" সোনার ভাণ্ডার থেকে দু-একটি বাণীর খণ্ড এইখানে তুলে ধরি। তর্জমায় ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া রক্ষা করেছি মাত্র।]

(ক) বহু সহস্র স্বদেশবাসীর মতো আমিও তাঁর কাছে ঋণী; কবিপ্রতিভা ও জীবনের আশ্চর্য পবিত্রতার দ্বারা তিনি সমগ্র পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধায় উন্নীত করেছেন। আমার ঋণ আরো বেশি। আফ্রিকা থেকে আমি চলে আসার পূর্বেই আমার আশ্রমের অধিবাসী যাঁরা প্রত্যাগমন করেন, শান্তি-নিকেতনে তিনি কি তাঁদের আশ্রয় দেন নি? আরো অনেক অন্তরের বন্ধন এবং পরম স্মৃতি আছে কিন্তু তা একান্ত মর্মের কথা, বাহিরের শ্রদ্ধা প্রকাশের উপলক্ষ্যে বলা চলবে না।

সাবরমতী (স্বাক্ষরিত) মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী

* • • *

(খ) তুমি দেখেছিলে প্রাণীদের ভীষণ সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম যা প্রয়োজনের তাড়নায় এবং অন্ধ প্রবৃত্তির আন্দোলনে জেগে ওঠে। তুমি দেখেছিলে মুক্তিকে, শান্ত ভাবনা এবং সুন্দর সৃষ্টির কাজের মধ্যে যার প্রকাশ। তাকেই হৃদয়ে রেখে দীর্ঘ কর্মসার্থক জীবনে তুমি মানুষের সেবায় নিরত আছ। সর্বত্র বিস্তীর্ণ করেছ সেই নম্র, পূর্ণ স্বাধীনতার অজেয় মানস যাকে তোমার দেশের ঋষিরা আদর্শ ব'লে প্রচার করেছিলেন।

বার্লিন (স্বাক্ষরিত) এলবার্ট আইনস্টাইন

* * * *

(গ) রবীন্দ্র সংস্কৃতির যুগে জন্মেছি আমরা, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও দেশের উপরে এই সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। সে চেষ্টা আমি করব না। কিন্তু গভীর শ্রদ্ধা জানাব তাঁকে যিনি আমাদের পথে আলো দেখিয়ে চলেছেন; জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরের দিক্-নির্দেশ করেছেন, যিনি আমাদের প্রথার গর্তে তলিয়ে যেতে দেননি যাতে প'ড়ে ব্যক্তি ও জাতি ধ্বংস হয়। দেশাত্মিকতা আমাদের প্রাণদান-কারী উচ্চ অভিলাষের ধন, বিশেষ ক'রে যখন দেশাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা মুক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেশাত্মিকতা সংকীর্ণ মন্ত্রে পরিণত হয়ে সেবকদের আচ্ছন্ন সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে; তারা বহুমুখী জীবনকে ভুলতে বসে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয়তার সাধনায় আন্তর্জাতিক উদারদৃষ্টি এনে দিয়েছেন; তাকে শিল্পে সংগীতে জাদুকরী বাণীতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। তাই আমাদের জাতীয়তা আজ ভারতবর্ষের জাগ্রত বুদ্ধির পূর্ণ প্রাণবান প্রতীক।

(স্বাক্ষরিত) জওহরলাল নেহেরু

* * * * *

[সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণ, ছাত্রসঙ্ঘ, অধ্যাপক, শিল্পী ও কর্মীর দল রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে অভিনন্দন পাঠান, য়ুরোপের অন্য কোন দেশ থেকেই সেরকম হৃদ্যতার বিচিত্র প্রকাশ এসে পৌঁছয় নি। সোভিয়েট জনসাধারণের সংস্কৃতি বিভাগ থেকে উৎসবের কালে এই ক-টি কথা তারযোগে এসেছিল; সমগ্র রাশিয়ার প্রীতি ও মঙ্গল-কামনার এই নিদর্শন আজ আবার "দেশ" পত্রিকাযোগে উপস্থিত করলাম।]

মস্কো

কবি,

বহু বৎসর ধ'রে তোমার সৃষ্টি কাজ চলতে থাক্। ভারতবর্ষ এবং মানব সমাজ সমৃদ্ধ হোক্। নবজাগ্রত ভারতে তোমার শিক্ষার কাজ পূর্ণ সার্থক হোক্ এই কামনা জানাই।

U. S. S. R-এর উৎকর্ষকর্মিবৃন্দ ॥

আধুনিক ভারত ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

মহাপুরুষেরাই একেকটা যুগের সৃষ্টি করেন, না একেকটা মহাযুগই তার উপযুক্ত মহাপুরুষকে সৃষ্টি করে—এই বহুশ্রুত সমস্যার নূতন সমাধানে অগ্রসর না হয়ে আমরা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, ওই সমস্যার দুই দিকেই কিছু সত্য আছে। গাছের উৎপত্তিও বীজে এবং তার পরিণতিও বীজে; তেমনি মহাপুরুষেরা একেকটা বড়ো বড়ো যুগের সৃষ্টিও বটেন এবং তার স্রষ্টাও বটেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অতি বড়ো যুগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই যুগ কিভাবে রবীন্দ্রনাথের মানসসত্তাকে গড়ে তুলেছে এবং তাঁর জীবন ও মননের মধ্যে স্বীয় অভিব্যক্তি লাভ করেছে, আমাদের জাতীয় আত্মোপলব্ধির পক্ষে এ বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই বোঝা দরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্তমান যুগের সার্থকতা কোথায়, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি কোন্ পরিণতির দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে। তার পর দেখতে হবে ওই যুগাভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কতখানি অভিব্যক্ত হয়েছে এবং ওই লক্ষ্যাভিমুখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কতখানি প্রেরণা দিয়েছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এত বড়ো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা এস্থলে এই বৃহৎ প্রশ্নের উত্তর কোন্ দিক থেকে মিলতে পারে, সে বিষয়ে একটু ইঙ্গিত মাত্র করেই নিরস্ত হব।

অতীত কালের মর্ম উদ্‌ঘাটন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যে বর্তমান কাল আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সহস্রবিধ জালে জড়িত ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করা স্বভাবতই দুঃসাধ্য। তাছাড়া, যে-যুগতরীর নীতি আরোহণ করে আমরা মহাকালের অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছি, দিকচক্রবালের ওপারে কোন্ মহাতীর্থে তার সন্ধান,—সে কথা শুধু তরণীর নাবিকরাই বলতে পারেন, সাধারণ যাত্রীর পক্ষে তা অজ্ঞাত। বর্তমানের মর্ম উপলব্ধি রূপ কঠিন সমস্যার সমাধান আমার মত অল্পজ্ঞের সাধ্যাতীত। তথাপি, "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" কালিদাসের এই উক্তিটিকে ভরসা করে ও পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথ অবলম্বন করে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় অনুচিত হবে না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখলে তার মধ্যে দুটি বিশেষ প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে বিশাল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিধির অভ্যন্তরে অজস্র বিভেদের মধ্যে মনোগত ঐক্য এবং সংহতি স্থাপনের অবিশ্রান্ত প্রয়াস; অপরদিকে যুগে যুগে বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্তরের সংযোগ স্থাপনের সাধনা। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এই দুটি প্রবণতাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হলেও এ দুটি মূলত একই শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। ভিতরের শক্তি এক, ক্ষেত্রভেদে পৃথক প্রকাশ হয়েছে মাত্র। যে মূল শক্তি এই দুই রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, সে হচ্ছে মৈত্রী-সাধনার শক্তি, ভারতবর্ষের যে প্রতিভা তাকে ওই সাধনার পথে পরিচালিত করেছে, সে হচ্ছে তার পরকে আপন করার প্রতিভা, পরের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিভা নয়। এই জন্যই রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে ভারতবর্ষের আসল অভিপ্রায় ও চরম সার্থকতার সন্ধান পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনার পূর্বেই অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্বেই যে ভারতীয় চিত্তে ভারতবর্ষের ঐক্যোপলব্ধি হয়েছিল এবং চিত্তগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, একথা মনে করার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আর চিন্তনীয় বিষয় এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক একাধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বেই ওই মনোগত ঐক্য দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় ঐক্যের এই যে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষতা, এটাই আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো কথা। এই ঐক্যকে আধুনিক পরিভাষায় cultural unity বা সংস্কৃতিগত ঐক্য বলে অভিহিত করতে পারি। যাহোক, মৌর্য যুগের পরে ভারতবর্ষের ইতিহাস নানারকম রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত হলেও তার ওই সংস্কৃতিগত ঐক্যের সাধনা কখনও বিরত হয়নি, বরং তা উত্তরোত্তর কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এখানে তার ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী উপস্থিত করতে চাইনে।

আর, বিশ্বজগতের সঙ্গে মৈত্রী-সাধনার যে দ্বিতীয় প্রবণতার কথা পূর্বে বলেছি, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের এই বিশ্ব-মৈত্রী-সাধনার চারটি বিশেষ যুগ ও পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। অস্পষ্ট প্রাচীন যুগের অবসানে দেখতে পাই—একদিকে ভারতবর্ষ এবং অপরদিকে যবন দেশ (অর্থাৎ গ্রীস), এই দুই দেশের মধ্যে চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। এই দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র-সংঘর্ষ যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যাবে, ওই অস্ত্র-সংঘর্ষ ছিল সাময়িক এবং তা কোনো দেশকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেনি; কিন্তু ওই দুই সভ্যতার মধ্যে যে চিত্ত-সংস্পর্শ ঘটেছিল, তা ছিল নিবিড় ও গভীর এবং তার প্রভাবে উভয় দেশের সভ্যতাই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। এই গেল বহির্জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের মৈত্রীবন্ধনের প্রথম পর্ব; এই পর্বে যার নাম সবচেয়ে স্মরণীয়, তিনি হচ্ছেন রাজর্ষি অশোক। দ্বিতীয় পর্বে ভারতবর্ষের দৃষ্টি ফিরেছে পূর্বের দিকে; মহা চীনবর্ষের সঙ্গে মহা ভারতবর্ষের অন্তরের মিলনই হচ্ছে এই যুগের সবচেয়ে বড়ো কথা। একদিকে কাশ্যপ, মাতঙ্গ, কুমারজীব, গুণবর্মন এবং অন্যদিকে ফা হিয়ান, হিউএনৎসাঙ, ইৎসিঙ, এঁরাই ছিলেন এই মৈত্রী-সাধনার প্রধান পতাকাবাহী। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, চীন ও ভারতবর্ষের এই চিত্ত-সংস্পর্শ ছিল সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র-সংঘাতহীন। তৃতীয় পর্বে ইসলামিক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ ঘটে। এই পর্বে অস্ত্র-সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গে ভারতীয় মধ্যযুগের অন্ধকার আকাশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওই আলো ছিল উল্কার মতো ক্ষণস্থায়ী। এই উল্কাবর্ষণ দীর্ঘকালব্যাপী হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আলোকে কিছুতেই স্থির আলো বলে বর্ণনা করা যায় না। আমাদের মধ্যযুগের ইতিহাস ওই চমকপ্রদ স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ ও উল্কাপাতের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। কিন্তু সে যুগের অন্ধকার আকাশে কি স্থিরপ্রভ নক্ষত্রমালাও ছিল না? যদি না থাকত, তবে মধ্যযুগের ভারতবর্ষই মিথ্যাময় বলে প্রতিপন্ন হতো। বস্তুত, সেই অন্ধকার রাত্রিতেও রামানন্দ, কবীর, দাদু, নানক, তুকারাম চৈতন্য প্রমুখ সপ্তর্ষিমণ্ডল উজ্জ্বল প্রভায় কোনো একটি ধ্রুবতারকার চারদিকে আবর্তিত হচ্ছিল এবং ভারতবর্ষকে একান্ত দিক্‌ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করছিল। সেই অমারাত্রির অবসানে নব প্রভাতের আবির্ভাবের সঙ্গেই ভারতীয় ইতিহাসের চতুর্থ পর্বের সূচনা হলো। এই পর্বে পশ্চিমের দিক্‌প্রান্ত থেকে যে প্রখর আলো ভারতবর্ষের আকাশে বিচ্ছুরিত হয়েছিল, তাতে প্রথমটাতে আমাদের সকলের চোখ ঝলসে গিয়েছিল। কিন্তু তবু একথা সত্য যে, ওই প্রখর আলোর আবির্ভাবেই আমাদের অমারজনীর অবসান ঘোষিত হলো এবং ওই আলো লেগেই আমাদের দীর্ঘ নিদ্রাভিভূতি কেটে গিয়ে নব জাগরণের সূচনা হলো, এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা।

আমাদের আধুনিক ইতিহাসকেও দুই পর্বে বিভক্ত করতে হয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে পর্ব, সে পর্ব হচ্ছে মুখ্যত পাশ্চাত্য প্রভাবে অভিভবের পর্ব। অল্প কয়েকজন মনীষী হয়তো ওই প্রভাব থেকে নিজেদের অল্পবিস্তর মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন; কিন্তু সাধারণ 'শিক্ষিত' সমাজ যে পশ্চিমের মহিমা গৌরবে মুগ্ধ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারপর দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেল মোহাবসান ও আত্মানুসন্ধানের সূচনা। এই সূচনা কালেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকালটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের এই আত্মানুসন্ধানের যুগ; এখনও যে সে যুগের অবসান হয়েছে, একথা বলতে পারিনে। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে 'আত্মানং বিদ্ধি' এবং এই বাণীই আধুনিক ভারতবর্ষকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের পক্ষে আত্মোপলব্ধিও সহজ সাধ্য নয়। ভারতবর্ষের অর্থাৎ ভারতীয় চিত্তের যথার্থ স্বরূপ ব'লে কিছু আছে কি? যদি থাকে তবে সেটি কি? এই মহাপ্রশ্নেরই সংশয়াতীত উত্তর বর্তমান ভারত চায়। আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ দেশে ও কালে বহু বিচিত্র; প্রদেশে প্রদেশে তার বিভিন্ন প্রকাশ এবং ইতিহাসের পর্বে পর্বে তার নিরন্তর রূপ পরিবর্তনটাই চোখে পড়ে। এই বহু দিকব্যাপ্ত বিচিত্র মহাবর্ষের কোনো ঐক্য সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না এবং তার বহুযুগব্যাপ্ত রহস্যময় ইতিহাসের অবিরত পট-পরিবর্তনের মধ্যে একটি ঐক্যধারা অনুভব করাও সহজ নয়। তাই আধুনিক কালের এই নবজাগরণ ও আত্মোপলব্ধির ব্যাকুলতার মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মস্বরূপ বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং এক একজনের দৃষ্টিতে তার ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ যুগই চিরন্তন ও 'সত্য যুগ' ব'লে মনে হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষকেও তার সমগ্র ইতিহাসকে অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথাটাকে আরও বিশদ ক'রে বলা প্রয়োজন।

আধুনিক ভারতের নবজাগরণ ও আত্মানুসন্ধানের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, এক এক সম্প্রদায় প্রাচীন ইতিহাসের এক একটি যুগের কোনো বিশেষরূপকেই সমগ্র ভারতের ভাবী আদর্শরূপে গ্রহণ ও প্রচার করছে। এই জন্যই দেখতে পাই, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রূপকে আধুনিক কালে এক সঙ্গেই ভারতবর্ষের চিরন্তন ও অভীষ্টরূপ ব'লে দাবী করা হচ্ছে। 'ভারতবর্ষের পূর্ববৈদিক যুগকেই যথার্থ সত্য যুগ বলে স্বীকার করেছে বর্তমান কালের 'আর্য সমাজ'। পূর্ব বৈদিক যুগকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল স্বামী দয়ানন্দের জীবনসাধনা। উত্তর বৈদিক যুগের অর্থাৎ উপনিষদ যুগের আদর্শ রয়েছে ব্রাহ্ম সমাজের মূলে। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন উপনিষদের বাণীর দ্বারা। বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে মহাবোধি সমাজে; তার মূলে রয়েছে দেবমিত্র ধর্মপালের অক্লান্ত সাধনা। শংকর প্রচারিত বেদান্ত ধর্ম নবকলেবর ধারণ করেছে রামকৃষ্ণ মিশনকে আশ্রয় করে; এই আন্দোলনের প্রেরণাদাতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বৈষ্ণব ধর্মেরও পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে; কিন্তু এই ধর্মের বহু শাখা আছে। রামানুজাচার্য, রামানন্দ, নিম্বার্ক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্মপ্রবর্তকগণ বৈষ্ণব ধর্মকে বহু বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছেন। আধুনিককালে এই বহুশাখায়িত বৈষ্ণব ধর্ম ও তার বিচিত্র রূপ নিয়ে নব জীবন প্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে নূতন রূপে ও নূতন শক্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে। শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম এবং জৈন ধর্মেও নূতন প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে বটে; কিন্তু এসব ধর্ম সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করতে সমর্থ হয় নি। শুধু যে সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই পুনরুদ্বোধন ঘটেছে তা নয়; সকল রকম ঐতিহাসিক চেতনাই এ যুগে উজ্জ্বল (কখনও কখনও উগ্র) হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে প্রাদেশিকতা স্বাতন্ত্র্যবোধ খুবই প্রখর হয়েছে। টডের রাজস্থান প্রকাশিত হবার পর থেকে রাজপুতের বীরত্ব মিশ্রিত আত্মত্যাগের কাহিনী একদিকে প্রাদেশিক এবং অপর দিকে সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করেছে। শিখের শৌর্যকীর্তি এবং মারাঠার সাম্রাজ্য মহিমা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে থেকে বঙ্গদেশে আত্মসচেতন হয়ে উঠতে আরম্ভ ক'রে এবং কার্জনের আঘাতে সে চেতনা দুর্নিবার রূপ ধারণ করে। একমাত্র 'রাজসিংহ' বাদে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের কথা-অংশটুকু বাঙলাদেশেরই কোনও না কোনও ঐতিহাসিক বা অর্ধ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয় লক্ষ্য করার যোগ্য। 'বঙ্গদর্শন' নামটির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ সচেতনতা সুস্পষ্ট। যা হোক, এ যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতীয় চিত্তে ঐতিহাসিক চেতনার সঞ্চার ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্বোধন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যের চর্চা নূতন করে শুরু হয় এবং উইলিয়ম জোন্স্, কোলব্রুক, ম্যাকস্ মূলর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনীষীদের গবেষণায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ রেনেসাঁস হয়। এ সকলের পাশে পাশে চলেছে সমাজ সংস্কার — সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহের প্রচলন, অসবর্ণ বিবাহের অনুমোদন প্রভৃতি তার প্রমাণ। শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন এবং প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কথাও এ প্রসঙ্গে কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রাচীন চিত্র ও নৃত্যকলা এবং মার্গ সঙ্গীতের নব অভ্যুদয়ের উল্লেখ মাত্র না করলে অন্যায় হবে। যা হোক, আধুনিক ভারতে নবপ্রাণ সঞ্চারের এই হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই সমস্ত পরস্পর অনুকূল বা প্রতিকূল শক্তিসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ আধুনিক ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ পরিপ্রেক্ষিকার উপরে স্থাপন করে আলোচনা করলেই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থরূপে বোঝা যাবে। তা হলে দেখা যাবে আধুনিক ভারতের প্রায় সমস্ত শক্তিই তাঁর অতি স্বচ্ছ চিত্তে শুধু যে প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, তাকে গভীরভাবে মন্থন ক'রে তাঁর জীবনকে সহস্র মুখী করে গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে তিনিও প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন।

এ প্রবন্ধে ওই বৃহৎ প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাও সম্ভব নয়। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়ে দুয়েকটি কথা ব'লেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। এ বিষয়টাও দুদিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, তিনি নানা প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতীয় ইতিহাসের বহু বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার থেকে জানা যায়, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সেটা জানার প্রয়োজন আছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত ভারতীয় চিত্তের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা ক'রেই তিনি নিরস্ত হননি। তাঁর রচিত সাহিত্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এমন বোধ করি আর কারও সাহিত্যে কখনও হয়নি। এই দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতি যদি একটু লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যায় ভারত-ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক যুগই তাঁর রচনায় নূতন রূপ পেয়েছে। প্রথমেই বৈদিক যুগ। গায়ত্রী মন্ত্র তাঁর কিরূপ প্রিয় ছিল, সেকথা আমরা জানি। তাছাড়া "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্রের বঙ্গানুবাদও

তিনি করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাতে সুরসংযোগও করেছেন। তারপরে উপনিষদের যুগ। 'চিত্রা' কাব্যে 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় সত্যকাম জাবালের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষে উপনিষদের যুগের গুরুগৃহের ও তৎকালীন আদর্শের যে চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অবিস্মরণীয়। তা ছাড়া, ধর্ম, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি গ্রন্থে উপনিষদের যে ব্যাখ্যা তিনি আমাদের দিয়েছেন এবং 'নৈবেদ্য' কাব্যে উপনিষদের বাণীকে যেভাবে প্রতিরণিত করে তুলেছেন, তাতে একটা বহুকালবিস্মৃত যুগ যেন আমাদের কাছে নূতন করে উদ্ঘাটিত হয়েছে। তারপরেই আসে বৌদ্ধযুগের কথা। 'কথা' কাব্যের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, অভিসার প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতায়, নটীর পূজা ও চণ্ডালিকা নাটকে বৌদ্ধযুগের প্রাণবস্তুটি যেন আমাদের কাছে পুনঃস্পন্দিত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, "হিংসায় উন্মত্ত পৃথিব" প্রভৃতি গানে, 'জাভাযাত্রীর পত্রে' এবং সিয়াম ও বালী দ্বীপ দর্শন উপলক্ষে যে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন, সেগুলিতেও বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত শুধু সাহিত্যে নয়, বৃহত্তর ভারত ও চীন-জাপান ভ্রমণ এবং চীনভবন প্রতিষ্ঠা ও চীন-ভারত সংস্কৃতি সমিতির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগকে পুনরুদ্বুদ্ধ ক'রতে কার্যতও সহায়তা করেছেন। প্রাচীনকালে কাশ্যপ, মাতঙ্গ, কুমারজীব ও গুণবর্ধন ভারতবর্ষের যে আদর্শকে বহন ক'রে গিয়েছিলেন চীনবর্ষে, আধুনিক-কালে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শেরই পতাকাবাহী ব'লে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবেন। বৌদ্ধযুগের পরে গুপ্তসম্রাটগণ ও কালিদাসের যুগের চিত্রই বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যে। কুমারসম্ভবের অনুবাদ, ক্ষণিকার 'সেকাল', কল্পনার 'স্বপ্ন' প্রভৃতি কবিতায় মেঘদূত, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনায় তিনি যে কি অদ্ভুত উপায়ে বিস্মৃতপ্রায় একটি যুগকে নূতন প্রাণে উজ্জীবিত ক'রে তুলেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। এই উপলক্ষে 'তপোবন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ-মহাভারতও তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। বাল্মীকি-প্রতিভা কালমৃগয়া, ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি রচনার মধ্যে রামায়ণের যুগকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি। গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, নরকবাস, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি রচনার মধ্যে মহাভারতীয় যুগের প্রাণ-স্পন্দন যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের রাজপুত, শিখ ও মারাঠার, ত্যাগ, বীর্য ও গৌরবের ইতিহাস যেন 'কথা' গ্রন্থের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংহত হয়ে আতসকাচে-ধৃত সূর্যকিরণের মতো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'শিবাজী' নামক সুবিখ্যাত কবিতাটি এবং শিখ ও মারাঠা ইতিহাসের উপর লিখিত দুটি প্রবন্ধও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ অনাদি অতীতকে আহ্বান ক'রে বলেছেন—'কথা কও, কথা কও'। তাঁর সাধনায় মৃত অতীতের কণ্ঠও আজ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে: তাই তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই আজ আমরা ভারতবর্ষের বহু অতীত যুগের মিলিত কণ্ঠের ঐক্যতান শুনতে পাচ্ছি, এটা আমাদের পক্ষে কম আনন্দ ও গৌরবের কথা নয়। কালিদাসের সাহিত্যে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের অখণ্ড ভৌগোলিক রূপকে প্রতিভাত দেখতে পাই উজ্জ্বল বর্ণে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রূপ দেখা যায় অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ক্ষীণ রেখায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের বৈশিষ্টতা থাকলেও তার বিশাল সমগ্রতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু ও সাহিত্যে ভারতীয় ইতিহাস শুধু বিশিষ্টরূপে নয়, অনেকখানি পূর্ণতর রূপেও প্রতিফলিত হয়েছে। সেক্সপীয়রের কতকগুলি নাটকে ইংলণ্ডের ইতিহাস ধরা দিয়েছে জীবন্তরূপে; তার মধ্যে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের আবেগ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড-গতিতে ও নাটকীয় ভঙ্গীতে। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে নাটকীয় প্রচণ্ডতা কখনও উদগ্র হয়ে ওঠেনি। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের ইতিহাস তার উগ্রতা পরিহার ক'রে ত্যাগ, বীর্য ও ধ্যানের স্তব্ধ মহিমময় মূর্তিতেই ধরা দিয়েছে। এই বিশিষ্টতাটুকু না বুঝলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি প্রধান কথাই অলক্ষিত থেকে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বসেছিলাম পায়ের কাছে, ভেবেছিলাম মনে—
একটা কিছু চেয়ে নেব সেবায়-আরাধনে।
আর সবারই পূজার শেষে
বলেছিলে ঈষৎ হেসে
কবি, তুমি বলো, তোমার কিসের নিবেদন;
বলেছিলাম, পাই যেন এই সঙ্গ সারাক্ষণ।
বলেছিলে—যাবার পথে অস্তাচলের কোণে,—
অনুদিনই জেগে আমি রইব তোমার মনে,—
আমায় কিন্তু ভুলতে হবে;
শুধু আমার দীপ্তি র'বে;—
পড়বে মনে—চাইবে যখন তোমার দু'নয়ন;
তোমার আমার সেই দেখারই রইল আয়োজন।

আজ যেদিকে ফিরাই আঁখি—যেথায় যাহা আছে,
মনে পড়ে সেই কথাটাই—আছই তুমি কাছে!
ধরার মুখে তোমার আলো,
চাইতে গেলেই লাগে ভালো,
যে বাণী মোর মন ভুলালো, স্মরণ করি তাই;
তোমার আমার দেখার পথে তাইতো বাধা নাই।
মুখের কথা? নাই-বা হ'ল—বুকের মাঝেই থেকো,
দিন ফুরাবার আগে আমার এই মিনতি রেখো।
চোখের পথে, মনের মাঝে
তোমার যে সুর-সারং বাজে,
সেই সুরেরই আবেশ যেন না ছাড়ে এক তিল;—
চোখের পাতায় মনের খাতায় হারায়নাক মিল।

পৃথিবীর পূর্ণতম মানব

শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম-এ

আজ দুই বৎসর হোলো রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের বাসর জাতীয় জীবনে কোন দিন অতীত হবে না। তাঁর তিরোভাবের কথা যখন ভাবি, তখন এই দেশের প্রচলিত কথায় বলতে হয়—একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেছে, কারণ তিনি ছিলেন বাস্তবিক জনগণের ইন্দ্র—মনে হয়, যে অভ্রভেদী হিমালয় পর্বত সমগ্র দেশের হৃদয়-দেশ হ'তে এতদিন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা' যেন সহসা দেশের বুকে এক বিরাট শূন্যতা রেখে ল্যান্ড-স্লাইডে বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। এই দেশের হৃদয়ে তিনি যে কতটা জায়গা জুড়ে ছিলেন, আমরা এখনই যেন তা' ভাল ক'রে বুঝতে পারছি। সমগ্র দেশ যে-ভাবে তাঁর জন্যে শোক করছে তাতে মনে হয়—তিনি যেন মরে গিয়েই দেশের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে জয় করে নিয়েছেন। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি—দেশের কত বিরুদ্ধতা ও বিমুখতার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। দেশের হৃদয়ের উপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর মনের যাদুদণ্ড বুলিয়ে দিয়েছেন, ধীরে ধীরে তাঁর অসপত্ন অধিকার তিনি বিস্তার করেছেন সমগ্র দেশের উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের পরমাশ্চর্য মোহিনী-শক্তি দিয়ে। মনে হয় মৃত্যুর পরই তাঁর দেশ-বিজয়-যাত্রা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল, এপারে যা ছল রামধনুর একটি খণ্ডিত বক্ররেখা তাই ওপারে গিয়ে পরিণত হ'ল এক পূর্ণ-বৃত্তের সুবলয়িত ছটায়।

বাঙলা দেশ বুঝছে—তিনি ছিলেন তার কতখানি। বর্তমান বাঙলা যে তাঁরি তৈরী। গত অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় হ'তে তিনি বাঙালীর হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ ক'রে এসেছেন বন্ধুরূপে সাথীরূপে মনের মিতা রূপে। তিনি ভিতর থেকে অন্তরঙ্গভাবে এই বাঙলাকে গড়ে তুলেছেন, নিয়ন্ত্রিত করেছেন তার ভাবকে তার চিন্তাকে। বাঙলার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, তা'র আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সম্ভোগ-বিরতির তিনি ছিলেন চিরসাথী। তাঁর হৃদয়ের অনন্ত সূক্ষ্ম-ভাবরাজিকে তিনি দিয়েছেন এক অপরূপ আলোছায়া-আঁকা ভাষা, তার আবেগকে আশ্চর্য বেগবতী অর্থের-ইঙ্গিতে-ভরা এক স্তুতিময়ী বাণী। এই যে প্রাণের বন্ধু, হৃদয়ের সঙ্গী, তিনি ভালবাসার ভিতর দিয়ে দেশকে গড়ে তুলেছিলেন, দিয়েছিলেন তাকে তার বর্তমান মূর্তি, কাজেই দেশ তাঁর প্রভাব প্রথমটা তত টের পায় নাই। রাজনীতিকের প্রভাবের মধ্যে একটা উন্মাদনা আছে, নেশার মত তা মানুষকে পেয়ে বসে, কিন্তু মদের ফেনার নেশার মত তা ক্ষণিক, সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হ'য়ে যেতে তা বেশী সময় নেয় না। সে প্রভাব মানুষের মনের উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ বলে তা স্থায়ী হয় না. রাজনীতিকের জীবিতাবস্থাতেই তা শেষ হ'য়ে গেছে—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু কবির প্রভাব অন্য-রকমের। বন্ধুকে দেশের সর্ববিধ বন্ধনমোচকরূপে চিনতে দেরী হয়। রবীন্দ্রনাথকে দেশ দেরীতেই চিনেছে।

আজ বাঙলা বুঝছে—তিনি কতটুকু মাধুরী মাখিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষের মনে মনে। তাঁর মনের মমতা মেখে শিশুর খেলা হ'য়ে উঠেছে আমাদের কাছে আরো মধুময় বধূর সলজ্জ হাসি হ'য়ে উঠেছে মধুরতর। যুবক-যুবতীর প্রেম-রাগে আজ মিশে গেছে তাঁরি হৃদয়ের রং, বৃদ্ধের কর্ম-বিরতিতে তাঁরি দূরপ্রসারী দৃষ্টির ছাপ। তাঁর নয়নের আলো আজ ঝল্‌সে উঠছে সূর্যকরোজ্জ্বল নদীনীরে, সুচিক্কণ তৃণে তৃণে, পল্লবের পলকে পলকে। তাঁরি নয়নের অঞ্জন গায়ে মেখে আকাশ হ'য়ে উঠেছে আমাদের কাছে আরো সুনীল, বনভূমি হয়েছে আরো শ্যামল। ধরণীর ধূলিকে তিনি ধন্য করেছেন, রজোরেণু রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি খুলে দিয়েছেন নন্দনের দুয়ার, স্বর্গে-মর্ত্যে বেঁধেছেন হেমসেতু অথবা ভূমিকেই পরিণত করেছেন এক পরমাশ্চর্য ভূ-স্বর্গে। সৌন্দর্যের কোন্ অমরাবতীতে তাঁর দেহ-মনকে তিনি আকণ্ঠ সৌন্দর্য পান করিয়েছেন এবং অকুণ্ঠ অজস্র ধারায় তাকে ঢেলে দিয়েছেন এই ধূলি-মলিন জগতে, হৃদয়ের লাবণ্য দিয়ে ধুয়ে দিয়েছেন তার সমস্ত গ্লানি। তাঁর দেহ-মনব্যাপী চিরসুন্দরকে কত দিকে দিকে তিনি রূপাতি ক'রে গেছেন তাঁর এবং দেশের জীবনে। তাঁর মনোগুহাবাসী সুন্দর অপরূপ সৃজনানন্দে নিত্য নব রূপ পেয়েছে কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে নৃত্যে অভিনয়ে নিত্য নূতন ভঙ্গীতে। বাঙলার সৌন্দর্য-সাধনা তাঁরি ভিতর দিয়ে অর্জন করেছে পরমা সিদ্ধি। ললিতকলার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে বর্তমান বাঙলার পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, চলন-বলন, উৎসবানুষ্ঠান এবং এমনকি, হাতের লেখাটিতে পর্যন্ত মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে তাঁরি হৃদয়ের কমনীয়তা, তাঁরি ব্যক্তিত্বের ছাপ।

কিন্তু এটুকু বল্লেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। তিনি কবি, তিনি প্রেমিক, তিনি রূপদক্ষ, শিল্প সাধক, সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ পুরোহিত, কিন্তু তিনি যে মহামনীষীও বটেন। সাহিত্য, ভাষা, শব্দতত্ত্ব, ধর্ম, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, শিক্ষা, নারী জাগৃতি, অর্থনীতি, কৃষি, পল্লী-উন্নয়ন ইত্যাদি জীবনের সর্ব বিভাগেই যে তাঁর অলৌকিক মনন-শক্তি দ্বারা পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। জীবনের সব বিভাগই পেয়েছে তাঁর অসামান্য মানস ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ও প্রভাব। অবশ্য সব দিক দিয়ে তিনি জীবনকে ছুঁয়েছেন ব'লেই তাকে তিনি অর্গলাবদ্ধ পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ক'রে দেখেন নি, তিনি চেয়েছিলেন বাঙলার তথা ভারতের—তথা জগতের অখণ্ড মনো-বিকাশ, সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, চেয়েছিলেন সর্ববিধ প্রথা অনুশাসন ও সংস্কারের কুহেলিকা-জাল হ'তে মানুষের মনের উদার অনাবৃত মুক্তি। তিনি যে কত বড় দার্শনিক বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে তা' প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন নিখিল ভারত দার্শনিক সম্মেলনের প্রথম সভাপতিরূপে তাঁকে দেখে এবং তাঁর হিবার্ট লেক্‌চারস্ দিতে আহূত হওয়াতে। মহাধর্ম সম্মেলনেও স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসবেণ্ড প্রমুখ মনীষীদের মতে তাঁর অভিভাষণই ছিল বিদেশী প্রতিনিধিদের প্রধান আকর্ষণের বস্তু। অবশ্য ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি একটা 'স্কুল' গ'ড়ে যাননি, শুষ্ক পুঁথির পাতার মধ্যে বিশেষ কোন একটা মতবাদকে আবদ্ধ ক'রে যাননি, 'সিস্‌টেমের' তটবন্ধনে তাকে সীমাবদ্ধ করেন নি। তাঁর চিত্ত-ক্ষেত্র ছিল জীবন-সমুদ্রের মতই উদার এবং অনন্তবিস্তৃত. তিনি দিয়ে গেছেন তাই জীবনেরই দর্শন, জীবন-বেদ, মানুষের ধর্ম। তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন মনে মনে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে ভেদের প্রাচীর; প্রচার করেছেন—জলে জলে যেমন অন্তর্লীন অন্তরঙ্গতা, মানুষে মানুষে তেমনি রয়েছে এক নিবিড় অন্তর্গূঢ় যোগ। সেই যোগ যেখানে হয়েছে ব্যাহত, যেখানে ফুটে উঠেছে উদার মহাকাশকে ঘটাকাশে পটাকাশে খণ্ডিত করবার প্রয়াস, যেখানেই প্রকাশ পেয়েছে ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা আত্মপঙ্কলীলামগ্ন কুৎসিত কূপমণ্ডুকতা, প্রবলের অত্যাচার আর দুর্বলের ভয় —সেখানেই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর অমোঘ ন্যায়ের দণ্ড, তাঁর রসনায় সত্য বাক্য ঝল্‌সে উঠেছে সেখানে খড়্গের মত। তিনি মনে করতেন—মানব-সমাজ একটি বহু-অবয়ব জীব, তার এক অঙ্গের কৃশতার বিনিময়ে অন্য অঙ্গের পুষ্টি-সাধনকে তার উন্নতি বলে না। এক জায়গায় বায়ু উত্তপ্ত হ'য়ে উপরে উঠে গেলে এই উত্তাপ-বৈষম্য যেমন ঝড়কে ডেকে আনে তেমনি মানব-সমাজের

মধ্যে উচ্চাবচতা এবং কৃত্রিম ভেদের ফাঁকের মধ্যেই ফুটে উঠে রুদ্রের প্রলয়ংকরী লীলা, সমস্ত অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। একই শৃংখলে গাঁথা মানব-সমাজের উত্থান এবং পতন একসংগে। পিছনে যে থাকবে—সকলকে সে পিছনে টানবে। ফাঁকি দিয়ে কারো এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সেই ফাঁকির চেষ্টা একদিন ধরা পড়ে, তখন এক পা' এগিয়ে দশ পা' পিছোতে হয়, অপমানে হতে হয় সবার সমান। সমগ্র মানব-জীবন ব্যেপে আছে যে, মহাসত্য এই ঋষি তা দর্শন করেছেন। মানবের চিন্তার ভাণ্ডারে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

এমার্সন পৃথিবীর নরোত্তমদেরে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—the Sayer, the Knower, the Doer—যিনি কথা বলেন, যিনি জানেন, যিনি কাজ করেন। কথা বলেন কবি। এই কথা ছোট জিনিস নয়—সৃষ্টির আদিতেই রয়েছে এই কথা—এই শব্দ। শব্দ যখন অর্থদ্যোতক ভাষা ও অনন্ত ব্যঞ্জনাপূর্ণ ছন্দের শাসনে বিবৃত হয় তখনই তার মধ্যে ফুটে উঠে আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি-সৃজনী শক্তি। সৃষ্টি লীলায় কথার স্থান তাই এত বড়। কবিরা এই কথা দিয়েই সৃষ্টি করেন রূপ, কাজেই এই Sayer-এর ক্ষেত্রে হয়েছে সুন্দরের ক্ষেত্র। Knower—অথাৎ যিনি জানেন, যিনি জ্ঞানী—সত্যকে জানাই জ্ঞানীর কাজ। কাজেই Knower-এর ক্ষেত্র হইল সত্যের ক্ষেত্র। Doer হলেন কর্মী, অর্থৎ মানবহিতব্রত যিনি গ্রহণ করেছেন। এই Doer-এর ক্ষেত্র হলো মঙ্গলের ক্ষেত্র, শিবের ক্ষেত্র। এই সত্য শিব ও সুন্দরের পন্থায়ই মানুষ ঐশী শক্তিকে স্পর্শ করতে পারে। পৃথিবীর নরোত্তমদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই এই তিন পন্থার একটি বিশেষ পন্থাকে অবলম্বন ক'রে তাঁর লোকোত্তরী লীলা দেখিয়ে থাকেন, অন্তত অন্য এক বা উভয় পন্থায় তাঁর যাতায়াত থাকলেও সে দিকে তাঁর আত্মবিকাশ অনেকটা আচ্ছন্ন ও অপ্রধান হয়েই থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব হয়েছে এই যে, তিনি এই তিন পন্থাকেই তুল্যভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাদের সব কয়েকটিকেই দিয়েছেন সমান প্রাধান্য, এই তিন ধারার সমন্বয়ে নিজ কীর্তি ও জীবনে তিনি সৃষ্টি ক'রে তুলেছেন এক অভিনব ত্রিবেণী-তীর্থ। কবি ও ও মনীষীরূপে আমরা তাঁকে দেখেছি, তিনি যে মহাকর্মী—জগৎ তা একদিন ভাল ক'রেই বুঝবে। বিশ্বভারতী এদেশে নালন্দা ও তক্ষশিলার উত্তরাধিকার সূত্রেই গজিয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু বিশ্ব-ভারতীর স্বপ্নের মত এতবড় বিরাট স্বপ্ন কোন মানব পূর্বে কখনও দেখে নি, এতবড় বিরাট স্বপ্নকে এত বিপুল সম্ভাব্যতাপূর্ণ অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ক্রমবর্দ্ধমান রূপও কেউ কখনো দেয়নি। অংকুরের মধ্যেই যেমন থাকে মহা মহীরূহ, এই বিশ্ব-ভারতীর মধ্যেও নিহিত রয়েছে সমগ্র মানব-সমাজের অনন্ত ভবিষ্যৎ। সাহিত্যের বহুশাখায়িত প্রচেষ্টা এবং দেশের উপর প্রভাবের দিক দিয়ে উনবিংশ শতকের ইউরোপের দুইটি লোকোত্তর প্রতিভার কথা—ফ্রান্সের ভিক্টর হুগো ও জার্মেনির গেটের কথা—কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সম-পর্যায়ভুক্ত ব'লে মনে আসা স্বাভাবিক। কাব্য ও সাহিত্য ছাড়াও জীবনের নানা দিকাভিসারী গতির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুল্য মনে হয় মধ্যযুগের ইতালীর লিওনার্ডো ডা ভিন্সি। Mona Lisa ও Last Supper-এর চিত্রকররূপেই তিনি এখন বিখ্যাত হ'লেও তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রকর, কবি, শিল্পসমালোচক, অংকশাস্ত্রবিশারদ, বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়র—তিনি ছিলেন ইতালীর বহুমুখী নব-জাগরণের প্রতীক। বাঙলা বহুমুখী নব-জাগরণে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এ'র চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। প্রতিভার বহুমুখিতার কথা বাদ দিয়ে শুধু সাহিত্যিক চেষ্টার পরিমাণের দিক দিয়েও বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে একরূপ অনতিক্রান্ত ব'লেই মনে হয়। তবে এদিকে বোধ হয় ডন্ কুইক্ সোটের লেখক সারভেনটিসের সমসাময়িক স্পেনীয় নাট্যকার লোপ্ ডি ভেগার স্থান সর্বোচ্চে। সাহিত্যিক অধ্যবসায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে এ'র নামই করা যেতে পারে। তিনি নাকি দু'হাজার নাটক রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে শ'চারেক এখনো প্রচলিত আছে— যদিও এর মধ্যে অনেকগুলিই একাঙ্কিকা। বিস্তৃতি বাদ দিয়ে বৈচিত্র্য ও গভীরতার দিক দিয়ে লোপ্ ডি ভেগাকে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কিছুতেই মনে করা যায় না।

জীবনের সর্ববিধ বিচিত্র ধারাকে নিজের মধ্যে যুক্ত ক'রে সমন্বিত করে দাঁড়িয়েছেন এই বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। এক কথায় জীবনের সর্বদিকস্পর্শী সমগ্রতাই হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবন, মনন-জীবন ও কর্ম-জীবনের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথরূপ বাঁকানো বৃত্তের মধ্যে তিনি বর্তমান জগতের সবই ধৃত অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে, তাঁর মনের পরিধি ফুটে উঠেছে সকলকে বেড়িয়ে—কোন কিছুকেই ছেড়ে নহে। এই জন্যই দেখতে পাই—কত আপাতবিরোধী জিনিস তাঁর জীবনে এসে মিলেছে, তাঁর জীবন হ'য়ে উঠেছে বিপরীতমুখী বহু ধারার যুক্ত ধারা। তিনি ভাববিলাসী কবি—এ পরিচয়ই ছিল এদেশে বহুদিন ধরে তাঁর একমাত্র পরিচয়। কিন্তু স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর জীবন-ধারা যাঁরা অনুসরণ ক'রে এসেছেন তাঁরাই জানেন—তিনি কত বড় কেজো লোক। তাঁর মনের একদিক সুদূর নক্ষত্রলোক প্রয়াণেই অত্যন্ত সত্য, কিন্তু অন্য দিক আমাদের এই স্থূল কঠিন ভূমিতেই রেখেছে তার পা। তিনি 'কমল বিলাসী' কবি, তিনি শুধু সুললিত কোমল-কান্ত পদাবলীরই রচয়িতা—একসময় অনেকে তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণাই ক'রে রেখেছিল; কিন্তু তাঁর মধ্যে রয়েছে কি অপরাজেয় শক্তি, কি দুর্জয় পৌরুষ, তাঁর সৌন্দর্য সৃষ্টির অন্তরালেও যে রয়েছে এক বলিষ্ঠ মানসতার বিধৃতি সে আবিষ্কার দেশ ধীরে ধীরে করেছে। তিনি সৌন্দর্যকে বেঁধেছেন সংযম ও শুচিতার সংগে, ভোগকে বেঁধেছেন ত্যাগের সংগে, প্রেমকে বেঁধেছেন প্রবল বীর্য ও দুর্দমনীয় পৌরুষের সংগে। তাঁর চিন্তা-ধারায় পূর্ব ও পশ্চিম গিয়েছে আশ্চর্যভাবে মিলে, তাঁর জীবনে এক নব-গংগা-যমুনা সংগমে এক অভিনব প্রয়াগ তীর্থ রচিত হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা গেটে সমস্ত পশ্চিমকে আত্মসাৎ ক'রে পূর্বের দিকে যে বাহু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শকুন্তলার উপর তাঁর বহু-খ্যাত প্রশস্তি থেকে তা' অনুমান করা যায়; কিন্তু উভয়কে দুই বাহু দিয়ে আলিংগন করবার এবং সংহতভাবে রূপায়িত ক'রে তুলবার অপেক্ষা ছিল রবীন্দ্র-প্রতিভারই। কল্পপন্থা, শ্রেয়ঃ পন্থা, বস্তুপন্থা, আলোকপন্থা প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্য-রীতিকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন একই জীবনের সাহিত্য-প্রচেষ্টায়, তাঁর দুঃসাহসিক লেখনীর কবলে প'ড়ে সাহিত্য-রাজ্যের বাঘ ও গরুরা এসে একই ঘাটে জল খেয়েছে। সংগীত ও চিত্রের রীতিকেও তিনি কাব্য-রীতির সংগে দিয়েছেন বেঁধে, কথা সুর ও রং তাঁর বাণীতে লাভ করেছে অপরূপ মিলন-তীর্থ। এদিকে তাঁতে দেখতে পাচ্ছি বৃন্দাবনবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধর রূপ। তাঁর মুরলীর সুকরুণ আহ্বান শুনে দেশে দেশে নরনারীর গোপী হিয়া অপূর্ব রাসানন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে! অন্য দিকে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে রুদ্রের প্রলয়ংকর রূপ, পিনাকীর রূপ—যেখানে প্রকাশ পেয়েছে ক্ষুদ্রতা এবং হীনতা সেখানেই তার মর্মে তিনি হেনেছেন তাঁর নিষ্পলক তৃতীয় নেত্রের বহ্নি। একদিকে মুরলী অন্য দিকে রুদ্রবীণা তাঁর সমন্বয়কারী জীবনে যুক্ত হয়ে—সত্য হয়ে উঠেছে, এক হয়ে উঠেছে অন্যের অনুপূরক, একে এনেছে অন্যেরই সম্পূর্ণতা। একদিকে তাঁর জীবনে রয়েছে সুগভীর আত্মবোধ, আত্মার গহনে নেমে স্থিরলক্ষ্য সমাহিত দৃষ্টিতে লাভ করেছেন তার মেঘমুক্ত অনাবৃত সাক্ষাৎকার, কেন্দ্রবিন্দুর স্থিতির মধ্যে তার অচঞ্চল পরিচয়; অন্যদিকে তাঁর চিত্তকে জালের মত ছড়িয়ে দিয়েছেন অন্তহীন বিশ্বের বিস্তারে, লাভ করেছেন পরিপূর্ণ বিশ্ববোধ। ভিতরের দিকে যা' অতলান্ত এবং বাইরের দিকে যা' অনন্ত—সেই আত্মাকেই দুই দিকে জানবার

এই দুই পদ্ধতি একই জালের গুটানো এবং ছড়ানোর মতন, একই হৃদযন্ত্রের systole and diastole—সংকোচন এবং সম্প্রসারণের মতন তাঁর জীবনে রূপ পরিগ্রহ করে উঠেছে। দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ থাকলেও তাদের মধ্যে সত্যিকার যে কোন বিরোধ নেই, বরং একের ভিত্তির উপরই যে অন্যকে দাঁড়াতে হয়, এক যে অন্যের পরিণতি—রবীন্দ্রনাথের জীবনে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—বিশ্বপ্রেমের দিকে যে দেশপ্রেমের উন্নতি নেই তা সংকীর্ণ এবং পঙ্কিল; আবার দেশপ্রেমে যার ভিত্তি নেই সেই বিশ্বপ্রেমও আকাশকুসুমের মতই অলীক এবং শূন্যগর্ভ। কাব্য ও জীবনের বিরোধিতা সর্বজনবিদিত, মানুষের সৃষ্ট কাব্য ও তার জীবন সাধারণত চলে দুই ভিন্ন খাতে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এরা পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে থাকে নাই, যুক্ত হয়ে গেছে। তিনি কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনকেও একটি মহাকাব্যরূপে সর্গে সর্গে উম্ঘাটিত করে মানবের চক্ষের সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁর সমগ্র কাব্য-চেষ্টা তার স্থির-ঘন রূপ পেয়েছে তাঁর জীবনে কাব্য ও জীবন তাঁর মধ্যে হয়ে উঠেছে অঙ্গাঙ্গী, একে অন্যের দ্বারা পরিপ্লাবিত ও ওতপ্রোত।

..এই সমন্বয়সাধক মহাপুরুষের মধ্যে কত বিভিন্ন দিক হতে কত বিরোধী ধারা যে এসে মিশেছে, কত বিচিত্র রসধাতুতে যে তাঁর মানস-লোক রচিত হয়ে উঠেছে তার ইতিবৃত্ত তৈরি করা শক্ত। অতীতের সমস্ত ভাব ও চিন্তার ধারাকে তিনি অগস্ত্যমুনির মত নিঃশেষে শোষণ করে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেশ বিদেশের সমস্ত সারস্বত সূচনার তিনি সুন্দর সমাপ্তি, যুগ-যুগ-সঞ্চিত শস্যের তিনি ঘনায়িত শেষ ছটা তারি ঘনফল। সারা বিশ্বের আকাঙ্ক্ষার আরাধনা ফুটিয়ে তুলেছিল এই আরাধ্য মূর্তিকে, বিশ্বমর্মের কামনা ধরেছিল এই চিত্ত-ঘন রূপ। তাই তিনি নব-বিশ্বরূপে দেখিয়ে গিয়েছেন জীবনে। বর্তমান মানব-জীবনের ক্ষুদ্রতা ও খণ্ডতার মধ্যে সমগ্রতা ও পূর্ণতার প্রকাশকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল এই বিধাতৃ-প্রেরিত জীবনের উদ্দেশ্য, তাই পৃথিবীর পূর্ণতম মানবরূপে সমগ্র অতীতের পাদপীঠতলে ভর করে অনাগত ভবিষ্যতের ক্রমায়ত পরিধির দিকে মাথা তুলে অনন্তকালের পটভূমিকায় দাঁড়াতে হয়েছে এই বিরাট পুরুষকে।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

ছন্নছাড়া জীবনের গতিহারা অন্ধকার কোণে
আমরা বাঁচিয়াছিনু। ম্লান মুখে শঙ্কিত চরণে
দুরন্ত শ্রাবণ এলো অশ্রুভারে অবনত আঁখি
সর্বস্ব হারায়ে তার হে কবি তোমারে গেল ডাকি
কোন সাড়া পেল না সে। শ্রাবণের মধুর সঙ্গীতে
নবীন আশার বাণী জানালে না নূতন ভঙ্গিতে,
নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল। ম্লান মুখে লয়ে অশ্রু ধারা
অসহবেদন ভারে পূর্ণিমা রজনী আত্মহারা
মেলিয়া কুন্তল-জাল রহি' রহি' উঠিলো গুমরি'
তমাল তালের বনে মর্ম ব্যথা জানালো মর্মরি।
মধুমাধবের লীলা আজি হতে হ'লো অবসান
বৈষ্ণবের লাগি হায় কে শোনাবে বৈকুণ্ঠের গান।
পথভ্রান্ত মানবেরে কে জানাবে হে পথ সন্ধানী
অমৃত পথের কথা অনল প্রবাহময় বাণী,
বিশ্বের হৃদয় জিনি মুহূর্তে আপন করি সবে
ভুবন ভরিলে তুমি অফুরন্ত জ্ঞানের বৈভবে।
হে বিরাট! দীপ্তি তব ছিন্ন করি ধূলির আকাশ
জ্ঞানের সুষমা রাশি সর্বময় করিল প্রকাশ।
সমুদ্রের কূলে কূলে উপল কুড়ায়ে ফিরি আমি
দেখি নি কি মুক্তা আছে জ্ঞানের সাগর জলে নামি।
প্রতিভা হিমাদ্রি সম মিশে গেছে ঊর্দ্ধ অসীমায়
প্লাবন আনিলে বিশ্বে ভূমানন্দ, আপন ভূমায়
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সমধরিত্রীর দিকচক্রবালে
জ্বালালে জ্ঞানের শিখা ম্লান দেশ জননীর ভালে
পরালে যশের জয়-টিকা। ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর
গৌরবে ভরিলে তুমি পরাধীন জাতির অন্তর।

ধরণীর সত্য যাহা নিত্য তাহা লক্ষ মুখে দিয়া
মানব কল্যাণ লাগি' মহানন্দে দিলে নিঃশেষিয়া,
যুগের অশান্তি আজি অনিবার্য স্বার্থের সংঘাতে
ভাঙিয়া পড়িতে চায় ঘনঘোর তমময়ী রাতে
কে দেখাবে সত্য পথ আঁধার আকাশ তলে আজি
তোমার মঙ্গল শঙ্খ ক্ষণ তরে উঠিবে কি বাজি
জাগাতে জগত জনে?
আজিকার শঙ্কট যাত্রায়
হে তপ নিমগ্ন কবি যাত্রী দল তোমাকেই চায়।

জানি তুমি আছ সত্য সমাহিত জাতির অন্তরে
নিয়ত ডাকিছ সবে বারম্বার মেঘমন্দ্র স্বরে
ওঠো জাগো নিপীড়িত ওরে ভাই অমৃত সন্তান
প্রাণের নিভৃত কোণে পাবে মোর মৃত্যুহীন প্রাণ।
হে মহামানবগুরু মৃত্যু তোমা স্পর্শিতে না পারে
ধরার ধূলায় শুধু ফেলে গেলে জীর্ণ দেহটারে।
বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে রেখে গেলে চির সত্য ভাষা
বাঙালীর দেহ-রক্তে রেখে গেলে দুর্নিবার আশা।
সাথে করে নিয়ে গেলে লাঞ্ছিতের অগৌরব গ্লানি
পরাধীনতার জ্বালা দাসত্বের ঘৃণা মাল্য খানি।

তোমার অভাব আজি শত দুঃখ হ'য়ে বক্ষে বাজে
হে বরেণ্য বিশ্বগুরু এ দুর্যোগে এস মন মাঝে
এস ধ্যানে এস জ্ঞানে এস প্রাণে নয়নাভিরাম
অশ্রুর অঞ্জলী সনে লহ দীন ভক্তের প্রণাম।

রবীন্দ্র জীবনের একদিক

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেবের কর্মবহুল জীবনের ধারা ছিল বিচিত্র—যাঁরা কেবল তাঁর এই বিচিত্র কর্মজীবনের বাইরের প্রকাশ কাজ সাহিত্য গান ছবি ইত্যাদির সাহায্যে তাঁকে জানতে চেয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন কেবল তাঁর জ্ঞানের, রসের, অমৃতের দিকটা, কিন্তু এর আবির্ভাবের মূলে যে মন্থনের ইতিহাস আছে, তার খোঁজ পেলে গুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে। এবং তিনি যে কি অমানুষিক শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর কাব্য সাহিত্য গান ইত্যাদির ভিতর দিয়ে তাঁকে জানবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেকের মনে স্বভাবতই এই কথাই বার বার জাগে যে, তিনি কেবল সুন্দরের উপাসক ছিলেন, যেন বাস্তব জগতের নিরস, মলিন আবহাওয়া একেবারেই তাঁকে ছুঁতে পারেনি—পারলেও তিনি তাকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে চলেছেন। তাই তাঁর জীবনে সুন্দরের আরাধনা এত সফল।



'চিত্রাঙ্গদা'র বিশিষ্ট ভূমিকায় নন্দিতা দেবী

এই পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ যুগ যুগ থেকে নানাভাবে কঠোর পরিশ্রম করে আসছে এবং তার এই বিপুল কর্মশক্তির মূল প্রেরণা হোলো এইখানে। আবার ঠিক সেই সঙ্গে এই কর্মবহুল জীবনের ক্লান্তি থেকে মনকে আরেক রসের লোকে নিয়ে গিয়ে তাকে বিশ্রাম দেওয়া, তার ক্লান্তি দূর করবার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের প্রবলভাবে দেখা গিয়েছে। সাঁওতালদের কর্মজীবনের নিরসতার কথা না বলাই ভালো। কিন্তু তাদের মত সংগীতপ্রিয় জাত খুবই কম দেখা যায়। তাদের গানের ভাষা আলোচনা করে দেখেছি—তাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোর কুলি-জীবনের কোন কথা তাতে পাই না। সেখানে তাদের অমার্জিত সহজ মন থেকে প্রকাশ পায় কর্মক্লান্ত নিরস মনকে সরসতায় পূর্ণ করে তোলবার মত অন্য লোকের গান। এই একই মনোবৃত্তি, গ্রাম্য জীবনে, চাষী, মাঝি, গাড়োয়ান ইত্যাদি গ্রামের লোকেরা যে গান রচনা করে বা গায়, তাতে প্রকাশ পেয়েছে—সেখানে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা সাধারণত থাকে না। এদের দুঃখের জীবন নিয়ে গান লেখে সেইসব শিক্ষিত কবি বা গাইয়েরা, যাঁরা এদের জীবনের সত্য পরিচয় কিছুই পায় না।

মানব মনের এই স্বতঃ উৎসারিত আকাঙ্ক্ষা গুরুদেবের কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদিতেও প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ তিনি মানব জীবনের কর্মক্লান্ত চিত্তকে রসলোকে উত্তীর্ণ করে আরো উন্নততর মানব-সমাজ রচনা করতে চেয়েছেন। মূলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যেমন কোন গাছ বেঁচে থাকতে পারে না, যতই সে আলো-বাতাস খাক্ না কেন, তেমনি গুরুদেব চারিদিকের বাস্তব জীবনের মধ্যে বাস করেই তবে আলো বাতাসের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন কেবল আলো-বাতাসের চর্চা করলে বিচিত্র পুষ্পে পল্লবে বর্ধিত এত বড় গাছের সুশীতল ছায়ায় শ্রান্তি দূর করবার ভাগ্য আজ আমাদের হোতো না।

গুরুদেবের বহুবিধ কর্মজীবনের মধ্যে অভিনয় নৃত্য ইত্যাদি ছিল একটি দিক। এ বিষয়ে পূর্বের কোনো কোনো লেখায় আলোচনা করেছি। সেখানে দেখিয়েছিলাম যে, বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কি অসম্ভব পরিশ্রমে সমস্ত অভিনয়ের পরিচালনা ও শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু আরো একটি কর্মজীবনের কথা এর পরেও পড়ে আছে, সেটি হোলো এইসব অভিনয়কে দেশের দশের সামনে ধরে, সকলের মনে আনন্দ দেওয়ার জন্যে নিজের দায়িত্বে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ঘুরে বেড়ানো। শান্তিনিকেতনে বসে নাটক লিখেছেন—সেখানে সকলকে শিখিয়েছেন এবং যখনি সম্ভব হয়েছে কলিকাতার জনসাধারণের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। যদিও প্রথম প্রথম আমাদের দেশের লোক ভালো চোখে একে নেয় নি, কিন্তু ধীরে ধীরে তা সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার যখন বাঙলা দেশের বাইরে তিনি ঘুরে বেড়াবার পথে পা দিলেন তাঁর নৃত্যাভিনয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, তখনো তাঁকে ভালো চোখে সর্বত্র দেখেনি। গুরুদেবের মত এত বড় বিরাট পুরুষের পক্ষে এ কাজটা বহু স্থানেই দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। তাঁরা অনেকেই ভেবেছেন, তাঁর মত এত বড় দার্শনিক কবির জীবনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কোথায়। তাঁর মত লোকের পক্ষে একি ঠিক?

কবির কাব্য, গীতকারের গান, শিল্পীর ছবি, নর্তকের নাচ, নাট্যকারের নাটক প্রকাশ পায় অন্তরের প্রেরণায়। কিন্তু তাঁদের মন চায়, যে আনন্দে তারা এগুলি প্রকাশ করলেন, আর সকলেও সেই আনন্দটি উপভোগ করুক। শিল্পীমনের এই হোলো ধর্ম। গায়ক ছাড়া যেমন গানের প্রকাশ সম্ভব নয়—নাটকের অভিনয়ও অভিনেতা ব্যতীত অসম্ভব। নৃত্যাভিনয়কে দশজনের কাছে ধরতে হলে দশজনকে নিয়েই তার আয়োজন করতে হয়। তবেই তার আনন্দ দর্শকের মন আকর্ষণ করে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই কারণেই গুরুদেবকে এই সব নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করতে হয়েছিল। এবং দেশে দেশে তাঁদের নিয়ে যে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তা কেবলমাত্র এই শিল্পীমনের তাগাদায়। সুতরাং তাঁর এই কাজকে যদি ঠিকভাবে দেখতে পারি, তবে বোধ হয় এ এতটা দৃষ্টিকটু নাও লাগতে পারে। তিনি যে আনন্দে নৃত্যাভিনয় রচনা করেছিলেন, তাকে দশজনের সামনে ধরার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এত ঘুরে বেড়ানোর আয়োজন। যদি তাঁর ভিতরে প্রকৃত শিল্পীমনের প্রেরণা না থাকতো তবে অনায়াসে তিনি এই ভ্রমণের নানা ভাবনা, চিন্তা, কতপ্রকার শারীরিক পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতেন, বৃদ্ধবয়সে যার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

গুরুদেব প্রথম নৃত্যাভিনয় দল নিয়ে বাঙলা দেশের বাইরে গিয়েছিলেন বোম্বাই শহরে। সেখানে বোম্বাইবাসী, তাঁর গুণমুগ্ধ বহু ভারতবাসীর চেষ্টায় ও উৎসাহে "রবীন্দ্র-সপ্তাহ" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নানারূপ বক্তৃতা, শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এবং "শাপমোচন" ও "তাসের দেশ" পর পর পাঁচ রাত্রি অভিনীত হয়। সঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলাল, সংগীতগুরু দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী নিয়ে সবসমেত প্রায় পঞ্চাশজনের কাছাকাছি ছিল দলের সংখ্যা।

এই দুই নাটকের মধ্যে 'শাপমোচন'কে গীতি-নাটকই বলা চলে কিন্তু 'তাসের দেশ'কে তা বলা চলে না। 'তাসের দেশ' বাঙলা ভাষায় হলেও "শাপমোচন" বুঝতে বা তার রস গ্রহণ করতে অ-বাঙালীদের খুব বেগ পেতে হয়নি। কারণ তার সুরের ও ছন্দের গতির সঙ্গে দেহ-ভঙ্গি, রঙ্গ ও সাজ মিলে তাদের কাছে বিশেষ উপভোগের জিনিস হয়েছিল। তাসের দেশে কথা ছিল বেশী, তাই একটু বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরে সে নাটকে বহু গানের অবতারণা করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে নাচের দ্বারা প্রকাশ করে। এই নাটকটি আশ্রমের একটি ছাত্র দ্বারা গুজরাতি ভাষায় সম্পূর্ণ অনূদিত হওয়ায় অনেকেই আগে থেকে নাটকটি পড়ে নিয়েছিল। দুই নাটকই সে শহরে সমাদর পেয়েছিল এবং নাট্যাভিনয়েরও সম্পূর্ণ নূতন একটি রূপ সকলের কাছে ধরা পড়েছিল। এর প্রভাব সে-দেশবাসীর মধ্যে যে বিশেষভাবে কাজ করেছিল, তার পরিচয় নানাভাবে পরে সেখানে প্রকাশ পেয়েছে এবং এখনো কাজ করছে। গানের ক্ষেত্রে যে একটি নূতন ধারার সন্ধান গুজরাতি ভাষায় দেখা দিয়েছে, সেটিও এই নৃত্যাভিনয়ের একটি বড় সফলতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে শিল্পপ্রদর্শনীতে বিচিত্র রকমের ছবি দেখে বোম্বাইবাসী স্পষ্ট বুঝেছিল যে, শান্তিনিকেতনের শিল্প চর্চার মধ্যে একটা বিশেষ প্রাণের রেশ আছে—যার অভাব অন্যখানে খুব বেশী। এবং নব্য ভারতীয় চিত্রকলায় নূতন ভাবধারার ইঙ্গিত এই ছবি থেকে তাঁরা পেয়েছিলেন। সেখানে সমঝদারের অভাব ছিল বলে মনে হয় না—কিন্তু অর্থের গৌরব সর্বত্র প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। যেমন, কোনো ধনী প্রদর্শনী শুরু হবার পূর্বেই, ছবি না দেখেই ঠিক করেছিলো যে, শিল্পাচার্য নন্দলালের যবতীয় ছবি, যে-দামেই হোক তিনি সংগ্রদ করবেন।

এর পরেই গরমের ছুটীতে এলো সিংহলবাসীদের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ। সিংহলের এই নিমন্ত্রণ নানাদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেও নৃত্যগীত, গুরুদেবের আঁকা ও নন্দলাল ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। "শাপমোচন" অভিনয় আমরা করেছিলাম প্রায় ১৫।১৬ রাত্রি—সে-দেশের বিভিন্ন ছোট-বড় শহরে। তাছাড়া, মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো নাচ গান, গুরুদেবের মুখে ইংরেজি ও বাঙলা কবিতা আবৃত্তি দিয়ে জলসারও বন্দোবস্ত হোতো। এই উপলক্ষে সে-দেশে আমাদের পুরো এক মাস থাকতে হয়। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের জন্য গুরুদেবের বক্তৃতা ও অন্যান্য অধ্যাপকদের দ্বারা প্রচারের কাজ চালানো হয়েছিল।

সিংহলবাসী শিক্ষিত ও অর্থশালীরা নিজের দেশের শিক্ষা বা সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন ছিল বরাবরই। বিদেশী অনুকরণে নিজেদের নামকরণ করা, সাজ-পোষাকে, আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় তারা বিদেশী প্রথাকেই আদর্শস্থানীয় বলে ধরে নিয়েছিল। নিজের দেশের ভাষা পড়তে না পারা, লিখতে না পারা বা কথা না বলায় তারা একটুও লজ্জাবোধ করেনি। এবং যথাসম্ভব এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করেছে। গুরুদেবের এই ভ্রমণের পর সেই সমাজের মধ্যে বিদেশী অনুকরণের এই ব্যর্থতার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। এবং এই ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার আন্দোলন বিশেষ জোর পায় এবং ক্রমশই তা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কয়েক বৎসর পরে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এর পরিচয় পেয়েছি। তারা নিজেদের দেশী গান ও নাচের চর্চা বা তার অনুশীলনে একটুও উৎসাহী ছিল না। গুরুদেব তাদের দেশী নাচ দেখলেন এবং তাদের দেশের গৌরব বলে এই নৃত্যগীতকে সম্বর্ধনা করলেন। তার পর বৎসরেই এই নাচ ও গান সে-দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় রূপে গণ্য করার জন্য এক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এবং এখন সমস্ত শিক্ষিত ও ধনী-সমাজে এ নাচ ও গানের অনুশীলন হচ্ছে। গুরুদেবের এক ভক্ত সে-দেশে গুরুদেবের আদর্শে, একটা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করালেন গুরুদেবকে দিয়ে। গুরুদেবের বাঙলা গান সে-দেশের মনকে এমন আকর্ষণ করেছিলো যে, তার পর থেকেই বাঙলা গানের অনুকরণে বহু গান



'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য নাটে একটি সমবেত নৃত্য

রচিত হয়েছে। অনেক গান ভাষান্তরিত হয়েছে, এখনো সেই আদর্শে তাদের ভাষায় বহু গান রচনা হচ্ছে। নির্বিচারে গুরুদেবের গানও তারাই গাইছে।

নৃত্য গীত, চিত্রকলা এবং সেই সঙ্গে গুরুদেবের ভাষায় ভারতীয় জ্ঞান রাজ্যের নতুন ব্যাখ্যা সে দেশে একসঙ্গে যেভাবে গিয়ে সকলের মনে নাড়া দিয়েছিল, তাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে এর একটি বিশেষ স্থান যে থাকবে একথা তাঁরা স্বীকার করেছে।

এর পরের পূজোর ছুটীতে দক্ষিণ-ভারতে নৃত্যাভিনয়ের দল নিয়ে গেলেন। সেখানেও নৃত্যগীত, প্রদর্শনী ও বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল। অর্থের দিক থেকে এই ভ্রমণের সফলতা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নয়। এ ধরণের ভ্রমণের বিরুদ্ধে আপত্তি ভারতে যে ছিল, মাদ্রাজ শহরে তার পরিচয় প্রথম দিকে একটু স্পষ্টভাবেই অনুভূত হয়। সেখানকার দলগত বিরোধ ও তাঁর এই প্রচেষ্টাকে বিশেষ বাধা দেয়। কারণ এই ভ্রমণের ব্যবস্থার ভার নিয়েছিল যে দল, তার বিরুদ্ধ দলের প্রভাব সেখানে ছিল খুব বেশী। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সেখানে ভালোয় ভালোয় সব কাজ সেরে দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের আমন্ত্রণে গুরুদেব আমাদের নিয়ে ওয়ালটায়ারে উপস্থিত হন, ফের-বার পথে। সেখানে মাত্র এক রাত্রি 'শাপ মোচন' অভিনীত হয়েছিল। এর পরের বৎসর থেকে শুরু হোলো চিত্রাঙ্গদার যুগ। এ অভিনয়টি সমগ্র উত্তর ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বহু বার অভিনীত হয়েছে। প্রথম দিকে গুরুদেব এই অভিনয়ের দলে কলকাতা থেকে পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী ও লাহোর পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন—তার পরে তিনি কি কারণে এইরূপ ভ্রমণ থেকে বিরত হলেন তা ভারতবাসী সকলেই জানেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মত ব্যক্তি

অর্থের প্রয়োজনে যে এভাবে ঘুরে বেড়াবেন দেশবাসী যে তা চায়নি—এই ব্যবস্থা থেকেই তা বোঝা যায় এবং তিনি বাধ্য হয়েই একাজে বিরত হয়েছিলেন কিন্তু একথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি যে, তাঁর অন্তর এ বিষয়ে সায় দেয়নি।



'শাপমোচন' অভিনয়ে একটি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গি

বিশ্বভারতীর প্রচারের দিক থেকে 'শাপমোচন' অভিনয় দল নিয়ে ভ্রমণের যে স্বার্থকতা বিশেষ করে অনুভব করেছিলাম, চিত্রাঙ্গদার সময় তার অভাব ঘটেছিল। এ সময় শিল্প প্রদর্শনী বা বিশ্বভারতীর জন্য প্রচারের পূর্বের ন্যায় সুব্যবস্থা ছিল না। প্রথম দিকে গুরুদেবের উপস্থিতি ও তাঁর বক্তৃতায় তা অনেকটা পূরণ হোত, কিন্তু শেষ দিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাও বন্ধ হোলো। তখন থেকে নাচ গান দেখিয়ে বেড়ানোই যেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো, টাকার জন্যে। যদিও অর্থের প্রয়োজনে এই সব ভ্রমণের তাগিদ ছিল, কিন্তু অর্থের তাড়না না থাকলেও তিনি এ কাজ না করে পারতেন না। এও আমরা দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রমণ শেষ করে যে-অর্থ বিশ্ব-ভারতীর হাতে এসেছে তা অতি নগণ্য। এই ভ্রমণের ব্যয়ে তার সব প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেতো।

গুরুদেবের সঙ্গে এই সব ভ্রমণ দ্বারা ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের জীবনে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা হোতো একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। তিনি পৃথিবীর যে দেশেই গেছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির বড় উপাসক বলে সে দেশবাসীরা তাঁদের দেশের জ্ঞান ও শিল্পের সব কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর সামনে এনে ধরেছে, তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যে। ভারতে দল নিয়ে ভ্রমণকালে সঙ্গীরাও সেই সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। কত প্রকার নামী অনামী লোকের সংশ্রবে এসেছে, কত কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখেছে অনায়াসে। সে-দেশের আতিথ্যে সকলে মুগ্ধ হয়েছে। কারণ, নানা উপায়ে দলের সকলের সুখ-সুবিধা আনন্দের প্রতি তারা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। আর দেখেছি—গুরুদেবের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শন। স্টেশনে স্টেশনে তাঁকে দর্শনের জন্যে লোকের উৎকণ্ঠা ও সামর্থ্য-মত কত প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ভেট। কোথাও দেখেছি—তাঁকে নিয়ে নানা মূল্যবান পুষ্পে পূজার আয়োজন করেছে। এদিকে তাঁর ছাত্রছাত্রী-দের প্রতি কোন প্রকার অসম্মান বা সৌজন্যের অভাব, কোন খানে অভিনয় কালে কখনো প্রকাশ পেয়েছে কি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন, এতটুকু দুর্বলতা তাঁর মনে তখন নেই।

এদিকে দিনরাত্রি মাথায় তাঁর ঘুরছে অভিনয়ের বিষয় নানা চিন্তা। প্রতিদিনই তার অদল বদল হবেই। গান রচনা হচ্ছে, তার মধ্যেই জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা চলেছে। তাঁকে উপলক্ষ করে নানা প্রকার অভ্যর্থনার আয়োজনে উপস্থিতি। বহু স্থানে তাঁকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যেতে হোতো। অর্থ ভিক্ষায় এবং নানা বিষয়ে দেখতে হোতো, শুনতে হোতো। কখনো কখনো দেখেছি—কোন শহরে প্রতিদিন নিয়মিত প্রাতে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। ভিন্ন মত, ভিন্ন সমাজের নানা লোক আসছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। এই ভ্রমণের মধ্যেই গল্প প্রবন্ধ কবিতা রচনাও করেছেন। ৭০ বৎসরের উপরে তখন তাঁর বয়স, কিন্তু তাঁর কর্মের জীবনে কি পরিশ্রম ও কত জটিলতা! অথচ এর মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন মুক্ত। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ গ্রহণের যে আকাঙ্ক্ষা, তিনি তাঁর মধ্য বয়সে প্রকাশ করেছিলেন, কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে দেখলে, সে কথা যে কেবল নিছক কবি কল্পনা নয়—নিশ্চয় করে বলা চলে। অসংখ্য কর্মের বন্ধন তাঁর মুক্তির সাধনায় তাঁকে বাধা দিতে পারেনি, সমগ্র জীবন দিয়ে এ সাধনাকে তিনি সত্যে পরিণত করে যেতে পেরেছিলেন।

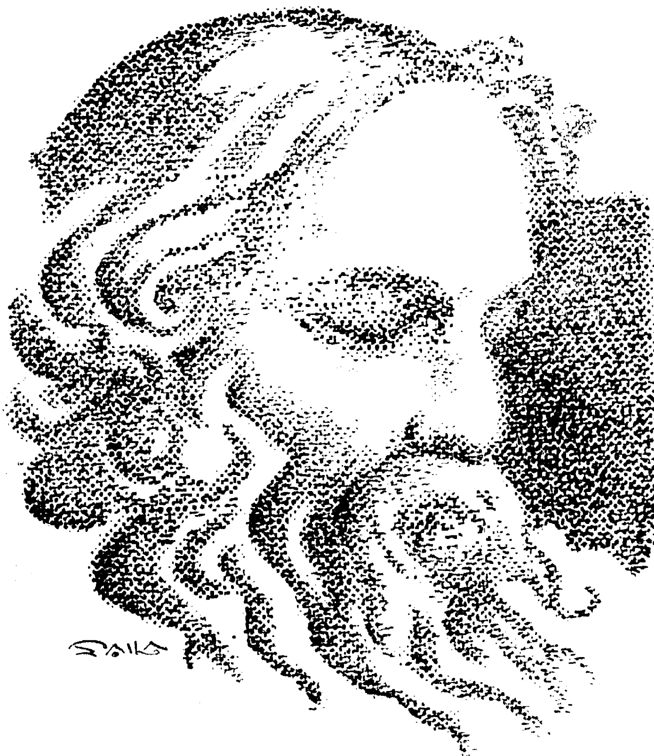
রবীন্দ্র প্রণাম

মণীন্দ্র দত্ত

দেখেছি তোমারে।
নিভৃত কক্ষে একান্ত করে নয়।
জন-সমুদ্রে তোমারে দেখেছি শত তরংগ মাঝে।
তারি মাঝে তুমি নির্ভুল পরিচয়ে
মর্মে পড়েছ আঁকা।
হোক সমুদ্র; থাক্ তরংগমালা;
তব তরংগ সকলেরে ফেলে ঊর্ধ্বে তুলেছে মাথা।
তোমার মাথায় ফেণার শুভ্র কেশ;
সূর্যের প্রেমে তার নিচে আঁকা আরক্ত মধু মুখ;
ভংগীতে তব ভুবন জয়ের নেশা;—
সে দৃপ্ত তেজ তোমারেই শুধু সাজে ঃ
ঢেউয়ের মাঝারে তুমি যে তরংগেশ।

আজো সমুদ্র তীরে তীরে ভেঙে পড়ে;
ভেঙে ভেঙে তীর জানায় আর্তনাদ;
আজো তরংগ কলকল্লোলে কাঁদে;
কিন্তু কোথায়—কোথায় তরংগেশ?

মনো সমুদ্রে এসেছে জোয়ার,
উত্তাল তার ঢেউ;
সেথায় তোমার দৃপ্ত অরূপ রূপ ঃ
থাকো থাকো সেথা ঃ সেথায় রাখি প্রণাম।



রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বি টি

গভীর বেদনার মধ্যে এল এ বৎসরের পঁচিশে বৈশাখ উৎসব। একদিকে সর্বগ্রাসী পাশবিকতার পৃথিবীব্যাপী গ্লানি, অন্য-দিকে দেশের মুক্তিকামী সর্বত্যাগী সন্তানদের বন্দী জীবনের বেদনা— আজ এই পরম দুর্দিনে ভারতবর্ষ যে রবীন্দ্রহীন, দুঃসহ সেই চিন্তা। নিদারুণ আতঙ্কে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে উঠে ভীত অসহায় ব্যক্তির বাক্‌রোধ হলে সে যেমন নিঃসহায় বোধ করে, রবীন্দ্র-বাণীর অভাবে সমগ্র ভারতবাসীর আজ সেই অবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ জীবিত নেই,—তাঁর এই না থাকা অধিকতর বেদনাকর হয়েছে কোন কারণে, মনের মধ্যে সেই কথাই আজ বার বার আলোড়িত হচ্ছে। রবীন্দ্র সংস্পর্শে আমাদের সংকীর্ণ জীবনের রুদ্ধ স্রোতে যে কোটালের বান জেগেছিল দুকূলপ্লাবী সেই প্রেরণায় ক্রমশ যেন আবিলতা দেখা দিচ্ছে। অতুল প্রাণের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান রবীন্দ্রনাথ এ সংসারে শুধু নিজে বেঁচে তৃপ্ত ছিলেন না, আমাদের ত্রিশ কোটি দীর্ণ-জীবনেও ষোড়শোপচারে তিনি রাজ-উৎসব জাগিয়েছিলেন। তাঁর প্রাণের স্পর্শে আমাদেরও প্রাণকে পলে পলে তিনি অনুপ্রাণিত করে-ছিলেন। নিজের জীবন দিয়ে নতুন জীবন গড়ে তুলেছিলেন এই দেশে নতুন যুগের ভাবে ভাষায় এবং কর্মের বহু বিচিত্র আয়োজনে। সর্বোপরি তিনি স্থাপনা করে গেছেন এই নতুন-প্রাণ-পাওয়া ত্রিশ কোটি নিরুদ্দেশ যাত্রীর অন্তরে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিরাট আদর্শ। আত্মবোধ ও স্বাতন্ত্র্যের প্রবল বীর্যে সে আদর্শ একদিকে যেমন বলিষ্ঠ মৈত্রী ও পারমার্থিকতার গভীর দ্যোতনায় অন্যদিকে তা তেমনিই সার্থকরূপে সুন্দর। ভাবী যুগের অক্ষয় পাথেয়স্বরূপ এই জীবনাদর্শকে সফল করে তোলার উপযোগী প্রেরণাও আমরা পেয়েছি তাঁর কাছে আমাদের। জাতীয় জীবনের সকল স্তরে সকল সময়ে। ভুলি কেমন করে যে, স্বদেশী যুগের বাউল কবির একতারা কালক্রমে হাজার-তার বীণার ঝংকারে বেজে উঠেছিল ভারতেরই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার বিপুল আকাঙ্ক্ষায়। স্বদেশ না হলে বিশ্বের প্রতিফলন ঘটতো আর কোন মানসমুকুরে।

মনের মধ্যে সবই বিচার করি, তবু যেন আশঙ্কা হয় সেই আদর্শ আজ ম্লান হয়ে আসছে, প্রেরণার সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আজ ভাঁটা পড়েছে। মানুষ মৃত্যুর অনিবার্যতাকে আপনার প্রিয়জনের জীবনে জয় করে তার চিরন্তন আত্মীয় স্বরূপটিকে অবিচল নিষ্ঠায় স্বীকার করে। ঘরে এবং বাইরে রবীন্দ্র-অস্বীকৃতির তথা রবীন্দ্রনাথকে ভুল বোঝার এবং ভুল বোঝানোর ক্ষীণ অথচ সুনির্দিষ্ট একটি যে ধারা আজ জেগেছে তার অপনোদনের দায়িত্ব কি রবীন্দ্র-ঋণে সহস্রভাবে ঋণী তাঁর স্বদেশবাসীদেরই নয়? ইংল্যাণ্ডের অস্বীকার আমাদের আশ্চর্য তেমন করে না, কারণ রবীন্দ্র-স্বীকার জাতিগতভাবে সে দেশে কোনও কালেই সত্য ছিল না। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে নাইট পদবী গ্রহণ করায় বা অশীতি বর্ষে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট গ্রহণে আপত্তি না করায় রবীন্দ্রনাথের সৌজন্য যে পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে সেই পরিমাণেই ধিক্কৃত হয়েছে সম্মানদাতাদের বিচারের শ্লথ-বুদ্ধি। আজ তাই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যপ্রকাশিত ইংরেজি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে যখন পড়ি যে, সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যের (Crescent Moon এবং Gardener বাদ নয়) অন্তর্নিহিত রস-বস্তু ইংরেজ পাঠকের জন্যে বহু পূর্বেই সঞ্চিত ছিল বাইবেলে.—এক-কথায় রবীন্দ্রনাথ করেছেন বাইবেলেরই পুনরাবৃত্তি, তখন প্রাজ্ঞ ইংরেজ

অধ্যাপকের আবিষ্কারের ও কাম্মকতায় স্তম্ভিত হই না।(১) সিবিডিশ একাডেমির ভ্রান্তি সংশোধনের এই ইংরেজি সংস্করণ প্রহসন দেখে নিজের মনে তার পূর্ণ রস উপভোগ করি: কিন্তু পরমুহূর্তেই শঙ্কিত হই এই ভেবে যে, সাগরপারের ছাপা লেখা যাদের কাছে অভ্রান্ত বেদবাক্য দেশবিদেশের সেই সব ছাত্র-ধুরন্ধরেরা ভাবী যুগে এই ধরণের গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্র-পরিচয়ের প্রথম পাঠ যখন গ্রহণ করবে, আমরা তাদের সেদিনের সে ভূত ছাড়াবার কোন্ ব্যবস্থা রেখে গেলাম। ভবিষ্যতের ছাত্রদের কথাই বা শুধু বলি কেন, এ যুগেও বিভ্রান্ত হবার লোকের অভাব ঘটবে না। তাছাড়া এই পণ্ডিতম্মন্য বিদেশী সবজান্তাদের (charlatan) যথোপযুক্ত জবাব দেবার যোগ্য ব্যক্তি কি দেশে আজ কেউ নেই? রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত ইংরেজি সাহিত্যিক নন, তাই ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অবান্তর এবং অসম্পূর্ণ উল্লেখের দ্বারা তাঁকে অবমাননা করা অত্যন্ত হীন রুচির পরিচায়ক—বিদেশী অধ্যাপকদের এই হঠকারিতা কোন্ মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত তা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে টমসনের গ্রন্থটির বিচারকালে কবি নিজেই বিশ্লেষণ করে গেছেন। সেই মনোবৃত্তির সমূলে বিষোৎপাটন এক যুগে সম্ভব নয় জানি, আমাদের রাজনৈতিক অধীনতা যে এই ঔদ্ধত্যের বহুলাংশে সহায়ক তাও স্বীকার করি। তবুও হয়তো দেশবাসীর দিক থেকে করণীয় অনেক আছে,—এ দ্বিধা মন থেকে ঘোচে না। প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের যা এবং আমাদের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের দরবারে বা সমগ্র মানবের চিত্তে ও চিন্তায় যা' তার কতটুকু পরিচয় যোগ্যতম ব্যক্তির সাহায্যে তথ্যে ও বিচারে সুসংবদ্ধ আকারে সর্বসাধারণের জন্য রেখে যাবার আয়োজন আমরা করেছি। যাঁরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ চিরজীবী হবেন, তাঁর কাব্যে, তাঁর সাহিত্যে, তাঁর গানে—এককথায় তাঁর নিজস্ব সর্বাঙ্গীন সৃষ্টিতে, তাঁদের নিশ্চেষ্টতার একটা সঙ্গতি তবু যেন আছে মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা ধুরন্ধর বলে পরিচিত, সভাসমিতি যাঁরা বক্তৃতার বেগে মাথায় করেন, তাঁদের হঠাৎ সুবুদ্ধির প্রশংসা করতে তো পারিই না—মাঝে মাঝে এমন কি তাঁদের সততায় সন্দেহ হয়। রবীন্দ্র-বন্দনা আমরা আজ বাজারময় দেখছি, বাক্যের বন্যার বেগে রচনার পর রচনা, অভিভাষণের পর অভিভাষণ, পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে চলে নিরুদ্দিষ্ট ঠিকানায় যেখানে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় লেখকের আত্ম-প্রসঙ্গ। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আজ পর্যন্ত নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ এমন একটি রবীন্দ্র-জীবনী প্রকাশিত হল না যার তথ্য এবং বিচারের উপর সত্যই পাঠক নির্ভর করতে পারেন। অথচ শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভালোয়-মন্দে মেশানো গ্রন্থটি নিঙড়ানো কত যে সংক্ষিপ্ত তথা ভ্রান্ত পুনরাবৃত্তি বাজার আজ ছেয়ে ফেলেছে তার হিসাব নেই। এমন কাণ্ডও এদেশে বলেই ঘটে যে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ ছাত্র বয়সের বিদ্যায় প্রকাশ করে দিয়ে তারপর লেখক শুরু করেছেন তাঁর পরিণত বয়সের রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ।

আমাদের এই আলোচনার পল্লবজালে মূলে কথাটি ঢাকা পড়তে দিলে চলবে না। আজ বড় বেদনার মধ্যে কেবলই মন বলছে, রবীন্দ্র-প্রয়াণের এত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মন্দিরে তাঁরই নামে আমরা দোকানপাট খুলে বাজার জাঁকিয়ে ব্যবসায় বসেছি। কলকাতার কলেজ-স্ট্রীট থেকে লাহোরের চাঁদনী চক, মায় হিটলারের বহুধা বিক্ষিপ্ত বিপণিমালা পর্যন্ত এই সত্য সারা ভারতে তারস্বরে ঘোষিত হচ্ছে। হাটের এই হট্টগোলের মধ্যে অবিচলিত নিষ্ঠায় যাঁরা ধীর নিশ্চিত পদ-ক্ষেপে রবীন্দ্রসাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করছেন এবং একাগ্র চিত্তে অধ্যয়ন ও মননে ব্যাপৃত আছেন, আজ তাঁদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করি—বাঙলার ক্ষীণ-উৎস জীবনে প্রাণের যে গগনস্পর্শী উৎসার রবীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ করবার দৈব সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল তার অবসান কি এত শীঘ্রই এমন নিঃশেষিত অবসানে পরিণত হবে। যে প্রবল প্রাণবন্যা একদিন সহস্র ধারায় বাঙালীর ঊসর চিত্ত-ভূমিকে উর্বর করেছিল, তার ধারাশেষ আজ এ কোন্ মরুলোকে। মন আজ সর্বদা আন্দোলিত নানা উদ্বেগজনক আলোড়নে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু যে ক্রমশ কী পরম-মৃত্যুতে পরিণত হল তার নিদর্শন নিয়ত লক্ষ্যগোচর হচ্ছে দেশী ও বিদেশী কয়েকটি সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের নির্বিচার মন্তব্যে এবং নানা সাময়িক বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রবাণীর বিবিধ উৎক্ষিপ্ত অপপ্রয়োগে। বেদনা গুরুভার হয়ে উঠছে প্রতিদিন। পঁচিশে বৈশাখ আজ ডাক দিল সেই সব নবীন প্রাণ রবীন্দ্র শিষ্যদের হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে যাদের নিরভিমান মানসপটে নিষ্কলুষ রবিরশ্মি আজও আপন সত্য দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল রয়েছে। দেশ-বিদেশের হাটের কোলাহল আজ অপহৃত হোক; রবীন্দ্র-অস্বীকারের ও অবমাননার সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠে আজ কবির বাণী ধ্বনিত হোকঃ—

"মানুষের অসম্মান দুর্বিসহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।"

আপন আপন হৃদয়ের পবিত্র অগ্নিগৃহে প্রবেশ করে সেই পাবকোজ্জ্বল পুরুষকে আজ শুভলগ্নে স্বীকার করতে হবে শুদ্ধ চিত্তে, শান্ত মনে, যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর জীবিতকালে স্বীকার করেছিলেন মানবের চিরন্তন মহিমাকে। বৎসরের আরম্ভে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের শুভ দিনটিতে অন্তরে বার বার তাই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে 'তিনি আছেন, তিনি আছেন।' তাঁর এই শাশ্বতিক উপস্থিতি যে কল্পনা মাত্র নয়,—পঁচিশে বৈশাখের নানা রবীন্দ্র-চিন্তার মধ্যে এই চিন্তাটি বিধিবিচারের দ্বারা আমাদের জীবনে সত্য প্রমাণিত হোক। পিতৃঋণ অপরিশোধনীয় বলেই সে ঋণ পরিশোধের ব্যর্থ চেষ্টা এত উপহাস্যকর, কিন্তু লগ্নবিশেষে পিতৃকুলকে নিয়মিত স্মরণের মধ্যে সন্তানেরা নিজেদের পরিচয়টিকেই অন্তরে সত্য করে রাখে, ধ্রুব করে রাখে। রবীন্দ্র-প্রতিভা—শুধু প্রতিভা কেন, রবীন্দ্র জীবনের অজস্র ফসলে পরিপুষ্ট আমাদের অস্তিত্বই বা আপন ধ্রুবত্ব অর্জন করবে অন্য আর কোন্ পরিচয়ের সাহায্যে? দেশজোড়া এই বেদনার দিনে রবীন্দ্রনাথ নেই—খণ্ডকালের এই ক্ষুদ্র তথ্যটুকু ছাপিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ আছেন' এই গভীরতর সত্যটি আমাদের সমগ্র প্রাণবেগে রণিত হয়ে উঠুক—নিঃসহায় জীবনের সমস্ত বিক্ষোভের কেন্দ্রে এনে দিক নবীন প্রেরণা।

---

(1) "Indeed it is difficult to find in his numerous volumes .... anything richer in thought and expression than the pages of the English Bible afford to the respective reader." (P. 915).
—The concise Cambridge History of English Literature: 1941.

আলাপ-আলোচনা

[পূজনীয় গুরুদেবের নানারূপ কথাবার্তা ও আলোচনার সারসংগ্রহ আলোচনান্তে লিখিয়া রাখিতাম। তাঁহার ভাষা ও ভাব ধরিয়া রাখা বিশেষ আয়াসসাধ্য। দুঃখ হয় যে এইগুলি গুরুদেবকে পূর্বে দেখাইয়া লই নাই। অনেকের ভাল লাগিবে মনে করিয়া এইগুলি প্রকাশিত করিলাম—ইহার মধ্যে যাহা ত্রুটি তাহা আমার নিজস্ব ইহা বলাই বাহুল্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।]

১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৪

আজ প্রাতে গুরুদেবকে নিয়ে জোড়াসাঁকোতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক-সংঘের একটি অধিবেশন হয়। আশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজীতে যেমন সস্তায় নানা বিষয়ের ভাল ভাল বই-এর সিরিজ বের হয়, বাঙলায়ও সেই রকম বই-এর একান্ত প্রয়োজন, এই কথা ওঠে। অধ্যাপক মহাশয়রা প্রশ্ন করতে থাকেন, গুরুদেব তার উত্তর দিতে গিয়ে অনেক কথা বলেন।

প্রশ্ন—ঐ রকম বই ছাপিয়ে বের করবার আগে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলে হয় না?

উত্তর—দেখ, তাহ'লে লোক হবে না। সভা কা'কে নিয়ে হবে?

প্রশ্ন—যদি বক্তারা ভাল করে বলতে পারেন তো নিশ্চয়ই লোক হবে।

উত্তর—সকলে তো ভাল করে বলতে পারে না—তারপরে, শ্রোতাদেরও মনে জমি তৈরি থাকা চাই, তাদের যদি ইচ্ছে থাকে, তবেই তো ভাল লাগবে। আমাদের দেশের ছেলেরা আইডিয়া নিয়ে থাকে না। তারা সব পড়া মুখস্থ করে। তারা গভীরভাবে কিছু ভাবে না। আমেরিকায় দেখলুম, ছেলেরা সব ভাবচে। তারা যে আমার বক্তৃতা শোনার পর এসে বল্লে—আজ আমরা কিছু পেলুম, তার মানে হচ্চে যে তারা আগের থেকেই প্রস্তুত ছিল। তারা আইডিয়াটা নিয়েই ছিল। আমার কথা শুনে সেটায় ঘা পড়বামাত্র তারা স্বীকার করল। আমাদের দেশের ছেলেদের বি এ, এম এ, পাশ করবার পর আর কিছু বাকী থাকে না। আমেরিকার ছাত্ররা যাহোক একটা বিষয় নিয়ে ভাবছে তাই তাদের প্রেরণা দিচ্চে। ওদের দেশে যেমন বহু ধনী আছে—অর্থবৃদ্ধিই যাদের নেশা, তেমনি বহু ভাবুক আদর্শবাদী আছে, তারা দেশকে রক্ষা করচে। তাবা ভাবচে, তারা কাজ করচে। তারা যা ভেবে ঠিক করচে, অমনি সেটা কাজেও পরিণত করচে।

আমেরিকায় দেখলুম, একটি স্বামীস্ত্রী, তাঁরা জীবনের প্রারম্ভ থেকেই মনে করেছিলেন যে শিশু-অপরাধীদের জন্য কিছু করবেন। তাঁদের গড়া সেই সব ছোট ছেলেদের স্কুল দেখলাম—৩৫টি ছেলে। স্বামীটির বয়স ২৮ বৎসর। তিনি তাঁর জীবন এই কাজে গোপনে উৎসর্গ করেছেন। সেই সব খুনী ছেলে আশ্চর্য রকম বদলে গেছে, তাদের কাউকে কাউকে দেখলে এখন 'সেণ্ট' বলে মনে হয়। তারা আমার কত যত্ন করল। তারা 'ডাকঘর' শুনে কেউ কেউ কাঁদতে লাগল।

ওরা আমাদের মত শুধু একবার দুর্ভিক্ষের সময়, বন্যার সময় বা অর্দ্ধোদয় যোগ বা বারুণী স্নানের সময়ই কাজ করে না—যদিও সে রকমের কাজও ওরা আমাদের চেয়ে বেশী করে। ওদের মধ্যে অনেক লোক সমস্ত জীবন ভাবচে—মানুষের দুঃখদুর্দশার মূল কারণ কোথায়, তার প্রতিবিধানের জন্য চেষ্টা করচে। ওদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রাণ আছে। অনেকে হয়ত বলবে,—এ যুবক বড় বাড়াবাড়ি করচে—হ্যাঁ, যৌবন তো বাড়াবাড়িরই সময়। সব মেনে যাওয়ার চেয়ে বাড়াবাড়ি ভাল, তারপর বুড়ো হ'য়ে না হয় বলবে যে হ্যাঁ, আমরা যতদূর এগিয়েছি, এই পর্যন্ত—বাস্, আর সব বাড়াবাড়ি।

আমাদের দেশের young manদের সে life নেই, কেননা এরা seriously কিছু ভাবে না। এরা পড়া মুখস্থই করচে। তাই আমাদের দেশে ছেলেরা বি এ, এম এ, পাশ করেও সমাজের সব অন্যায় নিয়ম দিব্যি মেনে নেয়। আমরা নতুনকে নিতে ভয় করি। যা ছিল, তাই থাক্। আমরা যদি বা যুক্তি ও চিন্তা দ্বারা কোন একটা কাজ ন্যায় বলে মনে করি, সেটা কাজে করবার মত সাহস আমাদের নেই। আমি যদি বিধবাবিবাহের পক্ষে কিছু বলি, তাহ'লে হয়ত আমাকে অনেকে সমর্থন করবে কিন্তু আমি যদি সেটা কাজে করি, তাহ'লেই আমায় একঘরে করবে। আমেরিকায় তা নয়, ওরা যেটা ভাববে যে এটা অন্যায়—সেটা দূর করবেই। হরদয়াল ওখানে প্রচার করছিলেন যে বিয়ের কোনো দরকার নেই, ওরা যেই বুঝলে সেটা ভাল কথা না, অমনি সে কথাটা ওরা আমলই দিলে না। ওখানে কোনো কোনো মুসলমান বহুবিবাহ সমর্থন করত, ওরা বল্লে, তা হবে না; সেটা দূর করে তবে ছাড়লে। ওরা মানুষকে মুক্তি দিয়েছে, সমাজের ছোটখাটো নিষেধের গণ্ডী ওরা আঁকে নি।

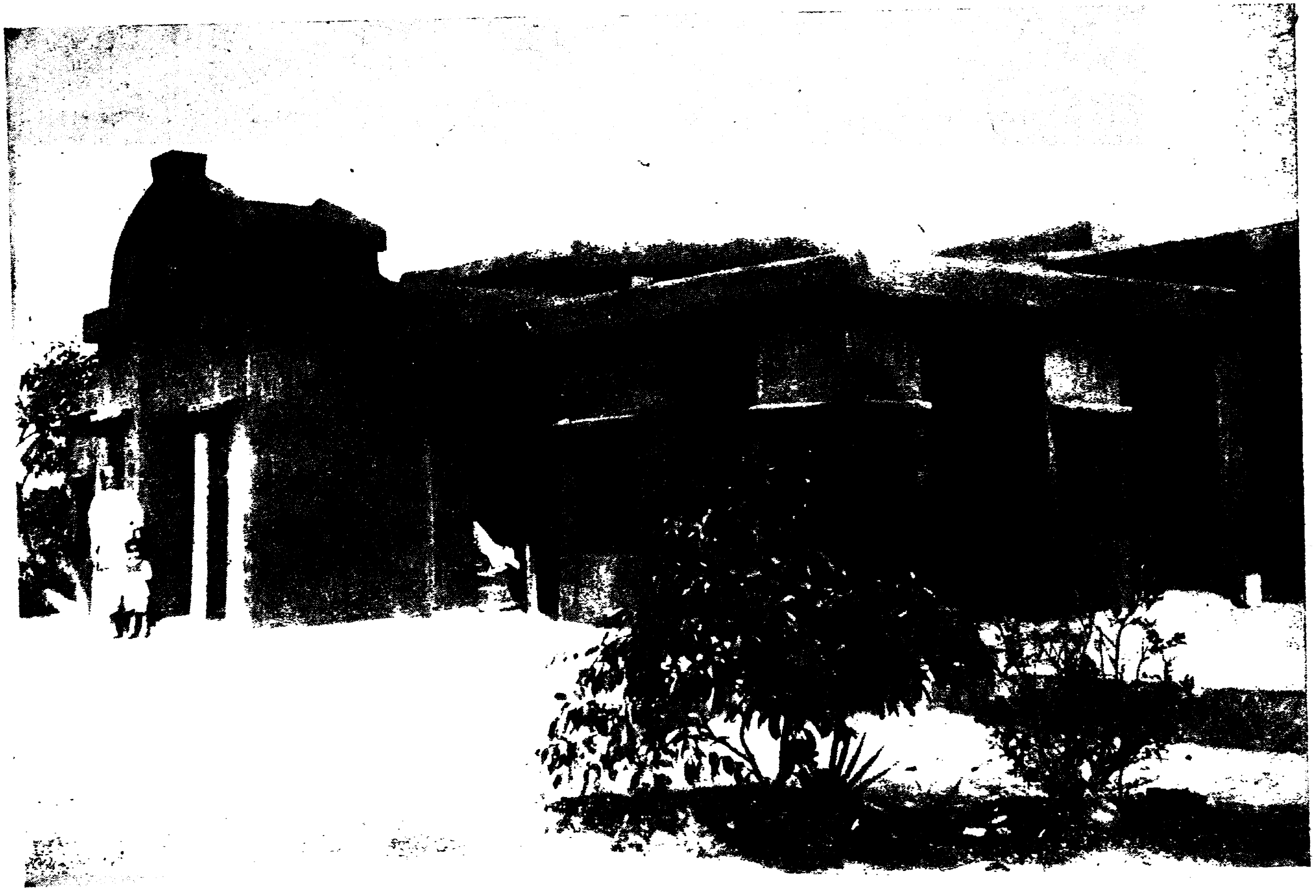
কুষ্ঠিয়ায় ধানের জন্য মাসিমা-পালিত যুবক মাসিমাকে হত্যা করেও সমাজে একঘরে হয়নি, ব্রাহ্মণরা তাকে আনুকূল্য করেচে। কিন্তু ঐ যুবকই যদি কোন দেবমূর্তিকে অবহেলা করত, তাহ'লে হয়ত ঐসব ব্রাহ্মণরাই ওর ধোপানাপিত বন্ধ করত। আরো দেখেছি যে, স্বামী স্ত্রীকে অন্যায় কারণে হত্যা করেও সমাজে দিব্যি মুরুব্বিগিরি করচে এবং ব্রাহ্মণরাই হয়ত তার পুনরায় বিবাহের জন্য আয়োজন করচে। কিন্তু তুমি অন্য জাতির লোকের সঙ্গে খাও, অমনি তোমায় একঘরে করবে। Toleration মোটে নেই, কার সঙ্গে খাব, কার মেয়ে বিয়ে করব, উত্তর শিয়রে না পূব শিয়রে শোব, সব বিধান হয়ে আছে। কোন্ কালে পরাশর বলে গেছেন সেই কথা ধরে বসে আছি। আরো ভয়ানক মনে হয়, যখন দেখি আমাদের দেশের বি-এ, এম-এ রাও সেই সব পুরানো বুলি আওড়াচ্চে। যাদের কোন কিছু স্বাধীনভাবে করবার অধিকার নেই, তারা আবার পলিটিক্যাল স্বাধীনতা চায় কোন্ মুখে? তোমার শোওয়া, খাওয়া, বিবাহ, মৃত্যু কিছুতে তোমার স্বাধীনভাবে কিছু করবার নেই, আর তুমি চাও পলিটিক্যাল স্বাধীনতা? কুকুর-বেড়ালেরও তো খাওয়া-দাওয়ায় স্বাধীনতা আছে—মধ্য আফ্রিকার অসভ্যদেরও তো এসব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। আমরা বলি, আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, আর ওরা জড়বাদী। মিছে কথা;—ওরা নানা উপায়ে বিশ্বমানবের সেবা করচে।

আমার শাশুড়ী ঠাকরুণকে শীতকালে ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করার সময় জিজ্ঞেস করতুম—এতে যে পুণ্য হয়, এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন? তিনি বলতেন—দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে যখন কথা হয়, তখন মনে হয়, ওসব মিছে কথা; কিন্তু তার পরে যখন দেখি—সবাই স্নানে যায়, তখন না গিয়ে পারি না, মনে ভয় হয়, কি জানি পরে কি হয়।

ঠিক সেই ভাব থেকেই হয়ত হ্যাট-কোট-পরা এম এ পাশ উকিল ট্রামে যেতে যেতে দেবীমূর্তিকে নমস্কার করেন, ভয় হয়, পরে

(শেষাংশ ৩৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্যামলী



যাব আমি।
তোমার বাধাবিহীন বিদায়-দিনে
আমার ভাঙাভিটের পরে গাইবে দোয়েল ল্যাজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি, আবার যেদিন যাই চ'লে॥

—রবীন্দ্রনাথ

৬ আগস্ট, ১৯৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

২৫শে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ নবযুগের স্মৃতি বহন করিয়া আবার আসিয়াছে। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তিথি। রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবের আবির্ভাব জাতির জীবনে এক যুগবিপর্যয়কর ব্যাপার। বাঙলার ভাবের শতদল বর্ণ, রূপ, রস, গন্ধের অনুধ্যান করিতেছিল, সে নয়ন মেলে নাই। বাঙলার বাউল গাহিয়াছে—কমল কি মেলে আঁখি, যদি রবি এসে না দেয় সাড়া রাতের শয়নে? রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে কমল নয়ন মেলিল। বাঙলার অন্তর-মাধুরী পরিপূর্ণ মহিমায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কবির বীণায় সে সুর সপ্তছন্দে বাজিয়া উঠিল, তাহার প্রাণ-মাতানো তানে জাতি জাগিয়া উঠিল। দেবগণ জয়ধ্বনি করিলেন, দিগ্‌বধূগণের হাতে মঙ্গল-শঙ্খ ধ্বনিত হইল। বাঙালী জাতি ফিরিয়া পাইল তাহার আপনাকে,—তাহার আত্মাকে। অবীর্য দূর হইয়া গেল। ২৫শে বৈশাখ বাঙলার নব জাগরণের পুণ্য মুহূর্ত। আমরা পুণ্য তিথিকে বন্দনা করিতেছি।

আজ আমরা কবিকে হারাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার স্মৃতিকে হারাই নাই। যতদিন পর্যন্ত বাঙালী জাতি থাকিবে; শুধু সেই কথাই বা বলি কেন, যতদিন পর্যন্ত মানব-মহিমা, মানব-সংহতির এ জগতে সমাদর থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ২৫শে বৈশাখের পুণ্যময়ী বাণী জগতে নূতন বার্তা বহন করিয়া আনিবে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে আমাদের চিত্তে উদ্দীপ্ত করিয়া ২৫শে বৈশাখ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অগ্রগতিকে সমৃদ্ধ করিয়া দিবে। ২৫শে বৈশাখের ছন্দোময় স্মৃতির ভিতর দিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাইব। আমাদের অন্তরে কবির ন্যায় হাস্যের উজ্জ্বল রেখা আসিয়া পড়িবে। আমরা নূতন বল পাইব; দেশের সেবা, জাতির সেবা এবং বিশ্বমানবের সেবায় আত্মোৎসর্গের পরম প্রেরণার পুলক আমাদের বুকে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে। আমাদের কানে বাজিবে কবিরই বাণী,—'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।' আজ মহাভয় চারিদিক হইতে আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সংকট-সন্ধিক্ষণে ২৫শে বৈশাখের স্মৃতি আমাদের সকল ভীতি দূর করুক। কবির জন্মতিথি পূজার সমগ্র প্রসাদ যেন আমরা একান্ত শ্রদ্ধায় আনত হইয়া গ্রহণ করিতে পারি। এই তিথিতে কবির প্রাণময় গানের সঙ্গে আমাদের চিত্ত একতান হউক, আমাদের শ্রুতি তাঁহার গীতি ছন্দে ডুবিয়া যাক্; আমরা যেন নবজীবনের দীক্ষালাভ করিয়া জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। জানি, লক্ষ্য এখনও বহু দূরে—জানি, পথ সুগম নয়; কিন্তু আমরা নিরাশ হইব না। তিমিরপথযাত্রীর আঁধার রাত্রিতে রবীন্দ্রনাথের অমর অবদান আমাদের পথ দেখাইবে। সে অবদানের অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষতার পরম বল আমাদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করিবে। আমাদের কানে বাজিবে কবির কণ্ঠ—'ওরে ভয় নাই, ওরে ভয় নাই'।

বাঙলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডল

হক মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলা দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই, লীগ দলের ইহাই ছিল উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ। হক মন্ত্রিমণ্ডলের সেই ত্রুটি এবার স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা কতটা পূরণ হয়, ইহাই দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত আছি। সম্প্রতি নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের বে-সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য সকল দলের সহযোগিতা চাহিয়াছেন। বলা বাহুল্য মিঃ সুরাবর্দী সত্যই যদি বাঙলা দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিতে পারেন, তবে সে কাজে বাঙলার লোকের সহযোগিতার অভাব হইবে না। কিন্তু মুখে বলা, আর তাহাকে কাজে পরিণত করা এক জিনিস নয়। ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডল ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশিত ডিনায়েল পলিসিকে খাদ্য-সমস্যার মূল কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ ফজলুল হক স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, গভর্নর ও স্থায়ী সিভিলিয়ানগণের হস্তক্ষেপ খাদ্য-সমস্যার অন্যতম কারণ। মিঃ সুরাবর্দী যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, সে-সব অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তিনি খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তবে দেশের লোকে তাঁহার কৃতিত্বকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং এ কাজে তাঁহাদের সহযোগিতাও মিলিবে। গভর্নর রাজস্ব বিল নিজের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে পাশ করিয়া দিয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অন্তত কয়েক মাসের মধ্যে পরিষদের ভোটের সম্মুখীন হইতে হইবে না। কিন্তু সেদিন একদিন আসিবে, মন্ত্রীরা যেন একথা স্মরণ রাখেন। তাঁহাদিগকে কথা ছাড়িয়া অবিলম্বে কাজ দেখাইতে হইবে। খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিতে হইবে এবং যে-সব রাজনৈতিক বন্দীকে তাঁহারা অবিলম্বে মুক্তিদান করিতে সমর্থ হইবেন না, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে এবং এ-সব ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্থানী জিগীর তাঁহাদিগকে বন্ধ করিতে হইবে। বর্তমানের এই সঙ্কটকালে বাঙালী জাতি চাহে সংহতি, চাহে মিলন, ভেদনীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া কোন প্রলোভনেই বাঙালী জাতি প্রবঞ্চিত হইতে প্রস্তুত নয়। দেশের লোকের সহযোগিতা দাবী করিবার আগে মনস্তাত্ত্বিক এই সহজ সত্যটিকে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। একদিকে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহ দল এবং স্থায়ী সিভিলিয়ানী চক্র, অন্যদিকে দেশের লোকের স্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার—কার্যক্ষেত্রে এই দুই দিক রক্ষা করিবার অসাধ্য সাধন নূতন মন্ত্রিমণ্ডল কেমন-ভাবে সম্ভব করিয়া তুলেন, তাহা দেখিবার জন্য সমগ্র জাতি আগ্রহান্বিত আছে এবং শুধু কথার চালে কিছুতেই ভুলিবে না।

বড়লাটের শাসন-পরিষদ

বড়লাটের শাসন-পরিষদের শূন্য পদ পূর্ণ হইয়াছে। স্যার মহম্মদ আজিজুল হক, ডাক্তার এন বি খারে, স্যার অশোককুমার রায়,—এই তিনজনকে শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছুই বলিবার নাই। কারণ এই সব বিষয়ে ব্যক্তিগত গুণ-দোষের মূল্য অতি সামান্যই আছে। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করাই ইঁহাদের নীতি; সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্থান ইঁহাদের অতি সামান্যই আছে। ইঁহারা দেশের ভাল কাজ করিতে পারুন আর না পারুন, জনমতের বিরোধী নীতিতে সায় দিয়া দেশের স্বার্থের বিরোধী কাজ ইঁহাদের দ্বারা হইতে বাধে না; এরূপ ক্ষেত্রে দেশের লোকের বিশ্বস্ত এবং প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা পরিষদের সদস্য পদের খপ্পরের মধ্যে গিয়া যত না পড়েন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এই

দিক হইতে পরিষদের সদস্য নিয়োগ ব্যাপারটা নিরাপদ হইয়াছে বলা যায়। কারণ, যাঁহারা সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, ইঁহারা কেহই জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি নহেন—এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। স্যার আজিজুল হক কিছুদিন বাঙলা দেশের পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি নামেন নাই। স্যার অশোক রায় ব্যবহার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। একমাত্র ডাক্তার খারে কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কিন্তু তিনি কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হন; এখন বোধ হয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই তাঁহাকে এই পদ লাভে প্রলুব্ধ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বড়লাটের শাসন-পরিষদের যে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের কথা আমরা শুনিতে পাই, বর্তমানে যাঁহারা সদস্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্য যে গুণেই থাকুক না কেন, দেশের জনমতের প্রতিনিধিত্বের দাবী তাঁহারা করিতে পারেন না। দেশের লোকের দৃষ্টিতে এমন পরিষদের স্থান কিরূপ, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

ধান চাউলের প্রাচুর্য

বাঙলার নূতন অসামরিক সরবরাহ সচিব বলিতেছেন, "বাঙলা দেশে ধান এবং চাউলের অভাব নাই। বোরো ধানের ফসল এ বৎসর প্রচুর ফলিয়াছে। আসাম এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহু পরিমাণে খাদ্যশস্য বাঙলা দেশে আসিতেছে। আউস ধানের ফসলের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ। ধান এবং চাউল ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে গম, ভুট্টা, যবেরা প্রভৃতি শস্য ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলা দেশে সরবরাহ করিতেছেন।" মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ধরণের আশার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তেমন কথা পূর্বেও অনেকবার শুনিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কথায় ফলপ্রবৃত্তি ঘটে না; যদি তাহা ঘটিত, আক্ষেপের কোন কারণই থাকিত না। খাদ্যশস্যের মূল্য কার্যত কিছুই কমে নাই। কলিকাতা শহরে গমের দর কিছুদিন সামান্য কিছু কমিয়াছিল; কিন্তু দর আবার চড়িতেছে; চাউলের মূল্যও তেজীর দিকে। মন্ত্রী মহোদয় বলিতেছেন, লাভখোরদের ফাটকা বাজীর জন্য দর চড়িতেছে এবং এজন্য যাহারা খাদ্যশস্য জমা রাখিতেছে, তাহারাও দায়ী। তিনি ইহাদিগকে কিছু সতর্কবাণীও শুনাইয়াছেন; কিন্তু আমরা জানি, ইহাতে কোন ফল হয় না। সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হইল সরবরাহ ব্যবস্থা কিছুদিন স্বচ্ছন্দ রাখিয়া বাজারে মন্দার ভাব সৃষ্টি করা এবং কিছুদিন সেই অবস্থা চালানো। যদি ইহা সম্ভব না হয় এবং বাজারে একটা অনাস্থার ভাব বিদ্যমান থাকে, তবে লাভখোরদের সুবিধা হইবেই এবং মাল জমা রাখিবার ঝোঁকও লোকের হ্রাস পাইবে না; কারণ ভবিষ্যতের পেটের ভাবনা হইতে যতটা সম্ভব নিশ্চিন্ত থাকিবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

গরীবের কাপড়

স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ অল্পদিনের মধ্যেই বাজারে দেখা দিবে এবং গরীবের বস্ত্র-সঙ্কটের কিছু সমাধান হইবে, আমরা এমন কথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে শুভদিন এখনও আসে নাই। সেদিন বঙ্গীয় মিল-মালিকদের সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া মিঃ এস এল সা' স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহে গভর্নমেণ্টের এই দীর্ঘসূত্রতা নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। মিঃ সা' বলেন, মিলওয়ালাগণ তাঁহাদের মিলের শতকরা ৬০ ভাগ কাজ স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এবং সামরিক বিভাগের জনাই প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এই ৬০ ভাগের মধ্যে কি পরিমাণ স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈয়ারীর জন্য এবং কি পরিমাণ সামরিক বিভাগের অন্যান্য বস্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য ব্যয় করা হইবে, গভর্নমেণ্ট এখনও তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। সুতরাং গরীবের বস্ত্র-সঙ্কটের যে সত্বর কোনভাবে সমাধান হইবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না এবং স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথও সম্ভবত ভাবজগতেরই বস্তু হইয়া থাকিবে। আমাদের বাস্তব অভাব মিটাইবার ক্ষেত্রে চর্মচক্ষুতে সে বস্তুর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমাদের সকলের হইবে না।

অখণ্ড ভারতের আদর্শ

পাঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী মহাশয় ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার আদর্শকে অভ্রান্ত ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দু ও মুসলমানগণ যেদিন নির্ভীকচিত্তে সুসংহত হইয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, আজ তাহারা হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কোনটিতেই নাই, শুধু ইংরেজ-স্থানে বসবাস করিতেছে, ঠিক সেই দিনই তাহারা মিলিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হিন্দু কিংবা মুসলমান, কেহই যেন একথা বিস্মৃত না হন যে, তাঁহারা একই মায়ের দুইটি বাহু। নিজেদের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা আজ উভয়কেই মায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। হিন্দু এবং মুসলমান, ভারতের এই প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ জাগাইয়া রাখিবার কূটকৌশলই যে ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিবার পক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র অবলম্বন, ইহা উপলব্ধি করিতে বর্তমানের এই বিংশ শতাব্দীর মানব-সভ্যতার দিনে সুগভীর তত্ত্ববিদ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দীর্ঘ পরাধীনতা জাতিকে এমনই দুর্বল করিয়া ফেলে যে, উঞ্ছবৃত্তির গ্লানিকে সে পরিত্যাগ করিতে পারে না; সংকীর্ণ স্বার্থের দায়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে বিকাইয়া দেয়। পাকিস্থানী মনোবৃত্তি সেই দীর্ঘ পরাধীনতা হইতে উদ্ভূত দাসমনোবৃত্তিরই উৎকট পরিণতি। এই দুর্বিপাক হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইলে আজ মধ্যযুগীয় সংস্কারশূন্য তরুণ চিত্তের বলিষ্ঠ ভাবধারা সর্বত্র সঞ্চার করিতে হইবে এবং রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে ধর্মের নামে বুজরুকদের স্বার্থের বেসাতি বন্ধ করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ও আমেরী

বিলাতের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের বুদ্ধির তারিফ করিতেই হয়। বিলাতী সহযোগী মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতসচিব মিঃ আমেরীকে সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'ডেলি হেরাল্ড' লিখিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ আমেরী উভয়েই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং উভয়েরই আন্তর্জাতিক উদারবুদ্ধির অভাব আছে। ইঁহাদের এমন মনোভাব বিশ্ব-শান্তির পক্ষে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আশ্চর্য যুক্তি বটে; নিজের দেশের স্বাধীনতা কামনা করা, আর সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব লইয়া অপর দেশকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত রাখা কি একই কথা? 'ডেলি হেরাল্ডের' নিজের দেশ যদি বিদেশীর অধীন থাকিত, তবে তিনি কি আন্তর্জাতিক উদারতায় মসগুল থাকিয়া পরাধীনতার বন্দনাগানে প্রবৃত্ত থাকিতেন? আন্তর্জাতিকতার গালভরা একটা ফাঁকা কথায় অধীন জীবনের বাস্তব গ্লানিকে বিস্মৃত হইতেন?

বাঁকাস্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

৬

কিন্তু এ সৌভাগ্য আমার বেশীদিন রহিল না। যেদিন আমি প্রথম হইয়া নতুন ক্লাসে উঠিলাম সেইদিন হইতে জ্যাঠাইমার মেজাজও যেন কেমন বিরূপ হইয়া উঠিল আমার প্রতি। আমি মনে মনে জ্যাঠাইমাকে ভীষণ ভয় করিতাম। তিনি যে আমায় কেবল প্রতি কার্যে আঘাত দিয়া কথা বলিতেন, বয়স অল্প হইলেও তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু এখন সে আঘাত যেন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এতদিন যাহা শুধু ফল্গুর মত ছিল অন্তঃসলিলা, এইবার তাহা যেন রুদ্র মূর্তিতে প্রকট হইয়া সর্বসমক্ষে পড়িল। তাহার সে তীব্রতা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

যেদিন বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বাহির হইল সেদিনের কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। জ্যাঠাইমা অপরাহ্নে উঠান ঝাঁট দিতেছিলেন। আমি ঘরে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলাম। ভুতো তখন বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে কাহার বাগান হইতে না-বলিয়া কি পাড়িয়া খাইলে নতুন ক্লাশে উঠিবার স্ফূর্তি উপভোগ করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টায় ব্যস্ত। এমন সময় এক প্রতিবেশীনি একটি ছোট ছেলে কোলে করিয়া আসিয়া জ্যাঠাইমার নিকট আসিয়া শুধাইলেন, —হ্যাঁলা খেঁদীর মা তোর দেওরপো নাকি ফার্স্ট হয়েছে, আমার ছেলের মুখে শুনলুম?

জ্যাঠাইমা যেন প্রথমটা সেকথা শুনিতেই পান নাই এইরূপ ভাব দেখাইলেন। কিন্তু প্রতিবেশীনি যখন আবার বলিলেন, খোকা বলছিল ও নাকি একটা মেডেল পাবে!

ইহা শুনিয়া সহসা যেন জ্যাঠাইমার কর্ণকুহর জ্বালা করিয়া উঠিল। তিনি ঝাঁট দিতে দিতে বলিলেন, দিনরাত অমন বইমুখে ক'রে পড়ে থাকলে আমার ভুতোও পারতো। তা কি বলবো ভাই বই যেন মুখপোড়ার যম—পড়ার নাম শুনলেই যেন ওর জ্বর আসে। আর দেখনা সেই ছেলে এখনো ঘরে বই মুখে দিয়ে বসে আছে—দিনরাত্তির কি পড়াই পড়তে পারে ভাই।

এমন সময় কতকগুলি কাঁচা পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে ভুতো বাড়ির উঠানে আসিয়া পা দিল এবং জ্যাঠাইমার কাছে গিয়া বলিল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা, মুড়ি দে খেতে।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভুতোর চুলের মুঠি ধরিয়া ঘা কতক চড় কিল তাহার পিঠে বসাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, ক্ষিদে পেয়েছে? মুড়ি দেবো না মুড়ো খ্যাঙরা দেবো? মুখপোড়া পড়া-শুনোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, দিনরাত কেবল খেলা আর খেলা—আর কেবল গিলতে দাও। কাল থেকে যদি বেরুবি বাড়ি থেকে ত তোর ভাত বন্ধ—দেখি তুই পড়িস্ কিনা?

ভুতো খুব চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে তাহার মায়ের এই ব্যবহারে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল আজ নতুন ক্লাশে উঠিয়াছি হয়ত মায়ের কাছে কিছু ভালো-মন্দ খাদ্য মিলিবে কিন্তু তাহার পরিবর্তে যাহা মিলিল তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে শুধু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মাস্টার মশায়রা ত বিকেলবেলা খেলতে বলেছেন—তাঁরা বলেন ব্যায়াম আগে তারপর লেখাপড়া—শরীর ভালো না থাকলে পড়াশুনা ভাল হয় না।

জ্যাঠাইমা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, শরীর? শরীর নিয়ে ধুয়ে খাবি? মুখপোড়া আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে?

ভুতো কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চলোনা মাস্টারদের জিজ্ঞেস করবে, তাঁরা বলেছেন কিনা!

আরো ঘা দুই বসাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, বলেছেন? সে কি শুধু তোকে একলা বলেছেন?

ভুতো বলিল, আমাকে একলা কেন—সকলকেই ত বলেছেন।

সকলকে বলেছেন! মুখপোড়া মাস্টাররা কি চোখে দেখতে পায় না যে একজন দিনরাত ঘরে বই মুখে দিয়ে বসে আছে? এই বলিয়া তিনি আবার প্রতিবেশীনির সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন, দেখলে ত দিদি ছেলের রকমখানা?

প্রতিবেশীনি বলিলেন, কাকে বলছিস ভাই—আমার খোকাও অমনি, কার সাধ্য যে তাকে বই দিয়ে বসাবে? তারপর মিনিট কয়েক থামিয়া আবার বলিলেন, যাই ভাই খেঁদীর মা, বেলা পড়ে এলো—ছেলেটার আবার কদিন ধরে সর্দিকাশি হয়েছে, ঠাণ্ডা লাগবে।

এই বলিতে বলিতে তিনি প্রস্থান করিলেন। জ্যাঠাইমাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে চলিয়া গেলেন।

ভুতো আবার পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে আমার কাছে উপস্থিত হইল। তারপর কোঁচড় হইতে দুইটা কাঁচা পেয়ারা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, তোর জন্যে শুধু আমি মার খেয়ে মরলুম।

আমি সবই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম, তবু কথাটা চাপিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করলাম, আমার জন্য কেন? সে বলিল, তুই দিনরাত যে লাইব্রেরীর বই পড়িস মা ত আর তা জানে না—মনে করে বুঝি পড়ার বই পড়ছিস—তাই আমি ফাঁকি দিচ্ছি মনে করে মারলে? যদি পড়তেই হয় ত কাল থেকে তুই ভাই মাঠে গিয়ে পড়িস—তা না হলে মা আমাকে আর বাড়ি থেকে বেরুতে দেবে না।

বলিলাম, আচ্ছা তাই হবে।

ভুতোর সঙ্গে আমার খুব আন্তরিকতা না থাকিলেও অন্তত অসদ্ভাব ছিল না। তাই পরের দিন হইতে আমি বইখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতাম।

জ্যাঠামশায় নিজের ক্ষেতখামার, চাষ আবাদ লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত থাকিতেন। ইহাদের তদারক করিতে করিতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। আর যেটুকু সময় অবসর পাইতেন বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করিতেন। ইহাতে পয়সা না পাইলেও কলাটা, মুলোটা, পুকুরের মাছটা রুগীদের নিকট হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে যাহা পাইতেন তাহাতেও সংসারের অনেকটা সাশ্রয় হইত। তাঁহার জমিজমার যাহা আয় ছিল তাহার সঙ্গে ইহা মিলাইয়া মিশাইয়া কোন রকমে খাইয়া পরিয়া স্বচ্ছন্দে পল্লীগ্রামে চলিয়া যাইত। অন্যের কাছে তাঁহাকে কোনদিন হাত পাতিতে হইত না। তাই যাহারা গ্রামে সুদের কারবার করিত তাহারা ভাবিত কালীচরণ বেশ

দু'পয়সা জমাইয়াছে। ইহা কতদূর [illegible] জানি না, তবে আমি কোনদিন জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে ইহার পরিচয় পাই নাই।

বেশভূষায় তাঁহার কোন পারিপাট্য ছিল না—এমন কি অতি সাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয়। স্বল্পভাষী, সংসার সম্বন্ধে যেন চিরউদাসীন। তাঁহাকে দেখিলে গীতায় উক্ত আদর্শ পুরুষকে মনে পড়ে—তিনি সংসার ধর্ম সবই করেন অথচ কোথাও কোন আসক্তি নাই। এক একদিন এমনও হইয়াছে, জ্যাঠাইমা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁহাকে আনিতে বলিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু তিনি ফিরিলেন একেবারে শূন্য হাতে। ইহা দেখিয়া জ্যাঠাইমা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলি কোন চুলোয় তোমার কান ছিল, আমি যে এত বকে বকে মলুম তা কি শুনতে পাওনি? না, আমি বাড়ির একটা দাসীবাঁদি বলে আমার কথা গেরাহ্যি হয় না?

জ্যাঠামশায় অপ্রস্তুত হইয়া বলেন, ভুলে গেছি।

ভুলে গেছি, না পাছে আমার জন্যে পয়সা খরচ হয় তাই মনে থাকে না?

জ্যাঠামশায় তখন নিবা গালিয়া পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলে তিনি ক্ষান্ত হন বটে, কিন্তু চুপ করেন না। বলেন, কার ধ্যানে দিনরাত থাকো—যদি সংসার করতে চাও ত সংসার করো আর যদি ধ্যান করতে চাও ত তারো জায়গা আছে সেখানে চলে যাও। দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না।

এই রকম ঝগড়া তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই হইত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্যাঠাইমা জয়ী হইতেন শুধু মুখের জোরে। জ্যাঠামশায় তাঁহার চেয়ে তাঁহার মুখকে সহস্র গুণ বেশী ভয় করিতেন। তাই তাঁহার মুখকে বন্ধ রাখিবার জন্য নিজের মুখ একেবারে খুলিতেন না। শুধু খুব বেশী রাগ হইলে একটি কথা প্রায়ই বলিতেন, হাঁগো তুমি যখন জন্মেছিলে তোমাদের দেশে কি তখন মধু পাওয়া যেতো না।

কেন, জানলে কি কিছু কিনে পাঠিয়ে দিতে?

ঠিক ধরেছো ত! বলিয়া জ্যাঠামশায় হয়ত একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠাইমা ঝাঁজিয়া বলিতেন, ধরবো না? তোমার মত মুখে মিষ্টি আর অন্তরে বিষ ভরে রাখতে ত আমার বাপ মা শেখায়নি! আমাদের ভেতর বাইরে সব সমান। এই বলিয়া তিনি রাগে গরগর করিতে করিতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিতেন।

রাগটা জ্যাঠাইমার বরাবরই ছিল, তবে ইদানীং দেখিতাম কিছু বাড়িয়াছিল, বিশেষ করিয়া আমার উপর। তাঁহার মনে কেমন করিয়া জানি না এই বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল যে, ভুতো যদি আমার মত বেশী পড়িত তাহা হইলে আমার মত সেও ফার্স্ট হইতে পারিত। বস্তুত ভুতো আমার চেয়েও অনেক বেশী পাঠ্য পুস্তক পড়িত, দুলিয়া দুলিয়া চক্ষু বুজাইয়া প্রতিটী লাইন পাঁচবার দশবার মুখস্থ করিত, সে কথা তিনি জানিতেন না। তাই সকল বিষয় সন্তুষ্টজনক নম্বর সে পাইত না কেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেন না। তবে তাহার মাথাটা যে একটু মোটা ছিল সে কথা স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের এমন কি জ্যাঠামশায়কে পর্যন্ত বহুবার উল্লেখ করিতে শুনিয়াছিলাম। জ্যাঠাইমার কানেও যে সেকথা আসে নাই তাহা নহে। তবে তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না, একই বই দুইজনে পড়ি অথচ আমি বেশী নম্বর পাই আর ভুতো কম পায় কি করিয়া। হয়ত আমি বেশীক্ষণ বইগুলি আটকাইয়া রাখিয়া ভুতোকে পড়িতে দিই না, এই মনে করিয়া এক একদিন তিনি চুপি চুপি আমাদের পড়ার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

আমরা দুইজনেই চেঁচাইয়া পড়িতাম। প্রথম যেদিন জ্যাঠাইমা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন সেকথা আজও মনে আছে। ভুতো মাকে দেখিয়া আরো বেশী মনোযোগী হইয়া উঠিল এবং আরো জোরে দুলিতে দুলিতে পড়িতে লাগিল—'এ্যা পচা পুকুরে স্নান করিলে ম্যালেরিয়া হয়', 'এ্যা পচা পুকুরে স্নান করিলে ম্যালেরিয়া হয়'—যে লাইনটি সে অন্য দিন হয়ত পাঁচবার পড়িত, সেদিন সে লাইনটি পনেরোবার কুড়িবার পড়িল, বোধ হয় মাকে খুশী করিবার জন্য।

আমি তখন ইংরেজী কবিতা পড়িতেছিলাম গলা কাঁপাইয়া, সুর করিয়া, থামিয়া থামিয়া ছন্দ, মাত্রা, বজায় রাখিয়া—

Oh call my brother back to the,
I cannot play alone,
The summer comes with flower and bee,
Where's my brother gone!

জ্যাঠাইমা দুজনের পড়াই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ শুনিলেন। তারপর বলিলেন, হাঁরে ভুতো তোর বুঝি ও বই পড়া নেই? এই বলিয়া আমার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইলেন।

ভুতো সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ওর আগে পড়া হয়ে যাক, তারপর আমি পড়বো।

জ্যাঠাইমা চীৎকার করিয়া বলিলেন, কেন তুই আগে পড়ে ওকে পরে দিতে পারিস না? পচাপুকুরে নাইলে যে ম্যালেরিয়া হয় এত সকলেই জানে, এ মুখস্থ ক'রে কি উনুনের পাঁশ হবে শুনি? মুখপোড়া মাস্টাররা কি তোকে পড়া দেবার আর বিষয় খুঁজে পায় না?

ভুতো বিস্মিত নেত্রে তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বা-রে আমি যে স্বাস্থ্যরক্ষা পড়ছি!

মুয়ে আগুন তোর স্বাস্থ্যরক্ষার—এ পড়ে কি হবে শুনি?

ভুতো ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে আবার বলিল, জানো মা হেড মাস্টারমশায় বলেন, আগে স্বাস্থ্য তবে অন্য কিছু। স্বাস্থ্য রক্ষা করতে না পারলে মানুষের বেঁচে লাভ কি?

জ্যাঠাইমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—ঝাঁটা মারি এই স্বাস্থ্যরক্ষার মুখে—যদি মুখ্যুই হয়ে রইলি তবে স্বাস্থ্যরক্ষা ক'রে কি হবে? দেখ দেখি ও ছেলে কেমন চালাক, বাজে বই না পড়ে কেমন কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। এই বলিয়া তিনি গম্ভীরকণ্ঠে আমায় কহিলেন, এই আলো তোর বইটা এখন ভুতোকে দে আর তুই ওর বইটা পড়।

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম। আমার বুকের ভিতরটা তখন কাঁপিতেছিল।

আর একদিন কখন তিনি এইভাবে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন আমরা দুইজনে কেহই বুঝিতে পারি নাই। আমি তখন বাঙলা বই পড়িতেছিলাম—

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ?......

ভুতো তখন পড়িতেছিল ভূগোল—'এ্যা মতিহারী, তামাকের জন্য বিখ্যাত', 'এ্যা রামপাল কলার জন্য বিখ্যাত'।

ভুতো! পিছন দিক হইতে যেন সিংহগর্জন হইল। আমাদের দুইজনের অন্তরাত্মা একসঙ্গে চমকাইয়া উঠিল। ভুতো পিছন দিকে না চাহিয়া বলিল, কি মা?

বলি ওটা কি পড়া হচ্ছে?

ভূগোল মা।

ভূগোল না আমার পিণ্ডি! বলি তামাক আর কলার কথা জেনে তোর কি হবে শুনি!

ভুতো বলিল, হেডমাস্টারমশায় বলেছেন ভূগোলটা খুব ভালো

করে মুখস্থ করতে। পৃথিবীর সম্বন্ধে জ্ঞান না হলে পড়াশুনো নাকি করে লাভ নেই।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি বলিলেন, হ্যাঁ খুব লাভ! তামাক আর কলা—ওই দুটোই শিগ্‌গির খেতে শিখবে হেডমাস্টারের মত: তারপর ধমক দিয়া বলিলেন, বন্ধ কর বই! দে—ওটা ওকে পড়তে তুই ওর বইটা পড়। এই বলিয়া তিনি অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে শুধু চাহিলেন।

আমি কোন কথা না বলিয়া সুড় সুড় করিয়া বাঙলা বইটি ভুতোর হাতে তুলিয়া দিতেই তিনি প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর হইতে এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল ভালো বইগুলি আমি নিজে পড়ি আর খারাপগুলি তাহাকে পড়িতে দিই। অথচ এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনদিন কোন চিন্তার উদয় হয় নাই। যখন যে বইটা পাইতাম আমরা দুজনে ভাগাভাগি করিয়া পড়িতাম। কিন্তু জ্যাঠাইমাই প্রথম আমাদের সেই দিকে সচেতন করিয়া দিলেন। ফলে সেই দিন হইতে আমি ভুতোর মত না লইয়া কোন বই পড়িতাম না।

এত করা সত্ত্বেও যখন আমি অর্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম তখন আর এক কাণ্ড ঘটিল। একদিন হঠাৎ পড়ার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম বইপত্র কিছুই নাই. ভুতো সবগুলি লইয়া আলাদা একটি ঘরে বসিয়া একাকী পড়িতেছে।

আমি ইহার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, হ্যাঁরে ভুতো এখানে একলা পড়ছিস কেন ভাই—ও ঘরে যাবি না?

সে যেন আমার কথা শুনিতে পায় নাই এইভাবে আপন মনে পড়িয়া চলিল। ইহা দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগিল। গলাটা একটু খাটো করিয়া তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ ভাই ভুতো বলনা কেন এঘরে পড়ছিস?

এইবার ভুতো হঠাৎ পড়াটা থামাইয়া বলিল, জানি না; তারপর পড়ায় বেশী করিয়া মনোযোগ দিল।

আমি তখন বলিলাম, তাহলে আমার বইগুলো দে ভাই, আমি চলে যাই।

সে আর একবার পড়া থামাইয়া শুধু উত্তর করিল, না।

রাগ হইয়া গেল। বলিলাম, তুই কি আমায় পড়তে দিবি না?

ভুতো আবার বলিল, না। এইবার তাহার কণ্ঠস্বর যেন দৃঢ়তর বলিয়া মনে হইল।

আচ্ছা আমি এখুনি জ্যাঠাইমাকে বলে দিয়ে আসছি। এই বলিয়া সবে ঘর হইতে বাহিরে পা দিয়েছি এমন সময় দেখিলাম তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ সামনে বাঘ দেখিলে লোকের মনের অবস্থা যেরূপ হয় আমার অনেকটা সেই রকম হইয়াছিল। তবু মনে একটু বল সঞ্চয় করিয়া বলিলাম, দ্যাখো না জ্যাঠাইমা ভুতো আমায় একটাও বই দিচ্ছে না পড়তে!

তাঁহার মুখে যেন পূর্ব হইতেই ইহার উত্তর জোগাইয়াছিল। তাই বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কহিলেন, তা আমি কি করবো—তুই যদি ওর বই নিয়ে আটকে রাখিস্ তাহলে ও পড়ে কখোন বলতো—একেই ত ওর পড়ায় মন নেই।

তাঁহার কথার উপর কথা বলিবার সাহস আমার ছিল না, তাই অবনত মস্তকে নিজের পড়ার ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এইভাবে বসিয়াছিলাম জানি না, তবে এক সময় হঠাৎ জ্যাঠামশায়ের গলার আওয়াজ পাইয়া যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, হ্যাঁরে আলোক তোর আজ বুঝি পড়াশুনা নেই—চুপ করে বসে আছিস কেন?

ইহার উত্তরে আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। শুধু দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল গালের উপর। তিনি তখন সস্নেহে আমার মাথায় একটা হাত রাখিয়া বলিলেন, কি হয়েছে বাবা বল্‌তো?

তাঁহার মুখ হইতে এই আদরের ডাক শুনিয়া কিনা জানি না আমি আর চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। একেবারে কান্নায় ভাঙিগয়া পড়িলাম।

জ্যাঠামশায় তখন আমার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে মৃদু ও সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন, কি হয়েছে বলতো আলোক—লক্ষ্মীবাপ আমার!

আমি তখন অস্ফুটস্বরে বলিলাম, ভুতো আমায় বই দিচ্ছে না পড়তে!

তিনি সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ ভুতোর নিকট ছুটিয়া গেলেন, তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, কেন তুই অলোককে বই দিসনি—সীগ্‌গির দে বলছি হতভাগা?

ভুতো পিতার নিকট সত্য গোপন করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করিয়া বলিল, মা যে তাহলে বকবে! ক্রমশঃ

আলাপ-আলোচনা

(৩৬৪ পৃষ্ঠার পর)

কি হয়। নতুন কিছু করবার মত সাহস নেই। যুবকেরা সব জীর্ণ শীর্ণ। আমার নিজেরই ভয় হয় যে. মরবার আগে আমি না আবার "যা কিছু আমাদের সব থাক" বলে বসি। এইই এদেশের আবহাওয়া। এই বাঙলা দেশই এখন যা কিছু নতুন আন্দোলন,—তার সব চেয়ে বেশী বিরোধী। আমার তো মনে হয়, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ এখন আমাদের চেয়ে অগ্রসর। হিমালয় পার হতে হলে রাস্তা কর, রাস্তা যে নিজেরাই বন্ধ করে বসে আছ। আজ বাঙলা দেশই একা বলচে, বিদেশে যাওয়ার দরকার নেই. ঘরে বসে থাক।

তাই আমি তোমাদের বলি, তোমরা এইটে কর, মেনো না, আমি বলি. এমনকি সত্যকেও না হয় মেনো না, তারপর ভুল একদিন আপনি শুধরে যাবে। পুরানো যা কিছু তাই থাক্, একথা বোলো না। আমেরিকায় একটা সুবিধে আছে যে. বছর বছর নূতন নূতন লোক সে দেশে এসে নূতন করে ভাবছে, নূতন করে বলচে. তাই ওরা নূতনকে ডরায় না। তাই ওরা নিত্য-নূতন বিজ্ঞানের কত আবিষ্কার করচে, ওদের উৎসাহের আর অন্ত নেই, সব সময়েই ভাবচে. দেখা যাক না, কি হয়। ইউরোপ ততটা পারে না, ইউরোপে একটা নূতন কল তৈরি হলে—খরচের জন্য ভয় পায়। আমেরিকা বলে, দেখাই যাক না কি হয়। লক্ষ্মীছাড়ারাই লক্ষ্মীলাভ করে।

এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কি যার তার কর্ম? এতে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিবাদ, প্রত্যহ সংগ্রাম, ঘরে-বাইরে আক্রমণ। এই প্রাত্যহিক সংগ্রাম, জেলে যাওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম না। আমাদের দেশে যে-লোক মার খায় না, সে সত্যি কথা বলে না।

মনে পড়ল, একবার ত্রিপুরার রাজা পান চিবতে চিবতে মুসলমান কোচম্যানওয়ালা তাঁর নিজের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আর এক বড় বিদ্বান রাজা তাঁর পিছনে কাপড় টেনে বললেন. "করচেন কি? —পান খেতে খেতে মুসলমানের গাড়িতে যাচ্চেন?" নিজের গাড়িতে বসে পান চিববার যার অধিকার নেই, তিনি আবার রাজ্যশাসন করেন কি করে?

ইতিহাসে দেখ, কোন জাত আগে সমাজে বিদ্রোহ না এনে বা না করে রাষ্ট্র-স্বাধীনতা পায়নি। আর আমরা সমাজে কোন রকম পরিবর্তন না করেই স্বাধীন হব? তাও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আমরা ভিক্ষে চাচ্চি, কোন জাত কি অমন করে সহজে কিছু অধীন দেশকে দিয়েছে? আমরা চাওয়ার মত চাইতেও পারি না।

আত্মপরিচয় । রবীন্দ্র
রবীন্দ্রনাথ ঠ
সাহিত্যের স্বরূপ
রবীন্দ্রনা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

রবীন্দ্র সাহি

এখন গভীরভাবে গীর বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রচারে ব্রতী আসিয়াছে। কিন্তু বৈশাখ ১৩৫০ হইতে প্রতিমাসে অন্যূন একখানি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে ছয় আনা ও আট আনা।

এ বিষয়ে যথেষ্ট
সমালোচকগণও
করিয়া শৌখী
সমালোচনা ক
গভীর
প্রয়োজন র
ভবিষ্যতের
হইবে: ভি
আ
করিবে।

১ বৈশাখ প্রকাশিত হইয়াছে

সাহিত্যের স্বরূপ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছয় আনা

১ জৈষ্ঠ প্রকাশিত হইবে

কুটিরশিল্প — শ্রীরাজশেখর বসু। ছয় আনা

১ আষাঢ় প্রকাশিত হইবে

ভারতের সংস্কৃতি — শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। আট আনা

বাণী-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের রচনা সংগ্রহ করিবার জন্য দেশের ঘরে ঘরে আজ ঔৎসুক্য জাগিয়াছে। তাহারই ফলে, আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি, রবীন্দ্রনাথের অনেক বই সম্প্রতি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, -র দুষ্প্রাপ্যতাবশত সেগুলি অবিলম্বেই পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভবপর হইতেছে না। অবশ্য, সেগুলি যাহাতে যথাসাধ্য পুনর্মুদ্রিত হয় বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং প্রতি সপ্তাহেই কয়েকখানি বই পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

আ
পারে— ইহ
এই
প্রথম প্র
কাজেই এ
পরিচয়
ইতিপূ
সংক্ষিপ্ত
লক্ষ্যের
প্রবন্ধের
১৯৯
প্রকাশি

সম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে

চিত্রা	বলাকা
পূরবী	কাহিনী
জন্মদিনে	সংকল্প ও স্বদেশ
সংকলন	পাঠসঞ্চয়
চণ্ডালিকা	জাপানে পারস্যে
গল্পসল্প	ছুটির পড়া
গল্পগুচ্ছ ২	সহজ পাঠ ৩

বৈশাখেই পুনঃপ্রকাশিত হইবে

নটীর পূজা	শেষের কবিতা
গীতাঞ্জলি	গীতবিতান

১০ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে পুনঃপ্রকাশিত হইবে

তিন সঙ্গী	রাশিয়ার চিঠি
বিসর্জন	গল্পগুচ্ছ ১

POEMS

অন্যান্য যে-সব বই এখন ছাপা নাই সেগুলি যন্ত্রস্থ আছে। প্রকাশিত হইলেই সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে॥

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

		১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	এক সংখ্যার জন্য
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	...	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	...	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	...	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর ছয় মাস তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে" পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনি-অর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১০৲ টাকা; যাণ্মাসিক ৫৲ টাকা। (খ) ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১৫৲ টাকা; যাণ্মাসিক ৭৸৹ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্য্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্য্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵০ তিন আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্ম্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 12th June, 1943. [৩২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্য সমস্যা ও মন্ত্রিমণ্ডল

বাঙলার খাদ্য সমস্যার জটিলতা কোন দিক হইতেই হ্রাস পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে বাঙলার খাদ্যসচিব এ সমস্যার সমাধান-কল্পে আমাদিগকে চাউল কম খাইবার জন্য পরামর্শ দেন, পাঠকদের তাহা স্মরণ আছে; কিন্তু ভারত সচিব আমেরী সাহেব আমাদিগকে একেবারে পথে বসাইয়াছেন। বাঙলাদেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, হাঁ চাউল দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হইয়াছে, ইহা ঠিক; কিন্তু এ সমস্যা বাঙলাদেশে এবং বিশেষভাবে কলিকাতার। আমাদের সমস্যার দিকে ভারত সচিবের নজর কতটা, তাঁহার এই উক্তিতেই বুঝা যায়; কারণ খাদ্য সমস্যায় সমগ্র বাঙলাদেশ জোড়া, বিশেষভাবে কলিকাতায় নহে। কলিকাতা অপেক্ষা মফঃস্বলে বরং অধিক। ইহার পর আমেরী সাহেব বলেন, যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের শস্য না পাওয়া যাইবে, তত দিন পর্যন্ত চাউল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। ব্রহ্মদেশের জন্য আমাদের কোন চিন্তা নাই। সে দেশ যে পুনরধিকৃত হইবে ইহা আমরা জানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেও পারিতাম; কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। খাদ্যের প্রয়োজন আমাদের এখনই। এজন্য কি করা হইতেছে, ইহা জানিবার জন্যই আমাদের উদ্বেগ বেশী। বাঙলার বর্তমান মন্ত্রীরা এ সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক দিন এপ্রদেশে ওপ্রদেশে ছুটাছুটি করিলেন; কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, ইহা মনে হয় না; কারণ পূর্বাঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানির নিষেধবিধি ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইবার পরও কিছুদিন কাটিয়া গেল; কিন্তু এ পর্যন্ত অবস্থার কোন প্রতিকারই লক্ষিত হইতেছে না। বাঙলার বে-সামরিক বিভাগ সেদিনও বলিয়াছেন, চাউলের মূল্য এবার যতটা চড়ার চড়িয়াছে, আর চড়িবে না; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কমিবে কি না; যদি অবিলম্বে চাউলের মূল্য না কমে, তবে ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অবস্থা পুনরায় বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। বাস্তবের দিক হইতে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট এক নূতন খাদ্য পরিকল্পনা প্রবর্তন করিতেছেন। লোকের ঘরে চাউল মজুত আছে। তাহারা তাহা বাহির করিতেছে না, ইহা ধরিয়া লইয়াই এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পরিকল্পনার কার্যক্রম মোটামুটি এইরূপ—(১) বাঙলাদেশের সর্বত্র মজুতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান করা হইবে; (২) প্রদেশের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য আছে, তাহার হিসাব লওয়া হইবে এবং খাদ্যের কতটা প্রয়োজন তাহারও একটা হিসাব প্রস্তুত করা হইবে; (৩) প্রদেশের সর্বত্র ফুড কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হইবে; (৪) খাদ্য বণ্টন বিষয়ে সুব্যবস্থা করা হইবে। বলাবাহুল্য অতিরিক্ত মজুত চাউল উদ্ধার করিয়া কমিটিসমূহের দ্বারা তাহার বণ্টন ব্যবস্থা করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে কথা হইল এই যে, চাউল যদি সত্যই প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে মজুত থাকে এবং অভাব মিটাইবার পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত হয়, তবেই এই পরিকল্পনা সফল হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাঙলাদেশের মফঃস্বলে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে চাউল মজুত আছে এমন বিশ্বাস আমাদের একটুও নাই। বাঙলা গভর্নমেণ্ট প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজনীয় ছয় মাসের চাউল মজুত রাখা চলিবে বলিতেছেন, বাঙলাদেশে এমন কয়জন সম্পন্ন গৃহস্থ আছেন, যাঁহারা ছয় মাসের অধিক চাউল মজুত রাখেন? বড় বড় ব্যবসায়ী এবং মহাজন—তাহারাই সাধারণত ব্যবসায়ের জন্য চাউল মজুত রাখিয়া থাকেন। এমন ব্যবসায়ী এবং মহাজনের সংখ্যাও বাঙলাদেশে অধিক নহে; যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গভর্নমেণ্টের এই সব বিধি-ব্যবস্থা জারী হইবার পর এবং জারী হইবার

সম্ভাবনা বুঝিয়াও যে চাউল মজুতে রাখিবেন ইহা মনে হয় না। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ব্যবসায়ী এবং মহাজনের ঘরে চাউল সত্যই যদি মজুতে থাকে তবে কলিকাতা এবং হাওড়া এই দুইটি স্থানেই বিশেষভাবে আছে। যথেষ্ট অর্থ ও বিত্ত এবং অন্যভাবে প্রতিপত্তিশালী না হইলে এ অবস্থার মধ্যে চাউল মজুতে রাখা কেহ নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল বলিয়া মনে করিবে না। এমন মহাজনের সংখ্যা কলিকাতাতেই বেশী। অথচ দেখা যাইতেছে বাঙলা গভর্নমেণ্ট কলিকাতা এবং হাওড়াকে তাঁহাদের খাদ্য পরিকল্পনা বিধি প্রয়োগের গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়াছেন; এমন বৈষম্যের আমরা কোন কারণ দেখি না। দেশের লোককে অন্নমুষ্টি হইতে বঞ্চিত রাখিয়া যাহারা নিজেদের উদর পরিস্ফীত করিতে চাহে, তাহারা শহর কলিকাতার কিংবা হাওড়ার এলাকা মধ্যে থাকিলে এবং সাহেব ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা পাইলে বাঁচিয়া যাইবে, এ ব্যবস্থায় এমন ত্রুটি রহিয়াছে। ইহা কখনই সমীচীন নহে।

দায়িত্ব কাহার ?

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার হইতে বাঙলা সরকারের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্য অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের এই অভিযানের আওতা হইতে হাওড়া ও কলিকাতাকে বাদ দিয়া যেভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান করিতে হয় যে, তাঁহাদের বিশ্বাস অন্যায় মজুতকারী কলিকাতা ও হাওড়ায় নাই, যত সব আছে গ্রামে। গ্রামে গ্রামে চাষী ও গৃহস্থদের গোলা ধানে ও চাউলে ভর্তি হইয়া আছে। সেগুলি টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই বাঙলা দেশের অন্নকষ্ট দূর হইবে। এই ব্যবস্থার দরুণ গভর্নমেণ্ট বাঙলার শোচনীয় অন্নকষ্ট দূর করিবার দায়িত্ব দেশের লোকের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। জনসাধারণকে অন্ন সরবরাহ করিবার ঝুঁকি তাঁহারা কার্যত স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ইহাতে গোড়ায় গলদই থাকিয়া যাইতেছে। দেশের লোকের ঘাড়ে ঝুঁকি চাপাইবার আগে সমস্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ অন্ন সংস্থানের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহাদের নিজেদের উপর লওয়া উচিত ছিল। গভর্নমেণ্ট যদি সে সম্বন্ধে দেশের লোককে নিশ্চিন্ত করিতে পারেন, তবে সঞ্চয়ের দুর্ভোগ হইতে রক্ষা পাইয়া জনসাধারণ [স্বস্তির] নিশ্বাস ফেলিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাঙলাদেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে। এজন্য কাহাকে দোষী করিব জানি না এবং করিলেও এখন কোন লাভ নাই। তবে ইহা সত্য যে, বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে না পারিলে দেশব্যাপী এ দুর্দশার মোচন হইবে না। সে খাদ্য চাউল না হয়, গম হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু গমও যে অবস্থায় দুষ্প্রাপ্য, সে অবস্থায় চাউল কম খাও এই ধরণের গবেষণার কোন মূল্য নাই। এমন গবেষণায় পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না।

আইনের মর্যাদা

ভারতরক্ষা আইনে আটক কয়েকজন বন্দীর মুক্তির জন্য সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চে একটি মামলা চলিতেছিল। গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ সেই মামলার রায় দেওয়া হয়। বিচারপতি ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারাটি অসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বন্দীদিগকে [অবিলম্বে] মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। বিচার সংশ্লিষ্ট নয়জন বন্দীর মধ্যে [কয়েক]জনকে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে আদালতে হাজির করিতে হইয়াছিল, হাইকোর্টের নির্দেশে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় বটে কিন্তু বিচারকদের এজলাস হইতে বাহিরে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে পুলিশ ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে পূর্ব হইতেই পুলিশ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, অবিলম্বে মুক্তির আদেশের পাল্টা হিসাবে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করাটা কি একান্তই প্রয়োজন ছিল? তারপর যাহাদিগকে বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কিত বিশেষ অবস্থা হইতে উদ্ভূত বিশেষ কারণের অজুহাতে এই অবস্থার পক্ষে কার্যকর ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে দেড়শত বৎসরের পূর্বেকার এবং তৎকালীন অবস্থার জন্য বিশেষভাবে প্রণীত বিধানের বলে বন্দী করা আইনসম্মত বিচার-ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করা ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলে না। এতদ্দ্বারা শাসকদের ক্ষমতার কাছে কলিকাতা হাইকোর্টের ক্ষমতা যে কিছুই নয় লোকচক্ষুতে ইহাই যেন স্পষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে বাঙলাদেশে পুলিশই যে সর্বেসর্বা ইহা দেশের লোকে বুঝিতে পারিল; কিন্তু সে বোধটা জাগানো কি এতই প্রয়োজন ছিল?

স্পেশ্যাল কোর্টের বৈধতা

যুদ্ধকালে অনুষ্ঠিত কয়েকপ্রকার অপরাধের বিচার ও দণ্ডদানের জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষ আদালত সম্পর্কিত বিচারবিধি প্রবর্তন করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট অর্ডিন্যান্স জারী করেন। এই সব আদালতের বৈধতার প্রশ্ন লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা উপস্থিত হয়। বিচারপতিগণ অর্ডিন্যান্সটি অসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সম্প্রতি ফেডারেল কোর্টও সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ফেডারেল কোর্টের এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর বিশেষ আদালতগুলির কাজ বাতিল হইয়া যায়। এই ত্রুটি পূরণ করিবার জন্য আরও একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে। নূতন অর্ডিন্যান্সে এই নির্দেশ দান করা হইয়াছে যে, পুরাতন অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে সকল দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে সাধারণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে আপীলের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে ঐ সকল দণ্ডের ক্ষেত্রেও তাহা প্রযুক্ত হইবে। নূতন অর্ডিন্যান্স সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হইবে এবং উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিন্যান্স অনুসারে বর্তমানে যে সকল মামলা বিচারাধীন আছে, সাধারণ আদালতসমূহে সে সব মামলার বিচার হইবে। পুরাতন বিধান অনুসারে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার জন্য কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করা যাইবে না। এ স্থলে প্রশ্ন উঠে এই যে, কলিকাতা হাইকোর্ট এবং ফেডারেল কোর্ট উভয়েই স্পেশ্যাল কোর্টের বিচারপদ্ধতিকে অবৈধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বর্তমানের নূতন অর্ডিন্যান্সে ভারতের সর্বপ্রধান বিচারালয় কর্তৃক স্থিরীকৃত সেই অবৈধ পদ্ধতি প্রয়োগে যে সব দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সব দণ্ড ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে, সাধারণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, এইরূপ গণ্য করিবার নির্দেশ দিয়া বৈধ করা হইয়াছে; ইহাতে ন্যায়ের বিচারের মর্যাদা এবং হাইকোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তের মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে লঙ্ঘিত হইল নাকি? কথা উঠিতে পারে এই যে, আপীলের দ্বারা দোষ-ত্রুটির প্রতিকার করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যে আপীল করিতে পারিবে না, তাহাকে অবৈধ বিচারপদ্ধতি অনুসারে প্রদত্ত দণ্ডই কার্যত বৈধ বলিয়া ভোগ করিতে হইবে। ইহাতে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হইল বলা যায় না।

বন্দিমুক্তির দাবী

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দান করেন। এপর্যন্ত তাঁহার প্রতিশ্রুতির কিছুই পালিত হয় নাই। চাউলের মূল্য হ্রাস করিবার প্রতিশ্রুতির পরিণতি আমরা যাহা

দেখিতেছি তাহাতে তাঁহার আমলে চাউলের মূল্য প্রকৃতপক্ষে দুই গুণেরও উপর চড়িয়াছে, সেইরূপে রাজনীতিক বন্দীদের আটকের হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিপ্রাপ্ত ৯জন রাজনীতিক বন্দীকে ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ দেখাইয়া দিয়াছে যে, তাহাদের খুঁটার জোর কতখানি। এই অবস্থার মধ্যেও মুস্‌লীম লীগের অন্যতম নেতা মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত 'মর্ণিং নিউজ'-পত্র সেদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র-সচিবের পক্ষে এখন তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসিয়াছে। 'মর্ণিং নিউজ' শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, 'তিনি ডায়াবিটিশ ও রক্তের চাপে ভুগিতেছেন। সম্প্রতি আবার তার উপর কঠিন অনিদ্রা ব্যাধিও আরম্ভ হইয়াছে। ইহার জন্য যে সকল ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু তাহাতে আর নিদ্রাকর্ষণও হয় না। কখনও কখনও রাত্রির পর রাত্রি ঘুম আসে না। একবার একপক্ষ কালেরও অধিক তিনি অনিদ্রায় কাটান। এরূপ অবস্থায় মজুমদার মহাশয়কে অবিলম্বে মুক্তিদান করা কর্তব্য।' এ সব ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডল কতটা অসহায় এবং তাঁহাদের ক্ষমতা কতটা সীমাবদ্ধ তাহা আমাদের জানা আছে। তাঁহারা সে কথাটা মুখে বলুন আর না বলুন। সেই জন্যই যখন নাজিমুদ্দীন যে আশ্বাস-বাণী দান করেন, আমরা তাহা [illegible] সাথে গ্রহণ করিতে পারি নাই। [illegible] এই ব্যাপারে যদি নাজিমুদ্দীন [illegible] হইয়াছেন তাহা [illegible] চাই। যদি তাঁহার পক্ষে [illegible] [illegible] সম্ভব না হয় তবে [illegible] [illegible] একথাটা [illegible] নাই লজ্জনীয়।

লুই ফিসারের লেখা—

মিঃ লুই ফিসার পাঠকদের নিকট অপরিচিত নহেন। [illegible] সাময়িকপত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যালোচকস্বরূপে [illegible] এই মার্কিন লেখকের খ্যাতি আছে। কংগ্রেসের সঙ্গে [illegible] স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের যখন আলোচনা চলে, তখন তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং আগাগোড়া সেই আলোচনার প্রতি লক্ষ্য [illegible]। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রস্তাব ফাঁসিয়া যাইবার পর [illegible] ফিসার কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং তার [illegible] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কংগ্রেসবিরোধী প্রচারকার্য একেবারে [illegible] হইয়া যায়। সম্প্রতি ভারত সরকার এই আদেশ জারী করিয়াছেন [illegible] 'সেন্সর' না করিয়া ভারতবর্ষে কোথাও তাঁহার [illegible] বা বক্তৃতা প্রকাশ করা চলিবে না। সুতরাং ভারত সরকারের [illegible] মিঃ লুই ফিসার একজন সাংঘাতিক লোক। ব্যক্তিবিশেষের [illegible] এমন জেহাদ ঘোষণা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ [illegible] চলে এবং সে ব্যক্তি-বিশেষও এক্ষেত্রে একজন নিরীহ লেখক [illegible] সাহিত্যিক। মিঃ ফিসারের অপরাধের মধ্যে একমাত্র অপরাধ ইহাই দেখা যায় যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই দাবী কৌশলক্রমে এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সমগ্র ভারতের আন্তরিক সহানুভূতির দ্বারা সমর্থিত [illegible] শক্তিকে দৃঢ়তর করিতে হইলে কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ করিয়া [illegible]তের এই অচল অবস্থার সমাধান করা কর্তব্য। মিঃ ফিসার যে [illegible] বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এখনও সে কথা বলিতেছেন; ইংলণ্ডের মহিলা সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়া [illegible]জন মহিলাও সেই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। ইঁহারা যদি সাংঘাতিক জীব স্বরূপে গণ্য না হন, তবে মিঃ ফিসার কোন্ অপরাধে বিশেষ অপরাধী হইলেন? একটা জাতীয় স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করা কি এতই অপরাধজনক বিষয়? যদি তাহাই হয় তবে জগতের স্বাধীনতার কথা তুলিয়া যাঁহারা সমরাদর্শের দোহাই দিতেছেন, তাঁহারাই সর্বপ্রথমে অপরাধী অধিকন্তু তাঁহাদের সে অপরাধের মূলে অনেকখানি ভণ্ডামি রহিয়াছে।

নিধিরামের সর্দারী

মহাত্মা গান্ধীর চিঠি লইয়া মিঃ জিন্না যে বীররসের অভিনয় করিয়াছেন, মোসলেম লীগের সমর্থক যাঁহারা, তাঁহারাও অনেকে তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। মিঃ জিন্না যে পাকিস্থানী প্রস্তাব ভাঙ্গাইয়া আজ নেতাগিরি ফলাইতেছেন, ডাক্তার আব্দুল লতিফকে সেই পাকিস্থানী প্রস্তাবের উদ্ভাবনকর্তা বলা যায়। সম্প্রতি তিনিও মিঃ জিন্নার আচরণের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। খাকসার দলের নেতা আল্লামা মাসারিকী মিঃ জিন্নার কার্যের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, জিন্না সাহেব যদি নিজের কার্য উদ্ধার করিতে চাহেন, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আনুগত্যের দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না; তাঁহাকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করিতে হইবে। এই সব বিরুদ্ধ সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ আঘাতে জিন্না সাহেব উত্তেজিত হইয়া সেদিন করাচীতে মহাত্মাজীকে আক্রমণ করিয়াছেন; কারণ সেদিক তাঁহার পক্ষে খোলা আছে এবং সেই সঙ্গে হিন্দু সংবাদপত্রসেবীদের উপরও তিনি একহাত লইয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, মিঃ জিন্নার অনুগামীদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই হিন্দু সংবাদপত্রগুলির প্রভাবে পড়েন নাই। তাঁহারা তাঁহার বিবৃতি বক্তৃতাও ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন এবং তাহার তাৎপর্যও উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে জিন্না সাহেব গান্ধীজীর চিঠি উপলক্ষ্য করিয়া যে বীররসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে নিজের ত্রুটী স্বীকার না করিয়া তিনি যতই অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজনা প্রকাশ করিবেন, ততই অধিক হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িবেন।

বিশ্বভারতীর প্রশংসনীয় উদ্যম

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সংস্করণে 'সাহিত্যের স্বরূপ' এবং 'কুটীর শিল্প' এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। প্রথম পুস্তকখানি বিশ্বকবির নিজের লিখিত; দ্বিতীয় পুস্তকখানি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত। 'সাহিত্যের স্বরূপে'র সম্বন্ধে কোন কথা বলা অনাবশ্যক; কারণ, সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় বাঙলার কয়েকটি কুটীর শিল্প সম্বন্ধে দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে আলোচনা করিয়াছেন। জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করাই বিশ্বভারতীর এই সংগ্রহ বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। বিশ্বভারতী বাঙলা দেশে সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। বৈশাখ মাস হইতে বিশ্বভারতীর এই বিভাগ হইতে পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রকাশিত পুস্তকগুলি বেশ সুদৃশ্য, ছাপা এবং কাগজ সুন্দর; ভাষা জনসাধারণের পক্ষে বুঝিবার উপযোগী সহজ এবং সরল। প্রত্যেকখানা পুস্তকের মূল্য আকার অনুসারে ৬ আনা হইতে আট আনা মাত্র। বর্তমান কাগজের এই দুর্মূল্যতার দিনে বিশ্বভারতীর এই উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। এই সব পুস্তকের সর্বত্র সমাদর হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।

বাঁকা স্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

১৩

সেই বছর আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া সবাই অবাক হইয়া গেল। প্রথম, দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় স্থান পর্যন্ত আমি অধিকার করিতে পারিলাম না। স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র, পাড়ার-লোক, জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা, এমনকি ভুতো পর্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারিল না। সেও এক বিষয়ে আমার চেয়ে কিছু বেশী নম্বর পাইয়াছিল। জ্যাঠামশায় চিন্তাক্লিষ্টমুখে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন করিয়া পরীক্ষা এত খারাপ হইল। আমি ইহার কোন উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জ্যাঠাইমা পিছনের ঘরে কোথায় ছিলেন জানি না। তিনি সেখান হইতে বোধ করি সবই শুনিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ বাহিরে আসিয়া আমার হইয়া জবাব দিলেন, দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকলেই কি পড়া হয়—বলি মানুষের মাথা ত, কত আর ধরবে! ভুতোকে ত আমি কিছুতেই পড়াতে বসাতে পারি না, তা সেও নাকি ওর চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে।

এই বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ভুতো—ও ভুতো? মুখপোড়া বলি কানের মাথা খেয়েছিস নাকি শুনতে পাচ্ছিস না? তোর সেই নম্বরের কাগজটা এনে ওঁকে দেখা না?

ভুতো প্রথমেই বাবাকে তাহা দেখাইয়াছিল। তাই ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, দেখিয়েছি ত?

তখন জ্যাঠাইমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোরটা দিয়েছিস?

লজ্জায় আমি তখনো সেইটা জ্যাঠামশায়কে দেখাইতে পারি নাই। তাই ঘাড় নাড়িয়া তাঁহাকে জানাইলাম, না।

তা দেখাতে যাবে কেন, তাতে যে তোমার মান যাবে? ওঁকে গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে তোমার কাছে চাইতে হবে তবে তুমি দয়া করে দেবে। দিনে দিনে হ'লো কি, বলে বাপের বড় ভাই জ্যাঠা তাঁকেও আজকালকার ছেলেরা 'কেয়ার' করে না! ধন্যি যাহোক—আরো কত যে দেখাবে বাবা তা কে জানে! এই বলিয়া গলায় একপ্রকার সুর টানিয়া আনিয়া জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া তিনি আবার আমার দিকে তাকাইলেন।

ইহাতে যেন আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া জামার পকেট হইতে 'প্রগ্রেস রিপোর্ট'টি আনিয়া জ্যাঠামশায়ের হাতে দিলাম।

জ্যাঠাইমার মুখচোখ নিমেষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি আর একবার জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া খেঁদীকে ডাকিতে লাগিলেন উচ্চৈঃস্বরে।

খেঁদী বাহিরের দিকে খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কি মা?

তিনি কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার মাথা আর মুণ্ড—বলি আজকাল কোন চুলোয় থাকিস যে ডাকতে ডাকতে গলা ফেটে মরে না গেলে শুনতে পাস না?

খেঁদী ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সে হাঁ করিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, যা ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গি থেকে দুখানা চিনির পুলী এনে তোর আলোকদাকে দে।

খেঁদী বলিল, কোনদিন ত আলোকদা খায় না মা?

—হারামজাদী, তোর সে খোঁজে দরকার কি—যা বলছি তাই কর। কোনও দিন খায় না, আজ খাবে। সে হিসেবে-নিকেশে তোর কি হবে?

খেঁদী পুলী লইয়া আসিতে আমি বলিলাম, আমার খিদে নেই খাবো না এখন।

জ্যাঠাইমা তেমনি উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, আবার রাগটুকু আছে খোল আনা।

জ্যাঠামশায় তখন আমায় খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা আমি কোন দিন অমান্য করি নাই। অগত্যা উপরোক্ত অনুরোধ করিতে করিতে সেই চিনির পুলী দুটি গলাধঃকরণ করিলাম।

পরের দিন হেড মাস্টারমশায় আমাকে চুপি চুপি তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, আলোক তুমি আমাদের স্কুলের একমাত্র আশা-ভরসা—তোমার মুখের দিকে আমরা সকলে, এমনকি সেক্রেটারী পর্যন্ত চেয়ে আছেন—তোমার পরীক্ষা এবারে এত খারাপ হলো কি করে বাবা?

কি একটা কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি সেটাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম স্যার শরীরটা এবার মোটেই ভাল ছিল না তাই একেবারে পড়তে পারিনি।

আমিও তাই হেড পণ্ডিতমশায়কে বলছিলুম নিশ্চয়ই বই-গুলো তুমি ভালো করে পড়তে পারোনি, তা না হ'লে তোমাকে হটাতে পারে এমন ছেলে এ অঞ্চলে নেই। আচ্ছা কাল থেকে তুমি আমার বাড়িতে কোচিং পড়তে যেয়ো—আমি তোমায় আলাদা করে দেখবো।

আমি হেড মাস্টারমশায়ের এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া বাহিরে আসিবার জন্য যেমন পা বাড়াইয়াছি অমনি সেকেণ্ড পণ্ডিত-মশায় বাঙলা পরীক্ষার খাতাটা হাতে করিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমায় বলিলেন, হাঁরে তুই খাতাতে কি সব বুড়োমি করেছিস—দিন দিন দেখছি বিদ্যে বাড়ছে! শুনুন মাস্টার মশায় কি লিখেছে।

এই বলিয়া তিনি আমার সামনে হেড মাস্টারমশায়কে বলিলেন, 'মাতৃহীনা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব' এর অর্থ লিখতে গিয়ে কি মন্তব্য করেছে জানেন?

হেড মাস্টারমশায় চশমার মধ্য দিয়া বিস্মিতদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আর তিনি আমার খাতাখানি পড়িতে লাগিলেন এইভাবে—জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে এইরকম লাইন কেমন করিয়া বাহির হইল জানি না। কেননা

তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা একেবারে অসম্ভব—আমার মনে হয় আমাদের দেশে ইহা কখনো হয় নাই, হইতে পারে না, যাহার মা নাই সে কখনো মা পাইতে পারে না। অপর কাহারো মা পরের ছেলের দুঃখ বুঝিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে ইহা একেবারে চিন্তা করা যায় না। এখানে প্রত্যেক মা স্বার্থপর—প্রত্যেকে শুধু নিজের ছেলেকেই ভালবাসিতে ব্যস্ত। তাই মনে হয় এই লাইনটি রবীন্দ্রনাথের মত কবির হাত দিয়া বাহির না হইলেই ভাল হইত। তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি, বাঙলা দেশের মায়েদের মনের দিকে কি কখনো চাহিয়া দেখেন নাই?

হেড মাস্টারমশায় দড়িবাঁধা চশমাটা সহসা কপালের উপর তুলিয়া দিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন আলোক এসব তুমি কি পাগলের মত লিখেছো।

বলিলাম আমি যা লিখেছি স্যার সব সত্যি এর মধ্যে এক কণাও মিথ্যে নেই।

তিনি বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও বাঙলা দেশে এমন মা নেই যে অপর ছেলেকে নিজের ছেলের মত ভালবাসতে পারে?

আমি বলিলাম না। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায় তখন উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, তুই কত দেখেছিস হাজার হাজার এই রকম মা বাঙলার ঘরে ঘরে রয়েছে। আমি বলিলাম, হাজার ত দূরের কথা আপনি একটাও দেখাতে পারবেন না স্যার।

আবার তর্ক করে দেখেছেন মাস্টারমশায়—আপনি কি করে এই ছেলের উপর এত ভরসা রাখেন আমি না—আমি ত বলি এর চেয়ে কমল ঢের ভাল ছেলে।

হেড মাস্টারমশায় অসন্তুষ্টভাবে একবার হুঁ বলিয়াই, নিজে আমাকে সরিয়ে বসিয়া গেলেন। আমি চলিয়া আসিলাম।

বাহিরে আসিতে সেকেণ্ড মাস্টারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি চুপি চুপি আমায় একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, দাখ আমাকে ত সেই ছুতোকে পড়াতে হয়, তুই না হয় আর দুটো টাকা বেশী দিস আমি তোকে পড়াবো। একসঙ্গে দুই জনে পড়বি সে ত ভালই হবে—তোর জ্যাঠাকে বলে দ্যাখ না?

সংক্ষেপে শুধু 'আচ্ছা' বলিয়া আমি যেমন দুই পা আগাইয়াছি অমনি তিনি পিছনে পিছনে আসিয়া আবার বলিলেন, দেখছিস ত ছুতো কি ছিল আর কি হয়েছে? আমার কাছে ফাঁকি পাবে না—অন্য মাস্টারদের মত একটা কিছু শিখতে দিয়ে নিজে বসে বসে হাওয়া খাবো তা হবে না। আমি যার ভার নেবো তাকে মানুষ করে দিয়ে তবে ছাড়বো!

আমি বলিলাম, আমার ত কোন হাত নেই স্যার, জ্যাঠামশায় না বললে আমি কি করবো।

—না তুই আর কি করবি! তবে তোকে বলছি এই জন্যে যে তুই এগুলো তাঁকে বুঝিয়ে বলবি। জিগ্যেস করিস ছুতোকে শুধু গাধার মত কতকগুলো বাজে মুখস্থ করলেই পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়া যায় না, এমন সব 'ইমপরট্যেন্ট' দাগ দিয়ে দিয়েছিলাম যে হুবহু সেইগুলো সব পড়ে গিয়েছিল। এমন কি রচনা পর্যন্ত ছুতো মুখস্ত করে গিয়েছিল—জিগ্যেস করে দেখিস তাকে।

তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন হ্যাঁরে হেড মাস্টার বুঝি তোকে পড়াবার কথা জ্যাঠামশায়কে বলতে বলছিলেন?

আমি বলিলাম, না, তিনি আমাকে কোচিং পড়তে যেতে বলছিলেন।

সেকেন্ড মাস্টার বলিলেন, ওখানে গিয়ে কি হবে—এক গাদা ছেলের মধ্যে কখনো লেখাপড়া হয়—হুঃ—হেডমাস্টারের যেমন মাথা খারাপ। এই বলিতে বলিতে তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর কমল ও মধু আসিল আমাকে সান্ত্বনা দিতে। কি বলিয়া কথাটা পাড়িবে ঠিক করিতে না পারিয়া তাহারা প্রথমটা একটু ইতস্তত করিল, তারপরে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া আমাকে কিছুদূরে লইয়া গিয়া বলিল আচ্ছা আলোক সত্যি করে বল না ভাই, তোর কাছ থেকে আমরা কত শিখলুম অথচ তুই আমাদের চেয়ে কম নম্বর পেলি কেন? বল না ভাই, আমাদের কাছে লুকোসনি?

তাহাদের মুখ হইতে সহানুভূতির কথা শুনিয়া আমার মনে হইতে লাগিল তাহারা যেন আমাকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে। একবার ভাবিলাম বলি আমার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার একমাত্র কারণ তোমরা, কিন্তু মুখ দিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহাদের সম্মুখে চাপিয়া লইয়া বলিলাম কি করে জানবো বল!

কমল বলিল, ওটা বাজে কথা—তা না তোর মত ছেলে কখনো এমন কম নম্বর পায়? নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ আছে আমাদের কাছে ভাঙছিস না।

মধুও তাহাতে সায় দিয়া বলিল, আমারও তাই বিশ্বাস ভাই।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, তাহলে হয়ত তোমাদের কথাই ঠিক।

১৪

পরের রবিবারে মধুর ফার্স্ট হওয়া উপলক্ষে তাহাদের বাড়িতে এক ভোজের আয়োজন হইল। মধুর মা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যাইব না শরীর খারাপ এই অজুহাত দেখাইব। কিন্তু পরে মনে হইল তাহারা হয়ত ভাবিবে মধু আমার স্থান কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া ঈর্ষাবশত আমি যাই নাই। অগত্যা যাইতেই হইল।

মধুর মা তাঁহার পাড়ার আরো কয়েকজন মহিলাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কমল তাহার মাকে লইয়া আসিয়াছিল। বাড়ি একেবারে গমগম করিতেছে। মধুর মা একেবারে আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেছেন আর তাঁহার সঙ্গিনীরা সব মধুকে ঘিরিয়া কত প্রশ্ন করিতেছেন। মধুরও চোখে একটা গর্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমলেরও যথেষ্ট খাতির হইতেছিল। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই সব মুহূর্তে যেন নিস্তব্ধ হইয়া গেল সবাই আমাকে দেখাইয়া চোখে যেন কি ইসারা করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল।

মধু আসিয়া তাহার পড়ার ঘরে আমাকে লইয়া গেল এবং তাহার চেয়ারে আমাকে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল বোস ভাই একটু কাজ আছে আমি এখুনি আসছি।

মিনিট কয়েক পরেই কমল খুব ব্যস্তভাবে ঘরে আসিয়া বলিল কি রে আলোক কখন এলি?

বলিলাম এই মিনিট পনেরো হলো।

কিছুক্ষণ খুচরো আলাপ করিয়া সেও কাজের অছিলায় ভিতরে চলিয়া গেল।

তারপরে আসিলেন মধুর মা। তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বাবা তুই এসেছিস বলে কি আনন্দ যে আমার হচ্ছে তা কি বলবো।

এই বলিয়া তিনিও অল্পক্ষণ পরে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আমি চুপচাপ বসিয়া মধুর পাঠ্য বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। কেবলই আমার মনে হইতে লাগিল, এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমার স্থান কোথায়?

এইসব চিন্তা করিতেছি এমন সময় মধুর বাবা একটা মোটা বর্মা চুরুট মুখে পুরিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর কয়েকটি কুশল প্রশ্ন আদান প্রদানের পর বলিলেন এই ত চাই, "নেক টু নেক ফাইট" দিতে হবে—হ্যাঁ মধু এবার ফার্স্ট হয়েছে,

তুমি আসছে বার ওকে আবার মেরে দাও—ও আবার তোমায় মারতে চেষ্টা করুক। এই রকম হওয়া চাই, তা না হ'লে ভালছেলে কি! শুধু জমিদারীর মৌরসী পাট্টার মত একঘেয়েভাবে জীবন কাটানোর কোন মানে হয় না। জীবনে ওঠানামা চাই—যতখানি নামবে তার দু'ডবল আবার উঠবে! বেশ বেশ তুমি এসেছো দেখে ভারী খুসী হলুম। এই বলিয়া একসঙ্গে বারকতক চুরুটে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খাইবার জন্য আমার ডাক পড়িল। কমল ও মধু আমাদের দলটিকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিল। মধুর মা একবার রান্নাঘর হইতে বলিলেন, কমল দেখিস বাবা সকলের যেন পেট ভরে। আমি একটু এদিকে ব্যস্ত রয়েছি।

মধুর বাবাও ইতিমধ্যে একবার আসিয়া কমলকে উপদেশ দিয়া গেলেন আমাকে ভালো করিয়া খাওয়াইতে। কমলকে মধুদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হইতে দেখিয়া আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল। মনে হইল, আমি যেন পর, ইহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

এমনিভাবে যখন খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয় এমন সময় সহসা মধুর মা আমার পাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মধুকে হুকুম করিলেন আরো গোটা দুই সন্দেশ আমার পাতে দিতে। আমার তখন পেট ভরিয়া গিয়াছিল, আমি অনুনয় করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আর পারিব না। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, তুমি ভালো করে না খেলে মধুর মনে আনন্দ হবে না বাবা—আজ ওর জীবনে একটা বিশেষ দিন! শেষের কথাটি শুনিয়া আমারও মনে হইল, আমারও ত জীবনে আজ একটা বিশেষ দিন—ইতিপূর্বে কখনো আমি ফার্স্ট ছাড়া হই নাই!

খাওয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সেখানে আর এক মিনিটও আমার যেন ভাল লাগিতেছিল না। মধুর মাকে রান্নাঘরে যাইয়া নমস্কার করিতেই তিনি বলিলেন, এর মধ্যে চললি বাবা—আমি মনে করেছিলুম মধু ও কমলকে তুই পরিবেষণ করে খাওয়াবি।

এই কথাটা শুনিয়া আমার মনের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। কয়েকবার ঢোক গিলিয়া বলিলাম, আমায় এতটা পথ যেতে হবে, তার ওপর রাতও হয়েছে অনেক।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা তবে এসো বাবা। তুই ত ভালো করে খেলি না বাবা—আমি একেবারে দেখতে পেলুম না।

কমলের মা সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকেও নমস্কার করিলাম। তিনি সদর দরজার কাছ পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসিয়া পিছনের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, এবার ফার্স্ট হতে পারলি না কেন বাবা?

কেন, ইহার উত্তর কাহাকে দিব, আর কেই-বা বুঝিবে! তাই চুপ করিয়া শুধু একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। তিনি বলিলেন, মন দিয়া পড় বাবা যাতে আবার ফার্স্ট হতে পারিস।

বলিলাম, আপনাদের আশীর্বাদ পেলে হবে বৈ কি!

তিনি বলিলেন, আমি আশীর্বাদ সব সময় করছি বাবা।

বাড়িতে আসিয়া জামা খুলিতেছি এমন সময় জ্যাঠাইমার এই মন্তব্যটি কানে আসিল। তিনি সরলাকে বলিতেছিলেন, লজ্জাও করে না ছ্যাঃ—খাওয়াটাই এত বড় হলো, তুই ফার্স্ট হতে পারলিনি আবার যে হলো তার বাড়ি স্ফূর্তি করে খেতে গেলি। আমি হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

সরলা বলিল, হাঁ মা, বড়দাদাবাবুকে ওরা বলেনি? ভুতোকে সে বড়দাদা বলিত।

খ্যাঙরা মারি অমন খাওয়ার মুখে—বললেই যেন আমার ভুতো যেতো। এমন নোলা আমার ছেলের নয়!

সরলা বলিল, তারাই বা কেমন লোক বাপু?

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তারা ত ওই চায়। ওকে নেমন্তন্ন করলে আবার সঙ্গে সঙ্গে অপমানও করা হলো।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। মনে হইল হয়ত জ্যাঠাইমা ঠিকই বলিতেছেন। এমন সময় ভুতো আসিয়া বলিল, কি রে কখন এলি?

বলিলাম, এই আসছি ভাই!

খুব খাওয়ালে না! একে ফার্স্ট হয়েছে তায় ওর বাবা [illegible] বড়লোক। কি কি খেলি তাই বল না?

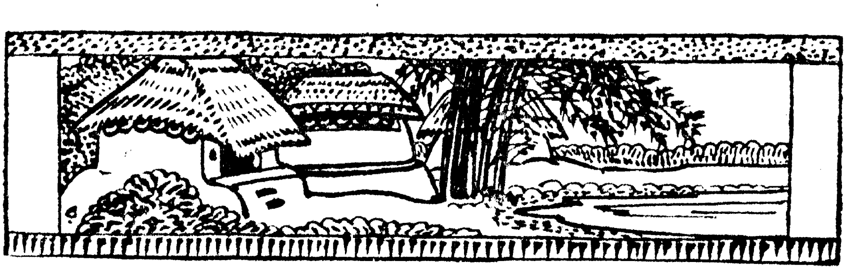
একে আমার মনের এই রকম অবস্থা তাহার উপর [illegible] এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহা সে শুনিল না। কেবলই প্রশ্ন করে রান্না কিরূপ হইয়াছিল, কোন আইটেম কি পরিমাণ খাইয়াছি ইত্যাদি। যখন সে শুনিল যে সন্দেশ মোটে একটা খাইয়াছি তখন রীতিমত ভুতো আমার উপর চটিয়া উঠিল, যেন ঘোরতর এক অন্যায় কাজ আমি করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে বলিল, তুই ভারী বোকা, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে [illegible] বাজে জিনিস খেয়ে পেট ভরাস। আমি হ'লে তরকারী প্রথমে একটু একটু খেয়ে পেট খালি রেখে দিতুম, শেষকালে মিষ্টি খাবো বলে। আট দশটা সন্দেশ না খেতে পারলে আর নেমন্তন্ন খেয়ে লাভ কি। কচুঘেঁচু ত বাড়িতেই রোজই খাই।

আমি উহার কোন উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে মনের আনন্দে বলিয়া চলিল, হ্যাঁরে কমল কি রকম ছেলেরে? ও ভারী চালাক ছেলে [illegible] আজকাল কি রকম মধুকে জমিয়েছে দেখেছিস—দিনরাত ওর সঙ্গে কি রকম লেগে থাকে। আর মধুটাও তেমনি বোকা—আমি হ'লে—

কমলের চরিত্রের প্রতি এইরূপ ইঙ্গিত করাতে ভুতোর উপর আমার ভীষণ রাগ হইল। বলিলাম, ভুতো চুপ্, ওর সম্বন্ধে কোন কথা আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না।

ভুতো আমার মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিল এবং আমার কাছে আর তাহার বসিয়া থাকিতে সাহস হইল না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল। শুধু যাইবার সময় ক্ষীণকণ্ঠে একটি কথা বলিয়া গেল, তুই আমার ওপর রাগ করলি বটে কিন্তু কমল যে তোকে কি চোখে দেখে তা একদিন বুঝতে পারবি!

আমি কোন রকমে ক্রোধ সংবরণ করিতে করিতে বলিলাম আচ্ছা, তোর চেয়ে কমলকে আমি বেশি চিনি। ক্রমশ



রাজবল হাটের কথা

আমাদের কোন সহযোগী সভাসমিতির উপর বেজায় খাপ্পা হইয়া উঠেছেন, তাঁর বক্তব্য মোটামুটি এই যে, সভাসমিতি যে আন্দাজ হ'চ্ছে, সে অনুপাতে কাজ কিছুই হচ্ছে না : আমরা কিন্তু বলি, সভাসমিতিও একটা কাজ; কোন কাজে কার যোগ্যতা কতখানি এ বিচার না করে এ কাজে সব সময় আমাদের মত সামান্য সাংবাদিককে ধরে যে টানাটানি করা হয় এই যা মুস্কিল : কিন্তু মুস্কিল হইলেও উপায় নেই। আমরা সাংবাদিক : জনসাধারণের সংগে আমাদের যোগ রয়েছে। বলতে গেলে জনসাধারণই হ'ল আমাদের মনিব : এক্ষেত্রে জনসাধারণের পক্ষ থেকে যদি আমাদের নিয়ে টানাটানি চলে, তবে সে আহ্বান আমাদের উপেক্ষা করবার উপায় নেই। রাজবল হাট থেকে, তাই সেখানকার অমূল্য বিদ্যাভূষণ এবং কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতি সভায় সভাপতিত্ব করবার আহ্বান যখন এলো, তখন নিজেকে এ কাজে সম্পূর্ণ অযোগ্য জেনেও সে আহ্বান আমাদিগকে শিরোধার্য করতে হ'লো। বিশেষভাবে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ আমি ছাড়তে পারিনি। তাঁর সংগে আত্মীয়তার বন্ধন অতি নিবিড় ছিল। তিনি তাঁর স্নেহজালে আমাকে বশ করে গেছেন। সুতরাং যাত্রা করতে হ'ল রাজবল হাটে। রাজবল হাট কলকাতা থেকে খুব দূরের পথ নয়, মাত্র ২৫ মাইলের ব্যবধান, মোটর বাসে উঠে দেখি, শুধু আমিই রাজবলহাট-যাত্রী নই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত চলেছেন সেখানে, আর যাচ্ছেন কবি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। এক সভাপতি নয়, এক সংগে তিন সভাপতিকে একত্র গেঁথে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর পাণ্ডাস্বরূপে শ্রীযুক্ত মহাভারত তিবারী মহাশয় আমাদিগকে নিয়ে চলেছেন। হাওড়া থেকে চাঁপাডাঙ্গাগামী মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলযোগে আমরা আঁটপুর ষ্টেশনে গিয়ে নামলাম। আঁটপুর ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থান। জায়গাটার নামের সংগে পরিচয় ছিল; এবার প্রত্যক্ষ দেখে আনন্দ হল। আঁটপুর ষ্টেশনে আমাদের জন্য গরুর গাড়ি প্রস্তুত ছিল। আমরা গরুর গাড়িযোগে হেমচন্দ্র রোড দিয়ে বেলা ১০টার পরে রাজবলহাট গ্রামে গিয়া পৌঁছলাম। গ্রামের কাছে গেলে কদলী বৃক্ষ সজ্জিত তোরণ দ্বার স্মরণ করিয়ে দিল যে গন্তব্যের অভিমুখে আমাদের গতি শেষ হয়েছে; সংগে সংগে শঙ্খ ধ্বনিতে বুঝতে আর কোন বিলম্বের অবসর রইল না যে এখন অবতরণ আবশ্যক। গরুর গাড়ি হতে নামতে গিয়েই দেখি একজন প্রৌঢ় করজোড়ে আমাদের অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর গায়ে কিছুই নাই, পরণে কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত। প্যারীবাবুর নিকট শুনলাম ইঁহারই নাম শ্রীযুক্ত জহরলাল ভড়। নাম আগেই শুনেছিলাম। এবার চাক্ষুষ পরিচয় হ'লো। জহরলাল এ অঞ্চলে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। এমন সেবাব্রতী মহানুভব ব্যক্তি বাঙলাদেশে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এই ভীষণ দুর্দিনে এতদঞ্চলের গরীবদের তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন বলা যায়। রাজবল হাট তাঁতের কাপড়ের ব্যাপারের জন্যে বিখ্যাত। এখনও এখানে পাঁচ ছয় শ তাঁত চলে বলে জানতে পারলাম। জহরলালবাবুর কলকাতায় তাঁতের কাপড়ের কারবার আছে। তাঁতের কারবারে এ গ্রাম এক সময় খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখনও হাওড়ার হাট জমিয়ে রেখেছে এই রাজবল হাটেরই কাপড়। জহরবাবু তাঁতের ব্যবসায়ে অর্থ অর্জন করেছেন; কিন্তু সে অর্থ তার সার্থক হচ্ছে—দেশের সেবায় গ্রামের সেবায় এবং দরিদ্র সাধারণের সেবায়। এ গ্রামের যা কিছু উন্নতিকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সর্বত্র পরিচয় পাওয়া যায় জহরলালবাবুর সাক্ষাৎ অবদানের। গ্রামে ঢুকে আমাদেরও মনে প্রশ্ন উঠেছিল, এ গ্রাম না শহর শুনলাম ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ এসে নাকি বলে গেছেন যে, এটি শহর এবং জহর শহর। সুতরাং এতদিন পরে মানুষের মত মানুষকে দেখা গেল এবং দেখার সংগে সঙ্গে প্রাণের টানও বাড়লো। জহরলাল জোড়হাত করেই রইলেন এবং সেইভাবে গ্রামবাসীদের তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে আমাদের নিয়ে চললেন তাঁর বাড়িতে। বাড়ির দরজায় গিয়ে দেখি আমাদের পদধূলি পাওয়ার জন্যে পথ থেকে সোপান পর্যন্ত বিস্তৃত শুভ্র বস্ত্রের বেড়াজাল পাতা রয়েছে। জুতো হাতে ক'রে আমাদের সে সংকট থেকে উত্তীর্ণ হ'তে হ'লো। কিন্তু দোতলায় গিয়ে পড়তে হ'লো সম্যক সংকটে। জলযোগের অনুযোগ রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের দস্তুরমত অভিযোগ তুলতে হ'লো। দেখা গেল জহরলাল কলকাতার ফলের দোকান উজাড় ক'রে সেখানে হাজির করেছেন। জলযোগের আয়োজনের সঙ্গে সংগেই স্নানান্তে এবার সত্যই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ আরম্ভ। শাকান্নের আয়োজন দেখে বিপাকে পড়তে হ'লো। আস্ত আস্ত রুই, মৃগেল, কাতলার ভর্জিত কনককান্তিকলেবর, আশে পাশে যখন চর্বিত হ'চ্ছিল, তখন সেই শব্দে আমার প্রাণও আনচান ক'রে উঠেছিল; কিন্তু জহরবাবু আমাকে যে অহিংস সংগ্রামে ব্যাপৃত রেখেছেন, তাতে মুখ তুলে তাকাবার অবসর আমার হয়নি—তার হবার উপায়ও ছিল না, তিনি থালার সামনে নিজে পাহারা থেকে সংগ্রামে আমাকে সম্মুখীন করছিলেন। এ অবস্থায় আমার সতীর্থদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমার ছিল না। তবে তাঁরা যেভাবে হাঁপিয়ে এসে উপরে গড়িয়ে পড়লেন তাতেই বুঝতে বাকী থাকলো না যে তাঁরা যথেষ্ট রকমই নাজেহাল হ'য়েছেন।

অপরাহ্নে আরম্ভ হ'লো গ্রাম পরিক্রমার পালা। প্রথমে হেমচন্দ্র পাঠাগার এবং অমূল্য প্রত্নতত্ত্বশালা আমরা পরিদর্শন করলুম। পাঠাগার বেশ বড়ই বলতে হয়। সদস্য সংখ্যাও আশাপ্রদ বিশেষত্ব এই যে ছেলেদের উপযুক্ত ভালো বইয়ের দিকে এদের যথেষ্ট দৃষ্টি আছে এবং যা তা বই তাদের পড়তে দেওয়া হয় না। এ ছাড়া পাঠাগারের সংলগ্ন একটি নৈশ বিদ্যালয় আছে। সেখানে দিনের বেলায় যাহাদের লেখাপড়া করবার সুযোগ হয় না, গ্রামের এমন সব শ্রমিক এবং কৃষক পরিবারের ছেলেদের অবৈতনিকভাবে লেখাপড়া শিখানো হয়ে থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হ'লো এখানকার অমূল্য প্রত্নতত্ত্বশালা। জহরলালবাবুর সাহচর্য সৌহার্দসূত্রে স্বর্গীয় অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংগে এ গ্রামের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। কলকাতা থেকে তাঁর প্রায়ই এখানে যাতায়াত ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙলাদেশে অন্য কোথাও এ পর্যন্ত কিছু করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই; এত বড় একজন পণ্ডিত এবং সাহিত্য প্রেমিকের স্মৃতির জন্য কিছু করা যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে উচিত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না, আমাদের সকলের স্মরণ যে কর্তব্যটি এ পর্যন্ত উদ্যাপিত হয়নি, রাজবল হাটের গ্রামবাসীরা তা করেছেন। রাজবল হাটের অমূল্য প্রত্নতত্ত্বাগার দেখলে সত্যই আনন্দ হয় এবং মনে এই আশা জেগে যে [illegible] সমিতির মতো অমূল্য প্রত্নতত্ত্বশালাও একদিন বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আহরণ করে বাঙলাদেশের ঐতিহাসিক উপাদানের ভাণ্ডার পূর্ণ করবে। এ অভাব যে কত রয়েছে বলে শেষ করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে এ পর্যন্ত আমরা পরের মুখেই ঝাল খেয়ে চলেছি। নির্ভরযোগ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলা দেশের ইতিহাস এ পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাহায্য নিয়ে এটি হওয়া সম্ভব নয়; কারণ সত্য বাংলার ঐতিহাসিক [illegible] এই রূপের উপর নির্ভরই গেছে। বাঙালীর কুল-

পরিচয়, সংস্কৃতির পরিচয়, আজ রাঢ়দেশের মাটির তলে চাপা পড়ে আছে। কে সেসব উদ্ধার করবে—ব্যাপার তো সোজা নয়; এজন্য অর্থের প্রয়োজন, সামর্থ্যের প্রয়োজন। রাজবল হাটের উৎসাহী কর্মীরা এদিক থেকে যে উদ্যমে ব্রতী হয়েছেন, সেজন্য তাঁরা সমগ্র জাতির ধন্যবাদার্হ। বাঙলা দেশে যাদের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে এ'দের এ কাজে তাঁদের সকল রকমে সাহায্য করা উচিত। বাঙলা সরকারেরও উচিত আর্থিক সাহায্য দিয়ে এদের কাজে সহায়তা করা। এ'রা কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন দেখা গেল, কিন্তু এ কাজে এগিয়ে যেতে হ'লে দেশবাসীর সকলের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই দুটি প্রতিষ্ঠান দেখবার পর আমরা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীরাজবল্লভীর মন্দির দেখতে গেলাম। এখানকার দেবী মূর্তির একটা বিশিষ্টতা দেখা গেল। শক্তি মূর্তি এই বাঙলাদেশেই অনেক রকমের আছে, রাজবল্লভীর মূর্তি এর মধ্যে অসাধারণ রকমের। পরিপূর্ণ যৌবনা গৌরাঙ্গী দেবী কোমরে কাপড় বেঁধে ছোরা কারো বুকে বসাবার মতো তাক করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এক হাতে এই বাঁকানো ছোরা, অপর হাতে পানপাত্র। এই দেবী মূর্তির ভিতর দিয়ে এ অঞ্চলের অতীত ইতিহাসের সংস্কৃতিই যেন মূর্তি ধরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়। রাণী ভবশংকরী এই গ্রামেরই [illegible] পাশে নাকি অসিকরে অশ্ব পৃষ্ঠে পাঠানদের সঙ্গে লড়াই করে, তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন। রায় বাঘিনীর কথা এখনো এখানকার লোকের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যায় এবং রায় বাঘিনী পাড়াও রয়েছে। রাজবল্লভী কি পরাধীন যুগে স্বাধীনতা লাভের জন্য শক্তি সাধনার সেই উদ্দীপনাই বহন করে আনছেন? এরপর সন্ধ্যার পর আমরা স্থানীয় স্কুল দেখেছিলাম। এই স্কুলের খেলার মাঠের মতো এত বড় আর এমন সুন্দর খেলার মাঠ কোনও-খানে দেখিনি; স্কুলের বাড়িও প্রকান্ড এবং দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

বেলা ৪টা আন্দাজ স্থানীয় বাজারে সভার অধিবেশন আরম্ভ হলো। এক সঙ্গে পর পর তিনটি সভা এবং তদুপযোগী প্রস্তাব প্রস্তাবনা বক্তৃতা অভিভাষণ হ'য়ে গেলো। আমি কবিবর হেমচন্দ্র এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাভরে কিছু বললাম; কারণ বেশী কিছু বলবার সময় ছিল না। হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে শুধু এই কথাটাই বললাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্রষ্টা; তিনি ঋষি। ঋষিরা তত্ত্বদর্শী এবং তত্ত্ব সকলে সোজাসুজি ধরতে পারে না; সেজন্য দরকার হয় গুরুর। গুরু তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে নিজের প্রাণশক্তি দিয়ে শিষ্যের চিত্তে উদ্দীপিত ক'রে তোলেন। এর ফলে অ-মূর্তিক তত্ত্ব মন্ত্র মূর্তি ধরে উঠে। রূপ জাগে অন্তরে। রূপ না হ'লে ভাব জাগে না আর ভাব না জমলে সাধনায় নিষ্ঠা জন্মে না। হেমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে আমাদের দীর্ঘ পরাধীনতার জড়ত্ব প্রাপ্ত চিত্তে প্রাণশক্তির দ্বারা রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তাঁর বীর্যময়ী বাণী আমাদের অন্তরের অজ্ঞানতা দূর করে মাতৃ-মন্ত্র সাধনার পথে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই হিসেবে বাঙলাদেশের নবযুগের মাতৃ-সাধনার গুরু বলা যেতে পারে হেম-চন্দ্রকে। এর পর তাঁর কবি-প্রতিভার সম্বন্ধে সামান্য রকমে কিছু বলবার সময় হয়েছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণ হলো এর পরে। তাঁর সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলতে হ'ল। বললাম, প্রকৃত পাণ্ডিত্যের যে আদর্শ, তা মূর্তিমান দেখা যেতো তাঁর মধ্যে। বিদ্যা বিনয় দান করে, এ কথা আমরা শুনেছি; কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মধ্যে তা দেখেছি। বহুশাস্ত্রে, বহু ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সাংবাদিক হিসাবে যখনই কোন তথ্য সম্বন্ধে সমস্যায় পড়েছি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে তার সমাধান পাওয়া গেছে। এ দিক থেকে অনেকে আমারই মত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এমন পাণ্ডিত্য নিয়ে, তিনি অর্থ প্রতিপত্তি লাভ না করতে পারতেন তা নয়; কিন্তু সে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। নিষ্ঠার এই ধর্ম। মা সরস্বতীর যাঁরা নৈষ্ঠিক সন্তান, তাঁদের সারা জগতে যা অবস্থা হ'য়ে থাকে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দারিদ্র্য তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। তাঁর সাহিত্য-সেবা সখের জিনিষ ছিল না; সাহিত্য সাধনাকে তিনি জীবনের আশ্রয়স্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মহীকোষ প্রণয়নের জন্যে তিনি শেষটা প্রাণপাতী পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন, এতেই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। দেশকে তিনি অনেক কিছুই দিয়েছেন, কিন্তু খাঁটি যে দান, সে দানে আপনার হিসাব থাকে না। সে হিসাব ভুলে দিতে হয় এবং সে হিসাব ভুলে যে দান বাইরের হিসাবে তা বড় হ'য়ে উঠবার সুযোগ পায় না। তাতে নিজের ঢক্কানিনাদ থাকে না; কারণ সে জিনিষের প্রয়োজনই থাকে না। বিদ্যাভূষণকে হারিয়ে আমরা এমন একজন বাণী সেবককে হারিয়েছি। বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ যে তাঁর অভাবে কতটা ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে সে কথা বলে শেষ করা যায় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা করবার জন্য আপনারা যে আয়োজন করেছেন, এ জন্যে আপনারা সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আপনাদের এ উদ্যম সার্থক হইলে দেশের একটা বড় অভাব দূর হইবে। তার পর ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অমূল্য প্রত্নশালার বার্ষিক অধিবেশন হলো। ডাক্তার দত্ত রাঢ়ের অতীত গৌরবের কথা বললেন। তিনি বাঙলার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করলেন। অবশেষে কবি শান্তিমোহনের সভাপতিত্বে হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের বার্ষিক সভা হলো। সভাপতি হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে অভিভাষণ লিখে এনেছিলেন। তিনি যখন তা পড়তে লাগলেন, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলো। রাত নয়টার পর এই তিন প্রস্থ সভা ভঙ্গ হল এবং এর পর পুনশ্চ খানা-সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে অন্যদের সেবার অনুগ্রহে আমি সে দৈন্য বিপদ থেকে নিস্তার পেয়ে গেলাম, কিন্তু সতীর্থ অপর দুই সভাপতির অবস্থা সঙ্গীন [illegible] হয়ে দাঁড়ালো। ডাক্তার [illegible] দুটো পর্যন্ত খাটের উপরে বালিশ বুকে ধরে [illegible] কবি সভাপতির অবস্থা তদপেক্ষা অধিক কাহিল; তিনি [illegible] দিকে দাঁড়িয়ে দিয়ে তাপিত অঙ্গ শীতল করছিলেন। কিন্তু তিনটে সভার এমন সাফল্যপূর্ণ অধি-বেশনের পর তিন তিনটে সভাপতি বিনিদ্র রজনীর অর্ধযাম অতিক্রম করে [illegible] আতিথেয়তারই আলোচনায় কাটাতে লাগলেন। রাজবলহাটের সে জ্যোৎস্না এবং সে আতিথেয়তার কথা সবাই অনেক দিন স্মরণ থাকবে; আর আমাদের কানে বাজবে হেমচন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকীর সম্পাদক রাজবলহাটের কবি শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের কবিতার সেই সুর—

"পুণ্যধাম, শৌর্যক্ষেত্র, শিল্পপুরী, কাব্যতীর্থ,
ভেটিবারে এসো গো সুজন!
পথ শ্রান্ত হ'লে ধীরে, কমলদীঘির তীরে
বিশ্রাম লভিও কিছুক্ষণ।
শ্যামল দীঘির জল, তরঙ্গে উচ্ছল,
কুমুদ কমলে কিবা শোভা।
আমাদের গ্রামখানি সকল গ্রামের রাণী
স্বাস্থ্যকর জনমনোলোভা।"

বিপরীত

মালবিকা রায়

সামান্য বচসা অবশেষে তুমুল কলহে পরিণত হইল। আজকাল ইহাই যেন স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিনাশ অফিস হইতে ফিরিয়া খাইতে বসিয়াছিল, মনোরমা নিকটে আসিয়া তিনটি সিনেমার টিকিট বাহির করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "এগুলো কোথা থেকে এলো? সিনেমায় যাওয়া হয়েছিল তাহলে?"

অবিনাশ আকাশ হইতে পড়িল, "কে? কখন গেছলো?"

মুখ নাড়িয়া মনোরমা বলিল "ন্যাকা আর কি আমি গেছলাম কিনা সিনেমা, তাই আমার পকেট থেকে এগুলো বেরোলো না?"

চক্ষু কপালে তুলিয়া অবিনাশ বলিল "আমার পকেট থেকে?"

তেমনিভাবে মনোরমা উত্তর করিল, "না, তোমার পকেট থেকে কেন হবে, আমার পকেট থেকে। বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথা না বললে চলে না নয়? তাই এখন বুঝলুম—এ মাসের মাইনেতে দু টাকা কম কেন? বললে একজনকে ধার দিয়েছো! ছি, ছি, এত মিথ্যে কথা জানো তুমি?"

অবিনাশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ইতস্তত করিয়া বলিল, "[illegible] অনেক করে ধরলো, মানে অফিসের [illegible], কিনা—"

[illegible] মনোরমা বলিল, "[illegible] দুটো টাকা [illegible] দুটো টাকা [illegible] কোথা থেকে শুনি? [illegible] দুটো পয়সা বাঁচাবার জন্য [illegible] [illegible] সাধ্যি!—"

[illegible] অবিনাশ বলিল, "[illegible] ছিল।"

ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত মাথা উঁচু করিয়া মনোরমা চিৎকার করিয়া বলিল "কাপড় দাও দেবে না দাও না দেবে। বাপ তুলবার তুমি কে! আমার বাপ ত তোমার পায়ে ধরতে যায়নি—"

"তবে আমিই বোধ হয় গেছলাম! [illegible]—" বলিয়া অবিনাশ খাবারের থালা ঠেলিয়া জলের গ্লাস হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। [illegible] চার বছরের ছেলেটি এতক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়াইয়াছিল। বাবাকে উঠিতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া কাপড় ধরিয়া আবদার করিয়া বলিল, "বাবা, আমার লজেঞ্চুস!"

বড় ছেলে সুশীল বোধ হয় কাছাকাছিই ছিল, সে আসিয়া বলিল, "বাবা, আমার ড্রইং বুক কি এনেছো? স্যার রোজ বকাবকি করছে—"

অবিনাশ জল পান না করিয়া গ্লাসটা মেঝেতে আছড়াইয়া ফেলিয়া গুম করিয়া ছোট ছেলের পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিল। তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বড় ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিল, "লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রইং বুক! ছেলে আমার নন্দলাল বসু হবে—" আলনা হইতে জামা টানিয়া অবিনাশ হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ছোট ছেলেটা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, গ্লাসটা ঝন ঝন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেলো।

ছোট ছেলেটার পিঠে আরো কয়েকটা কিল বসাইয়া মনোরমা বলিল, "আদুরে গোপাল, আদর করে গেছেন লজেঞ্চুস চাইতে! আর নিবি লজেঞ্চুস!" পলকে প্রলয় ঘটিয়া গেলো। ছেলেটা তারস্বরে চিৎকার করিয়া মাটীতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় ছেলেটি ব্যাপার দেখিয়া দ্রুতপদে পলাইয়া বাঁচিল।

মনোরমা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ছোট ছেলেটার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্রন্দনরত পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইল। ছেলেটার গায়ে হাত বুলাইয়া দুইটি পয়সা ঘুষ দিয়া অনেক মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মনোরমা তাহাকে খেলিতে পাঠাইয়া দিয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া বসিল।

মনটা তাহার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কাজ করিতে আর তখন ইচ্ছা ছিল না। কি এমন কথা সে বলিয়াছে যাহার জন্য অবিনাশ থালা ফেলিয়া গ্লাস ভাঙ্গিয়া ছেলেকে মারিয়া নিজে না খাইয়া বাহির হইয়া গেলো! সে যা বলিয়াছে—সে ত অবিনাশেরই ভালোর জন্য! অবিনাশের সংসারে যাহাতে দুপয়সা বাঁচে তাহার জন্য সে প্রাণপাত করিতেছে, আর সেই অবিনাশ যদি এমন ব্যবহার করে তবে তাহাকে কি বলিতে হয়! দুদুটো টাকা কিছু খোলামকুচি নয়! নিজের কথা ছাড়িয়া দিক সে ত নিজে কখনো সাবান মাখে না, সেণ্ট মাখে না, ভালো কাপড় পর্য্যন্ত পরে না কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো! তাহারা কি অত বোঝে? এই যে বড় ছেলেটা ড্রইং বুকের জন্য কদিন হইতে ঘুনঘুন করিতেছে। এ ত আর সখের কিছু নয়! তাহাকে স্কুলে রীতিমত শাস্তি পাইতে হইতেছে, সেদিকে বাবুর হুঁস নাই। রোজ শুধু আনিতে ভুলিয়া যান। মেজো মেয়েটা একটা কালো ফিতার জন্য কত দিন হইতে আবদার ধরিয়াছে; আজ নয় কাল—বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতেছে। এই ত সেদিন পাশের বাড়ির শেফালী ফেরিওলা ডাকিয়া ৮।১০ টাকার কাপড়-জামা কিনিল। তাহার ছেলেরাও ত বায়না ধরিয়াছিল আর সত্যই তাহাদের ভালো জামা-কাপড় ত কিছুই নাই! কিন্তু কে কি কিনিয়া দিল!

কেন দেয় নাই? দিলে ত দিতে পারিত; কিন্তু অবিনাশের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকায় সে ছেলেমেয়েদের বাবুয়ানি করিতে দিতে পারে না। কিন্তু অবিনাশ সে সব বোঝে কই। বেশ ত! সে চিরকাল বাবুয়ানি করিয়া আসিয়াছে, সিনেমা ত অবিনাশ প্রতিদিনই দেখিত, আজ দুঃখে পড়িয়া বদলাইয়াছে বটে কিন্তু কখনো কোনো সিনেমায় যাইলে এমন কিছু দোষের হয়—মনোরমা কখনো তাহা বলিবে না। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে সঙ্গে লইয়া গেলে কি হইত মনোরমার কথা ত বাদ দাও সেই যে কবে চিত্রায় চণ্ডীদাস আসিয়াছিল তাহার পর সিনেমা দেখা কি—মনোরমা ত ভুলিয়াই গেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর মনেও ত সাধ হয় দেখিতে! আর তাহাদের সাধ না পুরাইতে পারিলে মনোরমারও কষ্ট হয়। তা বাদ গেলেন কিনা বন্ধুদের লইয়া সিনেমা দেখিতে! তাও আবার ৯ আনার টিকিটে? কেন চার আনায় দেখিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত! সখ ত দেখি ষোল আনা! সৌখীন বন্ধু সব! পরের ঘাড় মুড়াইতে ওস্তাদ। আবার কেমন বন্ধু কে জানে। মেয়েছেলে না বেটা ছেলে তারই বা ঠিক কি! আজকাল ত সবই বন্ধু, সে মেয়েছেলে হোক আর বেটা ছেলে হোক! আর মেয়েছেলে যদি হয় তবে তাহারাও ত বেহায়া কম নয়! পুরুষ মানুষের সঙ্গে গায়ে গা লাগাইয়া সিনেমা না দেখিলে তাহাদের যেন দিন চলে না।—কোন্ আক্কেলে অবিনাশের সঙ্গে সিনেমা দেখিতে গেল তাহারা!

এই সব বন্ধু জুটিয়াছে বলিয়াই ত আর মনোরমাকে ভালো লাগে না। নয়ত যে অবিনাশ আজ গরীবের মেয়ে বলিয়া বেনারসী পরায় খোঁটা দিল, পায়ে ধরিয়া বিবাহ করিবার কথা বলিল, সেই

অবিনাশের বাপ সত্য সত্যই ত একদিন মনোরমার পিতার হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া মনোরমাকে বধূ করিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন। অবিনাশও সেদিন শত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল—মনোরমা ত মনোরমাই বটে!

এখন ত মনোরমা ভাল খাইতে পায় না, ভাল মাখিতে পারে না তথাপি আজও দশজন লোক তাহাকে দেখিলে দুদণ্ড চোখের পাতা ফেলিতে পারিবে না। একদিন অবিনাশেরও তাই অবস্থা ছিল। তখন অবিনাশের জন্য তাহার পায়ে আলতা পরিবার উপায় ছিল না। অবিনাশ তাহার কমল কোরকের মত সুকোমল পদ পল্লবে অলক্তরাগ দেখিলে চুম্বনে চুম্বনে আলতা যেন ধুইয়া লইত! লজ্জায় সংকোচে মনোরমা এতটুকু হইয়া স্বামীর চরণে শত প্রণাম করিয়া এই গুরু পাপের খণ্ডন করিতে চাহিত!

এখন সেই পায়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে বটে হয়তো জলে জলে হাজা ধরিয়াছে, হয়তো যত্নের অভাবে পা ফাটিয়া গেছে, তবু আলতা পরিলে আজও তা সুন্দর লাগে। কিন্তু অবিনাশ কি আর তাহা ফিরিয়া দেখে।

কত দিন সে আলতা পরিয়া থাকিত। কম্পিত বক্ষে সলজ্জ হাসিয়া এমনভাবে পা রাখিয়াছে যাহাতে অবিনাশের তাহা দৃষ্টি-গোচর হয়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, অবিনাশ হয়তো তখন খবরের কাগজ পড়িতে অথবা ছেলেকে পড়াইতে দারুণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনোরমা বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে।

একদিন সত্যই মনোরমার রূপের তুলনা ছিল না। তাহার রং, তাহার চুল, তাহার চোখ, তাহার কণ্ঠস্বর এমন কি তাহার গালের উপর কালো তিলটি পর্যন্ত অবিনাশের কাছে অমূল্য সম্পদ ছিল। এই গায়ের তিল লইয়া অবিনাশ কত কবিতা রচনা করিয়াছে, কত কবিতা পড়িয়াছে—সে সব মনোরমার বিশেষ কিছু মনে নাই; তবুও কিছু কিছু আছে বই কি। একটা কবিতা অবিনাশ প্রায়ই বলিত:—

"ইরানের সেই রূপসী তরুণী বেদরদী
যদি কোন দিন দরদ বোঝে এ সুখ হারায়
লাল সে গালের কালো তিলটির বদলে গো
দিয়ে দিতে পারি সমরখন্দ ও বুখারার।"

সে সব দিন গত হইয়াছে। এখন গালের সে লালিমা হয়তো মুছিয়া গিয়াছে, তিলের সে কৃষ্ণতা হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু মন ত এখনো তেমনি সরস রহিয়াছে। সে ত আজও এ সব শুনিতে চায়—হয়তো পূর্বের চেয়ে বেশী করিয়াই শুনিতে চায়—আজকার সত্যকার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া! কিন্তু অবিনাশের মন যে শুকাইয়া গিয়াছে!

আর অবিনাশেরই-বা দোষ কি! তখন মাথার উপর বাবা বাঁচিয়াছিলেন, সংসারের অভাব কি অবিনাশ তাহা জানিতে পারে নাই। এখন পোষ্য বাড়িতেছে, জিনিস দুর্মূল্য হইতেছে—চতুর্দিকে সামঞ্জস্য করিবার জন্য সারা দিনের মধ্যে অবিনাশের এতটুকু বিশ্রামের অবকাশ নাই।

সকালে উঠিয়াই সে টিউসনিতে বাহির হইয়া যায়। দশটায় বাড়ি ফিরিয়া ভাত খাইয়া না-খাইয়া ছোটে অফিসে। আবার সেখান হইতে ফিরিয়া কোন রকমে কিছু জল খাইয়া আবার ছেলে পড়াইতে যায়। বাড়ি ফেরে রাত দশটার পর। সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীর তখন যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতে চায়। অথচ এত পরিশ্রমের উপযুক্ত ভালো-মন্দ খাবারই বা কি পায়!

এই ত আজ সকালে ঠিকার ঝি আসে নাই বলিয়া একা হাতে মনোরমার সব কাজ করিতে অফিসের বেলা হইয়া গেলো। শুধু আলু ভাতে ভাত খাইয়া অবিনাশ অফিস করিতে গেলো। আর বিকালে ফিরিয়া আসিয়া ত এমন কাণ্ড হইল যে অবিনাশ না খাইয়াই উঠিয়া পড়িল। খাইতে বসিবার সময় ও সব কথা না বলিলেও হইত। এমনই-বা কি দোষ করিয়াছে সে সিনেমা দেখিতে গিয়া! মানুষের প্রাণে ত সখ আহ্লাদও আছে। বিশেষ করিয়া—যে চিরজীবন সুখে কাটাইয়াছে তাহার!

তবে তাহাকেও ত সংসারের নানা দিক চিন্তা করিয়াই এত সব বলিতে হয়! অবিনাশও তেমনি! সিনেমার টিকিটগুলো রাস্তায় ফেলিয়া দিলেই পারিত! তা নয়, পকেটে ঢুকাইয়া রাখিতে কে যেন মাথার দিব্য দিয়াছিল। ভুলিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। তবে মনোরমাকে ফাঁকি দিবার প্যাঁচালো বুদ্ধি অবিনাশের এখন পর্যন্ত হয় নাই। না, না—বেচারীকে এত কথা বলা তাহার ঠিক হয় নাই। আজ সারাদিন লোকটার খাওয়াই হইল না।

মনোরমার মনটা চঞ্চল হইয়া পড়িল। অবিনাশের মনের মতো রান্না করিবার এখনও অনেক সময় আছে। বেচারী চিরকালই ভালো মন্দ খাইতে ভালবাসে কিন্তু পয়সার অভাবে প্রায়ই কিছু হইয়া ওঠে না। একজনের মতো করিলে ত হইবে না। ছেলেমেয়েগুলো মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। পয়সা জমাইয়া আর সে কি করিবে! একদিকে না একদিকে ত বাহির হইয়া যাইবেই!

নিজের পুঁজি হইতে মনোরমা আজ কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া আনিল। আজ সে মাংস রাঁধিবে, লুচি ভাজিবে—দোকান হইতে রাবড়ী আনাইবে। অবিনাশ ভালবাসে নূতন গুড়ের সন্দেশ ও রাঙা আলুর পিঠা, তাহাও সে নিজ হাতে তৈয়ারী করিবে।

নূতন উৎসাহে মনোরমা মনের অবসাদ ঝাড়িয়া কর্মস্রোতে গা ঢালিয়া দিল। অবিনাশের মনের মতো রান্না রাঁধিয়া, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, মনোরমা গা ধুইতে গেলো। ছেলেমেয়েদের পরিতৃপ্ত মন দেখিয়া মনোরমার মন তৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অবিনাশের এমনি তৃপ্ত মুখ দেখিতে পাইলে তাহার সকল শ্রম সার্থক হয়। বহুদিন পরে মনোরমা সাবান মাখিয়া গা ধুইয়া আসিল। অবিন্যস্ত চুল পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া মুখ মুছিয়া সিঁদুরের টিপ পরিয়া তাহার মনে হইল বটে চেহারা ত এমন কিছু খারাপ হয় নাই তবে যে কেন অবিনাশের মনে ধরে না! মনোরমার একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

আজ সে অবিনাশের মনের মতো সাজিবে। পরনের অর্ধ-মলিন কাপড় ছাড়িয়া সে বাক্স খুলিয়া একটি বাসন্তী রং-এর সাড়ী পরিল। পুরানো দিনের মতো চোখের কোণে সুরমা লাগাইতে ইচ্ছা হইল কিন্তু লজ্জায় পারিল না। পা ধুইয়া আলতা পরিয়া এক খিলি পান মুখে দিয়া 'অবিনাশের প্রতীক্ষায় আগেকার মত আজ সে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া আসিয়া বসিল।

অবিনাশের খাবার সে সযত্নে ঢাকা দিয়া আসন পাতিয়া রাখিয়াছে। নিজের খাবারও ঢাকা আছে। অবিনাশের খাওয়া হইলে তবে সে খাইবে। বেচারী অবিনাশ! সারাদিন না খাইয়া সেই কখন ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়াছে এখন ফিরিল না। রাত্রি অনেক হইয়াছিল। মনোরমার কর্মক্লান্ত নয়নে কখন যে নিদ্রা ঘনাইয়া আসিল তাহা সে জানিতেই পারিল না।

ক্রুদ্ধ অবিনাশ যখন মুখের গ্রাস ফেলিয়া রাস্তায় হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল তখন ক্ষুধায় ও রাগে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছে। এই ত সংসার, এই ত তাহার রূপ। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সে বাড়ি আসিল একটু শান্তি—একটু বিশ্রামের জন্য, কিন্তু কোথায় বা শান্তি আর কোথায় বা বিশ্রাম! সংসার অমনি সহস্র হাত বাহির করিয়া নিজের দাবী মিটাইতে বসিল। শুধু 'দাও দাও' শব্দ করিয়া স্ত্রী-পুত্র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অথচ ইহাদের সুখ-সুবিধার জন্য সে বুকের রক্ত জল করিয়া ফেলিতেছে। কি হইবে এমন সংসারে থাকিয়া! স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, ভালবাসা নাই শুধু চাই আর চাই।

সিনেমায় যাইবে না ত কি করিবে সে? ঘরে তাহার মন বসিবে কি করিয়া! ঘরে সে যেটুকু সময় থাকিবে সেটুকু সময় মনোরমা ছোট ছেলের পেট ব্যথা, মেজো মেয়ের সর্দি, বড় মেয়ের কাপড় নাই, ঠিকা ঝির বাজারের পয়সা চুরি অথবা—এ নাই, ওটা আনিতে হবে, সেটা আনো নাই কেন ইত্যাদি ছাড়া ত আর কোন কথা বলিবে না।

সত্য বটে মনোরমা সংসারের দু' পয়সা বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ খাটিতেছে নিজের শরীরকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করে না। মনোরমার মতো অল্প খরচে এমন সচ্ছলভাবে সংসার চালাইতে খুব অল্প মেয়েই পারিবে। মনোরমা সুগৃহিণী বটে, কিন্তু সংসারের সুগৃহিণীর যেমন প্রয়োজন, প্রেয়সী নারীর কি ঠিক তেমনই প্রয়োজন নাই? সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর যখন সে কর্মক্লান্ত দেহ লইয়া বাড়ি ফেরে তখন তাহার মন চায় প্রেয়সী মনোরমা পুরানো দিনের মতো একটি বাসন্তী রঙের সাড়ি পরিয়া কালো কেশপাশে রজনীগন্ধার গুচ্ছ গুঁজিয়া, রক্তিম অধরে মধুর হাসি লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক।

মনোরমা আসে কিন্তু অর্ধ মলিন বসনে, অবিন্যস্ত কেশে মুখে অনর্গল অভিযোগ ও তিরস্কারের বাণী লইয়া। তখন অবিনাশের মন শুধু পালাই পালাই ডাক ছাড়ে, আগেকার কোন মাধুর্যই মনোরমার মধ্যে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোথায় সে সুমধুর হাসি, কোথায় সে উচ্ছ্বাস, কোথায় সেই অকারণ নানা প্রিয় সম্বোধন!

তাই ত এখন মনোরমাকে দেখিলেই তাহার ভয় হয়। হয় তো সে জাগিয়া বিছানায় শুইয়া আছে, মনোরমার পদশব্দ পাইবামাত্র ঘুমের ভান করে। হয় তো এই নিশীথ রাত্রে সংসারের কি অভাব কি অভিযোগের ফিরিস্তি বাহির করিয়া বসিবে! বাড়ি ফিরিয়া মনোরমাকে নিদ্রিত দেখিলে তাহার মন আপনা হইতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু মনোরমাকেই—বা দোষ দেওয়া যায় কি করিয়া। বেচারী সংসারের পিছনে খাটিয়া খাটিয়া ত হাড়মাস কালি করিয়া ফেলিল। মনোরমার অত রূপ শুধু এত পরিশ্রমেই ত ম্লান হইয়া গিয়াছে। মনোরমা যদি এমনভাবে সংসার চালাইতে না পারিত তাহা হইলে এত অল্প আয়ে কলিকাতা শহরে এতগুলি পোষ্য লইয়া বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। কোথা হইতে কি আসে কোথা হইতে কি হয়—মনোরমা কোন দিন তাহার গায়ে আঁচ লাগিতে দেয় না। বেচারীকে যে কতদিক সামলাইতে হয় তাহার ঠিক নাই। ইহাতে যদি মাঝে মাঝে তাহার মাথা মেজাজ খারাপ হইয়া যায় সেজন্য অবিনাশের রাগ করা সাজে না। সিনেমা যাওয়া লইয়া তাহার এত বিরক্তি প্রকাশ করা ও এত রাগ করা উচিত হয় নাই। বেনারসী পরার খোঁটাও তাহার দেওয়া ঠিক হয় নাই। সে গরীবের মেয়ে বটে কিন্তু একমাত্র সন্তান বলিয়া চিরকাল সে ভালো কাপড়ই পরিয়া আসিয়াছে; এখন সংসারের অভাবের জন্য তাহাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাপড়ই পরিতে হয়। স্বামী ছেলেমেয়ে সকলের কুলাইয়া তবে ত পরিবে! না, মনোরমাকে অমন করিয়া বলা ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে।

অবিনাশের মন নরম হইয়া আসিল। প্রতিদিনকার মতো ছাত্রটিকে যখন সে পড়াইয়া বাহির হইল, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। রাস্তায় চলিতে চলিতে কেবল মনোরমার কথাই মনে হইতে লাগিল। মনোরমাকে খুশী করিবার মতো কিছু আজ লইয়া যাইতে হইবে। বেচারী কখন কিছু চাহে নাই। এত রাত্রে কিই-বা পাওয়া যাইবে। একটা ভালো সেণ্ট অথবা সাবান লইয়া গেলে হইত। বড় ছেলের জন্য একটা ড্রইং বুক ও ছোট ছেলের জন্য লজেঞ্চুস ত লইয়া যাওয়া চাই-ই। বেচারীরা আজ মিছিমিছি বকুনী ও মার খাইল।

অবিনাশ আপন মনে পথ চলিতে লাগিল। দূরে একটা ফিরিওয়ালার গলা শুনিতে পাওয়া গেলো—"চাই—ফুল চাই ভালো ফুল চাই—"। অবিনাশ সচকিত হইয়া উঠিল। ঠিক, মনোরমার জন্য আজ সে ফুলই লইয়া যাইবে। দরদস্তুর না করিয়া অবিনাশ দু ছড়া যুঁই ফুলের গোড়ে ও এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা কিনিয়া লইল। অকারণেই অবিনাশের মনটা খুশী হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে অবিনাশ গাহিয়া উঠিল—"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে তুই কি এনেছিস বল"।

অবিনাশ এককালে সুকণ্ঠ ছিল। এখন অনভ্যাসে গলা প্রায় নষ্ট হইয়া গেছে বটে, কিন্তু বহুদিন পরে নিজের গলা যেন নিজের কানেই মধু বর্ষণ করিল। আজ সে সারারাত্রি জাগিয়া মনোরমাকে গান শুনাইবে যেমন শুনাইত আগে। সে মনোরমাকে বলিবে—"সমস্ত সংসার সব তুচ্ছ করিয়া আজ তুমি এসো রাণু, আমার একান্ত হয়ে আমার জীবনে। তোমার ঐ কোমল কর-পল্লবের স্পর্শে দেহ আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠুক। বেজে উঠুক সে সুরে বাঁধা বীণার মতো মীড়ে মূর্ছনায়। ওগো জীবনকুঞ্জের সাকী ওগো প্রিয়া তোমার ঐ দ্রাক্ষারসভরা রক্তিম অধর স্পর্শ কর আমার এই তৃষ্ণার্ত শুষ্ক অধরে ফোটাও ফুল বিকশিত কর দল, সার্থক কর জীবন রূপ-রস-গন্ধে। সব কোলাহল হতে দূরে—এসো আমরা দুজনে মায়ানীড় রচনা করি—এই আধো আলো আধো ছায়া ভরা শ্রাবণের স্নিগ্ধ পূর্ণিমায়; জীবনের সব অবসাদ দূর হয়ে যাক তোমার হাতের স্পর্শে, তোমার চোখের চাওয়া ও তোমার নিঃশ্বাসে—

অবিনাশের ধ্যান ভঙ্গ হইল বাড়ির দরজার সম্মুখে আসিয়া। দরজা দু'পাট হাঁ হাঁ করিতেছে। অবিনাশ বিরক্ত হইয়া উঠিল; কি আক্কেল সব বাড়ির লোকের। এত রাত্রে এমনি করিয়া দরজা খোলা! যদি চোর ঢুকিয়া সর্বস্ব চুরী করিয়া নেয়। আর পাঁচজনের কি তাহারই ত আবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সব কিনিয়া আনিতে হইবে!

অবিনাশ বিরক্তভাবে দরজা বন্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। বাঃ, ঘরেরও ত দরজা খোলা! বারান্দায় মাদুর পাতিয়া মনোরমা ত বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে! অবিনাশ যে সারাদিন না খাইয়া কোথায় গেলো—কি করিল, তাহার জন্য চিন্তা করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই! নিজে খাইয়া পানের রসে ঠোঁট লাল করিয়া সাজিয়া গুজিয়া ঘুমাইতে পারিলেই হইল! বাঃ সংসারের ধর্ম! আর সে তাহাদেরই জন্য ছেলে পড়াইয়া মুখে রক্ত তুলিয়া ট্রামের পয়সা বাঁচাইয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া এত রাতে বাড়ি আসিল।

পূর্বের ভাবাবেগ মিলাইয়া গেল। সম্মুখের ঢাকা খাবার পা দিয়া ঠেলিয়া গায়ের জামাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অবিনাশ বিছানায় শুইয়া পড়িল। ফুলের মালাগুলি জামার পকেট হইতে পড়িয়া ধুলোয় লুটাইতে লাগিল।

ভোরে ঘুম ভাঙিতেই মনোরমার নাকে ঢুকিল যুঁই ও রজনীগন্ধার উগ্র বাসি গন্ধ—মনোরমা চমকাইয়া উঠিল। ফুল আসিল কোথা হইতে? অবিনাশের জামার কাছে ফুল লুটাইতে দেখিয়া মনোরমার চিত্ত বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিল। ও, তাই বাবুর রাত করিয়া বাড়ি আসা হইল! খাবারও ঢাকা রহিয়াছে। খাইয়া আসা হইয়াছিল বোধ হয়। তাহা হইলে কালও বোধ হয় সিনেমায় যাওয়া হইয়াছিল বন্ধু লইয়া! তা না হইলে এত রাত করিবার কারণ কি! আবার ফুলের মালা! ইহাকেই বলে বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ! চরিত্র দোষ তাহা হইলে সত্য সত্যই ঘটিল এতদিনে!

রাগে গম্ গম্ করিতে পা ফেলিয়া মনোরমা নীচে নামিয়া

(শেষাংশ ৫০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চীনা সমাজে নারীর স্থান

পার্ল বাক্



আধুনিক ভূষণে সজ্জিতা চীনা রমণী

চীনে মেয়েরা আজ সাধারণ সৈন্যের ইউনিফরম পরছে এবং সাধারণ সৈন্যের জীবন-যাপন করছে। এটাকে তারা স্বাভাবিক বলেই নির্বিকারভাবে গ্রহণ করছে। যে সকল সৈন্যদের সঙ্গে তারা এগিয়ে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, তাদের ঔদাসীন্যও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এর চাইতে আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এই যে, প্রেম ঘটিত ব্যাপার সেখানে ক্রমশঃই দুর্লভ হয়ে উঠছে এবং স্ত্রীপুরুষ সবাইর মনই আজ যুদ্ধের ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপ্ত হয়ে আছে। আমেরিকার মেয়েদের যখন দেখি, স্বেচ্ছায় সেনাদলের কাজে যোগ দিচ্ছে, পুরুষের মতই ইউনিফরম পরছে এবং আগে কারখানায় যে সকল কাজ পুরুষেরা করত, এখন তা মেয়েরাই করছে, তখন আমার চীনের মেয়েদের কথাই মনে হয়। এ দেশে মেয়েরা যা কিছু করছে, তা নিয়ে বহু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং আলোচনা চলছে—তাও দেখতে পাই। মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশের কাজ ফেলে রেখে নূতন কাজে যোগ দিচ্ছে, এ দেশে এখনও তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। কেন যে এতে লোকে বিস্মিত হয়, তাই আমি ভাবি। এ আমার কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু, প্রাচীন কাল থেকে যারা ঘর নিয়েই ব্যস্ত ছিল, চীনের সে সব মেয়েরা সমরায়োজনে যখন বাইরে আসে, তখন তাদের যতটা আত্মবিশ্বাস দেখতে পাই, তার চাইতে এ দেশের মেয়েদেরই বা কম কেন? অথচ বহুদিন যাবৎ এদেশের মেয়েরা স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকার পেয়ে এসেছে।

পৃথিবীর সকল দেশের বা সকল জাতির যোগ্যতা প্রায় সমান বলেই আমার বিশ্বাস। সে জন্যই আমি একথা স্বীকার করি না যে চীনের মেয়েদের কোন প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

বর্তমান যুদ্ধে তারা যে শ্রেষ্ঠতা দেখাচ্ছে এবং চীন পুরুষেরা স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের যে সমানাধিকার দিয়েছেন, সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থারই সৃষ্টি—পূর্বপরিকল্পিত কোন ব্যাপার এটা নয়।

যে ভাবেই হোক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা চীনা মেয়েদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করবার সুযোগ দিয়েছে। পুরুষেরাও আজ দীর্ঘদিন যাবৎ নারীর এ ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ আছে। ফলে, আজ যখন তারা দেখতে পায় মেয়েরা পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, রাইফেল তুলে ধরছে এবং পুরুষেরই মত অটলভাবে শত্রুনিধন করছে, চীনা পুরুষেরা মোটেই বিস্ময় বোধ করে না। মেয়েদের কাছে তারা এটাই আশা করে।

নিজের কাছে এবং পুরুষের কাছে কিভাবে তারা এ প্রতিষ্ঠা পেল? সমানাধিকার এবং ভোটাধিকারের আন্দোলন না করে তারা এমন এক অবস্থায় এসেছে, যেখানে প্রতীচ্যের মেয়েরা আজও পৌঁছতে পারে নি। চীনা বিপ্লবের দিনে মেয়েরাও বিপ্লবের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত ছিল। ফলে, যেদিন শাসনতন্ত্র রচনা হয়, স্বাভাবিকভাবেই তাকে সমান অধিকার দিতে হয়েছে। পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থার যে-দিন পরিবর্তন হ'ল, স্বাভাবিকভাবে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা এসে গেল। মধ্যযুগ হতে আধুনিক যুগে চীন এক লাফে এগিয়ে এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও প্রাচীন জীবন থেকে আধুনিক জীবনে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রতীচ্যের সামাজিক জীবনে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় এগিয়ে আসতে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, চীনে কদাপি তা প্রয়োজন হয়নি।

চীনা নারীসমাজের এই সাফল্যের মূলে ছিল তাদের সুগভীর আত্মবিশ্বাস। অনুকরণ করে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যায়নি, কেননা, সর্বদাই তাদের মনে এ বিশ্বাস ছিল যে, কারু অনুকরণ করা তাদের সাজে না। আধুনিক যুগ যখন নূতন দাবী নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তারা নির্ভীকভাবে নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করে নিল। কোন কাজে তারা ব্যর্থ হবে, এমন আশঙ্কা তাদের মনে কখনও দেখা দেয় নি।

কিন্তু একথা ঠিক, যে সমাজে তারা জন্ম নিয়েছে, সে সমাজ যদি নারী হিসাবে তাকে যথেষ্ট মূল্য দিত না [illegible] তবে তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হ'ত না। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের এখানে পার্থক্য। চীনা সমাজ নারীকে নারীরূপেই সম্মান করে এসেছে। প্রতীচ্য সমাজে নারীকে রোমান্স এবং ভাবাবেগের মূর্তিমতী বিগ্রহ করে তোলা হয়েছে—কিন্তু ব্যক্তিবিশেষরূপে তাকে শ্রদ্ধা করে নি। ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেরা এই বলে গর্ব করে থাকেন যে, ছেলেপিলে প্রতিপালন করা ছাড়া আর সমস্ত কাজেই পুরুষেরা মেয়েদের চাইতে ভাল পারেন। এমনকি, রান্নাবান্না ও ঘর-সাজানোর কাজেও পুরুষের দক্ষতা বেশী বলে তারা অহংকার করেন। কিন্তু চীনা পুরুষেরা এরকম ছেলেমানুষী গর্ব প্রকাশ [illegible] কদাপি পছন্দ করেন না। চীনা পুরুষেরা মেয়েদের ছাড়া জীবনের কল্পনাই করতে পারেন না [illegible] না। চীনা সমাজ স্ত্রীপুরুষের সহযোগিতার উপরই গড়ে উঠেছে। কোন কোন চীনা পুরুষ [illegible] রান্না [illegible] এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁতে [illegible] পুরুষেরা [illegible] করে থাকে। কিন্তু [illegible] প্রধানত মেয়েদের [illegible] মনে করে না [illegible] এ বিশেষ কাজের জন্যই মেয়েদের কোন নির্দিষ্ট [illegible] হয় না। [illegible] দায়িত্ব তাদেরই উপর। [illegible] পুরুষের পক্ষেও [illegible] না [illegible] লাগে না। চীনা [illegible] এই যে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল [illegible] দিক থেকেও। [illegible] উপর [illegible] চীনা মেয়েরা সমাজে এমন একটি স্থান পেয়েছে, [illegible] পুরুষ সমাজে পুরুষের স্থানেরই সমান কিন্তু দুটো এক জিনিস নয়। পুরুষ থেকে পার্থক্যের মধ্যেই নারীর মূল্য, যেমন পুরুষের মূল্য নারীর থেকে পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত আছে। কেউ কারু থেকে ছোট নয়। নারীর কেউ মর্যাদাহানি [illegible] পুরুষের মত [illegible] না। [illegible] না, তাহলে নারীকে [illegible] জানানো হয়, [illegible] প্রয়োজন, তার চাইতে বেশী কেউ [illegible] নারীকে [illegible] না। স্ত্রীলোক বলে কেউ [illegible] সমাজে উঠে দাঁড়ায় না—[illegible] স্ত্রীলোকেরা সমাজে দাঁড়াবার [illegible] সেখানে আছে। আসলে, চীনা সমাজে নারীও পুরুষের মতই একজন মানুষ। মানুষ হিসাবে তার যে সকল দায়িত্ব আছে, সেগুলি পূরণ করা হল কি না, তা দিয়েই তার বিচার হবে।

বহু শতাব্দী ধরে মেয়েদের প্রতি এ ধরণের ব্যবহারের ফলে সেখানে অতি উন্নত নারীসমাজ গড়ে উঠেছে। স্ত্রীলোক বলে কোন বিশেষ অধিকার তারা চায় না বা বিশেষ অধিকার পাওয়া উচিত, এমন কথা তাদের মনে কখনও উদয় হয় না।

একথা মনে করবার কোনই হেতু নেই যে, সামাজিক জীবনে তাদের কর্তব্যের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র হয়ে আছে। বরং একথাই ঠিক, সমাজে নারীকে এমন বহু বিচিত্র এবং জটিল কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকতে হয় যে, চীনা সমাজ-জীবনের প্রধান দায়িত্ব তাদের উপরই পড়ে আছে। পরিবারকে অবলম্বন করেই চীনের সমাজ প্রধানত গড়ে উঠেছে। এ শুধু সমাজতত্ত্বের দিক থেকে সত্য নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও কথাটা সত্য। সাধারণত একটি চীনা পরিবারের বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠি একত্র বাস করে থাকে এবং কার্যত নারীই এই গোষ্ঠিদলের নেতৃত্বের আসনে বসে আছে। যদিও বাইরের দিক থেকে স্বামীই কর্তা, কিন্তু স্বামীকেও সকল ব্যাপারে স্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলতে হয়। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মেয়েরাই কেনে এবং টাকাকড়ির হিসাবও তারাই রাখে, সংসারের প্রত্যেকটি মানুষের তত্ত্বাবধান বাড়ির গিন্নীই করে থাকেন। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের কাজ তিনি ভাগ করে দেন এবং ছেলেপিলেদের শিক্ষা, বিবাহ এবং পেশা বাড়ির কর্ত্রীই ঠিক করেন। এদিকে পূজা-অর্চনা এবং অন্যান্য দায়িত্বও তার উপরই পড়ে আছে। এ থেকেই বুঝা যায়, বহু শত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে চীনা মেয়েরা সাংসারিক জীবনে সত্যিকার নেতৃত্ব করবার লিপ্সা পেয়েছে। প্রতীচ্যে যেমন জনকয়েক লোক নিয়েই পরিবার গড়ে উঠে, চীনে ঠিক তা নয়। এখানে পরিবার-জীবনে বহু লোকের সমাবেশ, এদের প্রত্যেকের মেজাজ-মর্জিও আলাদা রকমের। এদের সকলকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করাই চীনা নারীদের প্রধান কর্তব্য। পরিবারকে তারা ব্যক্তিবিশেষের সমবায়ে গড়ে-ওঠা একটি দল বলে মনে করে না, জাতির অংশ বলেই মনে করে থাকে। মেয়েরা জানে জাতির জীবনে তারা অপরিহার্য এবং এটাই তাদের আত্মবিশ্বাসের মূল কারণ।

আজ চীনে যুদ্ধের দরুণ বহু পরিবার ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তথাপি নারীসমাজের উপর নূতন কোন দাবী জানালে সর্বদাই তা পূরণে তারা প্রস্তুত আছে এবং নিজের ক্ষমতার উপর পুরাতন বিশ্বাস তাদের অটুট আছে। যুদ্ধের পর আবার শিল্প-জগৎ থেকে নারীকে দূরে করা হবে বলে ইউরোপ এবং আমেরিকার মেয়েরা যে আশঙ্কা করে থাকেন, চীনে তা একেবারেই নেই। সমাজের নেপথ্যে নারীসমাজকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে, এ ভয় চীনা মেয়েরা করে না। তারা জানে, নারীকে কেন্দ্র করেই সমাজে পুরুষ ও নারীর জীবন গড়ে উঠেছে। কৃষিকার্যই ছিল চীনে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, সেখানে স্ত্রীপুরুষে একত্রে কাজ করে এসেছে এবং বিভিন্ন কুটীর-শিল্পও একে অন্যের সাহায্য পেয়েছে।

যুদ্ধের পর চীনে নবযুগের আবির্ভাব ঘটবে। নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠবে এবং ঘরের বাইরেই বহু কাজ আরম্ভ হবে। সে সময় মেয়েদের অদৃষ্টে কি ঘটবে? একথা ভেবে মেয়েরাই আশঙ্কিত নই, কেননা, নারীরূপে অপরিহার্যতার এমন সম্বন্ধে ধারণা তাদের আছে যে, একান্ত পারিবারিক জীবন তাদের ছাড়া যেমন চলতে না, তেমনি ভবিষ্যতে কল-কারখানাও তাদের ছাড়া চলবে না। আজকের [illegible] পুরুষেরা মেয়েদের এমন সহযোগিতাই প্রয়োজনীয় বলে মনে করে থাকে যে, ভবিষ্যতে মেয়েরা না থাকলে ব্যবস্থা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে।

ইউরোপের কাছে এটাই এক বিস্ময়ের বিষয় যে, চীনের বর্তমান গভর্নমেন্টে ভগ্নীরা এত বড় স্থান অধিকার করে আছেন। প্রতীচ্যের মেয়েদের ধারণা যে, ভগ্নীরা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু চীনারা তা মনে করে না। মেয়েদের প্রভাব যে কত বড় হতে পারে এবং সমাজ জীবনে মেয়েরা যে কতটা অংশ গ্রহণ করতে পারে, তা তাদের জানা আছে। কোন নারীর ব্যক্তিগত মতামতের প্রতি যে শ্রদ্ধা চীনে দেখানো হয়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই আমি তা দেখি নি। কেননা, সেখানে পুরুষেরা জানে, মেয়েদের মতামত ছাড়া তাদের মতামতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। মেয়েরাও জানে, নিজেদের মতামতকে একটা সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হলে পুরুষের মতামতেরও প্রয়োজন আছে।

* ওয়ার্ল্ড রিভিউ চীন সংখ্যা হইতে

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, ভূপর্যটক

৮

প্রিটোরিয়ার ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মহাশয় বড়ই ভীতু লোক। আমাকে নিয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভীতু লোকের নানা দোষ থাকে। তারা সৎকর্ম অতি কমই করতে পারে। আমার মত পর্যটককে থাকবার স্থান করে দেওয়াটা তাঁর পক্ষে একটি রাজনৈতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে বসিয়ে রেখেই আমারই সামনে তিনটি ব্যবসা করলেন যার মুনাফা অন্ততঃপক্ষে পাঁচিশ পাউণ্ড হবে। তখন ছিল সকাল বেলা। সকাল বেলায় অতি অল্পই কারবার হয়। যার সকাল বেলায়ই তিনটা কারবারে পাঁচিশ পাউণ্ড রোজগার হয়, তিনি নিশ্চয়ই ধনী এবং ধনীরা যা হয়ে থাকে তিনিও তারই একজন ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না।

আমার কিন্তু দেরী সহ্য হচ্ছিল না। আমি একটু শোবার স্থান পেলেই সুখী হতাম। সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য কয়েকজন মিলে আমাকে একটা স্কুলে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেই স্কুলটি নর্দমার পাশে এবং সকালে যে মুসলমান ছেলেটির দোকানে চা খেয়েছিলাম তারই এক লাইনে অবস্থিত। নর্দমার কাছে থাকবার স্থান পেয়ে আমি মোটেই দুঃখিত হইনি। মনের আনন্দে কয়েকটা দিন বিশ্রাম করতে পারব এই যা ছিল একমাত্র সান্ত্বনা।

স্কুল ঘরটি দেখেই মনে হল এটা একটা অতি নিকৃষ্ট স্থান। মেঝেতে নানারূপ অসৎ চিত্র অংকিত কাগজ পড়ে ছিল সেগুলোর দুর্দশার কথা না বলাই ভাল। ঘরটা ছিল দোতলা। উপরের তলায় তিনটি অর্ধ নিগ্রো পরিবার থাকে। এদের পোষাক এবং শরীরের গঠন দেখলে কেউ বলবে না যে, এরা বাড়ীতে অত্যন্ত নোংরা হয়ে থাকে। কিন্তু এদের ঘরের দুর্গন্ধ আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এরা জানত না কি করে দোতলা ঘরেতে হাঁটতে হয় আর কি করেই বা থাকতে হয়। আমাদের দেশে অনেক ধনীর ছেলে ঘরের মেজেতে অনেক সময় 'কুইক মার্চ' করে থাকেন। বাইরে কিন্তু হাঁটতেই তাদের ভয় হয় কি জানি যদি গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটে। আবার এমন সব শিক্ষিত লোকের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছে যারা সোসিয়েলিজম বেশ বলতে পারেন অথচ সমাজের ক খও জানেন না। এমন কি কি করে দরজার কড়া নাড়তে হয়, কারো বাড়িতে গিয়ে তাকে যে নমস্কার করায় কোন দোষ হয় না সে ধারণাই তাদের নেই, অথচ তারা সমাজতন্ত্রী। আমাদের অর্ধ নিগ্রো পরিবারও সমাজতন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু উপর তলায় যখন 'কুইক মার্চ' করতেন তখন আমার নিদ্রা যাওয়া ত দূরের কথা, একজনের সংগে কথা বলাও কষ্টকর হয়ে উঠত।

দুপুর বেলা একটু শুয়েছিলাম, কিন্তু বেশিক্ষণ আরাম করতে পারিনি। সমাজতন্ত্রীরা ধনীদের যখন সর্বনাশ কামনা করে চীৎকার করে ঘরের মেঝের ওপর কুইক মার্চ করেছিলেন, তখন আমার ঘুম কেন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি কিন্তু বড়ই অভদ্র। কাউকে কিছু না বলে উপরতলায় গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললাম—

"আপনারা কি মার্ক্সবাদ নিয়ে আলোচনা করছেন?"

"হাঁ তাইত ভুল করেছি নাকি?"

"সমূহ ভুল করেছেন মশাই। মার্কস বলেছেন তাঁর বই পড়বার পূর্বে কারো অনিষ্ট না করলে তাঁর বই বুঝা যায় না। কারো অনিষ্ট করেননি কেন?"

লোকগুলি আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি তাদের বললাম নীচে আমি শুয়েছিলাম, আপনাদের গলার আওয়াজে এবং দোতলার ওপর পায়তারা করার ফলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে। গত তিন রাত আমি শুতে পারিনি আজ একটু ঘুমুতে চেয়েছিলাম, দয়া করে একটু ঘুমুতে দেবেন কি?

লোকগুলি লজ্জিত হল এবং তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করে অন্যত্র চলে গিয়ে হয়ত মার্ক্সবাদই আলোচনা করছিল ওদের নাকি ধীরে কথা বলার মোটেই অভ্যাস নেই, তাই যখন বই পড়ে তখনও সকলের দৃষ্টি তাদের বই পড়ার দিকে যেতে বাধ্য হয়।

সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি নিরাপদেই ঘুমাতে সক্ষম হয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর হতে দক্ষিণা বাতাসে যখন নর্দমার দুর্গন্ধ ঘরটার ভেতর ভর্তি হয়ে গিয়েছিল তখন সেই তীব্র দুর্গন্ধ আর সহ্য না করতে পেরে ঘর হতে বের হয়ে যেতে বাধ্য হই। বিকালে এদিক সেদিক ঘুরে আবার প্রেসিডেণ্টের ঘরে আসি এবং তার সংগে সুমধুর বাক্যালাপ হয়। প্রেসিডেণ্ট স্পষ্ট ভাবেই বলেন এদেশে আমাদের কিছুই নেই, আমরা কোনরূপ বিদ্রোহ এখানে করতে পারি না, মহাত্মা গান্ধী যা করে গিয়েছেন তা তাঁরই পক্ষে শোভা পেয়েছিল, অন্য লোক কিছুই করতে পারবে না। মহাত্মা গান্ধী নন-কো-অপারেশন করেছিলেন মজুরদের সাহায্যে। ধনীরা তাদের দোকান পর্যন্ত বন্ধ করেনি সে কথা আমি বেশ ভালভাবেই জানতাম। ধনীরা চায় শুধু নির্বিবাদে টাকা রোজগার। সরকারের বিরুদ্ধে এদের কোন কথা বলার ইচ্ছা নাই। আমি এসব কথা না বলে শুধু বললাম, আপনারা এখানে যেভাবে দিন কাটাচ্ছেন তাতে মনে হয় আপনারা মোটেই সুখে নেই। আপনাদের শহরের পথের ওপর ধূলো কাঁকর পড়ে আছে। পথঘাট পরিষ্কার নেই। আপনাদের দোকানপাট দেশী প্রথায় চলছে। একটু যদি আপনার বদলে যান দেখবেন আপনাদের পথঘাটের চেহারা বদলে গেছে। প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের তা আর সহ্য হলো না। নিকটেই একজন মুসলমান ভদ্রলোক বসেছিলেন; তার বহুরূপী পোষাক এবং দাড়ি গোঁফ দেখলেই মনে হয় তিনি সাহারা মরুভূমির বাসিন্দা। তার শহর সেই সাহারা হতে আরবগণ এনে চলতি পোষাক পরছে। চলতি প্রথা মতে চলছে যার ইউরোপীয়দের সমাজে মিশতে সক্ষম হচ্ছে। তারপর তার পোষাক এবং চালচলন আমি মেনে নিতে পারতাম যদি স্থানটি গরম হতো। এ স্থানটি গরম মোটেই নয় আমাদের দেশের দার্জিলিংএর মতই আবহাওয়া। এখানে আরবি কস্টিউম মোটেই উপযোগী নয়। এই ভদ্রলোককেই সন্তুষ্ট করার জন্য প্রেসিডেণ্ট মহাশয় আমার সংগে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমি বেশিক্ষণ তর্ক করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের যারা সভ্য তারা একেবারে বদলে গেছে। তারাই অনবরত তাদের দাবী ইউনিয়ন গবর্নমেণ্টকে জানাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে হুমকি দিচ্ছে যদি এর পর এই হয়, তবে আমরা আমকটা করব। প্রকৃত পক্ষে ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার কংগ্রেসকে মোটেই ভয় করেন না, ভয় করেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকেই। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ এখনও মেনে চলছে। তাদের ইউনিয়নে সভ্যরা মাত্র এক শিলিং বৎসরে চাঁদা দেয় আর কংগ্রেসের সভ্যেরা দশ শিলিং চাঁদা দেবার অধিকারও সকলে পায় না।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট-এর বাড়ি হতে বিদায় নিয়ে লছমনের হোটেলে এলাম। হোটেল তখন পুরাদমেই চলছিল। লছমনের হোটেলে অনেক ইউরোপীয়রাও খেতে আসে, লছমন তাদের প্রকাশ্য স্থানে খেতে দেয় না। ঘরের মাঝে গোপন স্থানে খেতে দেয়। ইউরোপীয়গণ যখন কোন ইণ্ডিয়ানের কাছে খাদ্য বিক্রয় করে তখন ইণ্ডিয়ানকে প্রকাশ্যে খেতে বসতে দেয় না, যথায় পাক হয় তথায় খেতে দেয় লছমনও তাই করে। লছমনের সংগে অনেকক্ষণ কাটাবার পর ঘরে ফিরে আসব বলে উঠছি এমন সময় লছমন বললে,—

(শেষাংশ ৫০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রতিনিধি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ

মেঘনার বাঁক।

অনেক গাঁয়ের গৈরিক মাটি গায়ে মেখে খরস্রোতা ডাকাতিয়া শহরটার বুক চিরে মেঘনার বাঁকে এসে মিলিয়ে গেছে। নদীর সংগে গাঙের সংগমটা তাই একটু আবর্তমুখর।

স্টেশন ঘরের জালবোনা ত্রিকোণ জানালা দিয়ে অনন্তর শিথিল চোখ দুটো বাঁকের পাশ কেটে সবুজ মাঠের কানায় কানায় উড়তে চায়। পাটকলের কালো চিমনীগুলো ধূসর ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে সারাদিনের মত আগুন খেয়ে নিচ্ছে। আগুন, ফার্নেসে অন্তত দু' হাজার মানুষকে ভস্ম করবার মত আগুন থাকা চাই। বিকট গোঙানি শব্দে পাটকলের মর্নিং সিফ্‌টের বাঁশি বেজে উঠলো। সারা রাত্রির আধজাগা অবসাদ নিয়ে অনন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। টেবিলের নীচে রঙীন কাঁচঘেরা পাইটম্যানী আলোটা তখনো নিম্ নিম্ করে জ্বলছে। কিন্তু অনন্তর চোখ দুটো নিবে আসছে যেন। উড়ন্ত মিয়ানো দৃষ্টি সংযত করে লেংচানো ময়লা কাপড়টা টেনে বাঁধলে সে। তেল-চিট্‌চিটে নীল আস্তীন গা থেকে ঝেড়ে ফেলে অনন্ত আলোটা ফু' দিয়ে নিবিয়ে দিলে।

কাঁচা কোয়ার্টারের পেছনে সুপারি বাগানের আঁধার ফুঁড়ে লাল সূর্যের চোখে আলো তখন বাঁকের তীর ঘেঁষে চিক্ চিক্ করছে। চারদিক ঘিরে মেছোদের ইলিশ-ধরা অগুনতি নৌকা। কয়েকটা বা পাটবোঝাই আধাবোট। তারই ভিড় ঠেলে অনন্ত খেলনা পাড়ি দিলে। চরের দিগন্তে মেঘাটে আকাশ লালে লাল—রঙের ইন্দ্রজাল। ডিঙির উরত ছেপে ছলাত্ ছলাত্ করে ঢেউয়ের নাচন। অনন্ত কষে দাঁড় টেনে চলে।

অনন্তর ডিঙির পাশ বেয়ে আরেকটা ডিঙি। ডিঙির গলুই-এ বসে ডাগুরা মালী ঢাকের মাথায় মাখছে কী?

—ও ডাগুরা, ও মাখছিস কি?

—জল-মেশানো তেল মাখছি। রাত্রে কুণ্ডের বাড়ি ঢাক পিটতে হবে যে! হাঁরে অনন্ত, শুনছি নাকি ঘোষালের যাত্রা হবে? 'বেউলা'?

—শুনেছি ত আমিও। কিন্তু লাভ নেই আমার!

—কেন? পুজোর বাজারে এমন গাহেন—আরে! পাবি কোথা?

—রাত্রে গাড়ির ডিউটি দিতে হবে না! যাবো কেমন করে? অনন্তর চোখে রাত্রির ছায়া নেমে আসে। সুর্মা মেল, চিটাগং মেল, গাড়ির পর গাড়ি এসে অনন্তর লণ্ঠনের নিশান পেয়ে ব্রীজের নীচে দাঁড়াতে লাগলো। ব্রেক-ভ্যানের কাছ থেকে ব্রাউন কাগজ হাতে নিয়ে কংকরময় প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে অনন্ত। বাঁ হাতের খাঁজে দু-রঙা আলোর নিশান। চোখে মারমুখী ঘুম। ঘুম—আধজাগা ঘুম—সে ঘুমের দেশে 'বেউলা' তার মরা স্বামীকে নিয়ে হয়ত ভেলায় ভাসছে। ঘোষালের পাখোয়াজের কিম্তি অনন্তর কানে ক্ষীণ হয়ে বাজে।

অনন্ত নদী থেকে খালে পড়লো এসে।

সামনেই কেন্দুয়ার বিল। এ সেই বিল, যে বিলে জব্বর-বালার ডাকাতি চলতো। চর নিয়ে কোঁদল বাঁধানো, আর তারই ফলে খুনোখুনি, এ নিয়ে জব্বর বালার রাজত্ব। অনন্ত এই বিল পাড়ি দিয়ে রোজ আসে যায়। জব্বর বালাকে সে ভুলেও ভুলতে পারে নি।

বাড়ির কাছে এসে দেখলে সে, গীর্জার ডান দিকের পোড়ো জমিতে আজগর মাঝি ঠেসে কোদাল ঠুকছে। সংগে তার মেয়ে আলেকজান। আজগর মাটি কুপিয়ে ঢেলা ভাঙছে—আর আলেক মাটি ছাড়িয়ে জংলা কুড়িয়ে চুপড়ি ভরে আলের উপর টাল দিচ্ছে। বুড়োর শিরদেশে পাকানো আধপাকা চুলের জটা—মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ। হাড়-বেরকরা বুকের পরিসরে লাল ঘাম জমে আছে। আজগর থেকে থেকে কোদাল ঠুক্‌ছে আর ধুকছে।

অনন্ত বললেঃ একি চাচা, পোড়ো জমিতে কোদাল কেন?

করুণ হেসে আজগর বলেঃ ঐ ত এবার সম্বল, বেটা।

—কেন, পাটকলের—পাট---

—পাটকল থেকে নামিয়ে দিয়েছে। বুড়ো হয়ে গেছি, ওদের কাজ চলে না। বললুম, তবে মেয়েটাকে কাজে লাগাও। তারা রাজী হলো, কিন্তু বেটী আমার রাজী হলো না।

অনন্ত 'হুঁ' বলে একটু দম টেনে নিলো। আলেক চুপড়িটা আ'লে রেখে ছুটে এসে বললেঃ তুমিই বলো না, অনন্তদা পাট-কলের ঐ কুলিগুলোর সংগে নাকি আমি কাজ করতে যাবো? ছিঃ, কতকগুলো অসভ্য জানোয়ার। হে'—বয়ে গেছে আমার! না-খেয়ে মরবো, তবু আমি যাবো না কলের কাজে। ছিঃ ঘেন্না!

অনন্ত কুলির মেয়ের কুলি-বিদ্বেষ দেখে নির্বাক। অনন্তর এই নির্বাক নিরুৎসাহ আলেকজানের মনের আভিজাত্যটা দমিয়ে দিলে। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে আলেক বললেঃ...বা-জান, কোপাও ত!

আজগর বলেঃ বুঝলে, অনন্ত, এই মেয়েটাকে নিয়েই আমার ভাবনা। নইলে দুই কানি ধানের জমিতে কোনমতে কাটিয়ে দিতুম।

মুখ কালি করে আলেক বলেঃ আমি তোমার ফেলনা। আমাকে তাড়িয়ে দিলেই ত আপদ চুকে যায়।

—পাগলি, তাই আমি বলেছি নাকি?

—তবে আমাকে নিয়েই তোমার ভাবনা, একাখেটো অনন্তদাকে ফলাও করে বলছো কেন? আমি কচি খুকী কিনা, বা-জান!

আজগর মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলেঃ কচি হলে ত ভাবনার কিছু ছিলো না রে! ডাগর হয়ে উঠেছিস বলেই না আমার এত চিন্তা, আলেক।

আজগরের কণ্ঠনালী ঠেলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আলেক গায়ের আঁচলটা সামলে নিয়ে হঠাৎ করে অনন্তর হাত দুটো চেপে কেঁদে ওঠেঃ অনন্তদা' দোহাই তোমাদের তোমরা আমাকে পাটকলে পাঠিও না। আমি তোমাকে ভিক্ষে করে খাওয়াবো, বা-জান!

আলেকজানের চোখের কোণে মেঘ ডাকছে। অনন্ত অনর্থক একটা হাসি দিয়ে আবহাওয়াটা হালকা করে বললেঃ চাচা ভেবে আর করবে কি। রাত জেগে কুড়ি টাকা করছি বটে কামাই, কিন্তু, দাদা নাতী দু'জনের মামলাই মিটছে না। গণ্ডাদুয়েক ধানী জমি ছিলো, তা-ও গেছে পাঁচকড়ি মোড়লের হাতে। যাক্ সেকে নাও। ভেবোনা কিছু, আমি থাকি ত তোমাদেরও উপোস রাখবো না।

আজগর চোখবুজে গীর্জার পানে মুখ রেখে মাটিতে হাঁটু গাড়লো। তার মুখে দুঃখের ছায়া বড় সুন্দর হয়ে ফুটে উঠলো। আলেকজান বা-জানের অনুকরণ করে অনন্তর চোটে দাপট দিয়ে বললেঃ হাঁ অনন্তদা, তোমাদের ঐ ডাগুরাটা কেমন লোক বলো ত?

—কেন?

—না, তেমন কিছু নয়। তবে তাকে বলে দিও, তার কেরামতী ফাস করে যীশুর নামে উচ্ছন্ন করবো—হাঁ, তেমন মায়ের মেয়ে আমি!

অনন্তর গলা বেয়ে যেন একটা আফিঙের সাপ কিলবিল করে উঠলো। গলায় খেক্‌ড়ি কেটে বললেঃ কেন, বদমায়েসটা করেছে কী?

—যেতে আসতে চোখ ঠারে আর শিস্ দেয়। সেদিন বিলে সাপলা তুলতে গিয়েছিলাম, আমার হাত ধরে বলে কিনা—না থাক, বলতে পারবো না। কিন্তু তুমি মালীর পোকে সামলে দিও—হেঁ'!

অনন্ত ফুলে যেন দু'মন ভারী হয়ে গেছে এতক্ষণে। তার নাকের ডগায় কে যেন মরিচ মেখে দিয়েছে—রাগে ছন্ ছন্ করে উঠলো অনন্ত। আজগর মাঝি ভীত কণ্ঠে বললেঃ দেখলে ত, অনন্ত, কি ভাবনায় দিন কাট্ছে আমার?

আজগর আবার হাঁটু ভাঙলে।

আট হাত পাছাপেড়ে শাড়িতে আলেকের কুলোয় না। তবু টেনে টুনে তাই দিয়ে বাড়ন্ত দেহের আনাচ কানাচ সামলে নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলো সে। আজগর এবার কোদাল তুলে মাটি ভাঙার কাজে লেগে গেল। অনন্ত তীব্র দৃষ্টিতে আলেকজানের সারা দেহে একবার চোখ বুলিয়ে লগির গোড়ায় নৌকাটা বেঁধে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

আলেকজান অবশ—চুপড়ি তুলে জংলা বাছবার শক্তি আর যেন তার নেই। প্রতিটি লোম-কূপে তার স্বেদ-কণা দেখা দিলে। চুপড়িটা পাশের ঝোপে ফেলে দিয়ে বললেঃ বা-জান, হাঁড়ি চড়াবার বেলা হলো। বাড়ি যাই, ওবেলা আবার—কেমন?

—আচ্ছা।

আজগর আবার কাজে মন দেয়।

রাত গড়িয়ে ভোর হলো। অনন্ত সবে মাত্র আলোটা নিবিয়ে স্টেশন ঘরের সামনে স্কেলটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ড্যাঙরাকে পেছনের সাইডিং লাইনের উপর দিয়ে যেতে দেখা গেল। ড্যাঙরা গুণ গুণ করে তখনো বেউলার সুর ভাঁজছেঃ

"লোহার চাউলে অন্ন হইয়া যদি মিলে কাই,
তবে ত জানিবা পথে কোন বিঘ্ন নাই—
—আহা, কোন বিঘ্ন নাই।"

অনন্ত তাকে দেখে ক্ষেপে উঠলো। একে ত তার যাত্রা শুনতে যাওয়া হয়নি, তায় আলেক্‌জানের সেই নালিশ—আঃ!

—ড্যাঙরা, ও ড্যাঙরা!

—কেন রে, চেঁচাচ্ছিস কেন?

ড্যাঙরা আধ-পোড়া বিড়িটা অনন্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে দাঁত কেলিয়ে বললে ঃ মাইরি অন্তা, এমন গাহেন জন্মে শুনিনি। উঃ, কাঁদিয়ে ছাড়লে!

বলে ড্যাঙরা কান্নার অভিনয় করলে।

ড্যাঙরার হাত থেকে বিড়িটা টেনে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কুটিল চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে অনন্ত ঃ বটে! আলেক-জানকে নিয়ে গেলিনে কেন?

—আলেক! নবাবজাদী আমার সঙ্গে যাবে কেন? নবাবপুত্তুর না হলে ঐ ডাঁসেল মাগীর মন ওঠে না। বলে কিনা, ভুঁইমালীর ঘর মানুষে করে না! ওঃ, সেখের বেটি খেতে পাসনি বলে জাত খুইয়ে ত খীষ্টেন হয়েছিস—তায় আবার জাতধম্ম! দেবো এক সময় জাতধম্ম দেখিয়ে—সুযোগ পাইনে, এই যা, নইলে—

—নইলে?

—মাইরী অন্তা, আলেকজান ঠাসা মাল। জান যায় তাও রাজী, লেকিন উসকো হাম একদফে দেখ লেগা।

অনন্ত নির্বাক।

ড্যাঙরা অসহ্য আগ্রহে আবার বললে ঃ শুদ্দুরের ছেলে তুই, তোর আর জাতধম্ম কি? সব ঠিক আছে—চল, আজ রাত্রেই একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্। অন্তা, মাইরি!

ড্যাঙরা কাঁপছে—ড্যাঙরার ঠোঁট বেয়ে লালা ঝরছে। চার-দিকে এক পলক দৃষ্টি ঘুরিয়ে অনন্ত অতর্কিত ক্ষিপ্রবেগে ড্যাঙরার কানের পাশটায় প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে হিংস্র নিঃশ্বাসে বললে ঃ যা, এবার ঠেসে চেষ্টা করগে, যা।

ড্যাঙরা লাগেজ-মাপা স্কেলটার উপর উবু হয়ে পৃথিবীর গোলাকারত্ব অনুভব করতে লাগলো আর বেদম ফোঁপাতে লাগলো।

অনন্ত আবার গর্জন করে উঠলো ঃ গীর্জার কাছাকাছি আবার গেছিস ত তোকে কেল্লা নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। লুচ্চা, পাজি, পাষণ্ড কাঁহাকে!

কুণ্ডের বাড়ির নাটমন্দিরে বিজয়ার সানাই করুণ সুরে বেজে উঠলো। এদিকে ফেণী-এক্সপ্রেস ব্রীজের নীচে দাঁড়িয়ে হুইসিল দিচ্ছে। অনন্ত লাল-সবুজ নিশান দুটো হাতে নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো।

স্টেশনঘরের সামনাটা মায় প্ল্যাটফর্মটা পর্যন্ত ড্যাঙরার চোখে ঝাপসা হয়ে দেখা দিলে।

এলো চৈত্র মাস।

আতপ্ত ঝাঁঝালো রোদে কেন্দুয়ার বিল খর খরে পাণ্ডুর। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, বাতাসে ভয়াল উষ্ণতা—দুনিয়াটা যেন নিরস নির্জল। মাঠ পাত্ শুকিয়ে চৌচির হয়েছে—লাঙল বসে না, কোদাল ঠুকতে গেলে ঠন্ করে ফিরে আসে। মেঘনার দুই তীরে হাহাকার হাহা রব।

তেলহীন শুকনো জটায় আঙুল ঢুকিয়ে আজগর বলে ঃ বেটা, এতদিন তোর চাকরীটা ছিলো, আমাদেরও বাঁচিয়ে রেখেছিলি, নিজেদের মুখেও শাক-ভাত দিয়েছিলি। কিন্তু এবার?

অনন্ত নির্বাক। অনন্ত নির্বিকার।

—বাপের বাপ ঠাকুর্দাকেও খুন করতে বসেছিস। ঐ মেয়েটাকেই বা বাঁচাই কি করে? কত বললুম, বেটা, ড্যাঙরাকে ক্ষেপাসনি। ও বেটা জাতি-সাপের বাচ্চা—কেমন নিজে ত বিষ ঝেড়ে চাকরীটা খতম করে! অনন্ত তোর আম্বাঁন গায়ে দিয়ে হতভাগা আজ তোরই নিশান নিয়ে পাইটম্যানী করছে! ওঃ, নচ্ছারী মেয়েটাই সব ডোবালো! সব ডোবালো! বলতে বলতে বৃদ্ধের কপালের শিরা উপশিরা স্ফীত হয়ে উঠলো। নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে আজগর খুপড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

খুপড়ির বাইরে ছাঁচে বসে আলেকজান তার পরনের শতচ্ছিন্ন ময়নামতীর আঁচলটা সেলাই করছিল। আঁচলটা গায়ে জড়িয়েই আলেক অনন্তর সামনে এসে ধুপ করে মাটিতে বসে পড়ে বললে ঃ এ ন্যাত পরে সরকারদের দিঘীতে আর যে জল আনতে যেতে পারিনে, অনন্তদা।

—নদীর ঘাট থেকে আনলেই পারিস?

—বা-রে নদীর পথে ড্যাঙরার বাড়ি—আমি যাই কি করে?

—তবে জল না খেয়ে মর না! ড্যাঙরা ড্যাঙরা করিসনি তুই, আলেক! তোর ড্যাঙরার সঙ্গে বুঝতে গিয়েই ত সব খুইয়েছি। তোর ড্যাঙরাকে নিয়ে তুই চুলোয় যা না, তাতে আমার কি? ওঃ, হায় হায় হায়, আমি করেছি কি! ন্যাত্‌তা পরে বেরোনো যায় না—ভাগ্!

আলেক চোখে অন্ধকার দেখলো। বলে কী অনন্ত? কিন্তু সেও আজ তেমনি ভিরিক্ষি—সারাদিন পেটে ভাতের দানাটি যায়নি, তায় এত?

বিদ্রুপের সুরে বললে আলেক ঃ ওরে আমার চাঁদরে মেয়ে-মানুষের গা ঢাকবার মত এক টুকরা কাপড় জোটাতে পারবিনে ত মেয়েমানুষের গায়ের গন্ধ শুঁকতে আসা কেন? সে সময় হুঁস থাকে না? ভাগ্!

কিন্তু মনের রোষটা আলেক সামলাতে পারলো না। দরজার বাঁশে ঠেকানো হোগলাটার উপর হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়লো সে। সে কাঁদছে, সে কাঁদছে—আলেক আজ সারা দেহমনে কাঁদছে।

বিমূঢ় অনন্ত ডাকলে ঃ আলেক!

কোনো সাড়া নেই—আলেক কাঁদছে।

অনন্ত কঠিন হাতে আলেকজানকে মাটি থেকে তুলে এনে তার চিবুক ছুঁয়ে ডাকলে ঃ আলেক!

সন্ধ্যার অন্ধকার খুপড়ির চারদিক চেপে এসেছে। অন্ধকার

বড় কুৎসিত, বড় সুন্দর অন্ধকার। নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া খুপড়ির অন্ধকার, বড় বিদঘুটে, বড় মধুর।

সেদিন চৈত্র সন্ধ্যা এমনি করেই মিলিয়ে গেল।

এলো শ্রাবণ—এলো ভরপুর বর্ষা।

কেন্দুয়ার বিল জলে জলাকার। মাঝে মাঝে ধান ক্ষেত পাটের ত অন্ত নেই, কিন্তু সব জলের কানায় কানায়। আউস ধান মারা গেছে আষাঢ়ের ঢলে, পাটের মাথাও থুবড়ে গেছে বোশেখ-জ্যৈষ্ঠের রোদ খেয়ে খেয়ে। পউস ধান আসবে অঘ্রাণের মাঝামাঝি। ঘর থেকে বেরোবার জো নেই—শুধু জল, মেঘনার কালো জল।

আসন্ন আতঙ্কে কেন্দুয়ার বাড়িঘর কাঁপছে—অনাহার, অর্ধাহার! আজগরকে আর চেনা যায় না। অনশনে চোখের তারা গর্তে ঢুকেছে। সারা দেহে রক্তবাহী শিরাগুলি যেন নীল-রঙা পাকানো দড়ির মত দেখাচ্ছে।

লাল আঙুরে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দিতে দিতে আজগর বললে: দাদাকে বিদেয় করেছিস না-খাইয়ে। দেখলি, বেটা, চাচা কিন্তু তোর এখনো খাড়া আছে। হেঁ হেঁ—এখনো খাড়া আছে।

অনন্ত পান্ডুর মুখে হাসি এনে বলে: হাঁ, এখনো তুমি [illegible] পারো নি। কিন্তু এবার বুঝি [illegible] ফুরালো, চাচা।

—কেন?

—[illegible]

—[illegible]

—[illegible]

[illegible] নেই।

[illegible] অনন্ত [illegible] তুই [illegible] উপরেই [illegible] আমার [illegible] সুখ নেই, অনন্ত।

আজগর [illegible] মাথা নত করলে।

সারা রাত্রি [illegible] করলো। মেঘনার [illegible] চায়। আজগরের [illegible] খুপড়ির [illegible] বিদঘুটে [illegible] ফুটুক ফাটুক করে নানান জাতের ছোট ছোট মাছ নদী থেকে উঠে আসে।

খুপড়ির মাচানে মাথা ঠেকিয়ে মাটিতে [illegible] বসে আছে আলেকজান, চোখভরা জল, মুখভরা আকুল অশান্তি। দুদিন সে ঠায় বসে আছে, ভাতের দানা চোখে পড়েনি। বিকট হিংস্র ক্ষুধা তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলছে। ঘরে আছে বরফের কলের জল আর আছে বুকজোড়া প্রচণ্ড হাহাকার—

ময়নামতীর জালি আঁচলটা জড়িয়ে আলেকজান খুপড়ির সেঁতানো মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু আজগর কোথায়? আজগর মাঝি?

ডিঙিটা পুকুরঘাটে বেঁধে রেখে আঙিনার দিকে থামতে থামতে বয়ে আসছে অনন্ত—কাপড়ের খুঁটে বাঁধা সের দেড়েক মোটা চাল, হাতে গোটা দুই লাল আলু।

—আলেক! আলেকজান! আজগর চাচা?

কোন সাড়া শব্দ নেই—শুধু ব্যর্থ প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।

খুপড়ির দোর বন্ধ। অনন্ত ভাঙা বেড়ার ফাঁকে চোখ বসিয়ে দেখলে খুপড়ির অন্ধকারে ময়নামতীর আঁচলে আধ-মোড়া দেহটাকে ঢাকবার জন্য আলেক বাঁশ-কপাটীর বাঁশ থেকে ছেঁড়া হোগলাটা টানছে। ছিন্ন শাড়ির বাঁধন ফুঁড়ে আলেকের উপোসী যৌবন বিস্ফারিত হতে চায়—অনন্ত সারা দেহে শিউরে উঠলো। পায়ের তলায় ভিজে পৃথিবীটা যেন মুহূর্তের মধ্যে অনন্তর কাছে আগুন হয়ে উঠলো। বেড়ার কাঁথিতে মুখ ঠেকিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে অনন্ত: আলেক, তোকে বাইরে আসতে হবে না। শুধু একবারটি চালের হাঁড়িটা ঠেলে দে তো!

খুপড়ির ভেতর থেকে চাপা কান্না ভেসে আসছে। অনন্ত মনের অসহ্য যন্ত্রণাটা হালকা করবার জন্যেই যেন চীৎকার করে উঠলো: দে না হতভাগী! জলের কামড়ে আর দাঁড়াতে পারছিনে যে!

একখানা হাত বাঁশ-কপাটীর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে এলো। হাঁড়িতে চাল ঢেলে দিয়ে অনন্ত বললে: জলদি করে চড়িয়ে দে। আমার উনানে জল উঠেছে—আগুন ধরবে না। তোর এখানেই খাবো কিন্তু। বুঝলি?

আলেক ভীত কণ্ঠে বললে: সে কি? তোমাদের মোসলমানের ভাত খেয়ে—

—আহা-হা-হা, থাম না তুই! মোসলমান? তিন দিন যে পেটে আগুন জ্বলছে, কই, ঘোষালের চৌদ্দ পুরুষ এসে ত একবারটি এক ফোঁটা জল গড়িয়ে দেয়নি? জাত নিয়ে কিছু বলেছে কি ওর সাতপুরুষের বামনাই ছুটিয়ে দেবো না আমি!

—বা-জান খেয়ে গালাগাল না করে!

—ও কিছু বলবে না। চাচা কোথায় রে?

সুবিধা না উঠতে বেরিয়ে গেছে বা-জান।

অনন্ত আর আলেকজানের মাঝখানে শুধু একটা বাতার বেড়া। অনন্ত [illegible]! বেড়াটা ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে হয় আলেকজানের। কিন্তু তার সেই ইচ্ছা কোথায় মিলিয়ে যায়। [illegible] কান্না আসে শুধু।

অনন্ত বলে: আর হাঁ, বাইরে ঐ কলমচার ডালে একটা কাপড় [illegible] শুকনো হাঁড়ি চড়াতে দেরি করিসনে যেন।

আলেক আর সইতে পারলে না। দড়াম করে দরজার ডান্ডাটা [illegible] নীচে এসে আর্তনাদ করে উঠলো আলেক: অনন্তদা!

অনন্ত [illegible] ডিঙির উপর [illegible] উঠেছে। আলেক আবার বললে: এ [illegible] অনন্তদা!

আলেকজানের [illegible] একটা [illegible] অনন্ত বললে: বকিস নি তুই আলেক। যা বলেছি তাই কর [illegible]! আমি [illegible] মাথাই [illegible] আসব।

আলেক কিছু বলবার আগেই অনন্তর ডিঙি চড়াক করে [illegible] মিলিয়ে গেল। আলেকজান অবশ দেহে হাঁচের [illegible] দাঁড়িয়ে রইলো।

অনন্তর ছোট্ট ডিঙি মেঘনার বাঁকে এসে পড়তেই—একী! [illegible] কে ঐ ময়নামতী? [illegible] অনন্ত দেখলে তার আজগর চাচা অর্ধ-নিমীলিত চোখে [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] যেন [illegible] অসংখ্য [illegible] দিয়ে অনন্তর [illegible] চোখে কটাক্ষ করতে লাগলো।

মেঘনার প্রচণ্ড স্রোত [illegible] চলছে অশ্রান্ত অবিরাম।

এলো আশ্বিন।

[illegible] উঠলো।

ডাঙার ঢেঁকের মাথায় জল-তেল মাখছে না আর?

এরই মধ্যে ছুতোরপাড়াটা কলেরায় সাফ হয়ে গেলো।

আলেকজান খপাড়িতে একা। রাত্রিতে দু-তিনবার অনন্ত এসে খবর নেয় আর সাহস দিয়ে যায়। অনন্ত গা-বদলা দিয়ে মুনিস-মজুরী যা পায়, তাই দিয়ে দুটি উনান কোনোদিন জ্বলে, কোনো-দিন জ্বলে না।

—কিন্তু আর বুঝি চললো না, আলেক। অনন্ত বলে।

—আর পারিনে, আমাকে না হয় পাটকলেই ঢুকিয়ে দাও, অনন্তদা।

অনন্ত স্থির জবাব দেয় : না।

—না হয় ঘোষালের চিনির কলে?

—না, না, কাজ তোকে কোথাও করতে হবে না।

অনন্তর মুখের সামনে আলেক দাঁড়াতে পারে না। অবুঝ মন তবু বারে বারে অনন্তর পায়ে আছড়ে পড়ে।

ক'দিন ধরে স্টেশনের চারদিকব্যাপী ইভাকুইর জন্যে ক্যাম্প খাটানো হচ্ছে গণ্ডায় গণ্ডায়। বার্মা থেকে, আসাম সীমান্ত থেকে আসছে তারা, অর্ধনগ্ন, অনাহারে জীর্ণশীর্ণ। তাদেরই জন্যে এত সব ক্যাম্প খাটানো, এত ঘটা করে খাওয়ার আয়োজন। এ নাকি খাঁটি স্বদেশী কোন শ্রেষ্ঠী মহাজনের কারসাজি। কড়া হুকুম : ইভাকুই ছাড়া স্থানীয় অনাথদের স্থান এখানে নেই। বার্মা-ফেরৎ বিদেশী-দের এই সৌভাগ্যে মেঘনার বাঁকে সহস্র চোখ বিস্ফারিত।

সুর্মা মেল পৌঁছে গেছে অনেকক্ষণ।

দুই পত্তন পাতা পড়েছে—আরেক পত্তন শুরু হবে। কিন্তু স্পেশালখানা এখনো আসছে না কেন?

ডাাঙরা ইভাকুইদের মহল্লায় একবার এসে ঘুরে গেলো লণ্ঠন হাতে। হুড়মুড় করে স্পেশাল ট্রেন এসে গোঙাতে লাগলো।

হাজারখানেক পাত্ পড়লো বিস্তীর্ণ চাতালে। পাতা নিয়ে মারামারি। খদ্দরের টুপীর সংগে মাঝে মাঝে টহলদারী পুলিশ দেখা যায়। কিন্তু এ কী? গদীঘরের পেছন দিকে এত হৈ-হল্লা কেন?

টর্চ ফেলে দেখা গেলো, একটা পাগলী মেয়ে এক ঝুড়ি ভাত নিয়ে ঊর্ধশ্বাসে নদীর দিকে ছুটে পালাচ্ছে, আর তাকে ধরবার জন্যে গোটা সাতেক লাল পাগড়ী লাঠি ঘুরিয়ে পায়তারা ভাজছে। লাঠির ঘায়ে চীৎকার করে মেয়েটা ঐ হুমড়ি খেয়ে পড়লো!

ডাাঙরা পাইটম্যানী আলোটা উঁচিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বললে : আরে! এ যে আলেকজান!

শীর্ণা আলেক এক-পা এগোতে পারলে না, চোখ তুলে চাইবার সাহসও তার নেই। আধমরা হয়ে নতশিরে বললে সে : ডাাঙুদা, আজ চারদিন খাইনি আমি। তোমরা আমাকে মেরে ফেলো, ডাাঙুদা!

চারদিক থেকে একটা বিকট অট্টহাসি উঠলো। আলেক চোখের জলে ঝাপসা দেখছে—এমন সময় দুখানি সবল হাত তাকে আরকোলা করে তুলে নিয়ে মেঘনার বাঁকে ডিঙিতে তুললো।

ডাাঙরা হাতের বাতাসে লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলে। সবল হাতে দাঁড়-টানা ডিঙিটা ততক্ষণে মেঘনার বাঁকে তরতর করে উত্তরে চলছে।

বিজয়া দশমী।

তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর অনন্ত আজ আলেকজানের খুপাড়িতে ঢুকলো এসে। ঝড়ে-পড়া কাকের মত উৎক্ষিপ্ত ছন্নছাড়া মূর্তি। আচমকা তাকে দেখে আলেক শিউরে উঠলো। ভয়ার্তকণ্ঠে সে শুধালো : অমন করছো কেন? কি হলো তোমার? অনন্তদা—

—চুপ! পুলিশ আসছে।

—কেন, কি করেছো তুমি?

অনন্ত ক্ষীণ ভাঙা কণ্ঠে বললে : চুরি, চুরি করেছি, আলেক! শ্রীপতী ঘোষালের বাক্স ভেঙে টাকা এনেছি—অনেক, অনেক টাকা! গীর্জার পেছনে আম গাছটার পশ্চিম গোড়ায় হাঁড়িতে পুতে রেখেছি—সাবধান!

আলেকজানের পায়ের তলা থেকে মাটির পৃথিবীটা সরে গেলো। এ কী বলে অনন্ত? অনন্ত পাগল হয়ে যায়নি ত?

—তুমি পাগল হয়ে যাওনি ত, অনন্তদা?

উন্মত্ত মাতালের মত অনন্ত আলেকজানকে নিজের বুকে জাপটে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো : আমি পাগল হইনি! শুধু দু-মুঠো ভাতের জন্যে পাষণ্ডরা তোর পা ভেঙে দিয়েছে—এ আমি সইতে পারি নি! ভাত চুরি আর করিস নি তুই—আলেক আলেক!

বড় পানসী ঢুকে পুলিশ বাহিনী হৈ হৈ করে পড়লো এসে। পুরোভাগে নীলরঙা আস্তীন গায়ে স্বয়ং ডাাঙরা মালী। অসহায় অবুঝ দৃষ্টি মেলে ফেটে পড়লো আলেক : এ তুমি করলে কি! আমার কি হবে—

অনন্তর বুকের পাঁজরা আলেকজানের আকুল বেষ্টনে জমে পাথর হয়ে গেছে। তার অশ্রুধৌত মুখের উপর মর্মভাঙা দৃষ্টি ফেলে বললে অনন্ত : ভয় কী, আলেক। তোর কাছে যাকে রেখে গেলুম, সে বড় হয়ে উঠতে না উঠতেই আমি জেল থেকে চলে আসবো।

অনন্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে।

আলেকজানের নাভিরন্ধ্রে একটা জীবন্ত কীট নড়ে উঠলো। তার অবশ দেহটা অনন্তর পায়ের উপর গড়িয়ে পড়লো। সম্বিত-হারা পাষাণী আলেক বোবার স্বপ্ন দেখছে! তার ঝাপসা চোখের তারায় তারায় অনন্তর শিশু-মূর্তি ছোট্ট হয়ে নাচছে। মুহূর্তের মধ্যে আলেক আর্তনাদ করে উঠলো : অনন্তদা, অনন্ত—

পানসী তখন মেঘনার বাঁকে জল কেটে চলছে। দুরন্ত বাতাসে আজগরের জীর্ণ খুপাড়িটা কেঁপে ওঠে। কুণ্ডের বাড়ির বিজয়ার সানাই অস্পষ্ট আখেরে তখনো প্রলাপ বকছে।

বিপরীত

(৪৯৩ পৃষ্ঠার পর)

আসিল। মরিতে সে কাল রাত্রে না খাইয়া মরিল। বাবু ত এদিকে দিব্য চোবাচোষ্য আহার করিয়া আসিলেন। তাহাকে ত সারাদিন সংসারের ঘানি টানিতে হইবে, হাত পা ইহারই মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছে।

বড় মেয়ে টুনিকে ডাকিয়া মনোরমা গম্ভীর স্বরে আদেশ করিল, "টুনি, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর কাল রাত্রে খায় নি কেন? কোন চুলোয় খাওয়া হয়েছিল?"

অবিনাশের ঘুম ভাঙিয়াছিল। সেও টুনিকে মধ্যস্থ রাখিয়া তেমনিভাবেই উত্তর করিল "বল টুনি—যে চুলোতেই খাই তাতে তোমার মায়ের কি! কাল আমার নেমতন্ন ছিল।"

মুখ ঝামটা দিয়া মনোরমা বলিল, "বলে গেলে কি এমন ক্ষতি হোত? খাবারগুলো ত নষ্ট হতো না। পয়সা কি আকাশ থেকে আসে। আর যে খাবার তৈরী করে—তার কি শরীর বলে কিছু নেই? ফুলের মালা গেঁথে ত তার দিন কাটে না।"

রাগে গজ গজ করিতে করিতে মনোরমা স্নানের ঘর হইতে বাহির হইল—পরণে সে বাসন্তী রংএর সাড়ী নাই, পরিপাটী খোঁপা নাই, অর্ধ মলিন বসন পরিহিতা, রুক্ষ্যভাষিণী প্রাত্যহিদিনের পরিচিত মনোরমা।

অবিনাশ মনোরমার দিকে চাহিল না। টুনি খাবার দিয়া গিয়াছিল, নীরবে তাহা শেষ করিয়া অবিনাশ ছেলে পড়াইতে বাহির হইল। যাইবার সময় রাস্তায় ডাস্টবিনের মধ্যে ফুলের মালাগুলি যে অবিনাশ ফেলিয়া দিয়া গেলো মনোরমা তাহা লক্ষ্য করিল।

আবর্জনার মধ্যে পড়িয়া ফুলের গন্ধ কোথায় মিলাইয়া গেলো অবিনাশ বা মনোরমার নাকে আর তাহা প্রবেশ করিল না।

আর্জেণ্টিনার অন্তর্বিপ্লব

শ্রীপণ্ডিত

আর্জেণ্টিনার দিকে আবার সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি ফিরেছে। বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে আর্জেণ্টিনা একবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ গ্রাফস্পীর অগ্নিমজ্জন দিনে। তারপর বহুদিন আর্জেণ্টিনার কথা কারু তেমন মনে ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি আর্জেণ্টিনার অন্তর্বিপ্লব এবং বিশ্বের সামরিক পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে আবার সকলেই সাগ্রহে আর্জেণ্টিনার দিকে তাকাচ্ছে। প্রায় চার শত বছরেরও আগে ১৫১৫ খৃঃ অব্দে স্পেনীয় নাবিক জুয়ান ডিয়াস-দি-সলিস আর্জেণ্টিনা আবিষ্কার করেন। এর পূর্বে ইউরোপ বা এসিয়ার কাছে আর্জেণ্টিনা নামে মাত্রও পরিচিত ছিল না। ইউরোপ যেখানেই যা আবিষ্কার করেছে, প্রথমত সেখানে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে গিয়ে শাসনভার গ্রহণের চেষ্টা করেছে। কথাটি ভারতবর্ষ এবং সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে যেমন সত্য আমেরিকা এবং আফ্রিকা সম্পর্কেও তেমনই সত্য। যা হোক স্পেন আর্জেণ্টিনায় শাসন করতে আরম্ভ করল এবং নিজেদেরো দীর্ঘদিন শাসনও করল। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রাজ্যসম্পদে স্পেন, পর্তুগাল এবং ইংলণ্ডের ভাণ্ডার পূর্ণ হতে লাগল। ইতিমধ্যে বুয়েনোস এরিসের লোকেরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বেড়ে উঠতে লাগল। তরুণ যুবকেরা দলে দলে ইউরোপ গিয়ে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি আহরণ করতে আরম্ভ করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বুয়েনোস এরিসের সমাজ-জীবনে রুশো ভলটেয়ার এবং মন্টেস্কুর প্রভাব নির্দিষ্ট একটা রূপ পেয়ে বসল এবং পরাধীনতার মর্মান্তিক বেদনা তারা বিশেষ ভাবেই অনুভব করতে লাগল।



ডাঃ কাস্টিলো

ইতিমধ্যে উত্তর আমেরিকায় বৃটিশ উপনিবেশসমূহের বিদ্রোহ এবং ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের দিকেও তারা সম্মানদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে আরম্ভ করল। আর্জেণ্টিনার উপর স্পেনীয় শাসন চালাবার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার যে নাই দৃঢ়ভাবে ক্রমশ তারা ঘোষণা করতে আরম্ভ করল। ঠিক এমন সময় ঘটনা স্থলে ইংরেজদের আবির্ভাব। ১৮০৬ সালে ১৬ শত সৈন্য সহ জাহাজ নিয়ে স্যার হোম পোফাম বুয়েনোস এরিসের নিকটে দেখা দিলেন। স্পেনীয় ভাইসরয় সোব্রেমণ্টে সংবাদটি পাওয়া মাত্রই পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বুয়েনোস এরিসের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বাধা দিতে আরম্ভ করল এবং আক্রমণকারীদের শহর থেকে তাড়িয়ে দিল। পর বৎসর আবার একদল বৃটিশ সৈন্য এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তারাও পরাস্ত হয়ে অন্তর্হিত হল।

এদিকে ইউরোপেও স্পেনের অবস্থা সেদিন ভাল ছিল না। কেননা, নেপোলিয়ান স্পেন দখল করে ভ্রাতা জোসেফকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। স্পেনের সামান্য একটু এলাকা মাত্র সেদিন স্বাধীন ছিল এবং সেখানেই একটি কমিটি বন্দী রাজাদের নামে শাসন চালাবার চেষ্টা করল। স্বদেশে স্পেনীয়দের এই দুর্দশার সুযোগ নিয়ে আর্জেণ্টিনা উপনিবেশও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ১৮১০ সালের ২৫শে মে তারিখে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক বিরাট জনতা বুয়েনোস এরিসের পাব্লিক স্কোয়ারে সমবেত হয়ে স্পেনীয় ভাইসরয়ের পদত্যাগ দাবী করে। যা হোক, ১৮১৬ সালের ৯ই জুলাইর পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য একথা ঠিক, ১৮১০ খৃঃ অব্দের মে মাসের পর থেকে কোন স্পেনীয় শাসক প্রতিনিধিই সেখানে ছিলেন না।

এর পর আরম্ভ হ'ল আর্জেণ্টিনার আভ্যন্তরীণ উন্নতির যুগ। অবশ্য সব সময়েই তারা নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে উন্নতি করতে পেরেছে, এমন কথা বলা চলে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও প্রতিবেশী চিলি প্রদেশের সাথে বার বার সীমান্ত সম্পর্কিত গোলযোগ হয়েছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল, ১৮৬০, ১৮৬৬, এবং ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তারই সংশোধন হয়। ১৪টি প্রদেশ এবং রাজধানী থেকে নিযুক্ত ৩৭৬ জন নির্বাচক প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করে থাকেন। ভাইস-প্রেসিডেণ্টও ঠিক এভাবেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন কিন্তু সেনেটের সভাপতিত্ব করা ছাড়া তাঁর কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই।

শাসনতন্ত্রের এই আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেই ডাঃ রোবার্টো, এম, অর্টিজ, ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং তাঁর অসুস্থতার দরুণ ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কাস্টিলো প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করেন। শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে পরাধীনতার বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে আর্জেণ্টিনা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যাতে কেবলমাত্র কংগ্রেসেরই আইন জারী করার অধিকার আছে। ১৯৩৯ সালে ডাঃ অর্টিজের শাসন-বিভাগ সম্বন্ধে এবং আভ্যন্তরীণ আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানের কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেণ্টিনাই সব চাইতে বড় দেশ এবং শিক্ষিতের হারও সেখানে খুব বেশী। এক কোটির সামান্য কিছু বেশী লোকসংখ্যার জন্য গভর্ণমেণ্টের বার হাজার প্রাথমিক স্কুল এবং ২০৮টি মাধ্যমিক স্কুল আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১,৭০০,০০০ এরও বেশী। এ ছাড়া অসংখ্য বেসরকারী শিক্ষায়তন ত আছেই। সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ হাজারেরও বেশী ছাত্র আছে, তন্মধ্যে বুয়েনোস এরিস ও লা-প্লাটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে।

সে যাক, তথাপি প্রেসিডেণ্ট অর্টিজ দেশের শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। বাণিজ্যের দিক থেকে যে বাইরের কারুর উপর না নির্ভর করতে হয় প্রেসিডেণ্ট অর্টিজের সেদিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যাতে তাদের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধান বাধা না পায়, তজ্জন্য বর্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার নীতিই আর্জেণ্টিনা গ্রহণ করেছিল। প্রতিবেশী এবং পৃথিবীর

অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করতে আর্জেণ্টিনা সর্বদাই চেষ্টা করে এসেছে। ল্যাটিন আমেরিকার যে সকল রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রথম যোগ দেয়, আর্জেণ্টিনা তাদের অন্যতম। ১৯১৯ সালের ১৬ই জুলাই তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল, ১৯২০ সালে যখন জার্মানী এবং অপরাপর রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গ্রহণ করার প্রস্তাব বাতিল হয়, আর্জেণ্টিনাও তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করে। আন্তর্জাতিক কলহের বিচার যাহাতে আন্তর্জাতিক আদালতে হতে পারে, আর্জেণ্টিনা সে প্রস্তাবই করেছিল। হ্যাহোক, ১৯২৭ সালে আর্জেণ্টিনা আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেয়। বর্তমান মহাযুদ্ধে যাতে কোন প্রকারেই জড়িয়ে পড়তে না হয়, আর্জেণ্টিনা মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবেই এতদিন সে চেষ্টা করে এসেছেন। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যান-আমেরিকা সম্মেলন আহূত হবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ল্যাটিন আমেরিকাকে কোন প্রকারেই যুদ্ধে জড়িত না করা। কিন্তু এম্নি সময় নিমজ্জিত জার্মান জাহাজ গ্রাফ-স্পীর নাবিকেরা আর্জেণ্টিনায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর্জেণ্টিনার সম্মুখে তখন এক বড় রকমের সমস্যা দেখা দিল—কেননা, ইউরোপীয় যুদ্ধে নিরপেক্ষতার সংকল্প তারা মাত্র কিছুদিন পূর্বেই ব্যক্ত করেছিলেন। এ অবস্থায় গ্রাফ-স্পীর নাবিকদের অন্তরীণ করা ছাড়া তাঁদের কাছে কোনই উপায় ছিল না। এদিকে, আর্জেণ্টিনার নেতৃত্বে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রই ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের অপরাধে রুশিয়াকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু আর্জেণ্টিনার আভ্যন্তরীণ অবস্থায় তখন বড় রকমের গলদ দেখা গেল। বিভিন্ন নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট পার্টি আর্জেণ্টিনায় প্রচার কার্যে লিপ্ত আছে, সরকারী তদন্তে তাই ধরা পড়ল। ফলে, এ সকল প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করে আর্জেণ্টিনাকে বিপন্মুক্ত হতে হল।

কিন্তু বৈদেশিক রাজনৈতিক দল বিশেষের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া প্রেসিডেণ্ট কষ্টিলোর কোনক্রমেই ইচ্ছা ছিল না। নিছক নির্লিপ্ততা এবং মহাসমরের দর্শক হিসাবেই তিনি আর্জেণ্টিনাকে রাখতে চেয়েছিলেন। আধুনিক এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট কষ্টিলোর বিরুদ্ধে সৈন্যদলের বিদ্রোহ দেখা গেল। বিদ্রোহ সফল হয়েছে এবং নির্লিপ্ততাপন্থী প্রেসিডেণ্ট কষ্টিলো পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মিত্রশক্তির দিক থেকে বলা যায়, নিঃসন্দেহে আমেরিকায় তারা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। কেননা, শাসনভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই জেনারেল রসন এক বক্তৃতায় বলেছেন, স্বাধীনতার জন্য যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধ করছে, আর্জেণ্টিনা তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকবে। এরই পরবর্তী অবস্থা হিসাবে আর্জেণ্টিনা যদি এক্সিসের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং মিত্ররাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে, তবে বিস্ময়ের কোন হেতুই থাকবে না। আর্জেণ্টিনার ভৌগোলিক গুরুত্ব অতিমাত্রায় বেশী। অতলান্তিকের দীর্ঘ উপকূলবর্তী এই দেশ যাতে কোনক্রমেই রাজনীতির বা কূটনীতির সঙ্কীর্ণপথে এক্সিসকে কোন সুযোগ সুবিধা দিতে না পারে মিত্রপক্ষ এতদিন তাই আশা করে এসেছেন। কাষ্টিলোর পদত্যাগ এবং রসনের শাসনভার গ্রহণ মার্কিন কূটনীতিক্ষেত্রে এক বড় রকমের পরিবর্তন আনতে পারে।

গত বছর আগস্ট মাসে ব্রেজিলে এক্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে পর আর্জেণ্টিনার নিরপেক্ষতা রক্ষা করা যে কতদূর কষ্টকর তাহা বুঝা গিয়েছিল।

গত সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী, জাপান ও ইতালীর সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত আর্জেণ্টিনার আইন সভায় গৃহীত হয়। কিন্তু ডাঃ কাষ্টিলো তাহাকে কার্যে পরিণত করেন নি বরং ডিক্টেটররূপেই তিনি শাসন চালাতে আরম্ভ করেন। ফলে ল্যাটিন আমেরিকায় আর্জেণ্টিনা জার্মান-গোয়েন্দা বিভাগের হেডকোয়ার্টার হয়ে ওঠে এবং জার্মান প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে বসে। অতঃপর গত ২০শে জানুয়ারী তিনি এক্সিস শক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ফলে, আমেরিকায় একমাত্র আর্জেণ্টিনাই আপন নিরপেক্ষতা রক্ষার চেষ্টা করে আসছিল।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ভ্রমণ

(৪৯৬ পৃষ্ঠার পর)

"বানুজি দাঁড়াও আমরা কোথাও যাব।"

"চল যাই।"

লছমন এবং আরও দুজন লোকের সঙ্গে আমরা চললাম ইউরোপীয় শহরে। শহরের এক পাশে একখানা বড় বাড়ি। তার পেছন-দরজা দিয়ে লছমন করাঘাত করল। দরজা খুলে দিয়ে ঘরের মালিক আমাদের মুখের দিকে তাকাল। আমার মুখ তার কাছে অপরিচিত। সে লছমনকে বলল, এ লোকটা কে আবার? লছমন জানাল, নবাগত বন্ধু ভয় নেই। আমরা ঘরে গেলাম। একটা বড় রুমে কতকগুলি চেয়ার টেবিল ছিল। আমরা সেখানে গিয়ে বসা মাত্র ঘরের মালিক বলল, "কি আনব?" লছমন হুইস্কি আনতে বলল।

এদের যখন কথা হচ্ছিল আমি ভাবিতেছিলাম লোকটি কি জাত হবে। অনেকক্ষণ লোকটির মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম লোকটি আরব ছাড়া আর কিছুই হবে না। এখানে এরা আর্মানী বলে পরিচয় দিয়ে ইউরোপীয় সমাজে মিশে গেছে। আর্মানী কখনও মুসলমান ধর্মের লোক হয় না।

হুইস্কি আনা হলে আমি প্রথম জানালাম আমি মদ্যপায়ী নই, তবে সঙ্গীদের সম্মান রক্ষা করার জন্য একটু পান করব। ছোট্ট গ্লাস হতে খানিকটা মুখে দিয়ে দেখলাম এটা হুইস্কি নয়, রং করা ডিস্টিল্ড স্পিরিট। চাকরী জীবনে আমি অনেক হুইস্কির শ্রাদ্ধ করেছি কিনা, তাই বলতে সক্ষম হই কোনটা কোন্ রকমের মদ।

ওদের মদ খাওয়া হয়ে গেলে মটরগাড়িতে যখন ফিরে আসছিলাম, তখন জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইণ্ডিয়ানরা বারে গিয়ে মদ খেতে পারে না। পরিণাম ফল হয়েছে ইণ্ডিয়ানরা পয়সা দিয়ে আগুন কিনে খায়। ক্রমশ



বোম্বাইয়ের চিঠি

ভাই সম্পাদক,

বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র চক্রের খবর চেয়েছ। খবরের অভাব কি? শুধু ভয় হয় পাছে সব খবর তোমার খবরের পাতে পরিবেশন করা চলবে না। বাঙলার পাঠকদের বাসনা ও রুচি ইদানিং যেভাবে ভেজাল খবরের দ্বারা পরিতৃপ্ত হোচ্ছে তার নিদর্শন পেলুম ওখানকার দুই একটি কাগজে, শ্রীনিতীন বসু ও শ্রীফণি মজুমদার সম্বন্ধে কয়েকটি রসাল খবর প্রকাশে। এ ছাড়া বাঙলার অভিনেতৃবৃন্দ ও শিল্পিগণ যে কোথায় কি ভাবে এখানে নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তার কোনও খবরই বাঙলার সংবাদপত্রে প্রায়শই দেখা যায় না। যদিও তাঁরা বাঙলায় অচল হয়ে থাকেন (শত্রুরা এই কথা বলে) তাহলেও যে তাঁরা বোম্বায়ে খুবই সচল তার পরিচয় এখানে প্রতিদিনই পাচ্ছি। একথাটা অন্তত এখানকার চিত্র নির্মাতারা ভালভাবেই বুঝেছেন তাই আজ বাঙলার কারিগরদের বোম্বায়ে প্রচুর আমদানী। প্রথমেই নিতীন বসু মহাশয়ের দু রোখা (double verseon) ছবি সম্বন্ধে বলা যাক।

ছবির নাম "[illegible] ধন" (হিন্দী) "[illegible]" (বাঙলা)। ছবির গ্রহণ [illegible] চলছে অমর [illegible] ভাড়া করা ষ্টুডিওতে। অর্থাৎ [illegible] একাধারে।

এখানে বলা দরকার যে বসু মহাশয় সম্পূর্ণ একটি floorএর [illegible] পেয়েছেন, যা [illegible] বোম্বাইয়ের কোনও পরিচালকের ভাগ্যে জোটে না।

R. C. A. [illegible] বসু, [illegible] গ্রহণ করছেন। Vide [illegible]

সংগীত পরিচালনা করছেন [illegible]

[illegible] ও [illegible] ভার নিয়েছেন [illegible]।

[illegible] নিয়েছেন [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও [illegible]।

[illegible] রচনা করেছেন—[illegible] বর, [illegible] ও [illegible]।

[illegible] অমূল্য মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনার ভার পড়েছে [illegible]।

[illegible] সুবিধা ও উৎসাহিত কর্মীবৃন্দ পেলে যে নিউ থিয়েটার্সের [illegible] কত দ্রুত কর্ম করতে পারেন তার নিদর্শন [illegible]।

ছবির শুভ মুহূর্ত পালিত হয় ৩০শে মার্চ অপরাহ্ণ ২টার সময়, রবীন্দ্র ঠাকুরের বড় floor জোড়া একটি setএর একাংশে।

লীলা দেশাই, মায়া ব্যানার্জি দিলীপ বসু, রতীন ঠাকুর, জগদীশ শেঠকে ঐদিন ও পরে বহুদিন ধরে ঐ সেটে অভিনয় করতে দেখা যায়।

ছবির শুভ মুহূর্তের দিন থেকে ১৮ই মে'র মধ্যে ১৩টি সেটের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ১২খানি গান ইতিমধ্যে যন্ত্রস্থ ও চিত্রায়িত হয়েছে। আরও চারখানি গানের মহড়া চলছে, সম্ভবত ১লা জুনের মধ্যেই যন্ত্রস্থ হবে।

সহ পরিচালকদের হিসাবের বহি থেকে জানা যায় যে, ১২৫ মিনিটের অধিক ছবির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে:

এইবার ছবির পূর্ণ ভূমিকা লিপি জানাই—

(১)	প্রতিমা—লীলা দেশাই	(বাঙলা—হিন্দি)
(২)	শান্তা—রাধারাণী দেবী	(„ „)
(৩)	লীলিয়ান—মায়া ব্যানার্জি	(„ „)
(৪)	মিসেস চ্যাটার্জি—সুনন্দিনী দেবী	(„ „)
(৫)	মিসেস প্রধান—রাজকুমারী শুক্লা	(„ „)
(৬)	ছোট প্রতিমা—বেবি মাধুরী	(„ „)
(৭)	রবিন ব্যানার্জি—দিলীপ বসু (বাঙলা) —বলবন্ত সিংহ (হিন্দি)	
(৮)	গবিন ব্যানার্জি—রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাঙলা) —জগদীশ শেঠি (হিন্দি)	
(৯)	পুরোহিত—দেবেশ কুমার (বাঙলা) —গদাধর শর্মা (হিন্দি)	
		(বাঙলা—হিন্দি)
(১০)	পুলিশ অফিসার—দেবী মুখোপাধ্যায়	(„ „)
(১১)	দামু—মাজিদ	(„ „)
(১২)	রেডিও ম্যানেজার—ডাঃ আগাশে	(„ „)

এইবার ফণি মজুমদারের নতুন ছবি "মহব্বত" সম্বন্ধে কিছু খবর জানাই। ছবির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই জুনে মুক্তিলাভ করবে নতুন করে ঢেলে সাজা "কমল টকিজে"।

গল্পের বিষয় বস্তু হল—মানুষের জন্যই সমাজের সৃষ্টি অথবা সমাজের জন্যই মানুষ। সমাজ বন্ধনে প্রেমের বন্দী বা প্রেমের বন্ধনে সমাজের মুক্তি. এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে গল্পের মধ্যে।

অভিনয় করেছেন—শান্তা আপ্তে, পাহাড়ী, জগদীশ, সুনন্দিনী, নাজীর মশোয়ারা, ও কৃষ্ণচন্দ্র দে।

সংগীত পরিচালনা করেছেন হরিপ্রসন্ন দাস।

ক্যামেরা চালিয়েছেন—[illegible] শব্দ গ্রহণ করেছেন, [illegible] চট্টোপাধ্যায়। [illegible]

ছবির [illegible]

এইবার [illegible]

লীলা দেশাই [illegible] কাজ শেষ করে[illegible]ছেন।

[illegible] করছেন।

[illegible] ছবির কাজ শেষ হতে দেরী আছে।

[illegible] বসু—[illegible] এই [illegible] ছবিতে একযোগে কাজ করছেন। ছবিগুলির কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। "[illegible]" প্রায় শেষের পথে এসেছে।

[illegible] দেশাই—[illegible] কাজ শেষ করে [illegible] সঙ্গে [illegible] (flirt) করছেন। [illegible] পরিচালনা করছেন। জগদীশ শেঠি একযোগে এতগুলি ছবিতে কাজ করছেন যে, সবগুলির নাম স্মরণ নেই। কৃষ্ণচন্দ্র দে নিজে ছবি নির্মাণ করবেন। তাঁর নতুন অফিসের সামনে সেদিন বাঙলার কোনও অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে দেখলাম। সঠিক খবর পরের চিঠিতে পাঠাতে পারবো আশা করি।

উপরোক্ত খবরগুলি যদি মুখোরোচক হয়ে থাকে, তাহলে আশা করি তোমাদের পাতে স্থান পাবে।

নমস্কারান্তে,

ভবদীয়
শ্রীইন্দ্রব্রত

পুঃ—

পরিচালক সুধীর সেন ফিরেছেন।

পুঃ পুঃ—

পরিচালক প্রফুল্ল রায় ফিরে যাচ্ছেন।

পুঃ পুঃ পুঃ—

পরিচালক ফণি মজুমদার বাঙলায় ফিরবেন শুধু কয়েক দিনের জন্য।

নিউ সিনেমায় 'রোটি'

ন্যাশনাল ষ্টুডিওর ছবি। পরিচালক : মেহবুব ; কাহিনী : আর, এস, চৌধুরী ; আলোকচিত্র : ফেরেডুন্ এ, ইরানী ; শব্দগ্রহণ : মিনশা বিলিমোরিয়া ; সুরশিল্পী : অনিল বিশ্বাস। ভূমিকায় : চন্দ্রমোহন, সেখ্ মুক্তার, সিতারা, আখতারী ফৈজাবাদী, আসরাফ্ খাঁ প্রভৃতি।

ন্যাশনাল ষ্টুডিওর বিঘোষিত চিত্র 'রোটি' দেখে এলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, বহুল বিজ্ঞাপিত এই চিত্রখানি যতটা উচ্চাঙ্গের হবে বলে আশা করেছিলাম, ততটা উচ্চাঙ্গের চিত্র এখানা হয়নি। এই চিত্রখানির কাহিনীতে নতুনত্ব [illegible] চেষ্টা হয়েছে এবং বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব ও [illegible] দিক থেকেও ছবিখানি আমাদের মনকে

আকৃষ্ট করে। তবে আগাগোড়া সমতা রাখতে না পারায় যেখানে সেখানে ছবিখানির তাল কেটে গেছে। কোন একটা বিশেষ গানে ক্ল্যাসিকাল সুরের মাঝে মাঝে যদি কেউ আধুনিক চটুল সুরের ভিয়ান দেয়, তবে যে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হয়, বর্তমান 'রোটি' চিত্রখানিতেও সেই অদ্ভুত রসের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর মাঝে মাঝে এমন সব অতি সস্তা হালকা হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আমরা পরিচালককে নিন্দা না করে পারি না। অথচ এই ছবিখানি নির্মাণ করতে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়েছে। প্রধানত কাহিনীর দৌর্বল্য ও পরিচালনার ভুলত্রুটির জন্য এই প্রচুর অর্থব্যয় সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। ছবির দৈর্ঘ্য নিয়ামক সাম্প্রতিক আইনের আওতায় পড়েনি বলে রোটির দৈর্ঘ্য হয়েছে—এগারো হাজার ফিটের অনেক বেশী। কিন্তু ছবিটির গতি স্থানে স্থানে অত্যন্ত শ্লথ হওয়ায়, বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

'রোটি'র কাহিনীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় রুটির মূল্য বেশী না সোনার মূল্য বেশী। আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি সোনা পৃথিবীতে নানা রকম কৃত্রিমতার আমদানী করেছে, মানুষে মানুষে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে এবং ফলে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় রুটির মূল্য গেছে বেড়ে। সোনা সংগ্রহের আপ্রাণ প্রচেষ্টার চাপে পড়ে মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত পথও রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই আধুনিক সভ্যতার প্রতীক হচ্ছে শেঠ লক্ষ্মীদাস—যাঁর জীবনের একমাত্র কামনা হচ্ছে অগণিত স্বর্ণের অধিকারী হওয়া। এই সোনার জোগাড় করার জন্য সে আত্মীয়কে হত্যা করতেও যেমন কুণ্ঠিত নয়—তেমনি তার অধীনস্থ মিলের কুলিদের উপরও অকথ্য অত্যাচার করতে পিছপা নয়। তার জীবনের আর একটি কামনা হচ্ছে—অগণিত স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে তার অংশীদারের কন্যা ডলিংয়ের প্রেমের অধিকারী হওয়া। আধুনিক যুগের মেয়ে হলেও ডলিং কিন্তু হৃদয়বতী ; শুধু সোনার চাকচিক্যে সে ভোলে না—সে চায় হৃদয়ের সহজ সুনিবিড় অনাড়ম্বর প্রকাশ। এই প্রকাশ সে দেখতে পায় অসভ্য বন্য প্রেমিক প্রেমিকা বালম ও বিনারীর মধ্যে। তাই সে বালমের প্রতি অনুরক্ত। শেঠ লক্ষ্মীদাসের ঠিক বিপরীত আদর্শের প্রতীক বালম—সে বনের আদিম অধিবাসী, তার হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ সহজ ও সুষ্ঠু—উদ্ধত সভ্যতার বালাই নেই। সোনার মর্যাদা সে জানে না—কিন্তু বুঝতে পারল শহরে এসে। লেখক গোটা বইটিতে যে আদর্শ প্রচার করেছেন, সেটা প্রগতি-বিরোধী—তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, আদিম বন্যজীবন আধুনিক শহরে সভ্যতার চেয়ে অনেক বড়। শেঠ লক্ষ্মীদাস সারাজীবন সোনাই জমিয়ে গেল, না পেল ডলিংকে না পেল মরুভূমিতে মরবার সময় একখণ্ড রুটি। গল্পের এই মূল কাঠামোর উপর ভিত্তি করে অবশ্য গড়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময় ঘটনা-পরম্পরার বিরাট সৌধ। এই সৌধ নির্মাণের ভিত্তি কাঁচা থাকায় অনেক অবান্তর ঘটনার সন্নিবেশ করতে হয়েছে।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শেঠের ভূমিকায় আখতার খাঁর অভিনয়ের কথা। এই ভূমিকাটির সার্থকতা খুব বেশী না থাকলেও তিনি এই ভূমিকাটিকে প্রাণবান করে তুলেছেন। শেঠ লক্ষ্মীদাসের ভূমিকায় চন্দ্রমোহন তাঁর স্বভাব সুলভ সংযত কঠিন অভিনয় করেছেন। ডলিংয়ের ভূমিকায় অখতারী ফৈজাবাদীর অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশের মত বিশেষ কোন অংশ ছিল না। তবে এই ভারত প্রসিদ্ধা গায়িকার মুখের ক্ল্যাসিকাল সংগীতগুলো আমাদের খুব বেশী তৃপ্তি দিয়েছে। বিনারী ও বালমের ভূমিকায় যথাক্রমে সিতারা ও সেখ মুখতার সুঅভিনয় করেছেন। সিতারার একখানা নাচ আমাদের খুব ভাল লেগেছে। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকার অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ছবিখানির আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ বেশ উচ্চাঙ্গের হয়েছে। সুরশিল্পী অনিল বিশ্বাস সংগীত পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পরিচালক মেহবুব আরও বেশী অবহিত হয়ে ছবিখানি তুললে, রোটিকে নিঃসন্দেহে একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে ফেলা যেত।

প্যারাডাইস—'তসবীর'

আত্রে পিকচার্সের ছবি। কাহিনী : অধ্যক্ষ পি. কে. আত্রে; সংগীত রচয়িতা : কবি আর্জু; সংগীত পরিচালক : রামচন্দ্র পাল ; পরিচালক : নাজমূল হুসেন নাকভী ; ভূমিকায় : দুর্গা খোটে, নন্দলাল, স্বর্ণলতা, ডেভিড, আজুরী প্রভৃতি।

ভাল অভিনেতা অভিনেত্রীর সংযোগ সত্ত্বেও শুধু কাহিনীর দুর্বলতার জন্য একখানা চিত্র কি করে নষ্ট হয়ে যেতে পারে 'তসবীর' তার প্রমাণ। 'তসবীরে'র কাহিনীতে কল্পনাশক্তির এত দৈন্য দেখলাম যে, আত্রে পিকচার্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত না হয়ে পারলাম না। প্রধানত এক জোড়া ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী-স্ত্রী ও আরেক জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা নিয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছে। মাত্র একখানা ফটো—তসবীর—এদের জীবনে কি ঝঞ্ঝাট নিয়ে এল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই কাহিনীই পর্দায় দেখানো হয়েছে। এই ফটোকে কেন্দ্র করে এদের জীবনে যে মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে মেঘ কেটে গিয়ে মিলনের সূর্যরশ্মি দেখা দিল। এই মিলনাত্মক কাহিনীটিকে হাসির গল্প বলে পর্দায় চালানো হয়েছে। স্থানে স্থানে হাসির বিষয় নেই এমন নয়; তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জোর করে হাসানোর চেষ্টা হয়েছে। গল্পটিকে টেনে বাড়ানো হয়েছে।

প্রেমিক যুবকের ভূমিকায় নন্দলাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাবলীল অভিনয় করেছেন। তার ঈর্ষাপরায়ণা বিধবা দেবীর চরিত্রটি দুর্গা খোটের উপযুক্ত হয়নি বলে, এই প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। কিশোরীর ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী স্বর্ণলতার রূপ-যৌবন আছে; তিনি অভিনয় ভাল করেছেন। যদি চলচ্চিত্র জগতে টিকে থাকেন, তবে এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়। অম্বাদাসের ভূমিকায় ডেভিড সুঅভিনয় করেছেন। পরিচালনা, সংগীত পরিচালনা প্রভৃতি সাধারণ স্তরের।

রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা



নন্দিতা দেবী

মেদিনীপুরে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে শান্তি-নিকেতনের শিল্পিবৃন্দ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ করবেন।

রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা নন্দিতা দেবী ও শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ অভিনয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। নন্দিতা দেবী প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন।



খেলা-ধূলা

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের সকল খেলা এখনও শেষ হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হইবে। তবে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল—এই দুইটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। কোন্ দল শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করিবে বলা কঠিন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান। এই বৎসরেও প্রথমার্ধের খেলায় লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মোহনবাগান দলের পয়েণ্ট সমান সমান হইলেও একটা খেলা বেশী খেলিয়া এইরূপ পয়েণ্ট সমান করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল দল মোহনবাগান দলকে দুই পয়েণ্ট পশ্চাতে ফেলিয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দল এই দুইটি পয়েণ্ট মোহনবাগান দলকে পরাজিত করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। ইস্টবেঙ্গলই একমাত্র দল, যাহার পক্ষে এই বৎসর লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দলকে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছে। এই বিষয়ে ইস্টবেঙ্গল দলের কৃতিত্ব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে এই জয়লাভ মোহনবাগান দলের ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য সম্ভব হইয়াছে, কারণ এই দিন মোহনবাগান দল খেলার কোন সময়েই বিজিত দলের ন্যায় খেলে নাই। ইস্টবেঙ্গল দলকেই একরূপ অনেক সময় আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। মোহনবাগান দল বারবার গোলের সুযোগও লাভ করে। কিন্তু আক্রমণভাগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতার অভাবই যে এই ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ, ইহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপে এই দুইটি দল শেষ পর্যন্ত জোর প্রতিযোগিতা করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই দুইটি দলের পরেই বি এণ্ড এ রেল দল ও কালীঘাট দল স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহারাও যে চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িবে না, বলা কঠিন। ইহাদের চ্যাম্পিয়ানশিপের আশা এখনও আছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ক্রমশই পিছাইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ প্রবীণ খেলোয়াড় দ্বারা এই দল গঠিত হওয়ায় এইরূপ শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিতেছে। ভবানীপুর ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা মন্দ হইতেছে না। লীগ তালিকায় ইহারা শেষ পর্যন্ত মধ্যভাগেই অবস্থান করিবে বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় দলসমূহের মধ্যে এরিয়ান্স দল সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। লীগের সূচনায় এই দলের ফলাফল সম্পর্কে যেরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করা গিয়াছিল, বর্তমানে তাহা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা ব্যতীত উপায় নাই। এই দলে বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দলের কোনরূপে উন্নতি হইতেছে না। দলের পরিচালকগণ ইহার জন্য যে দায়ী, ইহা বলিলে কোনরূপে অন্যায় হইবে না। প্রত্যেক খেলায় দল গঠনে খেলোয়াড় অদলবদল করিবার কি সার্থকতা আছে, আমরা বুঝি না! ইহাতে খেলোয়াড়গণকেই নিরুৎসাহ করা হইতেছে। দলগত স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থই খেলোয়াড়গণের নিকট বিশেষ বড় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শৃঙ্খলবদ্ধ আক্রমণ প্রথা এই দলের খেলায় বিরল হইতেছে। গোলের সুযোগ-লাভ করিলেও গোল করিতে পারিতেছে না।

ইউরোপীয় দলসমূহের মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল দলই কিছু খ্যাতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয়। রেঞ্জার্স, ডালহৌসী, পুলিশ প্রভৃতি দল লীগ তালিকার নিম্নভাগেই অবস্থান করিবে! ইহাদের উন্নতি অসম্ভব। নিম্নে প্রথম ডিভিসন লীগের ৮ই জুন তারিখ পর্যন্ত বিশিষ্ট দলসমূহের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১২	৯	২	১	২০	২	২০
মোহনবাগান	১৩	৮	৪	১	২২	৫	২০
বি এণ্ড এ	১২	৬	৫	১	১৬	১২	১৭
কালীঘাট	১২	৭	৩	২	১৭	৮	১৭
ক্যালকাটা	১৩	৬	৪	৩	১৯	১৫	১৬

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ

দ্বিতীয় ডিভিসনের সকল খেলা শেষ হইতে এখনও বহু দেরী। তবে ইতিমধ্যেই এই বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য এরিয়ান্স ক্লাব ও ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের পরেই বি এন আর দলের স্থান। এই রেল দলটি উক্ত দুইটি দলকে চ্যাম্পিয়ান হইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না।

খেলার ষ্টাণ্ডার্ড

লীগ প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্য বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়-দের খেলার অনুশীলন করিবার সুযোগ দেওয়া ও খেলার ক্রীড়া-কৌশলের উন্নতি করিতে সাহায্য করা। প্রথম বিষয়টি খেলোয়াড়গণ সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেছেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির কোনই ফলাফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ফলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতি হইয়াছে বলা চলে না। প্রতিযোগিতা আরম্ভের কয়েকদিন পরে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়গণের খেলার উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমানে তাহার পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। কোনরূপে খেলায় জয়লাভ করিলেই সকল উদ্দেশ্য সফল হইবে ইহাই সকল দলের সকল খেলোয়াড়ের খেলার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ফাউলের সংখ্যা এইজন্যই অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আক্রমণভাগের প্রত্যেক খেলোয়াড় স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িয়াছেন। আক্রমণ রচনা বিভিন্ন প্রথায় করিতে হয় তাহার পরিচয় কোন দলেরই আক্রমণ রচনার মধ্যে দেখা যায় না। অধিকাংশ দলেরই রক্ষণভাগের খেলোয়াড়গণ কোনরূপে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে বল কাড়িয়া লইয়া যে কোন দিকে বল মারিয়া দিলেই নিজেদের কর্তব্য করিলেন বলিয়া মনে করেন। ইহাতে যে সময় নষ্ট হয় ও আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের অগ্রসর হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় ইহা বুঝিতে পারেন না। গোলরক্ষকের মন ধীরস্থির হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কলিকাতা মাঠের গোলরক্ষকগণের চঞ্চলতাই বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় হইতেছে যে কোন দলের খেলোয়াড়গণের খেলার মধ্যে বোঝাপড়া অথবা সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন বিষয়েই সাফল্যলাভ করা যায় না। দলের সাফল্যও শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কলিকাতা ফুটবল মাঠে ইহার যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা বুঝিবার উপায় নাই। মাঠে বল মারিবার কৌশল শিক্ষা দিলেই এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতির কোনদিনই অবসান হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন মাঠের শিক্ষার সহিত আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করা। এই সকল আলাপ আলোচনার কেন্দ্র হইবে বিশিষ্ট ফুটবল শিক্ষক-গণের পুস্তকসমূহ। এইভাবে যদি কোনদিন ব্যবস্থা হয় তবেই বাঙলা দেশের ফুটবল খেলার উন্নতি হইবে, নতুবা বর্তমানে যে স্তরে আছে তাহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১লা জুন

মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ এ এম আল্লাপিচাই গান্ধীজীর প্রতি মিঃ জিন্নার মনোভাবের প্রতিবাদস্বরূপে মিঃ জিন্নার নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ভারতরক্ষা বিধানের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ লিন সেনের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু চুংকিং হইতে ইহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের তিন স্থানে জাপানীদের আক্রমণ সংবাদ অদ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আক্রমণের তারিখ প্রকাশ করা হয় নাই। দুইখানা বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং অগ্নি প্রজ্বালক বোমা ফেলিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে সামান্য অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভারতের সমর বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত দশ দিনের মধ্যে চিন পাহাড়ের টিডিম অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী ও জাপ সৈন্যদলের মধ্যে কতকগুলি সংঘর্ষ হইয়াছে। শত্রু সৈন্যগণ এখন কান্সোমও এবং ফোর্ট হোয়াইটের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

২রা জুন

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী সম্পাদিত **'মর্ণিং নিউজ'** পত্রে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আটক বন্দী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি বহুমূত্র এবং রক্তচাপে ভুগিতেছেন। তাঁহার পীড়ার এক উৎকট লক্ষণ অনিদ্রা।

আমেরিকায় পুনরায় কয়লা খনি ধর্মঘট শুরু হইয়াছে। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪ ঘণ্টায় কুবান অঞ্চলে জার্মানদের কয়েকটি পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে।

৩রা জুন

অদ্য কলিকাতা হাইকোর্টের **স্পেশ্যাল বেঞ্চ** ভারতরক্ষা বিধানের **২৬** ধারা মতে আটক বন্দী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এম এল এ, বিশ্বনাথ মজুমদার এম এল এ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এম এল এ, শশাঙ্কশেখর সান্যাল এম এল এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বিজয়সিংহ নাহার, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দেবব্রত রায়, বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও ননীগোপাল মজুমদারকে মুক্তি দানের আদেশ দেন। উপরোক্ত নয়জন বন্দীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করা হইয়াছিল। বন্দীদের মধ্যে শশাঙ্কশেখর সান্যাল এবং বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী ব্যতীত অপর ৭জনকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। স্পেশ্যাল বেঞ্চ কর্তৃক রায় দানের পর আদালতে উপস্থিত ৭জনকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশন অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ আমেরী বলেন যে, ভারতবর্ষে চাউলের অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক এবং যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল পাওয়া না যাইবে, ততদিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলিবে। বর্তমানে বাঙলা বিশেষ করিয়া কলিকাতার জন্য বিশেষ উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে চাউলের যে দর ছিল, বর্তমানে সেখানে তাহা আট গুণেরও অধিক হইয়াছে।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, মুসোলিনী বে-সামরিক হোম গার্ড ও সাধারণ সৈন্য তলব করিয়া সার্দিনিয়া দ্বীপ রক্ষায় নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সার্দিনিয়ার রাজধানী কাগলিয়ারী হইতে যাবতীয় বে-সামরিক লোকজন সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী প্যান্টেলেরিয়ার উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়।

রুশ রণাঙ্গনে বিমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানরা যে বিমান বহর নিয়োগ করিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতে প্রবল রুশ বিমান বহর জার্মান বিমানগুলিকে ভীষণ সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়াছে। কুবানের আকাশ যুদ্ধে জার্মানরা প্রায় সহস্র বিমান নিয়োগ করিতেছে।

চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, ইয়াংসি রণক্ষেত্রে চীনা বাহিনী বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে। চুংকিং-এর প্রবেশ পথ বিপন্মুক্ত হইয়াছে। পাঁচদিন ব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামে ৩০ হাজার জাপ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

৪ঠা জুন

জি আই পি রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার জানাইয়াছেন যে, ৩রা [illegible] বোম্বাই হইতে কলিকাতাগামী ১নং ডাউন মেলে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বর্তমানে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অনুমান ৫০ জন নিহত এবং একশত জন আহত হইয়াছে। উক্ত ট্রেনখানি বোম্বাই হইতে নাগপুর হইয়া কলিকাতা আসিতেছিল।

বাঙলা গভর্ণর ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে বঙ্গীয় খাদ্য শস্য বিষয়ক অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ নামক এক আদেশ জারী করিয়াছেন। উক্ত আদেশ অনুযায়ী বাঙলায় আগামী ৭ই জুন হইতে সারা প্রদেশব্যাপী 'খাদ্যান্বেষণ' আন্দোলন আরম্ভ হইবে। উক্ত পরিকল্পনার আওতা হইতে কলিকাতা ও হাওড়াকে বর্তমানে বাদ দেওয়া হইবে। কলিকাতা ও হাওড়া সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া উক্ত দুই স্থানের অধিবাসিগণকে নিজেদের মজুদ চাউলের পরিমাণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে বলিবেন।

আগামী ৭ই জুন হইতে গভর্নমেন্ট কর্তৃক উপরোক্ত যে 'খাদ্যান্বেষণ' আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে তদনুসারে (১) সারা প্রদেশব্যাপী একসঙ্গে খাদ্য শস্য মজুদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে একটা আন্দোলন চালাইবার; (২) এই প্রদেশে মোট কি পরিমাণ খাদ্য শস্য আছে ও প্রদেশের জন্য প্রকৃত কি পরিমাণ খাদ্য শস্য প্রয়োজন তাহার পূর্ণ তথ্য জানিবার; (৩) প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য কমিটিসমূহ গঠনের এবং (৪) যেখানে প্রয়োজন বোধ হইবে তথায় উপরোক্ত কমিটিগুলির মারফৎ অধিকতর সমতার ভিত্তিতে খাদ্য শস্য বণ্টন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিন্যান্সের কয়েকটি ধারা বিধি বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়াছেন, সেই রায়ের বিরুদ্ধে বাঙলা সরকার ফেডারেল কোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। ফেডা[illegible]নজন বিচারপতির মধ্যে দুইজন বিচারপতি—অস্থায়ী [illegible]তি স্যার বরদাচারিয়ার ও বিচারপতি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা [illegible] হইয়া অদ্য বাঙলা সরকারের সেই আপীল ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় বিচারপতি মিঃ রোনাল্ড ইঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা আলজিয়ার্স হইতে জানাইয়াছেন যে, ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আলজিয়ার্স ফ্রান্সের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে।

৫ই জুন

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য ফেডারেল কোর্ট যে স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিন্যান্স বিধি বহির্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অদ্য একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া তাহা বাতিল করা হইয়াছে।

ভারত সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার মিঃ লুই ফিসারের ভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতা নয়াদিল্লীস্থ চীফ প্রেস এডভাইসারের বিনা অনুমতিতে মুদ্রিত করা যাইবে না।

চীনা পররাষ্ট্রসচিব মিঃ টি ভি সুঙ বলেন যে, জাপানীরা চুংকিং-এর দিকে যে অভিযান চালাইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে এবং পশ্চাদপসরণের সময় জাপানীরা মার খাইতেছে।

মন্টেভিডিও হইতে এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া যায় যে, আর্জেন্টাইন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সৈন্যদল বিদ্রোহ করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট কাস্টিলো ও তাঁহার মন্ত্রিসভা জাহাজযোগে উরুগুয়ের কোলোনিয়ায় পলায়ন করিয়াছেন।

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়ার্টার্স হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মিঃ চার্চিল ও মিত্রপক্ষীয় সমরনায়কেরা সমবেত হইয়া এক্সিসের বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রচণ্ড আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

৬ই জুন

বাঙলার বর্তমান খাদ্য সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য অদ্য কলিকাতা টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকদের এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৭ই জুন হইতে বাঙলা দেশে গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে যে 'খাদ্য অভিযান' আরম্ভ হইবে, সভায় বিভিন্ন বক্তা তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, এই অভিযানে খাদ্য সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব গভর্নমেন্টের পরিবর্তে দেশবাসীর উপর আরোপ করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং চাউল মজুত করা ও মুনাফা করার প্রবৃত্তিকেই বর্তমান অবস্থার প্রধান কারণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া প্রকৃত অবস্থাকে এড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

বৈজ্ঞানিক বর্ণবোধ ঃ—তৃতীয় ভাগ। শ্রীঅধরচন্দ্র লস্কর, এসোসিয়েট সায়েণ্টিস্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার অর্ডনেন্স লেফটেন্যাণ্ট ইউ. এস. এ, প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা। প্রাপ্তিস্থান—১০নং কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। লস্কর মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লিখিত বর্ণবোধের আলোচ্য গ্রন্থখানা তৃতীয় ভাগ। শুধু শিশুরাই যে এতদ্দ্বারা উপকৃত হইবে এমন নয়, এই পুস্তক পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। ইহাতে অনেক ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় আছে।

তন্ত্রতত্ত্ব—দ্বিতীয় ভাগ। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত। মূল্য তিন টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বিদ্যার্ণব বাটী, কুমারখালি।

স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নাম বাঙলা দেশের সর্বত্র বিদিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল এবং তন্ত্র শাস্ত্রে তিনি অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। বিচারপতি উড্রফ ইহাঁরই প্রেরণায় তান্ত্রিকতার পক্ষে অনুপ্রাণিত হন এবং তিনি বিদ্যার্ণব মহাশয়ের শিষ্য স্থানীয় ছিলেন বলা চলে। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের জীবিত অবস্থায় তাঁহার লিখিত 'তন্ত্রতত্ত্ব' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁহার এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদর লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এমন গ্রন্থ সমাদৃত হইবার মতই বস্তু। হিন্দু ধর্ম সাধনার ক্রিয়াঙ্গ সমাকরূপে তন্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং সার্বভৌম সত্যের মধ্যেই তাহা পরিনিষ্ঠিত। বর্তমানে তন্ত্র সাধনার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকাতে অনেকে এই সাধনাকে হিন্দুধর্মের একটা শাখা বিশেষ বলিয়া মনে করেন। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের 'তন্ত্রতত্ত্ব' পাঠ করিলে সে ধারণা দূর হইবে এবং তন্ত্র সাধনার অন্তর্নিহিত উদার সার্বভৌম সত্যের মধ্যেই তাহা পরিনিষ্ঠিত। বর্তমানে তন্ত্র সাধনার মহাশয়ের লেখার বিশিষ্টতা এই যে, ইহা কেবল পারিভাষিক আলোচনা নহে, সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতায় এ লেখা অনুপ্রাণিত, এজন্য এ লেখা কান্তিময় এবং মধুর হইয়াছে। তিনি যে কথা বলিয়াছেন সমগ্র হৃদয়ের ছাপ তাহাতে আছে; এজন্য পাঠকের মনকে আত্মস্থিভাবে স্পর্শ করে। দুঃখের বিষয় এই যে, এমন মূল্যবান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এখন আর মুদ্রিত নাই। ইহার পুনঃ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইলে বাঙলা দেশের বড় একটা অভাব দূর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বীরত্বের রাজটীকা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক—এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২নং নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

যোগেশবাবু খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কিশোর কিশোরীদের জন্য কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সুযশ অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সেই সুযশ বর্ধিত করিবে। বর্তমান পুস্তকে রাবেয়া, জোয়ান অব আর্ক, রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, রাণী অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মাদাম চিয়াং কাইশেক, কস্তুরবাঈ গান্ধী ও সরোজিনী নাইডুর জীবনী আলোচিত হইয়াছে। ভাষা সহজ এবং সরল—স্বদেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠায় উদ্দীপনাপূর্ণ মহীয়সী নারীগণের এ জীবনী পাঠে কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা সার্থকতা লাভ করিবে। সুন্দর সুন্দর চিত্রে পুস্তকখানাকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। ছাপা কাগজ সুন্দর। আমরা ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের সমাদর হয়, ইহাই কামনা করি।

অঞ্জলি—কবিতার বই। শ্রীস্নেহলতা দেবী প্রণীত। পুস্তকখানাতে ৩২টি কবিতা আছে। লেখিকা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত নহেন; কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, কবিতাগুলি লেখিকার হৃদয়রসে স্নিগ্ধ, আমরা তাঁহার এই কথার সমর্থন করি। এই কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই অনাবিল আনন্দ পাইবেন।

কেদারপুর মুন্সীবাটী—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র গুপ্ত সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি, এস-সি,৯।ই, যোগোদ্যান লেন, কলিকাতা।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেদারপুরের বৈদ্যবংশীয় মুন্সী পরিবার পূর্ববঙ্গের সর্বত্র খ্যাতিসম্পন্ন। স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় এই পরিবারের সন্তান। সঙ্কলয়িতা এই পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং কুলপঞ্জী আলোচ্য পুস্তিকায় প্রদান করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত এবং রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের জীবনী দিয়াছেন। বাঙলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার পক্ষে এইরূপ সংগ্রহের প্রয়োজন রহিয়াছে।

কলির শেষ ঃ—শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট, ২১।বি সিমলাই পাড়া লেন কাশীপুর পোঃ, কলিকাতা।

কলিযুগ শেষ হইয়া আসিল এবং আগামী ১লা আগস্ট হইতেই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, কথাটা বর্তমানের এই দুর্দিনে বিশেষভাবেই আশ্বাসোদ্দীপক। এই বিষয় লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেকে অনেক রকম আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার কলিযুগের অবসান ঘটিয়াছে, এই বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, কল্কি-পুরাণ, কোরআন, বাইবেল এই সব ধর্মগ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক যুক্তি দেখাইয়াছেন। যুক্তি উত্থাপনে তাঁহার রীতিতে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিপাদ্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার কৌশলটি সুন্দর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রন্থকারের পাকা হাতের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। ভাষা বেশ সরল। যাঁহারা এ বিষয়ে আগ্রহসম্পন্ন, তাঁহারা বইখানা পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

কলিকাতায় মহাপ্রচারণ কাহিনী—ব্রহ্মচারী তরুণবন্ধু দাস, এম-এ। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিকীর্তন কার্যালয়। ২৯, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

মহানাম সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সম্বন্ধে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শ্রাবণ হইতে চৈত্র পর্যন্ত (১৩৪৯) ১৭টি সভার বিবরণ। বাঙলা দেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সব সভায় সভাপতি সভাপতি স্বরূপে যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। ধর্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এমন পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

হাসির মূল্য—শ্রীনিত্যানন্দ দাস প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—শ্রীমতী প্রভাবতী দাস, জলপাইগুড়ি। ছেলেদের অভিনয়ের জন্য নাটকের বই। পুস্তকখানায় তিনখানা নাটিকা আছে। নিত্যানন্দবাবু কিশোর-সাহিত্যে সুলেখক। কিশোর সমাজে তাঁহার এই পুস্তকের আদর হইবে।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ সাল Saturday, 29th May, 1943 [২৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি

গত ২৩শে মে, রবিবার বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন বর্তমান মন্ত্রিসভার নীতি বিশ্লেষণ করিয়া হাওড়ার টাউন হলে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বাঙলার খাদ্য-সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, অনতিবিলম্বে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যে হ্রাস পাইবে, এ বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ নাই। স্যার নাজিমুদ্দীনের এ কথায় নূতনত্ব কিছুই নাই; তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা একথা শুনিতেছি। খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী মজুতদারদিগকে সায়েস্তা করিয়া বাঙলার খাদ্যাভাব দূর করিবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এবং বিবৃতি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহার পর ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য চলাচলের অবাধ সুবিধাও দান করিয়াছেন; কিন্তু কাজে কিছুই আসিতেছে না। ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার আজিজুল হক আমাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, এক সপ্তাহকালের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষভাবে চাউলের মূল্য কমিয়া যাইবে, তিনি এই আশা করেন; বাঙলার অর্থসচিব মিঃ তুলসী গোস্বামীও অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মাসাধিক হইল নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় নাই। বাঙলায় নানাস্থানে পয়সা দিয়াও লোকে চাউল পাইতেছে না। মন্ত্রী মহোদয়গণ কলিকাতাবাসীদিগকে কণ্ট্রোলের দোকান দেখাইয়া দিতেছেন। মাঝে মাঝে এই সব কণ্ট্রোলের দোকানে কি দরে চাউল, আটা, চিনি বিক্রয় হইবে, তাহার দর বাহির হইতেছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সব দোকানে শহরের লোকের অভাব দূর হইতে[ছে] না; সেগুলির অব্যবস্থা এবং সেগুলির আশ্রয় লইতে গিয়া নরনারী যে দুরবস্থা তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমিবে; কেবল এই ফাঁকা কথার দ্বারা কোন কাজ হইবে না; কথা অনুযায়ী যদি কাজ না হয়, তবে কথার মূল্যও কি[ছু] থাকিবে না। মন্ত্রীরা যদি কাজের পথই অবলম্বন করিয়া থাকে[ন], তবে তাহার কোন শুভ ফলই এ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না, ইহ[ার] কারণ কি? খাদ্যসচিবের মতে তো দেখা যাইতেছে যে, মজুতদারদে[র] মাল বাজারে বাহির করাই একমাত্র কাজের পথ। এ কাজ এ[মন] দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়। যাঁহাদের হাতে করিৎকর্মা গোয়েন্[দা] বিভাগ রহিয়াছে, তাঁহারা এ কাজ কয়েক দিনের মধ্যেই করিয়া ফেলি[তে] পারেন। কোন কোন স্থানে মজুত মাল বার করিবার খবরও আম[রা] না দেখিতেছি এমন নহে; কিন্তু তথাপি অন্তত আইনের ভয়ে মাল মজুত করিবার ঝোঁক মজুতদারদের কমিতেছে না কেন? কার[ণ] সে ঝোঁক যদি কমিত এবং ভয়ে পড়িয়া তাহারা যদি মজুত ম[াল] বাজারে ছাড়িত, তবে ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক যে চাউল বাঙ[লা] দেশে আমদানী হইতেছে, তাহাতে বাজারে চাউলের অভাব এ[ভাবে] ঘটিত না। এমন অবস্থায় বাধ্য হইয়াই এমন ধারণা করিতে হয় [যে] ব্যাধির কারণ প্রকৃতরূপে নির্ণীত হয় নাই কিংবা নির্ণীত হইলে[ও] তাহার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইতেছে [না।] এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমি[টি]

সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন, ছোটখাট আড়তদার এবং মধ্যশ্রেণীর দ্বারা চাউল মজুতের কথা লইয়া খাড়াবাড়ি করা হইতেছে। হিন্দু মহাসভার মতে সমস্যার প্রকৃত সৃষ্টি হইয়াছে গভর্নমেণ্ট এবং বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানী কর্তৃক ব্যাপকভাবে চাউল মজুত করিবার ফলে; এই সব ব্যবসায়ী কোম্পানীর মধ্যে অধিকাংশই অবাঙালী। মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলা সরকারকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট কয়েকটি অঞ্চল হইতে চাউল রপ্তানির পক্ষে বাধানিষেধ তুলিয়া দিবার ফলে বাঙলা দেশে যে চাউল আমদানী হইবে, তাহা যাহাতে বিদেশী লাভখোরদের এবং মজুতদারদের হাতে গিয়া না পড়ে, সেদিকে তাঁহারা যেন লক্ষ্য রাখেন। হিন্দু মহাসভার এই মন্তব্য উপেক্ষা করিবার নয়। বাঙলা দেশে খাদ্য সম্পর্কে বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সাহসের সঙ্গে সোজাসুজি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে; পেটের ক্ষুধার যেখানে সমস্যা, সেখানে শুধু কথার দ্বারা নিজেদের নীতির যৌক্তিকতা দৃঢ় রাখা যায় না; কাজের দ্বারা যুক্তিকে পাকা করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

স্যার নাজিমুদ্দীন তাঁহার বক্তৃতায় রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁহার সে উক্তির মধ্যেও আমরা আশ্বস্ত হইবার মত কিছু দেখিতে পাইতেছি না। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এ সম্বন্ধে যেমন ধরাবাঁধা কথা দিয়াছিলেন; হাওড়ার বক্তৃতায় তেমন ধরাবাঁধা কথা কিছুই নাই; তাঁহার উক্তি এক্ষেত্রে একেবারেই অস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন যে, রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু শান্তি এবং মৈত্রীর আবহাওয়া বজায় রাখার উপর এই মুক্তি নির্ভর করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কথা এই যে, আমরা বাঙলা দেশে রাজনীতিক অশান্তির কোন আবহাওয়ার পরিচয় পাইতেছি না। হক মন্ত্রিমণ্ডল দেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির ফলে দেশে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনর্থকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, হক মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি তাহা দূর করিয়া বাঙলা দেশে এদিক হইতে আশ্বস্তির ভাব সৃষ্টি করে; স্যার নাজিমুদ্দীনের বর্তমান লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের নীতিতে সে আবহাওয়া যদি বজায় থাকে, তবে সাম্প্রদায়িকতার ভয় বাঙলা দেশে নাই। সুতরাং কোন দিক হইতে ভয়ের কারণ যখন নাই, তখন বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের জন্য বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এতদিন পর্যন্ত কার্যকর হইতেছে না কেন? যুক্তপ্রদেশে রাজনীতিক অশান্তি বাঙলা দেশের চেয়ে বেশী হইয়াছিল এবং সেখানে শাসনতন্ত্র গভর্নরের করায়ত্ত; তথাপি সেখানে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে; কিন্তু স্যার নাজিমুদ্দীন প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কয়জন রাজনীতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন আমরা জানিতে পারি কি? পক্ষান্তরে আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং তাঁহাদের ন্যায় জনসাধারণের বিশ্বস্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ, ইঁহাদের কেহই এ পর্যন্ত মুক্তিলাভ করেন নাই। এ দিকে বিনা বিচারে আটক করিবার সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডল কথা অনুসারে কাজ করেন, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। বাঙলা আজ বড়ই বিপন্ন; এই অবস্থায় বাঙলার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন যে একান্তই প্রয়োজন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, পাকিস্থানী নীতি লইয়া লাফালাফি করাতে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, এখন সে সময় নয়; অথচ শুনিতেছি, বাঙলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডল ইতিমধ্যেই বাঙলা দেশে দুইটি পাকিস্থানী সম্মলনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেশের লোক আজ অন্ন-সমস্যায় অস্থির, এরূপ অবস্থায় ইহার কি একান্তই প্রয়োজন ছিল? আমরা স্যার নাজিমুদ্দীনকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভারতের বোঝা

বিলাতের সংরক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলনে ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অবলম্বিত নীতির সমর্থন করিয়া সম্প্রতি একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে অপ্রত্যাশিত কিছুই নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বভার যে দলের উপরই থাকুক না কেন, ভারতের বেলায় সংরক্ষণশীল দলের অবলম্বিত নীতিই কার্যকর হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার জন্য যাঁহাদের দরদের অন্ত নাই, ভারতের বেলায় নিজেদের অভিভাবকত্বের মর্যাদা জাহির করিয়া ভারতবাসীদের অধীনতাকে দীর্ঘ করিবার জন্য তাঁহারা যুক্তির যে বাহাদুরী দেখাইয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। সংরক্ষণশীল দলের এই সভায় ভারত সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া ক্যাপ্টেন গডফ্রে নিকোলসন বলেন, ভারতের ৩৮ কোটি নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দায়িত্ব আমাদের রহিয়াছে, সে দায়িত্ব আমরা এখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করাই বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য; কারণ, সমস্যা ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে নয়; উহা ভারতবাসীদের নিজেদের ভিতরে। বলা বাহুল্য, এ সবই ধাপ্পাবাজি। জগতের লোকের ইহা বুঝিতে বাকী নাই যে, দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতবাসীদের নিজেদের ভিতর কোন অনৈক্য নাই; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই অনৈক্যের একটা কৃত্রিম অবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। মার্কিন দেশের জনমত বিশেষভাবে ব্রিটিশের ভারত সম্পর্কিত বর্তমান নীতিতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলপূর্ণ প্রচারকার্য সে দেশে সার্থক হইতেছে না। ক্যাপ্টেন গডফ্রে নিকোলসন এজন্য মার্কিন জাতির উপরও একহাত লইয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের বর্তমান নীতির বিরুদ্ধে ভারতে যেমনই সমালোচনা হউক না কেন, কিংবা আটলাণ্টিকের পর পার হইতে অর্থাৎ আমেরিকা হইতে যাহাই বলা হউক না কেন, আমরা আমাদের নীতি হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইব না। আমাদের জাতীয় চরিত্রের ইহাতে পরীক্ষা হইবে; এজন্য আমাদিগকে সাহস, পরার্থপরতা এবং সঙ্কল্পশীলতা প্রদর্শন করিতে হইবে। খুবই ভাল কথা; কিন্তু একটা দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিবার পরিণতি কি দাঁড়ায়, তাহা বুঝিবার জন্য আয়লণ্ড এবং আমেরিকা সম্বন্ধে অতীত অভিজ্ঞতার কথা আমরা ইঁহাদিগকে স্মরণ করিতে বলি।

আদর্শ ও বাস্তব

আন্তর্জাতিকতার যে আদর্শ লইয়া রুশিয়া একদিন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, জাতীয় বাস্তব স্বার্থের আঘাতে তাহা বহু পূর্বেই এলাইয়া পড়িয়াছিল; এতদিনে তাহার একেবারে অবসান ঘটিল। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর আদেশে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর বিভিন্ন দেশে যে সব কমিউনিস্ট দল আছে; রুশিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে সে সবের আর কোন যোগ থাকিল না। বলা বাহুল্য এ সিদ্ধান্তের ফলে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রাণকেন্দ্রের উপরই আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় রুশিয়ার পক্ষে ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। ভৌগোলিক ব্যবধানকে অস্বীকার করিয়া আন্তর্জাতিকতার এই আদর্শ রুশিয়ার মিত্রশক্তির মনেপ্রাণে তাহার প্রতি চাপা একটা অবিশ্বাসের ভাব দৃঢ় করিয়া তুলিতে ছিল।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত তথাকথিত গণতন্ত্র, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ—এই দুইয়ে কিছুতেই মিল খাইতেছিল না। ইহার ফলে অবশেষে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাস্তব দায়ে রুশিয়াকে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গুটাইয়া লইতে হইল। ফ্যাসিস্টবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য জাতীয়তার আদর্শই প্রয়োজন, এ সত্যকে স্বীকার করিতে হইল। স্বদেশের স্বার্থের প্রয়োজনে পড়িয়া রুশিয়ার কমিউনিস্টরা কমিউনিজমের মূল আদর্শকে লঘু করিতে বাধ্য হইলেন। রুশিয়া এই আদর্শকে বলি না দেওয়া পর্যন্ত শুধু ফ্যাসিস্টবিরোধিতার ভিত্তিতে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে রুশিয়ার মৈত্রী ঘটিতেছিল না। ফ্যাসিস্ট বিরোধিতাকে কার্যকর করিবার জন্য আজ প্রয়োজন হইল জাতীয়তাকে স্বীকার করা। ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদকে উড়াইয়া দিয়া যাঁহারা আন্তর্জাতীয়তার বুলির জোরে দেশের স্বাধীনতার সাধনা ক্ষেত্রে বুদ্ধিবিভ্রম সৃষ্টি করিতেছেন, আমরা আশা করি অতঃপর তাঁহাদের চৈতন্য হইবে।

সপ্রু-জয়াকরের চেষ্টা

বন্দী কংগ্রেস নেতৃদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচারের জন্য একটি নিরপেক্ষ ট্রাইবিউনাল গঠন করা হউক, নতুবা তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করা হউক। এই অনুরোধ করিয়া স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং ডাক্তার জয়াকর ও অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, ইঁহাদিগকে এইভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখিবার ফলে দেশের লোকের মনে উত্তরোত্তর অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। গভর্নমেণ্টের হয়ত ধারণা এই যে, দেশের লোকের সে মনোভাবকে উপেক্ষা করিবার মত তাঁহারা যথেষ্ট শক্তি রাখেন এবং কাহাকে এইভাবে বিনা বিচারে কত দিনের জন্য আটক রাখা হইবে সে বিচার করিবার তাঁহারাই একমাত্র মালিক। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যাঁহারা সৌহার্দ কামনা করেন, তাঁহারা এ দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখিতে পারেন না। বন্দীভূত নেতাদিগকে নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগ দান করা কর্তব্য। গভর্নমেণ্ট যদি কোন কারণে প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ ট্রাইবিউনাল গঠনে প্রস্তুত না থাকেন তবে ন্যায় বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা কর্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থাজনিত সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে সমর্থ হইবেন। স্যার তেজ বাহাদুর এবং ডাক্তার জয়াকরের এই প্রস্তাব কতটা সফল হইবে, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ আছে; কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির যাঁহারা নিয়ামক, ভারতের অচল অবস্থাজনিত সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহারা ব্যস্ত নহেন; কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখিবার নীতিকেই তাঁহারা বড় করিয়া ধরিয়াছেন এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বকে চিরন্তনভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রয়োজনই ইহার মূলে রহিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে ন্যায়, নীতি বা যুক্তির কথা উত্থাপন করা বৃথা।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

ওয়াশিংটন বৈঠকের উপসংহার হইয়াছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উভয়ে মিলিত হইয়া এই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহা জানা যায় নাই। যাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছিলেন, চার্চিলের বক্তৃতায় তাঁহারা নিরাশ হইলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধ যদি দীর্ঘ দিন চলে তবে একটা বিপদ আছে। জার্মানির মতলব হইল এ যুদ্ধকে দীর্ঘদিন স্থায়ী করা এবং সেই ভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে কোন কোন শক্তিকে রণশ্রান্ত করিয়া তাহাদের ভিতরকার সংহতি শক্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা নাকি সৃষ্টি হইয়াছিল যে, হিটলার পরাজিত হইলে ইংরেজ প্রশান্ত মহাসাগরের লড়াই হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে। মার্কিন প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ইতিপূর্বে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর দুই দুইবার বৈঠক হইবার পরও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমরনীতি সম্পর্কে মার্কিন জাতির মনে এমন ধারণা বিদ্যমান ছিল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। চার্চিল সাহেবের বক্তৃতার ফলে যদি সে ধারণা এতদিনে দূর হইয়া থাকে, মঙ্গলের কথা বলিতে হইবে।

আত্তু দ্বীপের লড়াই

উত্তর আমেরিকার আলাস্কার উপকূলবর্তী এলুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমপ্রান্তে শেষ দ্বীপটির নাম আত্তু। এলুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে জাপানীরা ঘাঁটি বাঁধিয়াছে। আত্তু হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন সেনাদল লড়াই করিতেছে। এই লড়াই নাকি শেষ হইয়া আসিল। রুশিয়ার মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ডেভিস সম্প্রতি একটি বেতারবার্তায় বলিয়াছেন, জাপানীরা আত্তু দ্বীপটিকে তাহাদের হিসাবের খাতায় খরচ লিখিয়া দিয়াছে। চির-তুষারাচ্ছন্ন এই দ্বীপের গুরুত্ব অবশ্য ভৌগোলিক দিক হইতে বিশেষ কিছু নাই। আত্তুর আয়তন দৈর্ঘ্যে ২৫ মাইল এবং চওড়ায় ১৮ মাইল মাত্র। আত্তুর আবহাওয়া দুরন্ত দুর্যোগপূর্ণ। অন্য দিক হইতে আত্তুর গুরুত্ব না থাকিলেও সামরিক দিক হইতে গুরুত্ব আছে। জাপানীরা এলুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের অধিকারে রাখিয়া রুশিয়া এবং মার্কিনের সংযোগসূত্রের মধ্যে অন্তরায় ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। রুশিয়া যদি জাপানের বিপক্ষে কোনদিন যুদ্ধঘোষণা করে, তবে আমেরিকা হইতে রুশিয়াকে সাহায্য করিতে হইলে এলুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার দখলে রাখা দরকার। আত্তু যদি জাপানের হাতে থাকে, তবে সে কাজ সহজ হইবে না। আত্তুর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া জাপানীদিগকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করিবে। ইহা ছাড়া ভবিষ্যতে জাপানের উপর উড়োজাহাজযোগে বোমা বৃষ্টির পক্ষেও আত্তুর ঘাঁটি সম্মিলিত পক্ষকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আত্তু দখল করিতে পারিলেই এলুইসিয়ানে মার্কিন প্রভুত্ব পাকা করা যাইবে না। কিস্কা দ্বীপে জাপানীদের অধিকতর পাকা ঘাঁটি রহিয়াছে।

কবিতা

বৃন্ত

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মী আসেন অন্ধকারের দীপ জেলে
আশায় এবং আশঙ্কাতে দিন কাটে,
আজ সকালে সময় গেলো 'কন্‌ট্রোলে'
ক্লান্ত চোখে তবুও দেখি ঃ দিন চলে!

কোন্ সীমানার মেঘের পারে তন্দ্রাতে
দেখেছিলাম জ্যোতির লতা বিদ্যুতে,
হয়তো মনের গোপন তারে সুর ছিলো
হঠাৎ দেখি আলোক লেখা ছায় মেঘে!

একটু হাসি, একটু চাওয়া বেশ লাগে,
বুকের তলে তরল তৃষা কম্পিত,
রাত্রি আমার স্বর্ণে ঢাকা তাইতে কি?
বর্ণচোরের মর্ম্ম অবগুণ্ঠিত?

লক্ষ্মী আসেন অন্ধকারের দীপ জেলে
আশায় আশায় তাইতো আমার রাত কাটে,
হস্তে কি তাঁর জ্বলছে আলো ঝলমলে
ঊর্ধমুখীন ফুলের মতো আজ ভোরে?

সংঘাত

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

অলকা তোমার আঁচল বিছানো এখনো কেন?
বাহির দুয়ারে বৃষ্টি হেনেছে জোর আঘাত,
এসে ফিরে গেছে মলমল মাখা ফুল-ভ্রমর,
বনের ছায়ায় ঝরে গেছে রাত, পুরানো রাত।
আঁচল এখন এখানে পাতার নেই মানে,
ও-ফাঁদে অধুনা ঘটবেই নাকো চরণপাত।

বাহিরে ডেকেছে মৃত্যুর দূত শুনি কানে,
দলে দলে আজো ঘর-ছাড়া হয়ে রুধি ডাকাত,
ফসলে আমার ঘোড়ার খুরের কেন ধূলি?
ফুলের কোরকে সহসা কেন এ অগ্নি তাত?
অলকা এখানে পেতো না তোমার আদিম ফাঁদ।

বাইরে জনতা মুখ চেয়ে আছে কাতরতায়,
পুবের দুয়ারে রক্ত পিশাচ হোক নিপাত।
আমার সোনার প্রাণ হরে নেবে—দুঃসাহসঃ
শুরু করে দিই সময় থাকতে এ সংঘাত!
উদ্দীপনায় কেঁপে ওঠে তাই দুখানা হাত।

দিন ও রাত

শ্রীসুর্মাণ মিত্র

রজনী সে মায়াময়।
অসম্ভব যত কথা ভাবিতে করে না কিছু ভয়।

চলে যাই সাত সমুদ্র-তেরো নদী পার,
কত শত সিংহ-দুয়ার
রেখে পাছে
স্বর্ণ-পালঙ্কেরই কাছে,
যেখানেতে সুপ্তোত্থিতা রাজকন্যা ঠায়
বসে থাকে কারও প্রতীক্ষায়।

কিন্তু রবি
চতুর্দিকে আলো ধরে বলে,—"ওগো কবি,
জ্যোৎস্নালোকে যারে তুমি ভেবেছিলে রূপসীর চুল
সে তোমার ভুল।
ও যে ঘাস ক্ষুদ্র অতি, মানুষের কাছে ওরা কেনা..."
থাক্, আর সত্যরূপ মোর চোখে দেখাতে হবে না।
রজনীর ভাবা কথা পুড়িয়াই যদি হবে ক্ষয়
দিনের আলোকে,
রাত্রি তবে কেন স্বপ্নময়?

বাঁকা স্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

৯

পরের দিন স্কুলে যাইতেই কমল আসিয়া আমার পাশে বসিল। ইদানীং সে আমারই সংগে সংগে সর্বদা থাকিত। সে প্রতিদিনের অভ্যাস মত নানা রকমের কথা সমোৎসাহে আমার নিকট বলিয়া যাইতে লাগিল। আমিও 'হুঁ-হাঁ' দিয়া কোনরকমে তাহাতে সায় দিয়া চলিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিল। বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার কথা শুনিবার আর আমার আগ্রহ নাই। ক্লাশের মধ্যে আমাকে কমল সে সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না। টিফিন হইলে স্কুলের পিছনে যে বাগান ছিল, তাহারি মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কমল বলিল, আলো, তোর কি হয়েছে সত্যিকরে বল না ভাই?

আমি প্রথমে বলিলাম, কিছুই হয় নাই, কিন্তু কমল সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া যখন বার বার আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না -বলিলাম, আমি বদমায়েস, আমার সংগে মিশতে তোর মা ত' বারণ করেছেন, আর তুইও ত' তাঁকে বলেছিস, আর মিশবি না। তাই আমি আগে থেকে নিজেই সাবধান হচ্ছি। অভিমানে তখন আমার কণ্ঠস্বর বুজিয়া আসিতেছিল।

কমলের কাছে ইহার কারণ আর গোপন রহিল না। সে বুঝিল যে কাল সন্ধ্যার ব্যাপার সমস্তই আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাই কোনরকম লুকোচুরি না করিয়া সে বলিল, দূর তুই ভারী বোকা, এটা বুঝতে পারলি না যে, তখন ওই কথা না বললে মা আমায় ছাড়তো না, আরো মারতো, তাই মিছিমিছি বলেছি। আমি বলিলাম তা বলে তুই মিথ্যে কথা বলবি মার কাছে।

আরে, ওকে মিথ্য কথা বলে নাকি? বরং মারই ভুল হয়েছে, অন্যে মিথ্যে করে তাঁকে যা লাগিয়েছে, মা তাই বিশ্বাস করেছেন। তুই ত সব কথা জানিস না, আমি তোকে বলিনি—পাছে তুই মনে কষ্ট পাস তাই।

বলিলাম, ভালই হয়েছে না জেনে।

সে বলিল, না, যখন তোর মনে এই রকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তখন শুনতেই হবে। এই বলিয়া কমল যাহা বলিল, তাহার সারাংশ হইল এইরূপ। —কমল কিছুদিন লাইব্রেরীর বই লইয়া এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠ্য পুস্তক সে আদৌ পড়িত না, ফলে সাপ্তাহিক পরীক্ষায় সে দুই-তিনটি বিষয়ে নম্বর পায় কম। ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার পিতা হেবোর দলের দুই-চারিটি ছেলেকে গোপনে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলে, আলোকের সংগে মিশিয়া কমলের এইরূপ হইয়াছে। তাই তাহার পিতামাতার আলোকের সম্বন্ধে ওই-রূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কমল আমার সেই নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কেন জানি না, কয়েক মিনিট পরেই বলিয়া উঠিল, আমি তাদের মন থেকে এ-ভুল দূর করবো!

আমি বলিলাম, কি দরকার ভাই, মিছিমিছি আমার সংগে মিশতে দেখলে তুই আরো মার খেয়ে মরবি মায়ের কাছে। তুই কি জানিস না, তোকে মারলে আমার বড় কষ্ট হয়?

কমল বলিল, যতই মা মারুক, তবু আমায় কেউ তোর কাছ থেকে সরাতে পারবে না। এই বলিয়া একটু থামিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, শুধু তুই যেন আমায় ত্যাগ করিস নি ভাই?

শেষের কথাগুলি বলিবার সময় তাহার ডাগর চোখের কোনে অশ্রু টলমল করিয়া উঠিল। আমি ইহার উত্তরে কি বলিব বুঝিতে না পারিয়া শুধু তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। তারপর অস্ফুট-স্বরে বলিলাম, আচ্ছা।

সেদিন এই-দুইটি কিশোরের এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া বোধ করি অন্তরীক্ষ হইতে ভগবান হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। তাই ইহার কয়েকদিন পরেই একটা সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের দুইজনের মনে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আর কোনদিন জোড়া লাগে নাই। ঘটনাটি হয়ত অন্যের কাছে তুচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে তাহা কত বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহাই বলিতেছি। কমল সেইবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিল, আর আমি প্রথম। কমলের আনন্দ ধরে না। শুধু এই সম্মান পাইয়াছে বলিয়া নহে; ইহার দ্বারা যে সে সকলের ভুল ভাঙগাইয়া দিয়াছে তাহার জন্য। ইহার পূর্বে কোনদিন সে কোন স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সাধারণ ছেলেদের মত বছর বছর শুধু ক্লাশে উঠিত। অবশ্য এবারের এই কৃতকার্যতার জন্য আমার কিছু হাত ছিল। আমি তাহাকে প্রয়োজনীয় অংক, শক্ত শক্ত পাঠ্য পুস্তকের অংশবিশেষ সহজ ও সরলভাবে বুঝাইয়া দিতাম। আমারও মনে একটা জেদ চাপিয়া গিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, তাহাকে পড়াশুনায় ভাল করিয়া তুলিবই। লোকে দেখিবে, বিশেষ করিয়া কমলের বাপ-মা— যে, আমার সংগে মিশিয়া তাঁদের ছেলে বদমায়েস হয় নাই, লেখা-পড়ায় ভাল হইয়াছে। তাই তাহার এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমারও আনন্দ কম হয় নাই। কমলের ত' ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা ছিল না আমাকে!

প্রাইজের দিন আনন্দ আরো বাড়িল। যেমন আমার, তেমনি কমলের। কমল এইবার প্রথম প্রাইজ পাইবে, তাহার আনন্দ অবশ্য খুবই হইয়াছিল, কিন্তু আমার আনন্দ তাহার চেয়েও বেশী। প্রথমত, সে আমার সাথী, দ্বিতীয়ত, এই পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে আমারই কৃতিত্ব বেশী। সকাল হইতে আমরা দুইজনে অন্যান্য ছেলেদের সংগে দেবদারু পাতা কাটিয়া আনিয়া স্কুলবাড়িকে সাজাইয়া, লাল নীল সবুজ রঙের কাগজ কাটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া চেন নিশান, ফুল প্রভৃতি কত রকম কি তৈয়ারী করিয়া, স্কুলের বেঞ্চি-গুলিকে মাস্টার মশায়ের উপদেশ মত সারিবন্ধ করিয়া রাখিয়া যখন বাড়ি ফিরিলাম, তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। চারটায় প্রাইজ; হেড মাস্টার মহাশয় সকাল সকাল যাইতে বলিয়া দিলেন। কমলের

সঙ্গে কথা হইল, তিনটার সময় আমি তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিব। আমি কমলের বাড়ি যাইতাম না তাহার মায়ের ভয়ে। তাহাদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটি আম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া মুখে একপ্রকার 'হুইসিল' বাজাইতাম, তাহা শুনিয়া কমল চলিয়া আসিত। এইভাবে আমরা প্রত্যহ মিলিত হইয়া একত্রে স্কুলে যাইতাম।

সেদিন আর কোন কাজে মন বসিতেছিল না। বার বার কেবল জ্যাঠাইমার ঘরে ঘড়ি দেখিতে যাইতেছিলাম। কখন তিনটে বাজিবে! আমার অতি ব্যস্ততা দেখিয়া জ্যাঠাইমা বলিলেন, বলি--তুই ত' একলা প্রাইজ পাবি না, আরো অনেক ছেলে পাবে, তবে এত ব্যস্ত কিসের? এখন একটু ঘুমুগে যা, দেরি আছে অনেক, ভুতোও ত' যাবে স্কুলে?

আমার চোখে তখন ঘুম আসিতেছিল না, তাহা আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইব ভাবিয়া পাইলাম না। প্রাইজের দিনে এমন একটা আনন্দ হয় মনে যে, তাহাকে চাপিয়া রাখা শক্ত! তাই অতি কষ্টে সেই দুই ঘণ্টা সময় কাটাইয়া ফরসা জামা-কাপড় পরিয়া আমি জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি ঘুমাইতেছিলেন, বার-তিনেক ডাকিবার পর চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার দুই পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেই তিনি আশীর্বাদ করিলেন 'রাজা হও' বলিয়া। তারপর আবার বিছানায় দেহ এলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, হ্যাঁরে প্রাইজ কি পালিয়ে যাচ্ছে যে, এই দুপুর থেকে সেখানে গিয়ে হত্যে দিতে হবে?

আমি বলিলাম, দুপুর কি, তিনটেই ত' বেজেছে! আর এক ঘণ্টা সময় মোটে আছে।

তিনি বলিলেন, তা এক ঘণ্টা সময়টা কি কম নাকি?

বলিলাম, হেড মাস্টার মশায় যে তিনটের সময় যেতে বলেছেন?

হেড মাস্টারের আর কি, খেয়ে দেয়ে দিব্যি ঘুম মারছেন, আর এই কচি ছেলেগুলোকে দিয়ে যত খাটিয়ে নিচ্ছেন, তা যাও আবার দেরি হ'লে হয়ত তাঁর রাগ হবে!

জ্যাঠাইমার অনুমতি পাইয়া যেন বাঁচিলাম। তারপর সেখান হইতে সোজা জ্যাঠামশায়ের ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একেবারে কমলের বাড়ির দিকে চলিলাম।

কিন্তু কমল কৈ? তাহার ত' দেখা নাই! গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বার বার মুখে সেই সংকেতধ্বনি করা সত্ত্বেও আমি তাহার কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না। তবে কি সে আমি আসিবার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে? এই মনে করিয়া ধীরে ধীরে তাহার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম, এখনো সে আছে কিনা দেখিবার জন্য।

কঞ্চির বেড়া দেওয়া ঘেরা ছিল তাহাদের বাড়ি। তাহারি ভিতর দিয়া চুপি চুপি একবার কমলের সন্ধান লইয়া চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম, কমল বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মা তাহাকে সাজাইয়া দিতেছেন। তিনি প্রথমে তাহাকে জামা কাপড় পরাইয়া দিলেন, তারপর তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিলেন, তারপর জুতোটা আনিয়া তাহার পায়ে পরাইয়া দিলেন। শেষে একটা এসেন্সের শিশি খুলিয়া তাহার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন।

কমলের মন তখন স্কুলের জন্য বোধ হয় ছটফট করিতেছিল। তাই সে বলিল, হয়েছে মা, আর নয়?

তিনি বলিলেন, আর একটু দাঁড়া বাবা। এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া কমলের মুখটা একবার মুছাইয়া দিলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম এখানে ওখানে লাগিয়াছিল। তারপর আর একবার চিরুণী দিয়া তাহার চুলটা আঁচড়াইতে লাগিলেন। ছেলেকে সাজাইয়া যেন তাঁহার আশ মিটিতেছিল না।

আর নয় মা হয়েছে। এই বলিয়া কমল মায়ের হাতটা মাথার উপর হইতে সরাইয়া দিয়া যেমন তাঁহাকে প্রণাম করিল, অমনি তিনি ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে তাহার দুই গালে দুইটি চুম্বন করিলেন।

আমি এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত দেখিতেছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। সহসা মনে হইল যেন পৃথিবীটা একটা প্রবল ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিল। আমার চারিদিকের গাছপালা, আকাশ বাতাস, মাটী সব যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমি টলিতে টলিতে তখন সম্মুখে যে বিরাট বাগান ছিল, তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া একটি গাছের তলায় বসিয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যখন স্কুলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন স্কুলের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য! প্রাইজ দেওয়া শুরু হইয়া গিয়াছে। আমি জনতার পিছনে গিয়া এক জায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। এমন সময় কোথা হইতে কমল ছুটিয়া আসিয়া বলিল, এই যে আলো, কোথায় ছিলি ভাই এতক্ষণ! আমি তোর বাড়িতে গিয়ে খুঁজে এলুম--ভুতো বললে, অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে! তারপর স্কুলে এসে এতক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করছি কোথায় ছিলি ভাই?

বুঝিলাম, আমি যে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম, তাহা সে শুনিতে পায় নাই। কোথায় ছিলাম, কি বলিব, ভাবিয়া না পাইয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিলাম, একটু দেরি হ'য়ে গেল!

আনন্দে কমল তখন ঝলমল করিতেছিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে যেন একটু মুষড়াইয়া গেল, তারপর বলিল, চল --তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, তোকে যে পণ্ডিতমশায় খুঁজছেন! এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, এই যে স্যার আলো এসেছে?

হেড পণ্ডিতমশায় বলিলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি--এক্ষুণি যে নাম ডাকা হবে, সব এক জায়গায় এসে দাঁড়া।

আমি দাঁড়াইলাম তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে।

একে একে তিনবার আমার ডাক পড়িল। তিনখানি প্রাইজ আমি একসঙ্গে পাইলাম। লেখাপড়ার জন্য, সচ্চরিত্রের জন্য এবং নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতির জন্য। যন্ত্রচালিতের মত আমি প্রাইজ-গুলি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কত বক্তৃতা, কত গানবাজনা হইল, কিছুই আমার ভাল লাগিল না। আমার মন তখন কোথায়, কি ভাবিতেছিল, কে জানে! তাই প্রাইজ শেষ হইবার পূর্বেই আমি চুপি চুপি বাড়িতে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা তখনো হয় নাই, তবে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল পশ্চিমের আকাশে ও গাছপালার মাথায়। আমি চুপ করিয়া শুইয়া তাহার দিকে তাকাইয়াছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কি একটা হাতে করিয়া ভুতো ঘরে ঢুকিল। তারপর কণ্ঠস্বর নিম্নতর করিয়া কহিল, এই আলো তুই বড্ড বোকা, খাবার না খেয়েই চলে এলি কেন?

ইহার উত্তরে কি বলিব ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কহিলাম, ভুলে গেছি।

ভুতো বলিল, তুই ভুলে গেলি বলে আমি ছেড়ে দেবো ভেবেছিস --এই দ্যাখ আমি তোর খাবারটা চেয়ে এনেছি--এই নে খা--

বলিলাম, তুই খা ভাই, আমার খেতে ইচ্ছে নেই।

ভুতো আবার বলিল, অন্তত একটা খা ভাই।

বলিলাম, না।

তখন সে বিনাবাক্যব্যয়ে সেই খাবারগুলি উদরসাৎ করিয়া বলিল, জানিস আলো, এইটে নিয়ে আমার চারবার খাওয়া হলো? স্কুলে আমি তিনবার নিয়েছি--কেউ ধরতে পারেনি।

এই বলিয়া আমার প্রাইজ তিনটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে গিয়া বলিল, মা এই দ্যাখো আলো তিনটে প্রাইজ পেয়েছে।

ইহার উত্তর আমার কানে আসিয়া পেঁৗছাইল, মুখপোড়া

তোর লজ্জা করছে না ও কথা মুখে আনতে? ও ত তিনটে পেয়েছে, তুই কি পেলি?

ভুতো তাড়াতাড়ি বইগুলি আনিয়া আমার কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে কিছু না বলিয়া তেমনি চুপ করিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে জ্যাঠাইমার কণ্ঠস্বর পাইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন, দেখি কি বই পেয়েছিস?

আমি বইগুলি তাঁহার হাতে দিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, এখনো ফিতে খুলিসনি কেন?

এই 'কেন'র জবাব দিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না, আর কেনই বা ছিল না তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ বোধ করি জানিত না। তাই কিছু না বলিয়া তেমনি চুপ করিয়া রহিলাম।

(১০)

দুই দিন ছুটির পর স্কুল খুলিল। প্রাইজ উপলক্ষে এই ছুটি। কমল আসিয়া যথারীতি আবার আমার পাশে বসিল। তারপর আমি কি কি বই পাইয়াছি, সেগুলি পড়িয়াছি কিনা এবং তাহাদের মধ্যে কোনটি সব চেয়ে ভাল ইত্যাদি বহু প্রশ্ন এক সঙ্গে এতটুকু বলিবার মত না থামিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। আমি বইগুলির শুধু নাম বলিলাম। কিন্তু সেগুলির একখানিও এখনো পড়া হয় নাই শুনিয়া কমল বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এই দুই দিন তবে কি করলি?

আমি কিছুই করি নাই এবং কেন যে করিতে পারি নাই, সে কথা তাহাকে বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

কমল কিন্তু সোৎসাহে বলিয়া চলিল, আমি এর মধ্যে দুখানা বই শেষ করে ফেলেছি, কি সুন্দর বই ভাই! তোকে কালকে পড়তে দেবোখন। আজকে মা পড়ছে কিনা?

মা পড়ছে! কথাটা কানে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের সেই দৃশ্যটি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল কমলের প্রাইজ পাওয়া সত্যই সার্থক হইয়াছে! আমার প্রাইজ দেখিয়া জ্যাঠাইমা যাহা বলিয়াছিলেন ভুতোকে, সেই কথাটিও সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। আমি আর চিন্তা করিতে পারিলাম না।

কমল নিজের কথা শেষ করিবার পর আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কি রে আমার বই পড়বি না?

আমার যেন চমক ভাঙ্গিল। বলিলাম, নিশ্চয়ই। তুই দিলেই পড়বো।

ইহা শুনিয়া কমল যেন অধিকতর উল্লসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার এই স্ফূর্তি দেখিয়া আমার বুকের মাঝে কোথায় যেন একটা বাথা বাজিতে লাগিল। মনে হইল তাহার এই আনন্দ উৎসবে যেন আমার প্রবেশাধিকার নাই। আমার ও কমলের মাঝে যেন কিসের একটা বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা বাহির হইতে দেখা যায় না, কিন্তু অন্তরের দিকে চাহিলে ধরা পড়ে।

পরের দিন কমল তাহার বই দুখানি আমায় দিয়া বলিল, তোর বইগুলো পড়া হলে আমায় দিস্?

বলিলাম, কালই তোকে এনে দেবো—তোর পড়া হয়ে গেলে আমি পড়বো।

দিনচারেক পরে কমল স্কুলে আসিয়া বলিল, মার খুব ভালো লেগেছে তোর বইগুলো—মা বলেন, আমার চেয়েও তুই ভাল বই পেয়েছিস!

ইহা শুনিয়া আমার বুকের ভিতরে নিমেষে যেন একটা কিসের আলোড়ন উপস্থিত হইল। কমলের মা তাহা হইলে আমার বই পড়িয়াছেন! তখন সাগ্রহে কমলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যি?

কমল বলিল, মাইরি বলছি। কাল রাত্তির দেড়টা পর্যন্ত জেগে মা পড়েছেন তোর বই! আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। বলিলাম, আর কিছু বলেন নি?

সে বলিল, বলেছেন তোকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে—যাবি ভাই আজ?

বাড়ি যাইবার কথা শুনিয়া প্রথমে মনটা উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণে কি মনে করিয়া আবার দমিয়া গেল। কমল আমার মুখ দেখিয়াই তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। তাই মুহূর্তে কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, যাবি না ভাই আলো—মা তোকে একবার দেখতে চান।

একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাবো।

ছুটির পর বাড়িতে বই রাখিয়া আমি কমলের সঙ্গে তাহাদের বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। বাড়ির ভিতরে পা দিবার পূর্বেই কমল চীৎকার করিয়া উঠিল, এই দ্যাখো মা, আলোক এসেছে!

তিনি বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠিক সেই জায়গায় যেখানে তাঁহাকে সেদিন কমলকে সাজাইয়া দিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার শরীরের মধ্যে কেমন একটা পুলকানুভূতি হইল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলাম। কিন্তু আমার মাথায় হাত দিয়া শুধু বেঁচে থাকো, বড় হও বলিয়া আশীর্বাদ করিতে শুনিয়া সহসা আমার সমস্ত আগ্রহ যেন নিভিয়া গেল। আমার মন যেন আর কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিল বলিয়া মনে হইল।

তিনি বলিলেন, তোমায় দেখে ভারী আনন্দ হলো আজ আমার কমল ত তোমার নাম করতেই অজ্ঞান! আমি জানি তোমার জন্যেই ও এবারে ভালো হয়ে ক্লাশে উঠেছে।

এই কথাগুলি তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আমি খুশী হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু কি আমি তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম সেই কথাগুলি শুনিবার জন্য! তাঁহার কি আর কিছু আমায় বলিবার ছিল না? বিদায় লইবার পূর্বে হঠাৎ যেন তিনি এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। ছেলের কথা বলিতে বসিতে আমার কে আছে, কি বৃত্তান্ত, জ্যাঠাইমা কিরূপ ব্যবহার করেন আমার সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন। তারপর আমি যখন বলিলাম, জ্যাঠাইমা খুব ভাল ব্যবহার করেন, তখন তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, আহা মা নেই যার কেউ নেই তার! এই বলিয়া আমার দুর্ভাগ্যের জন্য মুখে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। আমি আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেদিনের মত বিদায় লইলাম। আসিবার সময় তিনি বলিলেন, আবার এসো বাবা, তোমাকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়—তুমি বড় ভালো ছেলে!

অবশ্য ইহার পর হইতে আমি মধ্যে মধ্যে কমলের বাড়ি যাইতাম। কিন্তু যতবার গিয়াছি ততবার একই কথা তাঁহার মায়ের মুখে শুনিতাম—আমি ভাল ছেলে, আমায় দেখিলে তাঁহার খুব আনন্দ হয়, তাঁহার ছেলে আমায় খুব ভালবাসে, আমি যেন কমলের লেখাপড়ার দিকে একটু নজর রাখি এবং আমার মা নাই বলিয়া পৃথিবীতে আমি সব চেয়ে দুঃখী! এক একদিন আমার দুঃখ কল্পনা করিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর করুণ হইতে করুণতর হইয়া উঠিত। এমন কি তিনি জোর করিয়া দুই এক ফোঁটা জলও চোখ হইতে টানিয়া বাহির করিতেন। আমার ইহা একেবারে ভাল লাগিত না। মুখে না বলিয়া কার্যত যদি তিনি আমার দুঃখ নিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে হয়ত আমার মন বেশী সান্ত্বনা লাভ করিত।

এখন বুঝিতে পারি, তাঁহার নিকট হইতে এইরকম কিছু হয়ত আমি তখন প্রত্যাশা করিতাম। তাই তাঁহার নিকট হইতে ইহা

না পাইয়া তাঁর হতাশা লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতাম। নিজের ছেলের চিন্তায় তিনি দিনরাত এইরূপ বিভোর হইয়া থাকিতেন যে পরের ছেলের কথা মনে করিবার মত অবসর তাঁহার মিলিত না। কমলের প্রতি তাহার মায়ের স্নেহ যত বেশী করিয়া আমার চোখে ধরা পড়িতে লাগিল ততই আমার মন কমলের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমশ কমলও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

একদিন মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম। কমলও আমার পাশে বসিয়াছিল। দুইজনেই নীরব কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না, যেন আমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ ব্যবধান অপরিচয়ের! কিছুক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ কমল বলিল, আলোক, একটা কথা আজ সত্যি করে বলবি ভাই?

বলিলাম, কি কথা বল্?

সে বলিল, আজকাল তুই দিনরাত যেন কি ভাবিস—বিশেষ করে আমি যতক্ষণ কাছে থাকি। আগেকার মত তুই বইও পড়িস না—আর আমাকে পড়তেও দিস্ না। কি হয়েছে তোর, বলনা ভাই?

আমি শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া লইলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কমল আবার অনুনয় করিল, বলনা ভাই?

আমি আকাশের দিকে তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া শুধু বলিলাম, জানি না।

ইহার পরে একদিন কমলের মা আমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ বাবা আলোক, কমলের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া হয়েছে?

বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া কেমন করিয়া মানুষে করে তাহা আমি আজও ভাবিয়া পাই না। তাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া শুধু বলিলাম, ঝগড়া? কৈ না!

তবে কমল অমন করে থাকে কেন দিনরাত—তোর কথা জিগ্যেস করলে ভাল করে উত্তর দেয় না, অথচ তোরা এক সঙ্গে পড়িস, এক সঙ্গে বেড়াস—কি হয়েছে, আমার কাছে লুকোসনি বাবা—আমি তোর মা হই, বল?

মা হই! কথাটি কানে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। সহসা চোখের কোনে জল আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি জল সামলাইয়া লইয়া আমি তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলাম। মনে হইল বলি, ইহার জন্য তুমিই দায়ী; যদি সত্য সত্যই তুমি আমার মা হইতে পারিতে তাহা হইলে হয়ত আমি কমলের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারিতাম না। কিন্তু মুখ দিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে পারিলাম না, শুধু বারকয়েক ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বল বাবা, আমার কাছে লুকোসনি?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু বলিলাম, জানি না।

ইহা হইতে তিনি কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না, তবে তিনি আর আমাকে ডাকেন নাই, আমিও আর তাঁহার নিকট যাই নাই। আর কমল? তাহার কথা না বলাই ভালো! মন যে দিতে জানে, সে সহজেই বুঝিতে পারে অন্যের মনে তাহার স্থান কোথায়! আর আমি! সকলের মধ্যে থাকিয়াও যেন ছিলাম একা—যেমন বাড়িতে তেমনি স্কুলে। পৃথিবীতে সংগী মেলে অনেক কিন্তু বহু সাধনার ফলে একটি বন্ধু পাওয়া যায়। অন্তরে অন্তরে যে মিলন তাহা কদাচিৎ সম্ভব হয়, তাই বুঝি সত্যিকারের বন্ধু জগতে দুর্লভ!

যাহা হউক এমনিভাবে যখন আমার দিন কাটিতেছিল তখন একদিন হঠাৎ জ্যাঠামশায় আসিয়া বলিলেন, আলোক আমার এক বন্ধু তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—খুব বড়লোক আর লেখা পড়াও জানে খুব—আমাদের গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বান সে। তার ছেলে মধু নাকি তোদের সঙ্গে পড়ে—এবার সেকেণ্ড হয়েছে —চিনিস তাকে?

বলিলাম, হাঁ।

আমরা সকলে তখন রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছিলাম। জ্যাঠামশায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, জ্যাঠাইমা ভুতোকে ডাল দিতে দিতে একবার শুধু তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুধু কি ওকে যেতে বলেছে?

হাঁ, বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় ঘর ভরিয়া গেল। প্রশ্ন এবং জবাব দুই-ই নিতান্ত সামান্য; কিন্তু মনে হইল ইহারই ভিতর দিয়া যেন জ্যাঠাইমা অন্তরে এক দারুণ আঘাত পাইলেন। তাই জ্যাঠাইমার ছেলেমেয়েগুলি হঠাৎ ভাতখাওয়া বন্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে একবার নীরবে তাকাইল এবং এক সঙ্গে আবার সকলে আমার মুখে দিকে চাহিল। যেন ইহার জন্য সমস্ত অপরাধ আমার।

জ্যাঠামশায় আর কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। জ্যাঠাইমাও গম্ভীর মুখে আমাদের সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া আমি যখন ঘাটে আঁচাইতে গেলাম, তখন ভুতো আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, ওরা খুব বড়লোক—তোকে খুব খাওয়াবে দেখিস্। আমার জন্যে ভাই পকেটে করে কিছু নিয়ে আসিস্!

আমি ইহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু নীরবে তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। আমার চাউনি দেখিয়া ভুতোর মনে কি হইল বলিতে পারি না, সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, ভাই রাগ করলি?

না। বলিয়া আমি নিজের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ক্রমশ



বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পূর্ব প্রকাশিতের পর

একদিন সেই প্রায় আশী বৎসর আগে কবি যাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন আজ তাহাদের মত সুসভ্য জাতি পৃথিবীতে কয়টি আছে? এই ভারত সংগীতের কয়েকটি পংক্তি অতুলনীয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীতগুলির ন্যায় ইহার মধ্যেও অপূর্ব প্রেরণা ও তেজস্বিনী বাণী রহিয়াছে যাহাতে প্রাণে সঞ্চার করিয়া দেয় অপূর্ব শক্তি—কবি যেখানে কেবল অতীতের গৌরব লইয়া মিছা বড়াই না করিয়া বলিতেছেন :

এখনো জাগিয়া ওঠরে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে।
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা!

*　　　　*　　　　*

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু, উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

*　　　　*　　　　*

অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গ রসে হওরে উন্মাদ,
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

এই ভারত সংগীত সে সময়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত।

ভারত সংগীতের ন্যায় আরও দুইটি সংগীত সেকালের বাঙালীর প্রাণে নব সঞ্জীবনীশক্তি জাগাইয়া দিয়াছিল। এখানে সেই দুইটি সংগীতের কথা বলিতেছি। উহার একটি হইতেছে :

কতকাল পরে বল ভারতরে,
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে!

*　　　　*　　　　*

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর দাসখতে সমুদয় দিলে।

*　　　　*　　　　*

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে,
পর দীপমালা নগরে নগরে।

এই দুইটি সংগীত আগ্রা প্রবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বিরচিত। 'কতকাল পরে বল ভারত রে' কবে কোথায় কোন্ পত্রিকায় কিংবা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে কবির অন্যান্য সংগীত ও কবিতার সহিত একসঙ্গে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে আমার মনে হয় ঐ বিখ্যাত সংগীতটি 'ভারত সংগীতে'র সমকালে কিংবা তাহার কিছু পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে কেহ প্রকৃত তথ্যটুকু জানাইলে উপকৃত হইব।

যে সময় লাহোরে কংগ্রেস হইতেছিল, তখন একদিন স্বদেশ-প্রেমিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী গান করিতেছিলেন :

'পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।'

রাজনারায়ণবাবু উহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ও গান গাস্‌নে, সব কথা মনে হয়, শরীর দিয়ে আগুন বাহির হয়—মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। গাস্‌নে, গাস্‌নে।'

'কতকাল পরে ভারত রে' এই সংগীতটির রচনাকাল সঠিক-ভাবে না জানিলেও কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের যমুনালহরী (গীতি কবিতা)র প্রকাশের তারিখ আমরা জানিতে পারি। যমুনা-লহরী গীতি কবিতাটি কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত বান্ধব—পত্রের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণে প্রকাশিত হইয়াছিল ৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা। কবি 'প্রবাসী' নামে কবিতাটি প্রকাশ করেন। এই গীতি কবিতাটি লগ্নী রাগিণী ও যৎ তালে হিন্দুস্থানী ধরণে গীত হইত।

এই বিখ্যাত সংগীতটিও ভারতের অতীত গৌরব কাহিনীতে পূর্ণ এবং এই গানের মধ্যে পাঠান-মোগলের কীর্তি কাহিনী ও সে সকলের দুর্গতির বিবরণও আছে। ইহা কবিত্ব সম্পদে ঐশ্বর্যশালী —এই সংগীত যাঁহারা কোন সুগায়কের মুখে শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন কবি কত বড় আন্তরিকতার সহিত এই গীতি কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতা হইতে কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটির নাম 'যমুনালহরী' সার্থক বলিতে হইবে।

নির্মল সলিলে　　　　বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে! ও॥ ধ্রু
কত কত সুন্দর　　　　নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে　　　　ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও॥
যুগ যুগ বাহি　　　　প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্বুদ　　　　সহ কত রাজা
পরকাশি লয় পাইল ও॥
কল কল ভাষে　　　　বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি　　　　মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত গাথা ও।

তারপর কবি পাণ্ডব ও কৌরবের মহাসমর ও কৌরব-যাদবের কীর্তি কাহিনী স্মরণ করিয়া গাহিয়াছেন:—

যে মুরলী রবে　　　　নিবিড় নিশীথে
উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে　　　　তব তট পানে
যাইত রব সন্ধানে ও।

আবার

কভু শতধারে　　　　এ উভ পারে
পাঠান আফগান মোগল ও।
চালিল সেনা　　　　গ্রাসি নিবাসী
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও॥
অহ! কি কুদিবসে　　　　গ্রাসিল রাহু
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙিল চূর্ণিল　　　　উলটি পালটি
লুঠি নিল যা ছিল সারও॥

*　　　　*　　　　*

উপহাসি সর্বে　　　　মানব গর্বে
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহে গড় পুরেজ　　　　কতিপয় তুরেজ
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও॥

এই গীতি কবিতায় অতীত গৌরব কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে পাঠান ও মোগলের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

কবি হেমচন্দ্র ভারতবাসীর শোচনীয় দুর্দশার কথা বলিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় আমরা শুনিতে পাই,—

আর কি সেদিন হবে　　　　জগৎ জুড়িয়ে যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত?
যবে কবি কালিদাস　　　　শুনায়ে মধুর ভাষ
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত!

এ সময়ে 'হিন্দুমেলার' আমলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীন-চন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালী-প্রসন্ন ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিও স্বদেশপ্রেমের নব বাণী প্রচার করিতে থাকেন। যেখানে শুধু ভারতমাতাকে লক্ষ্য করিয়াই জাতীয় কবিতা রচিত হইয়াছে, সেখানে বাঙলা দেশের কথাও বাঙালী কবি স্মরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জাতীয় সাহিত্যে, কি

গদ্য, কি পদ্য, কি সংগীতে দেখা দিল সুজলা সুফলা বঙ্গজননীর বেদনার কাহিনী।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ইংরেজী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, মৃণালিনী ১০ই নভেম্বর, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর আনন্দমঠ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে যে নূতন ভাবধারা আনয়ন করিলেন, তাহা চিরন্তন ভাবে বাঙলার সাহিত্য জগতেই নয়, ভারতবর্ষের জাতীয়তার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। বাঙালীর কথা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত বাঙলা সাহিত্যবিদ্বেষী বাঙালীর প্রাণেও নূতন আনন্দ ও তৃপ্তি জাগাইয়া দিল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া বাঙলার ঘরে ঘরে বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন। বাঙলা ভাষায় নূতন সঞ্জীবনী শক্তি জাগিল। বাঙলার ইতিহাস, বাঙলার অতীত বীরত্ব, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের কথা স্মরণ করাইলেন বাঙালীকে, বাঙলার নৌবল, বাঙলার লাঠি, বাঙালীর বীরত্ব-বিবরণ প্রবন্ধে, ইতিহাসের আলোচনায় এবং গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মানুষ মাত্রেরই মনে জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই জাগিয়া উঠে পারিবারিক প্রীতি, গ্রাম-প্রীতি এবং স্বদেশ-প্রীতি। এই স্বদেশ-প্রীতি হইতেছে মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কে এমন কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক আছে যে, আপনার দেশকে অন্যান্য দেশের সমকক্ষরূপে দাঁড় করিয়া গৌরব বোধ না করে। তারপর স্বাধীনতা হইতেছে মানব মাত্রেরই কাম্য—সে অসভ্য হউক বা সুসভ্য হউক না কেন। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে তবে ত দেশের উন্নতির কথা ভাবিবে—এই বাঁচিয়া থাকার মূলেই রহিয়াছে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তা। এই জন্যই আমরা অতীতে কেমন ছিলাম, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অবস্থা কিরূপ হইবে, সে কথা আমরা চিন্তা করি। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা ভাবিয়াছিলেন, এবং অতীতের মুক্ত পৃষ্ঠা কাব্যের ন্যায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ও তাঁহার নয়ন সমক্ষে উজ্জ্বল আলোকমালার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এই জন্যই আমরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। দেশাত্মবোধের প্রবর্তক, উপাসক এবং দেশপ্রেমউদ্বোধক জ্ঞানী পুরুষ। পরম প্রীতিভাজন বন্ধু বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক কবি ও সমালোচক শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার এ বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ—"এই দেশাত্মবোধ তাঁহার প্রতিভার মূলে উৎস। এ-মন্ত্রে কেহ তাঁহাকে দীক্ষিত করে নাই, ইহা শিক্ষালব্ধ নয়, সহজাত মনীষার মত ইহা যেন তাঁহার প্রাক্তন সম্পদ। জাগ্রতে-স্বপনে, ধ্যানে-জ্ঞানে এক মুহূর্ত তিনি উহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, ধর্মতত্ত্বের বিচারে, সাহিত্য-সৃষ্টির অপূর্ব উন্মাদনায়, যৌবনের স্বপ্নে, প্রৌঢ়ের কর্মজিজ্ঞাসায়, বার্ধক্যের স্মৃতিকল্পনায়—এই দেশপ্রেম তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল, দেশের নামে তিনি আত্মহারা হইতেন। অত বড় গম্ভীর প্রকৃতিও দেশের কথায় বালকের মত অধীর হইয়া উঠিত—ক্ষোভে, লজ্জায়, হর্ষে, শোকে, ক্রোধে ও গর্বে আত্মসংযম হারাইত। এই দেশ কোনও মনঃকল্পিত দেবতা নয়, যেন সাকার বিগ্রহ; এ প্রেম যেন রক্তের ধর্ম—ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় চেতনা। কত ভাবে, কত প্রসঙ্গে যে তিনি এই গভীর চেতনা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।" [আধুনিক বাঙলা সাহিত্য—৩৯-৪০ পৃষ্ঠা] বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশপ্রেমের বিষয় আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে তাঁহার লিখিত রচনাবলী হইতেই আলোচনা করিব, আর বিশেষভাবে আলোচনা করিব তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' অমর জাতীয় সংগীতের মর্মকথা।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাঙালীকে ঘরমুখো করিলেন। সোনার বঙ্গভূমির অতীত গৌরবের কথা, বাহুবলের কথা, সমাজ, কৃষক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় শুনাইলেন এবং বাঙালীকে বলিলেন, এই সোনার বাঙলা তোমার জন্মভূমি, তাহাকে ভুলিও না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দুমেলার সময়ে আমরা ভারতের অতীত বেদনার কথাই স্মরণ করিয়াছি, বাঙলার কথা ভুলেও স্মরণ করি নাই! সে সময়ে বাঙলার সর্বত্র ভারতমাতার জন্যই কাঁদিতে শুনিয়াছি। পূর্ববঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষ গাহিয়াছেনঃ—

নটবেহাগ—পোস্ত

নীরব ভারতে কেন ভারতের বীণা।
সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল কণ্ঠে খেলিত সুধা-তরঙ্গে;
সে কবি নিকুঞ্জ আজি শ্মশান-সমানা।
বীর রাগমদে, যেই তানে গাহিত ভারত,
আজি সে দীপক-রাগ শ্রবণে শুনি না।

কালীপ্রসন্নের বিরচিত আরেকটি জাতীয় সংগীতও সে যুগে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত।

জংলাট—খেমটা

গাওরে ভারত সঙ্গীত, সবে প্রাণ ভরে
ভারতীর আরতিতে ভক্তি পূতে বীণা করে।
মিলি আজ প্রাণে প্রাণে, জনম তীর্থস্থানে
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ-সাগরে।
কত আর ঘুমে রবে, জাগরে জাগরে সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরি আশার মোহন স্বরে।
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র বলে
একথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধুনদী
তথাপি যন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, রসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণমন, শক্তির সোপান 'পরে।

এই গানটির সুর উদ্দীপনাপূর্ণ। এখানে অতীত গৌরববাণী স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ও হাহুতাশ নাই, আছে সংকল্পে দৃঢ়তা। এ সংগীত জাগরণের। এই সংগীতের মূল সূত্রটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে।

গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী
তথাপি যন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, রসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান পরে।

সেই হিন্দুমেলার যুগেই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গাহিয়াছিলেনঃ—

কাল রাত্রি পোহাইল উদিত সুখ-তপন।
আর কি ভারত-সুতা রবে ঘুমে অচেতন?

ইত্যাদি। এই গানটিতে সমাজ-সংস্কারের ইঙ্গিতও রহিয়াছে অনেক। আমরা মাত্র প্রথম দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'হিন্দুমেলার' প্রসঙ্গে বলন,—"হিন্দুমেলার গোড়ার দিকে এক বৎসর শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নামে প্রসিদ্ধ) ১৯ বৎসর বয়সে একটি ৪০০ পংক্তির ১০০ কলির দীর্ঘ কবিতা পড়েন। তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম কলি এইরূপঃ—

বঙ্গবাসী! আর কত থাকিবে নিদ্রায় রে,
থাকিবে নিদ্রায়?
জাগ জাগ নারী নর উঠ বাঁধ পরিকর
অলসে পড়িয়া আর কেনরে শয্যায়?
জন্মে নাকি বীর পুত্র বঙ্গের উদরে রে,
বঙ্গের উদরে?
আমরা কি চিরদিন হয়ে আছি পরাধীন?
চিরদিন আছি কি রে নতমুখ করে?

'রবীন্দ্রনাথ প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে একটি কবিতা লিখিয়া হিন্দুমেলায় পাঠ করেন। উহা বাইশটি কলিতে বিভক্ত এবং দৈর্ঘ্যে ৮৮ পংক্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন শোভাসম্পদ বর্ণনার পর তিনি লিখিয়াছিলেন,—

(শেষাংশ ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চুম্বক

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এমনি তুচ্ছ টুকরো টুকরো সংঘাত!

একি! বীরেশের কণ্ঠে বিস্ময়, ডলিদি'র বাড়ি যাবে না? আটটা বেজে গেল আর তুমি এখনো চুপচাপ ব'সে আছো—

যাবো না আমি; স্তিমিত কণ্ঠে জয়ন্তী উত্তর দিল।

অত ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে ওরা—

না, আমি যেতে পারবো না; জয়ন্তীর স্বর দুঃখ-গম্ভীর।

কেন জয়ন্তী? বীরেশ স্ত্রীর খুব কাছে সরে এলো।

প'রে যাবার মতো শাড়ী আমার নেই।

বীরেশের চোখ বড় হল; সেকি, অতগুলো শাড়ী তোমার—

ও প'রে ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়া যায় না; জয়ন্তী ঘর ছেড়ে গেল।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বীরেশের কাছে স্বচ্ছ হল। এমন ঘটনা আজ প্রথম নয়। বিয়ে হয়েছে ওদের সম্প্রতি। এবং বর্তমানে বোঝা গেছে—ওদের হিসেবে বেশ কিছু গলদ ছিল। এই পীড়াদায়ক অসংগতি লক্ষ্য করলো বীরেশ। ওর বুক থেকে ঝরলো একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস।

বীরেশের জীবনে জয়ন্তীর আবির্ভাব আকস্মিক। বছরখানেক আগেকার কথা। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বীরেশ সুপ্রতিষ্ঠিত বলতে হবে। এমন সময় জয়ন্তীর সংগে আলাপ। দিনে দিনে ঘন হল পরিচয়। কিন্তু ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে মানুষ জয়ন্তী আর বীরেশের আদর্শ অন্য। সে ভালবাসে গ্রাম, বিচলিত হয় জনগণের ব্যথায়, কান পেতে শোনে মৃত্তিকার আকুল ক্রন্দন। তবু ওরা ভালবাসলো। বীরেশের আদর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিল জয়ন্তী এবং একদিন সে বিদ্রোহ করল সমাজের বিরুদ্ধে, সংসারের বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে। ওদের বিয়ে হল।

তারপর আরএকদিনের কাহিনী।

চৈত্রের সন্ধ্যা। বাতাসে বেলফুলের গন্ধ। তবু দু'জনের মুখই গম্ভীর। বীরেশ স্থির করল—আজ একটা বোঝাপড়া ক'রে নেবে। ঘরে অন্ধকার জমা হয়ে উঠেছে দেখে ও আলো জ্বাললো। তারপর জয়ন্তীর কাছে চেয়ারটা টেনে এনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবল বীরেশ। বোধহয় কথাগুলো মনে মনে ঠিক ক'রে নিল।

তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে জয়ন্তী।

বল; জয়ন্তী যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

কয়েক মুহূর্তের ছেদ।

তুমি আমাকে নিয়ে শান্তি পাচ্ছ না, না?

হঠাৎ একথা?

হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি—আমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা দিয়েছে, সে ফাঁকটাকে আমি বুজিয়ে দিতে চাই।

তাই দাও।

কিন্তু তার জন্যে আমিই কি দায়ী? বীরেশের স্বরে অভিমান।

জয়ন্তী উত্তর দিল না।

বিয়ের আগে আমি কি বহুবার তোমায় বলিনি যে, আমি দরিদ্র—

হ্যাঁ, জয়ন্তী মৃদুকণ্ঠে বললো, বলেছ স্বীকার করি।

তবে?

আবার চুপচাপ। গম্ভীর অন্ধকারের দিকে ওরা দু'জনেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। জয়ন্তী প্রাণপণে কী যেন বলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। অকস্মাৎ একঝলক হাওয়া এসে আছাড় খেয়ে পড়ল ওদের মাঝখানে।

জয়ন্তী, তুমি কি চাও?

শান্তি।

কে যেন চাবুক চালালো বীরেশের মুখে;—কিন্তু আমি কি তোমাকে মানসিক শান্তি দিচ্ছি না জয়ন্তী?

হ্যাঁ, জয়ন্তী খুব আস্তে আস্তে বললো, মনের দিক দিয়ে আমি সম্পূর্ণ সুখী, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, পাঁচজনের কটাক্ষ, আত্মীয়দের বিদ্রূপ আমার অসহ্য—

কিন্তু তাদের মুখ তুমি বন্ধ করবে কেমন করে? সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে আমরা বিয়ে করেছি, আমাদের একটা-না একটা খুঁত তারা বের করবেই।

তুমি চেষ্টা করলেই সব হয়, make money, জয়ন্তী ইংরেজীতেই বললো, and everything will be alright—

অর্থাৎ প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেই তুমি সুখী হও, কিন্তু আমার আদর্শ তুমি তো জানো?

ওগো তুমি আমায় ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি, তোমায় আদর্শ-চ্যুত হতে তো আমি বলিনি।

বুঝতে পারছি মানসিক শান্তি তোমার কাছে বড় নয় জয়ন্তী, বীরেশের কণ্ঠস্বর একটু কর্কশ,—তুমি চাও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে জন-সাধারণকে অবাক্ করতে, তুমি চাও—

বাধা দিয়ে জয়ন্তী বললো, এ লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে কতটা কষ্টকর—বুঝতে পারো না কেন? এ দারিদ্র্য নয়, এ অশ্লীলতা; বিদ্রোহ করেছি সেকথা সত্যি কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, তাদেরই আমি দেখাতে চাই যে, আমি পরিপূর্ণ সুখী—অন্তরে এবং বাহিরে। sincere lover হওয়া সোজা; কিন্তু dutiful husband হওয়া কঠিন; বেশ একটু ঝাঁজের সংগে এতগুলো কথা বলে জয়ন্তী থামলো। তার বলা কথাগুলো বীরেশ একবার মনে মনে আউড়িয়ে নিলো। হয়তো ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই সে জয়ন্তীকে বোঝাতে পারতো। কিন্তু বীরেশ তা করলো না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো—এ জীবন সহ্য হচ্ছে না জয়ন্তীর। অভিমানের একটা তীক্ষ্ন কাঁটা অকস্মাৎ বিদ্ধ হল তার মনে।

তোমার কথাগুলো খুব বেশী সত্যি জয়ন্তী, কেন এতদিন ভেবে দেখিনি ঠিক বুঝতে পারছি না; আমি—হ্যাঁ আমি dutiful husband হবার চেষ্টাই করবো—

চৈত্রের খেয়ালী হাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। বেলফুলের গন্ধও আর নেই কোথাও। একটা বিশ্রী গুমোট গরম আচ্ছন্ন করেছে সারা কক্ষ। ওরা দুজনে প্রায় এক সংগেই উঠে দাঁড়ালো।

রৌদ্র-গৈরিক উগ্র জ্বালাময় মধ্যাহ্ন। বীরেশ বেরিয়ে গেছে জয়ন্তী। তারপর সুইচ টিপলো। আলো জ্বললো, পাখা চললো না। অনেকক্ষণ। একে একে ঘরের দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দিল জয়ন্তী। তারপর সুইচ টিপলো। আলো জ্বললো, পাখা চললো না। জয়ন্তীর অভ্যস্থ হাত লজ্জিত হলো। এ বাড়িতে পাখা নেই।

বীরেশের অবস্থা ভাল নয় সেকথা জয়ন্তী খুব ভাল করেই জানতো। বিয়ের আগে বীরেশ বহুবার বলেছিল সেকথা। সেদিন সত্যিই বীরেশের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল জয়ন্তী। সে কি এতই নীচ—এত হীন যে, বীরেশের অবস্থা ভাল নয় শুনে তাকে পরিহার করবে? মনে মনে জয়ন্তী একটু অপমানিত বোধ করেছিল যেন।

হিতাকাঙ্ক্ষী বৈষয়িক গুরুজনদের কাছে পাত্র হিসেবে বীরেশের কোন দামই হয়তো নেই। জনসাধারণের চোখে শুধু আদর্শ আর অন্তঃকরণ অর্থের চেয়ে বড় নয়। তাই ওদের বিয়েতে এসে পড়েছিল অসংখ্য বাধা। কিন্তু জয়ন্তী চিনেছিল বীরেশকে, সে

বুঝেছিল তাকে অন্তর দিয়ে। তাই অবশেষে তাদেরই জয় হল।

বিয়ের পর সত্যিই ধন্য হল জয়ন্তী। ভালবাসা দিয়ে বীরেশ যেন তাকে ঘিরে রাখে সব সময়। এত আদর, এত যত্ন যে-কোন নারীর পক্ষেই দুর্লভ। সামান্য শরীর খারাপ হলে বীরেশের চিন্তার অবধি থাকে না, প্রাণপণ সেবা আরম্ভ করে দেয় সে। জয়ন্তী বুঝল, নির্বাচনে তার ভুল হয়নি মোটেই।

কিন্তু বাইরের পৃথিবী আছে। আমাদের জীবন আমাদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। অনেক কৌতূহলী চোখ নিরন্তর আমাদের জীবনকে নাড়া দেয়। তাই আসে অশান্তি। বাইরের পৃথিবীকে যদি অস্বীকার করতে পারত মানুষ! জয়ন্তী তা পারলো না। ও বুঝল আর পাঁচজন সমর্থন করেনি এ জয়কে। দারিদ্র্য ঘোষণা করল জয়ন্তীর চরম পরাজয়। জয়ন্তী চাইলো তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ দারিদ্র্য সত্যিই জয়ন্তীর পক্ষে অসহ্য। এ জয়ন্তীর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। অবস্থা জয়ন্তীর অনেক বন্ধুরই ভাল নয়। কিন্তু বীরেশের অবস্থা একেবারে অপমানজনক। বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের খোঁটা খাবার ভয়ে বাইরের সংগে প্রায় সমস্ত সম্বন্ধ জয়ন্তী চুকিয়ে একে মনে পড়ছে। ওর অন্তরের নিভৃততম কোণে নিরন্তর একটা ফেলেছিল। আজ এই অলস মন্থর মধ্যাহ্নে অনেক কথাই তার একে কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে ওঠে। চোখে জলও জমে ওঠে মাঝে মাঝে। কেন এত ছোট হয়ে থাকে বীরেশ লোকের কাছে? কেন লোককে কথা শোনাবার সুযোগ দেয়? ইচ্ছে করলেই সে তো পারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে।—অন্তত জয়ন্তীর দিকে চেয়েও কেন সে ইচ্ছে হয় না বীরেশের? আদর্শের কী ক্ষতি হবে তাতে? লোকে যে বোঝে না, শোনে না ওসব আদর্শের কথা। রাগ হয় জয়ন্তীর। সে চায় পাঁচজনের সামনে মাথা তুলে ভদ্রভাবে বাঁচতে। এমন অবস্থায় আর বেশীদিন থাকলে মরে যাবে জয়ন্তী—রাগে দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায়। বেশ তো ছিল ওর শান্ত গম্ভীর জীবন। হঠাৎ ঝড়ের মত এল বীরেশ! ওলোট-পালোট করে দিল জয়ন্তীর সমস্ত কিছু। ছক-কাটা জীবনে এল বিশৃঙ্খলা। সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হয় আজ জয়ন্তীর।

দরজায় করাঘাত। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল। বীরেশ প্রবেশ করল। ভয়ানক ঘেমে গেছে বেচারী।

উঃ, যা গরম বাইরে!

হ্যাঁ, বড় গরম পড়েছে আজ।

পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে বীরেশ বলল, একটা চাকরী জোগাড় করলাম জয়ন্তী।

চাকরী!

হ্যাঁ, আমার এক পুরোনো বন্ধুর ফার্মে, মাইনে মন্দ না, তবে কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর।

কথাগুলো জয়ন্তী যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সত্যি বলছ?—সত্যি তুমি চাকরী করবে?

বাঃ, মৃদু হেসে বীরেশ বলল, কাল থেকে নিয়মিত কাজে বেরুতে হবে আর,—একটু থেমে ও বলল, চাকরী না করলে চলবেই-বা কেন!

অকস্মাৎ খুসীতে জয়ন্তীর সারা শরীর যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

গ্রীষ্মের গৈরিক অপরাহ্ণ সজল হয়ে উঠেছে মেঘের অকাল সমারোহে। মাটির সোঁদা গন্ধ আর বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ঝাপটায় বীরেশের মনে উঁকি মারছে একটা চাপা দুরন্ত অভিমান। এই বৃষ্টি যেন অসংখ্য আর্ত আর উপবাসীর ক্রন্দন! বীরেশ কি সাড়া দেবে না আর তার দেশবাসীর ক্রন্দন-মুখর কাতর আহ্বানে? বোধ হয় না বীরেশ বুঝতে পেরেছে আজ এক ভয়ংকর শক্তি আক্রমণ করেছে তাকে আর আস্তে আস্তে সে চলে যাচ্ছে সে-শক্তির কবলে। বীরেশের মন-সাম্রাজ্যে যে-ভাঙন ধরেছে, সে-ভাঙন প্রতিরোধ করার শক্তি তার নেই। আর প্রতিরোধ করতে সে চায়ও না। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে বীরেশ।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জয়ন্তী ঘরে ঢুকলো, নাও চা খাও।

হঠাৎ?

বাঃ, হঠাৎ কোথায়? এই তো চা খাবার সময়। যা বৃষ্টি হচ্ছে! আর তোমাকে তো আজকাল পাওয়াই যায় না একা, জয়ন্তী হাসলো, যা কাজের লোক হয়ে উঠেছ। কাপগুলো কী সুন্দর দেখো, ও ভাঙা কাপগুলো দিয়েছি বিদেয় করে। কেউ এলে এক কাপ চাও দেয়া যেত না, যা লজ্জা করতো আমার!

এইবার গোটা দুই চাকর রাখতে হবে।

হ্যাঁ, আর পারি না বাপু আমি!

চা খাওয়া চলতে লাগলো।

প্রচুর পরিশ্রম আরম্ভ করেছে বীরেশ। ফার্মের একটু উন্নতিও হয়েছে ওর জন্যে। সবাই ওর ওপর খুব খুসী। এমন কর্মী পাওয়া সুকঠিন। বন্ধু আশ্বাস দিয়েছে—শীগগিরই ওকে একজন পরিচালক করে দেবে।

কয়েকটা সুট করাতে হবে জয়ন্তী, চায়ে চুমুক দিয়ে বীরেশ বললো।

বেশ তো, তোমাকে তো কতবার বলেছি ওসব বাজে principle-এর কোন মানে হয় না, কখনও সুট পরবো না, এ আবার কি কথা? কাজের জন্যে লোকে কত কি করে। জীবনটা গোলাপের শয্যা নয়, সে কথা ভুললে চলবে কেন!

তাতো ঠিক।

বৃষ্টিটা হঠাৎ বেশ জোরে এসে গেল যেন! ঠাণ্ডা হাওয়া মাথা ঠুকে ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো সে-কক্ষে। জয়ন্তীর চুল উড়তে লাগলো। এইবার জয়ন্তী পরিপূর্ণ সুখী অন্তত বীরেশের তাই মনে হয়।

তারপর একদিন ওরা বাড়ি বদলালো।

বালীগঞ্জের দিকে সুন্দর ঝকঝকে একটা বাড়ি। এ বাড়ি খুব শীগগিরই কিনে ফেলবে, বীরেশ এমন আশ্বাস দিল জয়ন্তীকে। আজকাল জয়ন্তী প্রায়ই নেমন্তন্ন করে আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবকে। এইবার সকলে একবাক্যে স্বীকার করল, বীরেশ সত্যি একটা মানুষের মত মানুষ। শাড়ী আর গয়নায় ভরে উঠল জয়ন্তীর কক্ষ। দেখতে দেখতে সংসারের অবস্থা একেবারে ফিরে গেল। জয়ন্তীর মনে দেখা দিল পূর্ণ তৃপ্তি। নিজের পরিতৃপ্ত মনের দিকে চেয়ে জয়ন্তী খুসীতে কেঁপে উঠলো।

লক্ষ্য করলে বীরেশেরও অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে। সত্যিকারের কর্মী হয়ে উঠেছে সে আজকাল। অর্থ উপার্জন ছাড়া আর কোন দিকে তার মন নেই। বাড়িতে থাকে সে খুব কম। সময় তার খুবই অল্প। বড় গম্ভীর হয়ে উঠেছে বীরেশ আজকাল। জয়ন্তীর সংগেও সে খুব কম কথা বলে—তাও শুধু কাজের কথা।

এতদিন জয়ন্তী মেতেছিল নিজেকে নিয়ে—অর্থের প্রাচুর্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। বাইরের পৃথিবীর মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু এইবার একদিন ভাল করে বীরেশের দিকে চেয়ে দেখলে জয়ন্তী। বড় রোগা হয়ে গেছে যেন বীরেশ। কেমন যেন একটা উগ্র কাঠিন্য দেখা দিয়েছে ওর শরীরে। আর কই জয়ন্তীর দিকেও তো একবারও আজকাল চেয়ে দেখে না বীরেশ। কোথায় গেল তার অত গভীর কৌতূহল?

ওগো, তুমি আর লেখ না কেন? জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলো একদিন।

ইচ্ছেও নেই, সময়ও নেই। সংক্ষিপ্ত গম্ভীর উত্তর বীরেশের।

সংসার ভরে উঠলো রূপে রসে রঙে; কিন্তু জয়ন্তী বুঝতে পারলো বীরেশ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এই ধনী সংসারের মাঝ থেকে। বীরেশের মন আজকাল সম্পূর্ণ ব্যবসায়ী হয়ে গেছে যেন!

অত পরিশ্রম কর কেন তুমি?

ভাল লাগে। সিগারেটে টান মেরে বীরেশ বলে।

এই অবধি। আলাপ আর জমে না।

জয়ন্তীর বড় একা একা মনে হয় নিজেকে মাঝে মাঝে। অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব আসে তার, তাদের সংগে মাতামাতিও করে খুব জয়ন্তী। তবু তার মনে হয় পরিপূর্ণভাবে বীরেশের সঙ্গ না পেলে তার অন্তরের নির্জনতা ঘুচবে না। অথচ বীরেশ দুর্লভ আজকাল।

সিনেমায় যাবে আজ? জয়ন্তী বীরেশের কাছে এসে দাঁড়াল।

অসম্ভব, অনেক কাজ আমার।

তোমাকে যেতেই হবে, আমার ভয়ানক ইচ্ছে করছে।

অত বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, যাও না তাদের সংগে।

অভিমানে জয়ন্তী বলে, তুমি আজকাল একটুও থাক না কেন?

মৃদু হেসে বীরেশ বলে, অনেক কাজ আমার!

এইবার বীরেশ ভাল বেসেছে অর্থকে। অর্থের স্বপ্ন ছাড়া আর কোন স্বপ্ন সে দেখে না। কে ব্যথা পেল, কে অভিমান করল—সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর তার নেই। তার অন্তরের সবটুকু কোমলতা নিঃশেষে কে যেন গ্রাস করে নিয়েছে!

বীরেশ আর জয়ন্তীর নেই। একদিন সেকথা জয়ন্তী বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলো। একটা নিদারুণ ব্যথায় ওর সারা শরীর রী রী করে উঠলো। জয়ন্তী তো কখনই চায়নি বীরেশকে এমন করে দূরে সরিয়ে দিতে। বীরেশ যে তার অন্তরের অন্তরঙ্গ, আত্মার আত্মীয়। তাকে বাদ দিয়ে জয়ন্তী বাঁচবে কেমন করে? এই সম্পদ, বন্ধু-বান্ধব আর প্রচুর উল্লাসের মাঝেও জয়ন্তীর নিজেকে মনে হল একা—ভয়ংকর একা। তার দম্ বন্ধ হয়ে আসবে যেন। জয়ন্তী এইবার চাইলো সেই পুরোনো দিন ফিরিয়ে আনতে।

শোন!

বেরিয়ে যেতে যেতে বীরেশ বলল, না না, আর মনে করিয়ে দিতে হবে না আমায়, তোমার শাড়ীর অর্ডার দিয়ে দিয়েছি; বোধ হয় আজই ওরা বাড়িতেই দিয়ে যাবে, অতি দ্রুত বীরেশ বেরিয়ে গেল। অনেক কাজ তার আজ!

জয়ন্তী বোধহয় এখুনি টলে পড়ে যাবে। তার শরীর অত্যন্ত খারাপ—সেই কথাই সে জানাতে এসেছিল বীরেশকে। কিন্তু একি উত্তর দিল বীরেশ? কি ভাবে সে জয়ন্তীকে? আগেকার কথা মনে পড়ল জয়ন্তীর। তার সামান্য একটু মাথা ধরলেও কি ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠত বীরেশ। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘর থেকে বার হত না! কোথায় গেল তার সেই স্বামী আজ? জয়ন্তীর দু'চোখ ভরে উঠল জলে। ভারী কান্নায় বিছানার ওপর ভেঙে পড়ল সে।

মাঝে মাঝে ভারী আশ্চর্য লাগে বীরেশের! অতীতের কথা ভেবে তার হাসি পায়। কেমন করে সে এতদিন অর্থহীন আদর্শ নিয়ে মেতেছিল! সম্পদের স্বাদ কত মধুর! আরও অনেক আগে থেকে বীরেশ অর্থ উপার্জনের দিকে মন দেয়নি কেন! দুঃখ হয় তার সেকথা ভেবে। যশ, আনন্দ, স্ত্রীর ভালবাসা সমস্ত এনে দেয় সম্পদ। সম্পদের একটা তীব্র অদ্ভুত শক্তি আছে। আজ বীরেশ সেকথা বুঝেছে মর্মে মর্মে।

একদিন জয়ন্তীর বাবার কাছ থেকে এক চিঠি এল। তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়ে জয়ন্তী আর বীরেশকে ক্ষমা করেছেন। সত্যি বীরেশ একটা মানুষের মত মানুষ। জয়ন্তীর নির্বাচন খুবই ভাল সেকথা এতদিন পর বুঝতে পেরে তিনি যুগলকে নেমন্তন্ন করেছেন। জয়ন্তী চিঠিটা বীরেশকে এনে দিল। বাবার অমতে জয়ন্তী বিয়ে করেছিল। বাবার মত ছিল না, কারণ বীরেশ উপার্জন-ক্ষম নয়। এ বিয়েতে তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এবং বিয়ের পর এ পর্যন্ত মেয়ের মুখও তিনি দেখেন নি—জয়ন্তীর সংগে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছিলেন। এই জন্য বীরেশ ও জয়ন্তী উভয়ের মনেই একটা চাপা অশান্তি ছিল। আজ সে অশান্তির অবসান হবে বোধ হয়।

ভাগ্য যখন খোলে, তখন এমনি করেই খোলে—না জয়ন্তী? বীরেশ স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল।

জয়ন্তী উত্তর দিল না। বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

আজ, বীরেশ সিগ্রেটটা ধরিয়ে নিল, আশা করি তোমার আর কোন অশান্তি নেই? দারিদ্র্য আমাদের ঘুচে গেছে, মুছে গেছে বিদ্রূপ আর কটাক্ষ, অবশেষে বাবাও ক্ষমা করলেন আমাদের।

জয়ন্তী তবুও নীরব।

কথা বলছ না কেন জয়ন্তী?

আচ্ছা, আগের জীবনে আর কি ফিরে যাওয়া যায় না? ঠিক আমাদের বিয়ের পর যেমন ছিলাম?

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি, আমি চাই তোমাকে, শুধু তোমাকে, আর কিছু না—

তুমিই তো একদিন শান্তি চেয়েছিলে, চেয়েছিলে সম্পদ—

কিন্তু তোমাকে দূরে ঠেলে দিতে আমি চাইনি, আমি ভুল করেছিলাম, তুমি ফিরে এস—চাই না আর কিছু আমি—

আজকের আকাশেও মেঘের সমারোহ। অকাল শ্রাবণের ধারায় হয়তো এখুনি ভারী হয়ে উঠবে বাতাস। জোলো হাওয়া ছুটে ছুটে আসছে কক্ষের চারপাশে।

কি হল তোমার জয়ন্তী? বীরেশের দৃষ্টি বিস্মিত।

আমি তোমাকে ফিরে পেতে চাই, জয়ন্তীর কণ্ঠে কান্না কাঁপছে, আজ তুমি চলে গেছ অনেক দূরে—

কিন্তু এত বন্ধু-বান্ধব তোমার?

কে চায় তাদের? তোমার হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, তোমাকেই চাই আমি। ওগো, তুমি আবার লেখা আরম্ভ কর, আবার অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠো তোমার পুরানো আদর্শে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বীরেশ আরম্ভ করল, শোন জয়ন্তী, আজ তুমি আমায় বলছ পুরোনো আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে, কিন্তু সে কি সম্ভব?

কেন নয়?

মানুষের মন পরিবর্তনশীল, একদিন ঐশ্বর্যের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না, আমি শুধু ভালবাসতাম আমার আদর্শকে কিন্তু আজ আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আজ ঐশ্বর্য অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরেছে আমায় সে বাঁধন ছাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আজ আমাকে চাও, চাও না সম্পদ, কিন্তু আমি চাই—সম্পদের আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অর্থের চেয়ে বড়ো আমার কাছে আজ আর কিছু নয়—

জয়ন্তীর চাপা কান্নায় বীরেশকে থামতে হল।

বাইরে ঝরছে অকালবর্ষা। বাতাসে মাটির সোঁদা গন্ধ!

সপ্তম স্বর্গ

এলেক্স আব্‌ন্‌সন্‌

জীবনের বিচিত্র পথ অতিক্রম করে আজ যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েচি সেখানে আমি নিতান্ত নিঃসংগ, একাকী। একদা যারা ছিল আমার যাত্রা-সহচর তারা একে একে পথেই খসে পড়েচে অনেক সাগর পার হয়ে আসা শ্রান্ত পাখীদের মতো।

প্রোটোপ্লাজমের মতো চিন্তাভাবনাহীন আমার জীবন। কাজের ভেতর—নিশ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, খাওয়াদাওয়া আর ঘুম। ইদানিং আমার কাছে আমার শরীরটা বিশেষ বড়ো হয়ে উঠেচে। সজীব দেহের উপর ক্ষয়ের মন্থর গতি পর্যবেক্ষণ করি। ব্যাপারটা বীভৎস হলেও চমৎকার। চামড়ার রং বদলায়, এখানে ওখানে ব্রণের আবির্ভাব হয়, হাড়গুলি আর্তনাদ করে ওঠে, দৃষ্টি আসে ম্লান হয়ে। কেবল চুল আর নোখগুলি বেড়েই চলে উদ্দেশ্যহীন—তাদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করবার জন্যেই যেন।

কখনো কখনো, বিশেষত রাত্তিরে আমার শরীরটা কঁকিয়ে ওঠে, বিদ্রোহ জানায়। কী চায় ও জানিনে; বোধ হয় আর একটি মানুষের সান্নিধ্য, আর একটি বীভৎস ক্ষয়িষ্ণু সমজীবির স্পর্শ। কিন্তু দেহের এই অন্তর্দাহে আমি একটুও বিচলিত হইনে। পাঁজরের নীচে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি,—দ্রুত, অসম স্পন্দন। আমার কানে এই ধুক্‌ ধুক শব্দ অনেক দূরের কোন এঞ্জিনের শব্দের মতো লাগে। আশ্চর্য হয়ে যাই,—হৃদপিণ্ডটা আমারই তো? আমার হারানো সংগীদেরও হৃৎপিণ্ড আছে। তাদের হৃদয়ের স্পন্দন কোথায় হচ্চে—শুনতে পাইনে আমি। তাদেরও চুল, নোখ নিস্পৃহভাবে স্বচ্ছন্দে বেড়ে চলেছে। বেড়েই এরা নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। উদ্দেশ্যহীন এই বৃদ্ধি। এ ভাবেই সচেতন পদার্থ বাড়ে—অর্থহীন, বিস্ময়কর, বীভৎস নিয়মে। দশ বছর আগে আমি ছিলুম আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ—একজন শিক্ষক ও নাগরিক। আর কোন যোগ্যতা আমার ছিল না। মানুষ হিসেবে আমি নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতুম এবং জ্ঞানার্জনের তাগিদে সৃষ্টি করতুম নতুন নতুন সমস্যা। প্রিয়জনদের পীড়ন করাতেই ছিল আমার আনন্দ। গির্জায় প্রার্থনার সময়ে আমি উপস্থিত থাকতুম এবং রবিবার সন্ধ্যায় এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগ দিতুম। নাগরিক হিসেবে আমি অনুরুদ্ধ হলে ভোট দিতুম, সকালে খবরের কাগজ পড়তুম এবং আড্ডায় বসে রাজনীতির আলোচনা করতুম। শিক্ষক হিসেবে আমি নিয়মিত স্কুলে যেতুম, ইতিহাসের কয়েকটা ক্লাশ নিতুম। মাসের শেষে মাইনেটি এসে হাতে পৌঁছতো।

বেশ উপভোগ্য ছিল এই জীবনটা। বয়স ছিল অল্প, আশা-ভরসাও খুব ছিল। ডিসিপ্লিন আর সততায় বিশ্বাস রাখতুম। সকলেরই আমি প্রিয় ছিলুম। রবিবারে শরীরটা ঠিক রাখবার জন্যে শহরের বাইরে অনেক দূরে পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা আমার অভ্যেস ছিল। একটু বেশী রকম শৃংখলাবদ্ধ ছিল আমার চালচলন। পোষাক পরিচ্ছদ আমার সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো; সকালে আমি একরকম সুগন্ধী ব্যবহার করতুম সন্ধ্যায় অন্য একটি। অনেকেই আমার প্রশংসা করতো। হিংসেও করতো কেউ কেউ এবং কয়েকজন ঘৃণাও করতো। আমার বন্ধুরা ছিল সংযত প্রকৃতির। আন্তরিকতা প্রকাশে তারা ছিল পরিমিতাচারী, মতামতেও তারা মধ্যপন্থী ছিল, এমন কি আমোদপ্রমোদেও। সংযম আমার শত্রুদের মধ্যেও ছিল। আমার পরে তাদের ঘৃণা ছিল একজন সভ্যমানুষের ঘৃণা—করমর্দনের সময়ে অথবা মুচকি হাসিতে একটা নিস্পৃহ ভাব—এক রকম ভদ্ররুক্ষতা। লোকজনের সংগে আমার কোনরকম প্রবল উচ্ছ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। আমার পছন্দে, অপছন্দেও বিশেষ বাড়াবাড়ি ছিল না।

সে সময়ে যে মেয়েটিকে আমি ভালোবাসতুম সে ছিল কাছেই এক হাসপাতালের নার্স। সপ্তাহে দুদিন দেখা হত আমাদের—বুধবারে ও শনিবারে। হাসপাতাল থেকে ওকে ডেকে নিয়ে সাধারণত প্রথমে নাচতে যেতুম, তারপরে ফিরে এসে একেবারে বিছানায়। সমস্ত ব্যাপারটা খুবই সহজ ছিল। পরস্পরের মধ্যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাবার্তা খুব কমই চলতো। আমাদের প্রেম আমাদের শৃংখলাবদ্ধ জীবন-ধারারই একটা অংশ ছিল। এমন কি বিয়েও সে সময়ে অতিরিক্ত বলে মনে হত। মেয়েটির ছিল কালো চুল আর নীল চোখ। এই দুটো রঙের মিল আমার ভালো লাগতো। জীবনে এটাই ছিল আমার একমাত্র প্রকৃতিবহির্ভূত জিনিষ।

এক সোমবারের বিকেলে হঠাৎ আমি ঠিক করে ফেললুম—সন্ন্যাসী হবো। এখনও ভাবি—আমার জীবনের এই আমূল পরি-বর্তনের কারণ কি। কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনে। শুধু জানি—পরিবর্তনটা হঠাৎ ঘটেছিল এবং তাতে ভালোই হয়েছিল।

আমাদের আড্ডায় যাবার পথে চৌমাথা পার হবার সময়ে আমি মন ঠিক করে ফেললুম। মাথায় একটা ঝিম্‌ঝিমে অনুভূতি নিয়ে ট্রাফিকলাইটের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আমায় ধাক্কা দিলে। আমি আকাশের দিকে মুখ তুললুম—দেখলুম, নীল আকাশের গায়ে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। জোরালো বাতাস বইছিল মেঘগুলি তাই বেশ দ্রুত চলছিল। তখন গ্রীষ্ম অনেক দূর এগিয়েছে।

আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল, দেখলুম, এক অন্ধ ভিকিরী। ওর প্রসারিত হাতে ছিল পেতোলের একটা পাত্র; তাতে একটিমাত্র রৌপ্যমুদ্রা। সেই মুদ্রাটিকে আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। ভিকিরীটার প্রতি একটু অনুকম্পাও আমার মনে জাগেনি। ভিক্ষে আমি কখনও কাউকে দিইনে, কারণ দানে আমার একটুও আস্থা নেই।

ট্রাফিকলাইট সবুজ হয়ে জ্বলে উঠলো। আমার কাছে যা পয়সা ছিল সব ওর পাত্রে ঢেলে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেলুম। কে আমাকে চেঁচিয়ে ডাকছিল, কিন্তু আমি তাতে কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম।

মাথার ঝিম্‌ঝিমে ভাবটা হঠাৎ কখন কেটে গেছে। বেশ হাল্কা লাগছিল নিজেকে—ভারী আরাম পাচ্ছিলুম। নিজের অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্যই করিনি আমি। মনে হল সব কিছু বিলিয়ে দেওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও পৃথিবীর কারুর প্রতি এক ফোঁটা করুণাও আমি অনুভব করছিলুম না। অনির্বচনীয় এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো একটা সহজ প্রবৃত্তির বশেই আমি ও রকম অদ্ভুত কাজ করেছিলুম।

রাস্তার ও-ধারে পৌঁছবার আগে একবার পেছন ফিরে দেখি ভিকিরীটা আমার সংগে সংগে আসচে। আমি তাড়াতাড়ি আমার গা থেকে হাল্কা বর্ষাতিটা খুলে ওর কাঁধের ওপর ছুঁড়ে দিলুম। তারপর আর পেছনে না তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে আড্ডায় ঢুকে পড়লুম।

প্রথা মতো আমার তিন বন্ধুই ছিল সেখানে। একজন আমার স্কুলের সহকর্মী—খুব ভক্ত আমার। সর্বদাই সে আমার কাছে সবিস্তারে তার একঘেয়ে প্রেমের গল্প করতো। দ্বিতীয় জন বড় এক ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার কেরাণী। তার বুদ্ধিশুদ্ধির

তুলনায় অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকে তার ঝোঁকটা একটু বেমানানই ছিল। তৃতীয়টি এক বেকার সংগীতজ্ঞ। লোকটার গুণ ছিল কিছু, কিন্তু স্বভাবটা ছিল একটু কুঁড়ে ধরণের।

খবরের কাগজটা আমি তুলে নিলুম। ভীষণ গরম লাগছিল। এই প্রথম আমি আমার শরীরের নিঃশব্দ সঞ্চালন অনুভব করলুম। বন্ধুদের প্রশ্নগুলি আমার কানে পৌঁছচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি যেন অনেক উঁচু এক পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের দেখচি, মাথার ওপর আমার নীল আকাশ, মেঘেরা নীচে ভেসে চলছে। আমার মস্তিষ্ক সে সময়ে বলতে গেলে তার পর থেকে সব সময়ের জন্যই একেবারে অচল হয়ে পড়েছিল। আমার সন্ন্যাসী হবার সংকল্প একটা প্রাকৃতিক ঘটনাই বলা চলে, পোড়ো জমিতে গাছ জন্মাবার মতো, মরুভূমিতে বৃষ্টি হবার মতো অথবা সাংঘাতিক রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবার মতো। হঠাৎ আমি ঠিক করেচি আর বুঝতে চেষ্টা করবো না কিছু, বুঝতে আমি চাইনে। আমার অন্তরে যে শান্তি বিরাজ করছিল—সে সব প্রশ্ন, সব সমস্যা এবং অহমিকার অতীত।

আমার এতো ভালো লাগছিল যে, বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলুম, কোন কথাই বললুম না। আমার নির্বাক অবস্থাটা তিন বন্ধুকেই ঘাবড়ে দিয়েছিল। পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করে তারা তাদের দীর্ঘ লাল হাতগুলি দিয়ে টেবলটা হাতড়াতে লাগলো। ওদের অসহায় ভাবটা দেখে আমার ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল।

"তুমি বড়ো হয়রাণ হয়ে পড়েছ, ভায়া।" অর্ধনিমীলিত চোখে একটু সলজ্জ হাসি হেসে সংগীতজ্ঞটি আমায় বললে।

"তোমার কোনো টনিক খাওয়া দরকার। এই ঋতু পরিবর্তনের সময়ে প্রত্যেকবারই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো।" আমার সহকারী শিক্ষকটি বলে উঠলো।

তারপর কেরাণীটি উঠে আমার হাত ধরলে। আমাকে দরজা পর্যন্ত সে নিয়ে চললো, যেতে যেতে হঠাৎ একটা অন্ধকার জায়গায় এসে আমার খুব কাছে মুখ এনে নীচু গলায় বললে—"বুঝতে পেরেছি আমি—এ সেই মেয়েটার কাজ.....নয় কি? সে নিশ্চয়ই কাল আসেনি না? ভেবো না কিছু! বাড়ি গিয়ে তোফা ঘুম দাও গে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল আবার দেখা হ'বে'খন।" বলেই ও চলে গেল।

প্রায় ৭টার সময়ে আমার ঘরে পৌঁছলুম। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ছেড়ে শয্যাগ্রহণ করলুম। সারাক্ষণই আমি হাসছিলুম, কেন জানি নে। হঠাৎ মনে পড়লো আমার সমস্ত টাকা পয়সা দান করে ফেলেচি।

আমার বিছানা ছেড়ে উঠে জানালাটা খুলে দিলুম। নীচে রাস্তায় আলো জ্বলছিল, ব্যস্ত হয়ে লোকজন চলেছে, মোটরে, বাসে, ট্রামে। কিন্তু এত গাড়ি ঘোড়া চলা সত্ত্বেও রাস্তাটা বেশ নিস্তব্ধ। খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম আমি আর একটা ভীষণ হাসির বেগে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠছিল—আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মতো। বিশ্রীরকম অশ্লীল আমার হাসিটা। কিন্তু আমি তা' বুঝতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল—পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যা নেমেছে, নীচে মেঘগুলি ভেসে চলেছে, মাথার ওপরে আমার শান্ত, স্বচ্ছ আকাশ।

পরদিন সকালে স্কুলে যাবার আগে একবার মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীতে গেলুম। সেখানে দু'ঘণ্টা ধরে সাধু পুরুষদের জীবনী পড়লুম। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল সন্ন্যাসীরা সকলেই খুব সৎ ও সুখী। কিন্তু আমি ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়লুম যখন দেখলুম সন্ন্যাসীদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রলোভন, দুঃখ আর কষ্ট। প্রলোভন আর কষ্ট যত বেশী দুঃখও সেই পরিমাণেই বেশী। দুঃখ ভোগের মধ্যে তারা একটা মনগড়া সুখ পায়। সন্ন্যাসীরা স্বভাবতই অসুখী, সামর্থ্যের অনুপযোগী দায়িত্বভারে ভারাক্রান্ত আর প্রায়ই তারা নির্বোধ ও হিংস্র জনতার হাতে লাঞ্ছিত হয়। তাদের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন চূড়ান্ত অত্যাচারী—তাঁর অনুরাগে কিংবা রাগে কোনো সংগতিই নেই। সময়ে সময়ে বিনা কারণেই তিনি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন এবং তাঁর ভক্ত সন্ন্যাসীদের উৎকটভাবে পীড়ন করেন। অন্ধকার ও বিশৃঙ্খল তাদের জীবনের পথ।

এই সব ভাবতে ভাবতে আমি রেক্টরের ঘরে ঢুকলুম—প্রকাণ্ড বড় বাড়ি, তা'র ছ তলায়। ক্লাসগুলি ছিল বাকী পাঁচ তলায়। রেক্টরের অফিসে যাবার জন্যে একটা মার্বল পাথরের সিঁড়ি ছিল—শিক্ষকেরাই শুধু সেটা ব্যবহার করতেন।

দরজায় ধাক্কা না দিয়েই আমি অতি পরিচিতের মতো সটান ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লুম। রেক্টর মশাই টের পাননি আমি ঢুকেচি। তিনি তখন বুক চুলকোচ্ছিলেন আর আপন মনেই খুব হাসছিলেন। মনে হ'ল তিনি বেশ আরাম পাচ্ছেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন ঘরের ভিতরে তিনি একাই আছেন।

তাঁর কথার অপেক্ষা না রেখেই আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লুম। আমার দিকে তাকিয়ে ওঁর নাসারন্ধ্র একটু কেঁপে উঠলো। হঠাৎ ওঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাগুলি ওঁর বিভিন্ন প্রণয়োপাখ্যান—যা নিয়ে প্রত্যেকদিন সকালে শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা হয়—সবই আমার মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক বিবাহিত হলেও সঙ্গ-বৈচিত্র্যের দিকে ঝোঁকটা তাঁর একটু বেশীই ছিল। খুব ঘন ঘন তাঁর প্রণয়িনী বদ্‌লাতো আর তার ফলে আমাদের ভেতর দীর্ঘ এবং উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলতো। তাঁর শেষ দাঁও হচ্ছে স্থানীয় এক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের একটি নর্তকী।

"বর্তমান সমাজে সন্ন্যাসী হয়ে থাকা কি সম্ভব বলে মনে করেন আপনি?" আমি জিগ্যেস করলুম। প্রশ্নটা নির্বোধের মতোই হয়েছিল, স্বীকার করছি।

আমার প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত আছে বলে তিনি মনে করলেন বোধ হয়, কারণ তাঁর নাসারন্ধ্র আবার কাঁপতে লাগলো। তিনি বললেন, "সন্ন্যাস ধর্মটা মধ্যযুগের জিনিষ। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ঐকাত্ম্য প্রণালীরই অংশ বিশেষ। এখন আর এই ঐকাত্ম্য সম্ভব নয়। আমরা এখন বিশ্বাসের জায়গায় বসিয়েছি জ্ঞানকে। আমাদের জীবনে যা কিছু অপরিমিত যা কিছু প্রবল তাদের আমরা অবদমিত করে রেখেচি। ড্রয়িংরুমের উপযোগী এক রকম ধর্ম সৃষ্টি করেচি—তাতে ধর্মসুলভ আবেগের স্থান নেই।" রেক্টর বলে চল্‌লেন, কারণ নিজের গলার স্বর শুনতে তাঁর ভালো লাগতো। "এক পার্টিতে আমি একটি লোকের দেখা পেয়েছিলুম—ধর্ম নিয়ে সে একেবারে পাগল। রোগটা বিশেষ মারাত্মক ছিল না। তা' সত্ত্বেও সে সেদিনকার পার্টিতে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। শেরি-পার্টিই বোধ হয় ছিল সেটা', অন্যমনস্ক হয়ে তিনি বললেন, "হঠাৎ এক সময়ে লাফিয়ে উঠে সে সমস্ত কাঁচের গ্লাসগুলি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তার পরে প্রবলভাবে ধর্মোপদেশ বর্ষণ করতে শুরু করলেন। বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, তখন সে নিজেকে যিশু খৃষ্ট বলেই ভাবছিল। তার অভিনয়টা বেশ ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একজন ডাক্তার তাকে শান্ত করবার জন্য মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দিলেন। কারণ উপদেশ বর্ষণের পর সে চেয়ার ও বোতল ছুঁড়তে শুরু করেছিল। আমরা প্রথমে ভেবেছিলুম মদের নেশাতেই ও ও-রকম করছে। নেশাচ্ছন্ন মানুষের আর সন্ন্যাসীর ব্যবহার অনেকটা একই ধরণের বই তো নয়। পরবর্তী সময়ে এ রকম উত্তেজনা তার প্রায়ই হ'ত, উগ্রতা-ও তার বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাকে লোকজনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিকিৎসাধীনে রাখতে হ'ত। ......সন্ন্যাসধর্মটা এক রকম উন্মত্ততা, আধ্যাত্মিক উগ্রতার অবদমনের প্রতিক্রিয়া, মর্ষণকামী প্রবৃত্তির উদ্‌গতির

একটা অদ্ভূত এবং হৃদয়গ্রাহী রূপ।"

"বাস্তবিক" বলে আমি উঠে পড়লুম। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল। আমি ভীষণ হাসছিলুম, আর আমার কর্কশ অট্টহাসি রেক্টরকে ভড়কে দিয়েছিল। তিনি-ও উঠে আমাকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। বললেন, "ক্লাসে যান এবার। যদি অসুস্থ বোধ করেন তবে আজকের দিনটা ছুটি দিতে পারি আপনাকে।"

"ধন্যবাদ", আমি উত্তর দিলুম, "আমি বেশ ভালোই বোধ করছি, তবে আজ আর ক্লাস নেবো না। ভাবচি, আর কোনোদিনই ক্লাস নেবো না। আমার মর্ষণকামী প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্‌গত করবো ঠিক করেচি........আশা করি আমার এই একটু আধটু পাগলামিতে বিরক্ত হবেন না আপনি........এ ব্যাপারে আপনার উদার এবং বিজ্ঞান-সম্মত মতামত জেনে আমার খুব উপকার হল। আমার সুখের কথা কিন্তু বলতে পারবো না আপনাকে, বুঝতেই পারবেন না আপনি কিছু।"

সেদিনই বিকেল ৫ টায় আমি আমার সমস্ত জামাকাপড় সেই ভিকিরীটাকে দিয়ে দিলুম। লোকটা ট্রাফিক লাইটের কাছে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কোনোরকম করুণা বা সহানুভূতি অনুভব না করেই আমি কাজটা করে ফেললুম। এ একরকম সুখ, খাঁটি এবং দুর্দম সুখ।

পরদিন ছিল বুধবার। সকাল থেকেই রাস্তার ওপরে জোরালো বাতাস বইছিল। বাতাসের সংগে ভেসে আসছিল মেঘ আর সমুদ্রের নোনা গন্ধ। সন্ধ্যার সময়ে অনেক দূর থেকে মেঘের ডাক ভেসে আসতে লাগলো। শিগগিরই বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো—ফ্ল্যাটের পর্দা দেওয়া জানালাগুলি আর শহরতলীর বোর্ডিং বাড়ির দেয়ালের আয়নাগুলি থেকে থেকে আলোকিত হয়ে উঠতে লাগলো। আমার পাশের ঘুমন্ত মেয়েটির মুখের পরেও আলো এসে পড়ছিল। আমাদের দুজনের হৃদয়ের স্পন্দন শুনছিলুম আমি—ওরটা ধীর এবং নিয়মবদ্ধ, আমারটা দ্রুত এবং অসম। প্রত্যেক ঘণ্টায় আমার খুশির পরিমাণ বেড়েই চলেছিল। আসন্ন ঝড়টাও যেন আমার মধ্যে একটা নতুন উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। সঙ্গিনীর নগ্ন বুকের ওপরে আমার হাত দুটো রাখলুম। মেঘ ডাকছিল, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল।

"দ্যাখো", আমি ওকে বললুম, ওচোখ খুললে, "আজ রাত্তিরে তোমায় আমি ভীষণ ভালোবেসেচি—খুব বেশী রকম, প্রচণ্ডভাবে ...কেন জানো? একটা দুর্দম, অসীম সুখ অনুভব করছি আমি ভালোবেসেচি তোমার দেহটাকেই, শুধু ভালোবেসেচি তোমায়, এত ভালোবাসতে পেরেচি, তার কারণ, আমি ঠিক করেচি কোনো কিছুই বুঝতে চেষ্টা করবো না এখন থেকে। সত্যি বলতে গেলে, আমি ভালোবেসেচি তোমার দেহটাকেই, শুধু ভালোবেসেচি তোমার শুভ্র নগ্ন দেহকে, তোমার অঙ্গের স্নিগ্ধ ছন্দকে, তোমার হৃদয়ের মন্থর ও সংযত স্পন্দনকে........" ও হঠাৎ কণুই-এ ভর করে উঠে আমার দিকে তাকালো। ওর নীল চোখ দুটো ভয়ার্ত, ঠোঁট দুটো ফাঁক। রাস্তার ম্লান আলোয় দেখা যাচ্ছিল ওর শুভ্র দাঁতগুলি।

"ভয় পেয়ো না তুমি", বলে আমি ওর হাতদুটো চেপে ধরলুম, "একটা অমানুষিক আনন্দ এসেচে আমার মধ্যে। প্রাচীনকালের ঋষিরা যখন পরমপিতা ভগবানের সংগে ঐকাত্ম্য স্থাপন করতেন তখন তাঁরা-ও নিশ্চয়ই এ রকম অনুভব করতেন। কিন্তু আমি কারুর সংগেই ঐকাত্ম্যস্থাপন করিনি—একাই আমি শক্তিমান। আমার পাশে তোমার দেহটাই শুধু রয়েচে—আর তোমার রেশমের মতো কবোষ্ণ, মসৃণ গায়ের ত্বক, তোমার কালো চুল আর নীল চোখ, আর তোমার কোমল হৃদয়। বলতে পারো, মধ্যযুগের ঋষিরা কী করে দৈহিক কামনাকে পাপ বলে মনে করতে পারতেন? আমার মতে, এটাই সব চেয়ে উচুস্তরের তপস্যা, ভক্তির নিদর্শন এবং পবিত্রতম ও প্রবলতম সুখ।"

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে ও ছুটলো জানালা লক্ষ্য করে, সাহায্যলাভের আশাতেই বোধ হল। বিদ্যুতের আলোতে আবছা দেখা যাচ্ছিল ও কাঁপছে। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছিল জানালায়, আর তাতে জানালার কাঁচটা উঠছিল কেঁপে। ওর দিকে না তাকিয়ে আমি জামা কাপড় পরতে শুরু করে দিলুম। পরা হয়ে গেলে পর গেলুম ওর কাছে।

"দুঃখ ভোগ করাটাকেই আদর্শ বলে মেনো না", বললুম আমি, "আর, বুঝতে চেষ্টা কোরো না কিছু।......আজকের এই রাতটার কথা ভুলে যেয়ো। অন্তরের আনন্দের জন্যেই তোমার সংগে আজ রাত কাটালুম—আমার ভালো লাগলো বলে, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়......এতে যদি আমাদের সুশৃংখল জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটে থাকে, ক্ষমা কোরো আমাকে, আমার এই অসীম ও দুঃসহ আনন্দের কথা স্মরণ করেই আমাকে ক্ষমা কোরো।"

ও দাঁড়িয়েই রইল। ক্ষীণ আলোয় দেখা যেতে লাগলো ওর শুভ্র দেহ, ওর অঙ্গের স্নিগ্ধ ছন্দ আর রেশমের মতো কবোষ্ণ ও নরম ওর গায়ের ত্বক্।

বাইরে বৃষ্টির ঝাপটা এসে মুখের ওপর লাগতে লাগলো। গান গেয়ে, হেসে আর নেচে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারা শহরটা ঘুরে বেড়ালুম। তারপর কখন এক পুলিশ এসে আমাকে ট্যাক্সীতে চাপিয়ে ধরে নিয়ে চললো। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, বাধা দেবার শক্তি ছিল না।

আমার শুধু মনে আছে কী করে লিফটে অনেকতলা উঁচু একটা ঘরে উঠেছিলুম। মনে হচ্ছিল ওপরে ওঠা আর শেষ হবে না। ওপরে পৌঁছে আমাকে একটা ছোট ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ঘরের দেওয়াল সাদা, টেবল, বিছানা আর চেয়ারটা ও। এমন কি শিক লাগানো জানালার পর্দাগুলি-ও সাদা। দরজার তালায় চাবি ঘোরাবার শব্দ শোনা গেল।

জামা কাপড় না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। স্বপ্নটা আমার পরিষ্কার মনে আছে, কারণ তার পরেও অনেকবার স্বপ্নটা দেখেচি। স্বপ্নে দেখলুম—পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে নীচের মেঘ দেখচি আমি। মাথার ওপরে ট্র্যাফিক লাইট। যখনই আমি ওপরের দিকে তাকাচ্ছিলুম সবুজ আলো জ্বলে উঠছিল। হঠাৎ কে যেন আমার কপালের ওপর হাত রাখলে। পেছনের লোকটার সংগে হুড়োহুড়ি আরম্ভ করে দিলুম, কিন্তু পরে পেছনে ফিরে দেখি স্বয়ং রেক্টরমশাই দাঁড়িয়ে বুক চুলকোচ্ছেন আর হাসচেন।

"কি হে কৃচ্ছ্রসাধক!" বলে উঠলেন তিনি, তারপর দু'হাত দিয়েই গা চুলকোতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কুঁকড়ে বিশ্রী আকার নিলো শরীরটা। আমি আবার আগের মত রাত্তিরে নিজের ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম, মেঘ ডাকতে লাগলো। বিদ্যুতের শুভ্র ঝলকে সেই অন্ধ ভিকিরীটাকে আবছা দেখা গেল। হাতের পাত্রটা ও উঁচু করে ধরলে, তাতে দেখলুম, পয়সার বদলে রয়েচে কতগুলি মানুষের চোখ। শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েচে সেগুলি। বেশীরভাগ চোখই নীল, ভুরুগুলি কালো। অন্ধকারের মধ্যে ভিকিরীটা এগোতে লাগলো আমার দিকে। হাতে ওর একটা লম্বা, তীক্ষ্ম সূঁচ, আমার বুকের দিকে তার লক্ষ্য।

"তোমাকে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দেওয়া দরকার।" শুনলুম ও বললে।

আমি ছুটে গেলুম জানালা খুলে সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্য। না ছুঁতেই জানালাটা একেবারে খুলে গেল। রাত কেটে গিয়ে দিন হয়েচে তখন। অন্য একটা ঘরের ভিতরে, দেখলুম, কতগুলি

...োক মদ পান করছে। ও দের মধ্যে যিশুখৃষ্ট-ও ছিলেন। তিনি ...েবল থেকে কাচের গ্লাসগুলি ফেলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু মেঝেতে পড়ে সেগুলি ভেঙে গেলে-ও ঘরটা ছিল অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ।

হঠাৎ উল্টো দিকের দেয়ালের আয়না থেকে বেরিয়ে একটা পুলিশ ওঁকে বন্দী করলো। ঠিক আমার কেরাণী বন্ধুটির মতোই পুলিশটার চেহারা।

"ভয় পাবেন না", পুলিশটা ওকে বললে, "স্থানীয় থানা থেকে শহরের সমস্ত সন্ন্যাসীদের বন্দী করবার আদেশ এসেচে। কারণ সন্ন্যাসীরা শান্তিভঙ্গ করেন, সুখের জন্য তাঁরা বড়ো বেশী লালায়িত ...... তাঁদের প্রলুব্ধ করে, শাস্তি দিয়ে একেবারে নির্মূল করে ফেলতে হবে।"

তার পরেই আমার ঠিক পাশ থেকে কে যেন বললে, "ঘুমের ভেতর হাসচে ও........নিশ্চয়ই খুব সুখী লোকটা........সংসারে পাগলামী আর সুখ জিনিষটা বেশ খাপ খায়, কী বলুন?" ,

কে যেন আমার নাড়ি দেখছিল। চোখ খুলে অনুভব করলুম তখন-ও আমি হাসচি।

"রোগী আজ কেমন?" লম্বা, দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক তাঁর সামনেকার দেয়ালের দিক লক্ষ্য করে জিগ্যেস করলেন। সার্টের মতো সাদা একটা জামা ওঁর গায়। আমাকেই প্রশ্নটা করা হল কিনা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলুম আমি। আমার বিছানার পাশে আর একটি অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিই আমার নাড়ি দেখছিলেন। "কেমন আছে রোগী, আজ?" দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আবার জিগ্যেস করলেন। কপালের সামনে একটা পেন্সিল ঝুলিয়ে ধরে সেটার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি।

ভাবলুম আমার স্বপ্নেরই জের চলছে বুঝি। পরীক্ষা করবার জন্য আমি কথা বলে উঠলুম।

"রোগী আজ কেমন আছে?" আমি বললুম। নিজের গলার স্বর ও কথাটায় আশ্চর্য লাগলো নিজেরই। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটির হাত থেকে পেন্সিলটা পড়ে গেল, যুবকটি আমার হাতের ওপর থেকে হাত টেনে নিলে। তারপর দুজনে দৃষ্টি বিনিময় করলে! মনে হল ওরা ঘাবড়ে গেছে। ফিসফিস করে কতক্ষণ পরামর্শ করবার পর দুজনেই ঘর ছেড়ে চলে গেল। আবার তালায় চাবি ঘোরাবার শব্দ এলো। ছুটে গিয়ে জানালা খুলে ফেললুম। জানালার পেছনে গরাদ, তার পেছনে একটা বাগান। অদ্ভুত রকম উত্তেজিত এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে দুজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক বাগানের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যখনই কোন স্ত্রীলোকের সংগে কোনো পুরুষের দেখা হচ্ছিল সে চীনাদের মতো ভূমি স্পর্শ করে স্ত্রীলোকটিকে অভিবাদন করছিল। মিনিট কয়েক পরে সেই দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আর তাঁর সহকারীকে বাগান পার হয়ে আসতে দেখা গেল। বাগানের ওধারের বাড়িতে দুজনেই ঢুকে পড়লো একটা কাচের দরজা দিয়ে, বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা ছিল তার গায়ে—"Consultation Room, Municipal Mental Hospital."

দুঘণ্টা বাদে আমাকে এই কাচের দরজা দিয়েই একটা বড় ঘরে ঢোকানো হল—প্রচুর আলো ঘরের ভেতর, আর সাদা রঙের জিনিষপত্রই বেশী। লোকে ভর্তি ঘরটা। সাদা চেয়ারে সার দিয়ে বসে সবাই। প্রথমে রেক্টরমশাই, তারপর আমার তিন বন্ধু—কেরাণী, শিক্ষক আর সংগীতজ্ঞ। তারপর ক্রমে—আমার বান্ধবী—কালো চুল আর নীল চোখের অধিকারিণী সেই নার্সটি, অন্ধ ভিখিরীটা আর সেই পুলিশটা আমাকে ধরে এনেছিল সে। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি আর তাঁর সহকারী একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিল। সবাই আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, অবশ্য ভিখিরীটা বাদে। লক্ষ্য করলুম ওর সংগে পেতোলের পাত্রটা নেই, কিন্তু গায়ে ছিল ওর আমারই একটা ওভারকোট।

দাড়ির আড়ালে মুচকি হেসে দাড়িও... এলেন আমার দিকে, তারপর আমার কাঁধের ও... হাতখানা রাখলেন। আমাকে বললেন,—স্থানীয় পু... বিভাগ থেকে তোমার সবন্ধে তদন্ত করা হয়েচে। তাদে... অনুসারে তুমি বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত একটি সাংঘাতিক ... এরা সবাই সাক্ষী........তুমি যেসব বক্তৃতা দিয়েছো তাতে শহরে শান্তিভঙ্গ হবার আশংকা আছে। তার ওপরে, এই নিরীহ যুবতীর সংগে তুমি ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলে, একজন দরিদ্র অন্ধলোককে তুমি প্রকাশ্যে অপমানিত করেছিলে, সব শেষে, তোমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তুমি মাতাল অবস্থায় অর্থহীন চীৎকার করে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছিলে—এতে শান্তিপ্রিয় শহরবাসীদের তুমি বিরক্ত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছো। বিবৃতি অনুযায়ী তুমি হয় একজন বিপ্লবী, না হয় তো N. N. P. নামে খ্যাত National Nudist Party-র সভ্য। তোমাকে এখানে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েচে। এবার 'হা' করতো, একবার।"

ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে আমাকে যা করতে বলা হল তাই করলুম।

"যাও, এবার বোসোগে।" দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে কথাটা বলে ডাক্তার সিগারেট ধরালেন। "তোমার জীবনের প্রথম দিককার কোনো ঘটনা মনে করতে পারো?" আমার চোখের দিকে সোজা তাকাবার বৃথা চেষ্টা করে ডাক্তার বলে চললেন, "তোমার বাবা কি মা'র প্রতি তোমার কি কোনো বিশেষ আকর্ষণ ছিল? তোমার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ কি উন্মাদ কিংবা মৃগী রোগাক্রান্ত ছিলেন? তুমি কি প্রায়ই স্বপ্ন দ্যাখো? কখনো কি চাবি, পেন্সিল কিংবা আলু দেখেচো স্বপ্নে? আলু", নিজের মনেই আবার বললেন, "হুঁ, আলু আর পেন্সিল, এ একটা সূত্র হতে পারে।"

হঠাৎ ওঁর গলার স্বর বদলে, মেঝেতে খালি টিন গড়ালে যেমন শব্দ হয় তেমনি হয়ে গেল।

"জোরে হাস-তো।" উনি বললেন আমাকে। আমি চুপ করে থাকাতে আবার বললেন, "আরো জোর গলায়।" সব সাক্ষীরাই তখন মুচকি হাসছিল। কিন্তু আমি গম্ভীর হয়ে রইলুম—শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে কে জানে? আবার যখন ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "হাসো, বলচি।" তখন রেক্টর মশাই আর থাকতে না পেরে ভীষণভাবে হো হো করে হেসে উঠলেন। তার পরেই আবার হাসিটা সামলে নিলেন। ডাক্তারটি আবার আমার চোখের দিকে সোজা তাকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টা-ও যখন বিফল হ'ল, বিরক্ত হয়ে তিনি যন্ত্রটার কাছে ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে আবার সহকারীর সংগে নীচু গলায় পরামর্শ করতে লাগলেন।

আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কাচের দরজার দিকে ছুটে গেলুম। দরজায় তালা লাগানো ছিল না। তাড়াতাড়ি খুলেই খুব জোরে ছুটতে আরম্ভ করলুম বাগানের ভেতর দিয়ে। সেই দুজন লোক আর স্ত্রীলোক তিনটি তখন-ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একজন লোক আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে অভিবাদন করলো ভূমি স্পর্শ করে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটলুম গেটের দিকে। একটা ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে তাতে চড়ে বসলুম।

"স্টেশনে—চালাও তাড়াতাড়ি"—চেঁচিয়ে বললুম। বাগান থেকে অনেকেই আমাকে ডাকছে শুনতে পেলুম। আমি আর ফিরে তাকালুম না।

গত দশ বছর ধরে আমি এই পাহাড়ের ওপরে আছি। সকাল সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখতে পাই। আমার

(শেষাংশ ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইউরোপ
এড়াবার
...ওয়ার
...চ্ছে
...ন

একটা ত

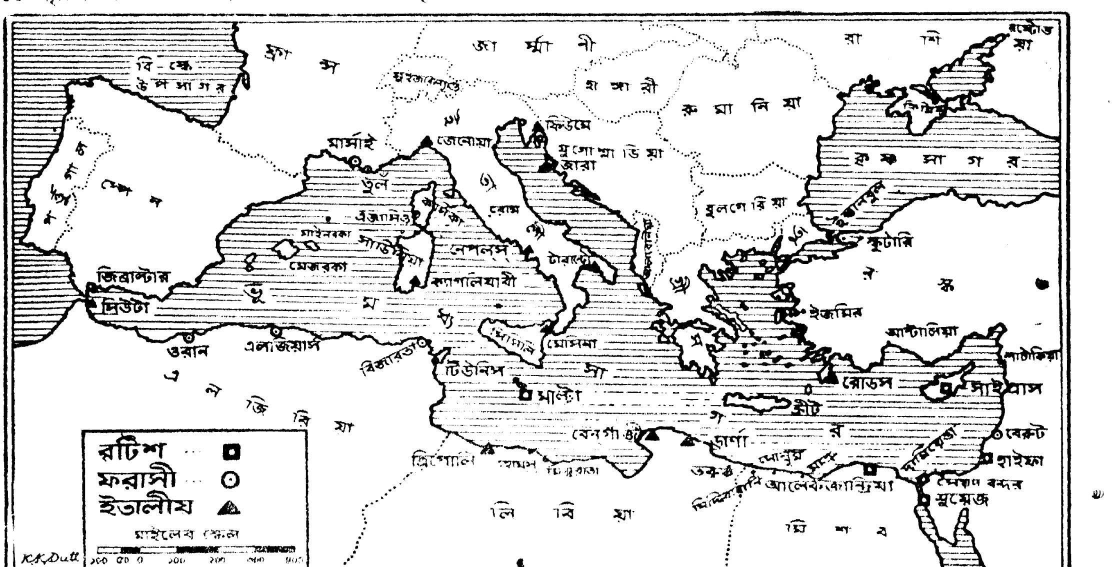
তিউনিসিয়ার পর

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ তিউনিসিয়ায় মিত্রপক্ষ জয়লাভ করায় যুদ্ধে এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছে। তিউনিস ও বিজের্তার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ চার্চিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শের জন্য ওয়াশিংটন গিয়েছেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলকেও নিয়েছেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ওয়াশিংটনে কেবল ইউরোপীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধেই পরামর্শ হবে না, প্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা হবে। তারপর খবরে প্রকাশ পেয়েছে যে, ওয়াশিংটনে আলোচনার পর মিঃ চার্চিল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মঃ স্ট্যালিনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে পারেন। মোট কথা তিউনিসিয়া বিজয়ে মিত্রপক্ষের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করেছে এবং তার ফলে তাদের কর্ণধারগণের মধ্যে একটা তৎপরতাও দেখা দিয়েছে। সকলের মনেই প্রশ্ন জেগেছে—এর পর কি?

তিউনিসিয়ার যুদ্ধকে প্রথমে সামরিক দিক থেকেই বিচার করা যাক। স্ট্যালিনগ্রাদে এক্সিস পক্ষের যে বিপর্যয় ঘটে তার জের সোভিয়েট রণাঙ্গনে অনেক দূর গিয়ে দাঁড়ায়। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছেড়ে সেখানে এক্সিস বাহিনীকে সরে আসতে হয়। কেবল সরে আসারই কথা নয়; কয়েক মাসের মধ্যে এক্সিস পক্ষ সোভিয়েট রণাঙ্গনে নিহত, আহত ও বন্দী মিলিয়ে প্রায় লাখ দশেক সৈন্য ও তদুপযোগী সমরোপকরণ হারায়। এক্সিস পক্ষের সামরিক শক্তিতে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। তারপর তিউনিসিয়ায় তাদের এই শোচনীয় পরাজয়। ডানকার্কে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর যে দুর্গতি হয়েছিল তিউনিসিয়ায় এক্সিস বাহিনীর তদপেক্ষা বেশী দুর্গতি হয়েছে। ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে সমরোপকরণ হারালেও ডানকার্ক হতে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর অধিকাংশকে বৃটেনে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু তিউনিসিয়া হতে এক্সিস বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিরাট সৈন্যদল নিয়ে সতেরজন জেনারেলসহ এক্সিস বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফন আর্নিমকে সেখানে মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। পরাজয় অপেক্ষাও এই আত্মসমর্পণ বেশী ক্ষতিকর এবং সদলবলে ফন আর্নিমের এভাবে আত্মসমর্পণ সেখানকার সামরিক অবস্থার ওপর অনেকখানি আলোক সম্পাত করে। মিত্রপক্ষ ভূমধ্যসাগরে নৌবলে এবং উত্তর আফ্রিকায় বিমানবলে প্রাধান্য লাভ না করে থাকলে এক্সিসপক্ষ নিশ্চয়ই উত্তর-আফ্রিকা থেকে তাদের এত বড় একটা সৈন্যদলকে অপসারণের চেষ্টা করত না। মিত্রপক্ষের যখন ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে তখন এক্সিসপক্ষ সাধ্য থাকলে এত বড় একটা ক্ষতি স্বীকার করতে কিছুতেই যেত না। কাজেই মিত্রপক্ষ উত্তর-আফ্রিকায় এক্সিস বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে বাধ্য ক'রে কেবল নিছক জয়ের গৌরবই অর্জন করেনি, সামরিক বলের দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের তারা যথেষ্ট ক্ষতিসাধনেও সমর্থ হয়েছে। উত্তর-আফ্রিকা থেকে এক্সিসপক্ষ তাদের সৈন্য সরাতে সক্ষম হ'লে তিউনিসিয়ায় মিত্রশক্তিবর্গের কেবল বড় রকমের একটা "স্ট্র্যাটেজিক" সুবিধাই হ'ত; কিন্তু প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারায় সামরিক বলের দিক দিয়েও তারা যথেষ্ট লাভবান হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষের বিমানবলে প্রাধান্য লাভ একটা বড় কথা। যে জার্মানরা কেবল বিমানবলের সাহায্যেই ক্রীট দ্বীপ দখল করেছিল, সেই জার্মানরা আজ বিমানবলের অভাবে সাগর পাড়ি দিতে অসমর্থ হয়ে তিউনিসিয়ায় আত্মসমর্পণ করল। তারপর আসে ইতালীর নৌবলের



এই মানচিত্র কিছুদিন আগে অঙ্কিত। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় ঘাঁটিগুলি এখন মিত্রপক্ষের অধিকারে।

কথা। আগাগোড়াই দেখা গিয়েছে যে, ইতালীর নৌকর্তৃপক্ষ ভূমধ্যসাগরে আত্মরক্ষাত্মক নীতি অবলম্বন করে এসেছে। যেখানেই বৃটিশ নৌবলের সম্মুখে ইতালীর নৌবল পড়েছে, সেখানেই ইতালীর নৌবাহিনী তাদের প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। ইতালী এযাবৎ কোথাও নৌবলে বৃটেনকে 'চ্যালেঞ্জ' করতে সাহসী হয়নি। তিউনিসিয়ার বেলাও ইতালীর এই নৌনীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে তার নৌবল আগে থেকেই বাড়ির কাছের নৌঘাঁটিগুলিতে সরিয়ে রেখেছে। এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ও বুদ্ধিমানের কাজ, কেননা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় যখন এক্সিসপক্ষের বিমানবলে প্রাধান্য ছিল তখনও সে যেখানে নৌবলে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হ'তে পারেনি সেখানে বিমানবলে প্রতিপক্ষ প্রাধান্য লাভ করবার পর তিউনিসিয়া থেকে এক্সিস বাহিনীকে পার করতে গেলে তার পক্ষে দুঃসাহসেরই পরিচয় দেওয়া হ'ত। এত বড় ঝুঁকি সে নিতে পারে না এবং হিটলারও ইতালীকে তেমন বুদ্ধি দিতে পারেন না ; কারণ, তিউনিসিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই মূলে ইউরোপ রক্ষার প্রশ্ন ওঠে। ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষের জলপথে অভিযান ঠেকাতে হ'লে হিটলারকে প্রধানত নির্ভর করতে হবে ইতালীর নৌবলের ওপর। সুতরাং এই অবস্থায় ইউরোপ রক্ষার কথা চিন্তা না করে তিউনিসিয়া থেকে এক্সিস সৈন্য পার করার জন্য হিটলার ইতালীর নৌবলকে বিপদের মুখে পাঠাতে পারেন না। ভূমধ্যসাগরে যখন একমাত্র বৃটিশ নৌবল ছিল তখনই ইতালী জলযুদ্ধে তাকে এড়িয়ে চলেছে। আর সেখানে যখন বৃটিশ নৌবলের সঙ্গে মার্কিন নৌবল এসে যুক্ত হয়েছে তখন ইতালী 'চ্যালেঞ্জ' করে তিউনিসিয়া থেকে এক্সিস সৈন্য পার করতে গেলে তার পক্ষে সামরিক বিচক্ষণতা প্রকাশ পেত না। উত্তর আফ্রিকার উপকূলের কাছে উভয় পক্ষের নৌবলের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেলে যুদ্ধের একটা পর্ব এগিয়ে যেত সন্দেহ নেই ; কিন্তু এক্সিস পক্ষ তা হতে দেয়নি—পর্বটিকে সে পিছিয়ে দেবারই চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ মিত্রপক্ষ ইউরোপে ভূমধ্যসাগরের পথে কোথাও অবতরণের চেষ্টা পেলে ইতালীর নৌবল তাতে বাধা দেবে। সেজন্যই উত্তর-আফ্রিকায় ইতালীর নৌকর্তৃপক্ষ শক্তিক্ষয়ে অগ্রসর হয়নি।

এই গেল ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় উভয় পক্ষের মুখ্য সুবিধা-অসুবিধা এবং সামরিক বলাবলের কথা। এবার তিউনিসিয়ায় মিত্রপক্ষের জয়ের ফলে সমগ্র ইউরোপীয় পরিস্থিতিতে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তা বিচার করে দেখা যাক। প্রথমেই বলা দরকার যে, উত্তর-আফ্রিকায় এক্সিস পক্ষের পরাজয় হওয়ায় ইউরোপের সমগ্র উপকূলভাগ আজ মিত্রপক্ষের অভিযানের পক্ষে উন্মুক্ত। বৃটিশ ও মার্কিন শক্তিকে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখবার জন্য ইউরোপের বাইরে হিটলার ও মুসোলিনীর আজ কোন রণাঙ্গন নেই। তার ফলে বৃটিশ ও মার্কিন শক্তির চাপ প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপের ওপর পড়েছে। মিত্রপক্ষ আপাতত দ্বিতীয় রণাঙ্গন না খুললেও এক্সিসপক্ষকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং সুদীর্ঘ উপকূলভাগে তাদের বিস্তর সেনা মোতায়েন না রাখলে চলবে না। তাতে সোভিয়েট রণাঙ্গনে এক্সিসপক্ষের চাপ খানিকটা কমতে বাধ্য। মোট কথা বৃটিশ ও মার্কিন শক্তি আশু ইউরোপ অভিযান না করলেও এতদিন ইউরোপে দু'রণাঙ্গন এড়াবার জন্য হিটলার যে চেষ্টা করে এসেছেন, এবার তা ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে এবার যে চাপ পড়েছে তাকে তাঁর অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। এই অবস্থা যে একদিন আসতে পারে হিটলার হয়ত তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যই পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর বলকানে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে তাড়াতাড়ি তিনি চেয়েছিলেন সোভিয়েট শক্তিকে পদদলিত করতে, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। সোভিয়েট রণাঙ্গনে হিটলারের 'টাইম টেবল' ব্যর্থ হয়েছে এবং সেখানে যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ায় বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিসঞ্চয়ে সময় ও সুবিধা পেয়েছে। তিউনিসিয়ায় মিত্রপক্ষকে এই বিজয়লাভে সুবিধা দিয়েছে সোভিয়েট শক্তি। এক্সিস বাহিনীর আক্রমণে সোভিয়েট ভূমির লালফৌজ ভেঙ্গে পড়লে মিত্রপক্ষ উত্তর-আফ্রিকায় এই বিজয়লাভের সুযোগ পেত কিনা বলা যায় না। লালফৌজের অতুলনীয় প্রতিরোধ-শক্তি ছিল বলেই উত্তর-আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের বিজয়লাভ সুগম হয়েছে।

এ গেল সামরিক দিক। এবার রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে সর্বাগ্রে একথা নিশ্চয়ই বলতে হয় যে, উত্তর-আফ্রিকায় শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ইতালীর ফাসিস্ত সৈন্যদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। কেবল ইতালীরই-বা কেন, ফাসিস্তপন্থী সমস্ত দেশেই এর প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। ফাসিস্তবাদের জন্ম ইতালীতে। অতএব সেই ইতালীর পরাজয়ে অন্যান্য দেশের ফাসিস্তদের মনে এই প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে, ফাসিস্তবাদের ভিত্তিতে কোন জাতির শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব কিনা ? এই প্রশ্নই আজ সমগ্র ফাসিস্ত শক্তিকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন যখনই জাগে—মানুষের মন তখনই তার সমাধান চায়। যুদ্ধকাতর সমগ্র ইউরোপ যখন এই সমাধানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে—তখন তাকে সমাধানের পথ দেখাবে কে—এ নিয়েই বাধবে দ্বন্দ্ব। সেই দারুণ কূটনৈতিক খেলার পূর্বাভাষ যেন এখনই পাওয়া যাচ্ছে। জিরো-দ্য-গল সমস্যাটা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে—যাহাতে দেখে মনে হয়—একজন আর একজনের সঙ্গে মিলনের আশায় হাত বাড়িয়ে আছেন, কিন্তু কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে কেউ কাকে স্পর্শ করতে পারছে না! তারপর লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্নমেণ্ট জার্মান প্রচারের ওপর নির্ভর করে সম্প্রতি "স্মোলেনস্কের কবরখানা" নিয়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে বিসদৃশ আচরণ করেছেন এবং এই যুদ্ধের সময় পরম শক্তিশালী মিত্ররাষ্ট্র সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে যেভাবে তাঁরা প্রশ্রয় পেয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। বৃটিশ ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে ব্যাপারটা অতদূর গড়াতে দিলেন কি করে বোঝা দায়। সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। স্বদেশ হতে বিতাড়িত যে-সব লোক নিয়ে লণ্ডনে এখন বিভিন্ন দেশের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তাঁদের অনেকে যে প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বদেশে তাঁরা যে জনপ্রিয় ছিলেন না তার প্রমাণ সাম্প্রতিক

ইতিহাসে যথেষ্টই রয়েছে। লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্নমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী সিকোরস্কির আত্মম্ভরিতা ও সোভিয়েট বিদ্বেষ এই যুদ্ধের আগেও বহুক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। অথচ এইসব লোককেই লণ্ডনে গদি দেওয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়; সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বারংবার হের হেসের বিচার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে বৃটিশ শাসক মহল থেকে এ পর্যন্ত তেমন কোন উচ্চবাচ্য হয়নি। হের হেসের বিচারকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়াও এক রহস্যজনক ব্যাপার।

এইসব দৃষ্টে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, উত্তর-আফ্রিকায় বিজয়লাভের পর বৃটিশ ও মার্কিন শক্তি কি অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলবে—না সোভিয়েট রণাঙ্গনে এক্সিস বাহিনীর আর একবার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তারা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করবে? সেই ভাগ্য-পরীক্ষায় যদি লালফৌজ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয় তবে বৃটিশ ও মার্কিন শক্তি তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে পশ্চিম কিংবা দক্ষিণ দিক থেকে এক্সিস পক্ষকে চাপ দেবার চেষ্টা করবে। আর সোভিয়েট রণাঙ্গনে এক্সিস বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে বৃটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ হয়ত চেষ্টা করবে পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদের স্ব স্ব দেশে পাঠিয়ে সেখানে আবার পুঁজিবাদসমর্থক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করতে। সোভিয়েট আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেসব দেশের জনসাধারণ যদি এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নণ্টেকে স্বীকার করতে না চায়, তবে বৃটিশ ও মার্কিন তরফ থেকে চাপ পড়া কিছু অসম্ভব নয় এবং তা গিয়ে সামরিক চাপে দাঁড়ালে আবার সেই সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে পুরাতন "ইণ্টারভেন্সন" নীতিই ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করবে। একমাত্র বৃটিশ ও মার্কিন জনসাধারণের চাপেই এই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তিরোহিত হতে পারে।

অতএব ঘটনা পারম্পর্য বিচার করে আপাতত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, টিউনিসিয়ায় মিত্রপক্ষ বিজয়লাভ করায় ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পথ প্রশস্ত হয়েছে বলেই অচিরে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে এই জয়লাভের ফলে তারা "Strategic position" অর্থাৎ অভিযান চালাবার মত অনুকূল পথ যে পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

[২০-৫-৪৩]

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত

(৪৩৮ পৃষ্ঠার পর)

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়;
বিষাদ-আঁধার ঘেরেছে এখন।
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

* * *

আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত-কানন,
চন্দ্রসূর্য হোক্ মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

[প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৫]

হিন্দুমেলা আমাদের বাঙলা দেশে জাতীয় সংগীত প্রচারকল্পে যে নবীন প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল—আমরা এখানে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

সপ্তম স্বর্গ

(৪৪৫ পৃষ্ঠার পর)

কুটীরের সামনে অনেক গাছ, বসন্তের সময়ে পাখীরা আসে তাতে, আবার শীত পড়বার সংগে সংগেই চলে যায়।

আমার দেহটাকে নিয়ে একাই আমি এখানে আছি। চুল আর নোখগুলি বেড়ে চলেছে, কারণ সচেতন পদার্থ এমনিভাবেই বাড়ে, অর্থহীন, চমকপ্রদ ও বীভৎস নিয়মে। আমার হৃদয় এখনও দ্রুত ও অসমভাবে স্পন্দিত হয়। আমি এই স্পন্দন শুনি আর ভাবি আমার সঙ্গীদের কথা যাদের হৃদয় অন্য কোথাও স্পন্দিত হচ্চে, যেন কিছুই ঘটেনি।

কখনো কখনো নীচের গ্রাম থেকে লোক আসে, সংগে আনে আমার জন্য ফল, দুধ, তরিতরকারী আর দু'একটা রুটি। বিকেলে ঘণ্টা খানেকের জন্য ওরা আমার কাছে থাকে, কথাবার্তা বলে—সরল, সুন্দর ওদের কথাগুলি। তারপরে বিস্তীর্ণ জলরাশির পরে সূর্যাস্তের সংগে ওরা-ও বিদায় নেয়।

গতকাল এক কৃষক যুবতী এসেছিল। পাহাড়ের কোলে যখন সন্ধ্যা নামলো তখন-ও সে গেল না। অন্ধকারের মধ্যে ও আমার পাশে বসে রইল, ওর হাত রইল আমার হাতের মুঠোয়। ওর পাহাড়ী জীবনের অনেক মজার ঘটনাই ও বললে। তারপর একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর অনেক দূর থেকে এরোপ্লেনের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। জল থেকে অনেক ঊর্ধে উড়ছিল এরোপ্লেনগুলি, মেয়েটি আমাকে জানালে—যুদ্ধ বেধেচে নীচের লোকদের মধ্যে।

কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক করেচি কিছু বুঝতে চেষ্টা করবো না। তাই আমি নিঃশব্দেই বসে রইলুম, ওর হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে। সমুদ্র থেকে একটা জোরালো বাতাস বইতে লাগলো, আর তার সংগে ভেসে এলো দ্রুতগামী কালো মেঘেরা। আমাদের মাথার ওপরে আকাশটা তখন শান্ত ও স্বচ্ছ!

সোভিয়েটরাষ্ট্রে প্রাচীনত্বের ধারা

শ্রীশত্রুঘ্ন রায়

ককেশাসে পর্বত শ্রেণীর অন্তরালে সান্ধ্যসূর্য অস্ত গেছে। পল্লীতে পল্লীতে ফিরে এসেছে কর্মক্লান্ত কৃষকেরা। পাইপ ধরিয়ে পুরুষেরা বসল মজলিস জমিয়ে। মেয়েরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে শুরু করল নৃত্যগীত। তাদের উচ্ছল আনন্দে দিনান্তের শ্রান্তির অবসাদ কোথায় মিলিয়ে গেল।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে গ্রাম্য কৃষ্টির এই ধারা এখনও চলেছে অপ্রতিহতবেগে। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দেশময় একটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেল, কিন্তু জনসঙ্গীতের প্রাচীন রূপ জাতীয় সম্পদেরই অঙ্গরূপে পরিগণিত হল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনুরূপ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। পুরাতন জীবন-পদ্ধতির ভগ্নস্তূপের ওপর নতুনত্বের ধ্বজা সগর্বে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর হয়েছে কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তিরোভাব। অথচ সকল দেশে কথ্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি এদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার রূপ গেছে বদলে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল অঞ্চল হয়ে উঠেছে শিল্পপ্রধান, কৃষকেরা হয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ, ককেশাসের পার্বত্য পল্লীদের মধ্যে এসেছে একটা বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন। যন্ত্রের কবাল কবলকে উপহাস করে চলেছে শুধু জনসঙ্গীতের ধারা। নতুন যুগের সঙ্গে প্রাচীন কৃষ্টির একমাত্র বন্ধন আজও সরস করে রেখেছে গ্রাম্য জীবনকে।

এই জনসঙ্গীত রাষ্ট্রের কাব্য জগতে একটা নির্দিষ্ট স্থান পেয়েছে। এই সঙ্গে পুনরায় দেখা দিয়েছে বীরত্ব কাহিনীর উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর জনসাধারণের মন নতুন সৃষ্টির আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করল। কবি ও লেখক সম্প্রদায় এই বিরাট পরিবর্তনের একটা সুসঙ্গত হিসাব-নিকাশ করবার আগেই জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও মানসিক বিকার মূর্ত হয়ে উঠল গ্রাম্য সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। দ্বিতীয়ত, এই বিপ্লবের ফলে জারদের অত্যাচার থেকে দেশের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়রা চিরতরে মুক্তি পেল। সোভিয়েট রাষ্ট্র বলতে একটা জাতি, তার ভাষা ও কৃষ্টি বোঝায় না। এর মধ্যে আছে ষোলটি স্বায়ত্তশাসনধর্মী সাধারণতন্ত্র। প্রত্যেকটির ভাষা স্বতন্ত্র, জাতীয় সত্ত্বা পৃথক। এদের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়দের জন্য স্বায়ত্তশাসিত এলাকা নির্দিষ্ট আছে। অখণ্ড জাতীয় সত্ত্বা রক্ষাকামী সব সম্প্রদায়কেই দেখাতে হবে ভাষা ও কৃষ্টির পার্থক্য। অন্যথায় স্বায়ত্তশাসনলাভ তাদের ভাগ্যে ঘটে না। বহু জাতির সমন্বয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত আদর্শ সংগঠিত হলেও এদের জীবনের লক্ষ্য এক, সমাজ দর্শনের প্রভাবও সর্বত্র একরূপ।

সোভিয়েট সম্বন্ধে এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, জনসাহিত্য বুঝতে হলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি তথ্য জানা দরকার।



উজবেক্ চাষী রমণীদের কনসার্ট

সমগ্র জাতির ভাবধারা এর মধ্যে নিহিত, আর দেশের সর্বত্র যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে তার ছায়াও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বীরত্ব গাথা, পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা, গ্রাম্য গীতি-নৃত্য, বিবাহ ও শোক-সঙ্গীত প্রভৃতি জনসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সত্য বটে কবিতার প্রাচীন ছন্দরূপ ও লিপিচাতুর্য রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের প্রতিভার নতুন পরিস্ফুরণ এর মধ্যে এনে দিয়েছে অভিনব প্রেরণা, একটা আশ্চর্য ভাবের সমৃদ্ধি।

উনিশশো আঠার থেকে একুশ সাল পর্যন্ত 'রেড আর্মি' ও গেরিলা যোদ্ধারা দেশের ধনিক সম্প্রদায় ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই মহান ঘটনা প্রধানত প্রভাব বিস্তার করেছে ছোট ছোট জনসঙ্গীতের মধ্যে। এ রকম গানের মধ্যে একটা এক ঘেয়ে সুর বারবার উচ্চারিত হয়। একে বলা হয় 'চস্তুস্কি।' এ সুর অনেকটা এক থোকা চাবির ঝঙ্কারের মত।

শ্বেত রক্ষী দলের ডেনিকিন, কোলচাক ও অন্যান্য নেতাদের শয়তানের প্রতিমূর্তি কল্পনা করে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনাকে সকলে বিদ্রূপ করে। জনসাধারণ যে তাদের নবার্জিত স্বাধীনতা হারাতে পারে একথা মনে হওয়াই তাদের কাছে আজ সবচেয়ে বিস্ময়কর। এই ছোট ছোট গানগুলি সাধারণত চার অংশে বিভক্ত। ঘরোয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এদের পুরাতন রূপ বজায় থাকল অনেকদিন ধরে।

তারপর নতুন ঘটনার সংমিশ্রণে এদের রূপ গেল বদলে। তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে। এই গানের মধ্যে সে আভাসও পাওয়া যায়। বহির্জগতের শত্রুতার প্রমাণ পাওয়া যায় গানের সঙ্গে জড়িত



মজুর রমণীদের গান

কয়েকজন বৈদেশিক রাষ্ট্র ধুরন্ধরের নামের মধ্যে। অবশ্য গানের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই, আছে শুধু হাস্যরসাত্মক বিদ্রূপের রেশ।

সে সময়কার জনসাহিত্যে লেনিনের নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। জনসাহিত্যে তাঁকে পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা থেকে মুক্তিদাতারূপে কল্পনা করেছে। তিনি শুধু এক দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের প্রপীড়িত মানবসমাজের জন্য মুক্তির বাণী বহন করে এনেছিলেন। শোলোকভ বর্তমান রাশিয়ার প্রতিভাশালী লেখক। তিনি তাঁর বই All Quiet flows the Don এ লিখেছেন,—সরল প্রকৃতি কসাকেরা লেনিনকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করত। কসাক সৈন্য দলে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গোলন্দাজ সেনা। জার্মানরা তাঁকে বন্দী করল, কিন্তু মুক্তি দিল। জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করতে তাঁর ক্ষমতার কথা তারা জানত। কাজেই লেনিন আবার দেশে ফিরে এলেন তাঁর মুক্তিমন্ত্র নিয়ে। সোভিয়েট মধ্য এশিয়া ও ককেশাসের অধিবাসীরা লেনিনের এই অসাধারণ ক্ষমতা তাদের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে নানা রঙে, নানা ছন্দে।

তুর্কমেনিয়ার স্থানীয় অধিবাসীদের বীরত্ব গাথাকে বলে 'বাখ্শী।' গানের মর্ম হচ্ছে, পৃথিবীর হিংসাপরায়ণ লোকদের ওপর বিরক্ত হয়ে আল্লা চেষ্টা করছিলেন একজন জ্ঞানী লোককে খুঁজে বের করতে। তাঁর কাজ হবে জগতের আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ করে তোলা। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বিফল হল। সমস্যার সমাধান অপূর্ণ রয়ে গেল। অবশেষে আল্লার কল্পিত কাজে হাত দিলেন এক ব্যক্তি। তাঁর প্রশস্ত কপাল পরিচয় দিল তাঁর জ্ঞানের। তিনি হচ্ছেন লেনিন। সাইবেরিয়ার উত্তরে ওস্টিয়াকিদের মধ্যে একটা গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। এতে বলা হচ্ছে,—একজন বৃদ্ধ ওস্টিয়াক তার ছেলেকে দলের নেতার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছে, যৌবনে লেনিনও সাধারণ একজন ওস্টিয়াকের মত জীবন যাপন করতেন। একবার ঝড়ের সময় সমুদ্রে তাঁর নৌকাডুবি হল। তাঁকে উদ্ধার করল এক দল লোক। তারা তাঁকে খাদ্য পানীয় দিয়ে সতেজ করে তুলল। তারপর তারা লেনিনকে ধরে বসল। এবার আপনার জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিতে হবে। লেনিন পিছপা নন। তিনি একাকী স্থানীয় শাসনকর্তার সমস্ত সৈন্যকে পরাজিত করলেন আর ধনী বণিকদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরীবদের দান করলেন। লেনিনের কর্তব্য শেষ হল। দুষ্ট লোকদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লোপ পেল। তখন সেই মহাত্মা অমর লোকে যাত্রা করলেন। আকাশে দেখা গেল একটা ঝকঝকে নতুন তারা উঠেছে। লেনিনের প্রদীপ্ত আত্মা যেন সস্নেহে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গান ও রূপকথার মধ্যে লেনিনের নাম অত্যাচারীদের হাত থেকে জনসাধারণের রক্ষাকর্তা হিসাবে অমর হয়ে আছে। জারের শাসন ও অন্যান্য পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্যোক্তারূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারীরূপে তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের



উজবেকের টুর্গেন বাভেবার প্রতিমূর্তি লইয়া খনি খননকারী মজুরদের উৎসব

সকল ভাষাতেই লোকসঙ্গীত রচনা করা হয়েছে। এসব গানকে বলা হয় 'প্ল্যাকি,'—জোরালো ভাষা ও ছন্দবৈচিত্র্যে এরা অতুলনীয়।

আর্কেঞ্জেল প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহে লেনিনের উদ্দেশ্যে রচিত শোক সঙ্গীতের মধ্যে রুশ দেশের

প্রাচীন ধারা রক্ষিত হয়েছে। মানুষের দুঃখে প্রকৃতিও সাড়া দিচ্ছে। ক্রিমিয়ার একজন তাতার কৃষক লেনিনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে যে শোকসংগীত রচনা করেছিল তার মধ্যেও সারা বিশ্বের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে।



মজুর রমণীরা ১লা মের উৎসবের জন্য মহড়া দিতেছে

লাল পতাকাবাহী ও শ্বেত রক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে চাপায়েভ নগরীকে নিয়ে একটা সুন্দর গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। এ গল্পের বাহ্যিক আবরণ প্রাচীন রাশিয়ার রূপকথার মত। আরম্ভ ও শেষে পুরাতনের বিশেষত্ব রক্ষিত হয়েছে। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মায়া-গন্ডীর উল্লেখও আছে। দুষ্ট লোকদের প্রভাব থেকে চাপায়েভকে রক্ষা করছে এই গন্ডী। কিন্তু কোলচাকের সৈন্যবাহিনীর সংগে প্রকৃত সংঘর্ষের বিবরণ বীরত্ব গাথার স্টাইলে বর্ণিত হয়েছে। রূপকথার নামগন্ধও এতে নেই। এ কাহিনীর ভিত্তি ইতিহাসের প্রকৃত রূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উনিশশো উনত্রিশ থেকে বত্রিশ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে বিরাট পরিবর্তন হল, তার ফলে গ্রাম্যজীবনের চেহারা একেবারে বদলে গেল। জনসাধারণের কল্পনা এই নতুন পরিবর্তনে সাড়া দিল। লোকসাহিত্য সকল প্রকারে সমৃদ্ধ হল। এবারে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন স্ট্যালিন। কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাষ্ট্রকে তিনি সুখের আগার করে তুলেছেন। এই সময়কার লোকসংগীতের মধ্যে আনন্দের সুর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে নিরাপত্তার বাণী। ভবিষ্যতের ওপর আস্থা, আর সমস্ত জাতির মঙ্গলের সংগে ব্যক্তিগত জীবনের অবিচ্ছিন্নতা।

'চস্তুস্ক' ও বিশেষ করে নৃত্য সম্বলিত ছোট ছোট গান নবকলেবরে দেখা দিল। গানের মর্ম হচ্ছে—পুরাতন লাঙ্গলের যুগ শেষ হয়ে দেখা দিল যন্ত্রচালিত লাঙ্গল ট্র্যাক্টরের রূপ ধরে; আর কৃষকজীবনে মেয়েদের স্থান নতুন করে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সময়ে ঘুম পাড়ানি গানের আকারে কয়েকটি নতুন ধরণের কবিতার আবির্ভাব হয়। মা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের পথ-নির্দেশ করে দিচ্ছেন গানের ভিতর দিয়ে। সোভিয়েট রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট অভিমত আমরা এর মধ্যেই প্রথম পাই। মার গানের মধ্যে ধনসম্পদ, ও স্যাঁকরা ডেকে মোহর কেটে অলঙ্কার গড়িয়ে দেওয়ার উল্লেখ নেই। আবেগপূর্ণ ছন্দে রচিত 'নুরী জীন্' শীর্ষক সংগীতে তুর্কমেনিয়ান জননী আশা করছেন যে, তাঁর ছেলে জ্ঞানী, শিক্ষিত ও চতুর হবে। 'সে হয়ত একদিন সমগ্র জাতির নেতার পদে সমাসীন হবে। 'মাই মেরেড' শীর্ষক আর একটা তুর্কমেনীয় সংগীতে মার মনে আশা আছে যে, তাঁর ছেলে হবে নির্ভীক, বন্ধুবৎসল, রাইফ্‌ল ব্যবহারে দক্ষ আর জনসাধারণের রক্ষাকর্তা।

সোভিয়েট পিতৃভূমির প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ দেখা দিয়েছে নতুন রূপে। সেই সংগে নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিও সঞ্চারিত হয়েছে সুগভীর প্রীতি। এই দুই-এর সংমিশ্রণে দেশপ্রেমের সূচনা হয়েছে। এই প্রেমের বিকাশ আমরা পাই ইউক্রেনে ও রাশিয়া সম্বন্ধে নানা প্রকার গীতি রচনার মধ্যে এবং বিশেষ করে রেড আর্মি বিষয়ক জনপ্রিয় সংগীতে।

একটা সুন্দর সাইবেরিয়ান রূপকথার জন্ম হয়েছে সোভিয়েট দেশপ্রেমের ওপর ভিত্তি করে। গল্পটির নাম,— How the Hunter Feodor has chased away the Japanese. গল্পের মধ্যে স্বয়ং প্রকৃতি বনানীও পশুজগতের রূপ ধরে ফিওডোরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। সাইবেরিয়ার এল্ক নামে বৃহদাকার হরিণ তাকে পিঠে বসিয়ে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে যাচ্ছে। এই রকম একটা গল্প সোভিয়েট ক্যারেলিয়ান ধীবরদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

গত কুড়ি বৎসর ধরে লোকসাহিত্যের এই ধারা জাতীয় ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এসেছে। তাই আজ আমরা বুঝতে পারছি সোভিয়েট রাষ্ট্রের কী সুদৃঢ় মননশক্তি জার্মানিকে প্রচণ্ডতম বাধা দিয়েছে। বীর সোভিয়েট জনগণের এই চরিত্রগত বিশেষত্বই রাষ্ট্রের লোকসাহিত্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বৃন্দাবন ও বাঙালী

বৃন্দাবনবাসী বাঙালীগণ, আপনারা আমার প্রণিপাত গ্রহণ করুন। কি দয়া আপনাদের, আমার জীবন আজ ধন্য হলো। এমন সৌভাগ্য আমার যে কোনদিন হবে, আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি। মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করবার শক্তি আমার নেই। এখানে এসে অবধি নানা ভাব মনে তোলপাড় করছে, তার উপর আপনাদের আত্মীয়তার এই প্রভাব আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে। কি বলব আমি বলুন। যে কৃপায় আমার মত লোক এই দিব্যধামে আসতে পেরেছে, সে কৃপা কি সোজা কৃপা? আমার পক্ষে এ যে বিস্ময়ের উপর পরম বিস্ময়। যে দিকে তাকাচ্ছি, কেবল বিস্মিত হচ্ছি। আমার এ চক্ষু জড় চক্ষু, এ চক্ষু চর্মচক্ষু। চর্মচক্ষুতে এ ধাম 'প্রপঞ্চের সম দৃষ্ট হয়', ইহা বুঝি, কিন্তু দৃষ্ট তো হয়েছে। প্রপঞ্চের সম দৃষ্ট হলেও তার ক্ষমতাই কি কম? যেভাবেই দেখি না কেন, চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন দেখতে যে পেয়েছি, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার এ জড় দেহেও শিহরণ উঠছে; স্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়ে বিচারবুদ্ধি এড়িয়ে ফেলছে। আপনাদের দুটো কথা বলব, এমন শক্তিও আমার নেই। আজ শুধু এই কথাই বলছি, এ প্রপঞ্চও সামান্য নয়। সিস্টার নিবেদিতার একটি কথা স্মরণ হচ্ছে। তাঁর জীবনকার লিখেছেন যে, গোপ জাতি দেখলেই তিনি শ্রদ্ধাভরে প্রণিপাত করতেন। একজন এতে লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা আমাদের আপনি এমনভাবে প্রণাম করছেন, এ কি, আমরা যে অতি তুচ্ছ গরীব লোক, দুধ বেচে খাই। এর উত্তরে ভক্তিমতী ভগিনী বলেছিলেন, না না, ও-কথা বলবেন না, আপনারা সামান্য নন। আপনাদেরই ঘরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আপনাদের দেখতে পাওয়া কি সোজা ভাগ্যের কথা! আজ এখানে এসে যা দেখছি, যাকে দেখছি, সেই ভাবই আমার মনেও জেগে উঠছে। বিষয়ী মন অবশ্য জড় বিচারকেই আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করছে; কিন্তু ষোলআনা সে উদ্যম তার পক্ষে সার্থক হচ্ছে না। তার উপর এক অপরূপ রূপের আলোক এসে পড়ে ঝলক তুলছে। জড় বিচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরোক্ষ, প্রত্যক্ষতায় সত্য হচ্ছে অন্য জিনিস। মনের উপর আরম্ভ হয়েছে অভাবনীয় এবং অচিন্ত্য এক প্রভাবের খেলা। একেই বলে বোধহয় যোগমায়া। কবি কর্ণপূর বলেছেন—'মহাপ্রভাবা খলু যোগিনী সা'। কালের প্রভাবে তাঁর যৌবন বিপর্যস্ত হয় না—"ন বয়ঃ তস্যাঃ অতি বিপ্রবায়।" এ রস উপলব্ধি করেই গোবিন্দ-মঙ্গলের কবি দুঃখী শ্যামদাস বলেছেন,—'বড়াইর বেশ কত কহিতে না পারি, পাকা চুলে রঙ্গ ফুলে বেঁধেছে কবরী।' মনের মূলে আনন্দময় পরিস্পন্দন তুলে পদার্থের এই অভিনবত্বের অভিব্যক্তি—তরুণ রসের এই তো রীতি। আমার ন্যায় চর্মচক্ষুসম্পন্ন লোকের চোখে বৃন্দাবন ধামের এমন তারুণ্য লাবণ্যকে যিনি ব্যক্ত করেছেন, আমি তাঁকে কোটি কোটি প্রণিপাত করি; প্রণিপাত করি সেই পরম দয়ালু মহাপ্রভুকে। তিনি নইলে এ কাজ আর কার দ্বারা সম্ভব হ'ত—মধুর বৃন্দাবন বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী সার, বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি শকতি আছিল কার—যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত? বৃন্দাবনের কুঞ্জকন্দরের যে মাধুরী গোপনে ছিল, তিনি তা ভুবনে নিয়ে এলেন, যে রস প্রপঞ্চাতীত ছিল, তা তিনি প্রপঞ্চে উচ্ছল করে দিলেন। বাঙলার প্রেমের ঠাকুরের সে দান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ভাসান দান, ডুবান দান। বিচ্ছিন্ন বাঙলার জীবনে তাঁর সেই বদান্যতায় ব্যাপ্তি-রসের বান উঠল, অল্প ভেঙ্গে গিয়ে আসল ভূমার উচ্ছ্বাস। বিশ্বের জীবনধারার সঙ্গে বাঙালীকে যুক্ত করে দিলেন তিনি। বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতেই জীবন, নইলে তো মৃত্যু।

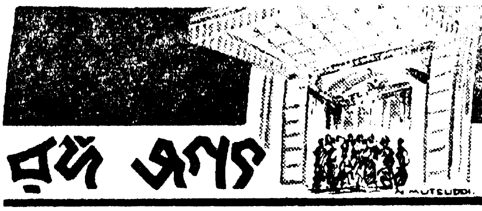
বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করার ভিতর দিয়ে মহাপ্রভু বাঙালীকে নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর এর ফলে বাঙলার ঘরে ঘরে জয় জয় ধ্বনি জেগে উঠল; বঙ্গবাণীর বীণার সপ্তছন্দে গান ছুটলো। বাঙালী পেলো তার অমর সাহিত্য। আজ মনে হচ্ছে সেই কথা। আজ ভাবছি, এই সেই বৃন্দাবন ভূমি, শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদগণের কৃপায় যে সাধনা এখানে চলেছিল, বাঙলার জাতীয় জীবনের মূলে রসায়নরূপে তাই তো কাজ করেছে এবং আজও করছে। আমরা এখন পাশ্চাত্যের সূত্র ছাড়া রাজনীতি বুঝি না, জাতীয়তাকে বুঝি তাদেরই ভাবে এবং তাদেরই ভাষা দিয়ে, কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে, বাঙলার মর্মমূলে তার সংস্কৃতিতে প্রাণধারা সঞ্চার করে জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বৃন্দাবনে তপস্যায় নিরত বৈষ্ণব প্রভুগণ। সে সাধনা কি সোজা ছিল, একবার ভেবে দেখুন তো এখন ছাপা বই হয়েছে, পুস্তকাগার হয়েছে, আর তখনকার সে দিনে দুর্গম ছিল যখন এ তীর্থ, সেখানে কি কঠোর তপস্যার জোরে তাঁরা অমূল্য গ্রন্থরাজী রচনা করেছেন। কি প্রাণপাতী সাধনা ছিল তাঁদের? ছয় গোস্বামীর কথা একবার স্মরণ করুন, কি অপূর্ব ত্যাগময় জীবন ছিল তাঁদের? আপনারা বলবেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাতীয়তার বোধ নিয়ে তাঁরা সাধনা করেন নি; তাঁরা তাঁদের ইষ্টের সেবা করছেন; কিন্তু ও একটা কেবল কথার কথা। তাঁদের সে ইষ্ট সেবায় আমি কি পেয়েছি, জাতি কি পেয়েছে, তাই দেখতে হবে, সমষ্টি কি পেয়েছে তারই হিসেব করতে হবে। জাতীয়তার দিক থেকে কথা চলে তাই। নইলে সাক্ষাৎ সম্পর্কে রাজনীতিকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করেও দেশ যদি কিছু না পায়, জাতির জনসাধারণ যদি কিছু না পায়, শুধু জনকতকের নেতাগিরির পসারই শুধু বাড়ে, কাজে তাকে জাতীয়তার সাধনা বললে ভুল হবে এবং হিসেবের বেলাতেও দেখা যাবে, কবিকঙ্কণেরই ভাষায়, সোণা রূপা নহে বাপু ও বেঙ্গা পিতল, ঘষিয়া মাজিয়া তুমি করেছ উজ্জ্বল। জাতীয়তার বাজারে তা চলবে না, জাতির দৈন্য তাতে ঘুচবে না। মহাপ্রভুর কৃপা রস-প্রস্ফুরিত বৃন্দাবনের বাণীর মাধুরীই বাঙালীকে দিয়েছিল সাহিত্য, দিয়েছিল সংস্কৃতি এবং একথাও সত্য যে, সাহিত্যই জাতির সবচেয়ে বড় সম্বল। বাঙালী জাতি বেঁচে আছে তার সাহিত্যেরই জোরে এবং সে সাহিত্যের প্রাণ মহাপ্রভুরই দান; এখনও সেই প্রাণধারাই বঙ্গসাহিত্যকে সমগ্র জাতির চিত্তের সঙ্গে যুক্ত রেখে তাকে সঞ্জীবিত রেখেছে; বিদেশীর পরগাছা সে ধারায় এসে পড়ছে বটে, কিন্তু টিকতে পারছে না, জন-চিত্তের সঙ্গে সংযোগের ব্যাপ্তি প্রয়োজন বঙ্গসাহিত্য-সাধনায় প্রেম-ধর্মের সে অবদানের আশ্রয়কেই অনিবার্য করে তুলছে। প্রাকৃতের সঙ্গে অপ্রাকৃতের মিলনের যে মনোভূমি, সেই ভূমি থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টিরসের উদ্ভব হয়। মহাপ্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনকে আশ্রয় করে বাঙলার সাধক এই মনোভূমিতে অধিরূঢ় হয়েছিলেন, পেয়েছিলেন ভাবের দৃষ্টি—মধুরের সঙ্গে চিত্তের সংযোগ; সুতরাং এ-ভূমি শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার ভূমিই নয়, জাতীয়তার সাধনারও এ তীর্থস্থল। এ-ভূমির সঙ্গে বাঙলার প্রাণের নাড়ির যোগ রয়েছে—বৃহতের সঙ্গে বাইরের সঙ্গে, সমগ্র ভারতের সঙ্গে, সমগ্র জগতের সঙ্গে বাঙালীর চিত্ত রসে উচ্ছ্বসিত হয়ে এই বৃন্দাবন সাধনার ভিত্তিতে যুক্ত হয়ে মানবতার মহিমায় সার্থকতা লাভ করেছে। বাঙালীর সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শের মূল খুঁজতে গেলে মহাপ্রভুর জীবনের পরম সত্যটি উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। সেখান থেকে ধরা পড়বে সাহিত্যের সত্যকার ধারা,—চিত্ত চমৎকারকারী অদ্ভুত নির্মাণ ক্ষমতা যে

প্রতিভাকে আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের প্রাণধর্ম বলে অভিহিত করেছেন, সে প্রতিভার মূলে রয়েছে মহাপ্রভুর কৃপায় উন্মুক্ত বৃন্দাবনধামেরই অপাবৃত মাধুরী। আপনারা বৃন্দাবনবাসী, আপনারা ভুলবেন না আপনাদের দায়িত্বের কথা। আমরা অনেক আশা এবং ভরসা নিয়ে আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছি। স্মরণ রাখিবেন, ষড় গোস্বামীগণের উত্তরাধিকারী আপনারাই। বাঙলা মায়ের আদরের দুলাল, অকিঞ্চন বৈষ্ণবদের অঙ্গধূলি ব্রজের পুণ্যরজের সঙ্গে মিশে আপনাদেরই আশেপাশে ছড়ান রয়েছে। কাব্যময় তাঁদের জীবন, ছন্দোময় তাঁদের জীবন, তাঁরা বাঙালী জাতির অন্তরে প্রাণে রসের ছন্দ জাগাইয়াছেন; জাতির মধ্যে যাঁরা পতিত ছিল, অবজ্ঞাত ছিল, তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নর-নারায়ণকে। সমষ্টির সাধনাকে এ ভাবে সত্য করে জাতিকে তাঁরা দিয়েছেন পুষ্টি। তাঁদের সে দৃষ্টি আপনারা সত্য, নিত্য করে রাখুন; কারণ সে কাজে আপনাদের অনুভব পাবার পথ প্রশস্ত রয়েছে। বৈষ্ণবের পদরেণু ভূষণ করিয়া তনু যাহা হৈতে অনুভব হয়। আজ অভাব হয়েছে এই অনুভবের। আমরা বুঝি সবই, জানি অনেক কিছুই; কিন্তু অনুভবের অভাবে কিছুই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠে না। জাতির সত্যকে নিয়ে জাতির শক্তি, এ আমাদের কারো জানতে বাকী নাই। দেশপ্রেমিকদের মুখস্থ বলে আমরা হামেসাই আওড়িয়ে নিজেদের রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকি; কিন্তু কাজের বেলায় আমাদের সব যায় গুলিয়ে। তখন আমরা ধরি অন্য মূর্তি। কারণ সকলকে ভালবাসতে হয় বললেই সকলকে ভালবাসা যায় না। যে বৃত্তি নিয়ে ভালবাসতে হয়, সেই বৃত্তি ভিতরে জাগিয়ে তুলতে হয়। এ বৃত্তি ভিতরে জাগলে ভালবাসা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে পড়ে, বিচারগত সংশয়ের ব্যবধান আর সে ক্ষেত্রে থাকে না অর্থাৎ বিচার করে ভালবাসতে হয় না; তখন ভালবাসা হলো সত্যকার বস্তু; যাকে ভালবাসলো তার মধ্যে নূতন নূতন মাধুরী ফুটে উঠে, বিচারের প্রয়োজনকে পরোক্ষ করে ফেলে, অনির্বচনীয় এই যে আস্বাদন, একে বলে অনুভব; এ দেশের সাধকেরা বলেছেন, এই অনুভব না জাগলে অর্থসম্বন্ধ সত্য হয় না। যিনি এক হয়ে প্রতি রূপে রূপে রয়েছেন, তিনি প্রচ্ছন্ন থেকে যান। অনুভবই তাঁকে একান্ত করে সর্বত্র তাঁকেই রসময় এবং লীলাময়রূপে দেখায়। সত্য প্রত্যক্ষ যদি না হলো, তবে সাধন কি হলো? উড়ো খই গোবিন্দায় নমো, এতে জীবনের কোন অভাবই মিটে না; কোন অর্থই সিদ্ধ হয় না। প্রেমই অর্থ; অন্য কিছু নয়। জানি, আপনারা যাঁহারা বৃন্দাবনবাসী বাঙালী, তাঁরা অনেকেই অকিঞ্চন, অর্থসামর্থ্য আপনাদের নাই; পরমার্থের পিপাসাই আপনাদের মধ্যে প্রবল, তবু আমার মত বিষয়ার্থীর আজ আনন্দ হচ্ছে আপনাদের দেখে। আজ এই দেখে আনন্দ হচ্ছে যে, আপনারা পরমার্থের অর্থ ঠিকমত বুঝেছেন; বুঝেছেন প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে। আপনারা উপলব্ধি করেছেন এই সত্যকে যে, পরমার্থের অর্থটি জগৎ ছাড়া নয়, এ জগতের মধ্যে সে অর্থটি নিহিত রয়েছে এবং জগতের ভিতর দিয়েই সে অর্থটিকে ধরতে হবে। এখানেই সেবার ছন্দ আশ্রয় করে জীবনকে স্বচ্ছন্দ করতে হবে। প্রাকৃতের ভিতরে জাগিয়ে তুলতে হবে অপ্রাকৃত রস—প্রাকৃত বলে, প্রপঞ্চ বলে সূক্ষ্ম দার্শনিকতার জোরে একে উড়িয়ে দিলে চলবে না। অকিঞ্চন আপনারা, কিন্তু আপনাদের কাজে পরম পুরুষার্থ এই যে প্রেম, এর জন্য আপনাদের আন্তরিক আকিঞ্চনের পরিচয় পাচ্ছি। আপনারা অনেক অসুবিধার মধ্যেও এখানে কয়েকটি পাঠাগার গড়ে তুলে বাঙলার সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন, জাতীয় সাহিত্যের সেবা করছেন। এ-তো মহাপ্রভুরই সেবা—বাঙলার সাহিত্য, বাঙলার সংস্কৃতি সবই তো মহাপ্রভুকে নিয়ে; বাঙলার সংস্কৃতি এবং বাঙলার সাহিত্যের সেবা করলে মহাপ্রভুরই সেবা করা হয়, ষড় গোস্বামীরই সেবা করা হয় এই পথে। বাঙলা দেশে এমন ধনশালী অনেকে আছেন, যাঁরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপরায়ণ, গোস্বামীপাদগণের অনুগত, আপনাদের এই সেবাব্রতে সাহায্য করে তাঁরা সৌভাগ্যশালী হতে পারেন। আমি এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর সদস্যগণ আমার মত অযোগ্য একজনকে ডেকে নিয়ে এসে যে আত্মীয়তা দেখালেন, সেজন্য আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রীগোপাল লাইব্রেরীর কথাও জীবনে আমি ভুলতে পারব না। ভালবাসা কি সহজে পাওয়া যায়; আর আমার মত লোককে যাঁরা ভালবেসেছেন এমন করে, তাঁদের কি ভোলা যায়? আপনাদের এখানে হিন্দী গ্রন্থ, হিন্দী সংবাদপত্রও আছে, খুবই ভালো কথা। বাঙালীর বিরোধ নেই কারো সঙ্গে; হিন্দী ভাষার সঙ্গেও তার বিরোধ নেই। সে সকলের সঙ্গে মিলনই কামনা করে। যাঁরা হিন্দী ভাষাভাষী, তাঁদের কাছে আমার এই নিবেদন যে, বাঙলা ভাষার চর্চায় তাঁদের উপকারই হবে। তাঁদের ভাষার শ্রীই বৃদ্ধি পাবে, যদি তাঁরা বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগী হন। দুঃখ হয় যেখানে দেখি, এ সত্যটি না বুঝতে পেরে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাকে বড় করে দেখা হচ্ছে এবং বাঙলা ভাষাকে চেপে দেবার চেষ্টা চলছে। এতে সমগ্র জাতির পক্ষেই অনিষ্ট হবে। এদের এমন প্রতিরোধে বাঙলা ভাষার মর্যাদার কিছু হানি ঘটবে না, অধিকন্তু তাঁদের নিজেদের ভাষারও মহিমা বৃদ্ধি পাবে না; কারণ ভাষাকে কেউ জোর-জবরদস্তির দ্বারা বাড়াতে পারে না; প্রত্যেক ভাষাই বাড়ে তার অন্তর্নিহিত সম্পদে। যে ভাষায় যত বড় বড় মনীষীর অবদান থাকে, সে ভাষা তত বড় হয়। বাঙলা ভাষা বর্তমানে সমগ্র ভারতে যে মর্যাদাময় আসন অধিকার করেছে, সেও বাঙলার মনীষিবর্গের অবদানে। সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের কোন ভাষাই বাঙলা ভাষার মত এক্ষেত্রে সৌভাগ্যশালী নয়। এক রবীন্দ্রনাথের যে অবদান, তারই কি পরিমাণ হয়? জগতের কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এমন অদ্ভুতকর্মা প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে বলে জানা যায় না,—একা যিনি তাঁর মাতৃভাষাকে এত দিয়েছেন। আজ প্রাদেশিকতার মোহে যাঁরা বাঙলা ভাষা থেকে এই সম্পদ আহরণে বঞ্চিত হবেন, তাঁদের কাজে তাঁদের নিজেদের মাতৃভাষারই অনিষ্ট ঘটবে, অর্থাৎ তাঁরা যা চান, তার পক্ষেই করা হবে কাজে প্রতিকূলতা। বৃন্দাবনে এটি না হয়—সুখেরই কথা। পারস্পরিক আদানপ্রদানের পথে আপনাদের মৈত্রী সুদৃঢ় থাকে, ইহাই তো প্রয়োজন; আর মহাপ্রভুর পথই এই;—বাঙলা সাহিত্যের ভিতর তিনি যে প্রাণরস সঞ্চার করেছেন, সে বস্তুর সার্থকতাও নির্ভর করছে এই দিক দিয়ে। বাঙলার জাতীয়তার বিশিষ্ট বাণীই হলো সমগ্র ভারতের চিত্তের সঙ্গে সংযোগ রেখে জাতিকে জাগিয়ে তোলা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে উঠছে, তা এই যে, এই বৃন্দাবনের মোট অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ বাঙালী, অথচ এখানকার বিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নেই; এ বড়ই দুঃখের কথা। মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে ছাড়া শিক্ষা কোনদিন সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিশেষভাবে যাঁরা বাঙালীর ছেলেমেয়ে—শিশু বয়সে অন্য ভাষার চাপ তাদের মনের উপর এসে পড়লে তাদের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ রুদ্ধ হয়ে পড়বে, এ স্বাভাবিক। এ ব্যবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার এবং এজন্য আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। যাঁরা হিন্দী-ভাষাভাষী, তাঁরাও এ বিষয়ে বাঙালীদের সাহায্য করবেন, ইহাই আমার অনুরোধ। উপসংহারে আমি পুনরায় আপনাদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। আপনারা বৃন্দাবন ধামে অনেক অসুবিধার মধ্যেও বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা সাহিত্যের যেভাবে সেবা করছেন, সেজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ; আপনাদের এ সাধনা যাতে সার্থকতা লাভ করে, আমি আশা করি, সেদিকে সমগ্র বাঙালী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকবে। *

---

* বৃন্দাবনে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।



নিউ এম্পায়ারে নৃত্যগীতানুষ্ঠান

গত ২৬শে মে, বুধবার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী তিমিরবরণের নবগঠিত নৃত্যগীতাদি চর্চার প্রতিষ্ঠান স্কুল অব রিদ্‌মিক্‌সের সাহায্যকল্পে যে বিচিত্র নৃত্যগীতানুষ্ঠান হয়েছিল, দেশবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় সেটি সব দিক দিয়েই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। যদি বলা যায় যে, তিমিরবরণ পরিচালিত এই বিচিত্র অনুষ্ঠানটি অনেক দিক থেকে ভারতীয় কলাজগতে অভিনবত্বের দাবী করতে পারে, তা হলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। অর্কেস্ট্রা সংগীতের সাহায্যে তিমিরবরণের সুযোগ্য যন্ত্রীদল সেদিন নিউ এম্পায়ারে যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনকার অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগ দেন নি, তাঁদের পক্ষে তার রূপ কল্পনা করা কঠিন। ভারতীয় সংগীতের প্রচলিত অপ্রচলিত অনেক রাগ-রাগিনী সেদিন তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রার সাহায্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল বলা চলে। ইতিপূর্বে ভারতের আর কোথাও কোন সুরশিল্পী অর্কেস্ট্রা সংগীতকে এতটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন কিনা আমরা জানি না। এ পর্যন্ত আবহ সংগীতরূপে ব্যবহৃত অর্কেস্ট্রা সংগীতকে স্বতন্ত্র সুর সৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া একমাত্র তিমিরবরণের মত সার্থক সুরস্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব—সেদিনের অনুষ্ঠানে সুরের ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ হয়ে বার বার এই কথাই শুধু মনে হচ্ছিল। এই অনুষ্ঠানে দেখা গেল যে, তিমিরবরণ আরেকটি নতুন পরীক্ষায় কৃতকার্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই সর্বপ্রথম তিনি রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার সহযোগিতার পরীক্ষা করেছেন; তাঁর এ গবেষণামূলক পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, অর্কেস্ট্রা সুপরিচালিত হলে রবীন্দ্র সংগীতের মাধুর্য ত ক্ষুণ্ণ করেই না—বরং তার অন্তর্নিহিত ভাব ও সুরের খেলাকে ফুটিয়ে তুলতে অনেক সাহায্য করে। এই দিনের অনুষ্ঠানে সুরশিল্পী তিমিরবরণ স্বয়ং অনুপস্থিত; এতে তাঁর অনেক গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ত নিরাশ হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের চার পাঁচ দিন পূর্বে তিমিরবরণ হঠাৎ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন; বর্তমানে তিনি অবশ্য বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন। কিন্তু রোগ-দুর্বল শরীরে সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। ব্যক্তিগত দিক থেকে তাঁর অনুপস্থিতি নিরাশার সঞ্চার করলেও, সেদিনের অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গহানি হয় নি। সেদিনকার অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিষয়ে তাঁর সুযোগ্য ও সুনিপুণ শিক্ষকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। রোগাক্রান্ত হবার পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি স্বয়ং মহড়ায় উপস্থিত থেকে প্রতিটি বিষয়ে যথাযোগ্য শিক্ষাবিধান করেছিলেন।

নিউ এম্পায়ারের প্রশস্ত রঙ্গমঞ্চে সেদিন যে মঞ্চ-সজ্জা করা হয়েছিল তার অভিনবত্বও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পটভূমিকায় কোনরূপ জটিল সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস করা হয় নি দেখে আমরা সন্তুষ্টই হয়েছিলাম। সহজ সরলভাবে নৃত্য ও গানের অভিব্যক্তিমূলক সুদৃশ্য ছবির দ্বারা পটভূমিকা এমন সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল যে তার সাহায্যে একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। পাদপ্রদীপের আলোকসজ্জা ও মঞ্চে নৃত্যোপযোগী আলোক প্রক্ষেপও প্রশংসার দাবী করতে পারে।

তিমিরবরণের ভারতীয় অর্কেস্ট্রা সংগীতকে সেদিন যাঁরা কণ্ঠসংগীত ও নৃত্যের সাহায্যে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও মূর্ত করে তুলেছিলেন, তাঁরা সবাই ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই কলাক্ষেত্রে নতুন। কিন্তু বিস্মিত হলাম এঁদের কলাকৌশল দেখে। এঁদের মধ্যে এমন দুই-চারজনের সন্ধান পাওয়া গেল, যাঁহাদের কৃতিত্ব অনেক তথা-প্রসিদ্ধ বড় নৃত্যশিল্পীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় সরস্বতী দেবী নাম্নী মাদ্রাজী মেয়েটির। এঁর দেহ সৌষ্ঠব ও অঙ্গভঙ্গি এত ভাল যে, মনে হয় এককালে ইনি বড় নৃত্যশিল্পী হবেন। ইনি এক সময়ে উদয়শঙ্করের দলে ছিলেন; কলকাতায় তাঁর এই প্রথম মঞ্চাবতরণ। অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে কুমারী গায়ত্রী রায়, জ্যোতিকণা রায়, ও সীতা গুহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্কেস্ট্রা-সংগীতের মধ্যে 'লুপ্তোদ্ধার', 'ব্ল্যাক-আউট্' ও 'অপরিচিতা' আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। সরস্বতী দেবীর একক নৃত্য 'আশাবরী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ললিতা গৌরী' নামক নৃত্যে গায়ত্রী দেবী অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গায়ত্রী দেবীর লীলা-চঞ্চল দেহভঙ্গিমা ও আঙ্গিক সুষমা তাঁর নৃত্যজীবনের বড় সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশে'র কেন্দ্রিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত 'লেজী আইল্যান্ড্' নামক নৃত্য-পরিকল্পনাটি হয়েছিল অপূর্ব। তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা যেমন মধুর আবেশের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি কুমারী গায়ত্রী রায়, জ্যোতিকণা রায় ও যাভা দ্বীপবাসী নর্তক সোয়েকরোর নৃত্যপরিকল্পনাও হয়েছিল চমৎকার। 'লেজী আইল্যান্ডে' কুমারী ইন্দ্রাণী রায়ের একক কণ্ঠ-সংগীতটিও উপভোগ্য হয়েছিল।

কণ্ঠ-সংগীত ও অর্কেস্ট্রা-সংগীত সঞ্জীবিত রবীন্দ্রনাথের ষড় ঋতুর পরিকল্পনাকে 'ঋতু-রঙ্গ' নামক অনুষ্ঠানে ধীর নম্র অথচ ভাব-ব্যঞ্জনাপূর্ণ নৃত্যে প্রাণবান করে তুলিছিলেন কুমারী গায়ত্রী রায়, জ্যোতিকণা রায় প্রভৃতি। কালবৈশাখী নৃত্যটি যাভা দ্বীপবাসী নৃত্যবিশারদ সোয়েকরোর নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিতে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে সৃষ্ট 'ক্ষুধিত পাষাণ' নামক নৃত্য-নাট্যটির কথা। এই নৃত্য-নাট্যটির পরিকল্পনায় তিমিরবরণ তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা-লব্ধ সুরশিল্পের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাষার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে যে কাহিনী রচনা করেছিলেন, সুরের ইন্দ্রজালে তার নতুন রূপদান করেছেন তিমিরবরণ। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র নৃত্যাংশে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বুলবুল চৌধুরী, কৃতদাসীর ভূমিকায় সরস্বতী দেবী ও আরব্যোপন্যাসের নায়িকার ভূমিকায় সীতা গুহ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন নৃত্যে শিউলী বাগচী, গৌরী, হেনা মুখোপাধ্যায়, বীণা গুপ্ত, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, নরনারায়ণ প্রভৃতিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কণ্ঠসংগীত—প্রধানত রবীন্দ্র-সংগীত—এই দিনের অনুষ্ঠানের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কণ্ঠ-সংগীতে যাঁরা আমাদের তৃপ্তি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গীতশ্রী ঈভা দত্ত, বেলা মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি দাস, কল্যাণী গুহ, আভা মুখোপাধ্যায়, শীতল ঘোষ, ভক্তিময় দাশগুপ্ত, অপূর্ব মৈত্র, আব্দুল আহাদ্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় বহুদিন এরূপ একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর নৃত্য-গীতের বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখেছি কি না সন্দেহ।

প্রধানত যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিমিরবরণের এই বিচিত্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ ও গীতশ্রী ঈভা দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।



খেলা-ধূলা

বেংগল বক্সিং এসোসিয়েশেন

বাঙলাদেশে বাঙালী ব্যায়ামোৎসাহীগণের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়টি যাহাতে প্রসার লাভ করে এই উদ্দেশ্য লইয়া সম্প্রতি "বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতি বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠন করা হইয়াছে। নিম্নে নির্বাচিত কমিটির সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি এ এন সেন; সহ-সভাপতিগণ—শ্রীযুত এস কে ঘোষ, শ্রীযুত রণজিৎ গুপ্ত, শ্রীযুত এ কে সেন, ডাঃ এস কে গুপ্ত, শ্রীযুত এইচ এন সরকার ও শ্রীযুত এস এম ইয়াকুব; সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুত ডি আর দাস; যুগ্ম সম্পাদকগণ—শ্রীযুত বিভূতি চ্যাটার্জি, শ্রীযুত যতীন রায় ও শ্রীযুত সন্তোষকুমার দে; কোষাধ্যক্ষ—মেজর এ কে মল্লিক; সভ্যগণ—শ্রীযুত বি ডি চ্যাটার্জি, শ্রীযুত এস মুখার্জি, শ্রীযুত বি এন রায়, শ্রীযুত জে কে শীল, শ্রীযুত ব্রজরঞ্জন রায়, শ্রীযুত এন আর মুখার্জি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত এইচ কে মুখার্জি, শ্রীযুত আবু ইউসুফ ও শ্রীযুত কে কে ঘোষ।

এই এসোসিয়েশন বর্তমানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিবেনঃ—(১) বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা (২) মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা সম্পর্কে সহজ উপায় নির্ধারণ করা এবং উহা প্রচার করা (৩) বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, (৪) সামরিক অথবা বাঙলার বাহিরের মুষ্টিযোদ্ধাগণের সহিত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা, (৫) পৃথিবীর বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধাগণের জীবনী ও শিক্ষার প্রণালী সম্পর্কে পুস্তিকা রচনা করা, (৬) বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের শাখা গঠন করা ইত্যাদি। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের বাঙলাদেশে প্রয়োজন ছিল। পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণের নাম দেখিয়া আশা হয় বাঙলার অভাব এইবার পূরণ হইবে। তবে এই জন্য উক্ত পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণকে এখন হইতেই বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্বে একটি গঠিত হইয়াছিল

১৯২৯ সালে বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের গঠনকার্য শ্রীযুত পি এল রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়। ঐ এসোসিয়েশন একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ঐ প্রতিযোগিতা গ্লোব রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ হয়ঃ

হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানঃ—শ্রীযুত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়,
লাইট হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানঃ—শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র,
ফেদার ওয়েট চ্যাম্পিয়ানঃ—শ্রীযুত বিভূতি চ্যাটার্জি,
ব্যান্টম ওয়েট চ্যাম্পিয়ানঃ—শ্রীযুত কার্তিকচন্দ্র দত্ত,
ফ্লাই ওয়েট চ্যাম্পিয়ানঃ—শ্রীযুত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য।

প্রতি বৎসর এইরূপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া পরিচালকমণ্ডলী স্থির করেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় না। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেওয়ায় পরিচালকমণ্ডলী ভাঙিয়া যায়। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়। তবে সেই সময় ব্যায়াম উৎসাহী বাঙালীগণ মুষ্টিযুদ্ধ সম্পর্কে যে প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন না। ৪।৫ বৎসর মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়টি সাধারণের দৃষ্টিগোচরের বাহিরে চলিয়া গেলেও ইণ্ডিয়ান এ্যাথলেটিক ক্যাম্প, স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার প্রভৃতি ব্যায়ামাগারে নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারের পরিচালকগণ ইণ্টার স্কুল ও ইণ্টার কলেজ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া নূতন প্রেরণা দানের চেষ্টা করেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় কয়েক বৎসর মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়টি ছাত্রদের মধ্যে প্রসারলাভ করে। কি কারণে জানি না হঠাৎ স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারের এই ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা বন্ধ হইলে অনেকেই মনে করিতে থাকেন মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়টি বাঙলাদেশ হইতে লোপ পাইবে। কিন্তু ইহাদের ধারণা যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক তাহা নর্থ ক্যালকাটা বক্সিং এসোসিয়েশন এবং সাউথ ক্যালকাটা বক্সিং এসোসিয়েশনের গঠন হইতেই প্রমাণিত হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ একত্র হইয়া বাঙালী ও ইংল্যাণ্ড হইতে আগত সৈনিক মুষ্টিযোদ্ধাগণের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতায় বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ মাত্র এক পয়েণ্টে পরাজিত হন। এই পরাজয় বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি না করিয়া নূতন উৎসাহ দান করে এবং এই উৎসাহের ফলস্বরূপ "বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের" উৎপত্তি। এই এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে ভালই হইয়াছে। ১৯২৯ সালের ন্যায় দর্শন দিয়া লোপ না পাইলেই বিশেষ সুখী হইব।

ওয়াটারপোলো খেলা

ইতিপূর্বে আমরা বাঙলার ওয়াটারপোলো খেলা সম্পর্কে অনেক কিছুই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের সেই সময় ধারণা হইয়াছিল বেঙল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ গত বৎসরের ন্যায় ওয়াটার পোলো খেলোয়াড়দের হতাশ করিবেন। কিন্তু বর্তমানে যে সকল কথা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে হতাশ হইতে হইবে না। নবগঠিত বেংগল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যাহাতে কার্যকারী হয় তাহার জন্য বিভিন্ন সন্তরণ ক্লাবে নোটিশ জারী করিয়াছেন। বিভিন্ন ক্লাবের অভিমত জানিতে পারিলেই প্রতিযোগিতার তালিকা গঠিত হইবে। পরিচালকগণ আলাপ-আলোচনায় অধিক সময় নষ্ট না করিয়া প্রতিযোগিতা সত্বর আরম্ভ করিয়া দেন তবে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৮ই মে

গত রাত্রে বৃটিশ বোমারু বিমান বহরের আক্রমণের ফলে জার্মানির মোইনে ও এডার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই দুইটি বাঁধ ভাঙ্গার ফলে জার্মানির বহু শহর জলপ্লাবিত হইয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, কুবানে নভরোসিস্কের উত্তর-পূর্ব-দিকে রুশ বাহিনী জার্মানদের এক পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাঁহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার গিরিডিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

পলতা জলের কলের বয়লারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বিগড়াইয়া যাওয়ায় অদ্য প্রাতে ৮টার পর কলিকাতা শহরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়; ইহার ফলে নাগরিকদের দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

গতকল্য শেষরাত্রে জলেশ্বর স্টেশনে ডাউন হাওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সহিত একখানি গুড্‌স্ ট্রেনের সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ১৪ জন নিহত ও ৩৪ আহত হইয়াছে।

১৯শে মে

এলিউসিয়ানে মার্কিন বাহিনী সাঁড়াশী অভিযান চালাইয়া আতু দ্বীপে জাপ অবস্থান পরিবেষ্টন করিয়াছে।

আরাকান রণাঙ্গনে তউং বাজার এলাকায় বৃটিশ টহলদারী সৈন্য দলের সহিত প্রতিপক্ষের ৪২ জন সৈন্য লইয়া গঠিত একটি দলের সংঘর্ষ হয়। প্রতিপক্ষের ১৫ জন নিহত ও ২ জন বন্দী হয়।

২০শে মে

টোকিও রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, এলিউসিয়ানের আতু দ্বীপে জাপ সৈন্য দল হটিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলেন যে, ১৫ই মার্চ পর্যন্ত কংগ্রেসী আন্দোলনের অপরাধ সম্পর্কে ভারতবর্ষে মোট ৩৪,৮৯৫ জনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং ১১,৬২৩ জনকে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে। ১লা মার্চ তারিখে ২৩,০৭১ জন কারাগারে ছিল। অনির্দিষ্ট কাল আটক রাখা হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা ৮ হাজারের সামান্য কিছু বেশী।

২১শে মে

মার্কিন নৌ সচিব কর্নেল নক্স ঘোষণা করেন যে, আতু দ্বীপে জাপ নিধন পর্ব আরম্ভ হইয়াছে।

বিহার, উড়িষ্যা, বাঙলা এবং আসাম প্রদেশের সুরমা উপত্যকার ভিতরে খাদ্যশস্যের অবাধ চলাচল সম্পর্কে ভারত সরকার সম্প্রতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন, উড়িষ্যা ও আসাম সরকার তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমেরিকায় প্রবল বন্যায় প্রায় এক লক্ষ লোক গৃহহারা হইয়াছে।

২২শে মে

গতকল্য প্রাতঃকালে কক্সবাজারের নিকট ছয়খানি বৃটিশ বিমানের সহিত এক ঝাঁক জাপ বিমানের সংঘর্ষ হয়। বৃটিশ বিমান বহরের আক্রমণে একখানি শত্রু বিমান ধ্বংস হয় এবং অন্যান্য বিমান ঘায়েল হয়। বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় চারখানি শত্রু বিমান ঘায়েল হয়। এই দিন ফেণী অঞ্চলেও আকাশ যুদ্ধ হয়। জঙ্গী বিমানের পাহারায় অনুমান ২৪ খানি জাপ বোমারু ফেণী অঞ্চলে হানা দিবার চেষ্টা করে। বৃটিশ বিমান বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে জাপানীদের তিনখানি বোমারু বিমান ভূপাতিত, আরও তিনখানি বিমান ধ্বংস এবং ৭ খানি বিমান গুরুতররূপে ঘায়েল হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে রামরী দ্বীপের অদূরে ৬ খানি টহলদারী জাপ লঞ্চ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মস্কো রেডিওতে কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহক পরিষদের একটি অনুজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। এই অনুজ্ঞায় কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

২২শে মে

মিঃ অ্যালাবক্সের হত্যাকারীদের ধরাইয়া দিবার মত সংবাদ দিতে পারিলে সংবাদদাতাকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া সিন্ধুর পুলিশ ঘোষণা করিয়াছে।

সাংবাদিক শিরোমণি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অষ্ট-সপ্ততি বর্ষ বয়ক্রম পূর্ণ হওয়ায় অদ্য ভারতীয় সংবাদপত্র সেবীসঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

২৩শে মে

গতকল্য সকালে ১১খানি জঙ্গী বিমানের পাহারায় ২০খানি জাপ বোমারু বিমান চট্টগ্রাম বিমানক্ষেত্র আক্রমণ করে। একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আকাশ যুদ্ধ হয়। জাপানীদের ১৫ খানি বিমান ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বৃটিশ বিমান বহরের ২ খানি জঙ্গী বিমান খোয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে দুই কোম্পানী জার্মান পদাতিক সৈন্য ট্যাঙ্কের সাহায্যে রুশ ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু রুশপক্ষের কামানশ্রেণী হইতে গোলা বর্ষণে এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। লিসিচান্‌স্ক অঞ্চলে জার্মানদের পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

টোকিও হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, জাপানের সম্মিলিত নৌবহরের প্রধান সেনাপতি ইসোরোকু ইয়ামামোতো গত এপ্রিল মাসে নৌবাহিনী পরিচালনার সময় নিহত হন। এডমিরাল মিনেইচি কোগো তাঁহার স্থলে প্রধান নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

২১শে ও ২২শে মে বৃটিশ বিমানবহর সিসিলির উপর আক্রমণ চালায়।

বোম্বাইয়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অধিবেশনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ এস এ ডাঙ্গে বলেন যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালানই এক্ষণে পার্টির সর্বপ্রধান এবং প্রাথমিক কর্তব্য হইবে।

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত জয়াকর এবং আরও চারিজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য এক যুক্ত বিবৃতিতে এই দাবী করিয়াছেন যে, এক নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করা হউক, অথবা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করা হউক।

২৪শে মে

গত রাত্রে বৃটিশ বিমান বহর রুরের ডর্টমুণ্ড-এর শিল্পকেন্দ্রে প্রচণ্ডতম আক্রমণ চালায়। এ পর্যন্ত জার্মানিতে এরূপ প্রচণ্ড আক্রমণ আর হয় নাই।

আতু দ্বীপের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। মার্কিন বাহিনী আতু দ্বীপে হতাবশিষ্ট জাপ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ত্রিশূলে অভিযান শুরু করিয়াছে।

আরাকান রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সম্প্রতি এক বৃটিশ টহলদার বাহিনী একদল জাপ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে। এই দলে দুইজন অফিসার ও ১০জন সৈন্য ছিল।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ সাল Saturday, 22nd May, 1943 [২৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলার খাদ্যসমস্যা

শুধু ফাঁকা কথা শুনিতে আর ইচ্ছা নাই; কারণ বাঙলাদেশ জুড়িয়া যে দুরন্ত ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা শুধু কথায় নিবৃত্ত হইবার নয়। কিছুদিন পূর্বে বাঙলা সরকারের উদ্যোগে সাংবাদিকদিগকে লইয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সরকারী দপ্তর-খানায় একটি বৈঠক হইয়াছিল। এই বৈঠকে ভারত গভর্নমেণ্টের নবনিযুক্ত বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক, ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্য বিভাগের নিয়ামক মিঃ উড এবং বাঙলার খাদ্য বিভাগের সচিব মিঃ সুরাবর্দি বক্তৃতা করেন। ইঁহারা সকলেই হিসাবপত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই। খাদ্যের অভাব ঘটিবে না। লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা সকলের আতঙ্ক দূর করুন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সরকারী হিসাবপত্রে লোকের ক্ষুধা মিটে না। ক্ষুধাটা বাস্তব এবং সরকারী হিসাবপত্র ঠিকই হউক আর অঠিকই হউক, এগুলি অবাস্তব; সুতরাং হিসাব দেখাইয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না কিংবা খাদ্য মূল্য অত্যধিক হওয়ার ফলে লোকের মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, সে আতঙ্ক দূর হয় না। খাদ্য মূল্য যদি কমে আতঙ্কও তখনই কমে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জনসাধারণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে উক্তি এবং বিবৃতি যতই বাহির হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়া চাউলের দামও ততই চড়িয়া চলিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দি মজুতদার এবং লাভখোরদের উপর সকল দোষ চাপাইতেছেন এবং তাহা দমন করিবার জন্য দৃঢ় [illegible] জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহার কথার জোর আছে, কিন্তু সে কথ[illegible] জোরে কাজ কিছুই হইতেছে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই [illegible] তাঁহার বিবৃতির ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমে নাই; অর্থাৎ লাভ[illegible] এবং মজুতদারদের দোষেই যদি চাউলের মূল্য বাড়িয়া থাকে, [illegible] তাহাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয় নাই, মূল্য আরও বাড়িয়া[illegible] সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাঁহার কথায় লাভখোর এবং মজুতদা[illegible] ভয় তো পায়ই নাই বরং বাজারে যে চাউল ছাড়া হইতেছে, তাহা মজ[illegible] করিবার দিকেই বেশী ঝোঁক দিতেছে। মিঃ সুরাবর্দি সে[illegible] গড়ের মাঠের বক্তৃতায় নিজেও একথা স্বীকার করিয়াছেন। [illegible] বলিয়াছেন, দুই দিনের মধ্যে চাউলের দাম পাঁচ ছয় টাকা চড়িতে প[illegible] এমন কিছু ঘটে নাই। কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে তাঁহার বিবৃ[illegible] পরে ইহাই ঘটিয়াছে। স্যার আজিজুল হক আশ্বাস দিয়াছেন [illegible] বাঙলা দেশের লোক না খাইয়া মরিবে না—ভারত গভর্নমেণ্ট দেখিবে [illegible] সপ্তাহের মধ্যে চাউলের মূল্য কমিবে বলিয়া তিনি আশা কর[illegible] বাঙলা দেশের নূতন অর্থ সচিব মিঃ তুলসী গোস্বামী বলিয়া[illegible] এক সপ্তাহ না হয় দুই সপ্তাহ কিংবা বড়জোর তিন সপ্তাহ। গোস্বামী কোন্ ভরসায় এ কথা বলিয়াছেন আমরা জানি না এব[illegible] বিচার করিতেও আমরা চাহি না। চাউলের দর কার্যত কমে [illegible] আমরা চাই। আজ বাঙলা দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, য[illegible] সমস্যার চেয়ে সে সমস্যা কম নয়। কলিকাতা শহরে চাউলের ক্রমেই চড়িতেছে ইহা সত্য; কিন্তু তবু এখানে চাউল পয়সা

এখনও মিলিতেছে; কিন্তু মফঃস্বলের বহু স্থানে পয়সা দিয়াও চাউল মিলিতেছে না; গরীবদের তো কথাই নাই, যাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের দুর্দশাও ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। অনেককে এক বেলা খাইয়া থাকিতে হইতেছে এবং সে একবেলাও পেট ভরিয়া ভাত জুটিতেছে না; চাউলের অভাবে শাকপাতা, বেশীর ভাগ সকরকন্দ আলু সিদ্ধ করিয়া উদর পূর্ণ করিতে হইতেছে। এই গরমের দিনে এমন খাদ্য সমস্যার ফলে স্থানে স্থানে মহামারী দেখা দিবারও ভয় রহিয়াছে। কলিকাতা শহরে ইতিমধ্যেই সে ভয় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। গ্রাম অঞ্চল হইতে বুভুক্ষু নরনারীর দল শহরে কণ্ট্রোলের দোকানে চাউল কিনিবার জন্য আসিতেছে। ইহারা রাস্তা-ঘাটে থাকিয়া অস্বাস্থ্যকরভাবে জীবনযাপন করিতেছে; ফলে শহরের স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে। শহরে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, মফঃস্বলে তাহাই দেখা দিবে এমন ভয় যথেষ্টই আছে। বাঙলার খাদ্যসমস্যার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার এক নূতন ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা আসাম, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং পূর্ব ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে—ইহাদের মধ্যে সকল প্রকার খাদ্যশস্য এবং খাদ্যশস্য হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের চলাচল সম্পর্কে যে সব নিষেধাজ্ঞা ছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বাঙলার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ হইতে বাঙলায় চাউল আমদানীর পথ সুগম করা হইয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, এইভাবে আমদানী চাউল আর লাভখোরদের হাতে না পড়ে কিংবা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের নামে কতকগুলি বিশেষ কোম্পানীর হাতে গিয়া আটক না হয়। এজন্য শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতবাসী নির্বিশেষে মজুতদারদের সকলের উপর মন্ত্রিমণ্ডলের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙলা দেশে আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এ অবস্থা আর কিছুদিন যদি চলে তবে বড় রকমের অনর্থ দেখা দিবে। ইহার প্রতীকার হয় কথায় নয়, কাজে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডল কথা ছাড়িয়া কাজে যদি ইহার প্রতীকার করিতে পারেন, তবে সে কাজে দেশের লোকের সহযোগিতা স্বভাবতই তাঁহারা লাভ করিবেন; কিন্তু শুধু জোরালো এবং ঝাঁজালো কথার দাপটে ভূত-পূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া তাহা মিলিবে না।

বীরের মৃত্যু

সিন্ধুর দেশপ্রেমিক জননায়ক আল্লাবক্স প্রকাশ্য দিবালোকে আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে সমগ্র ভারত স্তম্ভিত এবং মর্মাহত হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধে থাকিয়া যাঁহারা অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আল্লাবক্স একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার জীবনে মান প্রতিপত্তির প্রলোভন অনেক আসিয়াছে; কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে সে প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়াছেন। মোসলেম লীগের ভেদমূলক নীতির তিনি প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং সমগ্র অন্তর দিয়া ভারতের স্বাধীনতার প্রতিকূল মোসলেম লীগের পাকিস্থানী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিবার জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। অন্যায়ের সমর্থন করিবার মত দুর্বল মুহূর্ত কোনদিন জীবনে তিনি স্বীকার করেন নাই। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের দমন নীতির প্রতিবাদে সরকারী খেতাব বর্জন করেন। তিনি জানিতেন পরাধীন দেশের প্রভুত্বের পরিমণ্ডলে তাঁহার এমন তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার ফলে চাঞ্চল্য দেখা দিবে এবং তাহার জন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে; কিন্তু পদের মোহ তাঁহার কাছে বড় হয় নাই। এমন দৃঢ় মেরুদণ্ড এ দেশে দুর্লভ। আল্লাবক্সের শোচনীয় মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এমন দৃঢ়চেতা এবং আদর্শনিষ্ঠ জননায়ক হারাইল। সিন্ধুতে এখন লীগের মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত। আল্লাবক্সের আততায়ীদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহারা কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকিবে।

লীগ ও কংগ্রেস

কংগ্রেস যেমন গভর্নমেণ্টের প্রতিকূলে লীগও তেমনই গভর্নমেণ্টের প্রতিকূলতা করিতেছে, অথচ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মিঃ জিন্না ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত ব্যবহারে পৃথক নীতির অনুসরণ করিতেছেন। ইহার কারণ কি? সম্প্রতি পার্লামেণ্টে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। প্রশ্নকর্তা বলেন, একপক্ষকে যখন আটক করিতে হয়, তবে অপর-পক্ষকেও আটক করা হউক; আর একপক্ষকে যদি ছাড়িয়া রাখা যায়, তবে অপরপক্ষকেও ছাড়িয়া রাখা হউক। ভারত সচিব মিঃ আমেরী ইহার একটা জবাব দিয়াছেন। তিনি বলেন, মোসলেম লীগ বা জিন্নার আচরণে হিংসা বা বিদ্রোহের উত্তেজনা ছিল না। এতদ্দ্বারা ইঙ্গিতে কংগ্রেসের আচরণে যে ঐ বস্তু আছে ভারত সচিব এই বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু ইহা যে কত বড় মিথ্যা সকলেই তাহা জানেন। পক্ষান্তরে কিছু দিন পূর্বে জিন্না সাহেবের সভাপতিত্বে দিল্লীতে মোসলেম লীগের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে কতটা অবিমিশ্র প্রেমপূর্ণ এবং কি ধরণের অনুত্তেজক বক্তৃতা হইয়াছে আমেরী সাহেব নিশ্চয়ই তাহা জানেন। লীগের অন্যতম নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জমান স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছেন, লীগের দাবী যদি মিটানো না হয়, তবে লীগপন্থীরা প্রথমে হিংসা ও উপদ্রবের পথ গ্রহণ করিবে; পরে পাঁচটি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল স্থাপন করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে অস্বীকার করিবে। সুতরাং উত্তেজনার অভাব নাই এবং লীগের নীতিও গভর্নমেণ্টের সমর প্রচেষ্টার প্রতি উদাসীন, তথাপি দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভর্নমেণ্টের আচরণে পার্থক্য রহিয়াছে। ভারত সচিবের উত্তরে এ পক্ষে যুক্তি কিছুই দেওয়া হয় নাই, শুধু প্রশ্নটা ধাপ্পাবাজীতে চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, লীগ কংগ্রেস-বিরোধী ও জাতীয়তা বিরোধী প্রতিষ্ঠান। লীগের নীতি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম করিবার পথেই কাজ করিতেছে; সুতরাং এই দিক হইতে লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণ ইহা জানেন, জানিয়াই লীগের প্রভাব যাহাতে বাড়ে, সেজন্য লীগের কেখুনোই চরমপন্থী ভড়ংটিও তাঁহারা ভাল চোখেই দেখিতেছেন। উভয়েই স্বার্থের দায়ে উভয়ের কাছে ঋণী; এমন অবস্থায় লীগ নেতাদিগকে আটক করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

পাঁচটি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল

ভারতের পাঁচটি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, দিল্লীর মুসলিম লীগের অধিবেশনে এই সংকল্প ঘোষণা করা হয়—এখন কর্তাদের কৃপায় সে সংকল্প পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। বাঙলা দেশে, সিন্ধুতে এবং আসামে শাসনতন্ত্রের বিধি-বিধানকে পদদলিত করিয়া কৌশলক্রমে সংখ্যা লঘিষ্ঠ লীগ দলকেই মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হইয়াছে; সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সেই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে লীগের দলের প্রাধান্য নাই, সিন্ধুর ব্যবস্থা পরিষদেও সে প্রাধান্য নাই, ইহা সত্ত্বেও যদি এই দুই প্রদেশে লীগের মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই বা সম্ভব হইবে না কেন—কর্তার ইচ্ছায় যেখানে কর্ম সেখানে সকলই সম্ভব। বিশেষত সরকারী দমননীতির কল্যাণে আইনসভার অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য এখন আটক আছেন; সুতরাং শুভ সুযোগ আসিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী দলের নেতা ডাক্তার খান সাহেব একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সে প্রদেশের কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে অনেকেই এখন আটক থাকিলেও আইনসভায়

লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। অন্য দলের সদস্যগণও লীগপক্ষে যোগদান করেন নাই; এমন অবস্থায় সম্ভবত ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই গভর্নর লীগ দলের নেতাকে মন্ত্রিত্ব করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ভুলটা গভর্নরের জ্ঞানত, না জানিয়া নয়। কৌশলে কংগ্রেসী দলকে দাবাইয়া অন্যান্য প্রদেশে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সেই নীতিরই পরিণতি দেখিতে পাইতেছি। জনমতের মর্যাদার মূল্য এ ক্ষেত্রে নাই—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যে কতটা প্রহসন ইহাতে তাহাই উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে মোহটা যত ভাঙিয়া যায় ততই মঙ্গল, দেশের স্বার্থের দিক হইতে এক হিসাবে ইহাতে লাভ আছে।

মিঃ ফিলিপস ও মহাত্মা গান্ধী

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ফিলিপস ভারত ভ্রমণের পর দেশে ফিরিয়াছেন এবং ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এসব মার্কিন ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভিতরের কথা। আমরা বাহিরের লোক, এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা গবেষণা শুধু অনুমানমূলক, ভিতরের ব্যাপার আমাদের বুঝিবার বা জানিবার কোনই উপায় নাই; কিন্তু মিঃ ফিলিপসের ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে একটি রহস্য আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্বে মিঃ ফিলিপসকে স্বীকার করিয়া যাইতে হয় যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পান নাই। বর্তমান সংগ্রামে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু মার্কিন জাতি, সেই মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতিনিধির অনুরোধ ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক রক্ষিত হয় নাই। ইহার কারণ কি থাকিতে পারে, অনেকের নিকট ইহা রহস্য ছিল। সেদিন ভারত সচিব মিঃ আমেরীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, উত্তরে ভারত সচিব বলেন, গান্ধীজী অপরাধজনক কার্যের প্ররোচনা দিয়া থাকেন। গান্ধী-চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপের হীন প্রয়াসে অবশ্য প্রকৃত সত্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না, কিংবা জগতের দৃষ্টিতে গান্ধীজীর মর্যাদারও হ্রাস হইবে না; কিন্তু প্রশ্নের উত্তরই ইহাতে মিলিল কি? গান্ধীজী যদি অপরাধের প্ররোচনা সতাই দিয়া থাকেন, তবে মিঃ ফিলিপসও কি সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ করিবার জন্য মারমুখো হইয়া উঠিবেন? ভারত সচিব গান্ধী-চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন এবং বন্ধু শক্তির প্রতিনিধি স্থানীয় মিঃ ফিলিপসের ন্যায় একজন পদস্থ ব্যক্তিরও মর্যাদা বজায় রাখেন নাই। এমন কৌশলে মার্কিন জাতির নিকট ব্রিটিশ জাতির মর্যাদা বাড়িবে কি? এতদ্দ্বারা ভারত সম্পর্কিত ব্রিটিশ নীতির গলদই মার্কিন জাতির দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। মার্কিন সমাজকে ভুল বুঝান যাইবে না এবং দেখা যাইতেছে, এতদিন কামিক চেষ্টার পরও মার্কিনকে তেমন ভুল বুঝান যায় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ হইতে বহুবিধ অপপ্রচার সত্ত্বেও সে দেশের লোক গান্ধীজী এবং কংগ্রেস নেতাদিগকে অপরাধপ্রবণ লোক বলিয়া বুঝিয়া বসে নাই। সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে মিস পার্ল বাক প্রভৃতি মার্কিনের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত একদল প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি দাবী করিবেন এবং ভারতের স্বাধীনতার সমর্থন করিবেন। ইঁহাদের চেষ্টার ফল কি হইবে জানি না। চার্চিল সাহেব ইঁহাদের অনুরোধ স্বীকার করিয়া লইবেন না, ইহা নিশ্চয়; তথাপি এই ব্যাপারে ভারত সম্পর্কে মার্কিন জাতির মনোভাব এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রচার-কার্যের ব্যর্থতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সত্য যাহা চিরদিনের জন্য তাহা চাপা থাকে না।

পরীক্ষা সম্মুখে

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন গড়ের মাঠে একটি জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বর্তমান মন্ত্রিসভার নীতি ও লক্ষ্য বিবৃত করেন। স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন, 'জগদীশ্বরের করুণায় তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলকে বাঙলার তিন-চতুর্থাংশ লোক সমর্থন করিতেছে। বর্তমানে একটি ক্ষুদ্র অংশ তাঁহাদের সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। বাঙলার জনসাধারণ এবং যুবকগণ মুসলিম লীগের প্রতি অনুরক্ত থাকায়, বহুলাংশে তাহাদের জন্যই মন্ত্রিমণ্ডল কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন।' স্যার নাজিমুদ্দীন মুসলিম লীগের ঢাক পিটাইতে চাহেন ক্ষতি নাই; কিন্তু বাঙলার তিন-চতুর্থাংশ লোক তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল সমর্থন করিতেছে, এ তথ্য ইতিমধ্যেই তিনি সংগ্রহ করিলেন কোথা হইতে? কথায় আছে, গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি। স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডল এখনও আইনসভার সম্মুখীনই হইল না, অথচ ইতিমধ্যেই সে মন্ত্রিমণ্ডল কৃতিত্ব অর্জন করিল। এ কৃতিত্বের নিরিখ নিশ্চয় গভর্নর কর্তৃক স্যার নাজিমুদ্দীনকে প্রধান মন্ত্রীর গদীতে লইয়া বসানো এবং শ্বেতাঙ্গ দল বা সে দলের মুখপাত্র 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের সুপারিশ। সেই কথাটা খুলিয়া বলিলেই স্যার নাজিমুদ্দিন ভাল করিতেন। বাঙলা দেশ সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী বাঙলাদেশের জনসাধারণ, বিশেষভাবে বাঙলা দেশের যুবকদের আদর্শে মুসলিম লীগের ভেদমূলক নীতির কোন স্থান নাই। স্যার নাজিমুদ্দীন ইহা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখুন এবং তিনি এ সত্যও যেন বিস্মৃত হন না যে, তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল লীগের আদর্শ তাঁহাদের নীতিতে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইতে কতটা বিরত থাকেন, তাহার উপরই তাঁহার মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

পরলোকে স্যার নীলরতন

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার তাঁহার গিরিডিস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল; স্যার নীলরতন চিকিৎসা-বিদ্যায় অসামান্য কৃতিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল চিকিৎসক ছিলেন না। বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ যুগের তিনি সমসাময়িক এবং তিনি নিজে মডারেট মতাবলম্বী হইলেও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন এবং যথাসাধ্য জাতীয় আন্দোলনে সার্থক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সেজন্য ত্যাগ-স্বীকারও করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার-স্বরূপে স্যার নীলরতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করেন। বাঙলার ঘরে ঘরে তিনি সুপরিচিত ছিলেন; কিন্তু এত বড় মান-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ছিলেন। অন্তরের ধর্মভাব সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত হইয়া তাঁহার প্রকৃতিকে মধুর করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশের এবং বাঙালী জাতির যে ক্ষতি ঘটিল, তাহা সহজে পরিপূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঁকাস্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

(৮)

বাড়িতে এইভাবে দিন কাটিলেও স্কুলে কিন্তু এতদিন আমার পড়াশুনার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। লেখাপড়ার আগ্রহ আমার বরাবরই ছিল খুব প্রবল। শুধু তাহাই নহে, ইহার ভিতরেই আমার মন তখন একমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিত। বাহির হইতে যত কষ্ট, যত দুঃখ আসুক না কেন, আমার অধ্যয়নানুরাগী মনকে তাহারা কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই প্রতি পরীক্ষাতেই আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিলাম। আমার এই কৃতিত্ব দেখিয়া জ্যাঠামশায় হেডমাস্টারকে ধরিলেন আমার ফ্রি করিয়া দিবার জন্য। হেডমাস্টারমশায়ও কর্তৃপক্ষকে দিয়া ইহা অনুমোদন করাইয়া লইলেন।

ইহার জন্য সহপাঠীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে একটু কৃপার চক্ষে দেখিলেও আমি কিন্তু ফ্রি পড়িবার জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করিতাম। ভাবিতাম, এতদিনে যেন আমি লেখাপড়ার জন্য একটা উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছি।

ইতিমধ্যে সহপাঠীদের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য দূর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কাহারও সহিত সৌহার্দ স্থাপিত হয় নাই। কথাবার্তা সকলের সঙ্গেই হইত। কেহ বা কোন কঠিন অঙ্ক লইয়া আসিত আমার কাছে বুঝিবার জন্য, কেহ বা পরীক্ষার পূর্বে কোন প্রশ্নগুলি আসিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আমার নিকট হইতে জানিয়া লইত। আমি যাহা জানিতাম, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বলিয়া দিতাম। কিন্তু যদি পরীক্ষায় তাহার ভিতর হইতে কিছু না আসিত ত তাহারা আমায় টিটকারী দিতে ছাড়িত না। কেহ কেহ ইহাও বলিত যে, আমি তাহাদের ভুল বলিয়া দিয়াছি নিজের সুবিধার জন্য। তাহারা 'ফেল' করিলে আমি শিক্ষক মহাশয়দের নিকট হইতে বাহবা লইব বলিয়া।

আমি কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহা সহ্য করিতাম। আবার যখন আমার অনুমান সত্যে পরিণত হইত, তখন সহপাঠিদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া বলিত, মাইরি, ভাগিস্ তুই বলে দিয়েছিলি, আমি একেবারে ছাঁকা বই থেকে মুখস্থ মেরে দিয়েছি।

ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হয়ত তাহারা কেহ এক পয়সার বিস্কুট কিংবা এক পয়সার অবাক জলপান কিনিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিত, আমি সাদরে তাহাও গ্রহণ করিতাম। এমনি যখন ক্লাসে আমার অবস্থা, তখন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিয়া গেল।

একদিন হেডপণ্ডিত মশায় চেয়ারে বসিয়া পড়াইতে পড়াইতে যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখা গেল তাঁহার দীর্ঘ শিখাটি চেয়ারের মাথার সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি যত টানেন, শিখাটিও তত চেয়ারের সঙ্গে জড়াইয়া যায়। কাঁচা বেলের আঠা কে চেয়ারে লাগাইয়া রাখিয়াছিল, তাই কিছুক্ষণ টানাটানি করিবার পর তাহা খুলিয়া গেল। পণ্ডিতমশায় ইহাতে কি পরিণাম রাগান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ হেডমাস্টার মশায়কে ডাকিয়া আনিলেন।

হেডমাস্টার মশায় একটা বেত হাতে করিয়া ক্লাসে আসিলেন এবং কে ইহা করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যেকটি ছাত্রই বলিল, বেলের আঠা কেমন করিয়া সেখানে আসিল, তাহারা জানে না।

অষ্টম শ্রেণীতে প্রথম ঘণ্টায় সংস্কৃত পড়ানো হইত। দুই একটি ছেলে ইহাও বলিতে ছাড়িল না যে, হয়ত আগের দিন বাহির হইতে কেহ আসিয়া সেখানে উহা লাগাইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাদের পক্ষে ইহা জানা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

শেষে হেডমাস্টারমশায় আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, অলোক তুমি সচ্চরিত্র ও আদর্শ ছেলে—সমস্ত স্কুল তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে—তোমার উপর সকলের অগাধ ভরসা। আমি জানি, তুমি অন্ততঃ আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবে না। কার কাজ এটা বলতো বাবা?

আমি জানিতাম, কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের এইরূপ আবেদনের পরও কি করিয়া তাহা গোপন করিব, ভাবিয়া না পাইয়া বলিলাম, স্যার সহপাঠিদের মধ্যে যদি কেউ করেই থাকে ত আমার কি বলা উচিত তার নাম? আপনিও ত একদিন ছাত্র ছিলেন?

হেডমাস্টারমশায়ও যেন একটু দ্বিধায় পড়িলেন। তাই বার দুই মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, কিন্তু কাজটা যে কতদূর গর্হিত, তা ত তুমি বুঝতেই পারছো। কাজেই ভবিষ্যতে এই ব্যাপার যাতে আর না হয়, তাও ত তোমার দেখা কর্তব্য। যে ছাত্রেরা শিক্ষকদের অপমান করে, তাদের সমর্থন করা তোমার মত আদর্শচরিত্র ছেলের কখনও উচিত নয়।

ইহার পর আমি আর তাহার নাম না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হেডমাস্টারমশায় তাহাকে পঁচিশ ঘা বেত মারিলেন স্কুলের সমস্ত ছেলের সামনে।

বলা বাহুল্য, ক্লাসের ছেলেদের কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক, শয়তান—এই নামে অভিহিত হইলাম। কিন্তু কি করিব, তাহাও মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইল। সহপাঠীদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে ঠিক কিরূপ ছিল, তাহা এক কথায় বলা বড় শক্ত! মোট কথা প্রয়োজনের খাতিরে যতটুকু মেলামেশা করা দরকার, ঠিক ততটুকু ক্লাসের ছেলেরা আমার সঙ্গে মিশিত—তাহার চেয়ে বেশী উভয়পক্ষের কাহারও প্রয়োজন হইত না। ইহার সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় আমার তরফ হইতে যথেষ্ট আগ্রহের অভাব। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহাদের খেলাধুলা, ইয়ারকি ঠাট্টা, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার সমস্তই আমার নিকট অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইত। তবুও তাহারা বহুবার আমায় তাহাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। আমার মন তাহাদের সঙ্গে যেন হাঁপাইয়া উঠিত।

আমি একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতাম মাঠে ঘাটে পথে, কখনো বা

কোন নির্জন স্থানে বসিয়া বই পড়িতাম। ইহাতেই আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাইতাম।

একদিন একলা একটি মাঠের ধারে বসিয়াছিলাম। আমার হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু মনটা ছিল আকাশের গায়ে উড়ে-যাওয়া বলাকাশ্রেণীর দিকে। এমন সময় পিছন দিক হইতে ছুটিতে ছুটিতে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে আসিয়া আমায় বলিল, এই আলোক শিগ্‌গির পালা এখান থেকে, তোকে আজ ক্লাসের ছেলেরা মারবে বলে ঠিক করেছে।

ছেলেটির নাম কমল। ভীরু ও শীর্ণ চেহারা। গায়ের রঙ ফরসা, দেহের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চোখ দুইটি উজ্জ্বল ও ভাবময়। আমি বলিলাম, কেন মারবে রে কমল! সে বলিল, তুই হেবোর নাম কেন বলে দিতে গেলি হেড মাস্টারের কাছে? তাই ত ওর দলের ছেলেরা রেগে গেছে। বলিলাম, মাস্টারদের অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। শিক্ষকরা গুরু, তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা না করলে যে লেখাপড়া হয় না। তার জন্যে যদি মার খেতে হয় তাতেও রাজী!

কমল বলিল, আরে মারবে কে? এখনও পালা, তারপর কাল হেডমাস্টারকে বলে দিলেই সব জব্দ হয়ে যাবে। এই বলিয়া সে এক-রকম জোর করিয়া আমায় টানিতে টানিতে ভিন্ন পথ দিয়া বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু দরজার কাছে পা দিতেই আমার নজরে পড়িল দূরে দুইটি ছেলে আমাদের দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। উহারা যে হেবোর দলের তাহাও চিনিতে পারিলাম। আমি বলিলাম, এই কমল, তোকে যদি ওরা মারে!

সে বলিল, আমি পথের ভেতর দিয়ে সবসময় এক ছুট দেবো। আমার সঙ্গে ওদের কেউ ছুটতে পারবে না।

পরদিন স্কুলে গিয়া শুনিলাম কমলকে হেবোর দলের ছেলেরা খুব প্রহার করিয়াছে। আমি মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইলাম। আহা আমার জন্য বেচারী মার খাইল। কমলকে চুপি চুপি ডাকিয়া কহিলাম, ভাই আমার জন্যে মিছি মিছি তুই মার খেলি—আমায় ক্ষমা কর।

সে হাসিয়া বলিল, দূর বোকা—তুই কি ভেবেছিস্ আমার লেগেছে? আমিও এমন কামড়ে দিয়েছি ফণির হাতে যে সে বাপ বাপ বলে ছুটে দিয়েছে। আর এই দেখ ওর নতুন কপিং পেন্সিলটা পড়ে গিয়েছিল সে দেখতে পায়নি। যেমন মেরেছে আমি কিছুতেই এটা ফিরিয়ে দেবো না।

সেই দিন টিফিনের সময় হেডমাস্টার মশায়কে গিয়া আমরা দুইজনে সব কথা বলিলাম। তিনি হেবোকে ডাকিয়া কি বলিয়াছিলেন জানি না, তবে আমাদের পিছনে আর তাহারা লাগে নাই কখনো।

এই ঝগড়াকে উপলক্ষ্য করিয়া কমলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। কমল যাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিত তাহাদের অধিকাংশই হেবোর দলভুক্ত। তাই স্কুল হইতে ফিরিয়া বিকালটা সে আমারই সঙ্গে কাটাইত। আমরা দুইজনে একসঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে এক একদিন দামোদরের বাঁধ পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম। দামোদর নদী সেখান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। কোন কোন দিন দুইজনে মাঠে বসিয়া গল্প করিতাম। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য বই বই কমল একবারে পড়ে নাই। আমার মুখ হইতে তাই নানা দেশ-বিদেশের গল্প শুনিয়া সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইত। তাহার শিখিবার আগ্রহ ছিল। আমি যখন গল্প বলিতাম সে হাঁ করিয়া আমার মুখের কথা গিলিত। গল্প শেষ হইলে কিছুক্ষণ সে আর কথা কহিতে পারিত না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। বোধ হয় ভাবিত আমি তাহার চেয়ে কত বেশি জানি। তাই তাহার মনের কোণে আমার জন্য কখন যে শ্রদ্ধার আসন পাতিয়া রাখিয়াছিল তাহা সেও বুঝিতে পারে নাই। গল্প শুনিতে শুনিতে এক একদিন বিস্ফারিত নেত্রে সে জিজ্ঞাসা করিত, আলোক তুই এত শিখলি কি করে ভাই।

আমি যখন বলিতাম, শুধু লাইব্রেরীর বই পড়িয়া, সে আরো বিস্মিত হইয়া বলিত, আচ্ছা আমি যদি পড়ি তাহলে আমিও শিখতে পারবো?

নিশ্চয়ই।

কি বই পড়বো ভাই?

আমি তাহাকে বইয়ের নাম বলিয়া দিতাম। সে স্কুলের লাইব্রেরী হইতে বই লইত। এইভাবে তাহার মনের মধ্যে বাহিরের বই পড়িবার আগ্রহ যত বাড়িতে লাগিল তত সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আমিও মন খুলিয়া গল্প করিবার একজন সঙ্গী পাইয়া যেন বাঁচিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা আমার অদৃষ্টে বেশি দিন সহ্য হইল না। একদিন সকালে একখানি বই কমলকে দিবার জন্য আমি তাহার বাড়ির দিকে চলিলাম। বইখানি গল্পের—আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাহাকে পড়াইতে না পারা পর্যন্ত যেন মন সুস্থির হইতেছিল না। আমরা দুইজনে যখন কোন গল্প লইয়া আলোচনা করিতাম তখন আমার মনে এত আনন্দ হইত যে কি বলিব। যাহা হউক, বইখানি লইয়া গিয়া আমি কমলকে বাড়ির বাহির হইতে ডাকিলাম। ইতিপূর্বে আমি কোনদিন তাহাদের বাড়ি যাই নাই। কঞ্চি ও গাছের ডালপালার বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল কমলদের বাড়ি। কিন্তু প্রথমবার ডাকিতে আমি তাহার সাড়া পাইলাম না। দ্বিতীয়বার আবার যেই ডাকিয়াছি অমনি ভিতর হইতে তাহার মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কে রে দুষ্টু ছেলে, লেখাপড়ার নাম নেই, সকালবেলো কমলকে ডাকতে এসেছে?

ইহা শুনিয়া আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সামনের আম বাগানটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর চুপি চুপি বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াই বই লইয়া বসিলাম। তখন ভুতো ও তাহার অন্যান্য ভাই-বোনেরা সবাই পড়িতেছিল। আমার মনে হইল সত্যই ত আমি কমলকে ডাকিয়া অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু বই খুলিয়া যতবার পড়িবার চেষ্টা করি কিছুতেই মন পড়ায় যায় না। কেবলই সেই কথাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আমি কি সত্যই দুষ্টু ছেলে, কমলের মা কি আমার কথা তাঁহার ছেলের মুখে শোনেন নাই! আমি কোনদিন কাহারো কোন অনিষ্ট করি নাই—তাই কেহ আমাকে গালাগালি দিলে মনে বড় ব্যথা পাইতাম।

সেই দিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনো কমলকে ডাকিতে তাহার বাড়ি যাইব না। এদিকে কমলকে ডাকিতে যাইয়া যে তাহার মায়ের নিকট ভর্ৎসিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম সে কথাও আমি তাহাকে জানিতে দিই নাই। কমল আমাকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখিত—পাছে ইহাতে আমার সম্মানের হানি হয় তাই চাপিয়া গিয়াছিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে শুনিলাম পাশের গ্রামের হাই স্কুলে প্রাইজ, এবং সেই উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে একজন নামকরা সাহিত্যিক আসিবেন সভাপতিত্ব করিতে। এই সাহিত্যিকটির নাম আমার এবং কমলের দুজনেরই জানা ছিল। আমরা তাঁহার রচিত বহু পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাই যাঁহার রচনা পড়িয়া আমরা কত কাঁদিয়াছি, কল্পনার কত নব নব লোকে বিচরণ করিয়াছি, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাঁহাকে কিরূপ দেখিতে—আমাদেরই মত তিনিও মানুষ কিনা, এই রকম আরো কত অসম্ভব অসম্ভব কথা চিন্তা করিয়া কতদিন রাত্রে ঘুম হয় নাই। প্রাইজের দিন আমরা দুইজনে দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সেই পরম বিস্ময়কর বস্তু সাহিত্যিককে দেখিবার জন্য বেলাবেলি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেদিন ছিল রবিবার স্কুল বন্ধ। কিন্তু দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যখন আমরা আমাদের গ্রামে পদার্পণ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গাছে ও বনজঙ্গলে অন্ধকার দেখিয়া কমল বলিল, ভাই আলোক আমার ভয় করছে। আমাকে একটু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিবি?

অগত্যা আমি তাহাতেই রাজী হইলাম। কিন্তু যেমন কমল

বাড়ির মধ্যে পা দিয়াছে, অমনি আবার তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিল। মুখপোড়া, রাত্তির পর্যন্ত আড্ডা দিতে শিখেছ—কোন্ চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি। এই বলিয়া কিল চড় দুমদাম করিয়া তাহার মাথায় পিঠে বসাইয়া দিলেন। কমল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—ও মা মরে গেলুম গো—আর আমি কখনো যাবো না—আমায় আর মেরো না গো বলিয়া।

কার সঙ্গে গিয়েছিলি শিগ্‌গির বল? যত সব বদমাইস ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছো—আসুক সে শনিবার বাড়ি—তারপর তোমার হাড় একদিকে আর মাস একদিকে করবো। এই বলিতে বলিতে তিনি আবো প্রহার করিতে লাগিলেন। কমলের বাবা কলিকাতায় মেসে থাকিয়া চাকরী করিতেন। মাসে দুইবার করিয়া বাড়ি আসিতেন।

কমল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি আলোকের সঙ্গে গিয়েছিলুম—

কেন তুই এইসব বদছেলের সঙ্গে মিশিস্—তোকে না কতদিন বারণ করেছি কারুর সঙ্গে মিশবি না—বল আর কারুর সঙ্গে মিশবি?

না-মা আর কারুর সঙ্গে কখনো মিশবো না। এই বলিয়া কমল তখন তাহার মায়ের প্রহার হইতে নিস্তার পাইল।

পথ চলিতে চলিতে আমার কানে এই কথাগুলি সবই আসিল। আমি বদমায়েস, আমি দুষ্টু, আমি কমলকে খারাপ করিয়া দিতেছি। আর কমলও তাহার কোন প্রতিবাদ করিল না। মনে একটু দুঃখ হইল। কিন্তু ইহার চেয়েও বেশি হইল কমলের জন্য। বাস্তবিক কমলের মা কি ভীষণ রাগি! বেচারী কমল আমারি জন্য কত মার খাইল! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কমলের সঙ্গে মিশিব না। এইসব ভাবিতে ভাবিতে বাড়িতে ঢুকিতেছি এমন সময় শুনিলাম, জ্যাঠাইমা ভুতোর চুলের মুঠি ধরিয়া কিল চড় মারিতেছেন, আর চেঁচাইয়া বলিতেছেন, আর যাবি ম্যাচ খেলতে এত রাত পর্যন্ত, মুখপোড়া পড়াশুনো শিখে কি আমার মাথা কিনবি—আমি আর কাঁদিন—মরবি নিজের দুঃখে নিজে—আমি ত আর দেখতে আসবো না।

অন্য দিন এমন সময় ভুতো পড়াশুনো শুরু করিয়া দেয়—আজ সে ম্যাচ খেলিতে গিয়াছিল পাশের গ্রামে বলিয়া এই প্রহার!

চুপি চুপি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কি জানি আমারও ত দেরী হইয়াছে, এক্ষুনি হয়ত জ্যাঠাইমা আসিয়া আমায়ও দু'চার ঘা বসাইয়া দিবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ এই রকম আশংকায় প্রতীক্ষা করিবার পর যখন সব চুপ-চাপ হইয়া গেল এবং রান্নাঘর হইতে জ্যাঠাইমার খুন্তী নাড়িবার শব্দ আমার কানে আসিয়া পেঁৗছিল তখন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, ভাগ্যিস আমার মা বাঁচিয়া নাই। সব মায়েরাই ছেলেদের শুধু মারেন ও বকেন আমার মনে এইরূপ ধারণা তখন বদ্ধমূল হইয়াছিল। আমি চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া এইসব ভাবিতেছিলাম। এমন সময় সরলা ঝি একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আমার ঘরে দিতে আসিল। অন্ধকারে আমাকে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস লইয়া বলিল, এমনি করে চুপ করে বসে আছো কেন দাদাবাবু—তোমার কি পড়াশুনো নেই?

বলিলাম, আছে।

আছে ত বসে আছো কেন?

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, হ্যাঁ সরলা তোর ছেলে আছে? এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন আমার মুখ হইতে সরলা আশা করে নাই, সে তাই কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুই তাকে খুব মারিস না? হাঁরে সরলা, সব মা কি তার ছেলেদের মারে? সরলা আলোটা রাখিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। আমি ইহার কারণ উপলব্ধি করিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিল, মারবো দাদাবাবু? কোনদিন তার গায়ে হাত পর্যন্ত ছোঁয়াইনি, তবু কেন ভগবান কেড়ে নিলে তাকে আমার কোল থেকে? এই বলিয়া সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরে শুনিয়াছিলাম সরলা একটি ছেলে লইয়া বিধবা হয় এবং সেই ছেলেটি পাঁচ বছর বয়সে কলেরায় মারা যায়।

ক্রমশ

আসিবে কি চাঁদের বিভূতি

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নিঃসহায় শূন্য মাঠ। হেথা আমি,—নিঃসঙ্গ নীরব
নির্জন দ্বীপের মত; অস্তে গেছে স্বপ্নরশ্মি সব
স্মৃতির দিগন্তপারে,—মুহূর্তমন্থর। পৃথিবীর
কোথা যেন পৈশাচিক সুর পথে পথে করে ভিড়।
দৃষ্টির নেপথ্যে রহি ভাবি ভাগ্যবিহীনের কথা,
শতাব্দীর মানুষেরে আছে ঘিরে মিথ্যা মাদকতা।

মরমের অবলুপ্ত কথা যত দেয় এসে দেখা
অস্পষ্ট দৈত্যের মত। সশঙ্কিত ঘন অশ্রুরেখা
নয়নে আমার। হিংসা ভরা পশুসম অন্ধকার
ধেয়ে আসে। আলোকের চিহ্ন নাহি—বিষণ্ণ সন্ধ্যার
দোলে ছায়া,—চঞ্চল বিহঙ্গ নীল আকাশের 'পরে
ধূসর পালক তার বিস্তারিল। বিজন প্রান্তরে
নিদ্রায় নিমগ্ন বট, শীর্ষে তার ওড়ে শঙ্খ চিল,
অনন্ত আকাশে চলে ভাঙাচোরা মেঘের মিছিল।

মেঘলা রাতের মত এ জীবন করে কার স্তুতি!
ঘুমের ঝুড়িতে নেমে আসিবে কি চাঁদের বিভূতি?

গেলিলিও

(জীবনী)

শ্রীপবিত্রকুমার দাস

বর্তমান সভ্যতার যুগে বিজ্ঞানের প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। যুগে যুগে এই বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য যে সব মনীষী জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীকে ক্রমাগত সত্যের সন্ধান যুগিয়ে এসেছেন, মহামনীষী গেলিলিও তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৫৬৪ সালে ইটালির অন্তঃপাতী পিসা নগরে এই মহামনীষীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভিন্‌সেনজো বংশমর্যাদায় বড় হলেও দরিদ্র ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যায় ভিন্‌সেনজোর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। পিতার গুণাবলী ক্রমে পুত্রে প্রকাশ পায়। ছেলেবেলা থেকেই গেলিলিওর বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মে। বালক গেলিলিও একটুখানি অবসর পেলেই ছোট ছোট খেলনা ও যন্ত্রপাতি তৈরী ক'রত। গেলিলিওকে এসব করতে দেখে সমবয়সী বালকেরা তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকত। গেলিলিওর পিতা কিন্তু ছেলেকে বিজ্ঞানের প্রতি আসক্ত দেখে ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠতেন, কারণ তখনকার দিনে বিজ্ঞানের মোটেই আদর ছিল না। সেকালে বিজ্ঞান চর্চা মানে ছিল স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করা। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রটা তখন সামান্য সমাদর লাভ ক'রেছিল, তাই তাঁর পিতা তাঁকে ১৫৮১ সালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পাঠান।

গেলিলিও কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটেই উৎসুক ছিলেন না, তাই ফল হ'ল বিপরীত। পিতাকে না জানিয়েই তিনি অস্টিলিও রিসি নামক এক বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদের কাছে জ্যামিতি অধ্যয়ন শুরু ক'রে দিলেন। পরে তাঁর পিতার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে পুত্রের মতেই মত দিতে বাধ্য হ'লেন। গেলিলিওর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি একবার যা পড়তেন তা কখনও ভুলতেন না। মেধাশক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটা জিনিস আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারতেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইউক্লিডের জ্যামিতি শেষ ক'রে তিনি আর্কিমিডাসের পুস্তকাবলী পড়তে শুরু ক'রে দিলেন।

গেলিলিও পাঠদ্দশায় মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি দোলকের গতির নিয়ম আবিষ্কার করেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি গির্জায় বসেছিলেন এমন সময় হঠাৎ কড়িকাঠে ঝুলানো একটি আলোকধারের প্রতি তাঁর নজর পড়ে। তখন ওটা সবেমাত্র জ্বালানো হ'য়েছে এবং বাতিটি তখনও দুলছিল। এই দেখে গেলিলিও হাত দিয়ে নিজের নাড়ীর স্পন্দন গুণতে লাগলেন ও বাতির দোলাটাও লক্ষ্য ক'রতে লাগলেন। দোলাটা জোর থেকে আস্তে হ'য়ে আসল কিন্তু সময়ের কোন ব্যতিক্রম হ'ল না—সময় ঠিকই রইল। বাড়ি এসেই তিনি একটা ভারী জিনিসকে দড়িতে ঝুলিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে ফল সেই একই দাঁড়াচ্ছে, জোরে বা আস্তে দোলাতে সময়ের কোন ব্যতিক্রম হয় না। এই ক'রে তিনি দোলকের সমগতিত্ব আবিষ্কার ক'রেন। প্রথম প্রথম উহা নাড়ীর স্পন্দনের গতি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। পরে হিউজেন্স উহা ঘড়ি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করেন। গেলিলিওর আবিষ্কারের কথা পিতার কানে গেল। পিতার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে গেলিলিও পুরোদমে অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন ক'রতে শুরু করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গেলিলিও এই দুই বিষয়েই বিশেষ বুৎপত্তি



তরুণ কবি মিল্টনকে গেলিলিও দূরবীক্ষণে চন্দ্রলোক দেখাইতেছেন

লাভ করলেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি ২৬ বৎসর বয়সে মাত্র ২০, টাকা বেতনে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'লেন।

এবার তিনি আরেকটা বিষয়ে লোককে তাক লাগিয়ে দিলেন। গেলিলিওর আগে লোকে জানত যে দুটি দুরকম ওজনের জিনিস একই জায়গা থেকে একই সময়ে ছেড়ে দিলে ভারী জিনিসটাই আগে মাটীতে পড়ে। কিন্তু গেলিলিও বললেন, 'এ হ'তেই পারে না, দুটোই একসঙ্গে পড়বে।' একথা শুনে সকলে হাসল, ভাল পাগলের পাগলামী। কিন্তু গেলিলিও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন। একদিন তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপকদের নিয়ে পিসার বিখ্যাত 'লিনিং টাওয়ারে' গেলেন। অধ্যাপকদের নিচে রেখে তিনি একটি

পঞ্চাশ সের ও একটি আধ সের ওজনের গোলা নিয়ে উপরে উঠে গেলেন। তারপর সেই টাওয়ারের উপর থেকে দুটোই একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন—দেখা গেল দুটোই একসঙ্গে মাটীতে পড়ল। কিন্তু অধ্যাপকগণ স্বচক্ষে দেখেও তা বিশ্বাস করলেন না যে দুটোই একসঙ্গে পড়ে। গেলিলিও কিন্তু এতে মোটেই দমলেন না, বরঞ্চ শতগুণে তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়ে গেল। তিনি এই বিষয় নিয়ে আরও গবেষণা করতে লাগলেন। নূতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুবর্গও চটে যেতে লাগল। শেষে এমন অবস্থায় এসে পড়লেন যে, চাকরীর মেয়াদ শেষ না হ'তেই তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে বাধ্য হলেন। এই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সংসারের সমস্ত ভার এসে পড়ল গেলিলিওর উপর। তাঁর ভাগ্য ভাল ছিল তাই তিনি ১৫৯২ সালে পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

পদুয়াতে বছর দুই কাজ ক'রতে না করতেই বিজ্ঞান জগতে এক বীভৎস ব্যাপার ঘটে গেল। গিওভানো ব্রুনো নামক একজন ইতালিয়ান প্রচার করলেন যে, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। বাইবেলের বিরোধীতা করার অপরাধে ব্রুনোকে অভিযুক্ত করা হ'ল। বাইবেলের মত হ'ল, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘুরছে। ব্রুনো এর উত্তরে বললেন যে, বাইবেল মানুষকে শিক্ষা দেয় ভগবানকে ভালবাসতে ও ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে—বিজ্ঞানের রহস্য জানাবার জন্য বাইবেল লেখা হয়নি।

তখন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্মের প্রধান পুরোহিত ছিলেন রোমের পোপ। ব্রুনোর বিচার হ'ল। পোপের বিচারে ব্রুনোর ছয় বৎসর জেল হ'ল। কিন্তু জেলে গিয়েও ব্রুনো তাঁর মত বদলালেন না। তারপর নৃশংসতার পালা হ'ল শুরু। পোপ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ধর্মপ্রচারকগণের আদেশে ১৬০০ সালে ব্রুনোকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হ'ল।

ব্রুনোর এই মতবাদ গেলিলিও মনে মনে পোষণ ক'রতেন, কিন্তু তা প্রকাশ ক'রতে পারেননি। পরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পেরেছিলেন। গেলিলিওর এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করা এক বড় মজার ব্যাপার—

হল্যাণ্ডে জ্যানসেন ও লিপারসে নামক দুইজন চশমা বিক্রেতা বাস করত। শুনতে পাওয়া যায় যে, জ্যানসেনের ছেলে-পিলেরা একদিন দুটো আতসী কাঁচ নিয়ে খেলতে খেলতে দেখতে পায় যে, দুখানা কাঁচ একভাবে ধরলে দূরের গির্জার চূড়াটা খুব নিকটে দেখায়—তবে চূড়াটা উল্টো দেখায়। জ্যানসেন ছিল পাকা ব্যবসাদার—একথা জেনে তিনি কাঁচ দুখানাকে নূতন খেলনা বলে দোকানের সামনে কাঁচের আলমারীতে বিক্রীর জন্য রেখে দিলেন। এ সংবাদ পেয়ে গেলিলিওর সে রাত্রিতে ঘুম হ'ল না। পরদিন সকালে উঠেই তিনি সেই চশমা বিক্রেতার কাছে গিয়ে কাচ দুটোকে কিনে নিয়ে এসে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা ক'রতে লেগে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই দুটো কাচের সাহায্যে যখন দূরের গির্জার চূড়া অতি নিকটে দেখায় তখন নিশ্চয়ই বহুদূরের আকাশের নক্ষত্রাবলী নিকটে দেখাবে। তাই যদি হয় তবে তিনি অনায়াসে এই দুটো কাচের সাহায্যে অনন্ত নীল আকাশের কত গূঢ় রহস্যই না উদ্‌ঘাটন ক'রতে পারবেন। মনে অদম্য উৎসাহ ও আশা নিয়ে তিনি কাজে লেগে গেলেন।

বসে বসে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় তিনি তাঁর কাছেই একটা অর্গ্যান বাজাবার নল দেখতে পেয়ে তুলে নিলেন। পরে অনেক পরিশ্রম করে নলের একটি মুখে একখানি উন্নতোদর লেন্স ও অপর মুখে একখানি নতোদর লেন্স বসালেন। বুকে ভবিষ্যতের এক বিরাট আশা নিয়ে সেই নল দিয়ে চারিদিকে দেখলেন। মন তাঁর আনন্দে নেচে উঠল—যা চেয়েছিলেন তা তিনি পেলেন। দেখলেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে শুধু দূরের জিনিস নিকটেই দেখায় না, বড়ও দেখায়। তাঁর এই আবিষ্কারের কথা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা তাঁর মাইনে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন।

এবার গেলিলিও এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধনের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। অনেক পরিশ্রম ক'রে তিনি আর একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন এবং রাতের পর রাত জেগে তিনি অনন্ত নীলাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে মন দিলেন।

প্রথমেই তাঁর নজর পড়ল চন্দ্রের দিকে—তিনি দেখলেন পৃথিবীর মত চন্দ্রেও পাহাড় পর্বত সমতলভূমি সবই আছে। তাঁর এই কথা কেউ বিশ্বাস করলেন না। তিনি এও প্রচার করলেন যে, চন্দ্র যেমন সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে কিরণ বিতরণ করে, তেমনি পৃথিবীও কিরণ বিতরণ করে। তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদে যে কাস্তের মত কলা থাকে তা গেলিলিও বলেন যে, ওটা আর কিছুই না ওটা হল পৃথিবীর কিরণ চাঁদে পড়ে চাঁদে পৃথিবীর জ্যোৎস্নার উদয় হয়ে থাকে। আমরা যেমন চাঁদের কিরণ দেখি তেমনি চন্দ্রলোকের বাসিন্দারাও পৃথিবীর কিরণ দেখে। তাঁর এই সব অদ্ভুত আবিষ্কার প্রচার করাতে পণ্ডিতেরা সবাই খাপ্পা হয়ে উঠলেন। কিন্তু গেলিলিও মোটেই দমলেন না নূতন নূতন আবিষ্কার করেই চললেন। আকাশে রাত্রিকালে অসংখ্য তারা দেখা যায়। কোন কোন তারা আবার একটি দেখায়। গেলিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলেন যে, উহা দুটি তারার সমষ্টি। তারপর এল বৃহস্পতি উপগ্রহ। ১৬১০ সালের ৭ই জানুয়ারী তিনি এই উপগ্রহের বাম দিকে দুটী ও ডান দিকে একটি ছোট তারা দেখতে পেলেন। পরদিন লক্ষ্য করলেন যে, তিনটি তারাই ডান দিকে আছে। ১০ই তারিখে দেখলেন দুটী তারা মাত্র বাম দিকে আছে। পরদিনও ঠিক একইভাবে রইল, শুধু আয়তনে একটু বাড়ল। ১২ই তারিখে আবার সেই প্রথম দিনের মত দেখা গেল। পরদিন আবার চারিটি দেখা গেল। ওকে এর বেশী আর দেখা যায় না। গেলিলিও এবার প্রচার করলেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে যেমন চন্দ্র ঘুরছে তেমনি বৃহস্পতি গ্রহের চারিদিকে আর চারটি উপগ্রহ ঘুরছে। কিন্তু একথা কেউ বিশ্বাস করল না। গেলিলিও তখন সবাইকে যন্ত্রের সাহায্যে দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। কেউ কেউ স্বচক্ষে

দেখেও অস্বীকার করলেন। আবার কেউ কেউ অবিশ্বাসী হবার ভয়ে মোটেই দেখতে আসল না।

এর পর তিনি প্রচার করলেন যে, শুক্র গ্রহও পৃথিবীর মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। শত্রুপক্ষীয়েরা ত তার এই অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ পেয়ে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। এমন কি অনেকে প্রমাণ চাইলেন। গেলিলিও তাদেরকে এনে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখালেন। স্বচক্ষে দেখেও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না—গেলিলিও কিন্তু এতে মোটেই দমলেন না বরং তিনি আবিষ্কারের নেশায় আরও মেতে উঠলেন।

এবার এল শনিগ্রহের পালা। অনেক পরীক্ষার পর তিনি প্রমাণ করলেন যে, ওটা একটি মাত্র তারা নয়, ওর পাশে ছোট ছোট আরও দুটি তারা আছে। এর পর তিনি সূর্য পরীক্ষা করে দেখালেন যে, সূর্যের মধ্যে কতকগুলি দাগ আছে। এ ছাড়া এও লক্ষ্য করলেন যে, উহা সময়ে একটি হয়ে একটি একটি করে অনেকগুলি অংশে ভাগ হয়ে যায়। এটা কেন হয়? এই নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করলেন। গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন যে, একটি দাগে পরিণত হবার পর আস্তে আস্তে অনেক অংশে ভাগ হয়ে আবার আটাশ দিন পর একটিতে পরিণত হয়। এবার তিনি প্রমাণ করলেন যে, আটাশ দিনে সূর্য নিজের মেরুদণ্ডের ওপর একবার ঘুরে আসে।

পদুয়াতে তিনি আঠার বৎসর ধরে অনেক আবিষ্কার করেন। সব সময়েই তাঁর মাথায় আবিষ্কারের কথা ঘুরপাক খেত। তারপর এমন সময় হ'ল যে, তাঁর আর ছাত্রদের পড়াতে ভাল লাগত না। এই সময়ে তাঁর শিষ্য ও বন্ধু টসকানীর গ্রাণ্ড-ডিউক দ্বিতীয় কসমো তাঁকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যান। এই ফ্লোরেন্সে এসে তিনি জীবনে মস্ত বড় ভুল করলেন। কারণ ফ্লোরেন্স তখন পোপের অধীন। ফ্লোরেন্সে এসে প্রথম প্রথম বেশ কাটছিল। সমস্ত ইউরোপে তখন গেলিলিওর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। রাজার কাছেও তাঁর সম্মান কম ছিল না। তার ওপর আর্থিক স্বচ্ছলতাও ছিল বেশ।

এবার সুযোগ বুঝে বিপক্ষীয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে পোপের কাছে লাগাতে শুরু করল। শেষে ১৬১৫ সালে পঞ্চম পল তাঁকে রোমে গিয়ে পোপের কাছে তাঁর মতামত জানাতে আদেশ দিলেন। রোমে গিয়ে গেলিলিও যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর আবিষ্কার লোকদের দেখাতে লাগলেন। পোপের কাছেও একদিন গিয়ে তাঁর সমস্ত আবিষ্কার তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। পোপ কিন্তু কোন অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। গেলিলিও এ দেখে উৎসাহ পেলেন এবং রোমে কিছুকাল থেকে তাঁর মত প্রচার করতে লাগলেন। এবার ধর্মযাজকরা ক্ষেপে উঠলেন এবং পোপকে এর একটা ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। পোপ আদেশ দিলেন যে, এ সকল মত বাইবেলবিরোধী অতএব তিনি যেন আর ভবিষ্যতে এরূপ মতবাদ প্রচার না করেন।

১৬২৩ সালে পুরান পোপ মারা গেলেন ও তাঁর পদে এসে বসলেন গেলিলিওর এক বন্ধু। গেলিলিও ভাবলেন হয়ত বা এবার বিপদ কেটে গেল। ১৬৩২ সালে তাঁর বন্ধু নূতন পোপের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর ক'রে তিনি টলেমী ও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষ সম্বন্ধে কথাবার্তা নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করলেন। এই বইয়ে তিনি কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মত সমস্তই খণ্ডন করে দিয়েছিলেন। এই না দেখে সবাই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। এবার আর তিনি রেহাই পেলেন না। বিচারের জন্য তিনি রোমে প্রেরিত হলেন। তখন তাঁর বয়স সত্তর বৎসর। বন্ধুবান্ধবরা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলেন না। রোমেতে তাঁর বাড়ির বাইরে বের হবার হুকুম ছিল না। জুন মাসে তাঁর বিচার আরম্ভ হল। এই সময়ে ইনকুইজিশন বিচারালয়ে যে কি অমানুষিক নির্যাতন হত তা অবর্ণনীয়। এই বিচারালয়ে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই সময়ে তাঁর মেয়ে তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে থাকে তাঁকে বশ্যতা স্বীকার করতে। অবিশ্রান্ত মেয়ের চোখের জল দেখে তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি বললেন, "আপনারা আমায় যা বলবেন আমি তাতেই রাজী আছি।" বুকে যে কি দারুণ ব্যাথা নিয়ে তিনি বলেছিলেন সে তিনি জানেন। বিচারকগণ তখন নিম্নলিখিত আদেশ দিলেন—

(ক) গেলিলিও পৃথিবী সম্বন্ধে যা প্রচার করেছেন তা নিজেকেই আবার ভুল বলে প্রচার করতে হবে।

(খ) যাবজ্জীবন কাজে না হোক নামে অনন্ত কারারুদ্ধ থাকতে হ'বে।

(গ) সাতটি অনুতাপসূচক প্রার্থনা সংগীত প্রতি সপ্তাহে আবৃত্তি করতে হ'বে।

গেলিলিও বাইবেল স্পর্শ ক'রে বললেন যে, তিনি এতদিন পৃথিবী সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সবই মিথ্যা।

রোমে কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকার পর গেলিলিও সীনা নামক স্থানে প্রেরিত হন। এখানে কিছুকাল থাকার পর তিনি পল্লীভবনে গিয়ে বাস করবার অনুমতি পান। তাঁর শরীর অত্যন্ত ভেঙে পড়ে; এই সময়ে তাঁর কন্যাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর শরীরের এই অবস্থাতেই তাঁর কন্যা মারা যায়। এত দুঃখ, এত লজ্জা পেয়েও গেলিলিও চুপ ক'রে বসে থাকেননি। জীবনের শেষকাল পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের উপাসনায় কাল কাটিয়েছেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গতিশীল দ্রব্যের গতি সম্বন্ধীয় নিয়মত্রয় সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে লিখে গেছেন। তিনিই হলেন গতি বিজ্ঞানের জন্মদাতা।

প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই এরকম বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। গেলিলিওর যে এত নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তাতে আর কি—এর ওপরে শেষ বয়সে আবার বিধাতা তাঁর চক্ষুরত্নও কেড়ে নিয়েছিলেন। এই অন্ধ অবস্থায় তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে সব সময়ে সেবা শুশ্রূষা করতেন। এই সময়ে কবি মিল্টন ইটালি ভ্রমণ ক'রতে এসে গেলিলিওর সঙ্গে দেখা ক'রে যান। এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে গেলিলিও ১৬৪২ সালে আঠাত্তর বৎসর বয়সে অমরালোকে যাত্রা করেন।

রবিবার

মালবিকা রায়

আজ রবিবার। সকাল বেলা চোখ মেলিতেই চোখ পড়িল দেওয়ালে বিলম্বিত ক্যালেণ্ডারের দিকে—লাল হরফে বড় বড় করিয়া লেখা Sun-day.

আঃ! কোথা হইতে রাজ্যের আরাম এক নিমেষে নামিয়া আসিল। আপনা হইতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। এই লাল হরফগুলি কি সুন্দর! লালের মত এত প্রিয় বোধ হয় আর আমাদের কিছুই নাই। মনে পড়িল ছেলেবেলায় লাল খেলনা কত ভালবাসিতাম, তারপর ভালবাসিতাম লাল পোষাক, তারপর যৌবনে প্রেয়সীর রক্তিম অধরের মত প্রিয় আর কিছুই ছিল না। এই প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় আসিয়া এখন ভালবাসি ঐ ক্যালেণ্ডারের লাল হরফগুলি—প্রাণের রঙে রাঙা যেন অগ্নিশিখা। কালো কালো সারবন্দী ঐ সপ্তাহের কর্মকোলাহলের কালিমাকে ভস্মীভূত করিয়া জ্বালে নূতন দীপ, আনে নূতন আনন্দ, দেয় অনন্ত অবসর।

শীতের সকালে দেহ-তপ্ত লেপের মধ্যে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ঐ চিন্তাই করিতেছিলাম। শীতের সকালে এমনভাবে বিছানায় শুইয়া অলস চিন্তায় কাল যাপন না করিলে রবিবারকে ভালোভাবে উপভোগ করা যায় না। অন্য দিন এ সুযোগ মেলে না। রোদ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী তাড়া দেন, 'ওঠো, ওঠো, অফিস যেতে হবে না?' হবে বই কি! আমি তাহা বুঝি, গৃহিণী অপেক্ষা ভালো করিয়াই বুঝি, কিন্তু নিদ্রালস নয়ন নিদ্রা ছাড়িতে চায় না যে।

গৃহিণীর তাড়া দেওয়ার কারণ থাকে। আমি স্বভাবত একটু ঢিলা প্রকৃতির লোক। অন্য লোক যে কাজ দশ মিনিটে করে আমি সে কাজ আধ ঘণ্টার আগে করিয়া উঠিতে পারি না। সুতরাং শীতের স্বল্পবেলায় আমার দাড়ী কামাইতে, স্নান করিতে খাইতে বাজার যাইতে ১০টা বাজিয়া যায়। অর্ধেক দিন খাওয়া প্রায় ভালো করিয়া হইয়া ওঠে না। ইহাতে গৃহিণীর আফশোষের সীমা থাকে না। সকাল হইতে তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

শীতের সকালে দাড়ী কামানো ত একটি পর্ব। গৃহিণী অবশ্য গরম জল তৈয়ারী করিয়া দাড়ী কামাইবার সরঞ্জাম গুছাইয়া তবে আমাকে ঘুম হইতে উঠান। কিন্তু আমার হইয়া তিনি ত আর দাড়ী কামাইতে পারেন না। সুতরাং সমস্ত কষ্টটা আমাকেই সহ্য করিতে হয়।

তারপর আসে চা ও জলখাবার। আমার গৃহিণী সত্যই সুগৃহিণী। সকালে এক পেট খাইলে ভাত খাওয়ার কমতি পড়িবে বলিয়া তাঁহার বরাদ্দ মত আমার সকালে এক কাপ চা ও টোস্ট পাঁউরুটি বরাদ্দ আছে এবং এই স্বল্প খাদ্যও যাহাতে সুপরিপাক হইয়া যায়, তাহার জন্য ব্যবস্থা আছে চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাজার করা। প্রাতঃভ্রমণ সকলেরই প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া প্রৌঢ়দের পক্ষে। তাহা ছাড়া সংসারের যাহাতে দু'পয়সা অপব্যয় না হয় তাহা ত লক্ষ্য করা উচিত। বলিতে দ্বিধা নাই গৃহিণীর এই সুব্যবস্থায় পয়সার সাশ্রয় ত হয়ই, উপরন্তু এই বয়সেও ডায়াবিটিস, ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতি ধনীজনোচিত সুলভ রোগ আমাকে করতলগত করিতে পারে নাই।

কিন্তু আজকের জন্য ব্যবস্থা সবই আলাদা। আজ ভোর না হইতে হইতে গৃহিণী উঠিবার জন্য তাড়া দেন না। বরং শুনিতে পাইতেছি আমার ছোট ছেলেটি যে এতক্ষণ সম্মুখের বারান্দায় কলের ইঞ্জিন চালাইয়া মুখে হুস হুস শব্দ করিয়া চতুর্দিক মুখরিত করিতেছিল তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, "বদমায়েস ছেলে, সকাল থেকেই খেলা! মানুষটা সারা সপ্তাহ ধরে খাটে, আজকের দিনে একটু বিশ্রাম করবে সেদিকে কারো হুঁস নেই, যা পড়গে যা।"

ছেলেটি মুখ কাঁচু মাচু করিয়া উত্তর দিল, "আজ যে রবিবার মা।"

"রবিবার ত মাথা কিনেছেন, যা নীচে খেলগে যা।" গৃহিণী আবার পড়িলেন আমার মেজো ছেলেকে লইয়া। সে পাশের ঘরে গ্রামোফোনের রেকর্ড চাপাইয়াছে। গৃহিণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, "একটু পরে কি রেকর্ড বাজালে চলে না? বাপ যে পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে সেদিকে খেয়াল আছে?"

রেকর্ড বন্ধ হইয়া গেলো। গৃহিণীর সুউচ্চ কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম; আমার বড় মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হ্যাঁরে টুকু, সকাল থেকে তোর হাতে নভেল ছাড়া আর কিছু উঠবে না, না? অন্য দিন ত ইস্কুল যাবার তাড়া শুনতে পাই। আজ কি করছো? রবিবার দিন মানুষে দুটো ঘরকন্নার কাজ করে, মাকে দুটো সাহায্য করে, বাপ আজ ঘরে থাকবে দুটো ভালো মন্দ রেঁধে খাওয়ায়—তা এ মেয়ের সে সব নেই, কি যে হবে শ্বশুরবাড়ি গেলে"—বকিতে বকিতে গৃহিণী নীচে নামিয়া গেলেন।

নীচ হইতে গলা শুনিলাম—"আচ্ছা, ঠাকুর, তাড়াতাড়ি তোমাকে ঘিয়ের কড়া চাপাতে কে বলেছে বল ত? মানুষ ঘুমুচ্ছে, ঘুম থেকে উঠুক তারপর গরম গরম ভেজে দেব, তা নয়, তোমাদের সব বেগার সাধা কাজ—" ভাবিলাম না আর শুইয়া থাকা উচিত নয়। আমার ঘুম না ভাঙার জন্য গৃহিণী এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেছে। বেলাও অবশ্য কম হয় নাই। বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

মুখ হাত ধুইয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম এক হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ ও অন্য হাতে খাবারের প্লেট লইয়া গৃহিণী কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "ছেলেদের জ্বালায় ঘুম ভেঙে গেলো, না?"

বাধা দিয়া বলিলাম, "না, না, বেশ ঘুমিয়েছি। তা ছাড়া বয়স হচ্ছে, কত আর ঘুম হবে।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "আহা, আগে ত রবিবারে দশটার আগে ঘুমই ভাঙতো না।"

কথাটা সত্য। একটা উত্তর মুখে আসিল। কিন্তু রৌদ্র-প্রজ্জ্বলিত দিবসে চল্লিশের শেষ কোঠায় নামিয়া এ উত্তর আর মুখে শোভা পায় না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গৃহিণী যে সময়ের উল্লেখ করিলেন সে সময়ে এই রবিবার দিনটিকে শুধু রবিবার দিনটিতেই উপভোগ করিতাম না, শনিবার বিকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইত এবং রবিবারকে মনে করাইবার জন্য ক্যালেণ্ডারের লাল হরফেরও প্রয়োজন ছিল না। অন্তরের সত্তায় সত্তায় এই দিনটির আগমনী আমি শুনিতে পাইতাম। শনিবারের সমস্ত রাত গৃহিণীর সহিত প্রায় জাগিয়াই কাটিত। রবিবার দশটা পর্যন্ত তাই ঘুমাইয়া কাটাইতে হইত। সে সব দিন গত হইয়াছে। এখন রাত্রি ৯টার পর আর জাগিয়া থাকিতে পারি না, থাকিও না এবং গৃহিণী থাকিতে দেনও না।

গৃহিণীর উত্তর শুনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার মন অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। খাবারের প্লেট নামাইয়া তিনি বলিলেন, "খেয়ে নাও।"

আমি খাবারের দিকে চাহিলাম। প্লেটে দুইখানি গরম ভাজা

টাটকা সিঙাড়া, দুইটি রসগোল্লা ও গৃহিণীর স্বহস্তে প্রস্তুত চন্দ্রপুলী। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কিছু নেই?"

গৃহিণী বলিলেন, "অন্য দিন ত কিছু দিই না, ভাত খেতে পারবে না বলে। আজ ত সব বেলায় খাওয়া—"

"তাই সব আমায় খেতে হবে, না?" আমি হাসিতে হাসিতে আরম্ভ করিলাম।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালে বেরোবে নাকি?"

অলসভাবে উত্তর করিলাম, "না, কোথায় আর বেরোবো? তার চেয়ে ঘরে বসে বসে রেডিও শুনি। টুকুকে ডাকো। না, কি প্রোগ্রাম আছে শুনি। টুকুর ত সব নখদর্পণে।"

গৃহিণী বললেন, "টুকু নীচে তরকারী কুটছে। আজকের দিনে তোমাকে ফরমাস করতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু ছেলেগুলোর ত একেবারে টিকি দেখবার উপায় নেই আজ। কি করবো, তোমাকে একবার বাজার যেতে হবে।"

রবিবারে আমাকে বাজার যাইতে হয় না। বিস্মিতভাবে বলিলাম, "কেন?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "তোমার কিছুই মনে থাকে না আজ যে রবিবার।"

আজ যে রবিবার তাহা আমি সকাল হইতেই অনুভব করিতেছি, তথাপি গৃহিণীর তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "রবিবার ত কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে? আজ যে টুকুকে মাণিকতলা থেকে দেখতে আসবে। মেয়ে পুরুষে ৬।৭ জন আসবে খবর পাঠিয়েছে।"

"দেখতে আসবে? কেন?"

"বা-রে, ছেলের বিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত যে মেয়েকে ঘরের বউ করে নিয়ে যাবে তার দোষ গুণ দেখে নেবে না?"

"মানুষে সারা জীবন একজনের সঙ্গে ঘর করে তার দোষ-গুণ বুঝতে পারে না, পাঁচ মিনিটের ভিতর তারা মেয়ে দেখে দোষ-গুণ বুঝে নিয়ে যাবে, এমন কি তারা পীর পয়গম্বর এসেছে?"

গৃহিণী রাগ করিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কে তর্কে পারবে বল? চিরদিন ত আমাদের সমাজে এই হয়ে আসছে। তোমার মত আজগুবি মত ত কারো নেই। এখন বাজে কথা রেখে যা ফর্দ করে দিচ্ছি দুখীকে সঙ্গে নিয়ে কিনে দাও। জিনিস যেন বেশ ভালো হয়।"

আমি আর উত্তর দিলাম না। কথায় কথা বাড়ে জানি। এ সব বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রায় কাহারো মতের মিল হয় না। আগেকার দিনের কথা মনে পড়িল। এ বিষয়ে একবার তর্ক উঠিলে আর সহজে থামিতে দিতাম না। পণ প্রথা এবং কন্যা দেখার আমি চিরকাল বিরুদ্ধে ছিলাম। এ লইয়া অনেক হাসি ঠাট্টা ও অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, চুল খুলাইয়া, হাঁটাইয়া, বকাইয়া, দাঁড় করাইয়া যে কন্যাকে পরীক্ষা করিব, তাহাকে অপছন্দ হইয়াছে বলিয়া অপমানের চূড়ান্ত করিয়া আসিইবা কি করিয়া! যাহাকে বিবাহ করিবই তাহাকে এত ঘটা করিয়া দেখিবারই বা প্রয়োজন কি?"

গৃহিণীকে আমি না দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছি এবং করিয়া ঠকিও নাই। কিন্তু আজ টুকুকে কনে দেখাইবার প্রস্তাবে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিলেও আমি সজোরে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলাম না। যে জোরে সকল বস্তুর সপক্ষে এবং বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতে পারিতাম আজ যেন সে জিনিসের একান্ত অভাব অনুভব করিলাম। আজ যেন মনে হইল আমার বয়স হইয়াছে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। একাকী কোন জিনিসের অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিবার আর আমার ক্ষমতা নাই; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ইহাও অনুভব করিলাম যে, পঁচিশ বছর বয়সে যে প্রস্তাব শুনিলে মদনভস্ম করিবার মত তৃতীয় নয়ন উন্মীলন করিতাম, পঁয়তাল্লিশ বছর পার হইয়া আজ চুপ করিয়া বসিয়া ত আছিই, রাগও ত সেইরূপ প্রচণ্ড হয় নাই। বয়সের ধর্ম নিশ্চয়, সব বয়সেরই ধর্ম আছে।

চাকরকে সঙ্গে লইয়া ফর্দ হাতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ভাবী বৈবাহিকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গৃহিণী নানাবিধ আয়োজনের সংকল্প করিয়া প্রকাণ্ড ফর্দ করিয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত কিছু গুছাইয়া কিনিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম গৃহিণী তখনো রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত। বড় মেয়ে টুকু যথাসম্ভব মাকে সাহায্য করিয়া সন্তুষ্ট করিতে আরো ব্যস্ত। চাকর দাসীদের ত কথাই নাই। একে আজ রবিবার তাহার উপর জনসমাগম হইবে। সুতরাং তাহাদের একেবারেই অবসর নাই।

উপরে আসিয়া দেখিলাম মেজো ছেলে লালুর রেকর্ড বাজানো তখনো বন্ধ হয় নাই। লালুর গানের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক। সিনেমার কোন গানকে বাদ দেয় না। নিত্য নূতন রেকর্ড কিনিতে এবং সিনেমা দেখিতে তাহার জুড়িদার কেহ নাই। রবিবার দিন এক একটা রেকর্ড ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজাইয়া তাহার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিয়া সে একটি গান শেখে। এবং সারা সপ্তাহ সেই গান গাহিয়া আমাদের কান ঝালাপালা করে।

সেজো ছেলে বুকুর ঝোঁক ছবি আঁকায়। তাহার ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম সে একটি ক্যালেণ্ডারের ছবির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পেন্সিল স্কেচ করিয়া একটি দিস্তা সাদা কাগজ প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

বড় ছেলে গুলুর কোন পাত্তা পাইলাম না। সে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। নিত্য নূতন সাহিত্যসভার অধিবেশন, পল্লী সংস্কার সমিতির আয়োজন তাহাদের লাগিয়াই আছে। রবিবার দিন এই সব মাত্রা আরো বাড়ে। নূতন যুগের নূতন মানুষ গুলো। তাহার সহিত আমরা তাল রাখিয়া উঠিতে পারিব কেন!

নিজের ঘরের আরাম কেদারায় চোখ বন্ধ করিয়া শরীর এলাইয়া দিলাম। নরম গদীর স্পর্শে শরীর ভারি আরাম পাইল। পিছনের ছাদে আমার ছোট মেয়ে ও পাড়ার আরো কয়েকটি মেয়ে মিলিয়া গৃহস্থালী পাতিয়াছে। চতুর্দিকে ছোট ছোট হাঁড়িকুড়ি পুতুলে পরিপূর্ণ। আজ তাহাদের পুতুলের বিবাহ। তাহারই আয়োজন করিতে এই ছোট ছোট গৃহিণীরা হিম সিম খাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে কলহ বিবাদের কোলাহলও কানে আসিতেছে।

তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া ভারি হাসি পাইল। মেয়েদের অন্তরের চিরন্তন কামনা বালিকা বয়স হইতে এমনি করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। সম্মুখের বড় বাড়িতে ঠিক ইহারই প্রতিচ্ছবি দেখিলাম। তাহাদের অবশ্য পুতুলের বিয়ে নয়। সত্যকার মানুষের বিয়ে এবং বিয়ে হইতে দুই চারি দিন দেরিও আছে। চারিটি বধূ এবং পাঁচ ছয়টি বড় মেয়ে ঘন ঘন উপর হইতে নীচে এবং নীচে হইতে উপরে ছুটাছুটি করিতেছে। একটি বধূ একটি মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ দিকি ভাই, আজ আবার রবিবার, পুরুষের দল সব ঘরে বসে থাকবে, নইলে আজই জামাগুলো সব সেলাই হয়ে যেতো।"

চতুর্দিকের কর্মব্যস্ততা যেন পাল্লা দিয়া আজই জাগিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম ইহারা রবিবার লইয়া কি করিবে। রবিবার ত ইহাদের জীবনকে অবসর দেয় না কর্মমুখর করে, যদিও অতীতের রবিবার আমার এমনি কর্মমুখর হইয়াই কাটিয়াছে, তথাপি আজ মনে হইল ঘরের ভিতর নরম আরাম কেদারায় শরীর এলাইয়া না শুইয়া থাকিতে পাইলে আবার রবিবার! কাজ নাই, কর্ম নাই, আহ্বান নাই, অচঞ্চল অখণ্ড অবসর! ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে ১২টা বাজিয়া গেলো। পায়ের উপর পা দিয়া এমনি করিয়া আমি বহুক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারি। কেহ আমাকে বাধা দিবে না,

কেহ আহ্বান করিবে না। অবসরকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে দিবে। রবিবার ত আমারই!

এই সব অলস চিন্তায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেলো। গৃহিণী আহ্বান করিলেন, "চান করে নাও, বেলা হয়েছে।" একবার রৌদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম তারপর নিজের দিকে! ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, "কোথায় বেলা হইয়াছে, জীবনে না গগনে?" কিন্তু গৃহিণীর কর্মব্যস্ত মুখের দিকে চাহিয়া পরিহাসের প্রলোভন ত্যাগ করিলাম।

খাইতে বসিয়া চকিতে একবার গৃহিণীর দেখা পাইলাম, আমার থালার দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "ও বেলা আবার পাঁচ রকম আয়োজন করতে হবে বলে এ বেলা বিশেষ কিছু করিনি।"

হাসিয়া উত্তর করিলাম, "এই যদি তোমার বিশেষ কিছু না হয় তাহলে তোমার বিশেষ কিছু কি তা দেখবার জন্য আমাকে এখন থেকেই পেট খালি রাখতে হবে দেখছি।"

গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন। মেজো মেয়ে নীলু মায়ের আঁচল ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। একবার আড়চোখে মায়ের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "বাবা, আজ সন্ধ্যেবেলা সিনেমায় নিয়ে যাবে?"

গৃহিণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, "হাঁ, ওঁর তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। তোমার চৌকিদারী করতে এই সন্ধ্যেবেলা ছুটির দিনটিতে তোমাকে নিয়ে সিনেমা যাবে! একটা দিন যদি তোরা মানুষকে রেহাই দিবি। গুলুকে বল না সে নিয়ে যায় ত যাস।"

নীলু পালাইয়া গেলো। আমি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গৃহিণীর বিবেচনা শক্তিকে প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। ছুটির দিনটা তিনি আমাকে সর্বতোভাবেই ছুটি দিতে চান। সংসারের সমস্ত কর্তব্য, সমস্ত কোলাহলের নিকট হইতে আজ আমার পরিপূর্ণ ছুটী।

বিকেলবেলা যখন গৃহিণীর ডাকে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলাম তখন বেলা অনেকটাই গড়াইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী বলিলেন, "কাপড় জামা বদলে নাও, তারা এসে পড়লো বলে।"

"কারা!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"না, তোমাকে নিয়ে আর পারবার উপায় নেই, কারা আবার টুকুকে দেখতে যারা আসবে, তারা।"

এতক্ষণে মনে পড়িল, সত্যই আজকাল কথা এত ভুলিয়া যাই। আজ সন্ধ্যেবেলা টুকুকে দেখিতে আসিবার কথা আছে বটে। আমি কাপড় জামা পরিয়া প্রস্তুত হইলাম।

একটু পরেই নীচে একটি ট্যাক্সি থামিবার শব্দ শোনা গেলো। লালু ডাকিল, "বাবা, নীচে এসো।" আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। গৃহিণী মেয়েদের লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। যথারীতি টুকুকে দেখান হইল। ব্রীড়ায় সংকোচে অবনতমুখী টুকুকে যেন একটি জড়পিণ্ডের মত বোধ হইতেছিল। কে বলিবে সে আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মেয়ে। আমি বাপ, কিন্তু আমারই চোখে টুকুর এ মূর্তি অত্যন্ত বিরক্তিকর লাগিতেছিল। মনে হইল টুকুকে স্বাভাবিক বেশে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর লাগে। কিন্তু বরকর্তাদের পছন্দ হইল। তাঁহারা বার বার টুকুর রূপ গুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সাড়ম্বরে জলযোগের পর্ব চুকিল। গৃহিণী আমাকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপরের বড় ঘরে লাল গালিচা পাতিয়া গৃহিণী কুটুম্ব বাড়ির একটি ভদ্রমহিলাকে লইয়া বসিয়া আছেন। আমি ঘরে না ঢুকিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভেতরে এসো। বরের মা আমার পুরনো বন্ধু। ভাগ্যিস পরিচয় বেরিয়ে পড়লো।"

গৃহিণীর অনুরোধে ঘরে প্রবেশ করিলাম। গৃহিণীর সমবয়সী একটি মহিলা উঠিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন। প্রতি নমস্কার করিতে গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম। সে যে আমার একান্ত পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কে ইহা স্মরণ করিতে অনেকটা সময় কাটিয়া গেলো।

বিস্মৃতির রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেলো। চিনিতে পারিলাম, এ যে দীপ্তি! আমার যৌবনের দীপ্তিশিখা! চমকাইয়া উঠিলাম। যে দীপ্তিকে কেন্দ্র করিয়া আমার যৌবনের সমস্ত প্রেম সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা একদিন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল এ সেই দীপ্তি! আজ আমার ভাবী বৈবাহিকার পদ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে।

কিন্তু দীপ্তির সেই দৃপ্ততা কোথায়! যাহার দ্বারা সে একদিন আমাকে জয় করিয়াছিল! দীপ্তির মুখের দিকে চাহিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। বিস্মিতভাবে চিন্তা করিলাম, দীর্ঘদিন পরে দীপ্তির এত নিকটে বসিয়াও অতীতের স্মৃতিপুঞ্জ বুকের মধ্যে ফেনাইয়া উঠিল না কেন? দুর্নিবার আবেগ জাগিল কই! অথচ একদিন দীপ্তি আমার সমস্ত আবেগ, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত সুখের উৎস ছিল।

দীপ্তি আমার দিকে চাহিল। চিনিতে পারিয়াছে কি না বুঝিতে পারিলাম না। চোখের মধ্যে কোন পরিচয়ের দীপ্তির সন্ধান পাইলাম না। স্বাভাবিকভাবে দীপ্তি বলিল, "রমা আমার ছেলে-বেলার বন্ধু। রমার মেয়ের সঙ্গে খোকার বিয়ে হবে জানলে কত আগেই মেয়ে দেখে আশীর্বাদ করে যেতাম।" আমি বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলাম। প্রয়োজনীয় ভদ্রতাসূচক কথা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকালের জলযোগ অত্যন্ত গুরু হইয়াছে বলিয়া রাত্রের খাবার করিতে নিষেধ করিলাম। বিছানায় শুইয়া অনেক পুরানো কথা মনে পড়িল। দীপ্তির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হইতে শেষ বিদায় পর্যন্ত। কিন্তু অবাক হইয়া দেখিলাম, পূর্বে স্মৃতির উন্মাদনায় বুকের মধ্যে কোন আলোড়ন উঠিল না। সমস্ত যেন আজ নিশ্চল, স্তব্ধ।

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "রাত হচ্ছে, ঘুমোও। আজ রবিবার। কাল থেকে আবার তাড়াহুড়ো আরম্ভ হবে। ছেলেরা সব এর মধ্যেই নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে।"

আজ রবিবার! শুধু আজ কেন, সমস্ত দিনই আমার এবার হইতে অনন্ত রবিবার। সমস্ত কর্মমুখরতা, সমস্ত আন্দোলন সমস্ত আলোড়ন হইতে আমার মুক্তি, আমার অবসর, আমার ছুটী! ছুটী! ছুটী! সমস্ত কিছু হইতেই আমার ছুটী। তা না হইলে দীপ্তিকে দেখিয়া এতটুকু মত্ততা জাগিল না কেন! সমস্ত মত্ততা যে আমার নিকট হইতে ছুটী লইয়াছে। আজ সকলের রবিবার।

ক্যালেণ্ডারের লাল হরফ রক্তচক্ষু করিয়া আমাকে জানাইয়া দিতেছে আজ রবিবার। তাহার সেই উদ্ধত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজেকে গোপন করিবার জন্য আমি বাতি নিভাইয়া দিলাম। অন্ধকারেও চোখের সামনে ক্যালেণ্ডারের হরফগুলি যেন তেমনি করিয়াই জ্বলিতে লাগিল—রবিবার, রবিবার।

তাজমহলের অভিশাপ

সুবোধ বসু

বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল; কীর্তিমানের কাছে এগিয়ে যেতে এমনি ভয় করে। দূর থেকে যার জন্য শ্রদ্ধা জমে' উঠেচে গভীর হয়ে, কাছে এলে পাছে সে হতাশ করে, সে ভয় কম নয়। আর্টিস্ট্ মানুষ আমি, চাক্ষুষ না দেখলেও বহু স্থাপত্যভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় আছে। তাজমহলকে ছবিতে এতটা দেখেচি যে, এতদূর আসার সত্যই কোনও সার্থকতা আছে কি না সে বিষয়ে কখনও কখনও সন্দেহ হয়েচে। কত কবির কাব্যে তাজ কীর্তিত হয়েচে, কত চিত্রীর রঙে তা বিচিত্র হয়ে উঠেচে, কত বিভিন্ন চিন্তাবীর একে কলাশাস্ত্র-নিঃসম্পর্ক কত বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে' ছেড়েছেন। একে আমি নতুন করে দেখবো কি? বরঞ্চ যাকে বেষ্টন করে' মন এত অজস্র স্বপন রচনা করেছে, এ বাস্তব-সান্নিধ্য হয়ত তার গৌরব লাঘব করবে। ফতেপুর-সিক্রির পরিত্যক্ত রাজধানীর মুঘল-প্রাসাদের অলিন্দ ও চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে কতবার ভেবেচি, মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতির সঙ্গে এই তো যথেষ্ট চাক্ষুষ পরিচয় হলো; বুলান্দ দরওয়াজা এবং শেখ সিলিমচিস্তির মর্মর সমাধি মন্দির, দেওয়ানি খাস্ এবং বেগমদের ঈদের চাঁদ দেখবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে, দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে ধূ ধূ করা প্রান্তরের দিকে চেয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠার এই স্বপ্নময় পর্বটাকে অনায়াসেই কল্পনা করে নিয়েচি; দুর্গের কঙ্কালকে অবলম্বন করে' ঐশ্বর্য-ঝলসিত আড়ম্বরপূর্ণ বাদশাহী যুগের স্বপন দেখে নিয়েচি। সুতরাং বলতে পারব না, আগ্রা আসাটা ব্যর্থ হয়েছে। তাজ সুদূরের স্বপ্নই থেকে যাক্—Yarrow unvisited!

আগ্রার প্রাণান্তকর গরমের মধ্যে দুদিন কেটে গেল। দেখলুম আগ্রা ফোর্ট—হাওয়াই মহল, যুঁই মহল আর শীষ মহল, দেখলুম নেয়ামৎউদ্দৌল্লার শ্বেতপাথরের সমাধিসৌধ; টাঙ্গার উৎক্ষিপ্ত হ'তে হ'তে ক' মাইল দূরে সম্রাট আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রা দেখে এলুম। রোজই মন আনচান করে তাজ দেখবার জন্যে; চাঞ্চল্য চেপে রাখি, তাজ দেখব, কি না-দেখেই চলে যাব, সিদ্ধান্ত করতে পারিনে।

অবশেষে আর না পেরে এক অপরাহ্নে টাঙ্গা ডেকে চেপে বসলুম। প্রকৃত কথা বলতে গেলে, স্থাপত্য দেখবার জন্যই ভ্রমণে বের হইনি, বেরিয়েছি, বিচ্ছেদ-কাতর মনকে সান্ত্বনা দিয়ে সুস্থ করে তুলবার জন্য। অতসীর মৃত্যু হয়েছে প্রায় ছ' মাস। শোকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অসহায় মন বললে, 'অতসীকে আমি চিরস্মরণীয় করে' রাখব।' হাতে তুলে নিলুম তুলি, মন স্মৃতির ভান্ডারে যাত্রা করল, চোখে ঘনিয়ে উঠল আবেশ। পূর্ণ ছ' মাস কাল তুলি দিয়ে রঙ বুলোলাম মনকে আঁকবার প্রচেষ্টায়।

অতসীর সেই ছবি যখন চিত্রপ্রদর্শনীতে টাঙান হ'ল তখন কারুরই সন্দেহ রইল না যে, সেটা সত্যই বিস্ময়কর রকম সজীব প্রতিকৃতি; অদ্ভুত আনন্দ এবং মমতায় করুণ দুটি চোখ যেন কথা বলচে। নিজেই প্রায় চমকে উঠলুম। সে পোর্ট্রেটের সমাদর হ'তে দেরি হলো না; বিচারে তা বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে স্থিরীকৃত হলো। লাট-পত্নী একটা সোনার পদক শিল্পীর গলায় দুলিয়ে দিলেন; তুমুল করতালি-ধ্বনি হলো। আমি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অকিঞ্চিৎকর ছিল আমার আয়োজন। শুধু একটা তুলি, একটু রঙ, আর প্রিয়া-বিরহকাতর, হারাতে-অনিচ্ছুক মন। সম্রাট সাজাহানের কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। মন যাকে হারাতে অস্বীকার করে, তাকে হারিয়ে সম্রাট-কবি কি করেছিলেন, কতটা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, মৃত্যুকে কি পরিমাণ পরাজিত করতে পেরেছিলেন, সেটা না জেনে কি করে' ফিরে যাব? তাজমহলের মধ্যে আমি স্থাপত্য দেখতে চাইনি, চেয়েছি বিরহী সম্রাটকে দেখতে। দুদিনের অন্তর্দ্বন্দ্বের পর তাই তাজ দেখা স্থির করলুম।

ক্ষীণ যমুনার পরপারে বনরেখার উপর নিস্তেজ একটা তাম্রপাত্রের মতো সূর্য অস্ত যাবার উপক্রম করেচে, পশ্চিমের আকাশ গাঢ় বর্ণসম্পাতে রাঙা। এই সন্ধ্যারাগরক্ত পটভূমিকায় মর্মরময় তাজ আমার দুই মুগ্ধ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো। চারিদিকের উঁচু মিনারগুলির মধ্যখানে তাজের শাদা গম্বুজটায় অস্তরাগের আভা প্রতিফলিত হয়ে তাকে দেখাচ্ছে বিরাট এক পদ্মকলির মতো; এই কলি আকাশের গায়ে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠবে। আঙুরি-বাগের পথ দিয়ে আমার দৃষ্টি তীর্থযাত্রা করলে এই তাজের দিকে। তাজের বাগানে বেড়াতে আসা নিরাসক্ত জনতা প্রথমে আমার চোখেই পড়ল না। ধাপের পর ধাপ অবলীলাক্রমে বেয়ে নিচে নেমে এসে সুদূর তাজের দিকে এগিয়ে চললুম। চাঁপার গন্ধে চারিদিকে ভরে গিয়েচে।

জুতো খুলতে হবে? বেশ। তুমি রেখে দেবে? দাও। গুগ্গুলের গন্ধ পাচ্ছি। প্রকৃত কবরটা নিচে; সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। তার আগে উপরের এই কবরটাকেই একটু প্রদক্ষিণ করে নিই।

নিচে নেমে এলাম। বেঁচে আছে নাকি মমতাজ! কী রহস্যমণ্ডিত সমাধি-মন্দিরের এই অভ্যন্তর! কোনও অজ্ঞাত অন্ধকার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বলবে না তো, 'কি চাই? মৃত্যুর নীরবতাকেও তোমরা সম্মান করবে না?'

খাদিম আলো নিয়ে এসেছে; রহস্য নিকটসান্নিধ্য থেকে অপসৃত হয়েছে। অপরাধীর মতো উপরে উঠে এলুম। খাদিমদের এবং জুতা-পালকে বক্‌শিষে সন্তুষ্ট করে তাজের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে সামান্য দূরে একটা ছাতার মত গাছের তলায় বেঞ্চিটায় গিয়ে বসে পড়লুম।

বিশ হাজার শিল্পীর বাইশ বছরের কাজ সমাপ্ত হয়েচে। সম্রাট শাজাহানের শোকসন্তপ্ত চিত্ত যে স্মরণসৌধ কল্পনা করেছিলেন, তা বাস্তব আকার পেয়েচে। আজ তাজের দ্বারোন্মোচন উৎসব। প্রভাত হতেই নহবৎ বাজনা শুরু হয়েচে। তাজের উদ্যানে দরবারের জন্য কিংখাবের সামিয়ানা উঠেচে। ইরানী গালিচায় সবুজ ঘাস ঢাকা পড়েচে। ধূপদান, আতরদান, গোলাপের তোড়া, হাওয়া করবার চামর, সরবত আর শিরাজী বিতরণ করবার স্ফটিকপাত্র দেদার আসচে। লোকের হৈ চৈ চঞ্চলতার অন্ত নেই।

ওদিকে তাজের কারিগরেরা ঘষে মেজে তাজকে উজ্জ্বল করে' তুলচে। বড় গম্বুজটায় দুলিয়ে দিয়েচে নব নীপের মালা।

অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই নিমন্ত্রিতেরা হাজির হ'তে লাগলেন। কত নৃপতি-সামন্ত, কত আমীর-ওমরাহ, কত মওলানা-মোয়াজ্জিন, কত সেনাপতি-মনসবদার, কত কবি, গায়ক, বাদক, কত বিচিত্র লোকের ভিড়। কত বিচিত্র উষ্ণীষ কত বিভিন্ন বেশভূষা। প্রাচীরের বাইরে সারা রাজধানীর লোক ভেঙে পড়েছে; বোরখা-ঢাকা কত নাগরিকা জালে-ঢাকা চোখের জানলা দুটির সাহায্যে এই বিচিত্র উৎসবের সমারোহটা একবার দেখে নেবে বলে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে এসেচে। বৈতালিকদের সংগীত করুণ সুরে বেজে চলেছে।

এমন সময় লক্ষ কণ্ঠে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। তাঞ্জামে চড়ে বাদশা তাজের প্রধান দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। সকলে বিস্মিত হলো; ঘোড়া ছেড়ে বাদশা চড়লেন তাঞ্জাম? শরীর কি অসুস্থ হয়েচে, চতুর্দিকে উদ্বেগ-কাতর প্রশ্ন হ'তে লাগল।

শাজাহান তাঞ্জাম থেকে নেমে এলেন। অদ্ভুত কৃশ মূর্তি; যেন বহুদিন রোগ ভোগ করে' উঠে এসেচেন। অসম্ভব রকম দুর্বল মনে হচ্ছে: যেন দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্চে। অভিবাদন-নম্র নিমন্ত্রিতদের মধ্য দিয়ে শাহান শা অতি ধীরে ধীরে, প্রায় স্খলিত পদে অগ্রসর হলেন; তাজের দিকে একবারও চাইলেন না।

উৎসব শুরু হলো। আব্দুল বারি সেতারী ইমনের আলাপ শুরু করেচে। আতরের খোসবুতে চতুর্দিক আমোদিত। স্ফটিকপাত্রে সরবত বিতরিত হচ্চে। রাজা আর ওমরাহেরা তাজের স্থাপত্যের গুণকীর্তনের প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

যমুনার ধারটিতে এক নিরালা চাঁপা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সম্রাট শাজাহান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন তাজমহলের দিকে। আদেশ দিয়েচেন, কেউ যেন কাছে না আসে। যমুনার ওপারে গম্বুজের চূড়াকে আবেষ্টন করে' তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ উঠেচে; চাঁপার গন্ধে বাতাস ভারি। সমাধির পাশে যে গুগগুল জ্বালান হয়েচে, আসচে তার অলস গন্ধ। সম্রাট শাজাহান আমীর ওমরাহের ভিড় এড়িয়ে এই নিরালায় এসে নিস্তব্ধ তাজের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন। মনকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, পেরেচি কি? পেরেচি কি? সত্যই তাকে অমরতা দিতে পেরেচি কি?

সম্রাটের বুক কেঁপে উঠল। পারেন নি। সম্রাট জানেন, পারেন নি। পৃথিবী আর আকাশ বলে উঠল, পারো নি। এই অপূর্ব স্থাপত্যের প্রশংসায় চতুর্দিক মুখরিত হয়েচে; এই সমাধি-মন্দিরের পবিত্র সৌন্দর্যে পৃথিবী সুন্দরতর হয়েচে। সম্রাটের চিত্তবেদনা মর্মরময় এক অপূর্ব কায়ারূপ গ্রহণ করেচে। কিন্তু কতটুকু লাভ হয়েচে শাজাহানের? যাকে হারিয়েচেন, তার বদলে কতটুকু ফিরে পেলেন? অকালে যাকে রূপ রস গন্ধ বর্ণময় পৃথিবী ছেড়ে যেতে হল, সেই-বা কতটুকু সান্ত্বনা পেয়েচে? যা গেছে, তা কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না, শাহান শা বাদশাও নন।

চন্দ্রাতপের তলায় সংগীত মিশ্রিত কলগুঞ্জন। অতি আলোক সম্পাতে সভাস্থল অবাস্তব বলে ভ্রম হয়। সম্রাট শাজাহান এগিয়ে এলেন। করতালি ধ্বনি।

এ কি? একটা সোনার পদক তার গলায় ঝুলচে কেন? বাদশা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এত বড় অপমান! একটা সোনার খেলনা দিয়ে এত বড় সৃষ্টির এত বড় অপমান! এত বড় বেদনাকে এত বড় পরিহাস! কেন লোক ডেকে এই অনুষ্ঠান তিনি করতে গেলেন! কেন চুপে চুপে চাঁপার গাছের তলা থেকে খণ্ড চাঁদের আলোয় তাজকে দেখে চুপে চুপেই চলে গেলেন না? প্রেয়সীকে চিরস্মরণীয় করবার চেষ্টায় কেন তার প্রেমের মাধুর্যকে সাধারণের বিচারের বস্তু করে' তুলে তাঁর স্মৃতির অপমান করলেন!

বেদনা-কাতর চোখে শাজাহান এদিকে তাকালেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ কে? এ যে স্পষ্ট আমার মুখ! শাহান শা বাদশা শাজাহান কোথায়? রেল গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে দূরে...ঢং ঢং করে রাত্রি দশটার ঘণ্টা পড়ল। আমি চমকে উঠে সজাগ হয়ে উঠলাম।

কেন যে অতসীর ছবিটা আমি এগজিবিসানে টাঙাতে গিয়েছিলাম!

জাপানের রাশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা

শ্রীসুশীল বসু

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হইবে কি না—এ প্রশ্নটা যুদ্ধ-সংবাদ-প্রিয় জনসাধারণের নিকট আজ অপেক্ষাকৃত গৌণ হইয়া গিয়াছে। গত গ্রীষ্মের শেষভাগে স্টালিনগ্রাদ নগরীর দ্বারপথে সোভিয়েট বাহিনী যখন নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন এবং বিশ্ব যুদ্ধের জয়পরাজয় যখন সূক্ষ্মসূত্রে দোদুল্যমান তখন পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে জাপান রুশিয়াকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা ত্বরিত করিয়া দিবে কি না, সে সম্পর্কে লোকের মধ্যে গবেষণা ও উত্তেজনার অন্ত ছিল না।

কারণ, একথা কাহারও অবিদিত নাই যে, যুধ্যমান দুই-দলের প্রধান পক্ষ হইতেছে, একদিকে নাৎসী জার্মানী এবং অন্যদিকে সোভিয়েট রুশিয়া। কাজেই, কোন এক দলের প্রধান পক্ষের চূড়ান্ত পরাজয়ই যে সমগ্র পরিণতিকে প্রভাবিত করিবে, তাহাতে কাহারও মনে সংশয়মাত্র ছিল না। জার্মান বাহিনীর অপ্রতিহত অগ্রাভিযান এবং এই বাহিনীর অজেয়তা সম্পর্কে লোকের দৃঢ় ধারণার ফলে, রুশিয়ার পরাভবই অধিকাংশ লোকে আশা করিতেছিল। হয়ত আমাদের অবস্থাসঞ্জাত মনোভাবও জার্মানীর জয়াশার মূলে ছিল। অবশ্য একথার মধ্যেও কোন সন্দেহ নাই যে, স্টালিনগ্রাদে সংকট যখন ঘনীভূত তখন যদি পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে সোভিয়েট আক্রান্ত হইত তাহা হইলে সোভিয়েটের কঠিন সংকট কঠিনতর হইত।

দুইটি ঘটনা তখন যুদ্ধের মোড় দ্রুত ফিরাইয়া দিতে পারিত। এক মিত্রপক্ষের দ্বারা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি—দ্বিতীয়, জাপান কর্তৃক সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ। যদি স্ট্যালিনগ্রাদের পতন হইত, তাহা হইলে ঘটনাস্রোত কোন পথে প্রবাহিত হইত, বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে প্রধান শত্রু সোভিয়েট রুশিয়াকে পরিবেষ্টন করিয়া চূর্ণ করাই প্রধান প্রশ্ন হইত। কারণ, সোভিয়েটকে অল্প চেষ্টায় পরাভূত করা সম্ভব হইলে, ভবিষ্যৎ জগৎ ভাগাভাগি করিয়া লইবার পক্ষে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়ত জাপানের পক্ষে অসম্ভব হইত না।

কিন্তু এ ব্যাপারে জাপানের ঝুঁকি লইবার সাধ্য ছিল না। কারণ, সোভিয়েটের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অধিক শক্তি ব্যয় করা জাপানের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারিত। এই যুদ্ধে জাপানের অত্যধিক শক্তিক্ষয় হইলে, অক্ষশক্তি যুদ্ধে জয়ী হইলেও যুদ্ধান্তে শক্তিহীন জাপানের অবস্থা ইটালির বর্তমান অবস্থার অনুরূপ হইতে পারিত।

রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপানের বেশী শক্তিক্ষয় হইলে, জাপান যে বিশেষ ফাঁপরে পড়িয়া যাইত, তাহার কারণ, প্রাচ্যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সহিত শক্তি-পরীক্ষা জাপান কোনক্রমে এড়াইতে পারিত না। অক্ষ সম্মেলন ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহা নিজের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে।

বর্তমানে প্রধান সংঘর্ষ হইতেছে উভয় দলের দুই প্রধান পক্ষের মধ্যে—অর্থাৎ অপরিমেয় যান্ত্রিক শক্তিতে শক্তিমান দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী এবং স্বদেশপ্রেম ও মানব-মুক্তির মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত মৃত্যুঞ্জয়ী লালফৌজের মধ্যে। অন্যদিকে উভয়দলেরই দ্বিতীয় অংশীদারদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংঘর্ষের আয়োজন চলিয়াছে। অবশ্য আফ্রিকায় অক্ষশক্তির দ্বিতীয় অংশীদার ইটালির অসামর্থের ফলে সেখানে এ্যাংলো-আমেরিকান বাহিনীকে জার্মান বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি গুরুতর পরিবর্তনের সন্নিহিত হইয়াছে। রুশিয়ার সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্পর্কে জাপানকে সব সময়ই একথা মনে রাখিতে হইয়াছে যে, অক্ষশক্তির দ্বিতীয় অংশীদাররূপে তাহাকে সম্মিলিত পক্ষের দ্বিতীয় অংশীদার ইংরেজ-আমেরিকার সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। দায়িত্বের অংশ বণ্টন হিসাবেই যে এই ভার জাপানের উপর পড়িবে তাহা নহে, ঘটনার সংস্থানের ফলেই তাহা অপরিহার্য হইবে। য়ুরোপে যদি জার্মানীর পতন ঘটে, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরে ও এসিয়ার মূল ভূখণ্ডে শক্তি-শালী জাপান স্বতন্ত্রভাবে ইংরেজ ও আমেরিকার সহিত লড়িয়া অথবা আপোষ করিয়া (শক্তি থাকিলেই মাত্র তাহা সম্ভব) আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে। ইহার উপরই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। অবশ্য য়ুরোপে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় হইলে জাপানের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না—তাহা স্বতন্ত্র কথা। তবে, তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টা যে এই পথই অবলম্বন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি য়ুরোপে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় না ঘটে (যদিও তাহা সম্ভব নহে) তাহা হইলেও প্রাচ্যে ইংরেজের ও আমেরিকার, বিশেষ করিয়া আমেরিকার সহিত না লড়িয়া জাপানের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগর ও এসিয়ার দক্ষিণাংশে ইংরেজ-আমেরিকার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিতে তাহার কল্পিত সাম্রাজ্য নিরাপদ হইবে না। রণক্লান্ত জার্মানীর নিকট হইতেও সে সাহায্য পাইবে না। আর জার্মানীও চাহিবে না যে সমগ্র রণক্ষেত্রে একমাত্র তাহারই শক্তিক্ষয় হউক এবং জাপানের সামরিকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকুক। কাজেই রুশিয়ার সহিত জাপান সংঘর্ষ এড়াইয়াই চলিবে। রুশিয়ারও অবশ্য জাপানের সহিত সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিবার যুক্তিসংগত কারণ আছে। যদিও তাহা বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে।

য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কেও ইংরেজ ও আমেরিকাকে জাপানের কথা ভাবিতে হইতেছে। জাপানই তাহার শেষ শত্রু—জার্মানীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পরও

জাপানের সহিত তাহার যুদ্ধ চলিবে। ইংরেজ আমেরিকা জানে, জাপানের সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাহার উপায় নাই এবং সে যুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া তাহার দোসর হইবে না। তবুও সম্মিলিত পক্ষের অবস্থা জাপানের তুলনায় অনেক বেশী জটিল। কারণ জাপান য়ুরোপের ব্যাপারে আপাতত নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। কিন্তু ইংরেজ ও আমেরিকার -বিশেষ করিয়া ইংরেজের য়ুরোপ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই। কারণ, য়ুরোপে প্রাধান্য না থাকিলে সাম্রাজ্যরক্ষা করা যাইবে না। বর্তমান যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের যত সম্ভাবনাই থাকুক, শাসকবর্গের দৃষ্টি সাম্রাজ্য রক্ষার দিকে। তাঁহাদের নীতিও তদনুসারে পরিচালিত হইবে।

প্রাচ্যে প্রাধান্য অথবা আত্মরক্ষার জন্য এ্যাংলো-মার্কিন সমবায়োদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রস্তুত না থাকিয়া জাপানের উপায় নাই বলিয়াই রুশিয়ার সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিতে সে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে জার্মানী নিশ্চয়ই চাহিয়াছিল যে, জাপান পশ্চাৎ হইতে রুশিয়াকে আক্রমণ করিয়া তাহার কার্য সহজ করিয়া দিক। অন্যদিকে মিত্রশক্তিবর্গ চাহিয়াছিলেন যে, জাপান রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ুক। তবুও যে, জাপান রুশিয়াকে আক্রমণ না করিয়া মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিয়াছে সে তাহার নিজেরই প্রয়োজনে।

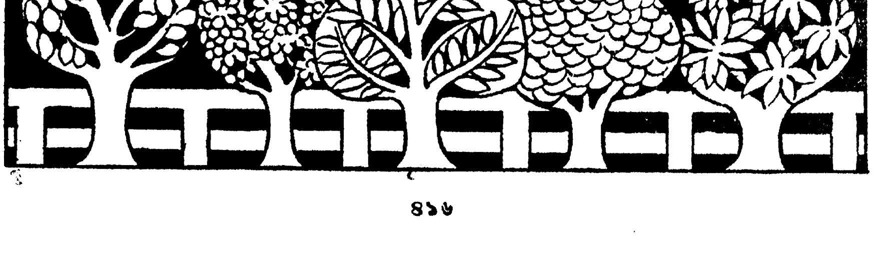
সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের জয়ে আর একবার এই প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে যে, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন ঘটিল তাহার ফলে জাপানের পক্ষে রুশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়া গেল কি না! এই ঘটনার ফলে প্রশ্নটি যে নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জাপান দুইটি বিপরীত অবস্থার চাপে রুশিয়াকে আক্রমণ করিতে পারে। এক রুশিয়ার পরাজয়ের মুখে। রুশিয়ার পরাজয় সম্ভাবনা অদূরবর্তী হইলে তখন পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিয়া অল্পায়াসে তাহাকে চূর্ণ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় তাহার এসিয়াস্থ দেশগুলি অধিকার করা জাপানের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে এবং পরে অক্ষুন্ন, এমনকি বর্ধিত শক্তি লইয়া সে ইংরেজ-আমেরিকার সম্মুখীন হইতে পারে। স্ট্যালিনগ্রাদে রুশিয়ার সঙ্কটের সময় কতকটা এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু রুশিয়ার শক্তিহীনতার বিষয় খুব নিশ্চিত না হইয়া জাপান রুশিয়াকে আক্রমণ করিবার ঝুঁকি লইতে পারে না।

দ্বিতীয়, জার্মানীর খুব সঙ্কটের সময় জার্মানীর পরাজয় বিলম্বিত করিবার বা পরাজয় সম্ভাবনাকে দূর করিবার জন্য জাপান রুশিয়াকে আক্রমণ করিতে পারে। উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের জয় এবং ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে এই দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দিয়াছে। কেন না, সম্মিলিত বাহিনীর এই জয়ের পরবর্তী পর্যায় হইতেছে য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি। চার্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকারে এই সম্ভাবনা অনেক দৃঢ় হইয়াছে।

জার্মানী যদি একই সময় দুই রণাঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায় তবে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ হইতে জাপান একক আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। অপরদিকে যদি পূর্ব সীমান্তে সে রুশিয়াকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে এবং জার্মানী সেই সুযোগে এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে জার্মানীর সহায়তায় সে পরে লাভবান হইতে পারে। অন্যথা জার্মানী পরাজিত হইলে তাহারও আশা-ভরসা নষ্ট হইবে এবং তাহার পরাজয় তখনমাত্র সময়ের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইবে। চুংকিংএর সংবাদেও দেখা যায় যে, জাপান মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ সমাবেশ করিতেছে। সেন্ট্রাল ডেলি নিউজের সংবাদে প্রকাশ, গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে জাপান তাহার মাঞ্চুরিয়া বাহিনীতে আরও ছয় ডিভিসন সৈন্য বাড়াইয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার সৈন্যবাহিনীই তাহার বৃহত্তম বাহিনী। কোরিয়ার সৈন্য সংখ্যা বাদ দিয়াও এই বাহিনীর শক্তি ৪১ ডিভিসনে দাঁড়াইল।

জাপানের এই সৈন্য সমাবেশ এবং উত্তর আফ্রিকায় জার্মানীর বিপর্যয়, জাপানের রুশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনাকে নিশ্চয়ই বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অবস্থার এই সমাবেশ দেখা গেলেও, অক্ষ সম্মেলন এবং জার্মানীর সহিত একত্র বিশ্ব-যুদ্ধ জয় অপেক্ষা একক আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। জার্মানীকে পরাজয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার সহিত ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত করিতে গেলে তাহাকে যে ঝুঁকি লইতে হইবে তাহাতে সে সহসা রাজী হইবে না, কারণ, জার্মানী যদিও বা তাহাতে রক্ষা পায়, ক্ষয়িত শক্তি জাপানের রক্ষা পাইবার আশা অনেক কমিয়া যাইবে।



সমাজ পত্তনের গোড়ার কথা

শ্রীশত্রুঘ্ন রায়

সামাজিক জীবনের আদিম ইতিহাস বিচিত্র ও কৌতুহলোদ্দীপক। প্রাচীন যুগের মানুষ এখনকার মত শ্রেণীবদ্ধ সমাজে বাস করত না। পশু জীবনের সঙ্গে তখন মানব জীবনের কোন পার্থক্য ছিল না। আহার অন্বেষণেই মানুষের বেশীর ভাগ সময় কেটে যেত। বনবাসী অন্য পশুদের মতই বনের মানুষের আহারের প্রয়োজন হত, কিন্তু এ প্রয়োজনের তাগাদা মিটাতে দেখা দিত কত বৈচিত্র্য, মানুষের নিজস্ব মানবত্ব। এর মধ্যে এসে যেত তার জীবনের পূর্ণ বিকাশ, তার বিচারশক্তি ও দূরদৃষ্টির পরাকাষ্ঠা। তাই আমাদের সমস্ত সামাজিক উন্নতির মূলে রয়েছে আহার অন্বেষণে এই উদ্যম ও কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। ফলে আমাদের দলগত, জাতিগত ও পারিবারিক জীবন প্রসারতা লাভ করেছে।

এখন দেখতে হবে এই দল কিভাবে সংগঠিত হয়েছে। সামাজিক জীবন যাপন করার পথে কি কি বাধা আছে ও এই সব বিপত্তি দূর করবার উপায় কি। আমাদের সভ্য জগতে সব জিনিসই এরকম গোলমেলে যে, কোন ব্যাপারের মূলসূত্র আবিষ্কার করা সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই কাজটি আমাদের করতে হবে। একটা উপায় হচ্ছে, আদিম মানুষের সাদাসিধা সমাজজীবন অথবা আমাদের অবজ্ঞাত জ্ঞাতিকুল মর্কট-গোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালী আলোচনা করা। আমরা প্রথমে নরাকৃতি বানরের কথা আলোচনা করব।



জংলী মানুষের মজলিস

এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে গিবন। মানুষের প্রকৃতিও এর মধ্যে সব চেয়ে কম। আমেরিকার কোন বৈজ্ঞানিক এদের দৈনন্দিন জীবনের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর দেখা গিবনদের বাসস্থান শ্যাম দেশে। সেখানকার জঙ্গলে ভরা পার্বত্য প্রদেশে এরা বাসা বাঁধে। এদের জীবন পরিবারবদ্ধ। মা, বাবা ও সাধারণত দুটি বাচ্চা নিয়ে। কোন কোন পরিবারে ঠাকুর্দাগোছের একজন অথবা অতিরিক্ত একটি বাচ্চা থাকে। সাধারণ ইংরেজ পরিবারও অনেকটা এই রকম। গিবন পরিবার ঘুমোয় গাছের উপরে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর শুরু হয় চীৎকারের ঐক্যতান। স্নানের পর্বটা এই সময় শেষ হয়। একটু পরে সকলে বেরিয়ে যায়। পথ নির্দেশ করে বাবা অথবা মা। হাত ধরাধরি করে গাছের শাখা থেকে শাখান্তরে দুলতে দুলতে চলে তারা। মাঝে মাঝে কুড়ি থেকে ত্রিশ ফুট দীর্ঘ লাফ দেয় এক গাছ থেকে আর এক গাছে। প্রাতরাশ করবার গাছ তারা শীঘ্র খুঁজে নেয়। ডুমুর, আঙুর অথবা কুলগাছে এরা চড়াও করে। কিছু না পেলে গাছের পাতা ও ফুলের কুঁড়ি খায়। প্রাতর্ভোজনের পর আসে বিশ্রামের পালা। বড়রা শান্তভাবে বসে পরস্পরের অঙ্গ কণ্ডুয়ন করে। এদের গায়ের লোম লম্বা ও ঘন। পরস্পরের আঙুল চিরুনীর কাজ করে। তারপর তারা আর একবার ভোজনপর্ব সেরে নেয়। এতক্ষণে দুপুর হয়ে যায়। আবহাওয়া গরম হয়ে উঠে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গ্রাম্য অধিবাসীদের মত গিবনরাও দুতিন ঘণ্টা মধ্যাহ্ন-নিদ্রায় অথবা বিশ্রামসুখে অতিবাহিত করে। সেই অবসরে বাচ্চারা অবিকল মানবশিশুর মত খেলা করে, পরস্পরকে তাড়া করে, মারামারি করে। এইভাবে মধ্যাহ্ন কেটে যায়। বৈকালের

ছায়া নেমে আসে। গিবনরা আরও দূরে চলে যায়। রাতের খাবারটা এই সময় সেরে নিয়ে গিবন-পরিবারের সকলে কোন পরিচিত গাছে আশ্রয় নেয়। সূর্য অস্ত গেলে তাদের চোখে গাঢ় ঘুম নেমে আসে।

এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, গিবনদের সমাজজীবন এক একটি পরিবার নিয়ে। এ সমাজের কাঠামো দাঁড়িয়ে রয়েছে স্নেহের ভিত্তির উপর। স্বামী, স্ত্রী ও বাচ্চারা পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে আন্তরিকভাবে। এদের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধও আজীবন থাকে। বাচ্চারা কিন্তু বড় হলে পরিবার ছেড়ে চলে যায়। তারা নিজেরাই এক একটি স্বতন্ত্র পরিবার গঠন করে। সুতরাং যে কোন নির্দিষ্ট এলাকা অনেক



গিবনদের মন্ত্রণাসভা

পরিবারের বাসভূমি হয়ে পড়ে। এদের নির্দিষ্ট সম্পত্তিও থাকে। এক এক পরিবারের দখলে থাকে ত্রিশ চল্লিশ একর ভূখণ্ড। এই স্থানটুকুর মধ্যে তাহারা আহার অন্বেষণ করে বেড়ায়, আর নির্দিষ্ট গাছে নিদ্রা যায়।

গিবনদের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারই নিজের সম্পত্তি রক্ষায় বিশেষ যত্নবান। অনেক সময় এক পরিবার অন্যের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আসে। ফলে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। আক্রান্ত পরিবার উচ্চনিনাদে বনভূমি মুখরিত করে আততায়ীর সম্মুখীন হয়। তারপর আসে আক্রমণের পালা। তীক্ষ্ণ, শাণিত দন্তে পরস্পরের গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। অনেক সময় আক্রমণ-কারী জয়লাভ করে। আক্রান্ত পরিবার বিতাড়িত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। স্তন্যপায়ী জন্তু ও পাখীদের মধ্যে এই ধরণের স্থানচ্যুতি ও স্থানপ্রাপ্তি খুব সাধারণ ব্যাপার। সম্পত্তির মালিকানাসত্ত্ব গিবনদের জীবনে বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্ব একজনের নয়, একটি সমগ্র পরিবারের অর্থাৎ একটি সামাজিক দলের।

অথচ এই গিবনরাই মানবাকৃতি মর্কটজাতির মধ্যে সব-চেয়ে কম মানুষের প্রকৃতি পেয়েছে। মানুষের সঙ্গে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অধিক আছে যে সব বানরের, আমরা তাদের সম্বন্ধে অনেক কম জানি। বোধ হয় ওরাংরা গিবনদের মত পরিবার বেঁধে বাস করে। কিন্তু এরা এক বিষয়ে একটু উন্নত, গাছে গাছে নীড় রচনা করে ঘুমের সুবিধা করে নেয়। এদের মধ্যে গরিলারা সবচেয়ে বড় ও মানুষের নিকটতম আত্মীয়। পশ্চিম আফ্রিকার গভীর বনের অধিবাসীরা গিবনদের মত পারিবারিক জীবনের ভক্ত। আবার মধ্য আফ্রিকার পার্বত্য বাসিন্দারা বহু পরিবারসমন্বিত দলে বিভক্ত হয়ে বিচরণ করে।

পরিবার-সমষ্টিকে দলে উন্নীত করতে গেলে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। তাদের দলবদ্ধ হয়ে থাকার মূল কারণ কি? কে তাদের নেতৃত্ব পদ লাভ করে ও তাকে দলপতি করা হয় কেন? শয্যা নির্বাচন ও খাদ্য সংগ্রহ ব্যাপারে কার অভিমত প্রাধান্য লাভ করে? প্রত্যেক পুরুষ গরিলার কটি স্ত্রী থাকে? গরিলাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি এরূপ বিস্তৃত নয় যে, এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। ছোট জাতের মর্কটদের বিষয়ে বরং কিছু আলোকসম্পাত করা যায়। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বেবুনদের স্বভাব হচ্ছে বড় বড় দল বেঁধে বাস করা। এদের চেয়েও ক্ষুদ্রাকৃতি একদল বাঁদরের কথা ধরা যাক। গিবন পরিবারের মত এদেরও বিষয়-সম্পত্তি আছে। এই স্থানটুকুর মধ্যে এরা আহার অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। পরসম্পত্তিলুব্ধ আক্রমণকারীদের এরাও পাল্টা আক্রমণ করে। এই ব্যাপারে এদের দলগত মনো-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সকলে আততায়ীকে একযোগে আক্রমণ করে। এ সময় এরা একজন নেতৃ-স্থানীয় বানরের নির্দেশ অনুসারে চলে। প্রাপ্তবয়স্ক সবল পুরুষই সাধারণত দলপতি হয়ে বসে। ছেলেবেলা থেকে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে এসেছে, বড় হয়ে মোড়লের পদ তার ত অবশ্যম্ভাবী! নিজের পদগৌরব বজায় রাখতে দৈহিক বলই তার একমাত্র ভরসা। অতীতের যুদ্ধজয়ের স্মৃতিও তার মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়তা করে। আহারের সময় তার দাবী সর্বাগ্রে। সে ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ করে। বিভিন্ন পরিবারের যুবতী মর্কটীরা সপ্রশংস মনোভাব নিয়ে তার অনুবর্তী হয়,—মরদ বটে! তার কাজ হচ্ছে দলের একতা রক্ষা করা, আর বিবাদে সালিশী করা। সে না থাকলে দল ভেঙ্গে যায়, সুযোগ বুঝে আত্মকলহের দুঃস্বপ্ন মাথা নাড়া দিয়ে উঠে।

দলপতির নীচে হচ্ছে অধস্তন সামাজিক স্তর। দলের প্রত্যেকেরই একটা সামাজিক সত্তা আছে। সেই অনুসারে সমাজে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট হয়। মর্কটীদের সামাজিক স্তরবিভাগ স্বতন্ত্র। বাচ্চারা শৈশবের খেলাধুলার ভিতর দিয়ে সমাজে ভবিষ্যতের আসন গড়ে তোলে।

যে সব বানরের কথা আমি আলোচনা করলাম, এক বেবুন ছাড়া এরা সকলেই গাছে বাস করে। বেবুনদের বাসস্থান নির্দিষ্ট। এখানে তারা কায়েমীভাবে বসবাস করে। তাদের সম্পত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত। শোনা যায় যে, তারা প্রহরীবেষ্টিত হয়ে আহারক্রিয়া সম্পন্ন করে, আর যে কোন আহত বানর চোখে পড়লে তাকে ঘরে পৌঁছে দেয়। এর ফলে দাঁড়াচ্ছে এইঃ— মর্কট ও বানরদের সামাজিক জীবন ঠিক আমাদের মত, অবশ্য মানবসমাজের জৌলুষ ও জটিলতা থেকে মুক্ত। উভয়ের মূল-



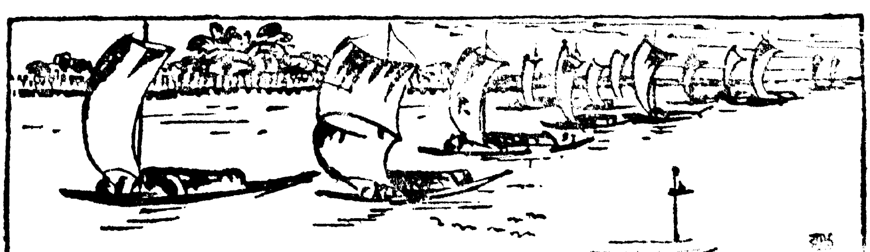
বেবুন জননী

গত ব্যাপার কিন্তু এক। স্ত্রী-পুরুষ, মাতাপিতা ও সন্তান-সন্ততির স্নেহ পারিবারিক জীবনে বন্ধনের কাজ করে। শত্রুকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যাপারে দল ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। দলের অস্তিত্ব নির্ভর করে একজনের নেতৃত্বের উপর। দলপতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকে তার ব্যক্তিগত গুণের উপর। দলের অন্য সকলেরও সমাজে স্থান নির্দিষ্ট থাকে। স্ত্রীলাভও নির্ভর করে সামাজিক মানসম্ভ্রমের উপর। সন্তানদের ভার থাকে মার উপর।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী সকলেই হতে পারে। দলগত স্বার্থ একে সমর্থন করবেই। দলের কাজই হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করা। এরূপ ক্ষেত্রে জয়-পরাজয় নির্ভর করে দলপতির উপর। এই বানর ও মর্কট সমাজের মধ্যেই আমাদের নিজেদের সামাজিক জীবনের বীজ নিহিত আছে। তাদের সুখ-দুঃখের ধারা আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। আমাদের মধ্যেও রয়েছে পারিবারিক স্নেহপ্রীতি, অত্যাচরপ্রবণতা ও শক্তির আস্ফালন। কিন্তু ভাষাহীন মর্কটদের সমাজ গঠনে জটিলতার লেশমাত্র নাই। আছে তাদের শুধু চীৎকার করবার ক্ষমতা এবং এ চীৎকার একেবারে অর্থহীন নয়। একজন আমেরিকান একবার গিবনদের এগার রকম চীৎকার শুনে তার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র রূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল বিপদসংকেত, ক্রোধের উদ্গার আর সঙ্গীতের তান। অবশ্য সত্যিকার ভাষা, কথা বলার ক্ষমতা আছে শুধু মানুষের। যুগ যুগ ধরে মানুষের এই শক্তি তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মানুষের বিপুল সমাজ গড়ে উঠেছে; বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সামাজিক প্রথার প্রবর্তন হয়েছে। সমাজ প্রত্যেক লোকের জীবনযাত্রার ধারা নির্দেশ করেছে। দলপতির মৃত্যু হলে অথবা বার্ধক্যহেতু নায়কের ক্লীবত্ব প্রাপ্তি হলে নতুন নেতা নির্বাচিত হয়। বর্তমান যুগেও মর্কটসমাজের অনুরূপ মানবসমাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানরা সেদিনও মর্কটদের মত জীবনযাপন করে এসেছে।

আমাদের পিছনে রয়েছে সহস্র বৎসরের সভ্যজীবনের ইতিহাস। আমাদের পূর্বপুরুষের জ্ঞানের বিকাশ আমাদের মধ্যে সুন্দরতর হয়ে ফুটে উঠেছে। কৃষিকর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রূপ বৃহত্তর হয়েছে, আর নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তারপর নতুন দেশ অধিকারের ইচ্ছা ও পররাজ্য অপহরণপ্রয়াসের ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। মর্কটসমাজের ছায়া এখনও মানবসমাজকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে।



বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

আপনাদের অনুগ্রহে পর পর সাতদিন বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কিছু নিবেদন করবার সুযোগ আমি পেয়েছি। আমার মত একজন অযোগ্য লোককে আপনারা যে এ সুযোগ দিয়েছেন, এ আপনাদের মহত্ত্বেরই পরিচয়, নতুবা এ সম্বন্ধে কিছু বলবার মত ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই। ভাল শ্রোতা পেলে নূতন অনেক কিছু জানা যায় এবং বলার মুখে নিজে যা ভেবে উঠতে পারিনে, এমন নূতন আনন্দের বার্তা অন্তরে শোনা যায়। আপনারা আমার সে পিপাসা মিটিয়েছেন, পরম দাতা আপনারা। ভূরিদান—এ তো বৈষ্ণবেরই লক্ষণ। বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপের কথা বলতে গেলে অল্পের মধ্যে এই কথা বলা চলে যে, সার্বভৌম সত্যের উপরই এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব ধর্ম কোন রকম প্রাদেশিকতা স্বীকার করে না। এই প্রাদেশিকতা বলতে আমি শুধু ভৌগোলিক প্রাদেশিকতার কথা বলছি না, স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক এগুলোর কথাও বলছি। বৈষ্ণবের মতে যা সত্য, তা সার্বভৌম, দেশ কাল বা পাত্রের দ্বারা তা বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। সদা এবং সর্বত্র যে আশ্রয়, বৈষ্ণবের সাধনা হ'ল সেই আশ্রয়ের জন্যে। সুতরাং এ জগৎটা কিছু নয়, অন্য কোথায়ও উর্বশী, মেনকা, রম্ভার নৃত্য চলছে, কোন গতিকে সেই ডাঙায় পাড়ি দিয়ে পড়তে পারলেই সত্য সুখ নিত্য সুখ পাওয়া গেল, বৈষ্ণব এ মানেন না। সত্যকে যদি পেতে হয়, এই জীবনেই অমৃতকে আহরণ করতে হবে, এখনই এবং এখানে অমৃত একবার আহরণ করতে পারলে পরে আর সেখান বলে কোন কিছু থাকবে না। কালের ব্যবধান, কলাকাষ্ঠাদি রূপে তার পরিণাম প্রদায়িনী গতি, শুধু পাকা আশ্রয় না পাওয়ার ফলে অর্থাৎ যা চাই, তা পাইনি বলেই ভবিষ্যতের সৃষ্টি হচ্ছে, এ লোক সে লোকের স্বপ্ন দেখছি।' "ভবন সমর্জন হ'লে এসব কিছুরই আর তখন তোয়াক্কা থাকে না। এ জগতেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন তত্ত্ব সত্য হ'য়ে ওঠে। নিত্য আনন্দের সে ধামে দেশের বিচারও নাই, কালের বিচারও নাই। যে সুখের সঙ্গে যুক্ত হ'লে কালের হিসাব আর ওঠে না, যে সুখের মধ্যে একান্তভাবে চিত্ত বিলীন হ'লে তৃষ্ণা বা কামের অভাবে দেশের চিন্তাও লুপ্ত হয়—পরোক্ষতা আর থাকে না, প্রত্যক্ষতার স্পর্শে জীবন বীর্যময়, আনন্দময় হয়ে ওঠে, বৈষ্ণব সেই সুখের উপাসক। বৈষ্ণব বলেন, এ সুখ রসস্বরূপ এবং সে রস মধুর এবং মধুর রসই ব্যাপ্ত ধর্মবিশিষ্ট, সকল রসের পরিপূর্ণতা তারই মধ্যে। জীবনকেও মধুর রসে একবার সিক্ত করতে পারলে আর কিছু বিতর্কের বস্তু থাকে না। সব জানা, সব চেনা হয়ে যায়: এক কথায় লাভ হয় পরম উপপত্তি। যে রসের মধ্যে এমন উপপত্তি আছে অর্থাৎ প্রাণভরা, বুক জোড়া পাওয়া আছে, বৈষ্ণব তাঁকেই ব্রজগোপিকার ভাব বলেন। অসংশয়িত উপপত্তির এই যে স্তর এখানে ওঠবার উপায় কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পথই দেখালেন। বেদও এই সত্যকেই নির্দেশ করেছেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে সে তত্ত্ব বলবন্ত হয়নি। প্রত্যক্ষতার বলে সে রস উচ্ছল হ'য়ে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে বস্তু ছিল একটা যেন অনুমান প্রমাণ বা বিতর্কের বিষয়। মহাপ্রভু 'অবিতর্কলিঙ্গে' সেই পরম রসমাধুর্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন; যে রস ছিল আভাস, তা হ'ল তাঁর কৃপায় প্রকাশ। মধুর রস ছিল; এর আগে না ছিল, এমন নয়; কিন্তু আভাস রূপে পরোক্ষভাবে বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সকল বস্তুধর্মে প্রচ্ছন্ন থেকে মানুষের তৃষ্ণাই জাগাত, মরীচিকায় মরু ভ্রমে শুধু পিপাসা বৃদ্ধি করত; শ্রীমন্মহাপ্রভু মধুর রসের সেই গোপন মহিমাকে প্রকাশ করে দিলেন। বাস্তব জীবনে সত্য হ'ল সে রস। যে রস বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অন্তর্লীন থেকে বিশ্বের বাইরে, বিশ্বের প্রতি মানুষের উপেক্ষা জাগিয়ে কামলোক সৃষ্টি করত, মহাপ্রভুর প্রেমলীলায় সেই রস বিশ্ব প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত হ'ল, জগৎও হ'ল মধুর। সমাজ, সংসার এবং মানুষের মধ্যে সেই রসের খেলা জাগালো—সেবা সত্য হ'ল জীবনে, যজ্ঞ সত্য হ'ল, ত্যাগ সত্য হ'ল জীবনে এবং সেই পথে সত্য ধর্মও প্রতিষ্ঠিত হ'ল সদা এবং সর্বত্র।

বিশ্ব প্রকৃতির সাথে আমাদের বর্তমানে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক, বিরোধের সম্পর্ক, দ্বন্দ্বের সম্পর্ক সে সম্পর্ক অভাবের সম্পর্ক, ভাবের সম্পর্ক নয়। যেখানে ভাব নাই, সেখানেই ভয়। এই ভয়ের রাজ্য থেকে অভয়ত্বের রাজ্যে যাওয়াই হচ্ছে সাধনা। আমাদের চারিদিকে মৃত্যু—চারিদিকে ভয়। এই ভয়ের থেকে অভয়ত্বের রাজ্যে যাওয়াই হ'চ্ছে ভারতের ঋষিদের বাণী; ক্ষয়ের থেকে জয়ের রাজ্যে যাওয়ার জন্যই তাঁরা সকলকে ডেকেছেন। তাঁরা বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব না জানবে, ততদিন পরাভব হ'বেই। এখন সাদাসিধে রকমে, বেশ সোজাসুজি, এই আত্মতত্ত্ব কি বোঝা দরকার। শুধু বড় বড় অনুস্বর বিসর্গের বোঝা মনের উপর চাপালে এ ক্ষেত্রে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হ'বে। এদেশের সাধকেরা সোজা কথায় এই আত্মতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—"স বৈ প্রিয়তমঃ আত্মা যতো ন ভয়মন্বপি" যাকে পেলে অনুমাত্র ভয় থাকে না সেই প্রিয়তমই আত্মা। বেদ এবং উপনিষদ এই প্রিয়তম আত্মারই তত্ত্ব নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, সেই তত্ত্বই ভগবৎ তত্ত্ব, কিন্তু সে তত্ত্ব ছিল দুর্নিরীক্ষ্য, আমরা বুক ভরে প্রাণ ভরে, সে তত্ত্বকে সত্য করে পাই নি। সে তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে, সকল অভাব ডুবিয়ে ভাবকে আমরা পরিব্যাপ্ত ক'রে পাই নি। প্রশ্ন রয়েছে, তর্ক থেকে গেছে; থাকবার কথাও। ভগবানের অনন্ত ভাব, অনন্ত ঐশ্বর্য, এর ভিতর থেকে হৃদয় ভরে তাঁকে পাওয়া সহজ নয়- ফাঁক থেকেই যায়, ভেদ নষ্ট হয় না; সব আপনার হয় না। এদেশের সাধকগণ এটি ধরে ফেললেন। তাঁরা বললেন, না না ওতে হ'চ্ছে না। ঐশ্বর্যের হিরন্ময় আবরণ একেবারে সরিয়ে নাও, একবার তোমার মধুর মুখখানা দেখি। বহু ভাবের খেলা দেখিয়ে কেবল বিভ্রান্তই ক'চ্ছ, একবার মহাভাব অঙ্গীকার করে এসো; নইলে ভেদ ভাব লোপ পাবে না, এবং ভয় দূর হ'য়ে শান্তিও আসবে না। তন্ত্রে সদাশিব স্বয়ং এই প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন—'এক এব মহাভাবো নানাত্বং ভজতে যতঃ উপাধি-ভেদ-ভাবেন ভাবভেদো লয়িষ্যতি।' একমাত্র মহাভাব ভক্তি প্রেম বাৎসল্য প্রভৃতি নানারূপে বিভক্ত হ'য়ে সকল অভাব মিটাতে পারে; এবং অভাব মিটাবার মত ভাব গাঢ় হ'য়ে উঠলে ভাবগত সে সব ভেদ পরিণামে একমাত্র মহাভাবেই বিলীন হ'য়ে যায়। এই মহাভাবের প্রভাবেই "রসরূপঃ স এবাত্মা সঃ প্রভু পরমো মহান্।" এই মহাভাব-দ্যুতি-সুবলিত তনুই মহাপ্রভু। তিনি জীবকে আনন্দ-ঘন সন্দোহ যিনি তাঁর সন্ধান দিলেন, ভাব ভেদ লয় করে মানুষকে তিনি স্বভাবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেখালেন তিনি তাঁকে যিনি অন্তরেও আছেন, বাইরেও আছেন, তিনি বিশ্বেও আছেন, আবার বিশ্বাতীত তত্ত্বও তিনি। সীমার মধ্যে থেকে অসীম তিনি আপনার

বাঁশী বাজাচ্ছেন। এতদিন সবাই শুনছিল যে জগৎ মিথ্যা। কিন্তু প্রেমের ঠাকুর এসে দেখালেন, জগৎ মিথ্যা নয়। জগৎ ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ব্রহ্ম যদি সত্য হন, তবে জগৎও সত্য। সোনা যদি সত্য হয়, তবে সোনার গহনাও সত্য। সোনার মূল্য যে বুঝেছে, সোনার অলংকারকে সে কখনও অনাদর করে না, বরং বেশী আদরই করে—কারণ তাতে সাধনা আরও বেশী আছে এবং সে সাধনাও প্রেমেরই সাধনা; ভালবাসার সাধনাই। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে ভগবানের সেই প্রেম সাধনাই ব্যক্ত হচ্ছে।

কিন্তু কথা হ'চ্ছে এই যে, সে প্রেমের রাজ্যে যাবার উপায় কি? এই তত্ত্বই বৈষ্ণবের সাধনতত্ত্ব—চোখ বদলিয়ে ফেলা—"সাক্ষাৎ কার্য।" চোখ দেখছে মৃত্যু, দেখছে ভয়, অমৃত দেখবে মধুরকে দেখবে কিসে? এর উপায় হ'চ্ছে অন্তরের রাজ্যে ডুবে দেখা এবং অন্তরের রাজ্যে ডুববার উপায় হ'ল স্মরণ; বাঙলার সাধক বললেন, মনের স্মরণ প্রাণ। স্মরণ হ'ল আত্মীয়তার ছন্দ; যাকে হারিয়েছি তাকে ফিরে পাওয়ারই ব্যাপার। মাধুর্যের মূল তত্ত্ব হ'চ্ছে এই আত্ম-পরিচয়। আমরা যেখানে যেটুকু মাধুর্য পাচ্ছি, এই আত্মপরিচয়ের ভিতর দিয়েই; কিন্তু আমাদের সে স্মৃতি নিত্য হ'চ্ছে না। চিনি, চিনি ক'রেও চিনতে পাচ্ছি না, জানি জানি ক'রেও সকল মন দিয়ে জেনে উঠতে বাধা আসছে, ধরি ধরি ক'রেও ধরতে পাচ্ছি না, ভিতরে যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। আমাদের স্মৃতি যদি নিত্য হ'ত, মাধুর্যও নিত্য হ'ত। এ নিত্য স্মৃতি উদ্দীপ্ত করবার উপায় হ'ল শ্রবণ। একটা সঞ্চরণ বা ভাইব্রেশনের দ্বারাই সব কিছু আমাদের গোচরীভূত হয়। কিন্তু শ্রবণ করলেই সব জিনিস কানে স্থির থাকে না। যাহা মধুর, তাই শ্রুতির ভিতর দিয়ে এসে স্মৃতিতে গ্রাহ্য হয়। রস ছাড়া মন কিছু গ্রহণ করে না, করতে পারেও না। ঋষিরা বললেন, মনঃ-স্পর্শ-স্মিতেক্ষণম্—স্মিত ঈক্ষণই মনকে স্পর্শ করে। অর্থাৎ হাসিমাখা চাহনিই মনে লেগে থাকে। হাসিমাখা চাহনি মন কোথায়ও পায় না, তাই সব সময়ই মন চঞ্চল। মন কেবলই খুঁজছে, কিন্তু স্পর্শের মধ্যে অর্থাৎ প্রত্যক্ষতার মধ্যে, একান্ত আশ্বস্ত হয়ে এবং আপনার করে এখানে কাউকেও পাচ্ছে না। মহাপ্রভুর লীলায় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। বৃন্দাবনের কুঞ্জের কন্দরে যে চাহনি ছিল তিনি সেই চাহনির স্পর্শ এনে মনকে দিলেন। কৃষ্ণ নামের ভিতর হরিনামের ভিতর দিয়ে সে চাহনির মাধুরী রস উপচে এসে মনকে স্পর্শ করলো—মন তখন কি পেলো শুনবেন? মন পেলো চরণ। প্রেমের কারবারের এই ব্যাপার। কটাক্ষের ছোঁয়া মনকে যতই রসে রাঙিয়ে তোলে, ততই স্পর্শ পিপাসা প্রবল হ'য়ে উঠে—সে পিপাসা আলিঙ্গনেও মিটে না—"গুম্বন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ"। কমল উপহার নিয়ে চরণ চেপে ধরে। স্পর্শ পিপাসার চরম মীমাংসা হয় চরণে। বৃন্দাবনের কুঞ্জকন্দরে যে রসের স্ফূর্তি, সে রসের রীতিই হ'ল ঐ চরণে রতি। স্মিত-ঈক্ষণে মনের স্ফুরণে বরণ হয় চরণ। লক্ষ্মী এজন্য আপশোষ করেছেন। গোপিকাদের উপর তাঁর যেন ঈর্ষা হ'য়েছে। আমরা ভাগবতে দেখতে পাই, তিনি বলছেন—ব্রজগোপিকারা সকল ছেড়ে দিয়ে নিষ্কাম হ'য়ে তোমার চরণ অর্হণ অর্থাৎ সেবা করতেই চায়, তারা অখিল কামলম্পটা! হাঁ এ অবস্থাই হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাপিয়ে তাদের বুকে প্রেমের ঢেউ উছলে ওঠে। এমন মহাবল প্রেম না হ'লে চরণের অভিস্পর্শ আস্বাদ করা যায় না। আর ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই—'পদং তৎ পরমং বিষ্ণোঃ মনো যত্র প্রসীদতি।' বিষ্ণুর পরম পদ পেলেই মন প্রসন্নতা লাভ করে। 'তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে উদয় করাহ যদি তবে বাঞ্ছা পূরে।' শ্রুতিও তাই বললেন—'তৎবিষ্ণোঃ পরম পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়োঃ দিবিব চক্ষুরাততং"। এ পাওযাতে আর কিছু ফেলে পাওয়া হ'ল না, বাকী রেখে পাওয়া হল না ছেড়ে পাওয়া হল না। জুড়ে পাওয়া হল। দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সকল ধন্য করে, পূর্ণ করে পাওয়া হ'ল—'চরণং ন্যাসনং স্থানং শরণং সাধনং বিদুঃ'। সকল সঁপে দিয়ে সব হল সার্থক। সাধক এ অবস্থায় একেবারে ডুবে গেলেন কৃষ্ণ সেবাসমুদ্রে। মহাভাব-স্বরূপিণী রাধারাণীর কৃপারসে অভিষিক্ত হ'য়ে তার উপাধিগত ভেদ ভাব বিলীন হয়ে গেল। সর্বত্র জাগলো মহাভাবের খেলা—"রাধেতি প্রথিতং সমস্ত জগতি রোমাঞ্চ-সঞ্চারকং।"

নামের ভিতর দিয়ে কিভাবে এ রসধর্মের বিস্তার ঘটে—প্রত্যাদিষ্ট সে অভিসারের পথের বিভাব কি বিভঙ্গীতে হৃদয় শতদল বিচিত্র রাগরসে পরিস্ফুরিত হয়, ভাষায় ব্যক্ত করবার বিষয় নয়। আর আমি কি জানি বলুন? আপনাদের কৃপায় অন্তরে যা স্ফুরণ হয়েছে, এ কয়দিনে তা বলবার জন্য যে ব্যগ্রতা ব্যক্ত করতে পেরেছি, সেজন্যও নিজেকে কৃতার্থ মনে হ'চ্ছে। কারণ এ সব বিষয় নিজে বুঝে শুঝে বলা যায় না। শ্রোতাদের অনুগ্রহে মনের উপর দিয়ে একটা উচ্ছ্বাস ব'য়ে যায় মাত্র; কিন্তু সে উচ্ছ্বাস আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, তা আমার জন্যও নয়। সুতরাং সেজন্য আপনারা আমাকে যেসব প্রশংসাসূচক কথা বলচেন, তাতে আমাকে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে হ'চ্ছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই দিল্লীনগরী প্রবাসী আপনারা, আপনাদের শ্রীচরণে আমি কোটি কোটি প্রণিপাত নিবেদন ক'চ্ছি। ধন্য আপনারা, আপনারা এত দূর দেশে থেকেও বাঙলার প্রাণের ঠাকুর মহাপ্রভুকে নিয়ে আছেন। এখানেও তাঁর নাম শুনবার জন্য শুনাবার জন্য আপনাদের এমন আগ্রহ! বাঙালী জাতির মান আপনারাই রাখছেন। মহাপ্রভুই বাঙলার মান, বাঙলার মর্যাদা, বাঙলার সংস্কৃতি—তাঁকে নিয়েই বাঙলার সাহিত্য, বাঙলার সংগীত। তাঁকে বাদ দিয়ে বাঙলার কিছুই নেই—আপনাদের এই সাধনা সার্থক হোক; সমগ্র বাঙলা দেশের পক্ষ থেকে, নিতান্ত অযোগ্য হ'য়েও আমি আপনাদিগকে অভিবাদন জ্ঞাপন কচ্ছি। বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ আপনাদের চরণে প্রণাম; আর কোটী কোটী প্রণাম জননীদের চরণে। তাঁরা আমাকে যে অপার স্নেহ এ কয়েকদিন দেখিয়েছেন, তাতে আমি অভিভূত হ'য়েছি। দিল্লীর এ স্মৃতি চিরদিন আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

নয়াদিল্লীর হরিসভার বার্ষিক অধিবেশনে 'দেশ' সম্পাদকের শেষ বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি।

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ইংরেজ রাজত্বের প্রভাব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই যে বাঙলা দেশের সর্বত্র ধীরে ধীরে জাতীয়ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার পূর্বে আমাদের দেশে জাতীয়ভাব কিরূপ ছিল এবং দেশ বলিতে কি বুঝিতাম সে আলোচনা একটু করিতেছি।

ভারত ও বাঙলায় জাতীয় প্রেম

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ঘটিয়াছিল সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষের ফলে দেশের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহবিবাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল; আজিও তাহা দেশ হইতে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় নাই। একথাটি আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সে সময়ে আত্মপ্রাধান্য লইয়াই কলহ চলিয়াছে দেশ বা জাতি বা মাতৃভূমির কল্যাণ কেহ গভীরভাবে চিন্তা করে নাই বা সেই রকম আদর্শও তাহাদের কাছে ছিল না। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্র বলেন : "আমাদের দেশে স্বদেশ বলিয়া কোন প্রীতির প্রতিমা কখনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। অন্য লোকে যাহাকে স্বদেশ বলিয়া পূজা করে, যাহার জন্য হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জন করে, আমরা তাহার স্থলে স্বজাতীয়কে স্থাপন করিয়াছিলাম। তাহাতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্গের মধ্যে প্রীতিবন্ধন প্রতিষ্ঠিত না হইয়া একত্রাবস্থানজনিত পরিচয় মাত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল, একের জন্য অপরে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত ছিল না।

"যতদিন অন্য জাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, ততদিন এরূপ অবস্থায় বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতে পারে না! কিন্তু যেদিন অন্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হইতে হয়, সেই দিন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। সত্য বটে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; কিন্তু সে জন্মভূমি বলিতে গণ্ডীমধ্যস্থ গণ্ডগ্রামের বাস্তুভূমি ভিন্ন আর কিছু নয়!

"ভারতবর্ষের ভাল মন্দ বাঙলা দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল; এখানে আসিয়া বরং ভাল অপেক্ষা মন্দের ভাগই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আযাবর্ত হইতে ক্রমশ গঙ্গা স্রোতের নিম্নাভিমুখিনী ত্বরিতগতির অনুসরণ করিয়া যাঁহারা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আর্যোপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা একরূপ বিনা যুদ্ধেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে পরপদতলে পাতিত করিয়াছিলেন। ইহা বাঙালীর পক্ষে লজ্জার কথা, কিন্তু ইহা সত্য। বাঙালী যেভাবে বঙ্গদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার মূলেই ধ্বংসবীজ নিহিত ছিল। মুসলমান উপলক্ষ মাত্র। যে কেহ বাঙলার স্বাধীনতা হরণ করিতে পারিত। কারণ বাঙালী সমগ্র দেশকে এক অখণ্ড রাজ্যরূপে পরিণত করিতে পারে নাই; বরং এক অখণ্ড রাজ্যকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ক্ষুদ্র শক্তিকে ক্ষুদ্রতর করিয়া আপনার পরাজয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

"বাঙালী যে ভীরু বা কাপুরুষ, তাহা সত্য নহে। বাঙালীর সাহিত্যে স্বদেশ প্রীতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; সমগ্র দেশের মধ্যে একপ্রাণতা বর্তমান থাকার কোন প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং মুসলমান সেনা বাঙলা দেশে পদার্পণ করিবার সময়ে যথারীতি বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। বাঙালীর বাহুবলের অভাব ছিল না, ইচ্ছা করিলে বাধা দিতে পারিত,' কিন্তু সকলেই আপনায় লইয়া ব্যস্ত বলিয়া কেহই দেশের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই।' * * সুতরাং আমরা একালের ন্যায় সেকালেও ব্যক্তিগত উন্নতির লোভে দেশের বা জাতির মুখের দিকে চাহি নাই; যেন তেন প্রকারেণ আপনার গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া আপন লাভের গণ্ডার জন্য লালায়িত রহিয়াছি; লার্ডের লোভে "স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকেও বিক্রয় করিতে ইতস্তত করি নাই!" *

আমাদের জাতীয় প্রেরণার মূল উৎস যে সেকাল নহে এ কাল একথা কয়টি এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। বাঙালীর জাতীয় জীবনের উৎস কোথায় সে বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে অক্ষয়কুমারের এই কঠোর ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

জাতীয় প্রেরণা ও জাতীয় জাগরণের মূলে থাকে একপ্রাণতা কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা, বহুবিধ ধর্ম ও তাহার শাখা প্রশাখা আচার ও অনুষ্ঠান এবং যাতায়াতের অভাব ও অভিযোগ ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের দেশে বিরাটভাবে স্বদেশপ্রীতির পুণ্য-মন্দির গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । ইংরেজের রাজত্বকালেই আমরা জাতীয় জীবন ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি। জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা আসিলে কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত প্রত্যেক বিষয়েই জনগণের প্রাণে কর্মশক্তি বাড়িয়া উঠে, প্রাণে উদ্দীপনা আসে এবং মিলিত হইয়া কাজ করিবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, একথা যে কত বড় সত্য তাহা আমাদের জীবিতকালেই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙলা দেশের ও সাহিত্যের একটি গৌরবময় যুগ। এ শতাব্দীতে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ধর্মপ্রচারক, সমাজ-সংস্কারক বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া ভীরুকে ও দুর্বলকেও সাহসী করিয়াছে এবং বোবার কণ্ঠেও বাণী দিয়াছে। তাঁহাদের সেই সংগীত, সেই নাটক, কাব্য, ধর্ম সারা ভারতবর্ষেই আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে একে একে তাঁহাদের কথাই বলিব।

বাঙলা সাহিত্যের প্রতি সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের তেমন অনুরাগ ছিল না। ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা, ইংরেজী ভাবাপন্ন হওয়া অখাদ্য ভোজন ছিল সেকালের সমাজ সংস্কার ও স্বদেশ হিতৈষণার প্রথম অঙ্গ। মধুসূদনও প্রথমত বাঙলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না, কিন্তু একদিন বঙ্গ ভারতীর শুভ আহ্বান-বাণী তাঁহার প্রাণে নব আশা ও শক্তির সঞ্চার করিয়া দিল। এবং তাঁহার লেখনী হইতে বাহির আসিল--

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
* * * * *
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারীদশা তবে কেন তোর আজি
যা ফিরি অজ্ঞান তুই! যারে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥"

সেদিন হইতেই বাঙলা সাহিত্যের খনি হইতে মণিমালা সংগ্রহের জন্য শিক্ষিত বাঙালী আত্মনিয়োগ করিলেন। সে দিন বাস্তবিকই অতি শুভ দিন।

মধুসূদনকে কুললক্ষ্মী স্বপ্নে যে শুভ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহার পূর্বে আমাদের কি প্রিয় ছিল?

"ইংরাজের শ্মশ্রু ইংরাজের কেশ,
ইংরাজের আহার—প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ সবে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্যবল?

---

* প্রদীপ—তৃতীয় ভাগ, পৌষ, ১৩০৬ সাল, ২য় সংখ্যা। অক্ষয়কুমার মৈত্রের লিখিত সেকাল নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহ চর্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ!"

আর সে সময়কার শিক্ষিত বাঙালীর সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তাহা সেকালের কবির উক্তি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে:

যে ভাবে দেশের হিত, না বুঝি তাহার চিত,
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে।
না জানি দেশ বা কার? দেশে কার উপকার?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে?
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশ হিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী!
ঢাল মদ! তামাক দে! লাও ব্রান্ডিপাণি।
* * * *
ধর তবে গ্লাস আঁটি, জ্বলন্ত বিষের বাটী
শুনে তবলার চাঁটি, বাজে খন্ খন্।
নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ,
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুংকার গর্জে॥
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,
অধম বাঙালী হতে, হবে কোন কাজ?
ধরিতে মনুষ্য দেহ, নাহি করে লাজ? *

বাঙালী যখন এইভাবে আত্মসুখে মগ্ন, হতচেতন, বিলাসবাসনে নিমজ্জিত এবং অমিত্ব লইয়া বিভোর, কেমন করিয়া নিজে বড় হইব কেমন করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া আপনাকেই বড় করিব ভাবে আত্মসমাহিত, যখন তাহাদের মনে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের মধ্য দিয়াই যে নিজের কল্যাণ এবং দশজন মিলিয়াই যে দেশ এবং দেশের উন্নতি হইলেই যে আমারও উন্নতি, সে বোধশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তখন আত্মোন্নতি বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন 'আমি এবং আমার', ইহাদের উপর যে 'আমাদের' দেশ, আমাদের ভাষা, আমাদের জাতি এই ভাব ত তাহাদের ছিল না। যে মহাপুরুষেরা বাঙালীর ও ভারতবাসীর প্রাণে স্বদেশপ্রীতির মহামন্ত্র জাগরিত করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন বাঙালী জাতির চিরবন্দনীয়।

এই বন্দনীয় মহামানবেরা হইতেছেন, দীনবন্ধু মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র এবং বঙ্গের নানা স্থানের প্রসিদ্ধ কবি ও লেখকগণ।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙলা দেশে তিনজন মহামানবের জন্ম হয় আমি এখানে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের কথা বলিতেছি। এবং এই সময়েই কবি নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বহু মনীষী ও স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইঁহাদের পূর্ববর্তীকালের ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন খাঁটি হিন্দু ও স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি।

হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা ১৮৬৭ সাল

হিন্দুমেলা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলা ১২৭৪ সালে স্থাপিত হয়। এই হিন্দু মেলা স্থাপনের মূলে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ ও কবি। দ্বিজেন্দ্রনাথ নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে এই মেলার সূত্রপাত করেন। এ সম্বন্ধে স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার লিখিত 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: 'বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাহাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হত। এই মেলা উপলক্ষ্যে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সংগীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সংগীতের জন্মদাতা,—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান......

* * উপরে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্মী হলেন, আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল, তিনি সর্বদা আমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তিনি ভারী চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus * * তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাশনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁরি নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল; দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না। শীঘ্রই নিবে গেল। এই স্বদেশী ভাবের যে পুনরুদ্দীপন হয়েছে এ ভাব যদি দেশময় বিস্তার লাভ করে শাশ্বতকাল স্থায়ী হয়, তা হলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।" (আমার বাল্যকথা ৩৬—৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

নবগোপাল মিত্র ও জাতীয় মেলা

আমরা জাতীয় মেলার প্রবর্তক স্বদেশহিতৈষী এবং জাতীয় দলের একরূপে স্রষ্টা নবগোপাল মিত্রের কথা বিস্মৃত হইয়াছি। বর্তমান ভারতের বা বাঙলার স্বদেশপ্রেম জাগরিত করিবার মূলে নবগোপালের প্রচেষ্টা যে কত বড় সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, তাহা সেকালের প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী ও সংবাদপত্রাদি আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। নবগোপাল মিত্রের জীবনী ও তাঁহার কার্যাবলীর ইতিহাস সংগ্রহের সময় আসিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' আর তারপরে হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতায় দেশ-মুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত; তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলায় গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়', গণদার লেখা 'লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি ক'রে', বড়দাদার মলিন মুখচন্দ্রমা তোমারি।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড অবতরণিকা ৯/০]

হিন্দুমেলার জাতীয় সংগীতগুলি ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিরচিত হইয়াছিল। কোন্ গানটি সর্বপ্রথম বিরচিত ও গীত হইয়াছিল, হিন্দুমেলা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি না দেখিলে তাহা বলা কঠিন। তবে অনেকেই অনুমান করেন যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' গানটিই সর্বপ্রথম গীত হয়। গানটির রচনাকাল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ। সে হিসাবে উহার বয়স হইতেছে প্রায় ৭৬ বৎসর। মলিনমুখচন্দ্রমা সংগীতটি হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গীত হইয়াছিল।

নটবেহাগ—পোস্ত

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্রজিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি॥

সে সময়েই শুধু নয় এক সময়ে এই সংগীতটি বাঙলার নানা-স্থানে গীত হইত।—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন হিন্দুমেলার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রচিত কয়েকটি সংগীত সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত গানটি ছিল সর্বত্র পরিচিত।

বাহার—খং

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥

সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই,
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে।
দেশান্তরে জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়; বিদেশীর তরে।
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।

হিন্দুমেলায় গীত সংগীতের সংখ্যা ছিল অনেক। সমুদয় গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা এখানে সম্ভবপর নহে। তবু এখানে কয়েকটি জনপ্রিয় সংগীত উধৃত করিলাম।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা

এ দেশের দুখে কার না সরে চখের জল।
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল॥
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারত।
ভাই ভাই মিলে সবে হও একদল॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল রবে।
বিনা মিলে কোন কাজ হয় কি সফল!

সে সময়ে জাতীয় জীবনের কল্পনা সমগ্র ভারতবর্ষকে আদর্শ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কবিরা ভারতের দুঃখেই অশ্রু-বিসর্জন করিতেন। তখনকার লেখকরা বলিতেনঃ—"যখন জাতীয় জীবনের কথা প্রসঙ্গে আমরা সসাগরা ভারতভূমি ও ভারতীয় প্রাচীন আর্য জাতির নাম গ্রহণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়, বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে, অন্তরে লুক্কায়িত শোকসিন্ধু অনিবার্য বেগে উথলিয়া উঠে। মেঘমণ্ডিত হিমাচল পংক্তিতে ধবলগিরি বড় উচ্চ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবিরা, কল্পনাকে ঊর্ধ্বে তুলিতে হইলে, স্তিমিতনেত্র হইয়া উহার উচ্চতার ধ্যানে নিমগ্ন হন। ভারতবর্ষের মস্তক এক সময় এই ধবলশৃঙ্গকেও অতিক্রম করিয়াছিল। যে ভয়সংকুলা সমুদ্রমালা মেখলার ন্যায় ভারতভূমির কটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, নাবিক সম্প্রদায় তাহার দুস্তর তরঙ্গরাজি দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত হন। ভারতের প্রতাপ তরঙ্গ এক সময়ে উহা অপেক্ষাও উত্তাল ছিল। সেই ভারত এইক্ষণ উদীচীন পর্বত সীমা হইতে সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং সিন্ধুনদরেখা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এক সুবিস্তীর্ণ ভয়ঙ্কর শ্মশান। বায়ু প্রকৃতির দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাসের ন্যায় হা হা করিয়া বহিতেছে; নদীর জল যেন জিজ্ঞাসু হইয়া জোয়ারে উঠিতেছে, ভাটায় নামিতেছে, বৃক্ষরাজি নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুরাতন ঢেউয়ের সাক্ষীরূপী অচলসমূহ নীরবে অবলোকন করিতেছে, কেহ কোন কথার উত্তর দেয় না। ভারত—শ্মশান।" [বান্ধব—১২৮২, পৌষ—জাতীয় জীবন, প্রথম খণ্ড—১৫৯-৬০ পৃষ্ঠা।]

সেকালের হিন্দুমেলার সংগীত রচয়িতাগণ ভারতের দুঃখেই হাহাকার করিয়াছেন। বাঙলা দেশকে তাঁহারা লক্ষ্যই করেন নাই। আর তাহার ভিতরে ছিল শুধু উত্তর ভারতের গৌরব কাহিনী, রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শ নরনারীর উল্লেখ ও যোদ্ধৃগণের বীরত্বের উল্লেখ—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির কথা। যেমনঃ—

'ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ!

আর নারীগণের মধ্যে—প্রায় সব সংগীতেই দেখিতে পাইঃ—

শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা! —এইরূপ।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ 'দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চ কণ্ঠে রটাব, ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ্ কতটা গড়ে তোলা হ'ল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।' [রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড—অবতরণিকা ১৷৷০]

সে সময়ে সেই হিন্দুমেলার যুগে যে স্বদেশপ্রীতির বন্যা প্রবাহিত হইল, তাহাতে ছিল শুধু ক্রন্দন, হা হতাশ আর ছিল ভারতের অতীত কথার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস! দেশ ছিল মাটি—মানুষ সেখানে ছিল না। সেকালের হিন্দুমেলার আরও কয়েকটি গানের প্রথম দুই চারি পংক্তি উধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ইহা বেশ বুঝা যাবে।

১। আসি ভারত ভূমে, একবার দেখে যাও আর্যগণ।
কোথা ব্যাস বশিষ্ট বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন॥
২। প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ।
ভূমণ্ডলে নাহি মেলে দ্বিতীয় আর এমন।
৩। বল এই কি সেই ভারত! বল এই সে ভারত রে॥

* * * *

যে ভারতে শত শত মুনি ঋষি,
যাগযজ্ঞে রত ছিলেন অহর্নিশ,
যে ভারতে ছিলেন সর্বপদবিনাশী,
তত্ত্বদর্শী মহেশাদি দেব যত।
৪। দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান॥
৫। দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র কন্দরে বসি।
রাহুভয়ে শশী যেন, ভূতলে পড়েছে খসি।
আলুলায়িতকেশা, ছিন্ন ভিন্ন মলিনবেশা,
আহা মরি কি দুর্দশা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসী।
বলে দীন,—হে বিধাত! হয়ে ভারত বীরেন্দ্র
মাতা, বিজাতি-বিপক্ষ হাতে হইলাম লাঞ্ছিত।
হায়! পুত্র হয়ে মাতৃ দুঃখ কেননা নাশিছে আসি।
অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারণের জননী।
ভারতের স্বাধীনতাধনি, অশ্রুমুখী দিবানিশি।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সকল জাতীয় সংগীত রচিত হইয়াছিল তাহার লেখকগণ মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, আনন্দচন্দ্র মিত্র রাধানাথ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় কেদারনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ দাসের রচিত নিম্নলিখিত সংগীতটি বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।

রাগিনী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান।
হায় কি তামসী নিশি ভারতমুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোকসাগরেতে ভাসি ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব যশোরাশি কাঁদিতেছে অবিরল;
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল!

এই গানটি প্রচারের অন্যতম কারণ লেখক উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে এই গানটি সংযোজিত থাকায়, বিশেষ সুরেন্দ্রবিনোদিনী রঙ্গালয়ে অভিনীত হওয়ার দরুণ লোক মুখে মুখে এই সংগীতটি এক সময়ে গীত হইত। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।।

কবি হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত সঙ্গীত' ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেকালের যুবকেরা, যাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের মুখে শোনা যাইতঃ

বাজরে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে—
'সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

রঙ্গজগৎ

নিউ এম্পায়ারে নৃত্যগীতানুষ্ঠান

আগামী ২৬শে মে নিউ এম্পায়ারে তিমির বরণ ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক নৃত্যগীত ও অর্কেষ্ট্রা-সংগীত সহযোগে [illegible] হবে যে সংবাদ আমরা পেয়েছি।



কুমারী গায়ত্রী রায় : নিউ এম্পায়ারে বিশিষ্ট নৃত্য-ভূমিকায় এঁকে দেখা যাবে।

এই অনুষ্ঠানে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের বহু মহিলা-শিল্পী অবতীর্ণা হবেন তার মধ্যে সরস্বতী দেবী, সীতা গুহ, গায়ত্রী রায়, জ্যোতিকণা রায়, দীপ্তি সান্যাল, [illegible], [illegible] ব্যানার্জি, শীলা ব্যানার্জি, বেলা মুখার্জি, ইন্দ্রাণী রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্য-শিল্পী বুলবুল চৌধুরী, [illegible] ও [illegible] প্রদীপের নর্তক সেবকরাকে বিশিষ্ট নৃত্য অংশে দেখা যাবে।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও গীতশ্রী শুভা দত্ত এই অনুষ্ঠানের পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করছেন।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন

গত ১০ই বৈশাখের 'দেশে' অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালী তরুণ-তরুণীদের চলচ্চিত্রে যোগদান সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলাম, আমাদের সেই মন্তব্যে কেউ কেউ ভুল বুঝেছেন বলে আবার সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের এই মন্তব্যের সমালোচনা করে মনোহরপুকুর রোড থেকে এক ভদ্রলোক একখানা দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর সুদীর্ঘ চিঠিখানা এখানে উধৃত করা সম্ভব নয় বলে তিনি যে প্রধান প্রধান যুক্তি কয়টির অবতারণা করেছেন, তারই জবাব দেবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই বলে রাখি যে শিক্ষিত বাঙালী তরুণ-তরুণীকে কেরাণীগিরির দিকে না ঝুঁকে চলচ্চিত্রে যোগ দেবার যে উপদেশ আমরা দিয়েছিলাম—তার দ্বারা আমরা কেরাণীগিরিকে অসম্মানজনক কাজ বলে বোঝাতে চাইনি। আমাদের চলচ্চিত্র জগতে যাতে নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীর আমদানী হ'তে পারে এবং আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র শিল্প যাতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এ মন্তব্য করেছিলাম। পত্র লেখক ভদ্রলোক যদি ভাল করে আমাদের মন্তব্যটি পড়েন তবে দেখতে পাবেন যে, চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষকেও আমরা রেহাই দিই নি; তাঁদের চিরাচরিত রক্ষণশীলতা, উৎসাহের অভাব প্রভৃতিকে আমরা যেমন নিন্দার্হ মনে করি, তেমনি চলচ্চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর উন্নাসিক ধারণাকেও নিন্দনীয় বলে মনে করি। আমাদের পত্রলেখক নিজেকে "শিক্ষিত, মার্জিতরুচিসম্পন্ন, উচ্চ বংশোদ্ভূত বাঙালী" বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর চিঠি পড়ে দেখা গেল যে, চলচ্চিত্র জগতেও তিনি কিছুকাল বিচরণ করে হতাশ হয়ে সম্প্রতি কেরাণীগিরির স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। চলচ্চিত্র জগৎ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে আমাদের চেয়ে বেশী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই; কাজেই তিনি 'স্টুডিয়ো ক্লিক' প্রভৃতি যে সব আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন তার সত্যতা আমরা মেনে নিলাম। এসব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তি যদি একবার চিত্র-জগতে কাজ করার সুযোগ পায়, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোন কিছুই ন্যায় পথে চালিত হয় না; চলচ্চিত্র-শিল্পও এই ধনতান্ত্রিকতার দোষগুলোর হাত থেকে মুক্ত নয়। অনেক দলাদলি অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে থাকা খুব স্বাভাবিক—ক্ষমতা থাকলে শেষ পর্যন্ত এসব বাধাবিঘ্নের হাত হয়ত এড়ানো যায়। যাদের ক্ষমতা থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকে, অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ও কম কৌশলী যারা তারা প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে বাধ্য হয়। ধনতন্ত্রের অতি সাধারণ নিয়মানুযায়ীই এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। যতদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন এসব গলদ থাকবেই।

তারপর চলচ্চিত্র জগতের আয়ের অনিশ্চয়তার কথা। পত্রলেখকের এ অভিযোগের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সত্য আছে। তবে এর প্রত্যুত্তর এই যে, চলচ্চিত্র জগতের আয় যেমন অনিশ্চিত—তেমনি কাজে উৎকর্ষ দেখাতে পারলে আয়ের অঙ্কটা সময় সময় এত স্ফীত হয়ে যায় যে, অনেক বড় সরকারী চাকুরেও সেটা কল্পনা করতে পারেন না। চলচ্চিত্র জগতে বড় শিল্পী হ'তে পারলে (প্রয়োগশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, সংগীত শিল্পীই হোন্ আর অভিনেতা অভিনেত্রীই হোন্) তাঁদের কাজের অভাব হয় না। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্প প্রতিদিন দ্রুতপদে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে; যতদিন যাবে এ পথে সম্ভাবনাও তত বাড়বে। অবশ্য চলচ্চিত্র জগতে কৃতকার্যতা অর্জন করতে হলে প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয়। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি করতে গেলে এ লড়াই করতেই হয়—এতে বিস্ময়ের কি আছে?

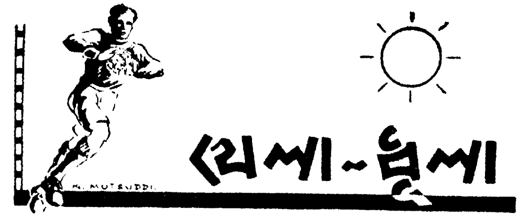
আমাদের পত্রলেখক ভদ্রলোকের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। আশা করি তিনি এগুলো ভেবে দেখবেন। আমাদের চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষ যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নন সে কথা জানি; মিথ্যা দলগত স্বার্থে এঁরা যে অনেক সময় যোগ্য শিল্পীকে সুযোগ দেন না, সেটাও সত্য। চলচ্চিত্রের এই দূষিত আবহাওয়াকে যতটা সম্ভব দূর করার জন্যই ত শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেখানে ভীড় জমানো উচিত। এইটেই ছিল আমাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভক্ত কবীর

ইউনিটি প্রোডাকসন্সের হিন্দী চিত্র। পরিচালক : রামেশ্বর শর্মা; কাহিনী, চিত্রনাট্য প্রভৃতি : পণ্ডিত শিবকুমার; আলোকচিত্র : জি কে মেহতা; শব্দযন্ত্র : চার্লস্ ক্রীড্, মায়া লাডিয়া ও এস কে ব্যানার্জি; সংগীত পরিচালক : হিমাংশু দত্ত সুরসাগর। ভূমিকায় : মেহতাব, পদ্মা দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, মাজাহার খান, ভারতভূষণ প্রমোদ গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

ধর্মমূলক চিত্র-বিচারে প্রধান মুস্কিল এই যে, আমাদের বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-বুদ্ধি পরিপুষ্ট মন সাধারণত অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করতে চায় না—অথচ এ জাতীয় ছবিতে প্রায় অলৌকিক ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। বর্তমান চিত্রখানি এ হিসাবে ব্যতিক্রম হতে হতে হয়নি—কাহিনীকার অলৌকিক ঘটনার মোহ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। প্রখ্যাত ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ভক্ত কবীর ঐতিহাসিক চরিত্র—অথচ ভক্তদের কৃপায় তাঁকে ঘিরেও অনেক অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। জোলার ঘরের ছেলে কবীর কি ক'রে বড় হয়ে ধর্মপ্রচারক হলেন এবং কেমন করে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে একতাবদ্ধ করে তাঁর ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তুললেন তারই বিচিত্র কাহিনী 'ভক্ত কবীরে' রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কবীরকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ হিসাবেই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তবু মাঝে মাঝে অলৌকিক ঘটনা উঁকি না দিয়ে পারেনি। এ সত্ত্বেও 'ভক্ত কবীর'কে প্রথম শ্রেণীর চিত্রের পর্যায়ে ফেলা যায়। যে মহাপুরুষের জীবন এই চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে, তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বড় সাধক। তাঁর ধর্মের মূল মন্ত্র ছিল এক ভগবান, এক জাতি। বর্তমান যুগের এই সর্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা আমাদের জাতীয় জীবনে জগদ্দল পাষাণের মত চেপে বসেছে। 'ভক্ত কবীরে'র মত চিত্র এই সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে অনেকটা সাহায্য করতে পারে বলে মনে হয়।

কবীর তাঁর মূল্যবান দোঁহার জন্য সুপরিচিত—'ভক্ত কবীর' তাই হয়েছে প্রধানত গীতিমূলক চিত্র। সুরশিল্পে হিমাংশু দত্ত সুরসাগর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাম ভূমিকায় ভারতভূষণ গানে এবং চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। ছোট কবীরের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করেছে, তারও অভিনয় বেশ ভাল হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে কবীরের মা ও বাবার ভূমিকায় যথাক্রমে মেহতাব ও মজাহার খাঁন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই। শব্দগ্রহণ ও আলোকচিত্র গ্রহণ উচ্চাঙ্গের হয়েছে।



ওয়াটার পোলো খেলা

বাঙলার সন্তরণ মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। গত এক মাস কলিকাতার সকল সন্তরণ ক্লাবের সভ্যগণ সন্তরণের বিভিন্ন কৌশল এবং ওয়াটার পোলো খেলার অনুশীলনে ব্যস্ত আছেন। তবে এই উৎসাহ ও তোড়জোড়ের মধ্যে বাঙলার সন্তরণ পরিচালকমণ্ডলী, বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা কি বৃহৎ পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিয়া নীরব আছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। তাঁহাদের এই নীরবতা আমাদের বিশেষ ভাল মনে হইতেছে না। গত বৎসর তাঁহারা মরসুমের শেষ সময় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ওয়াটার পোলো খেলাটির সমূহ ক্ষতি করিয়াছিলেন। "প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। তাহার ব্যবস্থা হইতেছে" এইরূপ বিজ্ঞপ্তি দিয়া তাঁহারা বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করিয়া শেষ পর্যন্ত কোন অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। ফলে ওয়াটার পোলো খেলোয়াড়গণ খুবই মর্মাহত হইয়াছিলেন। প্রতিবাদস্বরূপে খেলোয়াড়গণের মধ্যে কেহ কেহ পরিচালকগণের নিকট উপস্থিত হইলে, তখন তাঁহাদের এই বলিয়া আশ্বস্ত করা হইয়াছিল যে, আগামী বৎসরে মরসুমের প্রথম হইতেই ওয়াটার পোলো খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইবে। তাঁহাদের সেই আশ্বাসবাণী কতখানি আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যাইতেছে। সন্তরণ মরসুম এক মাসের উপর আরম্ভ হইয়াছে—এখনও তাঁহারা এই খেলার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহার কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। ফলে হইয়াছে এই যে, বিভিন্ন ক্লাবের ওয়াটার পোলো খেলোয়াড়গণ মরসুমের সূচনায় যেরূপ মনোযোগসহকারে অনুশীলন খেলায় যোগদান করিতেন ও খেলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহাতে শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "প্রতিযোগিতা যখন অনুষ্ঠিত হইবে না, তখন পরিশ্রম করিয়া কি হইবে?" এইরূপ উক্তি প্রকৃতই দুঃখদায়ক। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যদি সন্তরণ মরসুম আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটার পোলো লীগ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন, কোন খেলোয়াড়ই উক্তরূপ মন্তব্য করিবার সুযোগ পাইতেন না।

বাঙলার সাঁতারুগণ সন্তরণের বিভিন্ন বিষয় ও ওয়াটার পোলো খেলায় ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বহুবার প্রমাণিত করিয়াছেন। নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে অথবা বাঙলার বিভিন্ন সন্তরণ ক্লাবের সাঁতারুগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যতবার ভ্রমণ করিয়াছেন, ততবারই বাঙলার অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু গত ২।৩ বৎসর ধরিয়া বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যেরূপ কর্মপটুতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়, বাঙলার সাঁতারুগণ পূর্বের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠান শীঘ্র সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, নতুবা আমাদের উক্তি সম্পূর্ণ যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা প্রমাণিত হইত।

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন বাঙলার সন্তরণ বিভাগের উন্নতির জন্যই গঠিত হইয়াছে। সন্তরণের সর্ববিভাগে, এমন কি ওয়াটার পোলো খেলায় বাঙলার উৎসাহী সাঁতারুগণ ক্রমোন্নতির পথে চালিত হইতে পারেন, তাহার বিহিত ব্যবস্থা তাঁহাদেরই করিতে হইবে। অথচ তাঁহারা সেই সকল ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, সামান্য কয়েকটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা পর্যন্ত করিতে পারেন না দেখিয়া আমরা খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। কোন ব্যবস্থাই করিব না, কেবল পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিব, ইহার সার্থকতা যে কি আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়গণ সূচনায় যেরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহার কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। কোন দল লীগ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবেন, তাহা এখনও বলা কঠিন। প্রথম ডিভিসনের ডালহৌসী, রেঞ্জার্স ও কাস্টমস্ এই তিনটি দল ব্যতীত সকল দলের খেলায় বিশেষ তারতম্য হইতেছে না। লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলে কয়েকজন বাহিরের খেলোয়াড় যোগদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে দলের শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। তাঁহাদের আক্রমণভাগের বিশিষ্ট খেলোয়াড় সুনীল ঘোষ এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলিয়া আহত হইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। তিনি এই বৎসরের লীগ খেলায় আর যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার অভাব আক্রমণভাগকে অনেকখানি শক্তিহীন করিয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং দল পুরাতন খেলোয়াড়দের উপরই নির্ভর করিয়া আছে। কোন দিনই এই দল উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই পর্যন্ত এই দল কোন খেলায় পয়েণ্ট হারায় নাই। মোহনবাগান ক্লাব কোন খেলায় পরাজিত হয় নাই বটে, কিন্তু অধিকাংশ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সহিত পয়েণ্ট বণ্টন করিয়াছে। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে মোহনবাগান দলকে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। এরিয়ান্স, ভবানীপুর, কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি দল লীগের সূচনায় যেরূপ খেলিয়াছে, এখনও সেইরূপ খেলিতেছে। চ্যাম্পিয়ান হইবার জন্য এই সকল দলের বিশেষ আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হয় না। দৃঢ়তার অভাব এই সকল দলের খেলোয়াড়গণের মধ্যে খুবই পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বি এন্ড ও রেল দল সূচনায় যেরূপ খেলিতেছিল, তাহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ই মে

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, সোভিয়েট বাহিনী নভরোসিস্কের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং বর্তমানে নভরোসিস্ক এলাকায় তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

আলজিয়ার্স বেতারে বলা হইয়াছে যে, তিউনিস ও বিজার্তার মধ্যে এক বৃহৎ এক্সিস সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। রণাঙ্গনের আমেরিকান অংশে শত্রু সৈন্যেরা বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করে। শুধু এই অংশেই ২৫ হাজার এক্সিস সৈন্য বন্দী করা হয়।

'এসোসিয়েটেড প্রেসের' বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, মংদতে বৃটিশ পক্ষের অবস্থিতি বিপজ্জনক হওয়ায় এবং সেখানে বর্ষার সময়ের জন্য বহু রসদাদি গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া মিত্রপক্ষের বাহিনী আরও উত্তরে কক্সবাজারের দিকে সরিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বর্তমানে মংদ দখলের জন্যই যুদ্ধ চলিতেছে।

বোম্বাইয়ের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ধারওয়ার জেলায় অনিষ্টকারীদের সহিত পুলিসের সংঘর্ষকালে তিনজন অনিষ্টকারী নিহত হইয়াছে।

কলিকাতায় ট্রামগাড়িতে আরোহীদের সহিত ট্রামের লোকজনের দুইবার সংঘর্ষ হয়। ফলে কয়েকজন আরোহী এবং ট্রাম কর্মচারী আহত হয়।

ইন্দোরের মহারাজা হোলকার তাঁহার রাজ্যে প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করার আদেশ দিয়াছেন।

১২ই মে

ওয়াসিংটনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, মিঃ চার্চিল সেখানে পৌঁছিয়াছেন এবং রুজভেল্ট-চার্চিল আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ চার্চিলের সহিত ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল এবং অন্যান্য কয়েকজন সমরনায়ক ওয়াসিংটনে আসিয়াছেন।

জার্মান নিউজ এজেন্সী কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, কুবানে এক্সিস ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে আরও সোভিয়েট সৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ইসমাইল একটি মামলার রায়ে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রেজগী মজুদ রাখা ভারতরক্ষা বিধানের ৯৩ ধারার দুই উপধারার (খ) দফা অনুসারে অপরাধজনক নহে।

উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকাস্থিত এক্সিস বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফন আর্নিম চতুর্থ ভারতীয় ডিভিসনের সৈন্যদল কর্তৃক বন উপদ্বীপে বন্দী হইয়াছেন। ফন আর্নিমের সহিত আরও ১১ জন এক্সিস জেনারেলকে বন্দী করা হইয়াছে।

১৩ই মে

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অদ্য নৈনী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে আলমোড়ায় অন্তরীণ করা হইয়াছে।

ওয়াসিংটনে মার্কিন ও বৃটিশ সমর-নায়কগণের গোপন বৈঠক চলিতেছে। ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল এবং ভারতীয় রণাঙ্গনের তিনজন প্রধান সমরনায়ক ওয়াসিংটন বৈঠকে যোগদান করায় পর্যবেক্ষক মহল এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মিঃ চার্চিল ও রুজভেল্ট হয়তো জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার এবং ইউরোপে আঘাত হানিবার পরিকল্পনা করিতেছেন।

১৪ই মে

করাচীতে সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, সিন্ধুর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এবং নিখিল ভারত আজাদ-মুসলিম সম্মেলনের সভাপতি মিঃ আল্লাবক্সকে অদ্য সকাল ৯টার সময় শিকারপুরে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, অদ্য মিঃ আল্লাবক্স তাঁহার একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া একখানি টোঙ্গায় চড়িয়া শিকারপুর-শক্কর রোড দিয়া শক্করের দিকে যাইতেছিলেন। এই সময় চারিজন অজ্ঞাত আততায়ী মিঃ আল্লাবক্স ও তাঁহার বন্ধুর দিকে গুলী চালায়। মিঃ আল্লাবক্সের বক্ষস্থলে দুইটি রিভলবারের গুলী বিদ্ধ হয়। সিভিল হাসপাতালে লইয়া কোন প্রকার চিকিৎসা করার পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতীয় সমর বিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১১ই মে রাত্রে বৃটিশ সৈন্যেরা প্রতিপক্ষের বিনা বাধায় মংদ হইতে সরিয়া আসে এবং বর্তমানে উত্তরে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক ঘাঁটিসমূহে স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

১৫ই মে

আলজিয়ার্স রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জেনারেল জিরো তিউনিসিয়ার বেকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, ওয়াসিংটনে মিঃ চার্চিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল এবং মিঃ উইলিয়াম ফিলিপস ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার জন্য অনুরোধ জানাইবার উদ্দেশ্যে মিস পার্ল বাকের নেতৃত্বে প্রভাবশালী ভারতীয় ও আমেরিকানরা মিঃ চার্চিলের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিতেছেন।

উত্তর মুঙ্গেরের একটি গ্রামের নিকটে একখানা বৃটিশ বিমান অবতরণ করিতে বাধ্য হইলে তথায় তিনজন বৈমানিককে হত্যা করিবার অভিযোগে যে কয়েকজন আসামীকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল, নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মুঙ্গেরের স্পেশাল জজ মিঃ এস ইমাম তাহাদের সকলকেই খালাস দিয়াছেন এবং মামলাটি ডিসমিস করিয়াছেন।

১৬ই মে

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, গত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সোভিয়েট বিমান বাহিনীর যে তৎপরতা দেখা গিয়াছে, রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর এমন আর কখনও দেখা যায় নাই। ব্রিয়ানস্ক রেল স্টেশনে সোভিয়েট বিমান এমন প্রচণ্ডভাবে হানা দিয়াছে যে, জার্মানরা স্টেশন হইতে ছয় মাইল দূরে তাহাদের ট্রেনগুলি রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। নভোরসিস্ক পুনরুদ্ধারের জন্য লালফৌজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। লিসিচানস্ক অঞ্চলে জার্মানদের পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে।

জেনারেল ফন আর্নিমকে লণ্ডনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

১৭ই মে

আসাম, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং পূর্ব ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের অবাধ ব্যবসায় বাণিজ্যে যে সব বাধানিষেধ ছিল প্রথম ও শেষোক্ত স্থানের দুইটি অঞ্চল ব্যতীত ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারত সরকারের অর্থ সচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান অদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, দুইটি নূতন ব্যবস্থা হইতেছে এবং উহার ফলে দেশের দ্রব্যমূল্যের অবস্থা সন্তোষজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রথমত একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হইতেছে। অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৬৪ ভাগ ছাড়া অন্য সকল অর্থই গবর্ণমেণ্টের কাছে লইয়া আসা উহার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান অবস্থায় যাহাতে ব্যাঙের ছাতার মত কোম্পানী গজাইয়া উঠিতে না পারে, তজ্জন্য ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ীও একটি নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বৃটিশ ভারতে মূলধন নিয়োগ এবং স্টক, শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ বাজারে ছাড়া নিষিদ্ধ করিয়া ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক নূতন আদেশ জারী করা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতে বিধিবদ্ধ কোন কোম্পানী বৃটিশ ভারতে বা বৃটিশ ভারতের বাহিরে কোন মূলধন নিয়োগ করিতে পারিবে না।

আরাকানের কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ নাই। বৃটিশ বোমারু বিমান বাহিনী জঙ্গী বিমানের পাহারায় আকিয়াব দ্বীপে আক্রমণ চালায়।

তিউনিসিয়ার জয়ে মার্শাল চিয়াংকাইশেক প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট এক বাণী প্রেরণ করেন এবং প্রত্যুত্তরে প্রেসিডেণ্ট অদূর ভবিষ্যতে চীনাদের সহযোগিতায় এশিয়ায় মিত্র বাহিনীর এক আক্রমণ পরিচালনার আশা ব্যক্ত করেন।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	এক সংখ্যার জন্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা ...	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা ...	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা ...	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা ...	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর ছয় মাস তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে" পেঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনি-অর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১০৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা। (খ) ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১৫৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৭৷৷০ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পেঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵০ তিন আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্ম্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 15th May, 1943 [২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঁচিয়া থাকার সমস্যা

বাঙলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গড়পড়তা হিসাবে দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মাসিক আয় হইতেছে ৩০, টাকা, ৪০, টাকা এবং একজন শ্রমিকের আয় হইতেছে মাসিক ১৮, টাকা। এই সকল ব্যক্তির পক্ষে বর্তমানের উচ্চ মূল্যে চাউল ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব। ভগবানই জানেন, এ সব ব্যক্তি কি করিয়া বাঁচিয়া আছে। এ প্রশ্নের উত্তর স্যার নাজিমুদ্দীন সত্যই যদি চাহেন, তবে আমরা বলিব যে, তিনি যে শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া নাই। অর্থাৎ মানুষে যেভাবে বাঁচিয়া থাকে, সেভাবে তাঁহারা বাঁচিয়া রহে নাই। অর্ধাহারে এবং অনাহারে কোন প্রকারে দুর্বহ জীবনের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। এভাবে কোন দেশে মানুষ বাঁচে না ; সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা করিলে আমাদের মনুষ্যত্বের সম্বন্ধেই আমাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। সুবে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীনের মনে এই চিন্তা যে আলোড়ন তুলিয়াছে, ইহা সুখের বিষয় ; কিন্তু শুধু মুখের কথায় এ সমস্যার সমাধান হইবে না; এজন্য কার্যত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। আমরা সরকারী সদিচ্ছাপূর্ণ উক্তি এবং বিবৃতিই পাইতেছি ; কিন্তু নূতন মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সমস্যার সমাধান তো কিছুই হয় নাই বরং শহর এবং মফঃস্বল সর্বত্র সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে এবং উত্তরোত্তর তাহার গুরুত্বই অসাধারণ রকমে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙলার গ্রামে গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে । সে দৃশ্যের শোচনীয়তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মন্ত্রীরা কেবল আমাদিগকে স্তোকবাক্যই শুনাইতেছেন। খাদ্য বিভাগের সচিব চৌদ্দগণ্ডা 'যদি' জুড়িয়া এ সমস্যা সমাধানের যে পথ নির্দেশ করিতেছেন, তাহাতে দেশের লোকের মনে নৈরাশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেদিন একটি বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, যদি লাভ-খোরেরা মজুত মাল বাজারে ছাড়ে, যদি লোকের খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার ঝোঁক হ্রাস পায়, যদি ভগবানের দয়া তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি থাকে, তবে তাঁহারা এ সমস্যার সমাধান করিবেন, এমন আশা রাখেন। মন্ত্রী মহোদয়গণকে এই সম্পর্কে আমাদের একটি কথা বলিতে বিশেষ ইচ্ছা হয় তাহা এই যে, তাঁহার কথায় কথায় এ বিষয়ে ভগবানের দোহাই দিতেছেন, কেন আমরা বুঝি না। ভগবানের যে কাজ তাহা ভগবানের উপর রাখিয়া তাঁহারা নিজেরা কি করেন, আমরা তাহাই দেখিতে চাই। এই সমস্যা সমাধানের পথে ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর যে সকল অন্তরায় ছিল, মিঃ ফজলুল হক পর পর কলিকাতায় কয়েকটি বক্তৃতায় সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। হক সাহেবের সেই সব অভিযোগ হইতে বুঝা যায় যে, এই প্রদেশের চাউল সম্পর্কে গভর্নর স্বীয় দায়িত্বে অনেক কিছু করিয়াছেন। বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে এবং তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলীকে এ বিষয়ে যথাসম্ভব দূরে রাখা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে এই কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় নাই। হক সাহেবের মতে চাউল রপ্তানিও এই সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বাঙলার কয়েকটি প্রাচুর্যপূর্ণ জিলা হইতে চাউল সরানোর দরুণ এবং নৌকা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার ফলে খাদ্য সমস্যার জটিলতা বাড়িয়াছে। এই সব অভিযোগের সত্যা-সত্য আমরা জানি না ; তবে এ কথা শুনিতেছি যে, খাদ্য সমস্যার অভাব তেমন ঘটে নাই। উহার পর বহু পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য প্রতিদিনই বাহির হইতে বাঙলাদেশে আসিতেছে। বে-সামরিক

বিভাগের একটি প্রচারপত্রে সেদিনও বলা হইয়াছে যে, ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলাকে দৈনিক ১৫০০ টন খাদ্য শস্য দিয়া সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা বর্তমানে মাসে ১৫ লক্ষ মণ চাউল এবং প্রায় ১২॥ লক্ষ মণ সত্য আমরা জানি না; তবে এ কথা শুনিতেছি যে, খাদ্য-শস্যের মূল্য কমিতেছে না কেন, ইহাই রহস্য। লোককে আশ্বস্ত হইতে বলিলেই তাহারা আশ্বস্ত হইতে পারে না; কিংবা বাজারে আশ্বস্তির ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে; কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই প্রয়োজন। সেদিন কলিকাতায় একটি সভায় মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছেন যে, বাঙলা সরকার নিজেরা উচ্চ মূল্যে চাউল ক্রয় করিয়া বাজারে দশ টাকা দরে বিক্রয় করুন; এজন্য যে টাকা দরকার হইবে তাহা সরকারী তহবিল হইতে লওয়া হউক। জানি না, বাঙলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে এতখানি আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে কি না। যদি এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে অন্য পথ তাঁহারা অবলম্বন করুন। তাঁহাদের মুখে শুধু স্তোকবাক্য শুনিয়া তৃপ্ত হইবার মত ধৈর্য দেশের লোকের নাই; এ সত্য যত সত্বর তাঁহারা উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।

জাতীয় গভর্নমেণ্টের দাবী

গত ৮ই মে কলিকাতা শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে বাঙলা দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের গুরুত্বের উপর জোর দিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলন এই দাবী করিয়াছেন জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। এ সম্বন্ধে দেশবাসীর কাহারও দ্বিমত নাই। বাঙলার সর্বপ্রধান সমস্যাই হইল দেশের খাদ্য সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধান দেশের সকল দলই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই যুক্তির ভিত্তিতেই বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল পুনর্গঠনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল দলের প্রতিনিধিদের লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয় নাই; পক্ষান্তরে বাঙলা দেশের অধিকাংশের অভিমতের দ্বারা সমর্থিত দলগুলির দাবীকে উপেক্ষা করিয়া মুসলিম লীগ এবং শ্বেতাঙ্গ দলের সমর্থনে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। দেশের জনমতের প্রভাব হইতে বঞ্চিত এমন মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা বাঙলার বর্তমানের এই গুরুতর সঙ্কট সমস্যার সমাধান কতটা সম্ভবপর হইবে, এ বিষয়ে দেশের লোকের মনে যথেষ্ট সন্দেহের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে পূর্ব পাকিস্থানী নীতি অন্য দিকে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহদের মনস্তুষ্টি এই দুই দিক বজায় রাখিয়া বাঙলা দেশের বর্তমান সমস্যার প্রতীকার সাধন করার বড় বড় কথাকে আমরা মনে প্রাণে বেশী মূল্য দিতে পারি না, এ সত্যকে সোজাসুজিই স্বীকার করিতে হইতেছে।

ইংরেজের দৃষ্টিতে ভারত

মিঃ বিভারলী নিকোলাস একজন ব্রিটিশ সংবাদপত্রসেবী। ভারতের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি কিছুদিন হইল এদেশে আগমন করিয়াছেন। সেদিন বোম্বাইয়ের একটি বক্তৃতায় মিঃ নিকোলাস ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জাতির সদিচ্ছার কথা বলেন এবং জানান যে, ইংরেজদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা ভারতবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করেন। আমরা মিঃ নিকোলাসের উক্তিকে একান্ত ভিত্তিহীন বলিব না; কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে এই যে, ভারতের প্রতি সদিচ্ছাপরায়ণ ইংরেজদের সে মনোভাব শুধু মনেই থাকিয়া যায়, কাজ হয় অন্য রকম। যাঁহারা ভারতের সম্পর্কে মুখে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই সদিচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার অধিকার লাভ করিবামাত্রই তাঁহাদেরও মনোভাব মামুলী সাম্রাজ্যবাদীদেরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কার্যত কোন পরিবর্তন ঘটে না। মিঃ নিকোলসের নিজেরও যে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ইহা আমাদের মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মিঃ নিকোলাস ভারতের সংবাদপত্রসমূহ যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এমন সব মন্তব্যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের নীতির পক্ষে প্রচারকার্য করা হয়, ইহা ঠিক; কিন্তু সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। ভারতের সংবাদপত্র পরিচালনা সম্পর্কে কিংবা সাংবাদিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা মিঃ নিকোলাসের যদি থাকিত, তবে তাঁহার মুখে ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এমন ধরণের উদ্ভট কথা আমরা শুনিতাম না। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা বিদেশ হইতে ভারতে আসেন বটে; কিন্তু ভারতের জনগণের অন্তরের সঙ্গে ইঁহাদের কোন যোগ হয় না। নিজেদের জাতিগত স্বার্থ বুদ্ধির সংস্কার ইঁহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ভারতের ৪০ কোটি লোক পরাধীনতার কি বেদনা বুকে বহন করিতেছে এবং সেই পরাধীনতার জন্য বর্তমানের এ সঙ্কটের দিনে বাস্তব জীবনে তাহাদিগকে কিরূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হইতেছে, তাঁহারা গভীরভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না এবং যতদিন সমবেদনার সেই সূত্র সুদৃঢ় না হইবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের প্রতি সদিচ্ছাপরায়ণ দুই একজন ব্রিটিশ পুরুষের কথা শুনিয়া ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই তাহাদের চতুর্বর্গ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে না।

বাঙলা ভাষায় বৈদেশিক শব্দ

গত ৮ই মে খান সাহেব সৈয়দ এমদাদ আলীর সভাপতিত্বে কলিকাতা শহরে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যই বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করিবে, সভাপতির এই উক্তি সকলেই সমর্থন করিবেন; কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার এ এফ রহমানের একটি কথা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, মুসলিম লেখকগণ আরবী এবং ফারসী শব্দভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন শব্দ বাঙলা সাহিত্যে আমদানী করিতেছেন, ইহাতে ভাষার সম্পদই বৃদ্ধি পাইবে। আরবী কিংবা ফারসী শব্দে আপত্তির কারণ আমাদের কিছুই নাই; ঐ দুই ভাষার বহু শব্দ বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক গতি আছে এবং সেই গতির সঙ্গে জাতির অন্তরের যোগ যতখানি থাকে, ভাষা ততটা সজীব এবং শক্তিশালী হয়। বাহির হইতে শব্দ আমদানীর স্বেচ্ছাচার এবং সংযমহীনতা এই স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে; আহরণ অলঙ্কার না হইয়া জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে বোঝা স্বরূপে পরিণত হয়। বঙ্গ সাহিত্যের সার্বভৌমক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রভাবিত স্বেচ্ছাচার নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে।

দৃষ্টির বৈষম্য

পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেনসেন বাঙলায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের গঠন সম্পর্কে ভারতসচিবকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া অসুবিধার মধ্যে ফেলেন; 'স্টেটস্‌ম্যান' ইহাতে উত্তেজিত হইয়াছেন। সহযোগী মিঃ সোরেনসেনকে আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের সম্পর্কে যত রকমের অভিযোগ উত্থাপন করা তাঁহার একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এক্ষেত্রে সত্যাসত্যের দিকে কোন রকম লক্ষ্য রাখেন না। মিঃ সোরেনসেন যাহাই বলুন না কেন, হক মন্ত্রিমণ্ডল শুধু সরকারী কংগ্রেস দলের ভোটের জোরে টিকিয়া ছিলেন। শেষটা ভোটের জোর মাত্র দশ ভোটে নামিয়া আসে।

সহযোগী এক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক মৌলিক নীতিই বিস্মৃত হইয়াছেন। এক মন্ত্রিমণ্ডলের জোর দুই ভোটেই নামিয়া আসুক, আর দশ ভোটেই নামিয়া আসুক, তাহা প্রধান কথা নয়, প্রতিপক্ষ দলের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন তাঁহাদের ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। দ্বিতীয়ত কংগ্রেসী দলের ভোটে জয়ী হওয়া এমন কি অপরাধের বিষয় হইয়াছে। সহযোগীর কথার ভাবে মনে হয় কংগ্রেসী দল যেন দেশের লোকের কেহ নয় এবং আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা তাঁহাদের নাই—সে বস্তুর অধিকারী একমাত্র শ্বেতাঙ্গ দল। হক মন্ত্রিমণ্ডলের পিছনে কংগ্রেসী দলের জোর ছিল, সুতরাং তাঁহাদের জোর জোরই নয়, স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডলের পিছনে শ্বেতাঙ্গ দলের সমর্থন রহিয়াছে, সুতরাং শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা সেই মন্ত্রিমণ্ডলেরই শুধু আছে; স্বার্থ বিচারবুদ্ধিকে কতটা কলুষিত করিতে পারে, 'স্টেটস্‌ম্যানের' মন্তব্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পরিবর্তন কোথায়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের আণ্ডার স্টেট সেক্রেটারী মিঃ সামনার ওয়েলস্ কিছুদিন হইতে টোলেডো শহরের এক বক্তৃতায় গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকার বর্তমান আর্থিক নীতির কিছু সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের উভয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, আমরা স্বার্থপরতন্ত্রভাবে অন্য দেশে নিজেদের আর্থিক শোষণ নীতি প্রয়োগ করিতেছি। মিঃ ওয়েলস অতীতের সম্পর্কে এই অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তিনি কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিয়াছেন, আমরা এখন আমাদের সে নীতির ফলাফল উপলব্ধি করিয়াছি এবং আর্থিক সহযোগিতার দিকে আমাদের নীতিকে ঘুরাইয়া লইয়াছি। মিঃ ওয়েলস যাহা বলিয়াছেন, আমেরিকার সম্বন্ধে তাহা কতটা সত্য, সে বিষয় আমরা তুলিব না; কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান অর্থ-নীতি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা তাঁহাকে এই কথা বলিতে পারি যে, গ্রেট ব্রিটেনের অধিকৃত স্থানসমূহে এবং বিশেষভাবে এই ভারতবর্ষে আর্থিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠামূলক নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ভারতবর্ষে গ্রেট ব্রিটেন যে নীতি পরিচালিত করিতেছে, তাহাকে কেহই আর্থিক সহযোগিতার নীতি বলিতে পারিবে না। গ্রেট ব্রিটেন যদি ভারতে সত্যই আর্থিক সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করিত, তবে ভারতের অবস্থা বর্তমানে এমন অসহায় হইত না।

ডাক্তার আম্বেদকারের আশা

ডাক্তার আম্বেদকার বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য; সুতরাং চার্চিলী বিধানানুসারে তিনি একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। সম্প্রতি এই জ্ঞানী ও গুণী ডাক্তার ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থাজনিত সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একটি মৌলিক আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাক্তার সাহেবের অভিমত এই যে, ভারতের রাজনীতিকক্ষেত্র হইতে মহাত্মা গান্ধীকে এবং মিঃ জিন্নাকে অপসারিত করিতে পারিলেই বর্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। ডাঃ আম্বেদকার এই সম্পর্কে গান্ধীজীর রাজনীতিক জীবনের তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে গিয়া রাণাড়ে এবং গোখলের রাজনীতি হইতে তাঁহার পার্থক্য কোথায় দেখাইয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী রাজনীতিক। রাজনীতিকে কার্যকর করিতে যে সব উপকরণ থাকা দরকার তিনি স্বচ্ছন্দে সেগুলির অধিকারী হইয়াছেন। জনবল এবং অর্থবল এই দুইই তাঁহার করতলগত হইয়াছে; পক্ষান্তরে তিলক, গোখলে, রাণাড়ের সমস্ত জীবন সেগুলি সংগ্রহ করিতেই কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বিশ বৎসর রাজনীতিক আন্দোলন চালাইয়া গান্ধীজী দেশের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ডাঃ আম্বেদকার যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন, মিঃ জিন্নার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ চাপাইবার সাহস তাঁহার হয় নাই। বোধ হয় সে উদ্দেশ্যও তাঁহার ছিল না। তাঁহার আক্রোশ প্রধানত গান্ধীজীরই বিরুদ্ধে, উক্তির মধ্যে যুক্তির সংগতি দেখাইবার জন্য মিঃ জিন্নাকে এক্ষেত্রে আনিতে হইয়াছে। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ডাক্তার আম্বেদকারের এ আক্রোশের কারণ উপলব্ধি করিতে বেগ পাইতে হয় না; কারণ, ভারতের রাজনীতিকক্ষেত্র হইতে মহাত্মাজীর প্রভাব অপসারিত হইলে, অন্য কিছু হউক বা না হউক, তাঁহার এবং তাঁহার অনুরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অনুরাগী দলের সুবিধা হইবে। কিন্তু মানুষকে রাজনীতিকক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিলেও প্রভাবকে অপসারিত করা যায় না, ইহাই যে সমস্যা; সুতরাং ডাক্তার সাহেবের সে সুদিন আসিবার সম্ভাবনা কোথায়?

নিষ্ফল প্রয়াস

লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস কর্মীদের কমিটি সম্প্রতি একটি নূতন উদ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করিবার জন্য তাঁহারা একটি পরিষদ গঠন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের সমর্থন লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কমিটির সেক্রেটারী একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত শক্তির পক্ষ হইতে কেহ প্রতি-নিধি স্বরূপে গিয়া ভারতবাসীদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার উপায় সম্পর্কে যাহাতে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাঁহারা সেজন্য চেষ্টা করিবেন। কমিটির এই চেষ্টা সফল হইবে, আমরা এমন সম্ভাবনা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সম্মিলিত পক্ষের কোন শক্তি যে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রি-মণ্ডলের উপর চাপ দিবেন, এমন আশা করা বৃথা। ব্রিটিশ মন্ত্রি-মণ্ডল যে বর্তমানে ভারতবাসীদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক নহেন, ভারত সচিব মিঃ আমেরী সেদিনও পার্লামেণ্টে স্পষ্ট ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐরূপ আপোষ আলোচনা চালাইলেও তাহা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। যে অবস্থার সৃষ্টি হইলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভারতবাসীদের আপোষ আলোচনা সফল হইতে পারে, ভারতে এখনও সে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মিঃ আমেরী বিশ্বাস করেন না। এমন উক্তির তাৎপর্য এই যে, ভারতবাসীরা যদি স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করে এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীদের বহু বিঘোষিত ব্রিটিশ-অভিভাবকত্বের শান্তি-সুখ ভোগ করিবার যুক্তি মানিয়া লয়, তবে আপোষ-আলোচনার সুযোগ শুধু সেই ক্ষেত্রেই উপস্থিত হইতে পারে। লণ্ডনের কংগ্রেস কর্মীরা নিশ্চয়ই এমন হীন সর্তে আপোষ চান না।

টিউনিসিয়া

বসুবন্ধু শর্মা

সম্প্রতি খবর এসেছে যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যদল টিউনিস ও বিজার্তা দখল করেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকা মহাদেশের ততোধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন টিউনিসিয়া দেশের প্রতি লোকের দৃষ্টি আরেকবার আকৃষ্ট হয়েছে। প্রায় ছয় সাত মাস পূর্বে অক্ষ-শক্তির সৈন্যদল যখন লিবিয়া ও ট্রিপোলিটানিয়া থেকে মিত্রপক্ষের তাড়া খেয়ে, এই ফরাসী অধিকৃত ক্ষুদ্র দেশটিতে প্রবেশ করেছিল, তখন থেকেই টিউনিসিয়ার সামরিক গুরুত্ব সর্বাধিক বেড়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল টিউনিসিয়ার উপর। আজ টিউনিসিয়ার দীর্ঘ নাট্যাভিনয়ের অবসান প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। বর্তমান যুদ্ধে নানা দিক থেকেই টিউনিসিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব সর্বাধিক—এ যুদ্ধের গতি যে অনেকটা টিউনিসিয়ার যুদ্ধের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আফ্রিকা থেকে অক্ষ-শক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করতে না পারলে, মিত্র-শক্তির পক্ষে ভূমধ্যসাগরের পুরো কর্তৃত্ব লাভ সম্ভবপর নয়—অথচ মিত্রশক্তির পরিকল্পিত ও প্রস্তাবিত ইউরোপীয় অভিযানের পক্ষে ভূমধ্যসাগরের একচ্ছত্র আধিপত্য নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই ক্যাসাব্লাঙ্কার সম্মেলনে মিত্রপক্ষের কর্তারা ঘোষণা করেছিলেন যে, টিউনিসিয়ার যুদ্ধ শেষ না করে তাঁরা ইউরোপে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার চেষ্টা করবেন না। টিউনিসিয়ায় যুদ্ধারম্ভের প্রথম অবস্থায় মিত্রপক্ষ খুবই আশা করেছিলেন যে, অতি শীঘ্র টিউনিসিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে—এমন কি মিত্রপক্ষের কেউ কেউ ঘোষণা করেছিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই এ যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি—ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করলেও রোমেলের সুশিক্ষিত 'আফ্রিকা কোর' নামক সৈন্যদল মিত্রপক্ষের বৃটিশ, আমেরিকান ও ফরাসী সৈন্যদের ছয় মাস ধরে বাধা দিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে বিমানের সাহায্যে স্বদেশ থেকে রোমেল নতুন নতুন সাহায্যও পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত টিউনিসিয়ার যুদ্ধ প্রায় একে ঘেয়ে হয়ে উঠেছিল—স্বাভাবিক গতি হারিয়ে এ যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল অনেকটা স্থিতিশীল। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে এই যুদ্ধ হঠাৎ আবার গতিশীল হয়ে উঠেছিল এবং মিত্রপক্ষের বৃটিশ প্রথম বাহিনী, অষ্টম বাহিনী, জেনারল আইসেনহাওয়ারের অধীনে আমেরিকান বাহিনী ও ফরাসী বাহিনীর চাপে পড়ে অক্ষ-শক্তির সৈন্যদল ক্রমাগত পিছু হটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে অবশিষ্ট ছিল শুধু টিউনিস ও বিজার্তার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি দুটি। কিন্তু এই টিউনিস ও বিজার্তার ঘাঁটি দুটি যে এত শীঘ্র মিত্রপক্ষের হস্তগত হবে, মিত্রপক্ষের বড় বড় সমর-বিশারদরাও একথা কল্পনা করতে পারেন নি। টিউনিস ও বিজার্তা দখল করতে তাঁদের প্রবল জার্মান প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে এবং কিছুটা সময়ও লাগবে—এই ধারণাই তাঁরা করেছিলেন—কিন্তু তাঁদের সকল ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ের মধ্যে এই দুটি সুরক্ষিত সামরিক ঘাটির পতন সকলকেই বিস্মিত করে দিয়েছে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির পূর্ণ আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে—অবশ্য শত্রুর ইউবোটের বিপদ হয়ত সহজে কমবে না এবং ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় রণাঙ্গনও হয়ত যথাসম্ভব শীঘ্র খোলার বন্দোবস্ত করা হবে।

বিগতপ্রায় ষাট বছর ধরে টিউনিসিয়া বিদেশী শাসকদের অধীনে আছে। প্রথম ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল অ্যালজেরিয়া থেকে টিউনিসিয়ায় প্রবেশ করেছিল। টিউনিসিয়ার ক্রুমির নামক পার্বত্য জাতি তখন মাঝে মাঝে ফরাসী অধিকৃত আলজেরিয়ার সীমান্তে হানা দিত এবং লুঠতরাজ করত। এই সব পার্বত্য জাতির সর্দারদের উপর নিজের শাসন-ক্ষমতা চাপানোর মত কোন শক্তিই টিউনিসের বে-র ছিল না। তিনি ফ্রান্স, বৃটেন ও ইংলন্ডের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন—টাকার সুদ দেবার মত ক্ষমতা যেমন তাঁর ছিল না, তেমনি টাকা ফিরিয়ে দেবার মত ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। সারা দেশে তখন অরাজক অবস্থা বললেই চলে।

তখন ফরাসী গভর্নমেন্টের কর্তা ছিলেন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ জুলে ফেরি। তিনি ক্রুমিরদের হানাকে ছল হিসাবে গ্রহণ করে বে-র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করলেন। ছোট খাটো একটা যুদ্ধাভিযানের পরে টিউনিসের বে পরাজয় স্বীকার করলেন; তিনি টিউনিসিয়াকে ফরাসীদের রক্ষিত রাজ্যে পরিণত করতে স্বীকৃত হলেন কিন্তু নিজে টিউনিসের শাসনকর্তা এবং অধিকারী রইলেন।

টিউনিসিয়ায় প্রথম ফরাসী রেসিডেন্ট জেনারেল হয়েছিলেন মঃ পল্ ক্যাম্ব। ইনি পরে ইংলন্ডে ফরাসী গণতন্ত্রের রাজদূত হিসাবে বাইশ বৎসর ছিলেন এবং ফ্রান্স ও ইংলন্ডের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে ইনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। মঃ ক্যাম্ব সম্পূর্ণরূপে বে-র শাসন সংস্কার করলেন এবং শাসন ব্যাপারে ফরাসী কর্মচারীদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সংস্কৃত রাজকোষের কাজ এত সুন্দরভাবে চলতে লাগল এবং এত শীঘ্র রাজ্যের উন্নতি হতে লাগল, যে, রেসিডেন্ট জেনারেল কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদেশীদের ঋণ শোধ করে দিতে সমর্থ হলেন। প্রথমত ইটালীর রাজ্য স্পৃহা শান্ত করার জন্য তার টাকাই সর্বাগ্রে দিলেন। তখন থেকে টিউনিসিয়ার বাজেটে কখনও ঘাটতি হয়নি—এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের চার বছরেও নয়।

আলজেরিয়া যেমন শাসন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে বিজড়িত, টিউনিসিয়া সেরূপ নয়। টিউনিসিয়া ফরাসী রক্ষিত রাজ্য মাত্র—অ্যালজেরিয়ার মত প্যারী পার্লামেন্টে তার কোন প্রতিনিধি পাঠানো হয় না। অ্যালজেরিয়ার মত টিউনিসিয়া শাসন ব্যাপারে ফ্রান্সের অন্তর্বিভাগের মন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল নয়। টিউনিসে শুধু রেসিডেন্ট জেনারেল এবং তাঁর ফরাসী কর্মচারীদের নিযুক্ত করেন বৈদেশিক মন্ত্রীত্ব বিভাগ।

ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় কৃষিকার্য খুব উন্নত; কিন্তু নানাবিধ খনিজ পদার্থে এ অঞ্চল খুব সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এখানে কার্যত কোন বড় যন্ত্রশিল্পই নেই। অতলান্তিক থেকে বিজার্তা পর্যন্ত যে পার্বত্য শৃঙ্খল চলে গেছে সেখানে বিশেষ করে আলজিয়ার্সে প্রচুর লোহা পাওয়া যায়। কিন্তু আলজিয়ার্সের এই লোহা কোন কাজে লাগানো হয় না—যদিও এত লোহা এখানে পাওয়া যায় যে, এক বছরের যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ করা যেতে পারে কিংবা শান্তিকালীন প্রয়োজনের জন্যও যন্ত্রাদি নির্মাণ করা যেতে পারে। এ সমস্ত খনিজ পদার্থই কেন অব্যবহৃত রয়েছে? কারণ লবেনে সমৃদ্ধ খনিগুলির মালিক যাঁরা তাঁদেরই গঠিত কোম্পানীকে এ সব খনি দিয়ে দেওয়া হয়েছে—তাঁরা প্রতিযোগিতার হাত এড়ানোর জন্য এই সব খনিকে ফেলে রেখেছেন। চুক্তিপত্রে এমন কোন কথা ছিল না যে, তাঁরা এই সব খনি ব্যবহার করতে বাধ্য। টিউনিসিয়ায় ক্যাম্ব কিন্তু ইজারাদারদের এই সব চালাকিতে ভোলেন নি—যখন তাঁর রিজেন্সির অধীনে খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ইজারাদারদের সম্বন্ধে যে-সব চুক্তি ও সর্ত প্রয়োগ করা হয়, সেই সব প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই টিউনিসিয়ার ফসফেট এবং লৌহখনিগুলির কাজ ভালভাবেই করা হয়েছে। ফ... দস্তা এবং ম্যাংগানিজের খনিগুলোও অব্যবহৃত নেই। মেটলাই রেডিয়েফের খনিগুলি থেকে বছরে প্রায় দু কোটি টন ফসফেট পাওয়া যায়—পরে দুটি রেল লাইনের সাহায্যে এই ফসফেট স্ফাক্স ও স... বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়।

(শেষাংশ ৩৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঁকাস্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

জ্যাঠাইমা বারণ করিয়াছেন শুনিয়া মুহূর্তে তাঁহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কিন্তু এরূপ অন্যায়কে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে বিবেচনা করিয়া তিনি একেবারে রান্নাঘরে গিয়া হাজির হইলেন এবং বারকয়েক মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—হ্যাঁগো, তুমি নাকি অলোককে বই দিতে নিষেধ করেছ?

কে বলেছে, সেই ছোঁড়া বুঝি? এই বলিয়া তিনি রাঁধিতে রাঁধিতে একেবারে তরকারীর খুন্তীটা হাতে করিয়া আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর আমার মুখের সামনে হাতমুখ নাড়িয়া অভিনয় করিবার ভংগীতে বলিলেন, বলি জ্যাঠা বাড়িতে পা না দিতে দিতেই লাগানো হয়েছে? ওঃ তবে ত আমি একেবারে মরে গেলুম ভয়ে—তিনি আমায় এখুনি কচুগাছে ফাঁসী দেবেন! বেশ করেছি—একশোবার বারণ করবো—দেখি কে আমার কি করতে পারে? এই বলিয়া তিনি যেমন বেগে প্রবেশ করিয়াছিলেন তেমনি বেগে আবার প্রস্থান করিলেন!

আমি ত হতভম্ব! যেন এর জন্যে দায়ী আমি একা এবং সমস্ত আমার অপরাধ। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার অবস্থাও আমারই মত।

ভুতো ও তাহার অন্যান্য ছোট ছোট ভাইবোনগুলি যে-যেখানে ছিল সবাই ছুটিয়া আসিয়াছিল আমার পড়ার ঘরে। চাহিয়া দেখিলাম, তাহাদেরও মুখে হাসি নাই, সবাই বিস্মিত ও স্তব্ধ!

এইভাবে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর জ্যাঠামশায়ের যেন হুঁস হইল, তিনি ছেলেমেয়েগুলির দিকে চাহিয়া এক ধমক দিলেন, তোরা এখানে কি করছিস রে? যা শিগ্‌গির এখান থেকে?

তাহারা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। তখন ধীরে ধীরে তিনি আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, চুপ কর বাবা, আমি তোকে আলাদা বই কিনে দেবো।

জ্যাঠামশায়ের ছোট ছেলেটির নাম পচা। সে দরজার পাশে লুকাইয়াছিল। তাহার কানে এই কথাটি যাইতেই সে একেবারে ছুটিতে ছুটিতে রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, মা জানো, বাবা অলোকদাকে আলাদা বই কিনে দেবে বলেছে!

যেন ঘৃতে অগ্নিসংযোগ হইল। জ্যোঠাইমা একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, তা ত বলবেই! নিজের ছেলে যখন বইয়ের অভাবে পড়তে পাচ্ছিল না, তখন কি চোখে নুড়ো গোঁজা ছিল যে, দেখতে পায়নি! এখন একদিন ভাইপো পড়ার বই পাইনি, তাই কোমর বেঁধে আমার সংগে ঝগড়া করতে এলো! দর্পহারী মধুসূদন কি নেই, তিনি কি এর বিচার করবেন না? এই বলিয়া জোরে জোরে তিনি কড়াইয়ে খুন্তি নাড়িতে লাগিলেন।

রান্নাঘর হইতে এই সমস্তই আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছাইল। কিন্তু জ্যাঠামশায় ইহার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

৭

আমার অবস্থার কথা আর না বলিলেও বোধ করি কাহারও বুঝিবার অসুবিধা হইবে না। মোট কথা, এমনি করিয়াই আমার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছি শুনিয়া জ্যোঠাইমার মূর্তি যেন আবার বদলাইয়া গেল। আমার প্রতি তিনি তখন হইতে এইরূপ ব্যবহার শুরু করিলেন যে, তাহা বলিতে আজো লজ্জা করে। অবশ্য ভুতোও ক্লাশে উঠিয়াছিল, তবে দুইটি বিষয়ে ফেল করিয়া। তাই জ্যোঠাইমা তাহার জন্য একজন গৃহশিক্ষক রাখিবার কথা জ্যাঠামশায়কে বলিলেন।

তিনি প্রথমে কথাটা উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, ওটা গাধা, ওর কিছু হবে না—তাছাড়া মাস্টার রাখতে গেলে যে একগাদা টাকা লাগবে, তা কোথায়? ওই একটার পেছনে যথাসর্বস্ব খরচা করে ত আমি পথে বসতে পারবো না—আরো পাঁচটাকে মানুষ করতে হবে।

পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি শুনিলে কোন্ মায়ের প্রাণে ভাল লাগে! তাহার উপর স্বামীর মুখ হইতে ইহা শুনিয়া জ্যেঠাইমা একেবারে রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কোন রকমে ক্রোধ সম্বরণ করিতে করিতে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন কোন্ ছেলেটাকে তুমি মানুষ করেছ শুনি? বাছাদের আমার পড় বলে দেবার একটা লোক নেই—তুমি বাপ, তুমি কি কোনদিন গিে একবার ছেলেদের পড়ার কাছে বসেছো? লেখাপড়াটা কি ওর আপনি আপনি শিখবে?

জ্যাঠামশায় বলিলেন হাঁ যার হয়, তার আপনিই হয়—তা প্রমাণও তোমার বাড়িতেই রয়েছে। আলোককে কে পড়া বলে দে ইহা বলিয়া ফেলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি আবার নিজেকে সামলাই লইয়া বলিলেন, তাছাড়া, গ্রামে আরো দশটা ছেলে রয়েছে, তাদে কি সকলের মাস্টার আছে?

জ্যেঠাইমা হাতমুখ নাড়িয়া অভিনয় করিবার ভঙ্গীতে বলিলেন হ্যাঁগো হ্যাঁ, তোমার ভাইপোর মত ছেলে পৃথিবীতে আর নেই জা —তাবলে কি নিজের ছেলেদের ভাসিয়ে দিয়ে তার পুজো করতে হবে, না চরণামৃত খেতে হবে!

জ্যাঠামশায় কহিলেন, আমি কি তাই বলছি?

হ্যাঁ, আবার কি করে বলবে! তা নাহলে নিজের বড়ছেলে, তা কিসে ভালো হয়, তুমি তা না ভেবে কিনা বলছো, ওর লেখাপড় হবে না। বেশ তুমি যদি মাস্টারের মাইনে দিতে না পারো স্পষ্ট ক বলো, আমার বাবার দেওয়া গহনা এখনও ত দু'একখানা আছে, তা দিয়ে আমি যেমন করে হোক ওর মাইনে জোগাবো—তবু চোখে সামনে ছেলেটা মুখ্যু হয়ে যাবে, শুধু পড়া বলে দেবার একটা লোকে অভাবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

এই বলিয়া দম লইবার জন্য একটু থামিয়া তিনি আবা অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিলেন, ভুতো বলছিল ওদের স্কুলে কে এব সেকেণ্ড মাস্টার আছে, সে নাকি খুব ভালো পড়ায়, আমি তাঁকে ঠিক করেছি—পাঁচ টাকা মাইনে, দুবেলা বাড়িতে এসে ভুতোকে দুঘণ্টা পড়িয়ে যাবে!

যদি ঠিক করেই ফেলেছ, তবে আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছো কেন?

বলি ঘাট হয়েছে, তোমাদের চোদ্দপুরুষের পায়ে দণ্ডবত। এই বলিয়া জ্যাঠাইমা দুম দুম করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

জ্যাঠামশায়ও কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘর হইতে জ্যাঠাইমার গলা শোনা গেল। বলি ওগো বড়মানুষের জামাই, শুনতে পাচ্ছো, বাজার-হাট কি আজ হবে না—বই মুখে দিয়ে বসে থাকলেই চলবে—পিণ্ডি উঠবে কি করে মুখে শুনি?

এই সাদর সম্ভাষণটি যে তিনি আমারই উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, আপন মনে পড়িতেছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, আমার কথা কি কানে ঢুকলো না, না জ্যাঠামশায়কে দিয়ে বলাতে হবে? বলি এতটুকু কি আক্কেল নেই তোর, বাজার-হাটগুলো করবে কে শুনি—দেখছিস মাস্টার এসেছে, ভুতো পড়ছে, আর উনিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অপরাধীর মত আমি তাড়াতাড়ি বই মুড়িয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তার পর পয়সা লইয়া বাজারের দিকে চলিলাম। এই কাজটি জ্যাঠামশায় করিতেন। যেদিন তিনি পারিতেন না, ভুতোই করিত। কাজেই আজ যে সহসা আমাকে ইহার জন্য ডাক পড়িবে, তাহা আমি পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, জ্যাঠাইমার কাজে লাগিতে পারিয়া নিজেই নিজের কাছে সেদিন খুব খুশী হইয়া উঠিলাম।

পরের দিন আবার আমি পড়িতেছি, এমন সময় জ্যাঠাইমা খেঁদীকে দিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সে ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহার রন্ধনকার্যে বিঘ্ন ঘটাইতেছিল। আমি বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু যতই তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করি, ততই সে আরো জোরে কাঁদিয়া উঠে। ছোট ছেলেমেয়ে ইতিপূর্বে কখনও আমি রাখি নাই, তাই ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া তাহাকে থামাইব, এমন সময় জ্যাঠাইমা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, বলি চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি, দেখতে পাচ্ছিস না মেয়ে একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। আমি তখুনি বারণ করেছিলুম খেঁদিকে যে, দিস্‌নি ওর কাছে—ও গোরার বাচ্ছা, এই কালো কুৎসিত বোনকে ছুঁলে যে ওর রঙ কালো হয়ে যাবে।

ইহার উত্তর আমি কি দিব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় গোয়ালঘর হইতে সরলা ঝি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু ওকে নিয়ে একটু ফাঁকে যাও না।

আমি তাহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে হাওয়া খাওয়াইতে চলিয়া গেলাম। হাওয়া খাইয়া কিনা বলিতে পারি না, মেয়েটি কিছুক্ষণ পরেই চুপ করিল, কিন্তু যেই আবার ভিতরে লইয়া আসিলাম, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আবার তাহাকে বাহিরে লইয়া গেলাম। এইভাবে সেই মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে দিতেই সেদিন সকালটা কাটিয়া গেল, আমার আর পড়াশুনো হইল না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি সকাল সকাল বই লইয়া বসিলাম। সকালে যে পড়া করিতে পারি নাই, আগে তাহা করিয়া লইব, এই সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক! খেঁদী আসিয়া খবর দিল, আলোদা গয়লা এসেছে, মা তোমাকে গোয়ালে যেতে বললে।

দুধ দুইবার সময় একজনকে সেখানে যাইতে হইত বাছুরটা ধরিবার জন্য। এ পর্যন্ত আমি এ কার্য কোনদিন করি নাই। কে যে করিত, তাহাও ঠিক জানিতাম না, বোধ হয় ভুতোই করিত। তাই জ্যাঠাইমার সে হুকুম শিরোধার্য করিয়া অবিলম্বে গোয়ালঘরের দিকে যাত্রা করিলাম।

তিনটি গরু দুহিতে যে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিত, তাহা আমি জানিতাম না। আমার মন তখন স্কুলের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে পড়িয়াছিল। তাই যত দেরি হইতে লাগিল, ততই আমি গোয়ালাকে তাগাদা দিতে লাগিলাম তাড়াতাড়ি করিবার জন্যে। গোয়ালার বয়স হইয়াছিল অনেক, তাহার উপর একটু গল্প করিতে ভালবাসে। সে দুধ দুহিতে দুহিতে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করিতেছিল। পাছে আমার কথায় মন দিলে তাহার হাত চলিতে বিলম্ব হয় তাই শুধু একটা 'হুঁ', 'হ্যাঁ' দিয়ে তাহার দীর্ঘ প্রশ্নের জবাব দিতেছিলাম। কিন্তু গোয়ালার কৌতূহল ইহাতে মেটে না। সে আবার প্রশ্ন করে। একবার সে বলিল, আচ্ছা দাদাবাবু তুমি ত বললে, ইংরেজি, বাঙলা ইতিহাস, আরো কত কি বই পড়ো—কিন্তু কি করে সংগুলো এক সঙ্গে মনে রাখো? আমি ত আজ পর্যন্ত দুধের হিসেবটা ঠিকমত রাখতে পারলুম না। একজনের হিসেবের সঙ্গে আর একজনের গোলমাল হয়ে যায়। কি মাসেই কত বকুনি খেতে হয়। যে আজ একসের দুধ নিলে, আমি হয়ত তার ঘাড়ে দেড় সের চাপিয়ে দিলুম—আর যে দেড় সের নিলে, তার নামে একসের লিখে রাখলুম।

আমি বললুম, বুড়ো হয়েছো, তাই সব কথা মনে থাকে না।

সে তার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তাহলে ত বাঁচতুম—ছেলেবেলা থেকেই আমার এই রকম ধাত; গয়লানীর মুখনাড়া না খেয়ে আমার একটা দিনও কাটে না। তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, আচ্ছা, দাদাবাবু তোমার এমন ধারা হয় না? বাঙলা পড়া বলতে গিয়ে ইংরেজি বলে ফেলো কিংবা আঁক কষতে গিয়ে ইতিহাস লিখে দাও?

তাহার কথা শুনিয়া আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মনে হইল, এই জনাই বোধ হয় লোকে বলে—আশি বচ্ছর না হলে গয়লার বুদ্ধি হয় না। আমাকে হাসিতে দেখিয়া সে আবার প্রশ্ন করিল, হাসছো যে, আমার কথাটা কি বুঝতে পারলে না দাদাবাবু?

বলিলাম, হাঁ বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই ত লেখাপড়াটা সকলের মাথায় ঢোকে না।

আমার মুখ হইতে ইহা শুনিয়া গোয়ালা একেবারে লাফাইয়া উঠিল। ঠিক বলেছো দাদাবাবু, এই জন্যেই আমার লেখাপড়া হয়নি। মিথ্যে কথা বলবো না, আমার বাবা আমায় সারদা গুরুর পাঠশালে ভর্তি করে দিয়েছিল এবং লেখাপড়া শেখাবার জন্যে চেষ্টাও করেছিল অনেক; কিন্তু বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, তিন বছর ধরে তিনের ঘরের নামতা আর কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকলো না। কেবলই সাতের ঘরের সঙ্গে গোলমাল হয়ে যায়। তাই একদিন রাগ করে বাবা পাঠশালার নাম কাটিয়ে দিলে।

তারপর একটা হাই তুলিয়া বলিল, বুঝলে দাদাবাবু, আমি কিন্তু আর ও-ভুল করিনি, ছেলে দুটোকে একেবারে জাত-ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিয়েছি। গয়লানী অনেক কান্নাকাটি করেছিল ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবে বলে। আমি বললুম, যার বাপ তিন বছর ধরে তিনের কোটা নামতা মুখস্ত করতে পারে না, তার ছেলে আবার কি লেখাপড়া শিখবে?

ইহা শুনিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

দুধের বালতি লইয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই জ্যাঠাইমা বলিয়া উঠিলেন, গোয়ালঘর যে আজ হাসিতে ফেটে যাচ্ছিল, বলি গরুগুলো কি তোমার সঙ্গে কথা বলে নাকি গয়লা বুড়ো?

তাহলে ত বাঁচতুম মা ঠাকরুণ, বলিয়া বুড়ো ঈষৎ হাসিল।

জ্যাঠাইমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কেন—মানুষের কথা বুঝি আর ভালো লাগে না?

রা-মো মানুষের নাম করো না মা—যেমন মুখ তেমনি ব্যবহার! দেখ না, যত অশান্তি এই মানুষকে নিয়ে! ঝগড়া-বিবাদ, পরের নিন্দে পরের কেচ্ছা, ছি ছি ছি—কি বলবো মা ঠাকরুণ, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আর মানুষ হয়ে না জন্মাই!

জ্যাঠাইমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তবে কি গরু হয়ে জন্মাতে চাও?

মানুষের চেয়ে সে ঢের ভালো—ওরা তবু মানুষের ব্যথা বোঝে। তুমি কি বলো দাদাবাবু? এই বলিয়া গোয়ালা বুড়ো

আমার দিকে চাহিল। আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পড়ার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বলিয়া উঠিল তোমার এই ছেলেটি কালে একটা লোক হবে দেখে নিয়ো মা ঠাকরুণ, আমি বলে রাখলুম। ওঃ অতগুলো বই এক সঙ্গে পড়ে কি করে মনে রাখে?

সহসা জ্যাঠাইমার মুখটা অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি অতি-কষ্টে আবার মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, সেই আশীর্বাদ করো বুড়ো—পরের ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে যেন মুখ থাকে!

রাত্রের পড়াতে এতটা ব্যাঘাত হওয়ায় আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। তাই পরের দিন খুব ভোরে উঠিয়া পড়িতে বসিলাম তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য। কিন্তু আবার আজ খেঁদী আসিয়া তাহার ছোট বোনটিকে আমার কোলে দিয়া গেল। বলিল, বড্ড জ্বালাতন করছে মাকে, তুমি ওকে নিয়ে একটু ফাঁকে যাও।

মেয়েটি আমার কাছে আসিয়া পূর্বদিনের মতই কান্না সুরু করিয়া দিয়াছিল, আর আমি কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছিলাম না। শিশুদের কান্না কেমন করিয়া থামাইতে হয় আমি জানিতাম না। তাই আমার এই অপটুত্ব দেখিয়া সরলা ঝি গোয়াল ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার কোল হইতে খুকীকে লইল এবং তাহাকে শান্ত করিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

আমি যেন বাঁচিলাম। মনে মনে সরলাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে পড়ার ঘরে গিয়া বই লইয়া বসিলাম। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে জ্যাঠাইমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ঝিকে বলিতেছেন, কেন তুই খুকীকে নিয়ে এলি?

ঝি উত্তর করিল, দাদাবাবুর এখন লেখাপড়া করার সময়, তাই আমি তার কোল থেকে নিয়ে এলুম!

জ্যাঠাইমা গলায় একপ্রকার সুর টানিয়া কহিলেন, 'ওলো আমার দরদিনী—বলি এতদিন কোথায় ছিলি লো?—বলে মার চেয়ে ব্যথী বড় তারে বলি ডান'। এই বলিয়া একটু দম লইয়া আবার শুরু করিলেন, 'লেখাপড়ার তুই কি বুঝিস্ লা—যে, বলতে এসেছিস আমার কাছে? ওর পড়ার ক্ষতি হচ্ছে কিনা, তা কি তুই আমার চেয়ে বেশী বুঝিস্?

সরলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। তাই তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কিছু বুঝি না মা, তবে পাড়ার লোকেরা বলে দাদাবাবু নাকি খুব ভাল ছেলে লেখাপড়ায়—

থাম্ তুই। বলিয়া একটা ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, বাড়ির কোন কাজ না ক'রে দিনরাত বই মুখে ক'রে পড়ে থাকলে সবাই এমন ভালো হতে পারে!

সরলা ইহার কোন উত্তর দিয়াছিল কিনা আমি শুনিতে পাই নাই। তবে মুহূর্ত কয়েক পরে সে খুকীকে আনিয়া ধপাস্ করিয়া আমার কাছে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমিও তাহাকে কোন কথা প্রশ্ন করিলাম না, সেও আমায় আর কোন কথা বলিল না।

এতক্ষণে জ্যাঠাইমার উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি যে ভুতোকে কোন কাজ করিতে না দিয়া কেন আমায় বলিতেন—তাহা বুঝিলাম। ইহার জন্য আমার মনে যথেষ্ট আঘাত লাগিলেও মুখ বুজিয়া সহ্য করা ছাড়া তখন আর অন্য কোন উপায় ছিল না। তাই জ্যাঠাইমা যখন যাহা হুকুম করিতেন, আমি অবনত মস্তকে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিতাম। এইভাবে সকালে তাঁহার মেয়েকে লইয়া বেড়াইয়া আনা এবং সন্ধ্যার পর গোয়ালাকে সাহায্য করা ইহা আমার নিত্যকর্ম হইয়া উঠিল ত বটেই উপরন্তু অন্যান্য খুচরো কাজ যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাও আমাকে করিতে হইত।

খেঁদী কোনদিন হয়ত একটা পয়সা আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিত, আলোদা মা বললে শিগ্‌গির এক পয়সার হিঙ কিনে আনতে, ডাল রেঁধে ক'রে মা বসে আছে সাঁতলাতে পারছে না, যেন দেরী না হয়।

দোকান বাড়ি হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটিতাম হিঙ কিনিতে। হিঙ আনিয়া দিয়া হয়ত পড়িতে বসিয়াছি, আবার কিছুক্ষণ পরে খেঁদী আসিয়া বলিত, আলোদা মা বললে, তোমাকে তখন বলতে ভুলে গিয়েছিল, খুকীর জন্যে দু'পয়সার বার্লি আনতে হবে—খুকীর আজ সকাল থেকে পেটের অসুখ করেছে—বার্লি না আনলে মা ওকে খেতে দিতে পারছে না!

বলা বাহুল্য আবার ছুটিতে হইত। এইভাবে প্রায় প্রতিদিনই দুইবার না হউক একবার অন্তত দোকানে যাইতেই হইত। কাহার জন্য বিস্কুট, কাহার জন্য লজেঞ্চুস্, কাহার জন্য বাতাসা, কাহার জন্য মুড়ি-মুড়কি; ইহা ছাড়া তেল, নুন পাঁচফোড়ন, সরিষা প্রভৃতির আকস্মিক প্রয়োজন ত ছিল-ই। **ক্রমশ**

শিরীষের ফুল

রাখাল তালুকদার

শিরীষের থোকা থোকা ফুল
আমন্ত্রণ জানালো নির্ভুল,
নির্জন কৌতুকে।
আমি তো অবাক মানি
কাছে এসে দাঁড়ানু উৎসুকে।

শিরীষের ঊর্ধ্বশিরে নভোসীমা আঁকা;
দৃষ্টিহারা দিগন্ত বলাকা—
অদৃশ্য ইঙ্গিতে,
নিথর রাতের কোলে
মিলালো চকিতে।

আনন্দ-মঞ্জরী থরে থরে
ডাক দিয়ে যায় ঘরে-ঘরে:—
কেউ দেখে, কেউ দেখে না-যে,
মাটির ফসল খোঁজে রসলোক
ঊর্ধ্বাকাশ মাঝে!

বেঁচে থাকিবার দিন
কলুষ মলিন;—
মাটি তো আপন হাতে দান করে;
এ কৌতুক চোখে আজ পড়ে।

সমারোহ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্যামলী অতি কষ্টে বাসরঘর হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে তখন কোলাহল কমিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় নাই। অত রাত্রেও বাহিরের মণ্ড হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় বখশীষের লোভ একটু বেশীই দেখানো হইয়াছিল। ঠাকুরদের কাজও শেষ হয় নাই, তখন পরিবেশক এবং আত্মীয়দের খাওয়া বাকী।

কিন্তু এইসব সমারোহের যেন কোন অর্থই আর শ্যামলীর কাছে ছিল না। সে বরং তখন একটু নির্জনে বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচে। একটা সুগভীর ক্লান্তি, অতিরিক্ত উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে ক্লান্তি মানুষ অনুভব করে, যেন তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সে বারান্দার অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে একটা থামে মাথা দিয়া চোখ বুজিয়া দাঁড়াইল। এই নির্জনতা, এতটুকু একটু ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য তাহার সমস্ত অন্তর যেন লালায়িত হইয়াছিল।

অথচ তাহার ক্লান্তি অনুভব করিবার কথা নয়। সতেরো আঠারো বছর বয়স তাহার, বাপের একমাত্র আদরিণী কন্যা সে। আশুবাবু অনেক খুঁজিয়া রূপবান, সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পাত্র বাছিয়া আনিয়াছেন, এমন সুপাত্র অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়, একথা সকলেই জানাইয়া গিয়াছে শ্যামলীকে। খরচের কোন ত্রুটি হয় নাই। সমারোহ আড়ম্বরের কোন অভাব না থাকে, সেদিকে আশুবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, এমন কি এই ব্যাপারে তাঁহার স্ত্রীর সহিত বচসাও হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, কন্যার তরফ হইতে নব পরিণয়ে যে কারণে উৎসাহহীনতা থাকে, সে সব কারণও শ্যামলীর ছিল না। আশুবাবু কন্যাকে স্কুলে পর্যন্ত যাইতে দেন নাই, চিরকাল সযত্নে এবং সাবধানে মানুষ করিয়াছেন—আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি যাতায়াতও বিশেষ ছিল না তাহাদের, সুতরাং পূর্বরাগ-অনুরাগের কোন সুযোগই তাহার মেলে নাই। খোলা মনে, আকুল কামনায় স্বামীকে বরণ করিবার কথা তাহার।

তবে?

এ' তবের জবাব এখনও শ্যামলী নিজেই পায় নাই। এ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। এতগুলি বিপরীত এবং বিভিন্ন অনুভূতি তাহাকে অকস্মাৎ আঘাত করিয়াছে যে, তাহার চিত্ত এখনও পর্যন্ত কোথাও কোন স্থিতিই খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অথচ ব্যাপারটি কিছুই নয়। পুকুরের ওপারে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কয়েকটি ছাত্র মেস করিয়া থাকে, সকলকারই অল্প বয়স, বাল্যের চপলতা এখনও তাহারা ভোলে নাই। কারণে অকারণে হল্লা করে, স্নান করিতে নামিয়া পুকুরে মাতামাতি করে, সর্বদা পরস্পরের সহিত খুনসুটি করে এবং যে-কোন সামান্য ছুতায় হাসিয়া আকুল হয়। ইহাদের সহিত কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় শ্যামলীর থাকা সম্ভব নয়, ছিলও না। সে শুধু নিজের শয়ন ঘরের জানলা হইতে পর্দার আড়ালে থাকিয়া তাহাদের ছেলে মানুষী দেখিয়া আনন্দ পাইত। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চল যে ছেলেটি, নির্মল, সে ললিতকে সাঁতার শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই সূত্রে তাহার নামটা শ্যামলীর জানা ছিল, বাকী কাহারও নাম পর্যন্ত সে জানিত না। নির্মল ছেলেটি নাকি লেখাপড়াতেও ভাল; বছর একুশ বয়স, শ্যামবর্ণের বলিষ্ঠ গঠনের দেহ তাহার—এটুকুর বেশী তাহার সম্বন্ধেও শ্যামলীর কিছু জানা ছিল না।

সহসা ঘনিষ্ঠতা হইল এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই। আশুবাবু বিবাহে নিমন্ত্রিতদের যে ফর্দ তৈয়ারী করিতেছিলেন, একদিন সেদিকে নজর পড়ায় শ্যামলীই বলিয়াছিল, বাবা, পাড়ার সব বাড়িই যখন ফর্দে ধরলে তখন ও বায়ান্ন নম্বরটা বাদ দিলে কেন?

বায়ান্ন নম্বর? মানে ঐ মেসটা? ওদের সঙ্গে ত আমাদের তেমন যোগাযোগ নেই, সেই জন্যেই। বছর বছর নতুন ছেলেরা আসে, সবাই অপরিচিত। সামাজিক ব্যাপারে ওদের ডাকা কি ঠিক হবে মা?

শ্যামলী মাথা নীচু করিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষই-বা কি বাবা? বেচারীরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসে এখানে পড়ে আছে, কতকাল ভাল ক'রে খেতে পায়নি। রান্না করে ত ঐ উড়ে ঠাকুর, ওর আর দৌড় কত?

শ্যামলীর মাও সায় দিয়া বলিয়াছিলেন, তা বটে বাপু, মায়ের বাছারা কী কষ্ট করেই পড়ে আছে এখানে! না পায় ভাল খেতে, না আছে একটা যত্ন করার লোক। তোমার ত সাত শ' লোক খাবে তার মধ্যে আর ও কুড়ি-পঁচিশ জনের এমন কি বেশী খরচ পড়বে—

নিমেষে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া আশুবাবু বলিয়াছিলেন, ঠিক ঠিক, ও কথাটা আমার মনেই ছিল না। আমি নিজে গিয়ে বলে আসব ওদের। ফর্দে ওদের নামগুলো না ধরা আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ঐ জন্যেই ত আমার মা-মণিকে প্রত্যেক কথা জিগ্যেস ক'রে নিই—

ঐ পর্যন্ত। তাহার পর আর সে কথা শ্যামলীর মনেও ছিল না।

একেবারে বিবাহের দিন সে তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার কারণ, এ পাড়ার দু'একজন তরুণ ছাত্র ছাড়া বাকী সকলেই মেসের ছেলেদের এড়াইয়া চলিত। আজ সহসা আশুবাবু তাঁহার কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করাতে তাহাদের উৎসাহের সীমা রহিল না। তখনই তাহারা স্থির করিয়া ফেলিল যে, ভদ্রলোক যখন এতখানি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তিনি যাহাতে কোন রকমে না অপদস্থ হন তাহা দেখা তাহাদেরই কর্তব্য। আর সেই সিদ্ধান্তের ফলেই তাহারা সেদিন উপযাচক হইয়া অপরাহ্ণেই আসিয়া হাজির হইল এবং নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া কাজে লাগিয়া গেল।

আর বাস্তবিক ছেলেগুলি খাটিতেও পারে! আশুবাবুর লোকাভাব যথেষ্টই ছিল, সেজন্য তাঁহার উদ্বেগেরও সীমা ছিল না; কিন্তু এখন এই ছেলেগুলিকে পাইয়া তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বাড়ির ছেলেপুলেদের মতই নিজেরা বুঝিয়া সাধিয়া কাজ করিতে লাগিল তাহারা, আর সংখ্যাতেও ত কম নয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ জন; সুতরাং আশুবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া শুধু অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শ্যামলী অবশ্য অপরাহ্ণের বহু পূর্বেই আটকা পড়িয়াছিল একটা ঘরে, তবু ইহাদের সব খবরই তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ইহাদের এই পরিশ্রম এবং আন্তরিকতাকে সে তাহারই উদ্দেশে নিবেদিত শ্রদ্ধা স্বরূপে মনে মনে গ্রহণ করিয়া একটু খুশীও হইয়াছিল বই কি! বিশেষ করিয়া ঐ নির্মল ছেলেটি, সে যেন একটা মানুষ দশটা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। যে-ঘরে শ্যামলী বসিয়াছিল, তাহারই সামনের বারান্দা দিয়া একতলা হইতে তিনতলায় যাইবার পথ; সেইখান দিয়া অনবরতই ছুটাছুটি করিতেছিল নির্মল। তাহার ঘর্মাক্ত মুখ এবং দ্রুত নিশ্বাসের বক্ষ আন্দোলন দেখিয়া শ্যামলীর মন মমতা ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল, বহু লোক চারিদিকে; শ্যামলী তাহারই মধ্যে অসংখ্য পদধ্বনির মধ্য হইতে সেই

বিশেষ পদধ্বনিটি বাছিয়া লইয়া বার বার গোপনে নির্মলকে দেখিতেছিল। শ্যামলীর দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর নির্মলের ছিল না, তা না থাক—কিন্তু তাহার এই কর্মব্যস্ততা—সে ত শ্যামলীকেই উপলক্ষ্য করিয়া! সে জন্য সে মনে মনে যেমন গর্বও অনুভব করিতেছিল, তেমনি অনুতাপেরও সীমা ছিল না; আহা, বেচারীদের খাওয়াইবার জন্য ডাকিয়া কত কষ্টই দেওয়া হইল!

তাহার পর সহসা এই নির্মল ছেলেটি কেমন করিয়া যেন একেবারে তাহার ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে-ও একটা অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে, চারিদিকে হৈ-চৈ যখন সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, শ্যামলীর সেই জীবনের চরম মুহূর্তে লজ্জায় ভয়ে সে তখন অভিভূত, কোন অনুভূতিই তীব্রভাবে বোধ করিবার সময় সেটা তাহার নয়—তবু, তবু কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে সে সময় তাহার বুক ঐ ছেলেটিকে উপলক্ষ্য করিয়াই দুলিয়া উঠিয়াছিল।

কারণ?

কারণটা যেন মনের মধ্যে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। শ্যামলী অতি কষ্টে মনে করিবার চেষ্টা করিল। হ্যাঁ, সেটা সম্প্রদানের সময়েই বটে।

তখন বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ছাদনা তলায়।

এইবার কনেকে প্রয়োজন। কিন্তু পিঁড়িসুদ্ধ কনেকে তুলিয়া আনিবে কে? তেমন কোন আত্মীয় ছিল না শ্যামলীর। একটি মাত্র দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি ছিলেন, আর যে সব মামাতো-পিসতুতো ভাই ছিল, সকলেই ছোট ছোট। আশুবাবু একবার ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, তাই ত, কে আনে এখানে! ......আবার সাত পাক ঘোরানো।

ভগ্নীপতি সুরেশবাবু জামার হাতা গুটাইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনিও চারিদিকে চাহিয়া নির্মলের দিকে চোখ পড়াতে কহিলেন, তুমিই এসো না ভাই একটু—

নির্মল কী একটা কাজে উপরে যাইতেছিল, কহিল, আমি ধরলে কোন আপত্তি হবে না ত? শুনেছি বিবাহিত আত্মীয়দেরই ধরতে হয়।

সুরেশবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তুমিও যেমন! অত বাছতে গেলে আর কাজ চলে না। বিশেষ এখন আর অন্য লোক কই?......

অগত্যা নির্মলই সুরেশবাবুর সঙ্গে গেল। সুরেশবাবু কহিলেন, পারব ত দুজনে? না, আর কাউকে ডাকব?

নির্মল নিজের ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ বাহুর দিকে একবার চাহিয়া লইয়া জবাব দিল, কিছু দরকার নেই।......

নির্মল ধরিল সামনের দিকে সুরেশবাবু পিছনে। সহসা সেই বিশেষ মুহূর্তে কী রকম একটা গোলমাল হইয়া গেল। শ্যামলীর বুক আজ এই প্রথম কাঁপিয়া উঠিল। সে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না সত্য কথা, তবু নির্মলকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। চারিদিকের কোলাহল, আলোক সজ্জা, অসংখ্য উৎসুক চোখের দৃষ্টি—কোনদিকেই শ্যামলীর আর লক্ষ্য রহিল না। শুধু বলিষ্ঠ, স্বেদসিক্ত, শ্যামল একটি হাতের দিক হইতে সে যেন আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। ভারী জিনিস ধরিয়া থাকার জন্য শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরেই জমিয়াছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ একবার সেই হাতখানি স্পর্শ করিবার ইচ্ছা শ্যামলীর মনে উগ্র হইয়া উঠিল। একবার সে ঐ কব্জির উপরটা চাপিয়া ধরিবে, একবার শুধু আর কিছু নয়। কিন্তু—চারিদিকে অসংখ্য লোক, আর তা ছাড়া নির্মলই বা কি মনে করিবে? না, সে সম্ভব নয়।

কিন্তু সম্ভবই হইয়া পড়িল—একটু পরেই। সুরেশবাবুর ডান হাতটা একটু কাঁপিয়া একদিকের পিঁড়িটা হেলিয়া পড়িল। তাঁহার অনভ্যাসের জন্যই হউক, আর শ্যামলীর নড়িয়া বসিবার চেষ্টাতেই হউক—ফলে শ্যামলী পতনের সম্ভাবনাতে দিশেহারা হইয়া নির্মলেরই একটা হাত চাপিয়া ধরিল। সে এক মুহূর্ত, কি আরও কম। পরক্ষণেই শ্যামলী দারুণ লজ্জায় হাতটা ছাড়িয়া দিয়া মাথা আরও হেঁট করিয়া বসিল। সুরেশবাবুও ইতিমধ্যে সামলাইয়া লইয়াছিলেন—প্রয়োজনও আর ছিল না। এ-একটা অতর্কিত, আকস্মিক ঘটনা। দুই-একটি মহিলা, যাঁহারা কাছেই ছিলেন, তাঁহারা ছাড়া আর কেহ লক্ষ্যও করিল না; কিন্তু একটি মুহূর্তের সেই ঘটনা—পিচ্ছিল, তপ্ত, কঠিন একখানি হাতের স্পর্শ সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা আবেশে শ্যামলীর সমস্ত অনুভূতিকে যেন বিবশ, বিহ্বল করিয়া দিল!

সে বিহ্বলতা ভাল করিয়া কাটিবার পূর্বেই শুভদৃষ্টির সময় আসিয়া পড়িল। সকলে চারিদিক হইতে উপদেশ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নাপিত ছড়া কাটাইতে লাগিল, তাহারই মধ্যে কানে কানে সখীস্থানীয়া কে বলিল, ভাল করে চেয়ে দেখ লো—দেখবার মত বর!

চোখ লজ্জায় বুজিয়া আসে, তবু চাহিতে হইল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, লম্বা-চওড়া চেহারার একটি ভদ্রলোক, দেখিলেই সম্ভ্রম আসে মনে। সাধারণ হিসাবে সুপুরুষই বলিতে হইবে। কিন্তু তবু, স্বামীকে দেখিবার পরও শ্যামলী মনে কোন উৎসাহ বোধ করিল না, বরং যেন একটা সুগভীর ক্লান্তিই অনুভব করিতেছিল সে—নির্জনে কোথাও বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচে। যদিও সে বিশ্রাম সে পাইল না, বিবাহের নানা অনুষ্ঠানের ঘূর্ণাবর্তে একটা কোলাহল হইতে আর একটা কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িল। এমন কি, বাসরঘরে গিয়াও নিস্তার নাই, চারিদিক হইতে আত্মীয়ার দল ঘিরিয়া রহিল। পরিহাসে ও উচ্ছলতায় সকলে মশগুল—সে সব রসিকতার কোন মূল্য, এই আনন্দ উৎসবের যে নায়িকা, তাহার কাছে আছে কি না, দেখিবারও কাহারও অবসর নাই।

শ্যামলী সে ঘূর্ণাবর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। নির্জনে যাইবার চেষ্টা সে প্রথমে করিয়াছিল খানিকটা, পরে একেবারেই দিয়াছিল হাল ছাড়িয়া। একেবারে যখন সে ছুটি পাইল, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজে, উৎসবের কোলাহল অনেকটাই তখন কমিয়া আসিয়াছে। শ্যামলী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নীচের দিকে যতটা দৃষ্টি যায় দেখিয়া লইল, তখনও ভোজনের পাট শেষ হয় নাই একেবারে, তবে অনেকটা কম পড়িয়াছে বটে। ও-ধারে যাহারা আহারে বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরিবেশকের ও কর্মকর্তাদের দলই বেশী। সে-দলে মেসের ছেলেরাও অনেক রহিয়াছে, কিন্তু শ্যামলীর উৎসুক দৃষ্টি যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাকে কোথাও দেখা গেল না।

কে একজন বাসরঘর হইতে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, শ্যামলী ক্লান্তস্বরে তাহাকে বলিল, আমাকে একটু ঠাণ্ডায় দাঁড়াতে দাও কাকীমা, নইলে আর বাঁচব না।

তিনি সহানুভূতির স্বরে 'আহা বাছারে, সত্যি বাপু, যা গরম, আর ঐ ভীড়ের মধ্যে বেনারসী কাপড় পরে বসা যায়? আচ্ছা, তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে মা—' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই পিতা আসিয়া পড়িলেন। তাহাকে সেই প্রায়ান্ধকার কোণে একা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কে, মা-মণি, কী হয়েছে মা?

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে শ্যামলী উত্তর দিল, কিছু না বাবা। বড্ড মাথাটা ধরেছে—

আরও ব্যস্তকণ্ঠে আশুবাবু কহিলেন, তাইত, তা এ্যাসপিরিন একটা—

না, না, একটু ঠাণ্ডায় দাঁড়ালেই মাথা ছেড়ে যাবে। তারপর মুহূর্ত খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার খাওয়া হয়েছে বাবা?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, দূর পাগলী, আমি কি এখন

খেতে পারি, একটু মিষ্টি, আর একগ্লাস ঘোল খেয়েছি। একে এই গরম, তায় খাটা-খাটনি, তায় ভিয়ানের গন্ধ, খাওয়ার কথা মনে করাও যায় না। তবু ভাগ্যিস ঐ ছেলেগুলো ছিল—ওরা আর জন্মে তোরই ভাই ছিল মা, নইলে এমন করে কেউ খাটতে পারে না।

মরিয়া হইয়া শ্যামলী প্রশ্ন করিল, ওদের ভাল করে খাইয়েছ বাবা?

আশুবাবু জবাব দিলেন, ওদেরও সব ঐ দশা। তবু জোর করে স্নান করিয়ে এখন বসিয়েছি। দুজন কিন্তু কিছুতে রাজি হ'ল না, তাদের খাটনিও গেছে বেজায় কি না—নির্মল ছেলেটি ত এক মিনিট বসেনি। নির্মল আর বিজন, ওদের একটু কিছুও মুখে দেওয়ানো গেল না—

আরও কত কি আশুবাবু বকিয়া গেলেন, কিন্তু সে-সব কথা শ্যামলীর কানেই গেল না। তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্‌ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া যেন স্থির হইয়া যাইবার মত হইল। সে দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া থামে মাথা রাখিয়া নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নির্মল কিছুই মুখে দেয় নাই, কাহারও কোন অনুরোধে না। সে কি শুধু পরিশ্রম এবং গরমের জন্যই! পরিশ্রম ত অন্য ছেলেরাও কম করে নাই, তবে? তাহারা ত স্নান সারিয়া আসিয়া তবু বসিল—নির্মল একটা মিষ্টান্ন মুখে না দিয়া চলিয়া গেল কেন?

শ্যামলীর কান-মাথা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের গোপন অন্তঃপুরে যে প্রশ্নটা মাথা তুলিতে চায় তাহার আভাসেও শ্যামলীর ভয় করে। এ-আশা শুধু তাহার দুরাশা নয়, পাপ। হয়ত একেবারে অসম্ভব, সমস্তটাই তাহার কল্পনা—তবু ঐ কথাটাই মনে আনন্দ বেদনার তন্ত্রীতে বার বার আঘাত করিতেছে—ইহার সহিত কি শ্যামলীর কোন যোগাযোগ নাই? যে এক-মুহূর্তের অতর্কিত স্পর্শের স্মৃতি শ্যামলীর দেহমনকে এখনও মধ্যে মধ্যে অবশ করিয়া দিতেছে, তাহা কি কোন গোপন অনুভূতিই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই নির্মলের মনে? শ্যামলীর বিবাহ কি কোন ব্যথা জাগাইবে না সেখানে? ঈর্ষাতুর কোন অব্যক্ত বেদনা?......

এ-সব কথা শ্যামলী স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারে না, শুধু যেন বুকটা পিষিয়া যায় গুরুভার কোন সংশয়ের চাপে। মনে হয়, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াই যাইবে বুঝি সে। অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল আশুবাবুর কণ্ঠস্বরে, শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে মা? না হয় আমার ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়লি না কেন?

ছি-ছি, এ-সব কি ছাইভস্ম ভাবিতেছে সে! জীবনে যাহার সহিত কোন যোগ নাই, কোন দিন থাকিবেও না, যাহার পরিচয় পর্যন্ত ভাল করিয়া জানা নাই, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এ-কোন্‌ অসম্ভব কল্পনা তাহার। না, সে বাসরঘরেই ফিরিয়া যাইবে।

সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না বাবা, আমি বেশ আছি। আপনি যান্‌। নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে ত পারবো না, এখনই ওরা এসে টানাটানি করবে—। তার চেয়ে বরং এখানেই একটু থাকি—

পরদিন সকালের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া একটু অবসর পাইতেই শ্যামলী নীচে নামিয়া আসিল। আশুবাবু বহুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর তখন সবে একটু বসিয়া সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়াছেন, তিনি সস্নেহে টানিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন। কহিলেন, বেহাইকে বলে ঠিক করেছি, সেই বারবেলা কাটিয়ে চারটের সময় যাবি একেবারে। ললিতকেও সঙ্গে দেব এখন, কাল বৌ-ভাত খেয়ে পরশু নাগাদ ও ফিরে আসবে। তাছাড়া, আমি রোজ বিকেলে একবার করে তোর খবর নেব।......মোটে আট দিন ত, কেটে যাবে।

শ্যামলীর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে জবাব দিল না। তখন আশুবাবু অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, জিনিসপত্র অনেক বেঁচেছে—হিসাব ঠিক করতে পারি নি। অনেক জিনিস নষ্ট হবে—

তাহার পর সরবতের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, অবিশ্যি কিছু কিছু এ-বেলা কাজে লাগবে। কাল যারা খাটা-খাটনি করেছিল, তাদের ত খাওয়াই হয়নি বলতে গেলে, এবেলা তাদের ভাল করে খাইয়ে দেব ঠিক করেছি।...মেসের ছেলেদেরও বলে এসেছি। তাছাড়া, ওদের জলখাবারের জন্য কিছু কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিলুম। আহা, কাল ওরা যা করেছে, তা ভোলবার নয়—আপনার লোকেও অমন করে না।

শ্যামলীর মা আসিয়া দাঁড়াইলেন—হ্যাঁগা, তুমি আবার মাছ কিনতে বলেছ কেন? মাছ ত ঢের রয়েছে।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, হ্যাঁ, তা বটে। তবে ঐ ছেলেদের বললুম কি না আবার! সব বাসি জিনিস খাবে—তাই ভাবলুম......আচ্ছা, না হয় বরং কিছু মাংস আনাও, তাহলে তবু মানিয়ে যাবে। কি বলিস, মা?

শ্যামলী সলজ্জভাবে একটু হাসিল। কথা কহিল না বটে, কিন্তু কে জানে কেন, পিতার প্রতি একটা অকারণ কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া গেল। যেন তাহারই কোন্‌ না-বলা অনুরোধ তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

সে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরের সেই জানলাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও মেসের ছেলেরা সকলে ওঠে নাই; পূর্বদিনের পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। একজন কি দুজন উঠিয়া দাঁতন করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নির্মল নাই, বোধ করি সে এখনও ওঠে নাই।

জানলাটায় অভ্যাসমত সে বসিয়া পড়িল। গত রজনীর সেই একটা গোপন সংশয় এখনও মনকে পীড়িত করিয়া রাখিয়াছে। কথাটাকে সে জোর করিয়া মন হইতে তাড়াইয়া অন্য কথায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিতেছে, কিন্তু মন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাতেই ফিরিয়া আসিতে চায়। এক প্রকারের ক্ষত থাকে, তাহাতে হাত দিলে লাগে, তবু হাত নিজের অজ্ঞাতসারে সেখানেই বার বার পৌঁছায়। শ্যামলীরও সেই অবস্থা। নির্মলের গত রাত্রিতে একেবারে অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যাওয়ার সহিত তাহার বিবাহের একটা যোগাযোগ ছিল, এই আশার পিছনে যেমন একটা ব্যথা আছে, রঙ্গীন স্বপ্নও একটা আছে। তাহার সেই অসতর্ক আকুল অবস্থায় অবলম্বন হিসাবে নির্মলকেই স্পর্শ করা হইতেই শুরু করিয়া মন জাল বুনিতে বুনিতে বহুদূরেই যাইতে চায়। কে জানে তাহার আগেরও কোন ইতিহাস আছে কি না; নির্মলের এই প্রাণ-ঢালা পরিশ্রম শুধুই প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি কি না, তাই বা কে জানে?

যদি তা না হয়? শ্যামলীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। আহা, কত দুঃখেই তাহা হইলে সে কাল নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে। শ্যামলীর বিবাহ যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য নিজের সমস্ত দুঃখ মনে চাপিয়া তাহা হইলে কত বড় আত্মনিপীড়নই না সে করিয়াছে! যাহাতে শ্যামলীর কল্যাণ হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে নিঃশব্দে কাজ করিয়া গিয়াছে, সেই কল্যাণে নিজের জীবনটা যে শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া যাইবে, সে কথা সে একবার ভাবে নাই!

আকুল কান্নায় শ্যামলীর যেন কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে জোর করিয়া চোখ মুছিয়া রাস্তার দিকে চাহিল, পুকুরের দিকে। আচ্ছা, শ্যামলীর সহিত ত তাহার চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই কখনও, তবে? সে যে এই বাতায়ন পথে বসিয়া প্রত্যহ তাহাকে লক্ষ্য করে, একথাটি কি নির্মল জানিত? আর তাহা জানিয়াই কি নিঃশব্দে, সবার অগোচরে সেই দুটি চোখের মিনতি সে গ্রহণ করিয়াছে; তাহারই ফল কি এই মর্মন্তুদ অপসৃতি?

শ্যামলী আর বসিয়া থাকিতে পারে না। এ-চিন্তা তাহার পক্ষে অন্যায়, এটুকু জ্ঞান হইবার মত বয়স তাহার হইয়াছে। সে নির্জনে বসিয়া থাকিতে আর সাহস করিল না, থাকিলেই এই সব ছাইভস্ম চিন্তা শুরু হইবে।

সে নীচের কর্মব্যস্ততা, কোলাহল ও সমারোহের মধ্যে ফিরিয়া

আসিল। সুন্দর স্বামী হইয়াছে তাহার, জীবনের উৎসব মঞ্চের দ্বার তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত, আনন্দের পথ সবে প্রসারিত হইয়াছে। তাহার সৌভাগ্য চতুর্দিকের সমস্ত আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে আনন্দ ও ঈর্ষার ঢেউ উঠিয়াছে—এই সমস্ত নাটকের ত সে-ই নায়িকা। সে উৎসবের অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

সহস্র কর্ম, বিদায়ের অসংখ্য আয়োজন ও স্নেহের উচ্ছ্বাসের মধ্যে শ্যামলীর একটি কান ও একটি চক্ষু উন্মুখ হইয়াছিল পুকুরের দিকে। স্নান সারিয়া দল পাকাইয়া ছেলেগুলি যে আসিয়া পড়িয়াছে সে সংবাদটা তাহার গোচরে ছিল না। সে একটু পরে কী একটা ছুতায় আরক্ত মুখে নীচে নামিতেছে এমন সময় আশুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ। তাহাকে দেখিয়াই তিনি যেন ফাটিয়া পড়িলেন, পাম্নাকে বললুম বার বার যে এ সব আনাড়ি ঠাকুর দিও না আমাকে, অপদস্থ হতে হবে, তা কিছুতেই শুনলে না, এখন তাই হলো ত!

শ্যামলী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, কী হলো বাবা?

হবে আবার কি! ছেলেরা সব এসে পড়ল, আর আসার অপরাধই বা কি, এধারেও ত দেড়টা বাজে, তার ওপর বলতে গেলে ওদের কাল থেকে খাওয়াই নেই—

শ্যামলী প্রশ্ন করিল, রান্না কি এখনও হয়নি সব?

সব! মাংস এখনো উনুনে। যার নাম এখনও এক ঘণ্টা। ছি ছি, চার-চারটে ঠাকুর এখনও এই কটা লোকের রান্না করতে পারলে না। তাহার পরই দূরবর্তী গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি হাঁক ছাড়িলেন, ওগো শুনেছ!

তিনি কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কী হয়েছে?

আশুবাবু জবাব দিলেন, হবে আর কি! এখনও রান্না হলো না এদিকে ছেলেরা ত সব এসে পড়ল। অবিশ্যি ওরা বসবে খানিকটা কিন্তু ওদের মধ্যে দুটি ছেলের নাকি অপেক্ষা করার সময় নেই, ওদের এই আড়াইটার মধ্যেই কলকাতা পৌঁছতে হবে। যা হয়েছে তাই দিয়ে তুমি একটু ওদের খাইয়ে দাও। পিসিমাকেও বলেছি এই ভেতরের দালানে দুখানা জায়গা করে দিতে। তুমি দাঁড়িয়ে থেকে খাইও বাপু, ওরা কাল জলটুকু পর্যন্ত মুখে দেয়নি—

নিজের অজ্ঞাতেই শ্যামলীর মুখ দিয়া বাহির হইল, কে বাবা?

ঐ নির্মল আর বিজন। নির্মলের মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে, খাওয়া নেই একে, তায় ঐ অসম্ভব খাটুনি—

শ্যামলী আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিল। নির্মল তিনটার আগেই চলিয়া যাইতে চায়, একেবারে কলকাতাতে! তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে! সে কি শুধু উপবাসে আর পরিশ্রমে! সে যে কিছুতেই শ্যামলীর বিদায়ের সময়টা এখানে, এমন কি, এদেশেই উপস্থিত থাকিতে চায় না, একথাটা শ্যামলীর কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহা হইলে শ্যামলীর অনুমান মিথ্যা নয় কিছুতেই, যেটুকু সংশয় ছিল, এই শুষ্কমুখ এবং পলায়নই তাহা নিঃশেষে দূর করিয়া দিল। একটা অসহ্য সুখের আবেগে শ্যামলীর সমস্ত রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পূজা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে, এমন কি, সেখান হইতেও ফিরিয়াছে কিছু তাহার কাছে, ইহার অতিরিক্ত শ্যামলী কিছু চাহে না। এইটুকু আনন্দই হয়ত বুকের মর্মস্থান অনেকখানি ছিঁড়িয়া, পিষিয়া চলিয়া যাইবে—তবু তাহাই থাক্ শ্যামলীর পাথেয় হইয়া।

হঠাৎ কি একটা কাজে ললিত লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া পড়িল। কহিল, দিদি, এখানে চুপটি করে বসে যে? ও-ঘরে তোকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে—

শ্যামলীর কি মনে হইল, সে ললিতকে ধরিয়া কহিল খোকা ভাই, আমার একটা কাজ করবি?

ললিত জবাব দিল, করব—কী কাজ বল্।

শ্যামলী কহিল, বাইরের ঘরে নির্মলবাবু বসে আছে, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসতে পারিস—যে কী এত কাজ তার, এত তাড়াতাড়ি কলকাতা যেতে চাচ্ছে কেন? দেখিস, আমার নাম যেন করিস নি। লক্ষ্মীটি—

'আচ্ছা' বলিয়া ললিত আবার ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

উত্তরটা দিতে গিয়া নির্মল কি রকম বিব্রত হইয়া উঠিবে, কল্পনা করিয়া শ্যামলীর হাসি পাইল। তাহার আরক্ত মুখ পর্যন্ত সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

একটু পরেই ললিত ফিরিল। অতিরিক্ত ছুটাছুটির ফলে সে তখন হাঁপাইতেছে। তাহারই মধ্যে বলিল, ও-দিদি, উনি আর বিজনবাবু সিনেমায় যাবেন—এলিটে। কাল থেকে টিকিট কেনা আছে ওদের। আমাকে দেখালেন—আবার বলছিলেন আমায়, 'তুমি যাবে খোকা?'

তাহার পরই শ্যামলীর দিকে চোখ পড়ায় সে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, ও-কি, তোর কী হ'ল দিদি?

শ্যামলী চোখ বুজিয়া কহিল, কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

ললিত চুপি চুপি কহিল, ওরা খেতে বসেছে, কী তাড়া বাব্বা! আবার তিনটের শো সিনেমা দেখে কোথায় নাকি তাস খেলার কম্পিটিশন আছে, সেখানে যাবে সন্ধ্যেবেলা। ওরা দুজনে ফাইনালে উঠেছে কি না—

শ্যামলী প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জানলা দিয়া পুকুরের দিকে নজর পড়িতেই সে মুখটা ফিরাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে তখন আশুবাবু কাহাকে বলিতেছেন, বলে দেবে গাড়ি বেশ করে ফুল দিয়ে সাজাতে—খরচার জন্যে ভাবনা নেই। আর ঠিক চারটের সময় গাড়ি চাই আমার!



সংবাদ-চুরির রোমাঞ্চ

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য

সংবাদ চুরিই সাংবাদিকের জীবনে সব চাইতে রোমাঞ্চকর ব্যাপার। অবশ্য, সব সময়েই এ চুরিকে অপরাধ বলে গণ্য করবার কোন হেতু নাই। সাংসারিক দৃষ্টিতে নিতান্ত সদুপায়ে সংবাদ-চুরির অজস্র উদাহরণ সংবাদপত্রের ইতিহাসে মেলে। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে (অথবা, বোকা বানিয়ে?) সংবাদ সংগ্রহের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবনের মধ্যে যে প্রতিভা, বাইরের সংবাদপত্র পাঠকের কাছে সব সময়ে তা জানা থাকে না। কোন একটা বিশেষ সংবাদ-পত্রের "নিজস্ব সংবাদ" দেখে পাঠকেরা যখন চায়ের দোকান, ক্লাবঘর বা বাড়ির রোয়াক গুলজার করে বসেন, তখন তাঁরা একেবারেই জানেন না, কোন্ অখ্যাত সাংবাদিক নিজের জীবন বিপন্ন করে অথবা নিজের সম্মান এবং প্রতিপত্তি খুইয়ে দেবার ঝুঁকি নিয়ে এ সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংবাদপত্রের জীবনে তা' অহরহই ঘটছে। অবশ্য "newspaper scoop" প্রতিদিনই দুর্লভ হয়ে উঠছে বিশেষতঃ যুদ্ধকালে অনেক ক্ষেত্রে scoop-এর কথা চিন্তাই করা যায় না।

"চাঞ্চল্যকর সংবাদের" অভাব সম্পর্কে প্রতিদিনই অভিযোগ বেড়ে চলছে। বর্তমান যুগের রেডিও, টেলিফোন এবং ব্রডকাস্টিং "নিজস্ব সংবাদদাতাদের" পরিশ্রম অনেকাংশে লাঘব করে দিয়েছে। কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে এমনি ভাবে জানা হয়ে যায় যে, কোন বিশেষ সংবাদপত্রে তা' প্রকাশের বাহাদুরি অর্জন ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছে। সাংবাদিকের জীবনে নিশ্চয় এটা খুব আনন্দের নয়।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সংবাদ চুরি হয়েছে, তন্মধ্যে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বার্লিন চুক্তির সর্তাবলী চুরিই বোধ হয় সব চাইতে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। বার্লিন চুক্তির ফলে সমগ্র ইউরোপের চেহারাই বদলে গেল। মনে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বিসমার্ক ও বিকনস্‌ফিল্ড এই চুক্তির খসড়া রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'লণ্ডন টাইমসে'র প্যারিসস্থিত সংবাদদাতা De Blowitz এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগেই তা হাতে পান। উৎসুক পৃথিবীর চোখে ধুলো দিয়ে এবং বিকনসফিল্ড ও বিসমার্ককে একদম বোকা বানিয়ে 'টাইমস' সংবাদটা বের করে দিলেন ঠিক সে মুহূর্তেই যখন বাস্তবিক তা' স্বাক্ষরিত হচ্ছে।

De Blowitz কিভাবে সংবাদটা পেলেন, কোথাও তা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি বলেছেন, সংবাদের অভাবে বিরক্তির ভাণ করে তিনি চলে আসলেন বার্লিন থেকে। বন্ধুবান্ধবের কাছে এমন একটা বিরক্তির ভাব দেখালেন যে, কারু মনে কোন সন্দেহই হল না। কিন্তু বার্লিন চুক্তির খসড়া তখন তাঁর পকেটে নিরাপদেই রয়েছে। সংবাদটা কিভাবে De Blowitz পেয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত কেউ এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন নাই। কেউ কেউ সন্দেহ করে থাকেন, বার্লিন সম্মেলনের কোন সদস্যকে ঘুষ দিয়েই এ অসাধ্য সাধন করা হয়েছে। ঘটনা যা-ই হউক, সমস্ত পৃথিবী 'টাইমস'-এর এ আবিষ্কারে বিস্মিত হয়েছিল। শুনা যায়, বিসমার্ক ও বিকনস্‌ফিল্ড পরে যখনই কোন বৈঠকে একত্র হতেন, তখনই, টেবিলের নীচে De Blowitz বসে আছে কিনা, একবার তা দেখে' নিতেন। De Blowitz-আতংক দুই রাষ্ট্রনেতার জীবনে আর কোন দিনই দূরীভূত হয় নাই।

'চাঞ্চল্যকর' সংবাদ বলতে নরহত্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব বা মানুষ-চুরি ইত্যাদি একটা কিছু আমরা ধরে নিই। কিন্তু এমন সংবাদও সংগৃহীত হয়েছে, যা সাধারণ মানদণ্ডে মোটেই চাঞ্চল্যকর নয়, তথাপি, সংবাদপত্র জগতে বা পাঠকমহলে তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এবং সংবাদদাতার মনে গভীর আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি করেছে। উপস্থিত-বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা নিয়ে এ সকল ক্ষেত্রে এগুতে হয়েছে। হিটলার-অভ্যুদয়ের পূর্বে একদা প্রুশিয়ান একাডেমী থেকে অকস্মাৎ ঘোষণা করা হল, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদ সম্পর্কে নূতন কথা বলবেন। বার্লিনস্থ বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদদাতাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আইনস্টাইনের গবেষণার পুরোপুরি বিবরণ পাঠাবার জন্য তাদের কাছে জোর তাগাদা আসতে লাগল। কিন্তু Law of Relativity সম্পর্কে ক'জন রিপোর্টারেরই বা জ্ঞান থাকতে পারে? কিন্তু তথাপি একটা কিছু পাঠাতে হবে এবং তা' সর্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া চাই। এ এক অদ্ভুত আবদার;—কিন্তু সাংবাদিকগণকে চিরকালই তা রক্ষা করতে হয়। যে রিপোর্টার আজ বৈকালে হয়ত রমনের বক্তৃতা রিপোর্ট করছেন—কাল বৈকালে হয়ত শ্রীরাজাগোপালাচারীর বক্তৃতা তাঁকে রিপোর্ট করতে হয়। কিন্তু এ রীতিই চলছে পৃথিবীর সর্বত্র। যা' হউক, আইনস্টাইনের বক্তৃতা সকল সাংবাদিকই মন দিয়ে শুনলেন। কিন্তু একটি অক্ষরও কেউ বুঝলেন না—অনুবাদ করে লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে তাঁরা পাঠাবেন কিভাবে? বে-পরোয়া সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধিই এ ক্ষেত্রে অবলম্বন। জনৈক বৃটিশ বৈজ্ঞানিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন বার্লিনে। একখানা অখ্যাত বৃটিশ পত্রিকার সংবাদদাতা এ খবরটা জানতেন। কাউকে কিছুমাত্র না বলে তিনি উক্ত বৃটিশ বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হলেন—এবং তাঁর কাছ থেকে আইনস্টাইনের বক্তৃতার একটা মোটামুটি অনুবাদ নিলেন। পরদিন ভোরবেলা মাত্র একখানা বৃটিশ সংবাদপত্রে খবরটা প্রকাশিত হল। অনুবাদ মোটেই নিখুঁত হয় নাই—কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ঐ একটি মাত্র সংবাদপত্রের দিকেই। সংবাদপত্র পাঠকের শতকরা পাঁচজনও আইনস্টাইনের উক্তি উপলব্ধি করতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে সংবাদটা বের করা হয়েছে। সংবাদপত্রের পক্ষে এটাই সব চাইতে গৌরব।

আর একটা সংবাদ—চাঞ্চল্যকর বলা মোটেই চলে না,—লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পৃথিবীর আর কোন সংবাদপত্রই তা' প্রথম প্রকাশ করতে পারে নাই। কিন্তু সংবাদ হিসাবে তার মূল্য ছিল অসাধারণ। মিশরের রাজা টুটেনখামেনের কবর খুঁড়বার কথাই আমি বলছি। বহু সহস্র বছর আগে অমূল্য ঐশ্বর্য সঙ্গে দিয়ে যাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, পুনরায় তাঁর কবর খুঁড়ে হিরা মণি জহরতের সন্ধান,—সংবাদ হিসাবে এর মূল্য খুবই বেশী। কিন্তু সংবাদটা 'টাইমস' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন লর্ড কার্নারভন নিজেই—কোনরূপ কোলাহল না করে 'টাইমসের' এক কর্মচারী বন্ধুর কাছে তিনি সংবাদটা পাঠালেন। কিন্তু এ সংবাদটাও সমস্ত পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করল। বহু সহস্র বছর আগেকার এক লুপ্ত সভ্যতার কাহিনীর দিকে চোখ ফেরাবার সুযোগ মানুষ পেয়েছিল।

সংবাদ সংগ্রহের জন্য মানুষকে যে কত বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়, তার প্রমাণ আছে ডলফাস হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে ১৯৩৪ সালে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাস আততায়ীর হাতে নিহত হন। বিচারে আততায়ীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু এ প্রাণদণ্ড নিজের চোখে দেখতেই হবে। অথচ ফাঁসী হবে কারাগারের মধ্যে, জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে দূরে। জনৈক সাংবাদিক বিমানপোতে আরোহণ করে কারাগারের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। আততায়ীর ফাঁসী নিজের চোখে না দেখলেই তাঁ চলবে না। "প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ" পড়তে স্বভাবতঃই পাঠকদের আগ্রহ থাকবে। সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যানদেরও এমন দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন হতে পারে। মার্সাইয়ে যুগোশ্লাভিয়ার রাজ আলেকজাণ্ডারের হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ ফিল্ম তোলা হয়েছে

(শেষাংশ ৩৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইচ্ছামতী

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ফাল্গুনি বোমার অতিংক সহধর্মিণী লেখাকে লইয়া চব্বিশ পরগণার এই গ্রামে পল্লীর স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জায়গাটির মাধুর্য আছে। নিরাপদ কিনা জানি না—কিন্তু স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আমার প্রথম দৃষ্টিতেই গ্রামখানিকে ভালো লাগিয়া গেল। বিশেষ করিয়া ইচ্ছামতীর লোল ছন্দ রূপরাশি আমার মনের কবি প্রকৃতিতে সস্নেহ সাড়া জানাইল।

লেখা আপত্তি জানাইয়াছিল—চিরকাল শহরে থাকিয়া যে সুখ সুবিধা উপভোগ করিয়াছে—বোমার ভীতির জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে সে রাজী নহে; বিশেষ করিয়া জীবনের নিত্য প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য জীবন হাতে করিয়া আমাকে যখন বিপদ সংকুল শহরেই অধিকাংশ সময় বসবাস করিতে হইবে। আর লেখা যে-সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষ হইয়াছে এখানে তাহা নাই।

লেখাকে কাব্য করিয়া ইচ্ছামতীর কথা বলিলাম—জানো ভিক্টর হিউগো সমুদ্র দেখেই শুধু দিন কাটাতে চেয়েছিলেন—এমন নদী থাকতে তোমার আবার সঙ্গীর অভাব?

লেখা প্রতিবাদ জানাইল, রেখো বাপু তোমার ওই কাব্যের কথা আমরা স্থূলে সাংসারিক জীব—কাব্য করে আমাদের পেট ভরে না, এখানে অসুবিধা অনেক।

কিন্তু পরিশেষে লেখাকে নিজের মতের অনুকূলে আনিতে তেমন বেগ পাইতে হয় নাই।

অনেক প্রবোধ দিয়া লেখাকে বুঝাইয়া চলিয়া আসিলাম শহরের কর্ম জীবনের মাঝে।

বাঙলার পল্লীর বুকে তখন নব বসন্তের প্রাণ-স্পর্শ জাগিয়াছে। শহরের ইঁট কাঠ লৌহ যন্ত্রের জগতে যেমন মরিয়া গিয়াছিল গ্রামের নবীন বসন্ত তাহাকে জাগাইয়া তুলিল।

শহরে লেখা ছিল প্রয়োজনের গণ্ডী সীমানায় বদ্ধ, এখানকার মুক্ত বাতাসে তাহার মাঝে প্রাণের স্পন্দন জাগিল।

ইচ্ছামতীর তটরেখায় সান্ধ্য প্রদক্ষিণ কালে অনেক কাব্যের কথাই সে স্মরণ করে। সপ্তাহের বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি রঙিন অবকাশ সন্ধ্যাকে সে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরাইয়া তোলে।

শহরের জীবন ধারণের যে বায় বাহুল্য মানুষের মনের সৌন্দর্য রুচিকে ব্যাহত করে গ্রামে তাহা সহজ এবং বায় সংকোচ বলিয়া ইচ্ছা করিলে এখানে মানুষ খানিকটা সৌখীন এবং জনতার মাঝখান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে।

আমরা প্রথম প্রথম এ স্বাতন্ত্র্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলাম। ছুটি ফুরাইলে সোমবার দিন অফিস আসিবার সময় লেখা কহিল—কদিন তো বেশ কাটলো, কিন্তু এইবার? না বাপু, তুমি চলে গেলে আমি এখানে একলাটি কিছুতেই থাকতে পারবো না। এখানকার লোকজন—এদের সঙ্গে আমাদের একটুও মিল নেই—এক দিনেই আমাদের বেহায়াপনায় গাঁয়ে ঢি-ঢিকার পড়ে গেছে জানো?

এ সন্ধান রাখি নাই যে আমাদের অবাধ গতিবিধির মাঝে গাঁয়ের সামাজিক কলংক রেখার দাগ পড়িতে পারে। তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলাম, তাতে তো ভারী ক্ষতি আমাদের। চিরকালের জন্যে তো আর এখানে আসিনি—কিংবা কারুর অনুগ্রহ ভিক্ষার মাঝেও আমরা বসবাস করিনে। এই তো কটা দিন আবার শনিবার সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুবো। কারুর সঙ্গে না মিশলেই হোল।

—সে কী থাকা যায়?—লেখা অনুযোগ প্রকাশ করিল।

—দু'দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানকার লোকরাও তো মানুষ—দু' একদিন পরে দেখবে ওরাই কত আপন জন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখা চিঠি দিয়াছে—অত্যন্ত অলস এবং মন্থর গতিতে দিন কাটিতেছে। এখানে দিনে দিনে শহর হইতে নানা লোকজন আসিয়া আশ্রয় নিতেছে। আর লিখিয়াছে সবিস্তারে আমার প্রিয় ইচ্ছামতীর কথা। কত লৌকিক কাহিনীই না জমা আছে ওই নদীটিকে আশ্রয় করিয়া। এখন বসন্তকাল। উদাস এবং মন্থর গতিতে কূলে কূলে ছন্দের গুঞ্জন ধ্বনি তুলিয়া নিরন্তর নদী বহিয়া চলিয়াছে। বাসন্তী জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর কী অপূর্ব রূপ-সম্ভার জাগিয়া ওঠে। লেখা তাহাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া উপভোগ করিতেছে। একলা সে নদীর তটরেখা বাহিয়া দিগন্তের প্রসারিত পথে চলিতে পারে না—ইহা নাকি ভয়ানক আফশোষ। কিন্তু গৃহ-বাতায়নের ফাঁকে নদীর যেটুকু রূপালি রেখা দেখা যায় তাহা নাকি অপূর্ব!

লেখার চিঠিখানি পাইয়া বিস্মিত হইলাম। শহরের আবেষ্টনীতে যে মেয়েটি সিনেমা ট্রাম বাসের উন্মুক্ত স্বাধীন গতিবিধির আস্বাদ পাইয়াও অকালে সংসার বাস্তব কীট হইয়া উঠিতেছিল—যৌবনের মাঝে বার্ধক্যের জীর্ণতা আসিতেছিল, ইচ্ছামতীর স্নেহ স্পর্শে আবার সে সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

লেখা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে—নদীতে ভয়ানক হাঙ্গর তাই—তাছাড়া ইচ্ছে করে ওর অমন রূপালি জলে খেলা করে বেড়াই। পরিশেষে লেখা লিখিয়াছে—এবার এলে তোমার সঙ্গে ইচ্ছামতীতে নৌকা ভ্রমণ করবো আর নদীর তীর ধরে অনেক—অনেক দূরে দুজনে এগিয়ে যাবো।

লেখা ইচ্ছামতীকে ভালো বাসিয়াছে। চিঠি পড়িয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম।

সংসারের নিত্য প্রয়োজনে রান্নাঘরের কালিঝুলি আর ইঁট কাঠের কঠিন আবেষ্টনীর মাঝখান হইতে লেখার তরুণী চিত্তে রঙের স্পর্শ লাগিয়াছে—জীবনের এ এক পরম আশীর্বাদ!

বসন্ত গিয়া গ্রীষ্ম আসিল।

বৈশাখী আকাশে দেখা দিল দুর্যোগের মেঘ। ইচ্ছামতীর বক্ষে জাগিল তরঙ্গের চঞ্চলতা।

লেখা ধরিয়া বসিল—চলো আজ সন্ধেয় নৌকো করে নদীর ওপারে যাওয়া যাক!

আপত্তি প্রকাশ করিলাম—এ সময় কাল বৈশাখী—নদী এখন ক্ষিপ্ত—এখন নৌকো চড়া ঠিক নয়।

লেখা বলিল—না আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার আছে—ভয় কী, দুজনে থাকবো—আর আমি সাঁতার জানি।

—সাঁতার জানলেও বিপদে সব সময় পার পাওয়া যায় না।

লেখা আপত্তি তুলিল—তা হোক্ চলো না কী আর হবে?—এই তো এত লোক রোজই দেখি পারাপার করে—সবাই কী ডুবে যাচ্ছে?

—না, তা অবিশ্যি ডুবছে না—কিন্তু ডুবতেও তো পারে?

—হ্যাঁ, সে তো এ্যাক্সিডেন্ট—সুস্থ মানুষও যে কোনও সময় মরে যেতে পারে।

লেখার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে উঠিলাম। সংসার নীড়ের মাঝে যে ভীরু মেয়েটি কম্পিত পক্ষের আচ্ছাদনে বাহিরের দুর্যোগ মেঘকে শঙ্কিত চিত্তে ঢাকিয়া রাখিতে চায় আজ তাহার মনে একী দুর্বার চঞ্চলতা?

লেখার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

সন্ধ্যার দিকে আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। সূর্যাস্তের পর

রক্তরাঙা আকাশে চাঁদ উঠিল। দক্ষিণের ঝিরঝিরে বাতাসে উন্মনা বিহ্বলতার আমেজ ছিল।

নৌকা পূর্বেই ঠিক করা ছিল।

ঘাটের কিনারা হইতে নৌকা ছাড়িল। পালে বাতাস লাগিতে নৌকা দুলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল।

নদী লইয়া ইতিপূর্বে অনেক কাব্য করিয়াছি—নদীকে ভালোও বাসি। তাহার চঞ্চল তরঙ্গরাশি, তাহার যৌবন পরিপূর্ণ ঢল ঢল রূপলাবণ্য মনের মাঝে ছন্দের গুঞ্জন ধ্বনি জাগাইয়া তোলে—কিন্তু নৌকা টলিলে আবার ভয়ও লাগে। তীরের কাছে দাঁড়াইয়া যে নদীকে রূপোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হয় তরঙ্গের আবর্তে তাহা ভীতির সঞ্চার করে।

কিন্তু লেখার এ হইল কী?

সংসারের মাঝে সলাজ বধূরূপিণী লেখা নদীর সংস্পর্শে আসিয়া চঞ্চলা বালিকার জীবন উচ্ছ্বলতা কেমন করিয়া ফিরিয়া পাইল?—

মাঝিকে প্রশ্ন করিতেছিলাম—কী হে মাঝি, কালবোশেখী উঠবে না তো? ভয়ের কোন কারণ নেই তো?

মাঝি কহিল—এ আর এমন ডা কী, গাঙ্ দ্যাখছেন কত্তা, ইডা তো আমাদের ঘরদুয়ার—পদ্মার কথা মনে লাও দেখি একবার।—

লেখার কণ্ঠে তখন সুরলহরী ঢেউএর তালে তালে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—

ঢেউগুলি সব ডাকেরে
হাত বাড়ায়ে ডাকে—

লেখাকে কাছে টানিয়া লইলাম।

নৌকা মাঝনদীতে তখন পাড়ি দিয়াছে। বাতাসের গতি অকস্মাৎ বাড়িয়া গেল—তুফানের মুখে নৌকা টলিয়া টলিয়া চলিয়াছে। চাঁদের চারিপাশে মেঘের স্তূপ আসিয়া ভীড় জমাইতেছে। আমি ভয় পাইয়া গেলাম।

লেখা আমাকে বাহুবন্দী করিয়া লইল।

—কী হবে এখন যদি ঝড় ওঠে?

—কী আর হবে—আমরা দুজন তলিয়ে যাবো ঢেউএর অতল জলে।

লেখার মুখে এ কাব্য তখন বিরক্তিকর—আমার বক্ষ যখন দুরু দুরু করিতেছে লেখা কণ্ঠে গভীর অনুরাগের সুর টানিয়া কহিল—আচ্ছা ধরো আমি যদি মরে যাই তুমি আবার বিয়ে করবে তো?

ক্ষেপেছো?—আবার বিয়ে?—তুমি কী আমায় এমনি নীচ মনে করো?

—এতে আর নীচতা কোথায়?—পুরুষদের কাছে মেয়েরা এর বেশী আর কী আশা করতে পারে?

আমি সংক্ষেপে কহিলাম—সব মেয়েই যেমন সমান নয়—সব পুরুষও তেমনি সমান নয়।

লেখা প্রতিবাদ জানাইল—হ্যাঁ সব মেয়েরা অবিশ্যি সমান নয়, কিন্তু ছেলেরা সকলেই সমান।

এতদিনে তুমি বুঝি এই আমাকে চিনলে?

একটি বড় রকমের ঢেউ আসিয়া নৌকার তলদেশে আঘাত করিল। লেখাকে দৃঢ় বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া নিলাম।

তীরে পৌঁছাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া ইচ্ছামতীকে প্রণাম জানাইলাম। খুব বাঁচিয়া গেছি এ যাত্রা।

লেখাকে কহিলাম—কাব্য মাথায় থাকুক্ আর কক্ষনো এমন নদীতে নৌকায় উঠছি না।

ভীরু বলিয়া লেখা আমাকে উপহাস করিল।

আমি কহিলাম—যাই বলো না কেন আর যে অপবাদই দাও না কেন নৌকোতে আর আমি উঠছি নে—বিশেষ করে এই কাল বোশেখীর সময়।

লেখা কহিল—আমার কিন্তু সত্যি চমৎকার লাগছিল—ওঃ ঢেউএর মাঝে আমার প্রাণের কথা মিশিয়ে আছে যেন।—

গভীর রাত্রে সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া ভীষণ ঝড় উঠিল। কড় কড় ধ্বনিতে বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল।

ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলাম। বাহিরের আকাশ কালো করিয়া আছে। দুর্যোগের ঘন মেঘে দেখা যাইতেছে রুদ্র তাণ্ডব নর্তনলীলা। দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে শুইয়া রহিলাম। নীড়ের মাঝে সুকোমল আশ্রয়টুকু তখন নিরাপদ বলিয়াই মনে হইতেছিল। যদিও দারুণ ঝটিকার আঘাতে এখুনি এ নীড় ভাঙিয়া যাইতে পারে—যদিও দুর্যোগ রাত্রির এই ঘন অন্ধকারে এই পৃথিবীর মাঝখান হইতে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে, তবুও সংকীর্ণ গৃহ-শয্যার মাঝে লেখাকে আশ্রয় করিয়া পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছিলাম।

বাহিরের দুর্যোগের শব্দের মাঝে নদীর ভীষণ গর্জনধ্বনি শোনা গেল।

উন্মত্তা নদীর সে কী সরোষ সর্বনাশা গতিবেগ—ভাঙিয়া চুরিয়া সৃষ্টিকে এইবার বুঝি সে একাকার করিয়া দিতে চাহে!

বক্ষফাটা আর্তনাদের মাঝে কী বুঝি ভাঙিয়া পড়িল।

লেখা ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

আমি অভয় দিয়া কহিলাম—কী, ভয় কী?

—ও কীসের শব্দ? আমার ভীষণ ভয় করছে।

—ও ভাঙন—ইছামতীর উন্মত্ত ঢেউ পাড় ভাঙতে শুরু করেছে। দেখলে না চৌধুরীদের বাড়ির কাছটা কেমন করে ভেঙে ভেঙে এগিয়ে আসছে।

লেখা কম্পিত কণ্ঠে কহিল—কী সর্বনাশা রাক্ষুসী নদী গো, কী ভাগ্যিস নৌকা চড়ার সময় এ কালবোশেখী ওঠে নি।

আমি পরিহাস করিয়া কহিলাম—কেন, তখন যে বলছিলে দুজনে তলিয়ে যাবো নদীর অতল জলে। খুব তো কাব্য করছিলে তখন।

আবার একটি বিকট আর্তনাদের মাঝে কোথাকার তীরের খানিকটা অংশ বুঝি বা ধ্বসিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত ধ্বনি —বন্ধঘরের ভিতর কোথাকার কোন স্বল্প উন্মুক্ত স্থানের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের অগ্নিশিখা ঢুকিয়া চোখ ঝলসাইয়া চলিয়া গেল।

অত্যন্ত ভীতি বিহ্বলতার মাঝে লেখা চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া রহিল।

ইছামতীর রুদ্র তাণ্ডব লীলা সারা রাত ধরিয়া দুর্যোগের সাথে সাথে চলিল।

তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তীরের মাটি ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়ে। নদীর কী প্রচণ্ড গতিবেগ—ইঁট কাঠ, পাথর লোহা সমস্ত কঠিন পদার্থই তাহার দুর্নিবার আক্রমণকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। ওপারে তাহার চড়া পড়িতেছে—এপারে চলিতেছে ভাঙনের তাণ্ডব লীলা খেলা।

সারা রাত্রি ধরিয়া লেখা আমাকে ঘিরিয়া রহিল। আমার বাহু বন্ধনের মাঝে সে যেন পরম নিশ্চিন্ততার আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

দুর্যোগ রাত্রির মাঝে আসিল অনেক মুহূর্ত—যে মুহূর্তকে ইছামতীর ভয়াল ভাঙনের রূপ ভরাইয়া তুলিল।

ভয় কম্পিত দুরু দুরু বক্ষে লেখা আবেগ জানাইল—না, তোমাকে ছেড়ে আমি কক্ষনো থাকতে পারবো না—আমি মরতেও চাই নে।

কখনও বা বলিল গভীর বিহ্বলতার সুরে—আঃ কী শান্তি! এমনিভাবে তোমার কোলে মাথা রেখে যদি মরতে পারতুম।

ভোরের বাতাসে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। দুর্যোগ রাত্রির অবসান ঘটিল।

কাল বৈশাখী থামিয়া গেছে। ভোরের আকাশে আর এতটুকু মেঘেরও চিহ্নকণা নাই।

ইচ্ছামতীর উন্মত্তমুখর তরঙ্গরাশি আবার শান্ত হইয়াছে। প্রশান্ত গতিতে কুলু কুলু নাদে নদীর স্রোতধারা ছন্দের ধ্বনি তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কাল বৈশাখী রাত্রের যে রাক্ষুসী নদী ধ্বংসের সংহার মূর্তিতে সর্বনাশা রূপে পরিগ্রহ করিয়াছিল—প্রভাতের প্রশান্ত সূর্যালোকে তাহাকে যেন চেনা যায় না। দুরন্ত বালিকা শান্ত নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

প্রাতঃভ্রমণকালে দেখিলাম ইচ্ছামতীর রূপালি জলরেখা প্রভাতের সোনালী রোদ্রের আভায় চিক্‌মিক্ করিতেছে।

চৌধুরী বাড়ির সম্মুখের চত্বরে দেখা গেল শুধু বিরাট ফাটল ধরিয়াছে। পরিত্যক্ত বাড়ির খানিকটা অংশ রাক্ষুসী নদী গত রাত্রে গ্রাস করিয়াছে।

বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিলে লেখা আসিয়া কহিল—কী সর্বনাশা নদী গো—বর্ষাকালে নাকি সমানে এর ভাঙনের গতি চলবে।

আমি কহিলাম—হ্যাঁ, নদীর প্রকৃতিই তো তাই। বর্ষার নদীর রূপ অতি ভয়ংকর। বর্ষাকালেই নদী আসলে তার জীবনের রূপ পায়।

—এই সর্বনাশা ভাঙনের এই রাক্ষুসী বৃত্তি—একেই বলছো তুমি রূপ?

—হ্যাঁ—নদীর এই হচ্ছে প্রাণের রূপ। ইঁট, কাঠ, লোহার কঠিন বাঁধনে যে নির্দয় মানুষ তার অবারিত গতিপথকে বেঁধে রাখতে চায়—নদী তার প্রতিশোধ নেবে না?

—রাখো বাপু—তোমার ও কবিত্ব—

লেখার মুখে একথা শুনিয়া পুনরায় বিস্ময় বোধ করিলাম। ইছামতীর তরঙ্গের আবর্তে নৌকার মাঝে যে লেখার প্রাণে চঞ্চলতা জাগিয়াছিল আজ সে লেখা সংসারের মাঝে আবার কোথায় মিলাইয়া গেল?

কলিকাতায় ফিরিবার কালে লেখা আসিয়া অনুনয় জানাইল—সত্যি বলছি একা এখানে আমি আর থাক্‌তে পারছি নে—তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

আমি বাধা দিয়া কহিলাম—কল্‌কাতায় যাওয়া এখন একেবারেই নিরাপদ নয়।

এখানেই বুঝি নিরাপদ? কোন দিন ইছামতীর গর্ভেই তলিয়ে যাবো। আর সামনে এই বর্ষা।

—আর কলকাতায় জাপানি বোমা?

তবুও তো তুমি সঙ্গে থাকবে। না, সত্যি বলছি নদীকে আমার ভয়ানক ভয় করে। নদীর ওই ডাক আমায় যেন কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত জানিয়ে যায়।

বাধ্য হইয়াই লেখাকে সঙ্গে লইয়া আবার কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পিছনে পড়িয়া রহিল ইছামতীর তরঙ্গরাশি।

একটি রাত্রের দুর্যোগ-ঘন অন্ধকারে যে নদীর বক্ষে জাগিয়াছিল সর্বনাশার গতিউদ্দাম—যে নদী ভরিয়া উঠিয়াছিল ভাঙনের সৃষ্টি-নাশা প্রকাশ-ভঙ্গিমায়, অপরাহ্নের ম্লান গোধূলি আলোকে তাহার রূপালি রেখাকে দেখিলাম অতি সকরুণ শান্তরূপে।

লেখার সহিত উহার যেন কোথায় মিল রহিয়াছে। তরঙ্গমুখর নদী-বক্ষের মাঝে সেই প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা উচ্ছ্বাস-যৌবনা লেখা আমার পাশে আজ চলিয়াছে শান্ত নীড়মুখী সলাজ বধূরূপে। মুহূর্তের প্রাণের স্পন্দন আজ তাহার কোথায় মিলাইয়া গেল?

তরঙ্গে যখন চাঞ্চল্য জাগিল—নীড়ের মাঝে তখন ক্ষণিক উদ্বেলতা তুলিয়াছিল—তরঙ্গ শান্ত হইলে নীড়ের জাগরণ মরিয়া গেল।

বর্ষার প্লাবনে ইচ্ছামতী আবার জাগিয়া উঠিবে—কিন্তু লেখার জীবনে হয়ত বা আর তরঙ্গের চাঞ্চল্য—যৌবনের উন্মাদনা ফিরিয়া আসিবে না।

দূরের ইচ্ছামতীর রূপালি জলরেখা ধূসর সন্ধ্যার ছায়ায় দৃষ্টি পথ হইতে ক্রমশ মিলাইয়া গেল।

সংবাদ চুরির রোমাঞ্চ

(৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

ক্যামেরা রিপোর্টার অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মার্সাইয়ের রাজপথে হতভাগ্য রাজা চলেছেন হাসিমুখে সবাইর সাথে কথাবার্তা বলে',—অকস্মাৎ তাঁর মোটরের পা-দানীতে আততায়ীর আবির্ভাব;—সমস্ত ঘটনাটাই সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারের কৃতিত্বের দরুণ জীবন্ত কাহিনীরূপে দেখা দিয়েছে। ঘটনাটা দুঃখের সন্দেহ নাই—কিন্তু সংবাদপত্রের কাছে এর মূল্য খুবই বেশী। টেলিভিসান যন্ত্রের যতই উন্নতি হতে থাকবে, ততই সংবাদের চাঞ্চল্য থেকে ছবির চাঞ্চল্যের দিকে মানুষের মন ফিরে যাবে, এ সম্ভাবনা আছে।

এক-একজন দুর্ভাগা সাংবাদিক আছেন, যাঁরা সংবাদ পেয়েও তার ব্যবহার করতে পারেন নাই। নিঃশব্দে চলমান পৃথিবীতে সাংবাদিকের একটি মুহূর্তেও বিলম্ব ঘটলে, তাঁর সমস্ত কৃতিত্বই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষত, নিজের কাছেও এ এক দুর্বিসহ যাতনা। সংবাদ পাওয়া গেল, অথচ সংবাদ প্রকাশ করা গেল না, এর চাইতে দুঃখ বোধ হয় সাংবাদিকের জীবনে আর কিছু নাই।

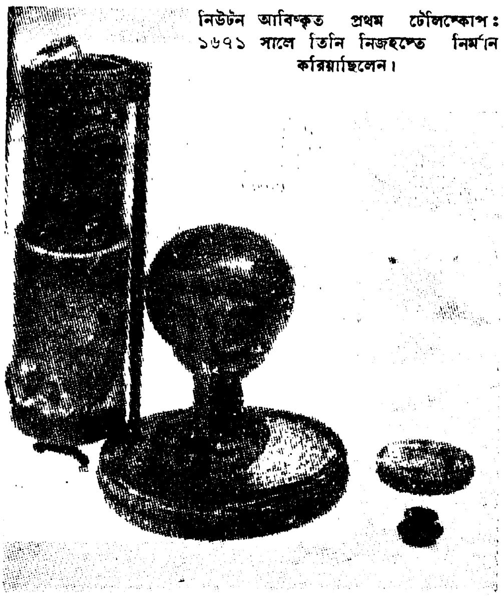
বিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক ডগলাস রীড এরূপ দুটি সংবাদের কথা বলেছেন। দুটি সংবাদই তিনি পেয়েছিলেন শনিবার বৈকালে, কিন্তু রবিবার ছিল তাঁর কাগজ বন্ধ। ফলে, তার সংবাদগুলি মাঠেই মারা গেল। সোমবার পর্যন্ত সবাইর সংবাদগুলি জানা হয়ে গেছে।

ডগলাস রীড বলেন, ইংলিশ চ্যানেল পার হবার কালে আমার জাহাজের কাছে একখানা এরোপ্লেন সমুদ্রে পড়ে যায়। আমাদের জাহাজের যাত্রী জনৈক ডাক্তার ধ্বংসপ্রাপ্ত এরোপ্লেনের যাত্রিগণকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখতে পান, তাঁরই একজন রোগীও উপরোক্ত দুর্ঘটনায় মরেছেন। অবশ্য ঘটনাটা বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের কিছু নয়; কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় স্বদেশ থেকে দূরে এক ডাক্তার ও তাঁর রোগীর (অবশ্য মৃত) এই অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই ভাল জায়গায় প্রকাশিত হ'তে পারত। আর একবার প্রাক্-হিটলার যুগে জার্মান কম্যুনিস্টরা একজন বক্তাকে আকস্মিকভাবে অপহরণ করে নিয়ে তাঁর স্থানে আর একজনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। বেতারের শ্রোতারা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না; তাঁদের ধারণা ছিল—তাঁরা আসল বক্তার বক্তৃতাই শুনেছেন। ঘটনাটা জানতেন একমাত্র ডগলাস রীডই—কিন্তু তাকে কাজে লাগাতে তিনি পারলেন না। সোমবার কাগজে প্রকাশ করতে গিয়ে দেখেন, সবাই তা জেনে গেছে। পুরানো সংবাদ প্রকাশ করবার মত অপবাদ সংবাদপত্রের পক্ষে আর কিছুই নাই। গতিশীল পৃথিবীতে এ মুহূর্তের বিস্ময় আগামী মুহূর্তে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি হয়ে উঠে। আজ যা জীবন্ত কাহিনী কাল তা মৃত-ইতিহাস। তথাপি এ মুহূর্তের মূল্য দিয়েই আগামী মুহূর্তের দিকে এগুতে হয়। এটাই বড় কথা।

জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন

শত্রুঘ্ন রায়

ক্ষুদ্র পল্লী উলস্‌থর্জ,—সভ্য জগতের জীবনপ্রবাহ থেকে বহু দূরে। গ্রামের গোলা বাড়িতে কেম্ব্রিজের একজন বিদ্যার্থী এসে বাস করছে কিছুদিন ধরে। বিদ্যার্থী যুবক। নিজেকে সে আড়াল করে রেখেছে সকল কিছুর সংস্রব থেকে। সময় কাটছে তার বই পড়ে আর চিন্তা করে। গোলা বাড়ির চারদিকে বাগান। অবসর পেলেই সে বাগানে এসে বসে, আর কি যেন ভাবে। তখন গাছে গাছে আপেল পাকতে আরম্ভ করেছে, সুগন্ধে বাতাস হয়েছে



নিউটন আবিষ্কৃত প্রথম টেলিস্কোপ: ১৬৭১ সালে তিনি নিজহস্তে নির্মাণ করিয়াছিলেন।

উতলা। পাকা আপেলের ভার গাছ আর বহন করতে পারছে না। একদিন চিন্তামগ্ন যুবকের সামনেই পড়ে গেল একটা সরস টুকটুকে আপেল। যুবক চমকে উঠল। আপেল মাটিতে পড়ল কেন? বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। সে আজ কবেকার কথা—সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা। তারপর হয়েছে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, জাগতিক আবহাওয়া গেছে বদলে। সকল পরিবর্তনের মূলে কিন্তু ছোট্ট একটি ঘটনা, আপেলের বৃক্ষচ্যুতি ও ভূমিশয্যা, আর সেই যুবকের সপ্রশ্ন চমকানি। মানুষ আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সেই যুবককে—স্যার আইজ্যাক্ নিউটনকে! গত ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর জন্মবার্ষিকী হয়ে গেছে।

ছেলেবেলায় নিউটনের মধ্যে বড় হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। কোন পরীর শুভাগমনে তাঁর জন্মোৎসব মঙ্গলময় হয়ে ওঠে নি। অভাবগ্রস্ত পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভও শিশু নিউটনের ভাগ্যে ঘটে নি। তাঁর মা বলতেন—নিউটন এত ক্ষুদ্রাকৃতি ছিলেন যে, একটা একপো মাপের পাত্রে তাঁকে বেশ বসিয়ে রাখা যেত।

স্কুলের পড়ায় তাঁর মোটেই মন বসত না। পরীক্ষার ফলও হত মন্দের দিকে। এই সময়কার একটি ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি ওলটপালট করে দেয়। ক্লাসে তিনি তখন লাস্ট বয়। তিনি মারামারি করে বসলেন তাঁর ঠিক ওপরে যে ছেলেটির স্থান তার সঙ্গে। দৈহিক বলে ন্যূন হলেও তাঁর সাহস ও সহ্যগুণ ছিল অসাধারণ। কাজেই মারামারিতে জিতলেন তিনিই। এর পর নিউটন প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁর শত্রুকে লেখা পড়ার ব্যাপারেও পরাজিত করবেন। নতুন উদ্দীপনা দেখা দিল তাঁর সকল কাজে। এ পর্যন্ত তিনি নানারকম খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। শিশু মনের খেয়ালে তিনি রচনা করতেন জলঘড়ি, সূর্যঘড়ি আর ছোটখাট উইন্ডমিল। স্কুলের পড়া শেষ করে নিউটন গেলেন কেম্ব্রিজে। সেখানে ভর্তি হলেন ট্রিনিটি কলেজে, আর দরিদ্রের জন্য একটা বৃত্তিও পেয়ে গেলেন। তখনও তাঁর বিরাট প্রতিভা রয়েছে সুপ্ত, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানপ্রবাহ রয়েছে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায়।

এর পর চার বৎসর কেটে গেছে। ইংল্যাণ্ডে হল প্লেগের প্রাদুর্ভাব। কেম্ব্রিজের ছেলেরা দলে দলে বাড়ি ফিরে গেল। নিউটন ফিরে এলেন উলস্‌থর্জে তাঁদের ক্ষুদ্র গোলা বাড়িতে। এখানকার দীর্ঘ অবকাশ, শান্তিপূর্ণ জীবন বাইশ বৎসরের যুবকের কাছে পরম লোভনীয় মনে হল। সে যুগের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সমস্যা তাঁর চিন্তাকে আলোড়িত করত। তাদের সমাধানে নিউটন অনেকটা সফল হয়েছিলেন। দু বৎসর অবকাশ বড় কম নয়। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানচর্চার পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন।

নিউটনের জীবনব্যাপী সাধনার আগে বিজ্ঞানচর্চার রূপ ও রীতি ছিল ভিন্ন। আদিম মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিকাশের মূলে দেবদেবীর কীর্তিকলাপের সন্ধান পেয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে তারা শুনতে পেত দৈত্যের হুঙ্কার, ঝাউবনের সোঁ সোঁ শব্দে তারা আবিষ্কার করত পেত্নীর কান্না। প্রাচীন যুগের জ্ঞানবৃদ্ধেরা অবশ্য বিশ্বাস করতেন—প্রকৃতির কাজ চলছে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে, কারও খেয়ালের তোয়াক্কা সে রাখে না। এই নিয়মের ভিত্তি ছিল দার্শনিক সূত্র অথবা অতীন্দ্রিয় জগতের ওপর। সেকালের লোকেরা পৃথিবীর নিখুঁত-সত্ত্বা মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই সব জিনিষেরই গতিপথ হবে নিখুঁত গোলাকার। গ্রহ-পুঞ্জের গতিপথের রহস্য এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা হত। মাটিতে পড়ে বল গড়িয়ে যায় কেন তার উত্তরও এর মধ্যে পাওয়া যেত। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তক হচ্ছেন আরিস্টটল। এক আধ বছর নয়, সতের শতাব্দী ধরে লোকের অন্ধ বিশ্বাস ছিল তাঁর ওপর। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরিস্টটলের মতবাদ লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ত, প্রকৃতির আসল রূপ তাদের চোখে ধরা দিত না। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা যেমন ল্যাবরেটরীতে এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সেকালের বিজ্ঞানবিদ্‌রা তেমনি লাইব্রেরীতে অ্যারিষ্টটলের লেখা পড়তেন।

এমনি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে নিউটন তাঁর মতবাদ নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন। ইতিমধ্যে অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। লোকের শিরায় শিরায় তখন রেনেসাঁসের আবেগ। পুরাতন আবেষ্টনীর মোহমুক্ত হতে চাইছে মানুষের মন। শত শত বৎসর ধরে জ্ঞানভাণ্ডারের উৎসরূপে অ্যারিস্টটল সম্মানিত হয়ে এসেছেন। এখন লোকে যাচাই করে দেখতে লাগল কতদূর সত্য তাঁর জ্ঞানের পরিধি। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল তাঁর মতবাদ অনেকাংশে ভ্রান্ত। বিশ্বের লোক উন্মুখ হয়ে উঠল প্রকৃতির নতুন আলেখ্য রচনার জন্য। কিন্তু প্রকৃতির অখণ্ড সত্ত্বা ছিল প্রায় সকলেরই কল্পনার বাইরে। ব্যক্তিগত চিন্তার মধ্যে

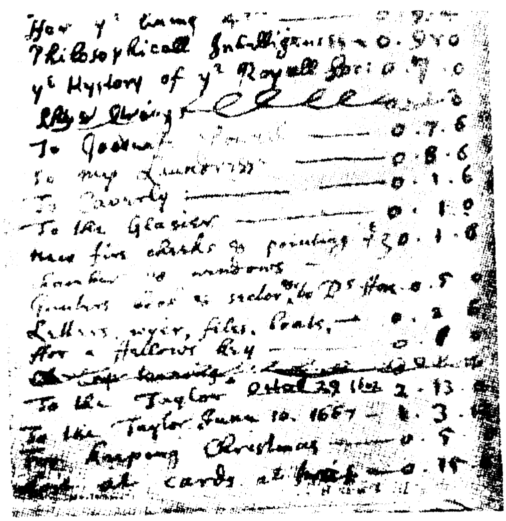
দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। অবস্থার পরিবর্তন করলেন নিউটন। তিনি প্রমাণ করলেন একটি মাত্র নিয়মবন্ধনে বাঁধা আছে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে এই নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ-মুক্ত হয়েছিলেন। নিউটন ছাড়া এ বিষয়ে আরও অনেকে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সাফল্যের দাবী একমাত্র তাঁরই পাওনা হল। কক্ষচ্যুত গ্রহের মত বিজ্ঞানজগতে তিনি একাকী বিচরণ করেন নি। তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছিলেন মোহমুক্তির পথে। অবশেষে জ্ঞানের নির্মল আলোক ধরা দিল তাঁরই কাছে।

নিউটনের আবিষ্কৃত তথ্যের মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতিলাভ করেছে মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণের খুঁটিনাটি আরও অনেকের চিন্তার মধ্যে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। নিউটনই এদের একসূত্রে বেঁধে ব্যবহারযোগ্য রূপ দিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, যে শক্তির আকর্ষণে আপেল ভূতলে শায়িত হল, সেই শক্তিই আবার আকাশের চাঁদকে ধরিত্রীর বুক থেকে দূরে রাখছে। সূর্যের চারিদিকে গ্রহরাজির আবর্তনের মূলেও রয়েছে এই শক্তি। এই শক্তির মহিমাতেই আকাশে জ্যোতিষ্মান ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। মানবের প্রতি দেবতার ক্রুদ্ধ অভিশাপরূপে ধূমকেতুর জারিজুরি এতদিনে ভেঙে গেল। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তথ্য সমস্ত বিশ্বের হিসাবনিকাশ করেই ক্ষান্ত হল না, পেণ্ডুলামের গতি, পৃথিবীর কমলালেবুর মত আকৃতি, সাগরের জোয়ার ভাঁটা, স্যাটার্ন ও জুপিটারের চাঁদের গতি, প্রভৃতি বিচিত্র তথ্যের মূলেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব প্রমাণিত হল।

আজ আমরা জানতে পারছি নিউটনের আবিষ্কৃত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়, কিন্তু এর জন্য তাঁকে দায়ী করা চলে না। বিজ্ঞান সহজে চরম সত্যে পৌঁছায় না, সে সত্যের পথে অগ্রসর হয় একটু একটু করে। নিউটন সেই সত্যের আভাস একটুখানি দিয়েছিলেন। দু শ' বৎসরেরও অধিককাল মানুষ তাকে ব্যবহার-যোগ্য মনে করে এসেছে। বিজ্ঞানের যে বিভাগ একে অনুপযুক্ত প্রমাণ করেছে, তার স্বরূপ নিউটনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আধুনিক জ্যোতির্বিদ আজও নিউটনের তথ্যের ওপরই নির্ভর করেন একান্তভাবে, ব্রীজ অথবা স্টীম এঞ্জিন নির্মাণরত এঞ্জিনিয়ারও নিউটনের নির্দেশ মেনে চলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিজ্ঞানপ্রবাহে নিউটনের প্রভাব এখনও সম্পূর্ণ বিরাজ করছে।

নিউটনের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা। আলোকের স্বরূপ ছিল সকলেরই অজ্ঞাত। তার রঙের খেলা, বিচিত্র ছটা সকলের কাছে পরম রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচনা চলত, এ রহস্য মোচন করতেই হবে। যুবক নিউটন স্টুরব্রিজের মেলায় বেড়াতে গেলেন। ছেলেভুলানো রঙীন খেলনার দোকান সারি সারি বসে গেছে। নিউটন একটা সস্তা দামের প্রিজ্‌ম কিনে বসলেন। বাড়ি এসে তিনি প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলেন রঙের খেলা, আর তখনি আলোকের মূল তথ্যটি আবিষ্কার করে ফেললেন। পরবর্তী গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হল। আলোকের জয়যাত্রা শুরু হল বিজ্ঞানজগতে। নিউটন এখানেই ক্ষান্ত হন নি। এ বিষয়ে তাঁর পর্বতপ্রমাণ গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে তখনকার বৈজ্ঞানিকমহলে বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর গোড়াতেও সেই সামান্য একটি ঘটনা। স্টুরব্রিজের মেলায় রঙীন একটা খেলনা।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের মতে এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগে না। তাঁরা বলেন,—বিজ্ঞানের শক্তি আমাদের সর্দি আটকাতে পারছে না ত, তুষারাচ্ছন্ন সকালবেলায় আমাদের মোটরগাড়ী স্টার্ট দেওয়ার কোন উপায়ও বার করতে পারছে না। এঁদের মনে রাখা উচিত বিজ্ঞানের কিভাবে উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞান হচ্ছে অনেকটা কৃষিকর্মের মত। একটা বীজবপনের সময়, আর একটা শস্য কাটার সময়। কৃষিকর্মের সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, শস্য কাটার ব্যাপারটা বীজবপনের দীর্ঘকাল পরে আসে। আজ মানুষ ফসলরূপে যে বৈজ্ঞানিক সুখসুবিধা ভোগ করছে, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল কত শত বৎসর আগে। সেই বপনকারীদের মধ্যে নিউটন দাঁড়িয়ে আছেন হারকিউলিসের


y^e Hystory of y^e Royall Soci...
To the Glasier
To the Taylor Octob 29 1662 2. 13.
To the Taylor June 10. 1667
Keeping Christmas
... at cards ...

নিউটনের নোটবুকের পাণ্ডুলিপি

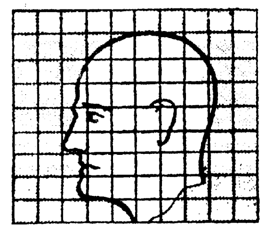
মত উন্নত মস্তকে। মানুষ আনন্দ চায় অমৃতরূপে। অমৃতধারা পরিবেশন করে গেছেন আইজ্যাক নিউটন, আজও জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে পরিগণিত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বীজাণুতত্ত্ব সম্প্রতি অনেক রোগের প্রতিষেধক আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। ভাল মাইক্রস্‌কোপ ছাড়া এদের আবিষ্কার করা যেত না। আলোক-বিজ্ঞানের তথ্য বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য না থাকলে ভাল মাইক্রস্‌কোপ নির্মাণ সম্ভব হয় না। আর এই আলোক সম্বন্ধে বেশীর ভাগ আবিষ্কার নিউটনের। হয়ত সর্দিরও প্রতিষেধক একদিন আবিষ্কৃত হবে কোন নতুন জোরালো মাইক্রস্‌কোপের সাহায্যে। তার জন্যও মানুষ নিউটনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রধানত নিউটনের প্রভাবেই মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল। ভৌতিক ও অতীন্দ্রিয় জগতের ওপর বৈজ্ঞানিক মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলল। কুসংস্কারের সুউচ্চ প্রাসাদ মাটিতে গুঁড়িয়ে গেল। বিজ্ঞানের স্বচ্ছ আলোর সামনে শতাব্দীর অজ্ঞতার অন্ধকার কোথায় মিলিয়ে গেল। সম্মান ও যশ সহস্রধারে বর্ষিত হয়েছিল নিউটনের ওপর। ভলটেয়ার বলে গেছেন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নিউটনের স্থান সর্বাগ্রে। শ্রেষ্ঠ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপ্লেসও অনুরূপ উক্তি করে গেছেন নিউটন সম্বন্ধে। কিন্তু নিউটন স্বয়ং জীবনসায়াহ্নে বলেছিলেন,—পৃথিবীতে আমার স্থান কোথায় হবে আমি জানি না। বালকের মত আমি সমুদ্র তীরে খেলা করে এসেছি। সারা জীবন ধরে চকচকে নুড়ি ও ঝিনুক সংগ্রহ করেছি। সত্যের বিশাল বারিধি আমার সম্মুখে অনাবিষ্কৃত পড়ে ছিল। বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ ঠিকই বলে গেছেন। মহাসাগর এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

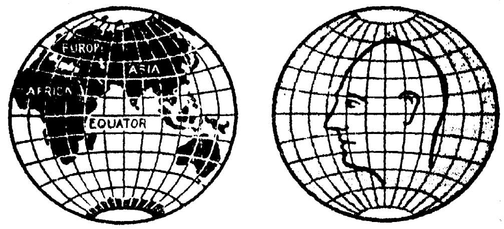
মানচিত্রের গলদ

শ্রীপণ্ডিত

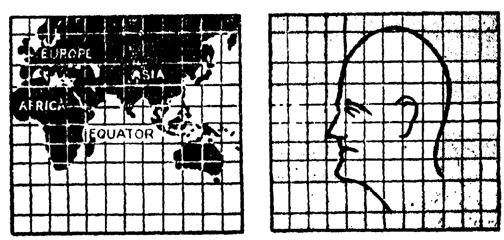
মানচিত্রগুলিকে মিথ্যাভাষণের দায়ে অভিযুক্ত করা চলে। তারা সত্য কথা, এমন কি আংশিক সত্য কথাও বলে না। সত্য কথা বলা তাদের ধাতে একেবারেই সয় না। মিথ্যা উক্তির অভ্যাস তাদের প্রকৃতিতেই রয়েছে। এমন কি শ্রেষ্ঠ মানচিত্রাঙ্কনবিদেরাও সব চাইতে বিশ্বাসযোগ্য হিসাব নিকাশ নিয়ে যে চিত্র এঁকে থাকেন, তার মধ্যেও মিথ্যা লুকিয়ে আছে। তাদের দোষ দিয়ে লাভ নাই—বরং অনুকম্পাই করতে হয়। একটা অতি সাধারণ উদাহরণ থেকেই বুঝা যাবে। একটি কমলালেবুর, (যার আকার অনেকটা পৃথিবীর মতই) গোটা খোসাটাই ছাড়িয়ে নেওয়া হল। অতঃপর ওটাকে টেবিলের উপর মেলে ধরার যদি চেষ্টা করা হয়, দেখা যাবে, না ছিঁড়ে বা আকারের কোন বিকৃতি সাধন না করে, মেলে ধরা অসম্ভব। মানচিত্রবিদই বা কি ভাবে গোলাকার পৃথিবীর ত্বক (মানচিত্র) টেবিলের উপর মেলে ধরবেন? আর একটু সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, পৃথিবীর বহিরাবরণ যদিও গোলাকার—কিন্তু মানচিত্র হয়ে উঠে সমতল। অঙ্কশাস্ত্রের দিক থেকে গোলাকার এবং সমতল স্থানের পরিমাপ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। সে জন্যই, গোলাকার জিনিসকে সমতল বলে চালিয়ে দিতে হলে কিছুটা বিকৃতি ঘটবেই। পৃথিবীর বহিরাবরণের সত্যিকার



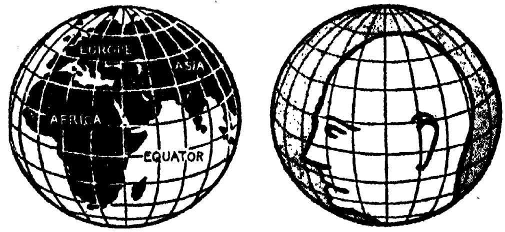
দূরত্ব, দিক বা পরিমাণ ফল এই তিনটি মূল বিষয়ের বিকৃতি না ঘটলে কোন গোলককে সমতল-ভূমিতে রূপ দেওয়া যায় না। সে জন্যই মানুষ বিভিন্ন projection বা পরিকল্পনার ব্যবহার করে থাকে; কিন্তু তথাপি কিছু কিছু বিকৃতি থাকবেই—ছবিতে মানুষের মাথাটি যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকৃত আকার ধারণ করবেই, তেমন মানচিত্রও বিকৃত হয়ে দেখা দেয়।



সম-পরিমাণ পরিকল্পনা বিভিন্ন স্থানের আনুপাতিক পরিমাণ ফল ঠিকভাবেই প্রকাশ পায়, কিন্তু দিক অশুদ্ধই থেকে যায়।



মার্কেটার পরিকল্পনাতে দিক ঠিক থাকে, কিন্তু দূরত্ব ঠিক থাকে কেবলমাত্র বিষুব রেখাতেই। পরিমাণ ফলে খুব বেশী বিকৃতি দেখা যায় এবং তা বিষুব রেখা থেকে সুমেরু বা কুমেরুর দিকে যেতে ক্রমশঃ বেড়ে উঠে।



ফটো পরিকল্পনাঃ—প্রায় সব দিক থেকেই ভুল। কিন্তু পৃথিবী যে গোলাকার তা বুঝাবার পক্ষে বিশেষভাবেই উপযোগী।

নিখুঁত প্রকাশ হয় গোলকে, মানচিত্রে কদাপি তা হয় না।

মানচিত্র যাঁরা এঁকে থাকেন, তাঁরা সবাই জানেন, দিক যদি সঠিক রাখতে হয়, তবে স্থানের পরিমাণে বিকৃতি ঘটবেই। আবার স্থানগুলির যদি আনুপাতিক পরিমাণ ফল সঠিক রাখতে হয়, তবে দিকে ভুল হবেই।

দুদিক সামলানো অসম্ভব বলে একটা বিশেষ কোন পরিকল্পনা বা projection ঠিক করে নিতে হয়। তাতে ভ্রান্তি যে দূর হয় তা নয়—তবে ভুলের পরিমাণ অসীম থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে নেমে আসে। এমন ডজনখানেক পরিকল্পনা আছে, যা থেকে মানচিত্রকারকে তার প্রয়োজনমাফিক একটা নির্বাচন করে নিতে হয়। সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই আছে। কিন্তু প্রয়োজনই হল মাপকাঠি।

(১) মার্কেটার পরিকল্পনা—এতে দিক ঠিক থাকে, চেহারাও মন্দ হয় না,—কিন্তু দূরত্ব ও বিভিন্ন স্থানের এলাকা সম্পর্কে ভুল খবর দিয়ে থাকে।

(২) সম-এলাকা পরিকল্পনা (Equalarea projection):—এলাকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেবে, দূরত্ব ও আকারে বিভ্রান্তি ঘটাবে।

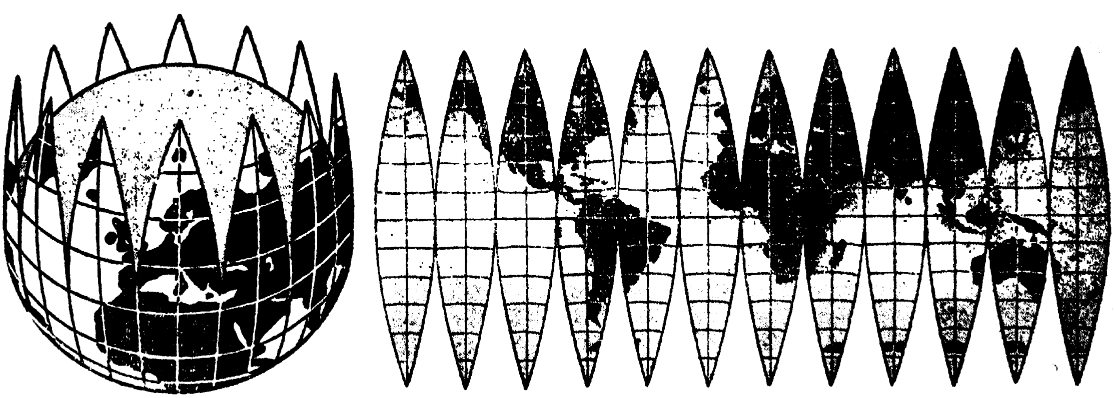
(৩) কৌণিক পরিকল্পনা (conic projection):—কোন বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে এ সঠিক দূরত্ব, আকার ও দিকনির্ণয় করে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে নয়।

পৃথিবীর যুদ্ধ-পরিকল্পনায় সম্ভবত মার্কেটার পরিকল্পনাই আমরা বেশী দেখি। গ্রীণল্যাণ্ডের পরিমাণ ফল যদি দক্ষিণ আমেরিকার সমান হয়, অথবা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ যদি বোর্নিও থেকে বড় দেখায় অথবা কানাডা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দ্বিগুণ বড় দেখায়, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমরা মার্কেটার পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছি। কিন্তু, পূর্বোক্ত দেশগুলির তুলনামূলক অবস্থা বাস্তবিক কি? গ্রীণল্যাণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার মাত্র এক-নবমাংশ, কিন্তু মানচিত্রে দেখা গেল সমান। বোর্নিও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের দ্বিগুণ বড়, অথচ মানচিত্রে দেখা গেল, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জই বড়। মিথ্যাভাষণের চমৎকার উদাহরণ যা হউক।

কিন্তু আজকের দিনে মার্কেটার পরিকল্পনারই ব্যবহার বেশী। বহু পেশাদার মানচিত্রকর এ পরিকল্পনা পছন্দ করেন না, কিন্তু সবাই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, সমুদ্রে জাহাজ চালনায় এটার উপযোগিতাই সব চাইতে বেশী। কেন না, কম্পাসের কাঁটা কোথায় আছে, এ মানচিত্র থেকে তা বিশুদ্ধভাবে স্থির করা যায়। প্রত্যেকটি উপসাগর এবং উপদ্বীপের চেহারা এতে ঠিকমত ধরা পড়ে। সেজন্যই, অধিকাংশ সামুদ্রিক চার্টই মার্কেটার পরিকল্পনানুযায়ী রচিত হয়েছে।

কিন্তু যদিও মার্কেটার পরিকল্পনায় কতকগুলি সুবিধা আছে, কিন্তু ভুলগুলিও একেবারে বিস্মৃত হওয়া যায় না। কিন্তু এ মানচিত্র যে কেমন অদ্ভুত রকমের আকার-বিকৃতি ঘটায়, তার আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। মনে করা যাক্, বিষুবরেখার দশ ইঞ্চি লম্বা লাইনে ১ হাজার মাইল দূরত্ব বুঝচ্ছে। কিন্তু ৪০ ডিগ্রি উত্তরে ঠিক সমপরিমাণ দূরত্ব বুঝাতে লাইনটি হবে ১৩ ইঞ্চি লম্বা; ৫১ ডিগ্রি উত্তরে (লণ্ডন) হবে ১৫ ইঞ্চির বেশী লম্বা, ৬০ ডিগ্রি উত্তরে (লেনিনগ্রাদ) লাইনটি হবে ঠিক ২০ ইঞ্চি।

যদি কোন মানচিত্রে গ্রীণল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, বোর্নিও এবং কানাডার আনুপাতিক পরিমাণ ফল সঠিকভাবে ধরা পড়ে, তবে মনে রাখতে হবে, সেখানে equal-area projections বা সম-পরিমাণ পরিকল্পনা ম্যাপেরই ব্যবহার হচ্ছে। এ পরিকল্পনায় পৃথিবীর মানচিত্র হবে ডিম্বাকার বা elliptical। যদিও বিভিন্ন দেশের আনুপাতিক পরিমাণ তুলনায় এর জুড়ি নাই, তথাপি একথা ঠিক, এ সকল মানচিত্র দিক এবং দূরত্বের ভয়ঙ্কর বিভ্রম ঘটায়। এ আকার-বিকৃতি মানচিত্রের কেন্দ্রস্থলে অতি সামান্য, কিন্তু যতই কেন্দ্র থেকে সরে যাওয়া হবে, ভুলের পরিমাণ ততই বেড়ে যাবে। দ্রাঘিমার উপর কৌণিক দূরত্ব এবং দ্রাঘিমাব-দূরত্ব বিবেচনা করলে এ ভুল সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। পৃথিবীতে বা গোলকে প্রত্যেকটি parallel of latitude প্রত্যেকটি meridian of longitudeকে সমকোণে ছেদ করে। সমকোণ থেকে লাইনগুলি কতটা সরে গেল তা দেখেই equal-area মানচিত্রের আকার বিকৃতিও ধরা যায়। দেশের চেহারা ভুল হলে দূরত্বেও ভুল হবে। অবশ্য, ত্রিকোণমিতি বা Trigonometry দিয়ে বিচার না করলে, ভুল বের করা সহজ নয়। বর্তমান কালে কোন কোন ক্ষেত্রে কৌণিক পরিকল্পনার ব্যবহার হচ্ছে। ইউরোপ, ইউনাইটেড স্টেটস্ এবং অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র এতে বেশ তৈরী করা যায়। সম-সমান্তর বা parallels of latitude দেখেই কৌণিক মানচিত্রের একটা বড় রকমের সুবিধা এই যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলিতে স্থানের পরিমাণ বা দূরত্বে বিভ্রম অতি সামান্যই হয়। ছোটখাট দেশ বা জেলা আঁকতে আকার-বিকৃতি হয় না বললেই চলে।



পৃথিবীর সত্যিকার চেহারা পাওয়া যায় গোলকে। কমলালেবুর খোসা ছাড়াবার মত পৃথিবীরও খোসা ছাড়ালে চেহারাটা কি রকম হবে, তা বুঝা যায়। বিভিন্ন ছিন্নাংশকে সমতল করার চেষ্টা করলে, মহাদেশগুলির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কৌণিক ম্যাপে অন্যান্য অনেক রকমের গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। এর কারণ এই যে আমরা অনেকেই মার্কেটার পরিকল্পনায় অভ্যস্ত। মানচিত্রের ঊর্ধ্ব দিক উত্তর এবং ডান দিক পূর্ব বলে ধরে নিতে আমরা অভ্যস্ত। ব্যাপারটা মার্কেটার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভাল রকমেই খাটে, কিন্তু কৌণিক বা সম-পরিমাণ মানচিত্রের কেবলমাত্র কেন্দ্রস্থল সম্পর্কেই কথাটা সত্য।

আর এক রকমের পরিকল্পনা আছে; কিন্তু মানচিত্রপটুয়ারা কদাচিৎ তা ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য, সাধারণ পুঁথি পুস্তক এবং সাময়িক পত্রে এগুলির ব্যবহার খুবই বেশী। একটা বিরাট গোলকের ফটো থেকেই এ সকল মানচিত্র তৈয়ার হয়। অবশ্য, এমন যায়গা থেকে ফটো নিতে হবে, যাতে গোলার্ধের প্রায় সম্পূর্ণটাই দেখা যায়। প্রথম দৃষ্টিতে এরূপ ফটোগ্রাফিক ম্যাপ আদর্শ বলেই মনে হবে—কিন্তু বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, প্রায় সকল দিক থেকেই এটাতে ভুল থাকে।

যে কোন পরিকল্পনাই নেওয়া যাক না কেন, কতকগুলি বিকৃতি থাকবেই। অধিকাংশ মানচিত্র যে রকম ছোট স্কেলে তৈরী হয়, তাতে কতকগুলি সমস্যা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। সংবাদপত্র পৃষ্ঠায় মানচিত্র আঁকতে হলে সাধারণত তা হয় আনুমানিক ১ : ১০০,০০০ ০০০। অর্থ এই যে মানচিত্রর এক ইঞ্চি স্থানে পৃথিবীর ১৬শত মাইল ধরা আছে। এরকম স্কেলেই হউক বা এর চাইতে বড় স্কেলেই হউক প্রাকৃতিক সমস্ত জিনিস, শহর, রেলপথ বা নদী ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ তথ্য বাদ দিয়ে ভীড় কমানোই কি উচিত? যদি তাই হয়, তবে কোন্ কোন্ তথ্য বাদ দিতে হবে?

আগের দিনে মানচিত্রকারেরা যত বেশী তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তারই চেষ্টা করতেন—কেননা, মানচিত্রে কোন খালি যায়গা দেখলে ক্রেতারা মনে করতেন, তাদের বুঝি ঠকানো হল। যা হক ভীড় করে বেশী নাম ঢুকাবার রেওয়াজ ক্রমশ লোপ পাচ্ছে,—কিন্তু তা একেবারে মরেও যায় নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সোভিয়েট ইউনিয়নের এক মানচিত্রে সাইবেরিয়ার শহর স্ক্রিডনে কার্লমস্ক, নিজনি কার্লমস্ক এবং নোভো মারলিনস্কের নামও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মজা এই যে, এ শহরগুলির মোট অধিবাসীর সংখ্যা এক হাজার থেকে দু চারজন বেশী। ম্যাপে উত্তর-পশ্চিম সাইবেরিয়ায় অনেক যায়গা খালি পড়ে আছে দেখে ড্রাফটস্‌ম্যান মনের খুশীতে নাম বসিয়েছেন। কিন্তু ঐ একই মানচিত্রের অন্য অংশে তিনি স্মলেনস্ক (অধিবাসী ৮৯,০০০জন) এবং স্ট্যালিনো (২,৭২,০০০জন) বাদ দিয়ে গেছেন। ৫শত বাসিন্দাওয়ালা স্ক্রিডনে কার্লমস্কের নাম যে টাইপে লেখা হয়েছে, ঠিক সে টাইপেই ৫০৯,০০০জন অধিবাসীর ওদেসা বন্দরের নামও লেখা হয়েছে।

অধিকাংশ মানচিত্রকারেরা অবশ্য স্বীকার করেন, মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকলে তা বরং খালি রাখাই ভাল—কিন্তু তথাপি আজে-বাজে নাম লিখে যায়গা ভর্তি না করাই উচিত। অনুরূপ সমস্যা আরও আছে। মনে করা যাক একশত মাইল দীর্ঘ এবং দুই মাইল প্রস্থ দশটি পাহাড় সমান্তরালভাবে রয়েছে। ছোট স্কেলের মানচিত্রে একটি পাহাড়কে বিশ মাইল প্রস্থ এবং ১শত মাইল দীর্ঘ দেখানো হয়। যায়গা থাকলে সর্বোচ্চ অংশের উচ্চতা এবং দু একটা গিরিবর্ত্মের চিহ্ন দেওয়া হয়।

পুঁথি-পড়া সমর বিশারদেরা অনায়াসেই এ ফাঁদে পড়েন। কেননা, একটি মাত্র পর্বতশাখা আত্মরক্ষার দিক থেকে যে অনেক বেশী শক্তিশালী, তা দূর থেকে তারা ঠিক মত বুঝতে পারেন না—এবং অনায়াসেই স্ট্রাটেজীর ভুল তারা ধরে ফেলেন এবং সেনাপতিদের যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা নিয়ে সংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লিখে বসেন। তারপর, গিরিবর্ত্মের কথাই ধরা যাক। যেখানে একটি গিরিবর্ত্মের চিহ্ন রয়েছে, সেখানে হয়ত আসলে দশটি গিরিবর্ত্ম আছে—এবং তার কোনটাই হয়ত মেকানাইজড্ ডিভিশনের যুদ্ধ চালনার উপযোগী নয়।

ছোট স্কেলের মানচিত্রে আরও কতগুলি স্বাভাবিক অসুবিধা আছে। সাধারণত মানচিত্রকার রাস্তা এবং রেলপথের বাঁকের কথা কিছু বলেন না—যদি বলেন, তাও সামান্য। এ অবস্থায় যে পথকে দেখানো হয় ১শত মাইল বলে, আঁকে বাঁকে ঘুরে ফিরে তা হয়ত সোয়াশত মাইল। কিন্তু সৈন্য দলের অগ্রগতি বা পশ্চাদ গতি বিচার করতে গিয়ে প্রায়শই অবিচার করা হয়। বড় স্কেলের সামরিক মানচিত্রের দিকে একবার মাত্র তাকালেও বহু সমস্যা ধরা পড়ে এবং পুঁথিপড়া সমরনীতিবিদদের আলোচনা যে কত হাস্যকর তা বুঝা যায়।

সঠিক তথ্যের অভাবই মানচিত্রের পক্ষে অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। অধিকাংশ মানচিত্রই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকে তৈরী হয় না, পুরানো মানচিত্র দেখে তৈরী হয়। আবার, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেরই তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়,—এবং যা পাওয়া যায়, তা অনেকক্ষেত্রেই তাড়াতাড়ি গোঁজা মিল দেওয়া। এ অবস্থায় কাগজের একটি দাগ হ্রদ বলেও ভুল হতে পারে, অথবা কালির একটা রেখাকে নদী বলে ঘোষণা করা হতে পারে। অবশ্য, এ ধরণের ভুল ক্রমশই কমে আসছে। বিমান থেকে ফটোগ্রাফ নেবার সুবিধা হওয়ায় ক্রমশ ভুল শুধরানোও যাচ্ছে। কিন্তু এখনও যথেষ্ট গলদ আছে। এখনও মানচিত্রগুলিকে মিথ্যাভাষণের দায়ে অভিযুক্ত করা চলে।



জ্ঞানবিজ্ঞান

সুধীর বসু

খাদ্য সমস্যা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বর্তমানে খাদ্য সমস্যাই বাঙলার প্রধান সমস্যা। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত। ধান, চাউল অগ্নিমূল্য হওয়াতে জনসাধারণের দুর্দশার অবধি নেই। অথচ এ সমস্যা সমাধানের পথ আজও সুস্পষ্ট নির্ধারিত হল না। গভর্নমেন্টের কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সন্তোষজনক ফল না হওয়ায়, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যাহার করা হয়েছে। সরকারের আশা ছিল, স্বাভাবিক খাতে ব্যবসায় পরিচালিত হতে দিলে, হয়তো অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কিন্তু কার্যত তাহা হয় নি। বাঙলার সর্বত্র চাউল দুর্মূল্য, অর্ধাহারে অনাহারে অগণিত লোক 'হা অদৃষ্ট বলে' মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। একদল বলছেন দেশে পর্যাপ্ত চাউল নেই—শত্রু দ্বারদেশে উপস্থিত—তাদের বঞ্চিত করার জন্য চাউল সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তাই এ অবস্থা। সরকার পক্ষ বলছেন,- এখনও দেশে যথেষ্ট চাউল আছে- ব্যবসায়ী ও মজুতদার-গণ তা অসঙ্গতভাবে আটক করে রেখে তাদের মোটা লাভের ব্যবস্থা করছেন মাত্র। যেখান থেকে যা চাউল আমদানী হচ্ছে, চোরাবাজার বা 'ব্ল্যাক মার্কেটেই' তা স্থান পাচ্ছে। অবস্থা যদি তাই হয়, তবে দেখা যাচ্ছে, যে পর্যন্ত লোভী ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের সায়েস্তা করা না যায়, সে পর্যন্ত বাজারে চাউলের আমদানী বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস আশা করা দুরাশা মাত্র। এ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল না করে যেভাবে উহা আরও সুসংবদ্ধ প্রণালীতে ভাল রকম কার্যকরী হয়, তাই করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ফসল উৎপাদন হতে আরম্ভ করে উহা বাজারে আমদানী ও বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে স্তরে ভালরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি প্রথম থেকে অবলম্বিত হ'ত, তাহলে আজ হয়তো এত শীঘ্র এরূপ শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হত না।

যুদ্ধের প্রথম হতেই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ঐ সকল দেশে লোভী ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের প্রাণদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত করা হয়। এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করবার নিমিত্ত সেখানে "স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো"ও গঠিত হয়েছে। জনসাধারণকে বঞ্চিত করে যারা লাভের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি গোপনে মজুত করে রাখে, তাদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্টও প্রবর্তন করেছেন এবং সম্প্রতি একটি চীনা শহরের মেয়রকে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার অপরাধে গুলী করে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে। দেশী ও বিদেশী ধনিকদের স্বার্থেই এদেশে শাসন কার্য পরিচালিত হয়। জনসাধারণের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন বিদেশী সরকার ধনী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সাহস পাবেন কিনা সন্দেহ। সাহস পেলেও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অর্থলোলুপতা ও স্বার্থবোধ যেরূপ বেশী বলে শুনতে পাওয়া যায় তাতে তাদের কাছ থেকে সত্যিকারের মঙ্গলজনক কাজ পাওয়ার আশাও বেশী নেই। যে সরিষা দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে, তার মধ্যেই যদি ভূত থাকে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিভাবেই বা কার্যকরী হবে? অগোণে এসব বিষয়ে যে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তাদের দেশের উৎপন্ন প্রধান প্রধান ফসলের হিসাবনিকাশ যথারীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের পক্ষে ফসলের পরিমাণ জেনে তদনুযায়ী জনসাধারণের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা বেশ সহজ হয়ে উঠে। দুঃখের বিষয়, এদেশে সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ কত, গত বৎসরের উদ্বৃত্তের পরিমাণই বা কি, জনসাধারণের চাহিদা কিরূপ এ সব বিষয়ে সুস্পষ্ট হিসাব পাওয়া ভার। এবার ফসল উঠবার পর থেকে এক-মাসে কিরূপ পরিমাণ ব্যয়িত হয়েছে এবং এখনও অবশিষ্ট যা' রয়েছে তার পরিমাণ কিরূপ—কতদিনই বা এ দেশের লোকের তাতে চলতে পারে—এসব কোন বিষয়েই বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যা সংগৃহীত না হওয়ায় কোন বিষয়েই যেন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না—শুধু অন্ধকারে পথ হাতরাবার মতই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। যে কারণেই হউক, চাউলের পরিমাণ যদি জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী এদেশে না থাকে, তবে উহার পরিবর্ত স্বরূপে দেশবাসীকে অন্য খাদ্য গ্রহণ করাবার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। বহুকালের অভ্যাস বদলে দিয়ে লোককে এমন খাদ্য গ্রহণ করাতে হবে, যাতে তাদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটে, খাদ্য সমস্যারও সমাধান হয়।

ভাতের পরিবর্ত খাদ্য

চাউলের অভাবে বা দুর্মূল্যতার জন্য অনেকে গোল আলু, রাঙা আলু, শাকসব্জী সিদ্ধ করে বেশী পরিমাণে ভাতের সঙ্গে বা আলাদা ইতিমধ্যেই খাওয়া শুরু করেছে। 'কিছু ভাত, কিছু রুটি' এরূপ মিশ্র খাদ্যের প্রচলনও এ সময় সুবিধাজনক বিবেচিত হয়; স্বাস্থ্যের দিক হতে শুধু ভাত খাওয়ার চেয়ে উহা বলকারকও বটে। কিন্তু বর্তমানে দেশে যা' অবস্থা তাতে চাউল, আটা সবই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য; বহুলোকের পক্ষেই এখনকার বাজার দরে উহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত। সুতরাং অতি সহজ-প্রাপ্য সাধারণ কোন দ্রব্য দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করা মানুষের পক্ষে সহজ কি না বিজ্ঞানীদের নিকট আজ সেই প্রশ্নই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ বীরেশ-চন্দ্র গুহ মহাশয় 'সায়েন্স এণ্ড কালচার' পত্রিকায় 'খাদ্য সঙ্কট' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কাঁচ ঘাস পাতা হতে মানুষের গ্রহণযোগ্য খাদ্য পাওয়া সম্ভবপর কি না তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ হতে জানা যায়, য়ুরোপে এবং আমেরিকায় এ সম্পর্কে সম্প্রতি কিছু গবেষণা হয়েছে। কাঁচ ঘাসপাতায় যে তন্তু (fibre) রয়েছে, তা অবশ্য মানুষের পক্ষে জীর্ণ করা সম্ভব নহে, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাদের মধ্য হতে যে 'প্রোটিন' জাতীয় পদার্থ পৃথক করা যায়, প্রাণী দেহের পক্ষে তা বেশ উপযোগী। এমন কি উহা গুণে দুগ্ধাদি হতে প্রাপ্ত প্রোটিনের প্রায় সমতুল্য। কাঁচ সবুজপাতা বা ঘাসের শীষ জলের সাহায্যে কোমল করে নিয়ে আগুনে জ্বাল দিলে জলসিক্ত নির্যাস হতে উহার প্রোটিন দানা বেধে উঠে। এভাবে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাতে ঘাসের মত একটু গন্ধ থাকে বটে, কিন্তু খেতে কোন বিস্বাদ নহে। উহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ 'ক্লোরোফিল' মিশ্রিত থাকলেও উহা কোনরূপে ক্ষতিকর নহে। এই প্রোটিন লোকেরা অনায়াসেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। প্রোটিন পৃথক করে লওয়ার পরও ঘাস বা পাতার তন্তুময় অংশ যা বেশী পরিমাণে পড়ে থাকে, অদ্রবীভূত প্রোটিনও তার মধ্যে কম পরিমাণ থাকে না। সুতরাং গরু, ঘোড়া গৃহপালিত পশুদের খাদ্য হিসাবে তন্তুময় অংশ বরাবরের ন্যায় চলবে। এভাবে ঘাস বা পাতার কোন অংশই নষ্ট হওয়ার কারণ নেই। সাধারণত বিষাক্ত কোন পাতা বা ঘাস ছাড়া যাবতীয় কাঁচা সবুজ পাতাই এভাবে মানুষ ও গৃহপালিত জন্তু উভয়ের খাদ্য হিসাবে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে পারে। যেখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস বা সবুজ পত্রাদি পাওয়া যায়, সেখানে ব্যাপকভাবে তাদের প্রোটিন পৃথক করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে ঐ

প্রোটিন শ্বুকিয়ে শহর অঞ্চলেও চালান দেওয়া যেতে পারে। গৃহস্থ লোকেরাও নিজেদের প্রয়োজন মত অন্যান্য জিনিস রাঁধবার ন্যায় ঘরে তৈরী করে নিয়ে 'ঘাসের চপ' খেতে পারেন।

ভাত বা আলু প্রভৃতি 'কার্বোহাইড্রেট'-সংযুক্ত পদার্থে যে পুষ্টি আনয়ন করে, সেদিক থেকে প্রোটিন যুক্ত আহার্যের গুণও প্রায় সমতুল। তবে ঘাসের প্রোটিন ভাতের বদলে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় শুধু প্রোটিনযুক্ত আহার্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। তবে ভাতের পরিমাণ অর্ধ বা এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে, সে পরিমাণ ঘাস বা সবুজ পাতা হতে প্রস্তুত প্রোটিন গ্রহণ করলে, তার ফল খারাপ হবে না। বরং খাদ্যে প্রোটিনের ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শুধু ভাত গ্রহণের চেয়ে এরূপ খাদ্য শরীরের পক্ষে অধিকতর পুষ্টিকরই হবে।

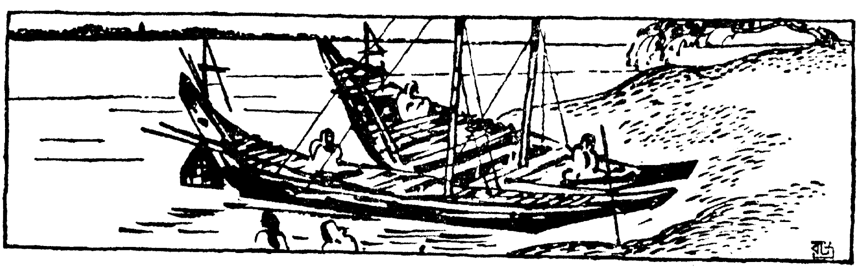
দেশে যে দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছে, বিজ্ঞানীদের এই গবেষণার বিষয় আরও ভালরূপে পরীক্ষা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। ঘাস পাতার এদেশে অভাব নেই--তা খেয়ে তবু মানুষ যদি এ যাত্রা প্রাণ বাঁচাতে পারে।

জনসংখ্যার তথ্য

বিশাল ভারতভূমির লোক গণনায় এমন সব বিচিত্র তথ্য প্রকাশ পেয়ে থাকে, যা ভৌগোলিক ও সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষণার খোরাক জুগিয়ে থাকে। ১৯৪১ সালের লোক গণনার হিসাব থেকে দেখা যায়, বিগত দশ বৎসরে এদেশে শতকরা ১৫ ভাগ লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে অঞ্চল হিসাবে আবার লোকসংখ্যার বাড়তি পড়তিতেও কম বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না! এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল-বিজ্ঞান শাখার লেকচারার ডাঃ আরথার গিডিস (Dr. Arthur Geddes) সম্প্রতি 'জিয়োগ্রাফিক্যাল রিভিউ'তে কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ডাঃ গিডিস্ পূর্বে কিছুকাল ভারতবর্ষে (১৯২১-২৪) সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করেন। ১৯৩৮-৩৯ সালেও পুনরায় এদেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে জনসংখ্যাগুলিও বিশ্লেষণ করে চিত্র সাহায্যে দেখিয়েছেন যে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে জনসংখ্যার মোট বাড়তির মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়, কোথাও বা এই বাড়তির পরিবর্তন বা ব্যতিক্রমের হার প্রায় অব্যাহত থাকে। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব বাঙলায় ও ত্রিবাঙ্কুরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লোকগণনার সংখ্যা হতে দেখা যায়, ১৮৮১ হ'তে ১৯৩১ সাল এই ৫০ বছরে এই দুই অঞ্চলে জনসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি লাভ করেছে যে ইহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন কমই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আসাম বা পাঞ্জাবের প্রণালিকাসিঞ্চিত অঞ্চলে জনসংখ্যা এ কয়বৎসরে অত্যধিক বেশী বৃদ্ধি পেলেও তার মধ্যে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম পদ্ধতি (Variability) চোখে পড়ে। ডাঃ গিডিস্ বলেন, কোথাও কৃষিকাজের নূতন ব্যবস্থা বা নূতন উপনিবেশের বন্দোবস্ত হলেই লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির ব্যতিক্রম অধিক সূচিত হয়। তা ছাড়া অন্যান্য কারণও দেখা যায়। মধ্য বাঙলায় লোকসংখ্যা শতকরা মোট ১৪ জন হ্রাস হয়েছে। ইহা কোন আকস্মিক ব্যতিক্রম নহে। এ অঞ্চলের ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাবই এখান-কার লোক সংখ্যা হ্রাসের কারণ। রাজপুতনার অঞ্চলে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করে, মাঝে মাঝে সুসময়ও আসে। সুতরাং এ অঞ্চলের লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে ব্যতিক্রম বেশী থাকলেও মোট লোক সংখ্যা উহার এ কয় বৎসরে প্রায় একরূপই রয়েছে। ডাঃ গিডিস বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সংখ্যার এই বাড়তি পড়তি হিসাব করলে ঐ অঞ্চলের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, পারিপার্শ্বিক ও অর্থনীতিক অবস্থা সম্পর্কে বহু তথ্য নির্ণীত হতে পারে। যে পরিমাণ লোক কোনও অঞ্চলে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, বা সেখান থেকে সরে পড়তে বাধ্য হয়, তা থেকে সামাজিক অবস্থাও বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়; পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মজন ও সমাজের বন্ধন কতদূর পর্যন্ত কোথাও শক্ত বা কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়, জনসংখ্যা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা হতেও অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারেন। সমাজ সংস্কারকগণ তদনুযায়ী সমাজ সংগঠনে যত্নবান হলে দেশের মঙ্গল সাধিত হতে পারে।

ডাঃ ভাটনগরের নূতন সম্মান

ডাঃ স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর সম্প্রতি রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছেন। ডাঃ ভাটনগর ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সমাজে সুপরিচিত। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন এবং নিজ প্রতিভার দ্বারা নিজের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে নিয়েছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে বহু উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন এবং লণ্ডনের ডি-এস-সি উপাধি নিয়ে ১৯২২ সালে প্রথমে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। পরে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিভিন্ন পদার্থের চুম্বক গুণ সম্পর্কে তিনি বহু গবেষণা করেছেন এবং এইভাবে রসায়ন বিভাগের এক নূতন গবেষণার ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। 'চুম্বক-রসায়ন' সম্পর্কিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তক বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ সমাদরলাভ করেছে। চুম্বক শক্তির পরিমাণ নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি মিঃ মাথুরের সহযোগিতায় যে তুলাদণ্ড (Interference Balance) প্রস্তুত করেছেন, তাতে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ডাঃ ভাটনগর শুধু মাত্র রসায়নের সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করেই ক্ষান্ত হন নি, শিল্প বিষয়ক বহু বিষয়ে তিনি গবেষণার প্রবর্তন করেছেন। ভারত সরকার পরি-চালিত সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ বিভাগের তিনি বর্তমান ডিরেক্টর। ভারতের শিল্পসংক্রান্ত বহু বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও পরিচালনা ইতিমধ্যেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য সমাজও তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার সমাদর করেছেন জেনে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।



আঙ্গার বাবা ও জগদীশ বাবা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও লেখক শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে ভারতীয় সাধুগণের পরিচয় লিখিয়া থাকেন। বহু জন্মের সুকৃতি না থাকিলে সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে না এবং বহু বহু জন্মের পুণ্য-পুঞ্জের ফলেই সাধু-গণের ঐশ্বর্য দর্শনের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি। তিনি আমাদের বক্রেশ্বর অঞ্চলেও শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে চক্র-সাধনকালে অঘোরী বাবার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ধমানের কেতুগ্রাম অট্টহাসেও তিনি সাধুদর্শন করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয় উত্তরা মাসিক পত্রে এই সমস্ত বিবরণ দেখিয়াছিলাম। সম্প্রতি গত দোলসংখ্যা (বার্ষিক সংখ্যা) আনন্দবাজার পত্রে তাঁহার এইরূপ সাধু দর্শনের গল্প পড়িলাম। এই লেখাটির নাম **"আঙ্গার বাবা"**। বলা বাহুল্য আঙ্গার বাবার স্পর্শেও তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। আঙ্গার বাবার প্রসঙ্গে তিনি "জগদীশ বাবা" নামক একজন মহাপুরুষের নাম করিয়াছেন। প্রবন্ধটির আরম্ভই জগদীশ বাবার নাম লইয়া "বৃন্দাবনে একজন মহাপুরুষ ছিলেন,—প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে। জগদীশ বাবা বলেই তাঁকে ওখানকার সবাই জানতো।" আঙ্গার বাবা একজন মাদ্রাজী সাধু, দস্তুর মত ইংরেজি লেখাপড়া জানেন, যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান। আচার ব্যবহারে ও বাহিরে কোন সাধুত্বের লক্ষণ নাই। মুখে বলেন ভগবান নাই, ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নাই। এ হেন আঙ্গার বাবা তাঁহার নিকট জগদীশ বাবার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং এই প্রৌঢ়-পুরুষটি উজ্জ্বল গৌর-কান্তি যুবকের রূপে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বাহুবেষ্টনে মূর্ছিত করিয়া জগদীশ বাবার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। জগদীশ বাবার সম্বন্ধে আঙ্গার বাবার সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহা-শয়ের এইরূপ কথা হইয়াছিল।

প্রমোদবাবু—"মিঃ আয়েঙ্গার, তোমার কথা আমি সমর্থন করতে পারচি না। তুমি সাধু হয়ে যথার্থ সাধু একজনও দেখনি? এ আমি বিশ্বাস করতে পারচি না।"

আঙ্গারবাবা—"হাঁ একজন দেখেচি, এইখানেই সে আছে। ঐ একজনই দেখেচি যাকে আমি ঠিক ত্যাগী সাধু বলতে পারি। আসল সাধু।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা শুনিয়া কেমন যেন বিহ্বল হইয়া গেলেন। বলিলেন, কে তিনি মহাশয়, তুমি বলো আমি দেখব তাঁকে। "ঐ যমুনার তীরে" বোলে সে ঝোপটি দেখিয়ে দিলে যমুনার দিকে। তারপর বললে জগদীশবাবা তাঁর নাম। তুমি তাঁকে কখনো দেখনি?

প্রমোদবাবু—"না, দেখিনি বলেই না এতটা চাই তাঁর কাছে যেতে।"

আঙ্গারবাবা—"তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি অতীব প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন। ইচ্ছা করলেই তাঁকে দেখা যাবে না জেনো।"

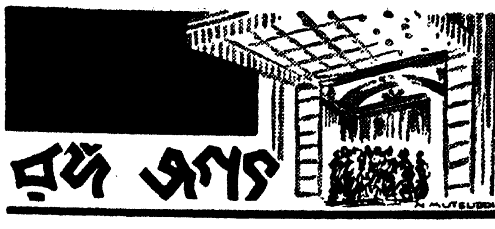
আমরা এক জগদীশবাবার কথা জানিতাম। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকালীয়দমন ঘাটের সন্নিকটে থাকিতেন। ইনি বাঙালী ছিলেন। পাবনা তাড়াসের জমিদার রাজর্ষিকল্প রায় বনমালী রায় বাহাদুরের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই জগদীশবাবা যদি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথিত জগদীশ-বাবা হন, তাহা হইলে "ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দেখা যাইবে না" একথা বলা চলে না। যে কোন লোক গিয়া তাঁহার দর্শন পাইত। সে জন্য কোন অলৌকিক শক্তিযুক্ত সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা ছিল না। অবশ্য আমি একথা বলিয়া তাঁহার সাধুত্বের কোন হানী করিতেছি না। জগদীশবাবা সত্যই এক জন মহাপুরুষ ছিলেন। আমরা জগদীশবাবার পূর্বপরিচয়—তিনি নিজমুখে যাহা বলিয়াছিলেন, সংক্ষেপে এইখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম, বাসগ্রাম ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা না করায় তিনিও কিছু বলেন নাই।

বীরভূম হেতমপুর রাজবাটীতে তখন সবেমাত্র 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং আমি তাহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছি। ১৩২১ সালের ২৩শে মাঘ প্রাতের ট্রেনে দুবরাজপুর হইতে হেতমপুরের মহারাজ কুমার (অধুনা স্বর্গগত) মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর (ইনিই সমিতির সম্পাদক ও সর্বস্ব ছিলেন) শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন। ফিরিয়া আসিয়া একটি লেখা আমার হাতে দেন। সন ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে "শ্রীবৃন্দাবনে হোলী" নামে সেই লেখাটি প্রকাশিত হয় (৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৬৯ হইতে ৩৭৬)। এই সংখ্যাতেই প্রসঙ্গত জগদীশবাবার নিজমুখে বলা জীবনকথা ও একখানি ফটোও বাহির হইয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই স্বচক্ষে দেখা সাধু সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের কোন কোন সঙ্গীর ছবি লিখিয়া লইয়া থাকেন। বক্রেশ্বরের এক পাটনীর ছবিও উত্তরাতে বাহির হইয়াছিল। (পাটনী শ্মশান রক্ষক) মূল ছবিখানি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ কার্যালয়ে এতদিনের পুরানো ব্লক থাকাও সম্ভব নয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইচ্ছা করিলে এই সংখ্যা ভারতবর্ষ হইতে ছবিখানি দেখিয়া লইতে পারেন। তাঁহার কাছে জগদীশবাবার কোন ছবি না থাকিলে এই ছবিখানি সংস্কার সাধনপূর্বক রক্ষা করিলে একজন বাঙালী মহাপুরুষের চিত্র সংরক্ষিত হইতে পারে। রাজর্ষি বনমালী রায় নাকি বহু চেষ্টাতেও জগদীশবাবাকে ফটো তোলাইতে সম্মত করাইতে পারেন নাই। শ্রীধামের কয়েকজন বৈষ্ণবের অনুরোধে মহারাজ-কুমার অতি অল্পায়াসেই এই ফটো গ্রহণ করেন। ১৩২১ সালে জগদীশবাবার বয়স প্রায় শতাধিক বৎসর হইয়াছিল। তিনি তখন কানে কম শুনিতেছিলেন, স্বাস্থ্যও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

জগদীশবাবার আত্মকাহিনী এইরূপ—

"আমি ডাক্তারী ব্যবসায় করতাম। দেখে শুনে ডাক্তারী শেখা; কিন্তু যৎসামান্য পাওয়ার পক্ষে তাতে তেমন ব্যাঘাত ঘটতো না। আমার চরিত্র খুব খারাপ ছিল। সংসারে পাপ পুণ্য বলে কোন জিনিস আছে কি না, কখনো ভাবি নাই। জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে কি না কখনো বুঝি নাই। মাথার উপরে যে একজন বিচারক আছেন, এ কথাও কখনো মনে হতো না। এ সব কথা ভাবতে বা বুঝতে কখনো চেষ্টা করি নাই। বেশ আনন্দেই দিন কাটতো। অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো। আমার বড় ভয় হলো। পরিণাম চিন্তায় প্রাণ অধীর হয়ে উঠলো। আমি যা করেছি সে সব যে ভয়ানক পাপের কাজ, তখন একে একে তাই মনে হতে লাগলো। আরও মনে হলো, মাথার উপর ভগবান আছেন। প্রাণের ব্যাকুলতায় ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা জানালাম। এবার যদি সেরে উঠি আমি খুব ভালভাবে চলবো, মদটদ খাওয়া সব ছেড়ে দেব। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনলেন। দুদিনের মধ্যে ব্যারামের উপসর্গ কমে এলো। একটু সুস্থ হতেই বন্ধু বান্ধবেরা এসে জুটলো, জেদ কত্তে লাগলো—মদ খাও। মদ খাওয়ার জন্যে আমারও মন কেমন কত্তে লাগলো; কিন্তু এ ধারণা কিছুতেই গেল না যে এবার মদ খেলেই সর্বনাশ। এখানে থাকলেই মদের হাত থেকে, বিশেষ এই বন্ধুবর্গের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া দায়। সুতরাং স্থান ত্যাগই শ্রেয় বিবেচনা করে কালনার ভগবানদাস বাবাজীর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনিও আমায় দেখেই জ্বলে উঠলেন, খড়ম হাতে তেড়ে মারতে এলেন। মার খাবার ভয়ে বাইরে গিয়ে বসলেম। ভাবলেম এ আবার কি? হু হু করে কান্না আসতে লাগলো। কিন্তু বাড়ি ফিরবো না, মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেম। সমস্ত দিন রাত্রি এক রকম বাইরে বসেই কেটে গেল। পরদিন প্রাতঃকালে সাহস করে আবার আশ্রমে ঢুকে পড়লেম। নিকটে এক গাছ ঝাঁটা পড়েছিল, তাই নিয়ে আস্তে আস্তে আশ্রম-প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিচ্ছি, আর এক একবার চেয়ে দেখছি বাবাজী আসচেন কি না, মতলব মারতে আসেন তো পালিয়ে যাব। বাবাজী এলেন, আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলো, কিন্তু কিছু বললেন না। আমি তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম। এমনি করে দুমাস কেটে গেল। অভাগার দুঃখ-রাত্রির সুপ্রভাত হলো। বাবাজী দয়া করে একদিন শুভক্ষণে নামব্রহ্ম দান করলেন। কালনায় কিছুদিন নামব্রহ্ম জপ করে সেই নাম মাহাত্ম্যে গুরুদেবের কৃপায় এই শ্রীবৃন্দাবন লাভ করলেম। অদৃষ্টের দোষ! এখানে এসে লোকে বড় বিরক্ত করতে লাগলো। নিরালার জন্য হরিদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেম। কিন্তু মন টিঁকলো না। শ্রীবৃন্দাবনের জন্য মন বড় কাঁদতে লাগলো। কষ্টে সৃষ্টে তিনদিন কাটলো, আর পারি না। ভাবলেম হেঁটেই শ্রীবৃন্দাবন যাব। আবার কি মনে হলো স্টেশনে চলে এলেম। আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো, নন্দ-নন্দনের এমনই মহিমা যে আমার হরিদ্বারে আসার কাহিনী শুনে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরবার রেলভাড়া তিনিই দিয়ে দিলেন। আমি শ্রীবৃন্দাবনে এসে পৌঁছলেম। সেই অবধি আমার সংকল্প ছিল আমি শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে আর কোথাও যাব না। নন্দ-নন্দন আমার সে সাধ পূর্ণ করবেন। তবে বলতে পারি না শেষের দিন পর্যন্ত কি হবে।"

ফোটো তোলানোর ব্যাপারেও সামান্য গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মহারাজকুমার একখানি ফোটো লইবার অনুরোধ জানাইলে জগদীশবাবা বলিয়াছিলেন "ও আর কি হবে, বনমালী (রাজর্ষি বনমালী রায়) অনেক চেষ্টা করেছিল আমি সম্মত হই নাই। কি জানি বাবা, মনের অবস্থা ঐ একটা ছুতো নাতাতেই অহঙ্কার আসতে পারে।" পরিশেষে মহারাজ কুমারের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি বলেন "আমার চেহারা তোলাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও।" মহারাজ কুমার সন্তুষ্ট হইব বলায় জগদীশবাবা বলেন "তবে তোলাও"। একদিন পর ফোটোগ্রাফার সঙ্গে লইয়া মহারাজকুমার আশ্রমে উপস্থিত হইলে জগদীশবাবার চেলা বলেন ফোটো তোলা হইবে না। মহারাজকুমার চেলাকে বলিলেন যে, আমার কথাটা বাবাজীকে বুঝাইয়া বলুন। চেলাটি তখন বলেন—"উনি আপনার চেহারা তোলাতে এসেচেন, তাই বাইরে যেতে বলচেন"। বাবাজী অমনি বালকসুলভ সরলতার সঙ্গে উত্তর করেন—"বেশত বাহিরে লইয়া চল"। মহারাজকুমার বাবাজীকে বাহিরে আনিতে চেলার সাহায্য চাহিলে চেলা বলেন, দাঁড়ান মশায় ও'র এখন মতি স্থির নাই বুঝিয়ে বলি। তারপর বাবাজীর উদ্দেশ্যে "বনমালী দাদা অনেক অনুনয় বিনয় করে যা পারেন নাই, ইনি আপনার সেই চেহারা তোলবার জন্য বলচেন"। এই কথা বলিলে বাবাজী উত্তর করেন "বেশ বাহিরে লইয়া চল না, তোমার কোন আপত্তি আছে কি?" চেলা বলেন "আমার আবার আপত্তি কি, পাছে আমায় অপরাধী করেন তাই বলচি"। জগদীশবাবা উত্তর করেন,—"না তোমায় কেন অপরাধী করবো"। তারপর ফোটো তোলানো হয়। ফোটো তুলিবার সময় চেলা আসিয়া জগদীশবাবার নিকট দাঁড়াইলে ছবি খারাপ হইবে বলিয়া মহারাজকুমার তাহাকে সরাইয়া দেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে কাহারো নিকট জগদীশবাবার এই আলোক চিত্রের কোন প্রতিলিপি আছে কিনা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুসন্ধান করিতে পারেন।



নিউ এম্পায়ারে তিমিরবরণ

আগামী ২৬শে মে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুরশিল্পী তিমিরবরণ তাঁর যন্ত্রীদল, নৃত্য সম্প্রদায় এবং অর্কেস্ট্রার সহযোগে নৃত্য-গীতাদি সম্বলিত একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তাঁর সংগঠিত নৃত্য-গীতাদি চর্চার প্রতিষ্ঠান 'স্কুল অব্ রিদ্‌মিক্‌সে'র সাহায্য কল্পেই এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। দেশবাসীদের কাছে নতুন ক'রে প্রতিভাবান যন্ত্রশিল্পী তিমিরবরণের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় অর্কেস্ট্রা-সংগীতের প্রবর্তক এবং সার্থক সুর-স্রষ্টারূপে তাঁর খ্যাতি যে শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ তা নয়—বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের সংগীতপ্রিয় রসিক সমাজও তাঁর সঙ্গীত প্রতিভায় বিমুগ্ধ। তাঁর আগে কোন ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ অর্কেস্ট্রা সংগীতকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কিনা সন্দেহ। অথচ পাশ্চাত্য দেশে এই অর্কেস্ট্রা-সংগীতের বহুল প্রচলন আছে। আমাদের দেশে এতদিন অর্কেসট্রা-সংগীত কোন স্বতন্ত্র সমাদর লাভ করেনি; নৃত্য, গীত, নাটক কিংবা চলচ্চিত্রের আবহ সংগীতরূপেই এতদিন একে আমরা অবহেলা করে এসেছি। তিমিরবরণই প্রথম সাধক সুরশিল্পী যিনি অর্কেস্ট্রা-সংগীতকে এই অপমানজনক অবহেলা থেকে উদ্ধার করে তাকে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে পেরেছেন। দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে তিনি যে নতুন সংগীত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, তারই সাধারণ বিকাশ আমরা দেখতে পাব নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে। এইদিন তিনি সাধারণ্যে প্রমাণ করবেন যে কণ্ঠসংগীতের সহযোগিতা ছাড়াও যন্ত্র সংগীতের মধ্যস্থতায় ভারতীয় ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনীকে রূপায়িত করে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে ও শ্রোতৃবৃন্দের জন্য যথেষ্ট সংগীত-রস পরিবেশন করা যেতে পারে। সাধক সুরশিল্পীর হাতে বিভিন্ন রাগরাগিনী যন্ত্র-সংগীতের মধ্যে কিরূপ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা-সংগীত শুনলেই তা বোঝা যাবে। কণ্ঠসংগীতের আবেদন যতটা সহজ এবং প্রত্যক্ষ, অর্কেস্ট্রা-সংগীতের আবেদন হয়ত ততটা সহজ এবং প্রত্যক্ষ নয়। অর্কেস্ট্রা-সংগীতের পূর্ণ মাধুর্য উপভোগ করতে হলে কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রয়োজন। এই সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল শ্রোতৃবৃন্দের কাছে অর্কেস্ট্রা-সংগীতের মৌন আবেদন, কণ্ঠসংগীতের মুখর আবেদনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।



তিমিরবরণ

এই অনুষ্ঠানের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার অপূর্ব সহযোগিতা। আর কোথাও রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার এরূপ অপূর্ব সহযোগিতার প্রচেষ্টা করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, রবীন্দ্র-সংগীত বুঝি শুধু কথা-প্রধান—ভাব ও সুরের আবেদন সেখানে গৌণ। এ ধারণার মধ্যে যে কোন সত্য নেই তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা সেটা প্রমাণ করবে। রবীন্দ্র-সংগীতের ভাব ও সুরের মাধুর্য অক্ষুন্ন রেখে—অর্কেস্ট্রাযোগে তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। একথাও নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, "ঋতু-উৎসব" অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যন্ত্র-সংগীতের অপূর্ব সমাবেশ কলারসিকদের তৃপ্তিবিধান করবে।

এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের অপর একটি আকর্ষণ হচ্ছে যন্ত্র-সংগীতের সঙ্গে নতুন নৃত্য পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিকে কুশলী শিল্পিগণ যন্ত্র-সংগীত ও নৃত্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রাণবান করে তুলবেন। এ ছাড়াও একক এবং সমবেত আরও কয়েকটি নৃত্যে এই অনুষ্ঠানটি সমৃদ্ধ।

১৯৩০ সাল থেকে তিমিরবরণ স্বীয় যন্ত্রীদল গঠন করে অর্কেস্ট্রায় ভারতীয় সংগীতের রূপদানের জন্য যে আপ্রাণ সাধনা করে আসছেন, আজ সুদীর্ঘ তের বৎসর পরেও তাঁর সে সাধনার বিরাম হয়নি। তিনি অবিরাম নিত্য নতুন সুরের উদ্ভাবনে নিমগ্ন আছেন। ইতিমধ্যে তিনি পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করে শুধু যে সে সব দেশের সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেছেন, তাই নয়—তিনি নিজে সে সব দেশের সংগীত চর্চা করে তাঁর সুরের ভাণ্ডারও বৃদ্ধি করেছেন। অর্কেস্ট্রা-সংগীতে তাঁর অভিজ্ঞতা ও সাধনালব্ধ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে। আশা করি, দেশবাসীদের পরিপূর্ণ সমর্থনে তাঁর এই বিচিত্র অনুষ্ঠানটি সবদিক থেকেই সার্থক হয়ে উঠবে।

মাইকেলের শততম অভিনয়োৎসব

সম্প্রতি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'মাইকেল' নাটকখানির শততম অভিনয় রজনী উপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবে মন্মথমোহন বসু, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় অধ্যাপক ও নাট্য-সমালোচক উপস্থিত ছিলেন। কোন একখানা নাটকের পক্ষে শততম অভিনয় হওয়া অবশ্য গৌরবের কথা—যেমন রঙ্গমঞ্চের গৌরব তেমনি নাট্যকার, এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও গৌরবের কথা। কিন্তু সেই শততম অভিনয় উৎসবের মধ্যে যদি ফাঁকি থাকে তবে তার চেয়ে অগৌরবের কথা আর কি হ'তে পারে? সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মাইকেলে'র শততম অভিনয় উৎসবের মধ্যে কিছুটা ফাঁকি আছে—বর্তমানে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমত, ঠিকমত বিচার করতে হ'লে বলতে হয় যে 'মাইকেলে'র শততম অভিনয় উৎসব করা উচিত হয় নি—কেননা মাইকেল ত ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত একশ দিন ধ'রে রঙমহলে অভিনীত হয় নি। যখন কোন নাটকের রজত-জয়ন্তী, স্বর্ণ-জয়ন্তী কিংবা হীরক-জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়, তখন আমরা বুঝি যে অব্যাহতভাবে প্রতি সপ্তাহে অন্তত ২।১ বার সে নাটকটির অভিনয় হবার ফলেই তার পক্ষে এ সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু 'মাইকেল' ও রঙমহলে ধারাবাহিকভাবে একশ' দিন অভিনীত হয় নি—মাঝে মাঝেই ছেদ পড়েছে। ইতিমধ্যে রঙমহলের রঙ্গমঞ্চে নতুন নাটক নেমেছে এবং বহুদিন ধ'রে ধারাবাহিকভাবে সে নাটকের অভিনয় চলছে। মাইকেল ইতিমধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে 'মাইকেল' মঞ্চস্থ হবার প্রায় এক বছর পরে হঠাৎ দেখি যে 'মাইকেলে'র শততম অভিনয় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিশির ভাদুড়ী ইতিমধ্যে শ্রীরঙ্গমে যে মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে নতুন নাটক নামিয়েছেন, তার উপরে টেক্কা দেবার উদ্দেশ্যেই কি এই শততম অভিনয়ের প্রহসন? কিন্তু এই উৎসবের অনুষ্ঠাতাদের জানা উচিত ছিল যে মোট অভিনয় সংখ্যা যোগ দিলে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অনেক নাটকেরই শততম অভিনয় উৎসব সম্পন্ন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্যের অধ্যাপক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে মহেন্দ্র গুপ্তের মাইকেল নাকি মধুসূদন সম্বন্ধে প্রথম সার্থক নাটক। একজন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-সাহিত্যের অধ্যাপক কি ক'রে এমন ভ্রমাত্মক মন্তব্য করলেন—তাই শুধু ভাবি। অধ্যাপক প্রবর কি জানেন না যে বাংলা ভাষায় মাইকেল সম্বন্ধে প্রথম সার্থক নাটক লিখেছেন 'বনফুল'? তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' বইখানার নাম কি তিনি শোনেন নি? মহেন্দ্র গুপ্তের মাইকেল যখন মঞ্চস্থ হয় তখন বনফুলের 'শ্রীমধুসূদনে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হ'য়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' মঞ্চস্থ হয় নি বটে—তবে বাংলা সাহিত্য জীবনী নিয়ে নাটক লেখার দুঃসাহস প্রথম 'বনফুল'ই দেখিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি পরবর্তী সব নাট্যকারেরই পথ-প্রদর্শক। একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য পথপ্রদর্শনের সম্মান থেকে বঞ্চিত করার কোন মানে হয় না। এতে অধ্যাপক প্রবরের মহেন্দ্র-প্রীতি যতটা না প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে অজ্ঞতা।



খেলা-ধূলা

কলিকাতা ফুটবল লীগ

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। গত দুই সপ্তাহ হইল এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ডিভিসনের বা বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রতিদিন বিভিন্ন খেলা দেখিবার জন্য বিশেষ দর্শক সমাগম হইতেছে না সত্য কিন্তু ফুটবল খেলায় উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রথম ডিভিসনের বা বিভাগের বিভিন্ন খেলা দেখিবার জন্যই সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের বিশেষ উৎসাহ জাগে। বিশেষ করিয়া মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান, এরিয়ান্স প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয় দলের খেলায় দর্শকের কোন দিনই অভাব হয় না। লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায় দর্শক সমাগম কম হইলেও শেষের দিকে ইহা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই বৎসরে প্রথম ডিভিসনের উক্ত বিশিষ্ট দলসমূহের খেলায় লোক সমাগম কম দেখিয়া হতাস হইবার কোনই কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বর্ত্তমানে দর্শক সমাগম বিশেষ না হইলেও পরে হইবে এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। তবে বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে উক্ত বিশিষ্ট দলসমূহের মধ্যে একটিও এ পর্যন্ত উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। গত বৎসরেও এই সকল দল যে স্তরের বা ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল এই বৎসর তাহা অপেক্ষা নিম্ন-স্তরের হইতেছে। কি রক্ষণভাগে, কি আক্রমণভাগে, কোন ভাগেই কোন দলের মধ্যে শৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। সকল দলেই পুরাতন খেলোয়াড় বর্ত্তমান আছেন কিন্তু তাঁহাদের সহিত নবাগতদের কোন সম্বন্ধ আছে ইহা খেলার মধ্যে বুঝিবার উপায় নাই। একটি দল আক্রমণ রচনা করিল অথচ সেই আক্রমণ রচনা ঐ বিভাগের সকল খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় সম্ভব হইল না, একক প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিল, ইহা দেখিয়া আমরা সত্যই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। রক্ষণ বিভাগেও সকল দলের মধ্যেই এই ত্রুটি বিশেষভাবে বিদ্যমান। হাফব্যাকত্রয়ের সহিত ব্যাকদ্বয়ের অথবা ব্যাকদ্বয়ের সহিত গোলরক্ষকের কোন সম্বন্ধ আছে ইহা এই সকল দলের খেলা দেখিয়া কেহই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ফুটবল খেলা দলগত খেলা। এই খেলার সাফল্য দলের সকল খেলোয়াড়ের সহযোগিতার উপরই নির্ভর করে। এই সামান্য কয়েকটি কথা প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়গণই যদি ভুলিয়া যান তবে বাঙলা দেশের ফুটবল খেলার উন্নতি হইবে কি করিয়া?

ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম বিশিষ্ট দলসমূহ নিজ নিজ দলের খেলোয়াড়গণকে উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী করিবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সকল শিক্ষক খেলোয়াড়গণকে লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভের একমাস পূর্ব্বে হইতে নিয়মিত শিক্ষা দিতেছেন। এই সকল শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষা দিয়াছেন অথবা ব্যবস্থা যে হইয়াছিল এই বিষয় কিন্তু আমাদের সন্দেহ জাগিতেছে। একমাস নিয়মিত শিক্ষার পরে কোন দলের খেলোয়াড়গণ এইরূপ নিম্নস্তরের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দিতে পারে ইহা আমাদের ধারণাতীত।

দল গঠন

সকল দলের পরিচালকগণ নিজ নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, এইরূপ আলোচনা আমরা ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে গত তিনমাস ধরিয়া শুনিতেছি। এই সকল আলাপ আলোচনা শুনিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল সকল দলই দলের প্রত্যেক বিভাগটি উপযুক্ত খেলোয়াড় দ্বারা গঠন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বিভিন্ন খেলা দেখিয়া আমাদের বলিতে বাধ্য হইতেছে যে, এখনও কোন দল সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয় নাই। গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল দলের হাফব্যাক লাইন এইরূপ সকল খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হইয়াছে যাঁহাদের কাহাকেও ঐ বিভাগের উপযুক্ত বলা চলে না। এই দলের সাফল্য এই বিভাগের গঠনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার যুগান্তর সৃষ্টিকারী দল। অথচ দুঃখের বিষয় যে এই দলের পরিচালকগণ এখনও পর্যন্ত সেই পুরাতন বয়োপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের লইয়া দল গঠন করিয়াছেন। গত বৎসর এইরূপভাবে দল গঠন করিয়া ফল কি হইল তাহা লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদের কোন যে চেতনা হয় নাই ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। এরিয়ান্স ক্লাব কলিকাতার বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে লইয়া দল গঠন করিয়াছেন সত্য কিন্তু আক্রমণ-ভাগ খুবই শক্তিহীন বলিয়া মনে হইতেছে। এই বিভাগের পরিবর্ত্তন ব্যতীত এই দল লীগ প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। মোহনবাগান ক্লাব অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে পরিচালকগণের প্রতি খেলায় নূতন নূতন খেলোয়াড় দলভুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিবার নীতি আমরা বিশেষ সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তাহা ছাড়া দলে যে কয়েকজন পুরাতন খেলোয়াড় আছেন তাঁহাদের স্থানে অন্য কোন উৎসাহী তরুণ খেলোয়াড়কে খেলিবার সুযোগ দিলে ভাল করিবেন বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে হয়তো ফল ভাল হইবে না কিন্তু প্রতিযোগিতার শেষভাগে ইহার ফল ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভবানীপুর ক্লাব বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে লইয়া গঠন করিয়াছেন সত্য কিন্তু সকল খেলোয়াড়ের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দলকে শক্তিশালী করে নাই। পরিচালকগণের কর্ত্তব্য এই সকল খেলোয়াড়গণের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব যাহাতে বিশেষভাবে জাগ্রত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। কালীঘাট ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল যে সকল খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত হইয়াছে তাঁহারা অধিকাংশই তরুণ। এই সকল খেলোয়াড় এই বৎসর বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও আগামী বৎসরে ভালই খেলিবেন ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। ইউরোপীয় দলসমূহের মধ্যে ক্যালকাটা দল ভাল খেলা প্রদর্শন করিবে বলিয়া ধারণা। বিদেশাগত সৈনিক খেলোয়াড়গণ এই দলে স্থান পাইয়া দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে ভাবে এই দল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে খেলিতেছে তাহাতে আশংকা হয় চ্যাম্পিয়ানসিপের সময় এই দল ভারতীয় বিশিষ্ট দলকে সহজে রেহাই দিবে না। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেই।

এই সকল আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা চলে যে, এই বৎসরের কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম ডিভিসনের বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে। তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলেই খেলা দর্শনযোগ্য হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ]. শনিবার, ১১ই আষাঢ়, ১৩৫০ সাল। Saturday, 26th June, 1943. [৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মজুত বিরোধী অভিযান

একপক্ষকাল অতিবাহিত হইতে চলিল, বাঙলাদেশে সরকারের নূতন পরিকল্পনা অনুসারে মজুতবিরোধী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। এই অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে হঠাৎ এই অভিযান আরম্ভ হইলে চাউলের দর হ্রাস পাইবে বলিয়া বাঙলার খাদ্য সচিব অনেক কিছু ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই একপক্ষকাল অভিযানের পর বাঙলার খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী এ সম্বন্ধে সেদিন কলিকাতার রোটারী ক্লাবে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের পঞ্চ প্রাণ শীতল হইয়া গিয়াছে। সরকারের এই পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হইয়াছে, মিঃ সুরাবর্দীর বক্তৃতা পাঠ করিলে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। খাদ্যসচিব এই অসাফল্যের কথাটা অন্যভাবে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের একযোগে কার্য্যের মহিমা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; কিন্তু পেটের ক্ষুধা তাহাতে মিটে না; মিটিবে যে এমন ভরসাও সুরাবর্দী সাহেবের বক্তৃতায় পাওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন, কতক লোককে উপবাস করিতেই হইবে। এই কতকের পরিমাণ কি? মোটা মাহিয়ানাওয়ালা মন্ত্রী এবং তাঁহাদের মত সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা ছাড়া অন্য সকলেই কি না বুঝিবার উপায় নাই। কলিকাতার কন্ট্রোলের দোকানগুলি এতদিন পরে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে শহরে এবং শহরতলীতে ৮ শত দোকান খোলা হইবে; কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান কি সে হইবে বুঝা যায় না; কারণ সমস্যা হইল খাদ্যের অভাবজনিত। খাদ্যসচিব অভাব মিটাইবার মত সুনির্দ্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা দিতে পারেন নাই। তাঁহারা যেন এখনও শুধু ফাঁকা চালের উপরই আসর জমাইয়া রাখিবার মতলবে আছেন। সম্প্রতি খাদ্যসচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত বিবৃতিতে সরকারী পরিকল্পনার সম্পর্কে আমরা নূতন একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে যাহাতে চাউলের মূল্য না বাড়ে, সেজন্য ফুড কমিটিসমূহের দ্বারা নির্দিষ্ট চাউল হইতে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ অংশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে থাকিবে। সরকারী মজুত-বিরোধী পরিকল্পনার মধ্যে রাজকর্মচারীদের কর্তৃত্বের কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনি নাই। পরিকল্পনা হইয়াছিল যে, যে খাদ্য উদ্বৃত্ত হইবে, স্থানীয় অভাব পূরণের পর অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের অভাব পূরণের জন্য দরকার হইলে তাহা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য সরকারী বিবৃতি পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, গ্রামে গ্রামে চাউলের হিসাব লইয়া যে পরিমাণ চাউল উদ্বৃত্ত হইবে বুঝা যাইবে, তাহার শতকরা ২৫ ভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে হাত করিবেন, পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ফুড কমিটিগুলিকে বিলি ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইবে। সরকারের ধারণা কি—আমরা বুঝি না। ইহার পরও কি তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, বাঙলা দেশে ব্যবসায়ী এবং গৃহস্থদের ঘরে ঘরে এত চাউল মজুত রহিয়াছে যে, তাহা হইতে শতকরা ২৫ ভাগ জেলার কর্মচারীরা লইলেও স্থানীয় অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট চাউল উদ্বৃত্ত থাকিবে? আমাদের বক্তব্য এই যে, এত চাউল যদি উদ্বৃত্তই হয়, তবে ফুড কমিটিগুলির হাতেই অসময়ের জন্য উদ্বৃত্ত চাউল রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল না কেন? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে ইহার মধ্যে না আনিলেই ভাল ছিল। তাঁহারা অনেকেই উঁচু দরের লোক; গ্রামের গরীবদের দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের খবর তাঁহারা কম রাখেন। তাঁহারা দেশের লোকের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা করিতে চেষ্টা করুন না কেন, ফুড কমিটির স্থানীয় লোকদের দ্বারা যে কাজ হয়, তাঁহাদের দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে না। মোটামুটি সরকারী

পরিকল্পনার এই প্রাথমিক পর্বে আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, বাঙলা দেশের গ্রাম অঞ্চলে চাউল বিশেষ কিছু মজুত নাই; যদি মজুত থাকে—আছে কলিকাতা এবং হাওড়ার বড় বড় ব্যবসায়ী, শ্বেতাঙ্গ ফার্ম এবং গভর্নমেণ্টের এজেণ্টদেরই হাতে। কিন্তু কলিকাতা ও হাওড়া শহরকে সরকারী পরিকল্পনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে মজুত মালের অবস্থা বুঝিবার উপায় নাই। কলিকাতা এবং হাওড়া শহরকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া এখানকার প্রয়োজনের হিসাব লইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কি না দেখিলে তবে তেমন পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ হইত। আমাদের বক্তব্য এই যে, আগামী হৈমন্তিক ধানের ফসল না উঠা পর্যন্ত বাঙলার বর্তমান এই চাউলের অভাব যদি পূরণ করিতে হয়, এই ধরণের উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সে কাজ হইবে না। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অন্য প্রদেশ হইতে এবং সম্ভব হইলে বিদেশ হইতে বাঙলা দেশে চাউল এবং গম আমদানী করিতে হইবে। সে দায়িত্ব অনেকটা ভারত গভর্নমেণ্টের উপর রহিয়াছে। তাঁহারা কয়েকটি অঞ্চল হইতে চাউলের কারবার অবাধ করিয়া যে সুবিধা দিয়াছিলেন, তাহা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট-সমূহের কৌশলে একেবারেই পণ্ড হইয়াছে। ইহার পর ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলাদেশকে যে পরিমাণ খাদ্য দিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া পূর্বে আমরা শুনিয়াছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি সেই পরিমাণও কার্যত অনেক কমাইয়া আনা হইয়াছে। ইহারই বা কারণ কি? ভারত সরকারের এই বিভাগের কর্তা স্যার আজিজুল হক সাহেব তাহা জানাইবেন কি? অপরের জন্য জল টানিবার এবং কাঠ বহিবার জন্যই বাঙালীরা শুধু রহিয়াছে?

সামরিক বড়লাট

স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল লর্ড লিনলিথগোর স্থানে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান সেনাপতির পদ হইতে বড়লাটের পদ লাভ ভারতে এই প্রথম। এই নূতন নিয়োগ অনেকের পক্ষে নূতন গবেষণার খোরাক জুটাইয়াছে। কেহ নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছেন, কেহ বা আশার আভাষ দেখিতেছেন। আমরা কিন্তু এই নিয়োগে গবেষণা করিবার মত বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। স্যার আর্চিবল্ড এই নিয়োগের পর সেদিন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেও সদিচ্ছাপূর্ণ মামুলী কথা ছাড়া গবেষণা করিবার মত কিছু নাই। আমাদের কাছে এই নিয়োগের অর্থ একেবারে পরিষ্কার। আমরা দেখিতেছি, ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতিকে গুরুত্ব না দিয়া এই নিয়োগে সামরিক দিকটাকেই গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। এই নিয়োগে ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থা সমাধানের জন্য চেষ্টার দিকটা আপাতত চাপা পড়িল এবং যুদ্ধের পর ভবিষ্যতের জন্য সেজন্য দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। মার্কিন জাতির মনোভাবের সঙ্গে এই নিয়োগের সম্পর্ক রহিয়াছে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অধিকতর উদ্যোগী হন, মার্কিনের বিপুল জনসাধারণ ইহাই চাহে এবং এজন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে যথেষ্ট কাজ করা হইতেছে না, সে দেশের অনেক লোকের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ওয়াশিংটনে গিয়া মার্কিন জাতির এই মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছিলেন। স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেলের এই নিয়োগে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষকে সামরিক কেন্দ্র করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যাপক পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং এইভাবে মার্কিন জাতির মনস্তুষ্টি করা হইল। ইহার পর ভারতবর্ষের রাজনীতিক ব্যাপারে মার্কিন গভর্নমেণ্টের কোন কথা বলিবার কারণ থাকিবে না, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ইহাই বিশ্বাস। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই ব্যবস্থা করিবার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন দেশে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। সম্ভবতঃ মার্কিন গভর্নমেণ্টই এই দিকে কিছু ইঙ্গিত ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলকে করিয়াছিলেন। এই নিয়োগ মার্কিন সামরিক বিভাগের কিরূপ সমর্থন লাভ করিয়াছে; মার্কিন গভর্নমেণ্টের সামরিক প্রচার বিভাগের মিঃ ডিরেক্টার ডেভিস সম্প্রতি ওয়াশিংটন হইতে যে বেতার বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ। তিনি বলেন,—"আজ ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ব্যাপারে একটি পরিবর্তন ঘোষিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনে জাপানের পক্ষে অন্য দিক হইতে বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে। ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল ভারতবর্ষের ভাইসরয় এবং জেনারেল অকিনলেক তাঁহার স্থানে জঙ্গীলাট নিযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার 'নিমিত্ত পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ড' বা পূর্ব এশিয়ার সমর বিভাগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব কাহার উপর থাকিবে, এখনও ঘোষণা করা হয় নাই; কিন্তু সময় আসিলে ইংরেজ, ভারতবাসী, চীনা এবং মার্কিন বাহিনী জাপানীদিগকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের দেশের দিকে পাঠাইবার কাজে ঐকান্তিকভাবে নিযুক্ত হইবে।" সুতরাং এ নিয়োগের মুখ্য প্রয়োজন হইল সামরিক। স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেলের রাজনীতিক মতামত এক্ষেত্রে তেমন বিবেচ্য নহে। মিশরে তিনি কি করিয়াছিলেন, কিংবা তিনি তাঁহার লিখিত কোন পুস্তকে অথবা বক্তৃতায় কতটা পরিমাণে উদারনীতিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে তাহাও অবান্তর। ক্রীপস-কংগ্রেস আলোচনার এক পর্যায়ে ক্রীপস সাহেব কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইবার অভিপ্রায় জানাইলে যে দুইজন রাজকর্মচারী পদত্যাগের হুমকী দিয়াছিলেন, জেনারেল ওয়াভেল যে তাঁহাদের মধ্যে একজন ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং ভারতবাসীদের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইয়া রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের অভিপ্রায় যে বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নাই এই নিয়োগে তাহাই সুস্পষ্ট হইল। অর্ডিন্যান্সের দ্বারাই শাসনকার্য চলিবে এবং তেমন শাসন ব্যবস্থার আমলে অসামরিক অপেক্ষা সামরিক বড়লাটই অধিক উপযোগী।

দরদের দরদী

বিদেশী রাজনীতিক দলের ভারত-প্রীতিকে কোনদিনই আমরা আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না; ইংলণ্ডের রাজনীতিক দলের তো বিশেষভাবেই নয়। তাঁহারা যখন ভারতের স্বাধীনতা বা ভারতবাসীদের স্বাধিকারের সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন, তখন আমাদের মনে বরং সন্দেহেরই উদ্রেক হইয়া থাকে; কারণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির মতলব হাসিল করিবার উদ্দেশ্যেই সাধারণত বাকজাল-বিস্তারের ঐ কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে। বিলাতের শ্রমিক দলের ভারত-প্রীতির গভীরতা কতখানি, ম্যাকডোনাল্ডী আমলেই আমরা তাহা বুঝিয়া লইয়াছি; তাহার পর যেটুকু বুঝিতে বাকী ছিল, স্যার স্ট্যাফোর্ড আসিয়া তাহাও বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সম্প্রতি বিলাতের শ্রমিক-দলের সম্মেলনে ভারতের স্বাধীনতা দাবীর প্রস্তাবের যে পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহাতে আমরা একটুও বিস্মিত হই নাই। ব্যাপারটা পাঠকেরা অনেকেই হয়ত জানেন। পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেনসেন এবং ইংলণ্ডের মফস্বলের শ্রমিক দলের অপর দুইজন সদস্য শ্রমিক সম্মেলনে ভারত সম্পর্কিত দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দেন। সম্মেলনে কার্যত এই দুইটি প্রস্তাবের কোনটিই উত্থাপিত হয় নাই। মিঃ সোরেনসেন তাঁহার প্রস্তাবে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনায় ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্টকে উদ্যোগী হইবার জন্য দাবী করিয়াছিলেন। অপর প্রস্তাবটিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত বর্তমান নীতির নিন্দাবাদ করা হয় এবং বন্দী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করিতে বলা হয়। এই প্রস্তাব দুইটি শ্রমিক সম্মেলনে উত্থাপিত হইলে কিংবা প্রস্তাব দুইটি যদি সম্মেলনে পরিগৃহীতও হইত, তবেই যে আমরা হাতে হাতে স্বাধীনতা পাইতাম ইহা নয়; কারণ বর্তমান ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে নিজেদের নীতি মানিতে বাধ্য করিবার মত কোন প্রভাব সেখানকার শ্রমিক দলের নাই; তথাপি প্রস্তাব দুইটি সম্মেলনে উত্থাপিত করিতে দেওয়া হয় নাই। অধিকাংশ সভ্যের ইচ্ছায় প্রস্তাবকদিগকে প্রস্তাব দুইটি প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। শ্রমিক দলের কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে মিঃ আর্থার গ্রীনউড এই আশ্বাস দান করেন যে, দলের কার্যকরী সমিতি পরিষদের ভারতীয় নীতি সম্বন্ধে কার্যকরী সমিতির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন আলোচনা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু কার্যকরী সমিতির যে রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া এই আলোচনা করা হইবে; সে রিপোর্টে কার্যত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতিরই সমর্থন করা হইয়াছে। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিলে তবে আপোষ-আলোচনা চলিতে পারে, এমন কথাই বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ পক্ষে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন [illegible] করে নাই এই সত্য চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। [illegible] সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আলোচনা এবং প্রস্তাব দুইটির [illegible] পরস্পর বিরোধী। প্রস্তাব দুইটিতে আলোচনা [illegible] গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া হয় এবং গভর্ণমেণ্টের বর্তমান নীতির নিন্দা করা হয়। এখন নূতন আলোচনা হইবে ঠিক বিপরীত যুক্তি অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ দায়িত্ব [illegible] চাপাইয়া। [illegible] শ্রমিক দলের প্রকৃত [illegible] সম্বন্ধে কি স্পষ্টই [illegible] গেল; দেখা গেল যে, দল [illegible] তাঁহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতিরই [illegible] করিয়া থাকেন কিংবা কাহারও [illegible] সে নীতির প্রতিবাদে [illegible] হইতে চাহেন না। ইহাতে ইহাই স্পষ্ট হইল যে, নিজেদের [illegible] দলের নীতি যাহাই হউক না কেন, ভারতের [illegible] তাঁহাদের সঙ্গে সংরক্ষণশীল দলের কার্যতঃ কোন পার্থক্য [illegible] পরানুগ্রহ-প্রত্যাশীর অজ্ঞানতা উন্মুক্ত হইবে [illegible] আশা করি।

[illegible]চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গত ৫ই আষাঢ় রবিবার ব্যারিস্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙলাদেশের বিগত ত্রিশ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। [illegible] ১৯০৫ সালে বাঙলাদেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের সবে সূচনা তিনি সেই সময়ে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া এদেশে আসেন এবং বাঙলার তরুণ দলের সঙ্গে যোগ দিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র বাঙলার 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা এবং শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্' পত্রে তাঁহার অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিক-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্জো মহাশয়ও প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে একপ্রকার সরিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু দেশ-জোড়া তাঁহার খ্যাতি হয় অন্য কারণে। তিনি বাঙলা এবং বাঙলার বাহিরে কয়েকটি বড় বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। অনেক ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক না লইয়াই তিনি ইহা করিয়াছেন এবং এই সব মামলা পরিচালনায় তিনি অসামান্য ব্যবহার-প্রতিভার পরিচয় দান করেন। সম্প্রতি ভাওয়াল মামলায় তিনি কুমারের পক্ষ সমর্থন করিয়াও বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। চাটুজ্জো মহাশয় গোড়া ধরণের জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি বিশেষভাবে ধর্মভাব-প্রবণ ছিল। হিন্দু সভ্যতা এবং হিন্দু সংস্কৃতির মর্যাদা তাঁহাকে উদ্দীপ্ত রাখিত। হিন্দু-সমাজের কল্যাণ-প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। জনসাধারণের সুখে দুঃখে সহানুভূতি, চিত্তের উদারতা, সৌজন্য এবং সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহার তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালী সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। আমরা চাটুজ্জো মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করিতেছি।

কারণ কি?

ভারতের কোন কোন প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসী বন্দী-দিগকে মুক্তিদান করিতেছেন। পাঞ্জাবে ডাক্তার এম. এন খাঁর পক্ষ হইতে হেবিয়াস কর্পাসের মামলার শুনানী উঠিলে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু বাঙলা সরকারের দিক হইতে এমন কোন চেষ্টারই এ পর্যন্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। গভর্নর শাসিত প্রদেশে যাহা সম্ভব হইতেছে, মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত প্রদেশে তাহা সম্ভব হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এই প্রশ্ন স্বভাবতই দেশের লোকের মনে উঠিবে। আমরা শুনিয়াছিলাম যে, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন কাজের লোক। তিনি যাহা বলেন, তাহা কাজে পরিণত করিয়া থাকেন, অন্ততঃ সেজন্য চেষ্টা করেন। স্যার নাজিমুদ্দীন প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদানের সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজের পরিচয় আমরা এ পর্যন্ত কিছুই পাইতেছি না। কথা অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য তিনি কতটা চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফল কি হইয়াছে, দেশের লোক আজ তাহাই শুনিতে চায়।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

কাপড় ও সূতা সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা না ছিল আমরা বলি না; কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে দেশের লোকের দুঃখ-কষ্ট কমিবে কি না ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। গভর্ণমেণ্ট একদিকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতির কথা বলিয়াছেন, অন্য দিকে ভারতের বাহিরে, বিশেষ-ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বস্ত্র রপ্তানি করিবার ইচ্ছাও তাঁহাদের প্রবল রহিয়াছে। বস্তুত কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি যে সব ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন, তাহার পশ্চাতে বাহিরে অল্পমূল্যে বস্ত্র প্রেরণের ইচ্ছা তাঁহাদের মনে কাজ করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছেন যে, অল্পমূল্যে ভারত হইতে এইভাবে ঐ সব দেশে কাপড় পাঠাইতে পারিলে, ঐ সব দেশের লোকের কাপড়ের অভাব দূর হইবে সেই সঙ্গে ভারতের বাহির্বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাইবে। অন্য দেশবাসীদের প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের এই মানবতামূলক প্রীতির জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, দেশের লোকের অভাব পূরণের কর্তব্যই তাঁহাদের পক্ষে প্রাথমিক হইবে কিনা। একে দেশব্যাপী নিদারুণ অন্নকষ্ট, তাহার উপর পরিধানে বস্ত্রের অভাব; সকল দিক হইতে নিজেদের এমন বিপন্ন অবস্থার মধ্যে বিশ্ব-মানবতার কথা ভাবিবার অবসর আমাদের নাই এবং নিজেদের অভাবের মধ্যে ঐ ধরণের কথা আমাদের কাছে ভালও লাগে না, গভর্ণমেণ্টের এ অবস্থা উপলব্ধি করা উচিত। বিশ্বমানবতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট যদি বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে তাহা হইতে তাঁহারা নিবৃত্ত হউন।

বাঁকা স্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

(১৬)

এইভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর একদিন হঠাৎ শুনিলাম শান্তির বিয়ে। কলিকাতার কোন ধনীর সন্তানের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, এক পয়সা তাহারা লইবে না বরং শান্তির মাথা হইতে পা পর্যন্ত সোনার পোর মুড়িয়া দিবে। শান্তির হস্তরেখা বিচার করিয়া বরের পিতা দেখিয়াছেন যে সে অত্যন্ত সুলক্ষণাবতী! তাই নাকি পুত্রবধূ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। শান্তির এই অচিন্তিতপূর্ব সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া তাহার মায়ের রাত্রে ঘুম হইতেছে না, তাই দ্রুত এই শুভকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি সেই মাসের শেষ তারিখেই দিন ধার্য করিয়াছেন।

তখনো পাঁচ দিন বাকী ছিল মাস কাবারের। আর মাত্র চারদিন পরে শান্তির বিবাহ—কথাটা শুনিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। শান্তিকে আগে যতটা ছেলেমানুষ ভাবিয়াছিলাম আসলে নাকি তাহার চেয়েও বেশী ছিল। জ্যাঠাইমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, এই মেয়ে পূর্ণ হয়ে চোদ্দয় পড়লো, আর যেন রাখতে সাহস হয় না দিদি!

যাহা হউক শান্তির মা আসিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন এবং বিশেষ করিয়া আমার ও ভুতোর নাম উল্লেখ করিয়া জ্যাঠাইমাকে বলিলেন ওদের একটু সকাল সকাল নিয়ে যেয়ো দিদি, ওদেরই ত আমোদ বেশী, তা ছাড়া ওদের একটু খাটতে খুটতে হবে।

ভুতো ও আমি দুজনেই সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। ভুতো একেবারে লাফাইয়া উঠিল, বলিল, আমি লুচি পরিবেশন করবো কাকিমা?

তিনি বলিলেন, আচ্ছা। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আলোক তুই কি পরিবেশন করবি বললি না ত?

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই ভুতো বলিয়া উঠিল ও জল আর নুন পরিবেশন করবে কাকিমা, লুচির ধামা নিয়ে ও নড়তেই পারবে না!

আমার দেহ একটু ক্ষীণকায় ছিল বলিয়াই হউক কিংবা ভুতোর চেয়ে আমি বয়সে ছোট ছিলাম বলিয়া জানি না, তাহা শুনিয়া শান্তির মা বলিলেন, ঠিক ধরেছিস, তুই তাহ'লে এই কাজগুলো করবি—সকাল সকাল যাস্ বাবা। এই বলিয়া তিনি আমাকে ও জ্যাঠাইমাকে অনুরোধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। জ্যাঠাইমা শান্তির মায়ের সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়া মাঠের রাস্তা পর্যন্ত গেলেন—বিয়েতে কে কে আসিবে, কত খরচ হইবে, আর সেই টাকাটা কে দিবে ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে করিতে।

আমি সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম শান্তির বিয়ে আর ক'দিন পরে অথচ শান্তি ত আমাকে কিছুই বলিল না, একবারও ত সে কাল আমাকে সে কথা জানাইতে পারিত! এমন সময় ভুতো একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ভাবছিস কেন আলো, আমার কাছে লুচির ধামা থাকবে আর ভাঁড়ার থেকে সন্দেশ, পানতুয়া চুরি করে এনে তোকে গেলাস গেলাস খাওয়াবো। তুই ত জল দিবি, তোর কাছে কত গেলাস থাকবে, কেউ জানতেও পারবে না। ওঃ কেয়া মজা! আর দাখ, তোকে যদি কেউ কিছু বলে ত আমাকে এসে বলে দিব—আমি লুকিয়ে গোয়াল ঘরের পিছন দিয়ে তোকে খেতে দেবো কেউ জানতেও পারবে না।

আমি গম্ভীর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে চুপ করিল এবং আমার দেহ হইতে সহসা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। আমি সেখান হইতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তারপর খাতা বই গুছাইতে লাগিলাম হেড মাস্টারের বাড়ি পড়িতে যাইবার জন্য। ভুতো ছুটিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল ভাই আলো রাগ করলি?

না। বলিয়া আমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

সেদিন মাঠে সবাই খেলিতে আসিল কিন্তু শান্তি আসিল না। পরের দিনও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। কয়েকগুলি ফুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া আমি নিজে তখন তাহার বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া শান্তি একেবারে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত হইতে ফুলগুলি কাড়িয়া লইল। আমি বলিলাম, শান্তি তুমি খেলতে যাওনি কেন? কালকে যাওনি, আজও গেলে না—

শান্তি কি একটা বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ যেন সেটা সামলাইয়া লইল। তারপর মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিল, মা যে যেতে দেয় না।

বলিলাম, কেন শান্তি?

সে আর সে কথার জবাব ভাল করিয়া উত্তর দিতে না পারিয়া কেবল একবার পিছন দিকে একবার আশেপাশে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, শান্তি তোমার নাকি বিয়ে?

অর্ধস্ফুট স্বরে সে একবার বলিল হোঁ। তারপর আমার মুখের দিকে বিদ্যুৎগতিতে তাকাইয়া খপ্ করিয়া তাহার শাড়ির একটি প্রান্ত দাঁতের কোণে চাপিয়া ধরিয়া আঁচলটি এক হাতে করিয়া পাকাইতে লাগিল। শুধু চকিতে তাহার চোখে মুখে কিসের একটা রঙ যেন ছিটকাইয়া উঠিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিলাম না। মনে হইল এ শান্তি যেন সে শান্তি নহে—যাহাকে আমি এতদিন ধরিয়া দেখিয়াছি, যাহার সহিত এতদিন খেলা করিয়াছি, এমন কি দুই দিন পূর্বেও যে আমার অতি নিকটে ছিল, আজ যেন তাহাকেই কোন দূরের স্বপ্নলোকের মনে হইতেছিল। তাহার মধ্যে একটা নতুন রূপ দেখিয়া আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ এই কথাটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, শান্তি শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে আমার কথা মনে থাকবে?

শান্তি কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল এমন সময় নাটকীয়ভাবে তাহার মা সেখানে আসিয়া পড়িয়া বলিলেন, হাঁরে শান্তি তুই কি কানে কালা হয়েছিস, শুনতে পাচ্ছিস না কখন থেকে

আমি চেঁচিয়ে মরছি? বলি সন্ধ্যে যে হলো তুলসীতলায় পিদীম সাজাতে হবে না?

যাচ্ছি মা—বলিয়া শান্তি তখনি সে স্থান ত্যাগ করিল। আমার দিকে চাহিয়া তাহার মা বলিলেন, বাবা আলো সকাল সকাল আসিস বিয়ের দিন—শান্তির বিয়েতে তোকে যে কোমর বেঁধে খাটতে হবে।

নিশ্চয়ই। আমাকে যে কাজ আপনি করতে বলবেন আমি করে দেবো। এই বলিয়া সেদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। শান্তির সহিত দেখা হইয়াছিল বলিয়া মনটা'ও খুব খুশি ছিল।

বিয়ের দিন সকাল সকাল শান্তিদের বাড়ি আমরা সকলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা তখন সবে হইয়াছে। আলোয় লোকের ভীড়ে চীৎকারে, লুচি ভাজার গন্ধে একটা অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে। জ্যাঠাইমাকে লইয়া আমি ও ভুতো একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। খেঁদী তাহার ছোট ছোট ভাই বোনের দলকে সামলাইতে সামলাইতে ভীড়ের ভিতরে কোথায় হারাইয়া গেল। জ্যাঠাইমা আমাকে বলিলেন খেঁদীর সন্ধান লইবার জন্য। আমি খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে শান্তিদের শোবার ঘরের দিকে চলিলাম। সেখানে ভীষণ ভীড় কনে সাজান হইতেছিল। বোধ হয় পঞ্চাশ ষাটজন স্ত্রীলোক—বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলে মিলিয়া শান্তিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যেন কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছিল। আমার ইচ্ছা ছিল একটু শান্তির সহিত দেখা করিবার কিন্তু সে ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। তাহার কাছে যাওয়া দূরে থাক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। আমি সারা বিকেলটা ধরিয়া ভাল ভাল ফুল সংগ্রহ করিয়া একটি মালা গাঁথিয়াছিলাম শান্তিকে দিবার জন্য। যে ফুলগুলি সে বিশেষ করিয়া পছন্দ করিত সেইগুলি দিয়াই সযত্নে এই মালাটি তৈরী করিয়াছিলাম। তাই নিজে হাতে করিয়া সেটি তাহাকে দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। শেষে খেঁদীর হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম শান্তিকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য।

এমন সময় বর আসিল পাল্কী করিয়া। চার পাঁচটি শাঁখ একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। মেয়েরা হুলুধ্বনি দিতে দিতে বাড়ির বাহিরে ছুটিয়া গেল। এই সময় একসঙ্গে যেন বিবাহ বাড়ির কোলাহল সর্বোচ্চ স্তরে উঠিল। আমাদের কাজ এইবার শুরু হইল। আমরা কয়েকটি ছেলে বরযাত্রীদের চা, জল, পান, সোডা লেমোনেড প্রভৃতি খাওয়াইতে লাগিলাম। ইহার অল্পক্ষণ পরেই আবার তাহাদের খাওয়াইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইল। কুশাসন বিছাইয়া মাটীর গ্লাসে জল দিয়া পাত পাতিয়া দিয়া, নুন দিয়া আমরা সব প্রস্তুত করিতেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরিবেশন করিতে লাগিলেন লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। ভুতো এই দলে ছিল। জলের জগ হাতে করিয়া আমি ও আরো দুইজন ছেলে সেখানে মোতায়েন রহিলাম ভোজনরত বরযাত্রীদের শূন্য গেলাস পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য।

ইহারই ফাঁকে আমি চট করিয়া একবার বাড়ির ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম। যদি শান্তির সঙ্গে দেখা হয় এই আশায়। আমি তাহাকে দেখিলাম বটে, কিন্তু শান্তি আমার দিকে চাহিলও না। সে যেন কোন দেবী পূজার বেদীতে বসিয়া আছে, আর অসংখ্য ভক্ত চারিদিক হইতে তাহার অর্চনার জন্য ব্যস্ত; আমি তাহার প্রসন্ন দৃষ্টিলাভ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম কিন্তু দেবী আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

তখন বিবাহ শুরু হইয়া গিয়াছে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন বরের হাতের উপর শান্তির হাত রাখিয়া। বধূ বেশে শান্তিকে এই প্রথম দেখিলাম। তাহার সর্বাঙ্গে লাল বেনারসী শাড়ি, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের তিলক, দুই হাতে নবনির্মিত স্বর্ণালঙ্কার ঝিকিমিকি করিতেছে, শান্তিকে যেন আর চেনা যায় না। সে যেন কোন কল্পলোকের রাজকন্যা। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই কি সেই শান্তি! কোথা হইতে সে এমন অপূর্ব শ্রীময়ী মূর্তি পাইল? আর তাহার পার্শ্বে শান্তির বর—তাহারই বা কিরূপ! তরুণ যুবক, কন্দর্পকান্তি চেহারা—অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। যেন কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা শান্তির সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য মর্তলোকে আসিয়াছে। তাহাদের দুইজনকে একত্রে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। দেখিয়া আশা মেটে না, আরো দেখিতে ইচ্ছা করে। আমি কিন্তু সে দৃশ্য বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিলাম না। শান্তি যদি আমার দিকে চাহিত আমায় দেখিত তাহা হইলে হয়ত সেখানে দাঁড়াইয়া তাহার বিবাহ দেখিতে পারিতাম; কিন্তু তাহার এই অবহেলা যেন আমার মর্মে শেলাঘাত করিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে সে কি আমায় ভুলিয়া গেল! এইরূপ আরো কত কি চিন্তা করিতে করিতে আমি আবার বাহিরে আসিয়া কাজে লাগিয়া গেলাম। জল, কলাপাতা, মাটীর গেলাস, খুরি লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। কত লোক আসিল, কত লোক খাইয়া গেল কিন্তু আমার মনে সর্বক্ষণ শান্তির সেই অবহেলার কথাই ঘুরিয়া মরিতে লাগিল।

হঠাৎ একবার মনে হইল হয়ত আমি শান্তির উপর অবিচার করিতেছি—সে আমায় দেখিতে পায় নাই ওই ভীড়ের মধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়ত আমারি উপর রাগ করিয়াছে। এই চিন্তা মাথায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মন যেন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল ইহাই ঠিক, তাহা না হইলে শান্তি কখনো ইচ্ছা করিয়া আমায় না দেখিতে পারে? আমি আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম অতি সঙ্গোপনে। আশা আকাঙ্ক্ষায় আমার মন তখন দুলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে ভুতো ছুটিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, এই আলো এই সন্দেশ দুটো খেয়ে ফেল—তোর খুব ক্ষিদে পেয়েছে না, মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে, কি করবো ভাই বুড়ো হারাণ ঠাকুর্দাটা ভাঁড়ার থেকে কিছুতেই নড়ে না—একবার ফাঁক পেতেই পান নেবার নাম করে ব্যস একেবারে এক মুঠো সরিয়েছি! ওঃ ক্ষিদেয় আমার পেটে কুকুর কাঁদছে। নে নে খেয়ে নে টপ্ করে এখুনি আবার কেউ এসে পড়বে!

আমি বলিলাম, তুই খেয়ে নে ভাই, আমার এখনো ক্ষিদে পায়নি।

ভুতো কোন কথা শুনিল না। আমার মুখে সন্দেশ দুইটা পুরিয়া দিয়া বলিল, খাটতে খাটতে ক্ষিদেটা ঠিক বোঝা যায় না বুঝলি— কিন্তু খেয়ে যেতে হয় তা না হলে পরে আর কিছু মুখে দিতে পারবি না। এই বলিয়া যেমন সে ঝড়ের মত আসিয়াছিল তেমনি ঝড়ের মত চলিয়া গেল।

আমি তাহাকে আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। সন্দেশ দুইটা তখন আমার গলার মধ্য পথে যাইয়া এমনভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল যে, না পারি তাহাদের গিলিতে না পারি বাহির করিতে। মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—বুঝি শ্বাস বন্ধ হয় এখুনি। তবু জল জল বলিয়া আমি প্রাণপণে তখন চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেহ সে কথা শুনিতে পাইল না। কেননা আমার মুখ দিয়া তখন জলের পরিবর্তে গোঁ-গোঁ করিয়া এক অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছিল। কে তাহার অর্থ বুঝিবে? শেষে একটি লোক কোথা হইতে হঠাৎ সেখানে ছুটিয়া আসিল। আমি তাহাকে চিনি না, সে বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া 'জল জল' বলিয়া এমনভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল যে, চার পাঁচজন ছেলে জলের জগ হাতে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আরো বহুলোক আসিয়া আমাকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিল। 'কি হয়েছে' 'কি হয়েছে' সকলের মুখে এক কথা! সবাই আশা করিতেছিল যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দুর্ঘটনা সত্যই কিন্তু তাহা মুখে বলিবার নয় এমনই লজ্জাকর। তবু লজ্জার মাথা খাইয়া কথাটা বলিতে হইল। তখনই একটা হাসির রোল উঠিল আমার চারিদিকে। কে একজন

চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, চুরি করে খেতে গেলে এই রকমই হয়! এইভাবে কত লোক কত কথা বলিয়া চলিয়া গেল। পৈতৃক প্রাণটা ফিরিয়া পাইয়াছি বলিয়া তখন সবই যেন সহ্য হইল। আমি শুধু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে সবাইকে কাজে ব্যস্ত দেখিয়া আরো যেন সুস্থ বোধ করিলাম। মনে ভাবিলাম যাক এখানকার কেহ ত আমায় এই অবস্থায় দেখে নাই!

সবে এই কথাটি চিন্তা করিতেছি এমন সময় কোথা হইতে শান্তির মা ছুটিতে ছুটিতে একেবারে আমার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই যে আলো, তুই বাবা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্—আমি চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথায় গেল বলে। লাগেনি ত বাবা বেশী? কোথায় পড়ে গিয়েছিলি? আমি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, পড়ে গিয়েছিলুম কে বললে? তিনি বলিলেন, আমি শুনেলুম মাথা ফেটে গেছে—মাথায় সবাই মিলে জল দিচ্ছে হাওয়া করছে। ভয়ে মরি একেবারে, আজ একটা শুভ দিনে এ কি কাণ্ড হলো! তাই ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মাথার কোন্ জায়গাটা কেটেছে দেখি? এই বলিয়া তিনি আমার মাথাটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, পড়েও যাইনি, মাথাও কাটেনি।

তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, তবে?

গোটা দুই ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম, গলায় খাবার আটকে গিয়ে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

তাই ভালো, বাবা এ দেশের মানুষগুলো কি তিলকে একেবারে তাল করে দেয়! এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, যাক তোকে আর কোন কাজ করতে হবে না—যা তুই বাসরঘরে গিয়ে বসগে যা—বর-কনে এখন সেখানে আছে।

যাচ্ছি। বলিয়া পা বাড়াইতেই প্রথমে মনে হইল ভাগ্যিস শান্তির কানে আমার এই দুর্ঘটনার কথা পৌঁছায় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল শান্তি শুনিতে পাইলে ভাল হইত। সে হয়ত ছুটিয়া আমায় দেখিতে আসিত। একই সঙ্গে এইরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন কথা যখন চিন্তা করিতেছি তখন তিনি আবার সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁরে আলো শান্তির বর কেমন হয়েছে? দেখেছিস?

বলিলাম, হাঁ দেখেছি।

তিনি আবার বলিলেন, তোর কেমন লাগল?

আর দুই ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম, বেশ সুন্দর হয়েছে কাকিমা!

তিনি একেবারে খুশিতে গদ গদ হইয়া আমাকে লইয়া একেবারে বাসরঘরের দরজার কাছে বসাইয়া দিলেন। বাসরঘরে তখন নাচ গান হাসি রঙ্গ তামাসার বন্যা চলিতেছে। পাড়ার বৃদ্ধা ক্ষান্তপিসী তোবড়ানো মুখে আলতা পাউডার মাখিয়া কাহার একখানি নতুন বেনারসী সাড়ি পড়িয়া নাচিতেছেন—আর গান গাহিতেছেন—'আমার ভাঙ্গা বাগান জোগান দেওয়া ভার ফুলে নাই সে বাহার।'

বিদ্যাসুন্দর নাটকে হীরা মালিনী এই গানটি গায়। ক্ষান্তপিসী লেখাপড়া জানেন না। তবে তাঁহার যৌবনকালে যাত্রা শুনিয়া ইহার সুর তাল লয়, এমন কি গাহিবার সময় নাচিবার ঠাটটি পর্যন্ত হুবহু নকল করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে বাসরঘরে কতবার তিনি সেই গানটি গাহিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন সে কথা তখন উপস্থিত সকলে বিশ্বাস না করিলেও ক্ষান্তপিসী কিন্তু ভুলিতে পারেন নাই। তাই সকলে যখন সেই পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধার নাচ-গান শুনিতে শুনিতে চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল, তখন তিনি সহসা একটি মেয়ের গালে ঠোনা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন, মর ছুঁড়ী, হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লি যে। এই ক্ষেন্তিপিসী নাচ দেখবার জন্যে একদিন সাত গাঁয়ের মেয়ে মদ্দ ভেঙ্গে পড়তো—বাসরঘরে জায়গা হতো না, তোর বাপকে জিগ্যেস করিস্ আমা[র] নাচের কথা তুই কি জানবি?

আবার সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বিশেষ করিয়া শান্তির বরের হাসি আর থামিতে চায় না। হাসিতে হাসিতে তাহা[র] চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। এমন সময় ক্ষান্তপিসী গিয়া নত[ুন] বরের হাত ধরিয়া বলিল, তুমি ভাই সুন্দরের পার্টটা করো, তা [না] হলে জমছে না, আমার মনে ঠিক রঙ লাগছে না—তাই এই ছুঁড়ী[রা] এত হাসছে।

শান্তির বর ছিল ভারী আমুদে তাই আর কালবিলম্ব [না] করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষান্তপিসী তখন তাহার দুই হাত ধরি[য়া] নাচিতে শুরু করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বর হইতে শুরু করি[য়া] সকলে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া শান্তি[র] হাসি যেন থামিতে চায় না—সে পেট টিপিয়া বারংবার তাহার পার্শ্ব[ে] স্থিত সঙ্গিনীর ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল! আমার আর সহ্য হইল না। শান্তি যত হাসিতে লাগিল আমার মনটা তত খারাপ হইয়া গেল। কেন তাহা বুঝি নাই! আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম, হয়[ত] আমাকে দেখিতে পাইলে তাহার হাসি থামিবে। কিন্তু ইহাতে কোন ফল ফলিল না। সে যেন আমাকে দেখিতে পাইল না—উপরন্তু তাহার হাসির রোল আরো বাড়িয়া গেল। আমি তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। তবুও আসিবার আগে আর একবার তাহা[র] দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িলাম না। খেঁদী পাশের ঘরে বসিয়া হাসিতেছিল। বিনা কারণে আমি তাহাকে উচ্চৈঃ[স্বরে] জিজ্ঞাসা করিলাম, খেঁদী বাড়ির চাবিটা তোর কাছে ঠিক আছে ত[ো]? দেখিস্ সাবধানে রাখিস ভীড়ের মধ্যে যেন হারিয়ে না যায়?

খেঁদী হাসি থামাইয়া ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল, তারপর তাহার আঁচলের প্রান্তটা একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, ঠিক আছে। আমি এমনভাবে কথা বলিতেছিলাম যাহাতে শান্তির কানে গিয়া পৌঁছায়। তাই ইহাতেও যখন শান্তির কোন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটিল না তখন পুনরায় বলিলাম, খেঁদী তুই এখান থেকে যেন কোথাও যাসনি, আমি এখুনি খেয়ে এসে চাবি নিয়ে বাড়ি চলে যাব, তোরা জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যাস্।

ইহাতেও যখন শান্তি একবারও আমার দিকে চাহিয়া দেখিল না তখন আমার মনে সত্যই আঘাত লাগিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর এখানে থাকিব না। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সেই বিবাহ বাড়ির সমস্ত আনন্দ কে যেন আমার চোখের উপর হইতে হরণ করিয়া লইল! লোকের হাসি ঠাট্টা, ছুটাছুটি খাওয়া দাওয়া উৎসব আয়োজন কোনটাতেই আর আমার উৎসাহ রহিল না। আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামান্য কিছু খাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মনে হইতে লাগিল—সারা পথ শান্তির সেই উচ্চ হাসি যেন আমাকে অনুসরণ করিতেছে। মনে আছে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাইতে পারি নাই।

পরের দিন সকালে বরকনে বিদায় হইবে। জ্যাঠাইমা ও খেঁদী সকাল সকাল কাজকর্ম সারিয়া শান্তিদের বাড়ি ছুটিল। ভুতো[ও] ছোট ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে করিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। আমি সকাল হইতে উঠিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম কিছুতেই যাইব না। তাই ভুতো যাইবার সময় যখন আমাকে ডাকিতে আসিল বলিলাম, পড়া হয়নি ভাই এখন আমি যেতে পারবো না, তুই যা।

ভুতো চলিয়া গেল। এদিকে বরকনের বিদায়ের সময় যত আসন্ন হইতে লাগিল, ততই আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল শান্তিকে দেখিবার জন্য। শেষে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ঘন ঘন জোড়া শাঁখের আওয়াজ আমার কানে আসিয়া

পেঁাছাইতেই বই ফেলিয়া রাখিয়া দ্রুততম পদক্ষেপে একেবারে বিয়ে বাড়ির নিকটে গিয়া হাজির হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি শান্তিদের বাড়ির সম্মুখে আর তিল ধারণের স্থান নাই। স্ত্রীলোক ও বালক বোধ হয় পাড়ায় আর কেহ বাকী নাই সকলেই আসিয়াছে। দুইখানি পাল্কী প্রস্তুত। একখানিতে পুরোহিত ও পরামাণিক বরের জিনিসপত্তর লইয়া উঠিল, সেখানি প্রথমে ছাড়িয়া দিল। তারপর আসিল বরকনের পাল্কী। আমি ভীড় ঠেলিয়া একেবারে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। বরকনে তখনো ভিতর হইতে আসে নাই। সকলেই তাহাদের দেখিবার জন্য মুহুর্মুহুঃ দরজার দিকে তাকাইতেছিল। এমন সময় পাঁচ ছয়টি শাঁখ একত্রে বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জনতা যেন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিতেই যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু সহসা সজল হইয়া উঠিল।

শান্তি কাঁদিতেছে, তাহার মা কাঁদিতেছে, তাহার মামামামী কাঁদিতেছে, আত্মীয়স্বজন সকলেই কাঁদিতেছে। আর কাঁদিতেছে দর্শকবৃন্দ—যত স্ত্রীলোক সেখানে ছিল—বৃদ্ধা ও বালিকা নির্বিশেষে। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। কেহ বা ঘন ঘন আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে, কেহ বা সজল চোখে সেই নিরানন্দ মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। এমন কি বরের পর্যন্ত চক্ষু ছলছল করিতেছে। সেই শোকার্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্য দিয়া শান্তি তাহার বরের পিছু পিছু আসিয়া পাল্কীর ভিতরে উঠিল। উড়ে বেহারারা পাল্কী কাঁধে তুলিয়া লইল। তখন শেষবারের মত সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলাইয়া দিয়া শান্তি কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। শ্রাবণের ধারার মত তাহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ক্ষান্তপিসী এতক্ষণ পরে কোথা হইতে একটি লাঠিতে ভর দিয়া ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে একেবারে পাল্কীর সামনে আসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে একটু ঠেলা মারিয়া বলিলেন আ মর, এই ছোঁড়াগুলো তোরা এখানে কি দেখতে এসেছিস—সরে যা।

আমি সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন তিনি পাল্কীর মধ্যে মুখ গলাইয়া এক হাতে করিয়া শান্তির চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, ছোঁড়া কাঁদিস কি আজ শুভদিন এখন কি চোখের জল ফেলতে আছে; চুপ কর শিগ্‌গির। এই বলিয়া তিনি দর্শকদের মধ্যকাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পাল্কীর ভিতর যখন এই দৃশ্য বাহিরে তখন সহসা যেন নিঃশব্দ শোকসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সমবেত মহিলাবৃন্দের ঘন ঘন চোখের জলে ও ফোঁপানির শব্দে সেখানকার আকাশ বাতাস থমথম করিতে লাগিল। আর তাঁর সঙ্গে সেই একটানা শাঁখের আওয়াজ মাঠ ছাড়াইয়া বন জঙ্গল পার হইয়া দূরে হইতে দূরান্তরে যেন সেই বেদনার বার্তাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

পাল্কী চলিয়া গেল।

আমি সেই দিকে চাহিয়া অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সহসা যেন আমার চমক ভাঙিল এবং সেই সঙ্গে শান্তিকে আর একবার দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেন তাহা জানি না তবে মনে হইল এখনি তাহাকে একবার চোখে না দেখিলে মরিয়া যাইব। তাই গোপনে কেহ না দেখিতে পায় এইভাবে আমি বনজঙ্গল ভাঙিয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ দূরে গিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেখানে কেহ নাই, আমি একা। শান্তি এবার নিশ্চয়ই আমায় দেখিতে পাইবে, হয়ত বা একটা দুইটা কথাও কহিবে কিংবা একটু হাসিবে—এই রকম আরো কত কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই পাল্কীটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

মিনিট কয়েক পরেই দূরে পাল্কী দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভিতরটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমি একেবারে পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু হায় শান্তি ফিরিয়াও চাহিল না, সে তখনো তেমনিভাবে কাঁদিতেছিল। পাল্কী চলিয়া গেল।

আমি ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘর দোর, লেখাপড়া এই পৃথিবী সব যেন আমার কাছে কেমন শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শান্তি যে আমার অন্তরে কতখানি স্থান জুড়িয়াছিল তাহা সে চলিয়া যাইবার পর আমি প্রথম আবিষ্কার করিলাম। এক নিমেষে আমার সমস্ত যেন অন্ধকার হইয়া গেল। আমি খোলা জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়াছিলাম। কি দেখিতেছিলাম, কি ভাবিতেছিলাম জানি না। তবে মনে পড়ে, শান্তি যে নাই সেই কথাটাই যেন সমস্ত বিশ্ব চরাচর সেদিন আমায় জানাইতেছিল। কেমন করিয়া শান্তি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমার মনকে এমনভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল চিন্তা করিতেছি এমন সময় খেঁদী পিছন হইতে ডাকিল, আলোকদা?

চমকাইয়া উঠিলাম। কখন যে সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়াছিল আমি তাহা টেরও পাই নাই। তাহার দিকে ফিরিবার সামর্থ্যও তখন বোধ করি আমার দেহে ছিল না, তাই তেমনিভাবে জানলার দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিলাম—কি?

সে আমার আরো কাছে সরিয়া আসিয়া একবার আমার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আলোকদা শান্তির জন্যে তোমার মন কেমন করছে না?

আমি কোন জবাব না দিয়া তেমনি নীরব রহিলাম। খেঁদী এই নীরবতার কি অর্থ বুঝিল জানি না সেও আমারই মত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তারপর যেন কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার সুরে বলিল, জানো আলোকদা সুন্দর বর হয়েছে বলে মেয়ে একেবারে আহ্লাদে ফেটে পড়ছেন, আমাদের সঙ্গে ত ভাল করে কথাই কইলে না, এমন কি তোমার সঙ্গে পর্যন্ত কিছু বললে না!

ইহারও আমি কোন জবাব দিলাম না দেখিয়া খেঁদী বোধ করি একটু বিস্মিত হইল। তারপর আমার একেবারে সামনে আসিয়া বলিল, তোমার মালাটা আমি কাল তাকে দিয়েছিলুম কিন্তু সেটা নিয়ে সে একবারও তোমার কথা জিগ্যেস করলে না। শুধু মালাটা গলায় পরতে পরতে একবার মাত্র বললে—আলোকদা যা দিয়েছে তা আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।

তাহার মুখ হইতে ইহা শুনিয়া অন্তত আমি তাহাকে কিছু বলিব এইরূপ সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু হাঁ বা না কোন কথাই যখন আমি বলিলাম না বরং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মৌন হইয়া রহিলাম তখন খেঁদী আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শান্তির বিরহে আমি কতটা কাতর হইয়া পড়িয়াছি তাহা জানিবার জনাই আমার ঘরে সে আসিয়াছিল কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাহা লইয়া গবেষণা করিবার মত ইচ্ছা বা উৎসাহ তখন আমার ছিল না। তাই সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি চলিয়া গেল, আমি কোন প্রশ্নই তাহাকে করিলাম না, তেমনি নীরব রহিলাম। ক্রমশ

জ্ঞান বিজ্ঞান

শ্রীসুধীর বসু

আন্তর্জাতিক খাদ্য সম্মেলন

ভার্জিনিয়ার 'হট্‌স্প্রিংস'এ সাম্মিলিত জাতিবর্গের এক অধিবেশনে পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব নিউট্রিসন এণ্ড রিসার্চে'র অধ্যক্ষ ডাঃ ডব্লিউ আর এ্যাকরয়েড উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন। ডাঃ এ্যাকরয়েড সুপুষ্টি (Nutrition) সম্পর্কে বহু গবেষণা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর নাম বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। তিনি উপরোক্ত খাদ্য সম্মেলন সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা হতে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার এক নিদারুণ চিত্র আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হয়। সম্মেলনে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে জানা যায়, খাদ্যসমস্যা সকল দেশেই প্রবল—বিশেষ করে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সব দেশেই অনুভূত হয়। এমন কি বহু ধনিকের দেশ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যেও সুপুষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের পূর্বেই অবস্থা এরূপ হয়েছিল। যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে যে অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও চীনের অবস্থা তো অবর্ণনীয়। ভারতের অবস্থা আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি—এখানে পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা—দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জুটানোও বহু লোকের পক্ষে এখন দুঃসাধ্য।

'আন্তর্জাতিক খাদ্য সম্মেলন' যুদ্ধান্তে সুষ্ঠুভাবে যাতে সকল দেশে খাদ্য সরবরাহ হয়, নিরন্ন দেশগুলিও যাতে অন্ন পায় তার ব্যবস্থা করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে খাদ্য বণ্টন হোক এ তো বেশ ভাল কথা। কিন্তু এর সংগে যে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, সে বিষয়ে সম্মেলন ভেবে দেখেছেন কিনা জানা যায়নি।

রাজনীতিক প্রশ্নের সমাধান না হলে যে দেশের লোকদের অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা নেই—সেকথা ভারতের বেলায় আমরা ভালো করেই বুঝতে পাচ্ছি। এদেশে বিদেশী শাসকগণ ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য কমই চেষ্টা করেছেন, তাই আজও ভারতে মান্ধাতার আমলের প্রথাতেই কৃষিকার্য চলছে। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোথাও তেমন কাজ হয়নি; সুতরাং আজ যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই এদেশে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। ভারতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তারও বহু অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ফলে অনশন অর্ধাশনই আজ আমাদের দেশের লোকদের ললাটলিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশ্চাত্যের বহু দেশ বিজ্ঞানের সহায়তায় ফসল উৎপাদন বিশেষ করেই বাড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে ধনিকেরা উচ্চ মূল্য পাওয়ার লোভে বহু শস্য নষ্ট করে দিয়ে থাকে। প্রাচুর্যের ভিতরে সেখানে তাই সাধারণ লোককে পুষ্টিকর আহার্যের সুযোগ হতে বঞ্চিত হতে হয়। আন্তর্জাতিক খাদ্য সম্মেলন সে-সব বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু যুদ্ধের অবসানে আবার বণিকসুলভ মনোবৃত্তি যে মাথা তুলে দাঁড়াবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়!

পুষ্টিকর খাদ্য

বর্তমানে যে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে, তাতে খাদ্য সম্পর্কে আমাদের অভ্যাস বদলাবার যে প্রয়োজন হয়ে উঠেছে পূর্বেও একবার তা আলোচনা করেছি। সুপুষ্টির দিক থেকে এরূপ খাদ্য কি হতে পারে তা নির্ণয় করা দরকার। আমরা দেখে সুখী হলুম, সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রীরা এবিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন এবং ঐ প্রদেশের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাখার কর্মীদের এজন্য সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। পাটনাতেও নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্সের এক অধিবেশনে এজন্য সুপুষ্টি কমিটি (Nutrition Committee) গঠন করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি ডাঃ কে এস রায় মহাশয় এক বিবৃতিপ্রসংগে বাঙলার মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন যে, পুষ্টিকর খাদ্য-(Balanced diet) নির্ণয় করবার জন্য সরকার যদি সচেষ্ট হন, তবে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বাঙলার কর্মিগণ এবিষয়ে যতদূর সাধ্য সহায়তা করতে সম্মত আছেন।

পুষ্টিকর খাদ্য নির্ণয়ে ভারতবর্ষে বহু গবেষণা হয়েছে। কুন্নুরে এবিষয়ে যে গবেষণা হয়েছে, তার প্রসিদ্ধি শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নহে, ভারতের বাহিরেও এই গবেষণা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। আজ যখন ভারতে খাদ্যাভাব বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে—ঐ গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী যদি কাজ হয়, তবেই তার সার্থকতা বোঝা যাবে। খাদ্য সম্পর্কে মানুষ স্বভাবতই রক্ষণশীল। এই বিষয়ে নূতন কিছু ধরানো সহজ নহে। যে অঞ্চলে যাহা সহজে পাওয়া যায়, বা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তাই সাধারণত সে অঞ্চলের লোকের প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বাঙালী চিরদিন ভাত খেয়ে আসছি; চাউলের অনটনে আজ উহার পরিবর্তে অন্য খাদ্য গ্রহণ করতে স্বভাবতই আমাদের কুণ্ঠা বোধ হয়। তবে অবস্থার বিপাকে পড়ে আজ হয়তো অভ্যাস বদলানো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ, ভিটামিন, ক্যালোরি এসব বিষয়ে এপর্যন্ত বহু তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদগণ পুষ্টিকর খাদ্য (Balanced diet) কি হতে পারে তা সহজেই নির্ণয় করতে পারবেন। কিন্তু শুধু আহার্য নির্ণয়েই সমস্যার সমাধান হবে না। যাতে সে আহার্য সহজলভ্য হয়, এবং সাধারণ লোকও তার সুযোগ গ্রহণ কর্তে পারে, তার ব্যবস্থাও সংগে সংগে হওয়া চাই। লোককে আহার্য দেওয়ার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের এবং সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের উপরেই সব নির্ভর করে।

মশা মারতে বোমা

জাপানী যুদ্ধে নামবার পর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ ও মার্কিণ সৈন্যদের এমন সব অঞ্চলে যাতায়াত করতে হচ্ছে যেগুলি ভয়ানকভাবে ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত। ম্যালেরিয়ার বাহন মশা; সুতরাং একদিকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য যেমন গবেষণা চলছে, তেমনি মশা ধ্বংসের উদ্যম আয়োজনও কম হচ্ছে না। ব্রিটিশ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বহুবিধ ঔষধও এজন্য প্রস্তুত করেছেন। এর মধ্যে "সাইট্রোনেলা" ও "ইণ্ডালোন" নামক নবাবিষ্কৃত দুইটি রাসায়নিক পদার্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "সাইট্রোনেলা" গায়ে মাখলে সাময়িকভাবে মশাগুলো দূরে থাকে। "ইণ্ডালোন"-এ "সাইট্রোনেলা"র চেয়েও অধিকতর বেশী সময়ের জন্য ভাল কাজ পাওয়া যায়। মশা হতে ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে। সুতরাং কোনও অঞ্চলের মশাগুলোকে সমূলে বিনাশ কর্তে পারলে সে অঞ্চল ম্যালেরিয়ার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে পারে।—এজন্য বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার 'এণ্টি-ম্যালেরিয়া বোমা'ও তৈরী

করেছেন। এ বোমা ছুড়লে তা হতে এক প্রকার তরল পদার্থ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও সেস্থানের সব মশাকে বিনষ্ট করে দেয়। এভাবে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এক বাহিনীও গঠন করা হয়েছে। মশার সঙ্গে যুদ্ধ করাই এদের কাজ। তারা বোমা ছুঁড়ে স্থান বিশেষকে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব হতে রক্ষা করে থাকে। 'মশা মারতে কামান দাগানো'র বিষয় পূর্বে আমরা গল্প বলেই মনে করতাম। বিজ্ঞান আজ গল্পকেও সত্যি করে তুলেছে।

সূর্যে স্বর্ণের সন্ধান

সূর্যের গঠন সম্পর্কে এপর্যন্ত জ্যোতির্বিদপণ্ডিতগণ কম গবেষণা করেন নি। কোটি কোটি বছর ধরে যে সূর্য আলো ও তাপ বিকীরণ করে বিশ্বচরাচরকে সচেতন রাখছে, তার সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। বিজ্ঞানে যে ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে, কম পক্ষে তার পঁয়ষট্টিটি যে সূর্যের মধ্যে আছে তা পূর্বেই গবেষণায় ধরা পড়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার দুজন বৈজ্ঞানিক সূর্যের মধ্যে স্বর্ণের সন্ধান পেয়েছেন। এই দুজন বিজ্ঞানীর একজন প্রিন্সটনের বৈজ্ঞানিক ডাঃ চার্লোট ই মুর ও অপর জন মাউণ্ট উইলসনের ডাঃ আর্থার এস্ কিং।

পরলোকে ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার

ভারতের স্বনামধন্য ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার মহাশয় পরিণত বয়সে (৮২) সম্প্রতি গিরিডিতে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের চিকিৎসা ক্ষেত্র হতে একজন মনীষীর তিরোধান হল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর কৃতিত্ব দেশবিদেশে সমভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্‌গণের মর্যাদা তিনিই জগৎবাসীর চোখে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর তিরোধানে তাই সুদূর মার্কিনবাসীরাও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন।

স্যার নীলরতন শুধু একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্‌ই ছিলেন না। এদেশের শিল্পবাণিজ্য যাতে গড়ে উঠে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে তজ্জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক এই ছিল তাঁর আন্তরিক বাসনা। নিষ্কলুষ চরিত্র বিদ্যাবত্তা ও অসামান্য প্রতিভা বলে তিনি অতি সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছিলেন। সুতরাং দেশবাসীর অন্তরে তাঁর স্মৃতি যে চিরদিন অম্লান হয়েই থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।

এদেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য স্যার নীলরতন বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। আমরা দেখে সুখী হলেম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে যে প্রস্তাব করেছেন তাতে তাঁর জীবনের সেই আদর্শের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এদেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার ও গবেষণার পথ যাতে প্রশস্ত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন এবং স্যার নীলরতনের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে তাঁর নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করে এই শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে তুলবেন বলে সংকল্প করেছেন। আমরা আশা করি স্যার নীলরতনের স্মৃতি রক্ষার এই প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় সকলের সহযোগিতাই লাভ করবেন।

অবরোধ

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানেই এসে থামা গেলো আজ
কঠিনচেতা
সারাটা জীবন স্বপ্নসারথী চালালো রথ
মর্মর তার চক্রের ধ্বনি কি ভয়াবহ।
পিছনে ধুলোর আড়ালে সূর্য অন্তরীণ!

ভালো লেগেছিলো এলোমেলো এই ছুটে চলা
সামনে আমার নিভৃত দিনের খাড়া পাহাড়
রাত্রি শেষের অনাগত দিন শরণ নিলো
আমারি উষার প্রথম আভার পক্ষপুটে।

কঠিনচেতা,
সেদিনো কি ছিলো মৃত্যু এমনি রূপহীনা
আগাগোড়া পথ ছিল মসৃণ ধূলি-ধূসর?
মিথ্যা কথা!
—ক্লান্ত বিকালে ডানা কি গুটায় শ্যেন পাখী?

আজো গান বাজে : বিষন্ন যেন কান্না কার!
আজো মাঝে মাঝে প্রাণ-কণিকার
রক্ত নাচে।
হে অধিনায়ক
আজো জ্বলে তার বহ্নিকণা

ভাগ্যকে নিয়ে মুঠো মুঠো ধূলি ওড়ানো ভালো,
—ভাগ্যকে নিয়ে তবুও এমন প্রবল প্রবঞ্চনা?

দিন কাটে মোর : সাধারণ দিন : নির্বিকার!
দৈনিক রথে স্বপ্ন আমার বাঁধা আছে
সন্ধ্যারো পরে ক্লান্ত কলস ফেলে রেখে
সিঁড়ি দিয়ে নামা শ্রান্তচরণে নগরীতে।

দুধারে সৈন্য পিঁপড়ের মতো পরিখারো জল
শুষে নিলো
এখানে আকাশ ওখানে মেঘের মৃদু মোহ!
আহা এই জন্যেই এতো রাজকীয় সমারোহ?
তাইতো বুঝেছি স্বপ্নিল দিন কেন কাঁদে!

হে অধিনায়ক
শ্রেণী ভারে বেঁকে বিদেশিনী কারা চলে গেলো
পিছনে আবার তাদেরি যাবার গান বাজে,
—শ্রান্ত দিনের ক্লান্ত মনের কাহিনীতে
এ-ইতিহাসের ছিন্নপত্র চাহিনি তো!

হে অধিনায়ক
এখানেই এসে থামা গেলো আজ : শেষ চরণ!
—সামনে আমার ধূসর দিনের খাড়া পাহাড়।

শিল্পী

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া উপরে যাইবার পথে সহসা ঊর্মিলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেন দূরে হইতে একটা চাপা আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, কিন্তু তবু শব্দটা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই, সেটা সেতারেরই গুঞ্জন। অসহ্য ক্রোধে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দুটি দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। সে আশা করিয়াছিল যে, অত কঠিন তিরস্কারের পর তাহার স্বামী অন্তত উপার্জনের চেষ্টায় বাহির হইবে, কিন্তু সে আশাও তাহার স্বামী সম্বন্ধে অজ্ঞতায় পরিণত হওয়ায় নিষ্ফল ক্রোধের দাহনটা তাহাকেই নিঃশব্দে পোড়াইতে লাগিল।

আশ্চর্য, অত মধুর একটা বাদ্যযন্ত্রের উপর সুনিপুণ হাতের মধুরতর কারিগরি মানুষের গায়ে এত বিষ ছড়াইতে পারে! অথচ এমনি কানে যাইবার কথাও নয়। একে ত রাজশেখরের হাতে সেতার কোনদিনই কলরব করে না, তাহার উপর সে বোধ করি ঊর্মিলারই ভয়ে, ভিতরের দিকের সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বসিয়াছে। যেটুকু শব্দ তবুও রুদ্ধদ্বার ভেদ করিয়া ভিতরে পোঁছিতেছে, সেটা অন্য কোন শব্দ হইলে বোধ হয় ঊর্মিলা শুনিতে পাইত না। কিন্তু সেতারটা জলাতঙ্কের মত তাহার ব্যাধিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই অত ক্ষীণ আওয়াজও তাহার কানে গেল। আজকাল সেতারের আভাস মাত্রেও সে যেন পাগল হইয়া উঠে।

অথচ কিছুদিন আগেও এমন ছিল না। মনে আছে, তাহার ফুলশয্যার দিন রাত্রেই সমস্ত লোকলজ্জা ও উপহাসের ভয় উপেক্ষা করিয়া রাজশেখর তাহাকে সেতার বাজাইয়া শুনাইয়াছিল। সেদিন যে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের ভাব তাহার মনের মধ্যে জাগিয়াছিল, প্রথম কৈশোরের সে মোহ বহুদিন তাহার মন হইতে যায় নাই। তারপর বহুকাল, বহু বৎসর সে বিস্ময়, সে শ্রদ্ধা তাহার ছিল অবিচলিত। সে স্বামীর কাছে কোনদিন অলঙ্কার চায় নাই, ভাল বস্ত্র চায় নাই—সমস্ত অভাব, সমস্ত কষ্ট সে হাসিমুখে সহিয়াছিল ঐ সেতারেরই মোহে। প্রতিদিন রাত্রে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজশেখর তখন শুধু তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বাজাইয়া যাইত, তখন সমস্ত শারীরিক কষ্ট এবং অভাবের কথা সে ভুলিয়া যাইত। কঠিনতম অপমানের বেদনাও সুরের আঘাতে অশ্রুর আকারে তাহার দুটি সুন্দর গণ্ড বাহিয়া নামিয়া আসিত, সে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু শিল্পীর ভাবসুন্দর চক্ষু দুইটির দিয়ে চাহিয়া থাকিত, আর কোন কথাই তাহার মনে আসিত না।

কিন্তু সে মোহও একদিন কাটিল বৈ কি!

শ্বশুরের রাখিয়া যাওয়া জমিগুলি সমস্তই যখন একে একে বিক্রয় হইয়া গেল, সত্য সত্যই যখন একাদিক্রমে দুই তিন দিন অনশনের পর একবেলা আহারও ভাল করিয়া জোটা ভার হইল, পথ্য এবং চিকিৎসার অভাবে তাহার অমন ফুলের মত সুন্দর ছেলে টুন টুন্ শুকাইয়া মরিল, তখন আর ধৈর্য রাখা ঊর্মিলার পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজশেখরের তবু চৈতন্য হইল না। সে ঠিক আগের মতই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সুরের সাধনাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঊর্মিলার অভিমান, অশ্রুজল, অনুনয় শেষে অনুযোগ পরে কঠিন তিরস্কারে পরিণত হইল তবু রাজশেখর রহিল অবিচলিত। ঊর্মিলার বাক্যবান যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত তখন সে বাইরে কোথাও চলিয়া যাইত, ঘণ্টা দুই-তিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কিংবা মাঠে বসিয়া কাটাইয়া আবার প্রশান্ত হাসিমুখে বাড়ি আসিয়া ঢুকিত এবং নিজের তিন-চারটি সেতারের যে কোন একটিকে লইয়া বসিত বাজাইতে।

সবচেয়ে ঊর্মিলার দুঃখ এই যে, সে ইচ্ছা করিলে উপার্জনও করিতে পারে। অন্তত টুইশনীর ত অভাব হয় না, অনেকেই তাহার কাছে বাজনা শিখিতে চায়, কিন্তু রাজশেখর সে কথা শুনিলেই জ্বলিয়া ওঠে। বলে, হ্যাঁ পাঁচটা কি দশটা টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনে নেবে একেবারে! গুরুদত্ত জিনিস, যা পাবার জন্য আমায় সারা জীবন সাধনা করতে হ'লো, তা আমি ঐ কটা টাকায় বিক্রী করতে পারব না।...তা ছাড়া ঐ সব ভোঁতা আর গাধা ছোঁড়াগুলোর সাধ্য নেই যে এ যন্ত্র বাজাতে শেখে, মিছিমিছি ওদের পেছনে খেটে আমার সুদ্ধ হাত খারাপ হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে দূর দেশ হইতে ডাক আসে বাজাইবার, তাহারা টাকাও দিতে চায়, কিন্তু রাজশেখর তাহাতেও রাজি হয় না। বলে, তামকানার আসরে শোনাবার জন্য আমার এ বিদ্যে শেখা হয়নি মিলি, ও আমি পারব না। হ্যাঁ পাঁচটা গুণীজ্ঞানীর আসর হোক, আলবৎ যাবো।

কিন্তু গুণীজ্ঞানীর আসরে টাকা মেলে না, মিলিলে মেলে সে শুধু গাড়ি-ভাড়াটা।

অবশ্য টাকা যে একেবারে পাওয়া যায় না তাহা নহে। মাঝে মধ্যে কলিকাতার বড় বড় দোকানদারেরা দামী সেতার পাঠাইয়া দেয় পরীক্ষা করিতে, কিসের অভাবে যথেষ্ট মিষ্টসুর বাহির হয় না তাহাই জানিতে। সে সব ব্যাপারে যন্ত্রটা ঠিক করিয়া দিয়া পাঁচ দশ টাকা পাওয়াও যায়, কিন্তু সে টাকা পরক্ষণেই তাহার নিজের সেতারের পিছনেই ব্যয় হইয়া যায়, ঊর্মিলার হাতে একটাও পড়ে না।

অথচ, সে সবই জানে। টাকার জন্য পাওনাদাররা যে ঊর্মিলাকেই লাঞ্ছনা করিয়া যায় তাহা রাজশেখর নিত্যই বসিয়া বসিয়া দেখে, তবু টাকা রোজগারের আবশ্যকতা তাহার মাথায় ঢোকে না। কী করিয়া মানুষ যে এত নির্বিকার হয় তাহা আজও ঊর্মিলা বুঝিতে পারে না। এইত আজই মুদীর দোকানের লোকটা তাহাকে কী পর্যন্ত না অপমান করিয়া গেল, আর তাহারই বা অপরাধ কি আড়াইশ' টাকার উপর তাহার পাওনা। নেহাৎ দুই পুরুষের লেনদেনের সম্পর্ক বলিয়াই এতদিন সে চুপ করিয়া আছে।...সে লোকটা যখন ঊর্মিলাকে গালিগালাজ করিতেছিল তখন রাজশেখর ভিতরে বসিয়া একটা সেতারে তার চড়াইতেছে। অথচ সে না বলিল একটি কথা, না আসিল বাহিরে। বরং সে লোকটা চলিয়া গেলে ভিতর হইতে হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, সে আপদটা গেছে মিলি?

এই প্রশ্নেই ঊর্মিলা হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছিল। ভিতরে গিয়া অসহ্য ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়াছিল, ঐ কথাটা জিজ্ঞেস করতে একটু লজ্জা হ'লো না তোমার? ছি ছি, তুমি মানুষ, না জানোয়ার! নিজের স্ত্রীকে পাওনাদার অপমান ক'রে যায় আর সে কী করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, আবার দাঁত বার ক'রে হাসে?...হাড়ি মুচি-ডোম হ'লেও সহ্য করতে পারত না, তারা নিজেরা মার খায় কিন্তু ঘরের মেয়ের ইজ্জৎ তাদেরও আছে। আমার মাথা মুড়ে খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে...ছি!...এত লোকের মরণ হয় তোমার হয় না! তবু বিধবা হ'লে লোকের দয়া পেতুম, ভিক্ষে ক'রে খেতুম লোকের বাড়ি, নয়ত গতর খাটাতুম, সে-ও এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল!

রাজশেখর এতক্ষণ মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল, শেষের কথাটায় মুখ তুলিয়া আহত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছ, মিলি?

ক্রোধে জ্ঞান হারাইলে প্রকৃতিস্থ হইতে বিলম্ব হয়। ঊর্মিলা

[illegible] খাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিল, হ্যাঁ, করছি! তোমার মত [illegible] বেঁচে থেকে লাভ কি!

রাজশেখর আর কথা বলে নাই, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল মাত্র। কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঊর্মিলার অনুশোচনার সীমা ছিল না। ছি ছি, একী করিল সে! কেমন করিয়া এ কথা সে মুখে আনিল! এই রকম মর্মান্তিক আঘাতেই [illegible] আত্মহত্যা করে, যদি সেই রকমই একটা কিছু করিয়া বসে [illegible]! স্ত্রীর মুখ হইতে এমন কঠিন কথা শুনিলে সেইটাই স্বাভাবিক।.....

অনুতাপে, দুশ্চিন্তায় ক্ষোভে ঊর্মিলার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। তাহার উদ্বেগের সীমা রহিল না। এ কথা যদি কেহ শোনে তাহা হইলেই বা কি বলিবে লোকে তাহাকেই সকলে দোষ দিবে যে! স্বামীর মৃত্যু কামনা—না সে কোনমতে কোনদিনই তাহা করিতে পারিবে না!......

অনেকক্ষণ রান্নাঘরে চুপ করিয়া একা বসিয়া থাকিয়া সে কী [illegible] অস্থিরতায় উঠিয়া পড়িল। মনের মধ্যে আসল কথাটা [illegible] হয় রাজশেখরের খবর লওয়াই কিন্তু বাহিরে পা দিয়াই [illegible] সমস্ত বেদনা সমস্ত উদ্বেগ [illegible] একটা অদম্য উন্মাদ [illegible] হইল। [illegible] এই লোকটিই আত্মহত্যার [illegible] করিতেছিল সে। [illegible] কি তাহারও [illegible] এক সময়ে অপমান বোধ হওয়া সম্ভব কিন্তু এ যে একেবারে পাথর [illegible] কোনদিনই সে [illegible] কোনরকম সম্মান [illegible] বাহির করিতে পারিবেন না। [illegible] নাই [illegible] কি করিয়া হয়।

ঊর্মিলা উপরের [illegible] আসিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। চোখের জল তাহার শুকাইয়া গিয়াছে সে ছিল [illegible] প্রথম দহে। আজ আর চোখে জল আসে না শুধু যেন আগুন বাহির হয়। একটা উন্মাদ অন্ধ ক্রোধ সে পাগলের মত বিছানায় মুখ ঘষিতে লাগিল। ইহার কি কোনও কোন প্রতিকার নাই? কিছুতেই কি ঐ [illegible] সম্ভব নয়?.......

একটা ছেঁড়া বালিশ হইতে অনেক দিন ধরিয়াই কিছু কিছু তুলা বাহির হইতেছে সেলাই করার অবসরও আর তাহার নাই তাহারই কয়েকটা তুলার ডেলা ঊর্মিলার কপালের ঘামের সহিত জড়াইয়া গেল। সেগুলোকে ঘষিয়া তুলিতে গিয়া তাহার নজরে পড়িল বালিশটা—সে দুই হাতে সেটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া সমস্ত তুলা ছড়াইয়া দিল। রাগে সে সত্যই তখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে! তাহার মনে হইতে লাগিল এই সমস্ত বিছানা-বালিশ সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে—বাড়ি ঘরে আগুন লাগাইতে পারিলে সে আরও খুশি হইত—কিন্তু তাহাতে শুধু মহাজনেরই ক্ষতি হইবে যে দুর্দিনে টাকা ধার দিয়াছে নাম মাত্র সুদে—রাজশেখর একবার বোধ হয় ফিরিয়াও চাহিবে না!......

ঊর্মিলা পাগলের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। ইহার প্রতিকার হওয়া চাই-ই যেমন করিয়াই হউক। তাহার ছেলে অনাহারে মরিয়াছে কোলের মেয়েটিও তিলে তিলে শুকাইয়া মরিতেছিল মেয়ের মাসী ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গিয়াছে সে-ও গরীব তবু হয়ত মেয়েটাকে সে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু কেন, কেন ঊর্মিলা এ অত্যাচার সহ্য করিবে! [illegible] কোলের মেয়েকে পরের কাছে পাঠাইয়া বন্ধ্যার মত [illegible] সেই...ঐ নির্মম, স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব লোকটির জন্য কিছুতেই সে এমন করিয়া অপমানের পাঁকে ডুবিয়া থাকিতে পারিবে না, [illegible] তিলে আত্মহত্যা করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে নির্বোধ তাই এতদিন রাজশেখরের প্রেমে বিশ্বাস করিয়াছিল ঐ লোকটি শুধু একটি মাত্র বস্তুকে এতদিন ধরিয়া ভালবাসিয়াছে সে তাহার নেশার। আর সে-ও ত আত্মপরতারই নামান্তর মাত্র।...তাহার জন্য মিছামিছি সকলে মিলিয়া এমন করিয়া লাঞ্ছনা দুঃখ ভোগ করিবে কেন?

না, আর নয়।

আরও কিছুক্ষণ এমনি উন্মত্ত ক্রোধে ছটফট করিবার পর ঊর্মিলার মনে পড়িল সে রান্নাঘরে ডাল চাপাইয়া আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া দেখিল ডালের জল মরিয়া সমস্তটা পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছিল, সে কয়লাও পুড়িয়া এখন ছাই হইয়াছে। কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া সে উনানের আঁচ নামাইয়া দিল, আজ আর সে রাঁধিবে না রান্না করা এ মানসিক অবস্থায় সম্ভব নয়। হউক জবদ, ক্ষুধার অন্ন না পাইয়া অন্তত একটু শারীরিক কষ্ট সহ্য করুক।

সে উপরে আসিয়া আঁচলটা বিছাইয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িল। ছেঁড়া বালিশটার তুলা ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছে অন্য সময় হইলে ঊর্মিলা কিছুতেই এ নোংরামি সহ্য করিতে পারিত না কিন্তু আজ সে জোর করিয়া পড়িয়া রহিল। এ সংসারের জন্য এতটুকু পরিশ্রমেও আর তাহার রুচি নাই। এমন সময়ে কাজকর্ম ফেলিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকাও তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, বিশেষত সেই অপরিসীম মানসিক গ্লানির মধ্যে কিন্তু তবু সে প্রাণপণ চেষ্টায় শুইয়াই রহিল। রাজশেখর বুঝুক একটা দিন যে হাতের কাছে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ঠিকমত না পাইলে শুধু সেতারে দিন চলে কি না।

কিন্তু সত্যই কি রাজশেখর বুঝিবে? হয়ত সে একটু পরে [illegible] নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। কোন বন্ধুর বাড়ি এ বেলাটা কাটাইয়া আবার সন্ধ্যায় আসিয়া সেতার লইয়া বসিবে। নিজেও খাইবে না ঊর্মিলাকেও অনুরোধ করিবে না! এই নিরুপদ্রব অসহযোগের কাছেই ত ঊর্মিলাকে বার বার হার মানিতে হইয়াছে।

অথচ কী-ই বা করা যায়? কেন একটা আঘাত রাজশেখরকে [illegible] পারিলেও প্রাণ পায়। [illegible] না পালে দুঃখ নাই আঘাতে আগুন বাহির হইলেও ঊর্মিলা খুশি হইত। সে যদি এমনভাবে চুপ করিয়া না থাকিয়া ঊর্মিলার সহিত কলহ করিত এমন কি মার ধোরও করিত তবুও হয়ত এত দুঃখ হইত না তাহার এই কুৎসিত, আত্মাবমাননাকর ঔদাসিন্যের অপেক্ষা সে ঢের ভাল ছিল।...

উন্মত্ত ক্রোধ ক্ষয় হইবার উপায় না পাইলে ক্রমাগত হিংস্রতাই বাড়ায়। নিষ্ফল রোষে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিবার পর অকস্মাৎ এক সময়ে ঊর্মিলার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে একেবারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু তবু যে কল্পনা আভাসে মাত্র দেখা দিয়াছে তাহার হিংস্রতা এতই উগ্র যে, সে নিজেই যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে যে রাজশেখরকে এতবড় আঘাত দিবার কথাটা কল্পনা করিতে পারিয়াছে—সে কথাটা সম্পূর্ণ ধারণা করিতেই তাহার কিছু সময় লাগিল!

কিন্তু হউক হিংস্র, তবু এই-ই তাহার একমাত্র পথ। রাজশেখর বাহির হইয়া গেলে সেতারগুলো সে আজ ভাঙিয়া দিবে।

সামান্য ক্ষতি নয়, একেবারে গুঁড়াইয়া শেষ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে আর কোনদিনই কোন রকমে তাহাদের সারানো না যায়।

পৃথিবীর সমস্ত কিছুর দিকে পিছন ফিরিয়া, দয়া-মায়া-ভালবাসা সম্মানবোধ সব বিসর্জন দিয়া সে একমাত্র যাহাকে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাকেই নষ্ট করিয়া মূলে আঘাত করিতে হইবে। তিল তিল করিয়া সে এই সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, নিখুঁত করিয়াছে—সেই সমস্ত স্বপ্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে একই আঘাতে [illegible] না করিতে পারিলে চলিবে না, আর কোন পথ, কোন উপায় খোলা নাই ঊর্মিলার চোখের সামনে।

রাজশেখরের মুখের চেহারাটা কল্পনা করিয়া এক প্রকারের হিংস্র আনন্দে ঊর্মিলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।—তখন নিশ্চুপ থাকিতে পারিবে কি সে? সেইটাই ঊর্মিলা দেখিতে চায়।

হয়ত পাগল হইয়া যাইবে। এই রকম আকস্মিক আঘাতেই মানুষে পাগল হয়, কিংবা হয়ত রাগে জ্ঞান হারাইয়া ঊর্মিলাকে প্রহারই করিবে। চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু পরিণাম যাহাই হউক, ঊর্মিলা তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। রাজশেখর যদি রাগের চোটে ঊর্মিলাকে হত্যা করে তাহাতেও আনন্দ পাইবে ঊর্মিলা, বুঝিবে তবু এতটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে—

ঊর্মিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে উত্তেজনায় স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। আর এক মুহূর্তও দেরী সহিতেছিল না তাহার। রাজশেখর কি আছে এখনও?

পা টিপিয়া টিপিয়া যেন কিসের একটা আশঙ্কায় সে নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। রাজশেখর সত্যই বাহির হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে একবার। তাহার পর ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

স্বামীকে ঊর্মিলা ভাল করিয়াই চেনে। এ বেলা আর রাজশেখর ফিরিবে না, স্বচ্ছন্দে সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় কোথাও আড্ডা দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরে আবার সেতার লইয়া বসিবে। যদি তিন দিন ঊর্মিলা রান্না না করে, তবু এই ধারার ব্যত্যয় ঘটিবে না।...

সে বাহিরের ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। বহু দিন, বোধ হয় দুই বৎসর সে এ ঘরে ঢোকে নাই। আগে বন্ধু বান্ধবেরা চলিয়া গেলে রাজশেখর তাহাকে এই ঘরেই ডাকিয়া বসাইয়া বলিত, হাঁ রাণীজী, অব, আপ ফরমাইয়ে। কোনটা বাজাবো বলো—

সে হাত দিয়া তিনটা সেতার দেখাইয়া দিত। তাহার পর ঊর্মিলার নির্দেশ মত একটা তুলিয়া লইয়া বাজাইতে বসিত—গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিত তাহার বাজনা একটি মাত্র শ্রোতাকে উপলক্ষ্য করিয়াই। কোন কোন দিন পরবের দিন বিশেষ করিয়া ছাদে গিয়াও বসিত।....

ঊর্মিলার অজ্ঞাতে একটা নিঃশ্বাস পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। না, দুর্বল হইয়া পড়িলে চলিবে না। সে কতকটা জোর করিয়াই চাহিয়া দেখিল, ইস্—কী নোংরাই হইয়া আছে বাহিরের ঘরটা। শতরঞ্চিটা শত ছিন্ন, তাহার উপর ধূলাই জমিয়া আছে বোধ হয় এক ইঞ্চি। মধ্যে মধ্যে রাজশেখর নিজেই ঘরটা পরিষ্কার করে ঊর্মিলা জানিত; কিন্তু সে যে এই পরিষ্কার করা—তাহা সে জানিত না। রাজশেখর নিজে বিড়ি খায় না, কিন্তু অভ্যাগতদের পরিত্যক্ত বিড়ি ও সিগারেটের কুচি বোধ হয় লাখ খানেকেরও বেশী মেঝেতে ছড়ানো আছে। ছি ছি, কলিকাতা হইতে যে-সব লোক আসে, তাহারা কি মনে করে! মনে মনে নিশ্চয় ঊর্মিলাকেই দোষ দেয়। না, এ রোগের আজই শেষ করিতে হইবে।

সে তক্তপোষের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সর্বাপেক্ষা দামী সেতার যেটি, সেইটিই পাড়িয়া লইল। আগাগোড়া হাতীর দাঁতে সমস্তটা বাঁধানো, আকৃতিও ইহার যেমন বিশাল সুরও তেমনি মধুর। ঊর্মিলার মনে আছে—এই সেতারটাই রাজশেখর ফুলশয্যার রাত্রে তাহাকে বাজাইয়া শুনাইয়াছিল। প্রথম কৈশোরের স্বামী সম্ভাষণের স্বপ্নের সহিত সেটা ঠিক না মিলিলেও সে অপূর্ব সুর-গুঞ্জনে ঊর্মিলা সেদিন মুগ্ধই হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল যে, দেবতার হাত দিয়া এই সুরের ধারা নামিয়া আসিতেছে, তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ উৎসর্গ না করিলে তাঁহার পূজা হয় না, তাঁহার রথচক্রতলে যদি কৈশোর-যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন পিষিয়া যায় ত যাক!

তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অভিনয়ই চলিয়াছিল। রাতের পর রাত যখন নব-বিবাহিত দম্পতীর শুধু প্রণয়গুঞ্জনে কাটিবার কথা, তখন চলিত তাহাদের বাসর শয্যায় সেতারের গুঞ্জন

আত্মীয়েরা হাসাহাসি করিয়াছেন, বাহিরের লোকও [illegible] করিয়াছে, কিন্তু তবু তাহার জীবনের বসন্তরঞ্জন সেদিন যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল, এমন কথা ত ঊর্মিলা বলিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কোন কোন দিন বা সারারাত্রি শুধু মাত্র একটি শ্রোতাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে সুরের ইন্দ্রজাল রাজশেখর রচনা করিত তাহাকে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা বলিয়াই ত ঊর্মিলা গ্রহণ করিয়াছে! হয়ত সারা দিনের জমিয়া রাখা অনেক কথা বলা হয় নাই, হয়ত বা মনের বহু কামনা অপূর্ণ থাকিয়াই রাত পোহাইয়া গিয়াছে, তবু কিন্তু সেদিন ঊর্মিলা সুখীই হইয়াছিল!........

ঊর্মিলা সেতারটা হাতে করিয়া সেই মলিন ছিন্ন শতরঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। তাহার এই অভিশপ্ত জীবনে যে কটা দিন সে সুখের মুখ দেখিয়াছিল তাহার স্মৃতির অনেকখানিই জড়াইয়া আছে এই সেতারটা বা এই সেতারগুলির সঙ্গে। মনে আছে, একদিন হাসিয়া সেতার শুনিতে শুনিতে সে রাজশেখরকে বলিয়াছিল, এই সেতারটার ওপর আমার বড় রাগ কিন্তু!

হাসিয়া রাজশেখর বলিয়াছিল, কেন মিলি?

মিলি জবাব দিয়াছিল, আমার কেবলই মনে হয়—তুমি আমার চেয়ে ঐ সেতারটাকে বেশী ভালবাস। ওটা আমার সতীনেরও বেশী শত্রু।

রাজশেখর বলিয়াছিল, দিব্যি, সত্যিই তুমি রাণীজী [illegible] চেয়ে তোমাকেই বেশী ভালবাসি। তার প্রমাণ চাও? তুমি এক একদিন রাতে বাজনা শুনতে শুনতে যখন ঘুমিয়ে পড়, তখন সেতারটা এখানে রেখে আগে তোমাকে কোলে করে [illegible] রেখে আসি, তারপর সেতারটা তুলে রাখি।

ঊর্মিলা বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল, [illegible] বিশ্বাস হয় না। সেতার রেখে তুমি আমাকে আগে নিয়ে যাও... যে সেতার তোমার প্রাণ!

রাজশেখর শুধু জবাব দিয়াছিল, তুমি ঠিকই বলেছ মিলি, সেতার আমার প্রাণ বটে কিন্তু তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি যে!

সামান্য কথা, তাহার পরই রাজশেখর আবার সেতারটা তুলিয়া বাজাইতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু সেই দুটি কথাতেই [illegible] ঊর্মিলার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে জানিত যে রাজশেখর সেদিন মিথ্যা বলে নাই।

কথাগুলো মনে পড়িতেই ঊর্মিলা শিহরিয়া উঠিল। সেতার রাজশেখরের প্রাণ, সেই প্রাণ নষ্ট করা মানে, স্বামী [illegible] না করা সম্ভব নয়।

শুধু কি তাই! এই সেতারগুলি ত তাহাকে শুধু আনন্দই দেয় নাই। শোকে, দুঃখে, দারিদ্র্যের বেদনাতেও সান্ত্বনা দিয়াছে। কত অভিমান, কত আঘাতের মালিন্য, স্বামী তাহার অজস্র সুরের ধারায় ধোয়াইয়া নিয়াছেন। খোকা যেদিন মারা যায়, সেদিন সে শোকে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজশেখরকেও কথা কহিতে বলে নাই, রাজশেখর নীরবে চোখের জল মুছিয়া সেতারটা হাতে করিয়া ঊর্মিলাকে বলিয়াছিল, তোমার পায়ে পড়ি মিলি, তুমি একটু মিনিট শোন, অনেক হালকা হয়ে যাবে বুকটা।

সেদিন সে নিজের বুকের সব বেদনাই বোধ করি সেতারে ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহার স্বামীর হাতেও অমন বাজনা ঊর্মিলা আর কোনদিন শোনে নাই। প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া একটি গৎ বাজাইবার পর রাজশেখর ঊর্মিলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মৃদু কণ্ঠে শুধু ডাকিয়াছিল মিলি, আমাকে ক্ষমা করতে পারলে?

সেদিন অজস্র অশ্রুজলের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বুকে বুক রাখিয়া যে অসীম আনন্দ পাইয়াছিল, যে সান্ত্বনা মিলিয়াছিল

(শেষাংশ ৫৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, ভূপর্যটক

৯

প্রিটোরিয়া তথা সমুদয় দক্ষিণ আফ্রিকার ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ ইউরোপীয়ান এবং নিগ্রোরা তাদের নিজেদের উপার্জিত টাকা দিয়ে আগুনে কিনে খাবার একমাত্র কারণ হলো—দক্ষিণ আফ্রিকা এখনও স্বাধীন হতে পারেনি এবং একটা জাহাজও পত্তন করতে সক্ষম হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অশ্বেতকায়দের ওপর অত্যাচার অবিচার চলবেই; কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকাতে দ্বৈত শাসনের প্রচলন রয়েছে। পৃথিবীর যে স্থানেই বৃটিশের কমনওয়েলথ শাসনের প্রচলন আছে তথায়ই পরাধীনতার গোপন ছাপ রয়েছে। দ্বৈত শাসন কিরূপ তা অনেক সময় দূর হতে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু কাছে গেলে তা দেখতে পাওয়া যায় এবং সুন্দর করে অনুভব করাও যায়। দ্বৈত শাসনের নমুনা বলবার পূর্বে আমাকে কতকগুলি কথা বলতে হবেই এবং পাঠকদের দয়া করে তা শুনতে হবেই।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হই। আমার ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে আরও ছয় মাস থেকে সেই স্থানটির আরও সংবাদ যোগাড় করি, কিন্তু স্বদেশবাসী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস আমার সে দেশে থাকা পছন্দ করেননি। সেজন্যই আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলে আসতে হয়। এখানে যেন কেউ ভুল না করে বসেন যে এই ছোট কথা দ্বারা হয়ত প্রমাণ করলেন সেই প্রতিষ্ঠান একজন ভূপর্যটকের বিরুদ্ধাচরণ কিরূপে করতে পারে? উত্তরে বলব—এখন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত নীতি পালন করে না সেজন্যই মণিলাল গান্ধী সেই প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাগ করে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গড়ে তুলেছেন। আমি এখন উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলতে পারি—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রতিনিধি নয়, প্রকৃত পক্ষে তারা Dog in the manger নীতিতেই চলছেন। কথা প্রসঙ্গে তাই বলা হবে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর সুখ সুবিধা দেখবার ভার নিতেন তবে পেগিং বিল আজ কোনকালেই পাস হতো না। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পদানতই রাখতে চান এবং বৃটিশ পুঁজিবাদীদের দালালী করতে চান। এই ভাবটি আগাগোড়া পোষণ করেন বলেই আজ পেগিং বিলে দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্ট ভোটে মেজরিটি হতে সক্ষম হয়েছে। কমনওয়েলথ পরাধীনতার সূক্ষ্ম প্রতীক। যে কমনওয়েলথ স্থাপন করে বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশকে স্বাধীন দেশ বলে বড় কথা উচ্চস্বরে বলেন সেই কমনওয়েলথকেই জাপানীরা আরও একটু ভাল নাম দিয়েছে এবং সেই ভাল নামকে জাপানীরা Co-operation বলছে। এখন সেই কো-অপারেশন অথবা কমনওয়েলথ হতে মুক্ত হবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাতে কেমন একটা ভাবধারা গজিয়ে উঠেছে তা দৃষ্টান্ত দিয়েই বলব। থিয়রী আমি বলতে পারি না; কারণ থিয়রী বলা আমার দ্বারা হয় না।

অন্ধকার রাতে কোথাও যাওয়া আসা আমার মোটেই ভাল লাগে না—এ কথা অনেকেই টের পেয়েছিল, কিন্তু আজ অন্ধকার রাতেই একখানা সুন্দর মটরকার এসে আমার বাসস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো হর্ন দিল। আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম। মিঃ লসমন এসেই আমাকে পোষাক পরতে বললেন। আমি পোষাক পরে নেবার পর যখন মটরে বসলাম তখন দেখলাম দু'জন ইউরোপীয়ান মোটরের সামনে বসে আছে। একজন মোটর চালাচ্ছে অপর জন তার কাছে বসে আছে। এরা আমাদের এক সঙ্গে বসলো না তাই এদের বসার ধরণ দেখে বুঝেছিলাম, তবে মোটরে বসা মাত্র আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে তাতে আগুন পর্যন্ত ধরিয়ে দেওয়ায় আমার মনে হয়েছিল—এরা আজ আমার কাছ হতে কিছু আদায় করবেই; কিন্তু আমার কাছ হতে কি নেবে তাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। আমি চুপচাপ করেই বসে ছিলাম।

পথে লসমন আমাকে কয়েকটি কথা বললেন; তা যদিও ইডিশতেই বলেছিলেন কিন্তু কিছুই বুঝতে সক্ষম হইনি। গাড়ি একটানা পথে চলে ইউরোপীয় শহরে গিয়ে হাজির হল এবং হঠাৎ একটা মোড় ফিরে একটি প্রকাণ্ড বাড়ির কাছে দাঁড়াল। মোড় ফেরার বেলা আমার মাথা লসমনের কানে লাগায় লসমনের কান কেটে রক্ত বের হয়েছিল। বিষয়টা বড়ই এলোমেলো হয়ে গেল। লসমন কানের ব্যথায় কতক্ষণ কথাই বলতে সক্ষম হননি।

ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে আছেন। লসমন আমাকে সামনের একটি সিটে বসিয়ে দিয়ে কান ব্যাণ্ডেজ করবার জন্য চলে গেলেন, বলে গেলেন,—তিনি না আসা পর্যন্ত যেন আমি কিছুই না বলি। আমিও তাঁর না আসা পর্যন্ত মুখ খুলিনি। লসমন আসবার পূর্বেই সভার কাজ শুরু হয়ে যায়। সভাতে সকলেই ডাচ ভাষায় কথা বললেন। ডাচ ভাষা অনেকটা জার্মান ভাষার মতই। লেকচার অতি অল্পই বুঝতে পেরেছিলাম। যেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম তাতে মনে হলো—এরা সবাই বৃটিশ বিদ্বেষী এবং বৃটিশ আর্থিক বশ্যতা হতে মুক্তি পেতে চায়। বৃটিশ আর্থিক বশ্যতা হতে মুক্তি পেতে হলেই তাদের নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে হবে। আত্ম করবার জন্য জাহাজের দরকার হবে আকাশ-যান এবং বর্তমান প্রথা মতে সাজোয়া বাহিনী গড়তে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার আর্থিক অভাব নেই আছে শুধু সাহসের অভাব। কি করে সাহস আসে, কি করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে একদম স্বাধীন করা যায়, এই সভা তাই নির্ণয় করবার জন্য বসেছিল। এই সভাতে যারা এসেছিলেন তারা সবাই জেনারেল হার্টজগ-এর মত পথ পালন করতে ইচ্ছুক এবং হার্টজগ যাতে প্রধান মন্ত্রী হয়ে দেশকে স্বাধীন করেন তাই এখানকার সভ্যদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এরূপ সভায় আমার উপস্থিতির যে কি দরকার তার কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না; তবে এঁরা যে আমাকে বসতে দিয়েছেন সেজন্যই আমি গর্ব অনুভব করছিলাম।

লসমন ফিরে এসে আমারই কাছে বসেছিলেন এবং তাঁকেও দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন বন্ধুগণ আপনারা যদি মনে করেন—ভারতবাসী আপনাদের স্বাধীনতা পাওয়ার দিক দিয়ে বাধা দিচ্ছে তবে তিনি দুঃখিত হবেন। স্থানীয় ভারতীয় ধনিক শ্রেণী হয়ত আপনাদের স্বাধীনতা পাবার অন্তরায় হতে পারে, কিন্তু স্থানীয় ভারতীয় মজুরগণ সেদিকে মোটেই যাবে না। মাইনরিটির স্বার্থ রক্ষার্থ যদি বৃটিশ দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধের সৃষ্টি করে তবে ভারতীয় মজুর এবার আপনাদের সহায় হবে। নিগ্রো, বান্টু এবং কালার্ড মানও এবার আপনাদের সাহায্য করবে।' ভারতবাসী পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ স্বাধীন দেখতে চায়।

সভার কাজ শেষ হবার পূর্বে মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমাকে ডাকালেন এবং বললেন আফ্রিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে

পক্ষ হয়ে আমার যদি কিছু বলার থাকে তবে বলতে পারি। আমি বলেছিলাম, যেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সর্বসাধারণ পেয়ে যায় সেখানে কোন রকমের অন্যায় চলতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থনীতির স্বাধীনতার জন্য যদি সংগ্রাম করে তবে কোন ভারতবাসী তাতে বাধা দেবে না, বরং সাহায্য করবে। আমি এর বেশী কোন কথা বলতে চেষ্টাই করিনি, কারণ এখানে বাজে কথার কোনও মূল্যই নেই। যার অঙ্কুর গজিয়েছিল বহুপূর্বে তার ফল হয়ত একদিন ফলবেই। দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ত একদিন সত্যিকারের স্বাধীনতাই অর্জন করবে। সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কোন কষ্ট থাকবে না।

ডোমিনিয়ন দল চায় কালো এবং অন্যান্য এশিয়াবাসীর উপর পুরোদমে কড়া শাসন চালাতে। এরূপ অন্যায় শাসন চালাতে হলেই অপরের সাহায্যের দরকার। তাই তারা বৃটেনের উপরই নির্ভর করে থাকে। কিন্তু যারা স্বাধীনতা চায় তারা বুঝতে পেরেছে—অশ্বেতকায়দের স্বাধীনতা না দিলে তারা নিজেরাও স্বাধীন হবে না। এই সভার সভ্যেরা এই মতই পোষণ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনেকগুলি দল আছে। একদল লোকের সঙ্গে আমার জোহনবার্গে দেখা হয়। তারা আমার প্রতি বেশ অত্যাচারও করেছিল। তাদের আমি খারাপ কোন মতেই বলতে পারব না। যারা ন্যাশনেলিজমের মদিরা পান করে পাগল হয়েছে তারা পাগল হতেও অধম। তারা চায় শুধু শ্বেতকায় দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকুক এবং কালাদের উপর রাজত্ব করুক। এই রাজত্ব করার মাঝে বৃটিশের কোন হক নেই। বৃটিশকে দক্ষিণ আফ্রিকা হতে একেবারে তাড়াতে হবে। বৃটিশ প্রাধান্য যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকে তবে তারা পুরোপুরিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ধন-দৌলত উপভোগ করতে সক্ষম হবে না। এরাই ন্যাশনাল সোসিয়ালিজম চালাতে চায়। এদেরই প্ররোচনায় ভুর-ট্রেকার দল কেপটাউন হতে প্রিটোরিয়ার দিকে রওনা হয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে নানারূপ মন্তব্য পাশ করার পর সভার কাজ শেষ হয়।

রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। আমরা সভা হতে ফিরে এসে আরাম করে ঘুমিয়েছিলাম। লছমন সে রাতে আর নিজের ঘরে যায়নি, আমার এখানেই শুয়েছিল। বেলা তখন বোধ হয় ছটা হবে এমনি সময় পুলিশ এসে জানাল সাড়ে সাতটার সময় যেন আমি ইমিগ্রেশন বিভাগে গিয়ে উপস্থিত হই। আমাদের দেশের পুলিশ দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়ি। পুলিশের প্রতি আমরা কটুবাক্য নিক্ষেপ করি না। আমরা জানি পুলিশের প্রতি কটুবাক্য নিক্ষেপ করা আর যমের বাড়ি যাওয়া একই কথা। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সেরূপ চিন্তা করার কিছুই নেই। সামান্য কনেস্টবল ত দূরের কথা বড় বড় পুলিশ কমিশনার পথের লোককে সালাম ঠুকে আত্মরক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় তারা পাপী। সে কথার অনুভূতি ক'জন ভারতবাসী উপলব্ধি করেছেন? দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র ত দূরের কথা—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সেই কথা বেশ ভাল করেই বুঝেছে। যখন দেখা গেল—পুলিশ অন্যায় করছে অথচ কিছুই করে উঠতে পারা যাচ্ছে না তখন সেই অন্যায়ের একমাত্র প্রতিকার হলো—অস্ত্রের ব্যবহার। সেজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশগণকে অনেক সময় তাদের নিজের আড্ডায়ই আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাতে দেখা যায়। অন্যায় সহ্য না করে নিজের প্রাণের বিনিময়ে তার প্রতিকার করা হচ্ছে।

ছটার সময় এসে ডাক-হাঁক করা বড়ই অন্যায়। লছমন ঘর হতে বের হয়েই যেই পুলিশের কাছে গেল অমনি পুলিশ অবনত মস্তকে জানাল, এই ঘরেতে লছমন থাকেন সেকথা সে জানত না, সেজন্য সে ক্ষমা চাইছে। ভূপর্যটক দিনের বেলায় ঘরে থাকেন না বলেই সকাল বেলাতে এসে জানাতে চাচ্ছে তিনি যেন আজই একবার দয়া করে ইমিগ্রেশন অফিসে যান। লোকটির দীনতা দেখে আমার দয়া হলো। আমি তাকে বললাম, "আমিই রামনাথ বিশ্বাস, কিছুক্ষণ পর যাচ্ছি।" লোকটি আমার পরিচয় পেয়ে আমার হাতে তৎক্ষণাৎ একটি সিগারেট গুঁজে দিল। বুঝলাম—এত সকালে আসার জন্য সে লজ্জিত এবং দুঃখিত।

ইমিগ্রেশন অফিসে যাবার পর দুজন ভারতীয় দোভাষী আমার কাছে বসলেন। ওঁদের হাব-ভাবে বুঝলাম ওঁরা আমার প্রতি সদয় নন। সকালে শ্বেতকায় পুলিশ বেচারীর দুরাবস্থা দেখে আমার দয়া হয়েছিল এখন এদের অবস্থা দেখে আমার রাগ হলো। আমি চুপ করে বসে অনবরত সিগারেট ফুকতে লাগলাম। এ দুজন ভারতীয় দোভাষী তাদের মনিবের সামনে সিগারেট খান না। আমি সিগারেট খাচ্ছি দেখে তাঁদের বেশ রাগ হয়েছিল এবং একজন বলেছিলেন,—এখানে সিগারেট ফুকা নিষেধ।

তদুত্তরে আমি বলেছিলাম,—ঐ দেখ তোমাদের মনিব ঠাকুর সিগারেট খাচ্ছেন।

এর পর আর কোন কথা হলো না। অফিসার আপন কাজ শেষ করে বেশ ভদ্রভাবে আমার সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বললেন। আমি তাঁকে জানালাম—ছয় মাস উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা পরিত্যাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। উচ্চবাচ্য না করে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু ঐ দুটি লোক আমার পেছন নিলেন। এঁরা নামতঃ দোভাষীর কাজ করেন কিন্তু আসলে তাঁরা গুপ্ত-পুলিশই। এঁদের সবাই ঘৃণা করে এবং কেউ এঁদের নিজেদের বাড়িতে ডেকে আনে না। কংগ্রেস মহলে এঁদের বেশ নাম আছে, কারণ তাঁরা কংগ্রেসের অনুগত এবং এঁরা সর্বদাই চেষ্টা করেন যাতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় মজুর বসবাস না করতে পারে।

ক্রমশ



জীবন

শ্রীসুকুমার রায় এম, এ

(১)

বিভিন্ন লোকে এ জীবনকে বিভিন্নরূপে দেখে, বিভিন্ন সবারই দৃষ্টিকোণ। কেহ বলেন, এই নরদেহের ভিতরেই আর একটি বিভিন্ন রকমের সত্তা আছে। যাঁহারা বলেন এবং প্রাণ দিয়া ইহাকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহাকে বিশেষ মূল্য দেন। রমেশ কিন্তু এরূপ বিশ্বাস করিত না। এ সম্বন্ধে তাহার অনুসন্ধিৎসা সামান্যও ছিল না।

হস্টেলে আসিবার পরদিন হইতেই ভোলাদাদা তাহাকে চিনিয়া লইলেন। ভোলানাথ সবাইকেই আপনার করিতে পারিতেন, এজন্য তিনি সরকারী-দাদারূপে পরিণত হইয়াছিলেন। মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রদের তিনি দাদা, হাসপাতালের নার্সদের দাদা, রোগীদের দোকানদারদের—এমন কি কোনও কোনও নতুন শিক্ষকদেরও তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে শুনা গিয়াছে। ভোলাদাদা কতদিন হইতে জানা যায় না, মনে হয় অনাদিকাল হইতে মেডিকেল ইস্কুলে পড়িতেছেন। অনেক সাধনা করিয়া পরীক্ষা পাশের বেড়া ডিঙাইয়া ফোর্থ ইয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এখানে আসিয়া পরীক্ষাটা যেন গলায় কাঁটার মত ফুটিয়া গিয়াছে। এ দিকে বয়স বাড়িয়া চলিল, তিনি এখন কঠোর সাধনায় বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন যে মানুষের এ জীবন হইতেও স্বতন্ত্র আর একটি জীবন আছে। ইহার অনুভূতি হয় কুণ্ডলিনীর জাগরণ দ্বারা। ভোলানাথ এই আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যাহাকেই যাহাকিছু বলিয়াছেন সকলি ব্যর্থ হইয়াছে—সকলেই বিদ্রূপ করিয়াছে। তবুও ইহাই তাহার জীবনের সাধনা।

রমেশ যেদিন আসিয়া ভোলাদাদার তক্তপোষের পাশেই স্থান করিয়া লইল, ভোলাদাদা অসংখ্য কৌপীনের স্তূপ হইতে মুখ বাড়াইয়া সামনে আসিয়া বসিলেন এবং একটি চিমটি কাটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু বুঝতে পারো?

রমেশ ভোলানাথকে পূর্ব হইতে চিনিত, বলিল হাঁ, একটি চিমটি।

আমি যা বলতে চাই তার কিছুই বুঝতে পারো নি। তোমরা শরীরের ওপর যা-কিছু ঘটে তাকেই বলো একটা দেহ তত্ত্বের ব্যাপার অথবা ফিজিওলজিকেল একটা কিছু বা বড় জোর মনস্তত্ত্বের। আমি বলি—মানুষের এ জীবনের ভেতরেও একটা জীবন আছে, আছে একটা শক্তি। তাকেই বুঝতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য এরূপই হওয়া উচিত।

রমেশ বলিল, কি হবে সে সব বুঝে?

হুঁকায় একটি গভীর টান দিয়া অতিশয় তৃপ্তির সহিত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কি হবে? সত্যকার জীবনটাকে জেনে কী হবে, এই তো? সুখ দুঃখ একাকার হবে, প্রাণ হবে মুক্ত বায়ুর মত —আর একটি স্বতন্ত্র জীবনের সন্ধান পেলে তুমি হবে প্রকৃত মানুষ।

আপনি কি বলতে চান সংসারে সব লোক প্রকৃত মানুষ নয়? আর কারও ভেতরে প্রকৃত জীবন নেই?

ভোলানাথ আবার রমেশের মুখের সামনে মুখ বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বুদ্ধি তোমাদের যে কোথায় আছে—ভগবান জানেন। আমি ওসব কিছুই বলিনি। শুধু বলুম, প্রকৃত জীবনকে যদি জানতে চাও, তবে এসো আমার সঙ্গে—শান্তি পাবে, মনের ও আধ্যাত্মিক দেহের অখণ্ড শক্তি লাভ করবে। যদি বিশ্বাস করো তবে চলো তোমাকে সিদ্ধি-বাবার কাছে নিয়ে যাই।

রমেশ এবার বুঝিল। বলিল, চাই না আমি কোথাও যেতে। বরং দুজনায় এই রুমে থেকে বেশ করে ভাবের আদান প্রদান করা যাবে। আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব আমি।

ভোলাদাদা এবার পরম তুষ্টি লাভ করিলেন। এমন কথা আর কাহারও নিকট হইতে তিনি শুনিতে পান নাই। ভাবিলেন, সত্যই বুঝি একটা ভাল শিষ্য জুটিল। ইহার পর হইতে ভোলানাথ নিশ্চিন্তে রমেশের সঙ্গে অধ্যাত্ম আলোচনা করিতেন। রমেশ কিন্তু এ জীবনের ভিতরে আর একটা স্বতন্ত্র জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারিত না। রমেশকে ইহা বুঝাইবার জন্য ভোলানাথের কিন্তু অসামান্য আগ্রহ। ভোলানাথ তাহার জন্য ফল, মূল, ভাল খাবার ইত্যাদি আনাইয়া রমেশকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর রমেশ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বটিকে কতক্ষণের মধ্যেই ত্যাগ করিয়া মনোযোগের সহিত বইগুলি পড়িতে আরম্ভ করিত। পড়াটাও ভাল করিয়া জমিত। আর অন্যদিকে ভোলানাথও যোগ-যাগ করিয়া তাহার শক্তি দেখাইতে চাহিতেন। দেখিতে দেখিতে দুবৎসর কাটিয়া গেল রমেশ ভোলাদাদার সহপাঠী হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে রমেশ সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে। ভোলানাথ যেমনটি ছিলেন, তেমনটিই রহিয়াছেন। তবে রমেশের উপর বর্তমানে তাহার ঝোঁক পড়িয়াছে অধিক, আর যাহাই হোক রমেশকে তাহার পথের পথিক করিতে হইবেই। রমেশ কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিতেছে না—এ জীবনের ভিতরকার আর একটা রহস্যময় জীবন।

ফোর্থ ইয়ার ক্লাস চলিয়াছে। রমেশ সেখানে প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র কাজেই তাহার সঙ্গীর অভাব নাই। সেদিন ক্লাসে সে বলিয়াই ফেলিল যে ভোলাদাদা তাহাকে এমন একটি মানসিক শক্তি দিয়াছেন, যে জন্য সে পরীক্ষায় অবার্থভাবে মেডেল পাইয়া উত্তীর্ণ হইবে। সন্ধ্যায় যখন ফিরিল তখন ভোলানাথের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সকলেই ফিরিয়া গিয়াছে। ভোলানাথ গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন। রমেশ ঘরে পা দিতেই ভোলানাথ বলিলেন, আচ্ছা রমেশ তুমি কারকাছে এই মিথ্যে বলে আমাকে এমন অপ্রস্তুত করলে।

রমেশ অবাক হইল কী রকম?

এই সমস্ত লোককে বলে বেড়াচ্ছ যে তুমি আমার শিষ্য। তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার শক্তি পেয়েছ আমারি নিকট থেকে—অথচ তুমি আমার শিষ্যও নও,—কিছুই আমার কাছ থেকে পাওনি। লোকদের যতই একথা বলি ততই তারা ছুটে এসে আমাকে চেপে ধরে।

রমেশ বলিল, ভালইতো হল। আপনার শিষ্য জুটিয়ে দিলাম অনেক। আমাকে ভাগ দিতে হবে যে।

ভোলানাথ গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন তোমার নিকট থেকে সে বিদ্রূপ আশা করি না রমেশ। আমার এই সাধনার জন্যে ফোর্থইয়ারের পরীক্ষাটা পর্যন্ত বিসর্জন দিলাম, সেটা হাসি খেলার বস্তু নয়।

রমেশ এবার ভোলাদাদাকে আশ্বাস দিল দাদা শুনুন। আমি আপনার শিষ্য না হলেও ভক্ত তো বটে। ভক্তকে ক্ষমা করুন। আর যাই বলুন, আপনি দরজা লাগিয়ে বসে জপ তপ করেন বলেইতো এখানে আড্ডা চলে না, আমারও পড়াশুনা জমে।

ভোলানাথ বলিলেন শুধু তাই নয় রমেশ আমি দেহের ভেতরে যে আর একটা স্বতন্ত্র জীবন দেখতে পাই, তাকে দেখতে গিয়ে এক

অপূর্ব শক্তি লাভ করি। আমার সেই মনোজগতের শক্তি তোমার কল্যাণের জন্য তোমার ওপরেও প্রয়োগ করি। তুমি সাফল্য লাভ করবে একথা নিশ্চিত।

ইহার পর আর রমেশ জবাব দেয় না। আধ্যাত্মিক অদৃশ্য জীবনের অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করিতে পারে না। অন্তত চিকিৎসা শাস্ত্রে দেহ ও মনের চিকিৎসা ব্যতীত আর কিছুই সে লাভ করে নাই। শুধু ভাবে, হয়ত বা ভোলাদাদার একটা কোনও প্রকারের শক্তি আছে। বাহিরে রমেশ ভোলানাথের অদ্ভুত সাধনার কথা লোক সমক্ষে বলিয়া বেড়ায়, আর তাহা শুনিয়া ভোলানাথের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য নানা লোক ছুটিয়া আসে।

এমনি তো দিন বেশ কাটিয়া যায়। সেদিন সারাটা বেলা বসিয়া ও ঘুমাইয়া কাটিয়াছে, রমেশের মনটি মোটেও ভাল নয়! অবশ্য মনেরও এমন অবস্থা আসা উচিত যে এক সময়ে কিছুই ভাল লাগিবে না, কারণ অন্য সময়ে সংসারের সব কিছুই ভাল লাগে। ভাল লাগা আর না লাগা এই লইয়াই জীবনের যা কিছু কাজকর্ম মান প্রতিষ্ঠা সাধনা তপস্যা। এজন্য ভোলাদাদা আনন্দের কথা বলেন। মনটা তাহার সদানন্দময়। বোধ হয় মানুষের এই সুখ দুঃখের পরিপূর্ণ জীবনের অন্তরালে চির আনন্দ লাভ করিবার মত আর একটি জীবন আছে এবং সেখানে মানুষ স্বতন্ত্র আদর্শকে খুঁজিয়া পায়। হয়ত তাহাই জীবনকে আনন্দের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে নতুন অনুভূতি জাগে। নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিল। পরদিন ভোরে চা খাইয়া ভোলানাথকে রমেশ বলিল, দাদা আমার ভেতরে যেন কিরূপ একটা বিশ্বাস ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে! মানব জীবনের আর একটি স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ভোলাদাদা আগ্রহে তাহার উপরে আসিয়া পড়িল প্রায়, এবং বলিল ঐ তো—এ হচ্ছে সুসঙ্গের ফল। আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারবে। কুণ্ডলিনীও জাগবে—আর বুঝবে তোমাদের এই ফেলকরা হাস্যাস্পদ ভোলাদাদাটির কথাতে কত বড় খাঁটি সত্য আছে।

রমেশ হাসিয়া বলিতে লাগিল কখনো মনে হয় বাস্তবিক আর একটি আনন্দময় জীবন লাভ করলেই শান্তি।

আলবৎ শান্তি। অনন্ত এই অশান্তির শেষ। বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ। কি বলছি এতদিন ধরে—মোটে বুঝতেও পারছ না। ঠিক এই কথাটিই। কে বলে তোমাকে সাধু হতে? সাধু হতে হবে না। যেমনি আছো তেমনি চলো। চা খাও নার্সদের সঙ্গে কাজ করো, পড়ো প্রেম করো, পাশ করো চাকরী নাও কিন্তু বিশ্বাস করো। বিশ্বাসেই সব মিলে। এমন উদার পথ আর পাবে না। তখন যা করবে—সব অসার মনে হবে। এসে বসো, আরও কয়েকটি কথা বলি।

বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে রমেশ উঠিয়া পড়িল তারপর মিট মিট করিয়া তাকাইয়া বলিল, দেখি ধরে চিন্তা করে আসি, তারপর আপনার শিষ্য হব। অন্তত বিশ্বাস করতে শিখব।

রমেশ ভোলাদাদাকে আশ্বাস দিয়া অবশেষে বাহির হইয়া পড়িল—হাসপাতালের দিকে। কথায় কথায় ভোলাদাদাকে আজ কথা দিয়া আসিয়াছে। ভোলাদাদা কিন্তু অব্যর্থ শিকারীর ন্যায় রমেশকে নিজের শিষ্য করিয়া লইবার আশায় মরিয়া হইয়া লাগিলেন দুই তিনটা আসন ক্রিয়া ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া লইলেন আরও কত কি। ভোলাদাদার আজ আর অবসর নাই—আনন্দের সীমা নাই।

(২)

হাসপাতালে আসিয়া রমেশ আনমনে ঢুকিয়া পড়িল। খানিকটা অবসাদ, তাহা ছাড়া খামোকা একটা গুমোট ভাব তাহাকে কিছুটা পরিমাণে গম্ভীর করিয়া রাখিয়াছিল। অর গত দু-একদিন উপস্থিত না হওয়ায় বন্ধুরা কেহ কেহ বলিল, ওহে, ভোলাদাদার সঙ্গে থেকে থেকে তুমিও সাধন পথে চল্লে না কি? একটি ফিলস-ফারের মতই যে চেহারাটি করে রেখেছ!

রমেশ বলিল, ভোলাদাদার শিষ্য হতে পেয়েছি বলেই তো জীবনটা সার্থক হবে ভাবচি। আর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা যোগ স্থাপন করাও ইচ্ছে বটে।

ইহার পর অনেকের তরফ হইতেই রমেশকে বিদ্রূপে পাইয়া বসিল। আলোচনা ঘুরিয়া আসিলে সমপাঠী বন্ধু বলিলেন, নূতন সার্জন এসেছেন, গতকাল থেকে।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, কে এলো?

সার্জন চৌধুরী। বাঙলা দেশের একজন কৃতিছাত্র বিলেতেও ডিগ্রী নিয়েছেন। মানুষ হয়েছেন উত্তর ভারতে, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি বাঙালী।

রমেশ বলিল, কত ডাক্তারই এল আর কত রোগী—আমরাও তৈরী হচ্ছি, আমরাও সার্জন হব।

কিন্তু উনি খুব ভালো লোক।

ভাল। ভাল হওয়াই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সখ করে তো আর কেউ ডাক্তারী করতে আসে না—ভাল হলেই পসার জমে।

বন্ধুটি রমেশকে থামিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছিল কিন্তু রমেশ সজোরেই বলিয়া ফেলিল, সত্য বলছি, সখ করে কেউ কর্তব্য করতে আসে না। লোকে বলে ডাক্তার মানুষের উপকার করে। বিলক্ষণ? কিন্তু উপকার করাই হচ্ছে তাদের ব্যবসা। অমুকে ভাল হয়েছে কেন? যেহেতু টাকা পাবে। ভালর মানে হচ্ছে—টাকা!

বন্ধুটি রমেশের হাত ধরিয়া ফেলিল। রমেশ পিছন হইতে গম্ভীর কণ্ঠের উক্তি শুনিল, তোমার কথা ঠিক।

পিছন ফিরিয়া দেখিল সাদা পরিহিত দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক। তাঁহার পশ্চাতে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র দাঁড়াইয়া। ইনিই যে ডাক্তার চৌধুরী হইবেন একথা তাহার কল্পনায়ও আসে নাই। সার্জন চৌধুরী বলিলেন ডাক্তারী পেশা নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমার ধারণাটিকে আমিও ঠিক বলে মনে করি। মানুষের পরিচয় প্রাণে—ব্যবহারে নয়। তোমাদের ব্যবসায়ে যে কত কৃত্রিম উদারতা আর লুকানো সংকীর্ণতা আছে তা বলে শেষ করা যায় না। তোমার কথা ঠিক।

রমেশ সহসা মনের একটা অপূর্ব শক্তি লাভ করিল। এক মুহূর্তে ডাঃ চৌধুরী তাহাকে করিলেন চিন্তাশীল—সকলের সমক্ষে মনোরাজ্যে সম্পূর্ণ শক্তিমান হইয়া দাঁড়াইল রমেশ।

ডাক্তার চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আছো ডিউটিতে?

আজ্ঞে হাঁ।

পরিচয় করাইয়া দিল। রমেশ ফার্স্ট বয়।

সার্জন চৌধুরী অগ্রসর হইয়া গেলেন। মুখে স্মিত হাসি কিন্তু দাঁতগুলি বাহির হইয়াই আছে—আড়ম্বর নাই। পাশের রোগিটি ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে "বড় সাহেব এসেছেন।" উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতে সার্জন নিজেই ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন। উঃ কি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি! একটি রোগী বলিল—পায়ের ঘা।

ডাঃ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, পায়ের ঘা-টা শুকোচ্ছে না, ত?

না বাবু।

ভয় নেই শুকিয়ে যাবে। বাড়িতে যেতে পারবে।

রোগী নিশ্চিন্ত হইল।

একজন লোকের একটা বড় অপারেশন হওয়ার পর ক্রমাগত জ্বর চলিতেছিল। ডাঃ চৌধুরী তাহাকে সযত্নে পরীক্ষা করিতে-

ছিলেন। পাশের খাটে ছিল একটি ভিখারী ছেলে—ডাক্তার দেখিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। সাহেবের কথা বলিয়া একজন ধমকাইয়া দিতে গেলে, সার্জন পকেট হইতে একটি ঝকঝকে আনি বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন, আর যেন চেঁচিও না।

একটি ছোট ছেলে কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু আমার ঠাকুর্দা আপনাকে ডাকছেন।

এক কোণে ছিল একটি বেড, তাহাতে জীর্ণশীর্ণ অশীতিপর এক বৃদ্ধ বিছানায় পাশ-বালিশের মত মিশিয়া আছে আর পার্শ্বে এক একটি স্ত্রীলোক বসিয়া। স্ত্রীলোকটি প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত ধরিয়া ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া ডাক্তারবাবুর কাছে সংকুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ছেলেমানুষ, দোষগুণ বোঝে না। মাফ করবেন।

ডাঃ সার্জন চৌধুরী এক নিমেষে রোগীটির চার্ট দেখিয়া লইলেন এবং বলিলেন, হাঁ কি বল্লেন?

ছেলেটি সভয়ে বলিল ঠাকুর্দার অসুখ কবে সারবে?

ঠাকুর্দা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। একজন ডাক্তার একটু হাসিয়া ইংরেজিতে বলিয়াছিলেন এখন ত যাবারই সময়। বেঁচে আর কাজ কি?

সার্জন একবার বৃদ্ধের দিকে [illegible] করিলেন তারপর [illegible] বলিলেন, কি বল্লেন আপনি? বেঁচে কাজ কি—এই না? ডাক্তার হয়ে আপনি এ কথাটি বলতে পারলেন? আশ্চর্য? তবুও আমরা ডাক্তার। আমরা দেহেরই পরীক্ষা করি, তাকে নিরাময় করতে চেষ্টা করি। কিন্তু দেহের ভিতরে মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে তাকে খুঁজি কি? যদি আপনি সে সন্ধান জানতেন তাহলে একথা বলতেন না। যারা একদিন [illegible] এত বছর এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাঁদেরও প্রয়োজন সংসারে আছে। এঁদের বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এঁদের অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে হবে।

সার্জন চৌধুরী অন্যমনস্ক হইয়া চলিলেন রোগীর পর রোগী খাটের পর খাট। শিশু, বৃদ্ধ ও [illegible] দেহ দেহ যাহা দৃষ্টি-গোচর হইল তাহা নিঃশব্দে এক একটি শব্দ ফুটাইয়া আসিয়া রমেশের মনের মধ্যে আলোড়ন তুলিতেছিল। রোগীর প্রতি যেন একটি স্বতন্ত্র স্নেহ দৃষ্টি [illegible] মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের আন্তরিক নিবেদন করিয়া উপলব্ধি করিবার একটি ক্ষমতা রমেশকে বুঝাইয়া দিল যে শুধু কতকগুলি রোগ দেহ লইয়া খেলা করাই ডাক্তারের জীবনের দায়িত্ব নহে। জীবনের এ ধরণের উপলব্ধির কথাও রমেশকে আকর্ষণ করিয়া লইল।

গাইনোকোলজিক্যাল ওয়ার্ড হইতেও নবাগত সার্জনের ডাক পড়িল। স্ত্রী বিভাগেও নাকি তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। ডাক্তার চলিলেন সেখানে, রমেশের প্রতি সাগ্রহে চাহিয়া রমেশকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

কাতর কণ্ঠে আর্তনাদরত একটি স্ত্রীলোককে কঠিন অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যন্ত্রের অবধি নাই। কর্মিগণ অর্থাৎ নার্সগণ সুসজ্জিত, সাবধান। একজন অজ্ঞান করিবার যন্ত্রপাতি ধরিয়াছেন। আরও কত কিছু। মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটা ঘরে একটা স্থৈর্য, ধৈর্য ও সাবধানতা ও ক্ষিপ্রকারিতার নিদর্শন। বিজ্ঞান যেন মূর্তিমান হইল। সহসা ডাঃ চৌধুরী নিঃশব্দ ভেদ করিয়া সকলের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে সকলকে আকর্ষণ করিলেন—কী অদ্ভুৎ এক মাতৃময়ী মূর্তি দেখা দিয়েছে এর মুখে, এই মুহূর্তে ইনি মা হবেন আর একজন পৃথিবীতে নতুন আসবে, যদি বেঁচে থাকে, আলো বাতাসের মধ্যে একে মুক্ত করতে পেরে আমরা ধন্য হব। তারপর অস্ত্রোপচার শিশুকে তুলিয়া লওয়া, সকলগুলি কর্মীর কার্যতৎপরতা—মানব জীবনকে লইয়া যেন একটা ইন্দ্রজাল। এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা সময় কাটিল এক মুহূর্তে সকল ঝড়ো হাওয়া ভেদ করিয়া পাড়ী জমানো নৌকা যেন, নীল সমুদ্রের রংগীন তীরে আসিয়া নিঃশব্দে ভিড়িল। কার্য শেষ হইতেই সার্জন চৌধুরী সদ্যপ্রসূত রক্তাভ শিশুটিকে দেখিয়া বালকের মত লাফাইয়া উঠিলেন, বলিতে লাগিলেন, এই ত জীবন। এই তো ভগবানের সম্মান—এই সৃষ্টির শক্তি? এর জীবনের বিপদজাল কেটে দিয়ে একেও সংসারে নিয়ে এসেছি।

আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

রমেশ তখন সমস্ত তরুণ ডাক্তার দলের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। যাহার ভিতরে এমন একটা আনন্দের প্রস্রবণ বহিতে থাকে তাহার পাগলামীটা একবার দেখিয়া ফিরিতে হইবে। তাহার মাথার কলকব্জাতে কিছু ঢিলা পড়িয়াছে কিনা এ বিষয়েও গবেষণা চলিতেছিল। অনেকে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে, প্রবীণ ডাক্তার চৌধুরীর একজন সতীর্থ বন্ধুও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশেষে সার্জন হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ নাকের ডগায়, শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিয়াছে। সিঁড়ির সামনেই একটা বেয়ারা বলিতেছিল, কি চাই? এখানে অর থাকতে পাবে না। যাও

সার্জন বলিলেন, আহা—তাড়িও না। এই বোধ হয় রোগিনীর কেউ হবে।

দশ বৎসর বয়স্কা একটি মলিন মেয়ে সার্জন চৌধুরীর দিকে ছল ছল দৃষ্টিতে তাকাইতেছিল। সার্জন ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন উনি তোমার কেউ হন।

মেয়েটি মাথা নাড়িল বলিল মা।

তোমার মা ভাল হয়ে যাবেন। তোমার একটি ভাই হয়েছে যে।

মেয়েটি একবার কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, আশ্বাস দিলেন যে আশ্বাস ডাক্তারের নিকট হইতে ওষুধের চেয়েও বিশেষ করিয়া কামনা করে—জাতিবর্ণ ও প্রতিদানের অপেক্ষা না করিয়া তিনি তাহাই মেয়েটিকে দিলেন। তখনও কত অজানা লোক আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মেয়েটি আর একবার পিছন ফিরিয়া ডাঃ চৌধুরীর স্থির মূর্তিটিকে দেখিয়া লইল এবং ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

ডাক্তার সার্জন চৌধুরীর যে বন্ধুটি আসিয়া আমাদের সামনে দাঁড়াইলেন তাঁহার নামের পুরোভাগে অনেকগুলি ইংরেজী অক্ষরের ব্যবহার করিলে বুঝা যায় তিনি কত বড় কীর্তি রাখি। এবং সেইগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি নিজেই বুঝাইতেছিলেন যে তিনি ডাঃ চৌধুরী হইতেও কত বড়, কত বছরের শিক্ষা এবং ডাঃ চৌধুরী যে শুধু পাগলামো দ্বারাই সংসারে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ডাক্তার চৌধুরী এতক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেই ছিলেন—বহু দূরে তাঁহার দৃষ্টি।

বন্ধুটি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন সার্জন কি ভাবছ?

তেমনি শূন্য দৃষ্টিতে বলিলেন, বিজ্ঞান যাই বলুক মনে হচ্ছে এ দেহের ভেতরে কি একটা জিনিষ আছে তাকে জানা হয়নি।

বিদ্রূপের স্বরে তাঁহার বন্ধুটি প্রত্যুত্তর করিলেন, কার ব্রেইনের ভেতরে এই ফোঁড়া লক্ষ্য করেছ।

সার্জন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমারই ভেতরে? এই ভাবনাটির আভাস পাচ্ছি।

ভাল ভাল। অপারেশন করে দেখ।

সে অপারেশনের ক্ষমতা মানুষ প্রকৃতি থেকে অর্জন করে। কেমন করে যেন দু একজন লোকের ভেতরে সে শক্তির আবেশ হয়।

বলিতে বলিতে দুজনা চলিয়া গেলেন, শুধু যাইবার সময় সার্জনের একটি মাত্র দৃষ্টি রমেশের উপরে পড়িয়া রমেশকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়া গেল।

আর যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের আলোচনা এইরূপ।

ভাল এক্টর হতে পারতো।

পাগল।

সেণ্টিমেণ্টালিজম ডাক্তারী জীবনে দোষের মধ্যেই গণ্য কি বল?

আর একজনা কাতলা মাছের মত হাঁ করিয়া এক গাল পুরে দম লইলেন এবং ফুস করিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, বটে।

(৩)

রমেশ হস্টেলে ফিরিয়া আসিয়া নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল ভোলাদাদা তাহার সিটের চারদিকে এক দক্ষযজ্ঞের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ফল মূল আরও কত কি—আজ রমেশ তাহার শিষ্য হইবে—ইহা কত বড় আনন্দের ব্যাপার। বড় গলায় সবার কাছে বলিয়াছেন। ভোলানাথ নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছেন, তিনটা মন্দিরে পূজা দিয়া আসিয়া ধূপে চন্দনে ঘরটিতে যেন পবিত্রতার নব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহারা ছাত্র, বাহির হইতে ভোলাদাদার এসব ব্যাপার লইয়া প্রতিদিন বিদ্রূপ করিত, তাহারাও তাহাকে অপ্রতিভ করিতে পারে নাই। আজ কেহ কেহ আসিয়া ভোলানাথের নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া গেল। রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল, দাদা মানুষের এই রক্তমাংশের দেহের ভেতরেও আর একটি জীবন আছে—একথা সত্য। একথা আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বাস করো! হাঁ সে কথাই তো বলি সকলকে। আনন্দের আতিশয্যে তিনি কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া হস্তস্থিত হুঁকোটি বাড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, তা হলে রমেশ চট করে চান করে এসো।

চান আজ আর করব না।

থাক্‌, তাহলে—এই কোপীনটা পরে নাও।

সে কি হবে?

মন্ত্রটা কানে বলে দেব।

রমেশ বলিল, মন্ত্রও লাগবে না, কোপীনও লাগবে না।

ভোলানাথের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, বলিল তাহলে কি করতে চাও?

রমেশ বলিল, খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম শেষ করে চল একবার সেই সার্জন চৌধুরীর কাছে—যার ভেতরে অপূর্ব এ জিনিস দেখেছি, তার কাছে।

তিনি কি এসব ক্রিয়া জানেন।

তিনি এসব কিছুই জানেন না।

তা হলে তুমি—

আমি তাঁরই শিষ্য।

ভোলানাথ হতবাক হইয়া রহিলেন। আর কিছু বলিতে চাহিলেও সে ভাষা তাহার হতাশায় মিলাইয়া গেল। দৃষ্টির মধ্যে শুধু একটি মাত্র ভাব, শেষকালে রমেশও তাহাকে ব্যর্থ করিল। ভোলানাথ এতকাল যাহা ভাবিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে, সমপাঠী ছাত্রেরা যাহার প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছে, বন্ধুরা হাসিয়াছে। যে রমেশ একদিন তাহার ভাবনায় বিশ্বাস করিয়াছিল, সেও সমস্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় রমেশ ফিরিয়া দেখিল ভোলানাথ সমস্ত কিছু বাঁধা ছাঁদা করিয়া লইয়া হস্টেল ত্যাগ করিয়াছেন। রমেশের পরীক্ষা নিকটবর্তী হইয়াছে। সেখানে সেই ভোলাদাদার জপতপের সঙ্গে তাহার পড়াশুনা যেন এক সুরে সমন্বয় হইয়াছিল। সমস্ত সারাটি ছিঁড়িয়া গেল। ভোলাদাদা আর মেডিকেল ইস্কুলে ফিরিলেন না। রমেশের সে বছর আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

শিল্পী

(৫৪৪ পৃষ্ঠার পর)

তাহাদের—তার মূল্য কি কম! সে-ও ত সম্ভব হইয়াছিল এই সেতারটির জন্যই।

না, ঊর্মিলা এতদিন পরে বুঝিতে পারিল যে, কবে সকলের অগোচরে এই সেতারগুলি তাহারও প্রাণের সহিত এক হইয়া গিয়াছে, এগুলিকে নষ্ট করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙিল, স্বামীর কণ্ঠস্বরে।

—মিলি! তুমি এ ঘরে!

ঊর্মিলা চমকিয়া উঠিয়া সেতারটা সযত্নে রাখিয়া দিয়া নামিয়া আসিল চৌকী হইতে। সে বিষম অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া স্বামীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিল না।

কিন্তু রাজশেখরই কাছে আসিল ঊর্মিলার একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া কহিল, এই নাও টাকা মিলি, মুদিকে এই দিয়ে আপাতত ঠাণ্ডা করো, পরে আরও দেবো।

দুখানা দশ টাকার নোট।

ঊর্মিলা নির্বাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। রাজশেখরের শীর্ণমুখে কে যেন কালী মাড়িয়া দিয়াছে। সে ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, এ টাকা তুমি কোথায় পেলে? কোথায় গিয়েছিলে না খেয়ে দেয়ে?

ম্লান হাসিয়া রাজশেখর কহিল, একটা সেতার বিক্রী করে এলাম ত্রিশ টাকা দেবে বলেছে, সন্ধ্যার সময়ে বাকী দশ টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে।

শিহরিয়া উঠিয়া ঊর্মিলা কহিল, সেতার কোন সেতার?

—যেটা হোক দেবো। সবগুলোই বিক্রী করব ঠিক করেছি, ওগুলো থাকতে আর কোন কাজে লাগতে পারব না।

ঊর্মিলা টাকাগুলো তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, টাকা তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো। সেতার আমি বেচতে দেবো না।

রাজশেখর কহিল, ভুল করছ মিলি, বড় ভুল করছ। এ সর্বনাশের বীজ না রাখাই ভাল। নেশার শেষ ক'রে দিই।

না-না।

দৃঢ় কণ্ঠে ঊর্মিলা কহিল, সে হবে না। টাকাটা তুমি ফেরৎ দাও। এখনই।

তাহার দুই চোখে জল টল-টল করিতেছিল।

রাজশেখর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

তাপ

সুনীল মিত্র, এম এস-সি

মাত্র কিছুকাল হ'ল তাপের সঠিক কারণ জানা গেছে। এর আগে তাপের সঠিক কারণ জানা সম্ভবপর হয়নি। পূর্বে আলোককে জড় পদার্থের ছটা বলে মনে করা হ'ত। পঞ্চাশ বৎসর আগে আলোকের ন্যায় তাপকেও জড় পদার্থ বলেই মনে করা হ'ত। তাপকে তখন এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল—"তাপ একটি সূক্ষ্ম দ্রব্য, বিশ্বব্যাপী বিক্ষিপ্ত এবং সর্বাপেক্ষা ঘন পদার্থকেও ভেদ করতে সমর্থ।" এই দ্রব্যের বিভিন্ন অংশকে মনে করা হ'ত পরস্পরের প্রতি নিবারক (repellunt), অথচ বিভিন্ন দ্রব্যাদির অংশগুলির প্রতি আকর্ষক (attractive)—এইরূপে জড় পদার্থের সম্প্রসারণ এবং সংকোচন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল।

এখন তাপকে জানা গেছে শক্তির একটি প্রকারভেদ বলে। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের পরমাণু সকল (molecules) আবহমানকালের জন্য গতিশীল। এই গতি থেকে তাপের উৎপত্তি। পরমাণুসকল যত বেশী গতিশীল হবে, দ্রব্য তত বেশী উত্তপ্ত হবে।

উপরোক্তরূপ তাপের ফলে দ্রব্যের রাসায়নিক (chemical) কোন পরিবর্তন (change) হয় না। এ ছাড়া দহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অগ্নি উৎপন্ন হয়। দহন ক্রিয়ায় দ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়।

প্রায় সকল দ্রব্য থেকেই, বিশেষত নক্ষত্রের ন্যায় যে সকল পদার্থ বিকীরণ করে থাকে এক বা অন্য উপায়ে তাপ পাওয়া যায়। নক্ষত্রশ্রেণীর মধ্যে সূর্যই আমাদিগের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

তিন উপায়ে তাপ উৎপন্ন হ'তে পারে—বল সম্বন্ধীয় কার্যের সাহায্যে (mechanical work), রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে (chemical action) এবং বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে (electricity)। প্রথমটির সাহায্যে ঘর্ষণ (friction) উৎপন্ন হয় এবং তাহা থেকে তাপের সৃষ্টি হয়। ঘর্ষণের সাহায্যে তরল পদার্থকেও উত্তপ্ত করা যায়। অতি সহজেই ইহা প্রমাণ করা যায়। একটি বোতলের মধ্যে যদি ঠান্ডা জল দ্রুত নাড়া যায়, তবে দেখা যাবে, এক মিনিটের মধ্যে জলের তাপ এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি যদি কোন শূন্যে (vacuum) দুইটি বরফের টুকরাকে ঘষা যায়, তবে সেই ঘর্ষণের ফলে বরফকে গলাবার পক্ষে যথেষ্ট তাপ সৃষ্টি হবে। যখন আমরা একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি কোন খসখসে জায়গায় ঘর্ষণ করি, তখন সেই ঘর্ষণের ফলেই তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপ কাঠিটিকে প্রজ্বলিত করতে সাহায্য করে। যদি কাঠিটিকে কাঁচের ন্যায় কোন মসৃণ গাত্রে ঘষা যায়, তবে তার ফলে সামান্য ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়—সেই ঘর্ষণ এত সামান্য যে, তার দ্বারা কাঠিটিকে প্রজ্বলিত করা কষ্টকর, হয়ত অসম্ভব। প্রথম উদাহরণে ঘর্ষণের ফলে দহনক্রিয়া সাধিত হয়—ইহা বোঝা যায় কাঠিটির আগুনেট লক্ষ্য করে। কিন্তু এস্থলে দহনক্রিয়ার পূর্বেই তাপের সৃষ্টি হয়েছিল।

অগ্নি উৎপাদনের প্রাচীন উপায়

প্রাচীনকালে মানুষ দুটি কাঠের অংশকে পরস্পর ঘর্ষণ করে সেই ঘর্ষণ থেকে অগ্নি উৎপন্ন করত। প্রথাটি ছিল এই যে, একটি কাঠের তরপুণকে একটি কঠিন কাষ্ঠের ভূমির উপর ঘর্ষণ করা।

উপরোক্ত প্রথায় ঘর্ষণের শক্তিশালী বেগ, যে বস্তুকে ঘর্ষিত করা হয়, তার সংযোগ বা সংলঘ্নতার যে শক্তি তাহাদ্বারা প্রতিহত হয় এবং এই প্রতিঘাত থেকে তাপের সৃষ্টি হয়। কাষ্ঠের অংশকে ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্নের বহু পরে চকমকি পাথর এবং ইস্পাতে ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্নের প্রথা আবিষ্কৃত হয়। এই প্রথায় যে অগ্নিকণা দেখা যায়, তাহা ধাতু দ্বারা বিচ্ছিন্ন চকমকি পাথরেরই অংশ—যার ঘর্ষণের ফলে উত্তপ্ত হয়ে প্রজ্বলিত হয়ে থাকে। এই প্রজ্বলিত অংশ সকল চকমকির পোড়া শোলা অথবা ঐরূপ সহজ দাহ্য বস্তুর উপর পতিত হয়, তৎপরে পাখা দ্বারা বাতাসের সাহায্যে অগ্নিশিখা উৎপন্ন করা হয়। সুপরিচিত 'সিগারেট লাইটার'এর মধ্যে এই প্রথার আধুনিক প্রয়োগ দেখা যায়। এস্থলে চকমকির পোড়া শোলার পরিবর্তে পাটের অসূক্ষ্ম ভাগ অথবা অপ্রয়োজনীয় তুলার অংশ ব্যবহার করা হয় এবং উহাকে দাহ করবার জন্য 'পেট্রোল' অথবা 'বেনজাইন' (benzine) দ্বারা ভিজিয়ে রাখা হয়।

বহু শতাব্দী ধরে ব্রহ্মদেশ এবং বোর্নিওর অধিবাসিগণ কর্তৃক এক কৌশলে অগ্নি উৎপন্ন করা হ'ত। এই কৌশলটি ছিল একটি অগ্নি উৎপাদনকারী পিচকারি (syringe) অথবা অগ্নি প্রস্তুতকারী চাপদণ্ডের (piston) ব্যবহার। উপরোক্ত পিচকারী অথবা চাপদণ্ড দেখতে ছিল অনেকটা সাইকেলের পাম্পের মত। সাধারণত বাঁশনির্মিত একটি গোলাকার বস্তুর মধ্যে একটি চাপদণ্ডকে অতি দ্রুত উপর থেকে নীচে চালনা করা হ'ত। এর ফলে গোলাকার বস্তু (cylinder) মধ্যস্থ বাতাসের তাপ এরূপ বৃদ্ধি পেত যে তার সাহায্যে শুষ্ক শোলা জাতীয় পদার্থকে প্রজ্জ্বলিত করা সম্ভবপর হত। সাইকেলের পাম্পের যে দিক থেকে বাতাস নির্গত হয় সেই দিকে অংগুলি রেখে পাম্পের চাপ-দণ্ডটি বারকতক উপর নীচে চালনা করে বোঝা যায় ভিতরের বাতাসের তাপ কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপর হইতে কোন বস্তু ভূমির উপর পড়লে অথবা দুইটি বস্তু ধাক্কা খেলে তাপ উৎপন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি একটি পেরেকের উপর দুই তিন মিনিট ধরে হাতুড়ি পিটান যায় তবে পেরেকটি উত্তপ্ত হয়ে লাল বর্ণ হয়।

তাপ এবং সংকোচন

সংকোচনের ফলেও তাপ সৃষ্টি হ'তে পারে। যখন একটি ধাতুর পিণ্ডকে ঠান্ডা অবস্থায় পিষ্ট ("cold rolled") করা হয়, তখন এত উত্তপ্ত হয় যে, পেষণকারী যন্ত্রের দুইটি গোলকের মধ্য যাবার সময় জল ফুটতে থাকে। (ঠান্ডা অবস্থায় পেষণ করতে হলে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ধাতু-পিণ্ডের উপর নলের সাহায্যে জল নিক্ষেপ করা হয়)।

অম্লজান ও অংগারের ন্যায় পদার্থের সংমিশ্রণে (combination) তাপ উৎপন্ন হ'তে পারে। অম্লজানের সংগে কোনও পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে প্রচণ্ডভাবে তাপ উৎপাদনের উপায়কে বলা হয় দহনক্রিয়া (combustion)। অম্লজান ভিন্ন অন্য কোন বায়বীয় পদার্থের সাহায্যে অনুরূপ তাপ উৎপন্নের উপায়কেও দহনক্রিয়া বলা হয়। অম্লজানের সাহায্যে দহনক্রিয়াকে আমরা অগ্নিকাণ্ড বলে থাকি—ইহা সাধারণ বাতাসেই সংসাধিত হয়।

প্যারাফিন (খনিজ তৈল বিশেষ) চুল্লীতে যে তৈল ব্যবহৃত হয় তা উদযান এবং অংগারের যৌগিক পদার্থ (compound)। এই

তৈল বাতাসের অম্লযানের সহিত সংমিশ্রিত হয়ে অগ্নির সৃষ্টি করে থাকে। যখন চুল্লীর পলিতাকে (wick) উত্তপ্ত করা হয় তখন পলিতার উপর উত্থিত তৈল বাষ্পাকার ধারণ করে। বাষ্পের একাংশ তখন জ্বলতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ বাতাসের অম্লযানের সহিত সংমিশ্রিত হয়ে থাকে এবং অঙ্গারাম্ল (carbon dioxide) নামক বায়বীয় পদার্থ এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই দহনক্রিয়ায় বাষ্পের অপরাংশের পরমাণু সকল (molecules) উদযান পরমাণু (hydrogen molecules) এবং অঙ্গার পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হয়। অগ্নিশিখার সাহায্যে ঐগুলি উত্তপ্ত হয় এবং ফলে অগ্নিশিখা থেকে তাপ এবং আলোক নির্গত হয়।

প্যারাফিন ব্যবহৃত বায়বীয় চুল্লী

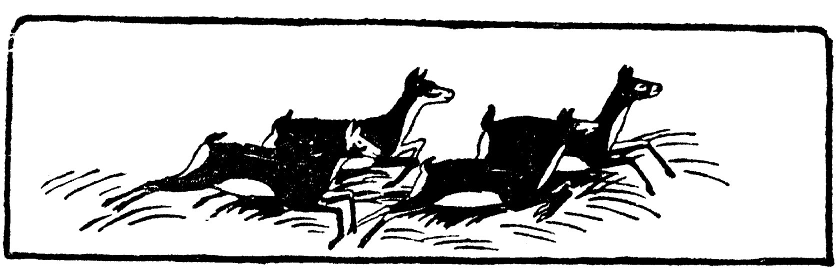
এই চুল্লীতে কোন পলতে নেই, সংকুচিত বায়ুর সাহায্যে তৈলকে অগ্নিশিখা পর্যন্ত উত্তোলন করা হয়। একটি বদ্ধ আধারে প্যারাফিন লওয়া হয়। এই আধারে বায়ু প্রবেশ করবার একদিক আঁটা ঢাকনি (air-valve) এবং নিষ্কাশন যন্ত্র (pump) সংযুক্ত করা থাকে। চুল্লীর মাথায় একটি দাহবর্ধনী (burner) থাকে এবং তার ঠিক নিম্নে একটি ছোট পাত্র থাকে। পাত্র হতে দাহবর্ধনকারী পর্যন্ত একটি অগ্নি সাহায্যকারী নল (pilot light jet) আছে।

প্রথমে ছোটপাত্রে কিছু মেথিলেটেড স্পিরিট দ্বারা ঐটিকে প্রজ্বলিত করা হয়। স্পিরিট জ্বলে যাবার সময় সাহায্যকারী নল থেকে অগ্নিশিখা দেখা যায়। তখন বায়ু প্রবেশ পথটি (air-valve) বন্ধ করে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রটিকে কয়েকবার চালনা করা হয়।

দাহবর্ধনী সংযুক্ত নল-বরাবর তৈল উঠে। ঐ স্থানের তাপ তৈলকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করে। ঐ বায়বীয় পদার্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়ে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বের হয় এবং প্রবল অগ্নিশিখা সমেত জ্বলতে থাকে। ফলে দাহবর্ধনকারী নল অধিকতর উত্তপ্ত হয় এবং যখন তৈল নল বরাবর উঠতে থাকে তখন ঐটিকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করতে থাকে।

বিদ্যুৎ (electricity) থেকেও তাপ উৎপন্ন হয়। জানা গেছে যে প্রাকৃতিক বিদ্যুৎ (lightning) গৃহ প্রজ্বলিত করে ধাতুর দণ্ড গলিয়েছে এবং বালুকাকে গলিয়ে তার অবস্থান্তর ঘটিয়েছে। অতি সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়ে ঐ তারের বহন ক্ষমতার অতীত বিদ্যুৎ যদি সঞ্চালিত করা যায়, তবে তারের পরমানুগুলি অতি প্রবলভাবে চঞ্চল হয়ে উঠে। তাপ উৎপন্ন হয় এবং তাপ এরূপ হতে পারে যার ফলে তারটি লোহিতাভা ধারণ করতে পারে অথবা গলে যেতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সহিত 'ফিউজ-বক্স' থাকে। ইহা আর কিছুই নয়—উপরোক্ত অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ মাত্র। যদি কোনও কারণে বিদ্যুৎ মাত্রাপেক্ষা বেশী প্রবাহিত হতে থাকে তখন আশংকা অনেক। কিন্তু ঐ 'ফিউজ-বক্স' থাকার জন্য আশংকা দূরীভূত হয়। অধিক বিদ্যুৎ অপর কোন ক্ষতি না করে ফিউজ-বক্সের তার গলিয়ে দেয় এবং বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় আর আশংকার কোন কারণ থাকে না।

তাপ উৎপন্নের শেষ উপায়টি হচ্ছে শরীর বিষয়ক উপায় (physiological source)। উদাহরণ পাওয়া যায় আমাদের শরীরে এবং উষ্ণ রক্তধারী (warm blooded) বা ঠাণ্ডা রক্তধারী (cold blooded) উভয় প্রকার প্রাণী সকলের শরীরে। উপরোক্ত উভয় জাতীয় প্রাণীই বেশ তাপ উৎপন্ন করে থাকে কিন্তু শেষোক্তের তাপের ক্ষয়ের অনুপাত প্রথমোক্ত অপেক্ষা অনেক বেশী। অথবা অন্য প্রকারে বলতে গেলে প্রথমোক্ত প্রাণীদিগের তাপ প্রায় সমান থাকে—সামান্য ইতরবিশেষ হয়; কিন্তু শেষোক্ত প্রাণীদিগের তাপ সমান থাকে না—অধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়ে থাকে। উপরোক্ত দুই প্রকার প্রাণীর মধ্যে এটাই আসল প্রভেদ।



পুস্তক পরিচয়

নিশীথ-সূর্য—শ্রীরবীন্দ্রবিনোদ সিংহ। 'সাহিত্যিকেরা সমাজ-সচেতন হবে'—এ কথাটা বাঙলা-সাহিত্য জগতে অহরহই শোনা যাচ্ছে; কিন্তু প্রতিষ্ঠালব্ধ অনেক সাহিত্যিকই তাঁদের রচনায় সমাজ-সচেতনতার কোনো আভাস দিতে চেষ্টা করেন নি। বরং এ চেষ্টা দেখা যায়—যাঁরা নূতন লিখছেন তাঁদের রচনায়। 'নিশীথ-সূর্য' উপন্যাসটি একটি বিপ্লবেরই কাহিনী—নায়ক শুধু রাষ্ট্রিক জীবনের ভেতরেই বিপ্লবকে উপলব্ধি করেন নি—সেই বিপ্লবের ছোঁওয়া তার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনেও এসে লেগেছে। একটি বিপ্লবী চরিত্রের এমন নিখুঁত পরিকল্পনার জন্যে লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন, কেননা আমাদের দেশের তথাকথিত অনেক বিপ্লবীই নিজ ঘরে প্রতি বিপ্লবের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত রেখে রাষ্ট্রিক মতবাদে দুর্দান্ত বিপ্লবী হয়ে ওঠেন এবং একদিন [illegible] হয়ে যায়। কিন্তু লেখক যে পরিবেশ তৈরী করে নায়ককে উপস্থিত করেছেন এবং তাতে যতটুকু সাহসিকতা দেখিয়েছেন, পরে আর সে ধারা রক্ষা করবার মত চেষ্টা তিনি করেন নি। নায়ক সঞ্জয়ের [illegible] সামাজিক বিদ্রোহটাকে লেখক যে কারসাজি করে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে [illegible] একটা রঙীন ভূমিকা তৈরী করবার দরকার কি? 'নিশীথ-সূর্য' লেখকের প্রথম উপন্যাস বলে হয়ত এ দোষ মার্জনা করা যায়, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁকে সাবধান হতে হবে, আর [illegible] তিনি নূতন লেখক, তাঁর কাছে বাঙলা সাহিত্য অনেক কিছু আশা করে।

[illegible] বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে [illegible] পাচ্ছে। এ নিয়ে যদি তিনি [illegible] প্রাতিষ্ঠানিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন তার চেয়ে [illegible] স্বাভাবিক কিছু নেই—[illegible] একজন বিপ্লবী সম্বন্ধে যা হয়ে আসছে তা না বলে, যা হওয়া উচিত তা বলাই কি উপন্যাসের সুলক্ষণ নয়? অবশ্য এই উচিত বোধটাকে [illegible] সব উপন্যাসিকের লক্ষণ—সেখানেই দরকার স্বাতন্ত্র্য—[illegible] থাকে। কিন্তু নূতন লেখকদের আমরা সে পর্যায়ের লেখক [illegible] আর সে সঙ্গে এও বলবো, তাঁরা পূর্ববর্তীদের মত [illegible] দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে [illegible] হয়ে থাকুন।

সৃষ্টি-ক্ষমতার যে স্ফুরণ 'নিশীথ-সূর্য'র স্থানে স্থানে আছে, [illegible] ঘন, কেন্দ্রীভূত করে বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতায় ও শৈল্পিক সংযমে [illegible] যদি ভবিষ্যৎ রচনায় হাত দেন [illegible] এখনই বলা যায়। [illegible] পরিচিত হতে চান তাঁদের আমরা 'নিশীথ-সূর্য' উপন্যাসটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

'মাতৃভূমি'—সম্পাদক : শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত। কার্যালয় : ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা ।৵১০ বার্ষিক সডাক ৫ টাকা।

এই প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকাখানির জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ এবং কবিতা বর্তমান সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত 'লোক শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : এই প্রবন্ধটিতে আমাদের দেশের লোক শিক্ষা সমস্যার অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধ লেখকের মধ্যে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ও প্রশান্তকুমার চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'শিকল' গল্পটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। কবিতা বিভাগকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন গোপাল ভৌমিক, সুশীল রায় এবং অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি। দিলীপকুমার রায়ের মৌলিক উপন্যাস ও And quiet flows the Don-এর অনুবাদ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে। সঞ্চয়ন, পুস্তক-পরিচয়, বিবিধ প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিভাগগুলিও উল্লেখযোগ্য।

গীতাঞ্জলি—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নূতন সংস্করণ)	মূল্য	১॥০
নটীর পূজা—	,,	,,	৸০
চিত্রা—	,,	,,	১,
বিসর্জন	,,	,,	১।০

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট (২, কলেজ স্কোয়ার)

বর্তমান সময়ে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও [illegible] নানা অসুবিধার মধ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ রবীন্দ্রনাথের নিঃশেষিত বইগুলির পুনর্মুদ্রণ করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী পাঠকদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পুস্তকের নূতন সংস্করণগুলি ছাপা, কাগজ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবে রুচির পরিচয় দেয়।

গীতাঞ্জলির আলোচ্য সংস্করণে অনেক গান ও কবিতার রচনা-স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং রচনা-তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। 'নটীর পূজা'র বর্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব হইতেছে—বইয়ের শেষে গ্রন্থ-পরিচয়, প্রথম অভিনয় রাত্রির পাত্র-পাত্রীদের নামের তালিকা, গানগুলির স্বরলিপি পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। 'বিসর্জন' পুস্তকের নূতন সংস্করণে নাটকের গানগুলির স্বরলিপি বইয়ের শেষে মুদ্রিত হইয়াছে। 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে' গানটির স্বরলিপি ইতিপূর্বে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, গানটির সুর একরকম অজানাই ছিল। সুখের বিষয় আলোচ্য পুস্তকে বিশ্বভারতী গানটির স্বরলিপি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 'চিত্রা' কবিতা পুস্তকটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রথম যুগের রচনা; রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার পূর্ণবিকাশের সূচনা এই গ্রন্থে। তাই এই পুস্তকে প্রকাশিত কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, আলোচ্য সংস্করণে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।



ইটালী

বসুবন্ধু শর্ম্মা

টিউনিসিয়ার যুদ্ধ মিত্রপক্ষের আনুকূল্যে শেষ হবার পর হঠাৎ আবার ইটালীর কথা নতুন ক'রে লোকের মনে পড়েছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগ দেবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসোলিনীর ইটালী বেশ প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু অক্ষশক্তিতে যোগ দেবার পর থেকে ইটালীর সুনাম এত কমে গিয়েছিল যে, লোকে ইটালীকে হিটলারের আজ্ঞাবাহী দেশ ছাড়া আর কিছু ভাবত না। এই রকম ভাবার পেছনে অবশ্য যুক্তি ছিল অনেক। প্রকৃতপক্ষে ইটালীর সর্ব্বময় প্রভু মুসোলিনী যতই সদম্ভ উক্তি করুন না কেন, তাঁর দেশ যে সামরিক শক্তির দিক থেকে যথেষ্ট হীনবল, এটা ইতিমধ্যেই বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। একথা সর্ব্বপ্রথম প্রমাণিত হয়েছিল, যখন মুসোলিনী নিরস্ত্র অ্যাবিসিনিয়ার বুকে নৃশংস ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করেছিলেন। অ্যাবিসিনিয়ার মত একটি নিরস্ত্র অসহায় দেশকে দখল করতেও মুসোলিনীর সময় লেগেছিল এক বৎসর। কিন্তু ইটালীর সমর-সামর্থ্য কম থাকলে কি হয়, মুসোলিনীর রাজ্য-পিপাসার কিন্তু শেষ নেই। তিনি অ্যাবিসিনিয়া, লিবিয়া, ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড প্রভৃতি অ্যাফ্রিকার রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না—সমগ্র অ্যাফ্রিকাকে গ্রাস করে আবার পৃথিবীব্যাপী রোমক-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। হিটলারের সাহায্যে এই স্বপ্ন সফল হবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা ছিল; কেননা যতই বাক্‌জাল বিস্তার করুন, মুসোলিনী তাঁর নিজের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করবার আশাতেই তিনি একদিন তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিটলারের বিজয়ী সৈন্যদলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর অবলম্বিত পন্থার ভুল আজ হয়ত মুসোলিনী ধরতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় যে-পথে পা বাড়িয়েছেন, সে পথ থেকে ফেরার সম্ভাবনা আজ খুবই কম। যে-লাভের আশায় মুসোলিনি অক্ষশক্তিতে যোগ দিয়েছিলেন, সে-লাভের একাংশও পূর্ণ হয়নি—বরং ইটালী ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যথেষ্ট এবং তার সামনে আসন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা আরও বেশী।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইটালী অক্ষ-শক্তির দুর্ব্বলতম অংশীদার বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে সবচেয়ে বেশী। অক্ষশক্তির মধ্যে এবার দেশ জয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদলাভের দিক থেকে জার্ম্মানীই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে—তারপর

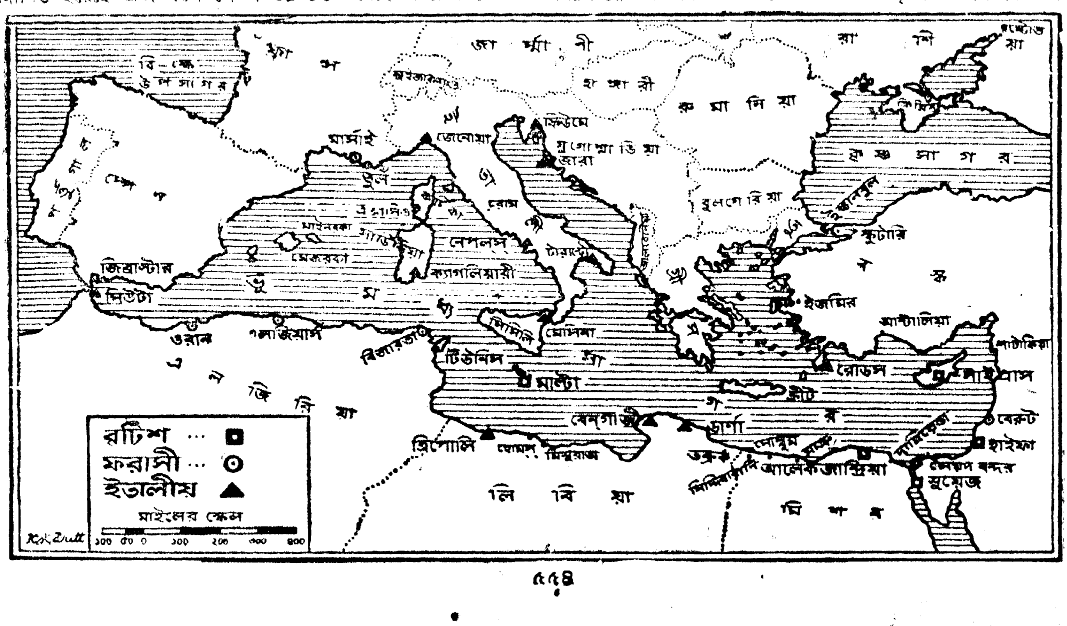


হিটলার



মুসোলিনী

লাভবান হয়েছে জাপান। আর ইটালীর নূতন দেশ জয় করার কথা ত ছেড়েই দিলাম—তার নিজের যা কিছু ছিল, তাও সে ইতিমধ্যে হারিয়েছে। মুসোলিনীর ইটালী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন আজ আকাশ-কুসুমে মাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। ইটালীর অধিবাসীরা আজ মোহমুক্ত হয়ে মুসোলিনীর বাগাড়ম্বরের ব্যর্থতা বুঝতে পেরেছে। ফ্যাসিস্ট একনায়ক অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, এখনও বাকজাল বিস্তার করে তিনি হতাশা-কাতর জনগণকে উজ্জীবিত রাখতে পারেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই তিনি টিউনিসিয়ার পতনের দুই-চারদিন পূর্ব্বে বেতার-বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তাঁর সৈন্যরা আবার উত্তর আফ্রিকায় ফিরে যাবে। তারপর অবশ্য ঘটনা-প্রবাহ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইটালীর ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপ প্যাণ্টেলেরিয়া, ল্যাম্পেডুসা প্রভৃতির পতনের ফলে মিত্রশক্তি সিসিলি দ্বীপের ৬০ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। ভীতি-বিবর্ণ জনগণ মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধিতে দিন দিন আরও



শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছে এবং বুঝতে পারছে যে, ইটালীর ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেশব্যাপী খাদ্য-সংকট ও জার্মানীর কার্যে ইটালীর যন্ত্র-শিল্পের নিয়োগে আজ ইটালীবাসীদের দুর্দশার অন্ত নেই।

ইটালীয় জনগণ ও জার্মান জনগণের মধ্যে যে খাদ্য-ব্যবস্থার বৈষম্য বর্তমান, তাতে ইটালীর জনসাধারণের যুদ্ধপ্রবৃত্তি না থাকা অস্বাভাবিক নয়। জার্মানদের সাপ্তাহিক রুটির পরিমাণ ৮০ আউন্স, কিন্তু ইটালীয়দের জন্য নির্দিষ্ট রুটির পরিমাণ ৩৭ আউন্স। নীচে আমরা এই দুটি দেশের অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের একটা তুলনামূলক সাপ্তাহিক হিসাব দিচ্ছি ঃ মাংস—জার্মানী ঃ ১২½ আউন্স; ইটালী ঃ ৩½ আউন্স; চিনি—চর্বি প্রভৃতি জার্মানী পায় ইটালীর দ্বিগুণ; জার্মানী প্রতি জন পিছু আলু পায় ১৫৭ আউন্স, আর ইটালী পায় ১৭½ আউন্স। সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্যদ্রব্যের এই হ'ল তালিকা। অবশ্য যারা যুদ্ধকার্যে এবং যুদ্ধ-শ্রম-শিল্পে নিযুক্ত আছে, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে; তবে সেখানেও জার্মান এবং ইটালীয়দের মধ্যে এই বৈষম্য বর্তমান।

ইটালীর যন্ত্র-শিল্পের অবস্থা কি শোচনীয় তা তার প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের সরবরাহের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইটালী তার প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহের শতকরা ৭৫ ভাগের জন্য অর্থাৎ প্রায় ১২000000 টন বছরে—জার্মানীর উপর নির্ভরশীল। এটা সাধারণ জ্ঞান থেকেই বোঝা যায় যে, দৈনিক ইটালীতে ২00 টন কয়লা পাঠান জার্মানীর পক্ষে কত কঠিন। প্রয়োজনীয় পেট্রোলেরও শতকরা ৮৫ ভাগ আসে রুমানিয়া থেকে—অবশ্য জার্মানী নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে যদি দিতে পারে।

ইটালী বছরে চোদ্দ লক্ষ টন লোহ ও ইস্পাত উৎপাদন করে—এবং তাকে আরও সাত লক্ষ টনের জন্য জার্মানীর স্বারস্থ হতে হয়। তার নিজস্ব কোন রবার-শিল্প নেই বললেই চলে। তামা ও নিকেল সরবরাহ ব্যাপারে জার্মানীই তার একমাত্র ভরসা। বিস্ফোরক দ্রব্য নির্মাণের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, তাও তাকে পেতে হয় জার্মানী থেকে। যুগোস্লাভিয়া এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে ইটালী দশ লক্ষ টন কাঠ পায়—কিন্তু জার্মানী এবং মধ্য ইউরোপে সরবরাহ-ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার জন্য অনেক সময় এই সরবরাহ কার্য কঠিন হয়ে পড়ে। তার সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতির জন্যও ইটালী জার্মান রাইখের উপর নির্ভরশীল।

ইটালীতে প্রায় ৭000 টন পশম হয়—অথচ তার স্বাভাবিক প্রয়োজন হচ্ছে ৫0000 টন। সাধারণ অবস্থায় তাকে শতকরা ৯৫ ভাগ তুলো বিদেশ থেকে আমদানী করতে হ'ত—বর্তমানে সে আমদানী বন্ধ। শতকরা ৮০ ভাগ চামড়াও তাকে বিদেশ থেকে আমদানী ক'রতে হ'ত—বর্তমানে সে আমদানীও বন্ধ। তারপর আফ্রিকা থেকে ইটালী যে নয় লক্ষ টন ফস্‌ফেট পেত এবং যার দ্বারা সে জমির সার তৈরী করত—তার অভাবে ইটালীর কৃষিকার্য ভীষণভাবে ব্যাহত হবে। এক সময় ইটালীর উত্তরাঞ্চলের যে বস্ত্র-শিল্প সমৃদ্ধ ছিল, তারও ধ্বংস হয়ে গেছে। এক কথায় ইটালীর অর্থনৈতিক জীবন আজ ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত এবং তাকে সম্পূর্ণ জার্মানীর দয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

বর্তমানে মিত্রপক্ষের ইটালী আক্রমণ সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবিরাম বিমান আক্রমণের ফলে সাধারণ অধিবাসীদের দুর্দশার অন্ত নেই। জনসাধারণ হয়ত অক্ষশক্তির সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে মিত্রশক্তির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু জনগণের এই আন্তরিক ইচ্ছায় কোন কাজ হবে কি? ফ্যাসিস্ট ইটালীতে কি কোন অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে? সব দিক বিচার করে দেখলে মনে হয় যে, ইটালীর জনসাধারণ যতই দুর্দশাগ্রস্ত হোক না কেন, ইটালীতে আশু অন্তর্বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই। স্বয়ং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলও সেই অভিমত পোষণ করেন। ইটালীতে যে জার্মান গেস্টাপো ও ফ্যাসিস্ট ওভ্রা (ovra) আছে তারা অন্তর্বিপ্লবের আশংকাকে নির্মূল করার চেষ্টা করবে। ইটালীর ভিতর কিংবা বাইরে থেকে কোন জনপ্রিয় নেতার অভ্যুদয় হয়ে মুসোলিনীর রাজত্বের অবসান হবে—একথা কল্পনা করাও বৃথা। নীচে যে শক্তি-গুলোর উল্লেখ করা হল তারা যদি একযোগে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, তবেই ফ্যাসিস্ট শাসন-তন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ সম্ভবপর ঃ—

(১) ইটালীর সম্রাট; তিনি উত্তরোত্তর বুঝতে পারছেন যে জনগণের মনে মুসোলিনীর প্রতি আর পূর্বের শ্রদ্ধা নেই।

(২) সামরিক নেতৃবৃন্দ; তাঁরা বিজয়ের আশা হারিয়ে ফেলেছেন এবং বুঝতে পারছেন যে, অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অভাবে ইটালীর ধ্বংস অনিবার্য; ইটালী বাঁচতে পারে যদি সে জার্মানীকে ছেড়ে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়।

(৩) বড় বড় যন্ত্র-শিল্পের মালিক ও ব্যবসায়ীরা; তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, ইটালীর অর্থনৈতিক জীবন বর্তমানে জার্মান কর্তৃত্বাধীনে চলে গেছে; এই পরাধীনতার হাত এড়াতে হলে মিত্র-পক্ষের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন প্রয়োজন।

(৪) কৃষকেরা; এরা বাধ্য হয়ে নিজেদের উৎপন্ন শস্য সামরিক নেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছে এবং প্রতিদিন শ্রমিকের অভাবে অসুবিধা ভোগ করছে।

(৫) শ্রমিকরা; এরা দেখতে পাচ্ছে যে, কারখানাগুলো প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হতে চলেছে এবং জোর করে জার্মানীতে নীত হবার আশংকায় তারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

(৬) যাজক-শক্তি; এই শক্তি দীর্ঘদিন ধরে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র-নীতি ও শাসনের ওঠা পড়া লক্ষ্য করে আস্‌ছে; প্রয়োজন হলে ঠিক সময় মত এই শক্তি ইটালীর জনগণের মধ্যে তার ভূতপূর্ব প্রভাব প্রয়োগ করবে।

এ শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে কি ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে? এর কোন একটি শক্তির পক্ষে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এর যে কোন একটি শক্তি যদি উল্লিখিত অপর শক্তিগুলোর সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে; তবেই আমরা ইটালীতে বিপ্লবের আশা করতে পারি—তা নইলে নয়। অবশ্য এর সঙ্গে মিত্রপক্ষের সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি এবং কাঁচামাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিও থাকা চাই। এই সব সর্ত পূর্ণ হলেই ইটালীতে বিপ্লব সম্ভব; নইলে মিত্রশক্তিকে যুদ্ধ করেই ইটালী থেকে নাৎসীদের দ্বারা প্রভাবিত ফ্যাসিস্ট শাসন ধ্বংস করতে হবে।

রঙ্গজগৎ

গ্লোব থিয়েটারে—"নটীর পূজা"

আগামী সোম ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গ্লোব রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটিকা "নটীর পূজা"র অভিনয় হবে এ সংবাদ পূর্বেই আমরা জানিয়েছি। এই অভিনয়ে যাঁরা যোগদান করছেন তাঁদের অধিকাংশই শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ও শিল্পী, কলকাতার আর্টিস্ট এসোসিয়েশনও এতে সহযোগিতা করছেন। বাঙলা দেশে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের অবস্থার পরিবর্তন আজও হয়নি, উপরন্তু খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ তারা আজ দুর্দশার চরম সীমায় এসে পড়েছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ও শিল্পীবৃন্দ তাঁদের গ্রীষ্মাবকাশের সময়টুকু অলসভাবে না কাটিয়ে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশবাসীর সেবায় যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন তারজন্য আমরা তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের এই দৃষ্টান্ত যদি কলকাতা ও মফঃস্বলের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অনুসরণ করতেন তাহলে বাঙলা দেশের অগণিত গৃহহীন অন্নহীন ও বস্ত্রহীন নরনারীর দুঃখ কিছু পরিমাণে তাঁরা লাঘব করতে পারতেন।



নটীর পূজা" নাটক রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। অবদান শতকের একটি কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। এই কাহিনী অবলম্বনে কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত 'পূজারিণী' কবিতাটিও রচিত হয়।

'নটীর পূজা' শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা প্রথম অভিনয় করেন ১৩৩৩ সালে, তখন এই অভিনয় কলকাতার কলারসিক মহলে নূতন সাড়া জাগিয়ে তোলে। ভগবান বুদ্ধের ধর্মানুরাগী একটি নটীর আত্মনিবেদনের করুণ কাহিনী নিয়ে এই নাটকটি রচিত। এই নটীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী।

দিকশূল

নিউ থিয়েটার্সের নতুন চিত্র—দিকশূল। পরিচালনা : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ; কাহিনী : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; আলোক-চিত্র : রবি ধর ; শব্দ-গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ; সংগীত-পরিচালনা : পঙ্কজ মল্লিক ; ভূমিকায় : ছবি বিশ্বাস, অঞ্জলি রায়, শৈলেন চৌধুরী, রেণুকা রায়, রাজরাণী, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের প্রথম চিত্র 'দিকশূল' দেখে আমরা হতাশ হইনি বটে তবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার মতও কোন কিছু ছবিখানিতে আমরা খুঁজে পাইনি। আতর্থী মহাশয় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরিচালক ; অবশ্য 'অবতার' দিয়ে তাঁর বিচার করলে ভুল করা হবে। তাঁকে বিচার করতে হবে হিন্দী ছবির পরিচালকরূপে। এত ছবি পরিচালনা করে এসেও তিনি বাঙলা ছবিতে কেন অভিনবত্বের আমদানী করতে পারছেন না—সেটা বিস্ময়ের বিষয়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওতে তোলা ছবি কেন শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে পড়বে না? কিন্তু দুঃখের বিষয় একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'দিকশূল'কে কোন ক্রমেই শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে ফেলা চলে না। এর মধ্যে অবশ্য পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'অবতারে'র মত হিন্দী স্টান্ট নেই—তবু, 'দিকশূলে'র মধ্যে এমন কিছু আমরা পেলাম না যেটা দর্শকের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে।

প্রথমত গল্পাংশের কথাই আলোচনা করা যাক। ঔপন্যাসিক হিসাবে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আছে যথেষ্ট। কিন্তু পর্দার গায়ে 'দিকশূলে'র কাহিনী মোটেই রসঘন হয়ে ওঠেনি। কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত মিলনাত্মক হলেও, এর মধ্যে যথেষ্ট ট্রাজেডির অবতারণা করা হয়েছে। এই দুটি বিভিন্নমুখী রস একত্রিত হয়ে আমাদের মনে কোন সামগ্রিক ছাপ রেখে যেতে পারে না। বিবাহিত যুবক রমাপদর যেদিন এম-এ পাশ করার খবর এল, সেদিনই তার মার মৃত্যু এল। পিতার মৃত্যুর পর এই মা-ই তাকে স্নেহচ্ছায়ায় ঘিরে রেখে যথাসর্বস্ব খুইয়ে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। রমাপদর স্ত্রী সরমা খুব পতিভক্তিপরায়ণা। তাদের একটি মাত্র ছেলে। বেকার রমাপদ মহা মুস্কিলেই পড়ল, কিন্তু তাকে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়ে চলল সরমা। এর মধ্যে এসে জুটল সরমার বড় বোন সুকুমারী এবং তার ধনী স্বামী। সুকুমারীদের ধনের অপ্রতুলতা ছিল না—শুধু, অভাব ছিল একটি শিশুর। মাতৃস্নেহে কাঙাল সুকুমারীর সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ছোট বোন সরমার ছেলেকে তার এত বেশী ভাল লাগল যে সে তাকে দত্তক-পুত্র নিবার ইচ্ছা জানাল। সরমা দিদির প্রতি সহানুভূতিবশত রমাপদর কাছে এ প্রস্তাব করতে সে ত অসম্মত হলই, উপরন্তু মনে করল যে, সরমা বোধ হয় অর্থের লোভেই এ প্রস্তাব করছে। ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন তার দিদির ইচ্ছা অনুযায়ী সরমা তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে দিদিদের সাথে কাশী যেতে চাইল। বেকার রমাপদর আত্মাভিমানে আঘাত লাগল; এই নির্দোষ প্রস্তাবেও সে অসম্মতি জ্ঞাপন করল; কিন্তু সরমা দিদির সঙ্গে কাশী চলে গেল। এই সামান্য দম্পতী কলহ থেকেই শুরু হল ট্রাজেডি। রমাপদর ধারণা হল যে, বউ বুঝি শুধু অর্থই ভালবাসে না এর পরে শুরু, হ'ল তার ভাগ্যান্বেষণ এবং তার ফলে এল সাফল্য। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তার অভিমান গেল না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নানা ভাগ্যবিপর্যয় ও ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে তাদের মিলন হ'ল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি নাকি স্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ—কোন বৃহত্তর সামাজিক সার্থকতা বইখানির নেই। ঘটনা পরম্পরার কার্য-কারণ সম্পর্কের গাঁথুনি বড় শিথিল। কাহিনীটিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কোলিয়ারী দুর্ঘটনার অবতারণা পর্যন্ত করা হয়েছে—এমন কি কয়লাখাদ ধসে পড়বার দৃশ্য পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। তবু কাহিনীটির বিশেষ কোন অংশই আমাদের মন স্পর্শ করতে পারে না।

এই ত গেল কাহিনীর কথা। অভিনয়ের দিক থেকেও বইখানি চিত্তাকর্ষক হয় নি। রমাপদর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মাঝে মাঝে আমাদের তৃপ্তি দিলেও, পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তি আমরা পাই নি। তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ একটানা অভিনয় করেছেন—তবে বিশেষ দুই একটি স্থান ছাড়া তিনি সার্থক অভিনয় করেছেন এমন কথা আমরা বলতে পারি না। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অঞ্জলি রায়। এঁর মধ্যে নায়িকার উপযুক্ত দেহ-সৌষ্ঠব ও অভিনয়-ক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হ'ল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এঁর অভিনয় উৎরায় নি। সুকুমারীর স্বামীর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় বেশ ভাল হয়েছে। সুকুমারীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন, প্রিয়দর্শনা না হলেও তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। স্ত্রী চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি বিধবা মেয়ের ছোট ভূমিকায় রেণুকা রায় বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই।

'দিকশূলে'র সংগীতাংশও দুর্বল। সংগীত-পরিচালক হিসাবে একদা পঙ্কজ মল্লিকের যে সুনাম ছিল, ইদানীং তিনি তা হারাতে বসেছেন। সুকুমারীর মুখের একখানি গান ছাড়া, অন্য সংগীত গান আমাদের ভাল লাগে নি। কণ্ঠ সংগীতের তুলনায় আবহ-সংগীত ভাল হয়েছে।

আলোক-চিত্র ও শব্দ-গ্রহণে নিউ থিয়েটার্সের পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন আছে।

খেলাধুলা

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের বিভিন্ন খেলার ফলাফল ইতিপূর্বে ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে যেরূপ প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করিত বর্তমানে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হইবেই এইরূপ সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার ফলেই বোধ হয় এই অবস্থা হইয়াছে। তবে ইহাতে দর্শক সমাগম কম হইতেছে না। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি বিশিষ্ট দলের খেলার দিন দর্শক সমাগম পূর্বের মতনই হইতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিতই উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, খেলার অথবা খেলোয়াড়গণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ভাগের শেষ ভাগে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়গণকে যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা গিয়াছিল বর্তমানে তাহারা নৈরাশ্যজনক ক্রীড়াকৌশলের অবতারণা করিতেছেন। প্রতিযোগিতার সকল খেলা এখনও শেষ হয় নাই। সকল দলকেই এখনও ৭।৮টি করিয়া খেলায় যোগদান করিতে হইবে। ইহার মধ্যেই খেলায় শৈথিল্য প্রকাশ করিবার যে কি কারণ ঘটিল বুঝিতে পারি না। ইস্টবেঙ্গল দলের চ্যাম্পিয়ান ও মোহনবাগান দলের রানার্স আপ হইবার সম্ভাবনা আছে ইহা স্বীকার করিলেও অন্যান্য দল এখনও চেষ্টা করিলে ইহার পরিবর্তন করিতে পারেন সে বিষয় আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। "শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া খেলিব ফলাফল যাহাই হউক না কেন সেই দিকে দৃষ্টি দিব না" এইরূপ মনোবৃত্তিই সকল খেলোয়াড়ের নিকট হইতে আমরা আশা করি। নিম্নে প্রথম ডিভিসন লীগের ২১শে জুন পর্যন্ত বিশিষ্ট দলের খেলার যে ফলাফল হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রথম ডিভিসন লীগ

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	১৬	১৩	২	১	৪০	৬	২৮
মোহনবাগান	১৭	১০	৬	১	২৫	৬	২৬
কালীঘাট	১৭	৮	৬	৩	২০	১২	২২
ভবানীপুর	১৬	৮	৪	৪	১৯	৯	২০
মহমেডান স্পোর্টিং	১৬	৭	৫	৪	১৭	৭	১৯
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	১৬	৭	৫	৪	২০	১১	১৯

ফুটবল খেলা পরিচালনা

কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন খেলায় পরিচালকগণকে যেরূপ মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি করিতে দেখা যাইতেছিল এখনও তাহা বিদূরিত হয় নাই। কেন হইতেছে না ইহা অনুসন্ধান করিতে জানা গেল ভাল রেফারী এসোসিয়েশনের অধীনে অল্প নাই। আগামী বৎসরে এই অভাব যাহাতে অনুভূত না হয় তাহার জন্য এসোসিয়েশন ব্যবস্থা করিবেন। ব্যবস্থা হইলে ভাল, তবে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতাই আমাদিগকে এই উক্তি করিতে বাধ্য করিতেছে। রেফারীর অভাব যে হইবে ইহা বহু পূর্বেই বুঝা এসোসিয়েশনের উচিত ছিল। ৬।৭টি রেফারী লইয়া নিশ্চয়ই এসোসিয়েশন গঠিত হয় নাই। আমরা যত দূর জানি এসোসিয়েশনের সভ্য সংখ্যা প্রায় এক শত। এই এক শত জনের মধ্য হইতে প্রথম শ্রেণীর খেলা পরিচালনা করিতে পারেন এইরূপ ২০ জন রেফারী বাহির করা যায় না, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমাদের যত দূর ধারণা প্রথম শ্রেণীর খেলা পরিচালনা করিবার মত শক্তি অর্জন করিবার সুযোগ এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ সকল সভ্যকে দেন না। সুযোগ ও সুবিধা দিলে জুনিয়র ডিভিসনের খেলা যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম শ্রেণীর খেলা পরিচালনা করিতে পারিবেন ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি। কতকগুলি সভ্যকে সুযোগ দিব সকলকে দিব না এইরূপ মনোভাব যত দিন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের মধ্যে বর্তমান থাকিবে ততদিন প্রথম শ্রেণীর রেফারীর অভাব কখনই কলিকাতার ফুটবল মাঠ হইতে যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে এসোসিয়েশনের সুনাম রক্ষা করিতে হইলে এই সকল দোষত্রুটি দূর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ওয়াটার পোলো লীগ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতা যে আরম্ভ করিতে পারিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। এই পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন দলের খেলা সম্পর্কে আলোচনা করিবার এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি যে, অধিকাংশ দলই অতি পুরাতন খেলোয়াড় দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। গত দুই বৎসরের মধ্যে নূতন খেলোয়াড় যে তৈয়ারী হয় নাই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এসোসিয়েশনের পরিচালনার দোষে বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকগণ নূতন নূতন খেলোয়াড় সৃষ্টি করিবার উৎসাহ যে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাও প্রমাণিত হইল। যাহা হউক এই বৎসরে লীগ প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যদি এসোসিয়েশন শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে আগামী বৎসরে বিভিন্ন দলে বহু নূতন খেলোয়াড়কে খেলিতে দেখা যাইবে। প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে খেলা শিক্ষারও উৎসাহ কখনও আসে না।

খেলা পরিচালকেরও অভাব অনুভূত হইতেছে। অনেক বিশিষ্ট ওয়াটার পোলো খেলা পরিচালককেই খেলা পরিচালনা করিতে দেখা যাইতেছে না। যাঁহারা খেলা পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের পরিচালনা শক্তি আছে কিন্তু শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন একটি ওয়াটার পোলো রেফারী এসোসিয়েশন গঠন করিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন। এই রেফারী এসোসিয়েশন বিভিন্ন উৎসাহী সাঁতারুকে ওয়াটার পোলো খেলার নিয়মাবলী শিক্ষা দিবেন ও খেলা পরিচালনা করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবেন। এখন হইতেই যদি এসোসিয়েশন এই দিকে দৃষ্টি না দেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে ইঁহাদিগকেও ফুটবল ও হকি খেলার ন্যায় রেফারীর অভাব অনুভব করিতে হইবে।

দার্জিলিং ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

চাঁদমারী ক্লাব পরিচালিত দার্জিলিং ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা এই বৎসরেও প্রবল উত্তেজনা ও বিপুল দর্শক সমাগমের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ইহাতে যোগদান করেন এবং গত বৎসরের ন্যায় সকল বিভাগেই সাফল্য লাভ করেন। যেভাবে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে বে স্থান লাভ করিবে সে বিষয় আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। চাঁদমারী ক্লাবের পরিচালকগণের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা। নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

মহিলাদের সিংগলস :—মিস প্রীতি বসু ১১—৭, ১১—৫ গেমে মিস কণা বসুকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিংগলস :—ডিঃ ম্যাডগাভকার ১৫—১১, ১৫—৮ গেমে সুনীল বসুকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস :—ডিঃ ম্যাডগাভকার ও সুনীল বসু ১৩—১৫, ১৫—৪, ১৫—১০ গেমে সুশীল ব্যানার্জি ও বিশ্বনাথ ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস :—সুনীল বসু ও মিস গৌরী পাল ১৫—১১, ১৫—৮ গেমে সুশীল ব্যানার্জি ও মিস পূরবী বসুকে পরাজিত করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৫ই জুন

ভারতীয় সৈন্যদলের জনৈক পর্যবেক্ষক জানাইতেছেন যে, ব্রহ্মদেশের অন্যতম বৃটিশ ঘাঁটি চীন পাহাড় দখলের জন্য জাপানীরা চেষ্টা করিলে কয়েকবার ভয়ঙ্কর হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। মে মাসের শেষ সপ্তাহে ছয়দিন ব্যাপী এই লড়াইয়ে সর্বোৎকৃষ্ট জাপ সৈন্যদের পাঁচশত জন হতাহত হইয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মেনস্কের নিকটস্থ ৪টি লোকালয় পুনরুদ্ধারের জন্য জার্মানরা গতকল্য বারংবার আক্রমণ চালাইয়াছিল। তাহাদের সব কয়টি আক্রমণই ব্যর্থ হইয়াছে এবং প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

চুংকিং-এর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনারা দক্ষিণ হুপেতে কুংগান শহর পুনরধিকার করিয়াছে।

মিঃ আর্থার গ্রীণউড বৃটিশ শ্রমিকদলের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন।

লণ্ডনে লেবার পার্টি সম্মেলনে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। প্রথম প্রস্তাবে ভারতের বৃহৎ সম্প্রদায়গুলির সত্যিকার প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিবার দাবী জানান হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতির ভিত্তিতে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনায় উদ্যোগী হইতে এবং একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠন করিতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

১৬ই জুন

জাপ **প্রধানমন্ত্রী** জেনারেল তোজো জাপ পার্লামেণ্টের এক বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে জাপ সাম্রাজ্য বাহিনী বর্তমানে ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তে এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সংগ্রামরত রহিয়াছে। জাপ জাতি শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। নিজেদের পূর্ব প্রতিষ্ঠাবলে যুদ্ধপরিচালনায় জার্মানী ইতালী এবং ইহাদের মিত্ররাষ্ট্রসমূহ সাফল্য অর্জন করিবে এই বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল। তিনি বলেন যে অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে, ব্যাপকভাবে বৃটিশ ও মার্কিন অভিযান আসন্ন বলিয়া ক্রমেই সুস্পষ্টতর প্রতীয়মান হইতেছে।

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে রাজা উত্তর আফ্রিকা পরিদর্শনে গিয়াছেন। রাজার সহিত সমর-সচিব ও বিমান-সচিব আছেন।

সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, লিসিচান্স্কের পশ্চিমে জার্মানদের ৪ দফা পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

লেনিনগ্রাদ রেডিও মারফৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষ যে মুহূর্তে ইউরোপে অভিযান আরম্ভ করিবে, লাল-ফৌজও তন্মুহূর্তে জার্মানদের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিবে। ঘোষণাকারী বলেন পশ্চিম দিক হইতে জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ হইলে পূর্ব দিক হইতে লালফৌজও যে প্রচণ্ড আঘাত হানিতে আরম্ভ করিবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

স্টকহলম হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন অদ্য সুইডেনের জার্মান সমর্থক সংবাদপত্র "আলেহান্দা" বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে সম্প্রতি স্টকহলমে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট পক্ষে মাদাম কলোন্টে এবং জার্মানপক্ষে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়া নাকি বাল্টিক অঞ্চলের রাজ্যগুলি এবং সমগ্র পোল্যাণ্ড জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু জার্মানরা ইউক্রেন দাবী করে। ফলে আলাপ আলোচনা ফাঁসিয়া যায়।

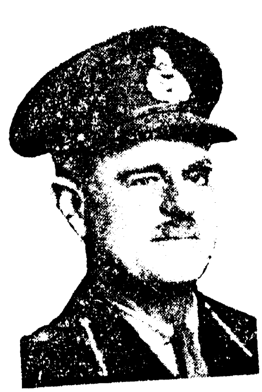
কার্পাসের বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীরা যাহাতে মাল মজুদ না করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে বস্ত্র ও সূতার মূল্য, উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া ভারত সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

১৭ই জুন

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকার সাম্প্রতিক দাঙ্গা সম্পর্কে কয়েকটি মহল্লার অধিবাসীদিগের উপর মোট ১৪ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়াছেন।

মাদ্রিদের সংবাদে প্রকাশ, ৭৪ খানি মিত্রপক্ষীয় জাহাজ জিব্রাল্টারে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি ব্যাটেল-শিপ, দুইখানি বিমানপোতবাহী জাহাজ এবং ১০ খানি ডেস্ট্রয়ার আছে। আটখানি মালবাহী জাহাজ অদ্য আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।

১৮ই জুন



সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফিল্ড মার্শাল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে বর্তমান বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কার্যকাল শেষ হইবে এবং ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল তাঁহার স্থলে কার্যভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মার্শাল ওয়াভেল বড়লাটের পদে নিযুক্ত হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির যে পদ শূন্য হইল, জেনারেল স্যার অকিনলেক সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল বর্তমানে বৃটেনে আছেন, আগামী অক্টোবরের পূর্বে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। কিন্তু প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত জেনারেল অকিনলেক অবিলম্বেই তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

পাটনার এক সংবাদে **প্রকাশ**, সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুখেন্দুমোহন সিংহকে পত্নী হত্যার চেষ্টার অভিযোগে মুঙ্গেরে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

আটক বন্দীদের আদালতে হাজির হওয়ার অথবা কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই—লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ব্র্যাকার ও মিঃ মহম্মদ মুনির অদ্য এই রায় দিয়া আগামী ২৪শে জুন সর্দার শার্দুল সিং কবিশেরকে আদালতে হাজির করিতে বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে এফিডেভিট করিবার সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে বলিয়াছেন।

১৯শে জুন

বৃটিশ ও মার্কিন বিমানবহর গতকল্য দিবাভাগে সিসিলি দ্বীপে কোকিসা ও বিস্কারী বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। দুইটি বিমানক্ষেত্রে প্রায় আড়াই **লক্ষ** পাউণ্ড বোমা নিক্ষিপ্ত **হয়**।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ। শনিবার, ৩২শে আষাঢ়, ১৩৫০ সাল। Saturday, 17th July, 1943. [৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি এত ঘটা করিয়া যে খাদ্য সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার ফলের দিক হইতে বিবেচনা করিলে পর্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে, এই প্রবাদ বাক্যই আমাদের মনে পড়ে। প্রধানত সমস্যাটিকে আপাতত ধামা চাপা দিয়া সেপ্টেম্বর মাসের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে যাহা করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও অবশ্য অনেক কথা। ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য সচিবের বক্তৃতায় প্রকাশ, তাঁহারা শহরগুলিতে ক্রমান্বয়ে রেশনিংয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিবেন; কোনও কোনও দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হইবে না; তবে মূল্য যথাসম্ভব কমাইবার এবং সেই মূল্য স্থায়ী করিবার চেষ্টা হইবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যেই অবাধ বাণিজ্যের কথা বিবেচনা করা হইবে না। ঘাটতি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি বাড়তি এলাকা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য আমদানীর জন্য সরাসরি চেষ্টা করিতে পারিবে। ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে অভাব দেখা দিয়াছে, যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করা হইবে ইত্যাদি। এসব কথা শুনিতে মন্দ নয়; কিন্তু এগুলি কার্যে পরিণত করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপ্রণালীই আমরা ভারত গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্তের মধ্যে পাইতেছি না। ঘাটতি প্রদেশগুলি বাড়তি এলাকা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য আমদানীর জন্য সরাসরি চেষ্টা করিতে পারিবে। এই সিদ্ধান্ত অভাবগ্রস্ত প্রদেশগুলির পক্ষে উপরে উপরে আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু কার্যতঃ ইহা অভাবগ্রস্ত প্রদেশসমূহের সমস্যা সম্পর্কে নৈরাশ্যজনকই হইয়া দাঁড়াইবে। ঘাটতি প্রদেশ এবং বাড়তি প্রদেশগুলির মধ্যে খাদ্যের আমদানী-রপ্তানী লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল, এই সিদ্ধান্তে দেখা যাইতেছে যে বাড়তি প্রদেশগুলিই সেক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে। সম্মেলনে বাড়তি প্রদেশগুলি সকলেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বাড়তি খাদ্য নাই; ইহার ফলে কতটা খাদ্যদ্রব্য ঘাটতি প্রদেশগুলি সেসব প্রদেশ হইতে লইতে পারিবে তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিবার স্বাধীনতা বাড়তি প্রদেশসমূহের গভর্নমেণ্ট লাভ করিয়াছেন। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ঘাটতি প্রদেশগুলি বাড়তি প্রদেশগুলির কাছে খাদ্যশস্য চাহিবার যে স্বাধীনতা ভারত গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্তে লাভ করিয়াছে, তাহার কার্যত কোন মূল্যই নাই। চাহিবার স্বাধীনতা বড় কথা নয়, যদি না পাওয়া যায়, তবে চাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এই ক্ষেত্রে ঘাটতি প্রদেশগুলি বাড়তি প্রদেশ হইতে মাল আমদানী করিবার জন্য মালগাড়ির সুবিধা পাইবে, ভারত গভর্নমেণ্ট এমন আশ্বাস দিয়াছেন; কিন্তু কথা হইতেছে মালই যদি না মিলে তবে সে সুবিধাদানের আশ্বাসের কোন সার্থকতাই থাকে না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এই কয়েক মাসেই আমরা ভালরূপেই বুঝিয়াছি যে, গভর্ণমেণ্ট যদি এই ক্ষেত্রে ঘাটতি প্রদেশগুলিকে বাড়তি প্রদেশ হইতে সুবিধালাভের কার্যকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারেন, তবে বাড়তি প্রদেশগুলির ঘাটতি প্রদেশের দাবী এড়াইবার কৌশল যথেষ্টই রহিয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট খাদ্য বণ্টন এবং সরবরাহ ব্যাপারে নিখিল ভারতীয় নীতি অবলম্বন না করাতেই এ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে; বাঙলা দেশের নিদারুণ অবস্থা অবগত হইয়াও

তাঁহারা এখনও পূর্ব নীতি ধরিয়াই চলিবেন, সংকল্প করিয়াছেন; সমস্যা সমাধানের জন্য ইহাতে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের খাদ্য সচিব বলিয়াছেন, অবিলম্বে সর্বত্র কঠোরভাবে মজুত-বিরোধী খাদ্য তল্লাসী অভিযান আরম্ভ হইবে। কর্তাদের মুখে ঐ এক কথাই আমরা বারংবার শুনিতেছি; কিন্তু এই মজুত বিরোধী অভিযানের পরিণতি বাঙলা দেশে কি দাঁড়াইয়াছে, সে নজীর তো চোখের সামনেই রহিয়াছে। বাঙলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব কয়েকদিন আগে মজুত বিরোধী আন্দোলনের ফল দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের সুফল হয় নাই কে বলিবে? খাদ্যাভাবে গ্রামে গ্রামে লুঠতরাজ হইতেছিল, এই আন্দোলনের ফলে তাহা কমিয়াছে; কিন্তু বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীনের মুখে আমরা শুনিতেছি যে, বাঙলা দেশের সর্বত্র অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা বরং প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। খাদ্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, সিঁদ কাটা, চুরি এই-গুলির সংখ্যাই অধিক। দেশব্যাপী অভাব-অনটনের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু গভর্নমেন্ট এই সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে এখনও উদাসীনই রহিয়াছেন। পরাধীন ভারতবর্ষেই ইহা সম্ভব।

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার প্রস্তাবে ইহাও বলা হয় যে, গভর্নমেন্ট যদি অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তি দিতে না পারেন, তবে বন্দীদের বিষয় পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য হাইকোর্টের জজের অনুরূপ পদাধিকারী দুইজন ব্যক্তি লইয়া একটি ট্রাইবিউনাল গঠন করা হউক। মন্ত্রীদের পক্ষ সমর্থকদের তরফ হইতে শ্রীযুক্তা সেন-গুপ্তার প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবেও রাজবন্দীদের মুক্তিদানের জন্য সুপারিশ করা হয়; কিন্তু বলা হয় যে, প্রত্যেক বন্দী সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া যাহাদিগকে শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে নিরাপদ মনে করা হইবে, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। আমরা এই সংশোধন প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারি না। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে বিবেচনার প্রশ্ন আজ নূতন করিয়া উঠে নাই; ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর সময় হইতে এই বিবেচনা চলিতেছে। মৌলভী ফজলুল হক কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে তিনি ৫ শতজনের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত করেন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার প্রাক্কালে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি-দান তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম নীতি হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতিদান করেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডল যতজনকে মুক্তি দিতে সিদ্ধান্ত করেন, এতদিন পর্যন্ত সে পরিমাণ বন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। মন্ত্রী-দলের পক্ষ হইতে মিঃ সিদ্দিকী তাঁহার উত্থাপিত প্রস্তাবেও রাজবন্দীদের মুক্তি ত্বরান্বিত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখনও যদি অধিকাংশ বন্দীর সম্বন্ধে বিবেচনা করা না হইয়া থাকে, তবে তাহা কিরূপভাবে সম্ভব হইবে বুঝা যায় না। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা তাঁহার প্রস্তাবে ট্রাইবিউনাল গঠনের কথা বলিয়াছেন সংশোধন প্রস্তাবে সেটি খণ্ডন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে পক্ষে কারণ কিছুই দেখা যায় না। সকল রাজ-নীতিক বন্দীকে মন্ত্রিমণ্ডল যদি মুক্তি দিতে সমর্থ না হন, তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জনাই ট্রাইবিউনাল গঠনের কথা হইয়াছে; মিঃ সিদ্দিকী প্রত্যেক বন্দীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার কথা তুলিয়া শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার প্রস্তাবের যৌক্তিকতাকেই স্বীকার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করাই যদি বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অভিপ্রেত হয়, তবে মূল প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ট্রাইবিউনাল গঠনের দাবী এড়াইবার জন্য কৌশল অবলম্বনের কোন কারণ দেখা যায় না। মিঃ সিদ্দিকীর প্রস্তাবের একটি অংশে আছে "বাঙলা দেশের অবস্থা আর পূর্বেকার মত স্বাভাবিক নহে।" এই অস্বাভাবিকত্ব কোন হিসাবে—রাজনীতিক কারণে নিশ্চয়ই নয়। রাজনীতিক আন্দো-লনের দিক হইতে বাঙলা দেশে কোনরূপ অশান্তিই নাই। মিঃ সিদ্দিকীও তেমন বলিতেছেন না। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট হইতে নানারূপ অর্ডিন্যান্স জারী করা হইতেছে এবং প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট-গুলির আর বর্তমান অবস্থায় পূর্বেকার ন্যায় স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের এতৎসম্পর্কিত সাম্প্রতিক ব্যবস্থাসমূহের অন্তরায় সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের কার্য বাঙলা দেশের চেয়ে অধিকভাবে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইতেছে, ইহার কারণ বুঝা যায় না। যেসব প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল নাই, সেসব প্রদেশে রাজনীতিক বন্দীদের দলে দলে মুক্তি দেওয়া হইতেছে। বোম্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদেশ বাঙলা দেশকে এ বিষয়ে পিছনে ফেলিয়া গেল; অথচ সেসব স্থানে মন্ত্রিমণ্ডল নাই; তবে কি বুঝিতে হইবে, মন্ত্রিমণ্ডল থাকার জনাই অন্তরায়ের কারণ অন্যভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। গভর্নমেন্ট যাহাই মনে করুন, এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, রাজ-নীতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হউক দেশের লোকে ইহাই চায় এবং বন্দীদের মুক্তিদান বিলম্বিত করার পক্ষেও তাহারা কোন কারণ দেখিতে পায় না।

ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন

সম্মিলিত পক্ষের সেনাদল ইতালীর অধিকারস্থ সিসিলী দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। জার্মান এবং ইতালীয় বাহিনী এই অভিযান প্রতিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সম্মিলিত পক্ষ সত্বরই সিসিলী দ্বীপ অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া মনে হয়। সিসিলী দ্বীপ অধিকার করিবার পর পশ্চিম দিকে সার্দিনিয়া ও কর্শিকা এবং পূর্ব দিকে কটি দ্বীপ অধিকার করাও সম্মিলিত পক্ষের উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, ভূমধ্য-সাগরস্থ শত্রুপক্ষের এই দ্বীপ দুর্গগুলি নিজেদের অধিকারে না আনিয়া তাঁহারা সম্ভবত ইতালী, ফ্রান্স কিংবা গ্রীসের তট-ভূমিতে সেনাদল নামাইবেন না। মার্কিন সামরিকগণ বলিতেছেন যে, ইতালী এবং জার্মান সেনাদল ইউরোপের তটভূমিতে সেনাদল অবতরণ করাইলে প্রচণ্ডভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে; সম্মিলিত পক্ষ তেমন সংগ্রামের ঝুঁকি লইয়াই এবার কার্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ইহার প্রয়োজনও অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানী এবার রুশিয়ার উপর সমগ্র শক্তি লইয়া চাপ দিবার আয়োজন করিয়াছিল এবং সে আক্রমণে রুশিয়ার রক্ষা ব্যূহ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কারও যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্মিলিত পক্ষের এই নূতন উদ্যমে রুশিয়ার উপর হইতে জার্মানদের সেই চাপ কমিবে; সুতরাং তাঁদের অবলম্বিত এই নীতি বর্তমান সামরিক পরিস্থিতির সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিতে হইবে। ইহার পরিণতি কি দাঁড়ায় সেদিকে সমগ্র জগতের আগ্রহ নিবদ্ধ থাকিবে।

বাঙলার বাজেট সমস্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট ব্যাপারে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন মন্ত্রীরা নূতন বাজেট উপস্থিত না করিয়া ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডল কর্তৃক উত্থাপিত বাজেটের যে কয়েকটি বরাদ্দ পাশ করা বাকী ছিল, সেই কয়টি বর্তমান অধিবেশনে পাশ করাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু স্পীকারের নির্দেশে তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নজীর উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে নূতন একটি সম্পূর্ণ বাজেট উপস্থিত করাই নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর কর্তব্য। এই নির্দেশদান করিতে গিয়া স্পীকার মৌলভী নৌসের আলী যে স্বাধীনচিত্ততা, নিরপেক্ষতা এবং ব্যবহার নীতির দিক হইতে বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আধুনিক বাঙলার রাজনীতিক ইতিহাসে তাহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়া থাকিবে। তাঁহার এই নির্দেশের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ প্যাটেলের কথা আমাদের মনে পড়ে। স্পীকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিরোধী দলের তাহাতে আপত্তি করিবার উপায় নাই; আইনের দিক হইতে ইহাতে আপত্তি করিবার মত তাঁহাদের কিছু ছিল না; বাজেট উত্থাপন প্রসঙ্গে তাঁহাদের বিবৃতিতে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অসহায়ত্ব সম্পূর্ণভাবেই উন্মুক্ত হইয়াছে। আজ বাজেট ব্যাপারে এই যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, হক সাহেবকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য অতি মাত্র ব্যগ্রতারই তাহা পরিণতি। বাঙলার গভর্নরের সেই অবিমৃষ্যকারিতার ফলই আজ মন্ত্রিমণ্ডলীকে ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহারা এই সমস্যা কিভাবে কাটাইয়া শাসন-কার্য চালান এখন তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শোনা যাইতেছে, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যথাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহারবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন বাজেট উপস্থিত না করিয়া ব্যয় বরাদ্দ বৈধ বলিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের শাসনকার্য পরিচালনের সুবিধা-লাভের সরাসরি কোন উপায় আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে নূতন বাজেট সম্পূর্ণভাবে দফাওয়ারীভাবে উপস্থিত করাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়, ইহাই সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায়।

অচল অবস্থার প্রতীকার

বিলাতের নবগঠিত 'কমনওয়েলথ' দলের নেতা স্যার রিচার্ড অকল্যাণ্ড এক বিবৃতিতে ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা করিয়া বলেন, "অচল অবস্থা মানিয়া লইবার বর্তমান নীতি কুফলপ্রদ হইতে বাধ্য। ইহা দ্বারা রক্ষণপন্থী দলের রাজনৈতিক দেউলিয়া অবস্থাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠিত হইলে এবং সেই গভর্নমেণ্ট বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মান মর্যাদা লাভ করিলে তবেই এই অচল অবস্থা দূরীভূত হইতে পারে।" স্যার রিচার্ড ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধানের জন্য যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে তাহা অবিদিত নহে। কংগ্রেস এ পথ দেখাইয়াছে; ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে এ সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিয়াছেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যাঁহারা সমর্থক বলিয়া এ দেশের রাজনীতিক মহলে পরিচিত, সেই উদারনীতিক দলের নেতারা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সদুপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সে সব প্রস্তাব, পরামর্শ বা সদুপদেশ সবভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজেদের প্রাণের প্রেস্টিজকেই বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদানের প্রশ্নটি বর্তমানে তাঁহাদের পক্ষে নিছক একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার সমস্যার সমাধান করা যদি সত্যই তাঁহারা প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতেন, তবে মহাত্মা গান্ধীর পত্রের ভাব ও ভাষার বিচার লইয়া তাঁহারা বসিয়া থাকিতেন না; কারণ, মহাত্মাজী যে নিরুপদ্রব নীতির চিরন্তন সমর্থক এবং অহিংসা তাঁহার কাছে ধর্ম বিশ্বাসস্বরূপ, ইহা তাঁহারা অবগত আছেন। এতদিন পরে আমরা ইহাও শুনিতেছি যে, গান্ধীজী বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কাছে একখানা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছেন এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের জরুরী বৈঠকে এই চিঠির সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইয়াছে। ভিতরের ব্যাপার কি, আমরা জানি না; তবে আমাদের বিশ্বাস এই যে, গভর্নমেণ্ট সত্যই যদি ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থাজনিত সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন, তবে গান্ধীজী এবং বন্দীভূত অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে তাঁহাদের অবিলম্বে মুক্তিদান করা উচিত; কিন্তু ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থাজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সত্যই আগ্রহান্বিত কি না, ইহাই হইতেছে প্রথমে বিবেচ্য; এ সম্বন্ধে আমাদের মনে এখনও সম্পূর্ণ সন্দেহই রহিয়াছে।

দেশসেবকের সম্বর্ধনা

গত ২৫শে আষাঢ় বাঙলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার ৭৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে সম্বর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতায় একটি জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় বাঙলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ চাটুজ্জে মহাশয়ের কর্মময় জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। বিগত অর্ধশতাব্দীকাল অতন্দ্রিত উদ্যমে যাঁহারা বাঙলাদেশের সেবা করিয়াছেন, চাটুজ্জে মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য পুরুষ। শিক্ষকস্বরূপে, সাংবাদিক হিসাবে, অধ্যাত্ম সাধনায় এবং মনন-সম্পদে তিনি বাঙলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করিয়াছেন। সর্বোপরি তাঁহার অনমনীয় আদর্শনিষ্ঠা, নির্ভীকতা এবং অত্যুগ্র স্বদেশপ্রেম আমাদের জাতীয় জীবন-পথে উজ্জ্বল বর্তিকাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার লেখনী স্বদেশের স্বাধীনতার বাণী অগ্নিময়ী ভাষায় উদ্গীরণ করিয়াছে। অন্যায়ের প্রতি তাঁহার আঘাত নির্মম এবং ক্ষুরধারের মত ক্ষিপ্র। সেই আঘাতে ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদের অন্তরে জ্বালা সঞ্চার না করিয়া পারে না—একজন দেশসেবকের পক্ষে পরাধীন দেশে যাহা চিরন্তন পুরস্কার, চাটুজ্জে মহাশয়কেও সেই নির্যাতন এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে প্রতিকূলতা কোন দিনই তাঁহাকে আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। এ-দেশের উপর দিয়া রাজনীতিক মতবাদের অনেক বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার দাবী তাঁহার কণ্ঠে সমান রহিয়াছে। এমন শক্ত মানুষ জাতির মধ্যে সত্যই দুর্লভ। কিছুদিন হইতে চাটুজ্জে মহাশয় রোগশয্যায় শায়িত। আমরা এই উপলক্ষে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং বাঙলার এই বরেণ্য সন্তানকে নিরাময় করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

বাঁকা স্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

৪

কমলের সঙ্গে আমার আমি দূরত্ব রাখিয়া চলিতে শুরু করিলাম। কিন্তু সাত আট দিন যাইতে না যাইতে মনে হইল যেন মধুকে আগের চাইতে বেশী হর্ষোৎফুল্ল দেখাইতেছে। তবে কি আমার পরাজয়ে সে এইরূপ খুশি হইয়াছে? ভাবিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরো কত কি মনে পড়িল—যাহা হয়ত হয় নাই কিংবা হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু তবুও সেই সব চিন্তা আসিয়া আমার মনকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কমলের সান্নিধ্য লাভের জন্য আবার আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই হঠাৎ আবার আমাকে মাঠে দেখিয়া কমল বলিয়া উঠিল, কি-রে আলোক, কি মনে করে? এখন এলি যে, পড়াশুনার ক্ষতি হইবে না? বাবা, খুব যাহোক দেখালি, টেস্ট পরীক্ষা আমরাও দেবো।

মধুও তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, দেবে কিন্তু ওর মত ফার্স্ট ত হতে পারবে না—তার ওপর আবার হেডমাস্টার চেষ্টা করছেন যাতে ও স্কলারশিপ্ পায়।

ইহা শুনিয়া মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। বলিলাম, দেখ মধু আমাকে যা ইচ্ছা বল তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের নামে কোন কথা বললে ভাল হবে না বলছি—ও কি, শিক্ষকদের নিয়ে ঠাট্টা!

মধু বলিল, আমি ত ঠাট্টা করিনি, সত্যকথা বলেছি।

আমি বলিলাম, হেডমাস্টারমশায় বুঝি কেবল তোর কানে এই কথা বলতে গিয়েছিলেন?

মধু জোর গলায় বলিল, জিজ্ঞেস কর কমলকে হেডপণ্ডিতমশায়ের কাছে তিনি বলেছেন কি না?

কমল একটা ধমক দিয়া বলিল, এই মধু চুপ কর্, তোর্ কি দরকার ওসব কথায় থাকবার?

মধু সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল এবং কমল বলিল, হ্যাঁরে আলো এতদিন আসিসনি কেন ভাই? হেডমাস্টারমশায় বুঝি ছাড়ে নি—আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাস্ বলে বকেছেন?

—দূর, বকবে কেন, বলিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমি কমলের দিকে তাকাইলাম। মধু বলিল, স্কলারশিপ ও পাবেই, তা হেডমাস্টার জানে।

তখনো টেস্ট পরীক্ষার মাসখানেক দেরী ছিল কিন্তু এইভাবে তাহারা আমাকে খোঁচা দিয়া কথা বলিলেও আমি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাদের সঙ্গেই বেড়াইতাম।

ইহার দিন পনেরো পরে হঠাৎ একদিন শুনিলাম কমলের বাবা তাহার পৈতা দিবার জন্য টেস্টের আগেই দিন ঠিক করিয়াছেন। কমলের মা ছেলের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া নিষেধ করিয়াছিল, তিনি নাকি তাহা শোনেন নাই। বলিয়াছেন, তিন দিন পড়া না করলে যে ছেলের পরীক্ষা খারাপ হয় তার লেখাপড়া না করাই উচিত।

কথাটা সত্য তাই কমলের মা আর আপত্তি করেন নাই, দিন স্থির হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, এই উপলক্ষে কমলকে কি উপহার দিব তাহাই তখন আমার কাছে চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ স্থির করিলাম, জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া কমলকে একটি ভাল বই উপহার দিব। কিন্তু কার্যকালে তাহা হইল না। কেন তাহা বলিতেছি।

কমলের উপনয়নের তখনো পাঁচদিন বাকী। হঠাৎ মধু কমলকে ও আমাকে বলিল, চল্ আজ রাস দেখতে যাই।

রাসযাত্রা উপলক্ষে ও অঞ্চলে এক বিরাট মেলা বসিত। তাহাতে কলিকাতা হইতে বহু ব্যবসায়ী আসিয়া দোকান খুলিত। একমাস ধরিয়া এই মেলা চলিত, দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিত তাহা দেখিতে। সুতরাং জিনিষ যাহা থাকে পল্লীগ্রামের লোকদের একবার দেখিয়া আশা মেটে না, প্রতি বছরই বার বার অনেকেই দেখিয়া থাকে—বিশেষ করিয়া যাহাদের বাড়ি কাছে তাহাদের ত কথাই নাই।

বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাম হইতে এই স্থানটি নিকটেই এবং আমরা ইতিপূর্বে দুই দিন মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। এখান হইতেই আমি কমলের জন্য বই কিনিব মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মধু সেদিন মেলায় যাইবার কথা বলিতে আমি বা কমল কেহই আপত্তি করিলাম না। আবার যাইলাম। মধু সেখানে গিয়া একটি ফটোর দোকানে ঢুকিল এবং কমলের একখানি বড় করিয়া ফটো তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম দিল। সোনালী ফ্রেমে বাঁধাইয়া কমলের ছবিখানির মোট দাম পড়িবে বারো টাকা। মধু ইহা কমলের পৈতায় উপহার দিবে। কমল বেশ খুশি হইয়া উঠিল দেখিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যে কিরূপ খারাপ হইয়া গেল তাহা বোধকরি কমল বা মধু কেহই বুঝিতে পারিল না। আমি যে দরিদ্র এই কথাটা বার বার তখন আমার মনে পড়িতে লাগিল! আর সেইজন্য বোধহয় কমল আমার চেয়ে মধুকে বেশী পছন্দ করে এই চিন্তা আমার মনকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতে লাগিল।

এইসব ভাবিতে ভাবিতে মেলার মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় হঠাৎ একটা গ্রামোফোনের দোকানের সামনে কমল থমকিয়া দাঁড়াইল। আমরাও তাহার সঙ্গে দাঁড়াইলাম। একখানি গান বাজিতেছিল। মিনিট দুই পরে গানটি শেষ হইতেই কমল একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, গ্রামোফোন যন্ত্রটা বেশ, না আলো, যে গানটা আমার ভাল লাগবে যতবার ইচ্ছে খুশিমত বাজিয়ে শুনবো?

গান শুনিতে আমিও খুব ভালবাসিতাম তাই তাহার কথায় সায় না দিয়া পারিলাম না। মধুও আমাদের সঙ্গে একমত হইল। আমরা সকলে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

এই ঘটনার শেষ এইখানেই হইলেও আসলে কিন্তু ইহার জের চলিয়াছিল বহুদিন পর্যন্ত। সেই কথাই এখন বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে।

পৈতার আগের দিন হঠাৎ মনে হইল আচ্ছা যদি আমি কমলকে একটা গ্রামোফোন উপহার দিই তাহা হইলে কেমন হয়?

মনে মনে কদিন ধরিয়া কেবল ইহা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়াছিলাম কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি নাই। তাই ইহা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর যেন একসঙ্গে তাহা সমর্থন করিল। ইহাতে শুধু যে কমলকে খুশি করা হইবে তাহা নহে, মধুর উপরেও রীতিমত প্রতিশোধ লওয়া হইবে। মধুর ফটোখানি কি ম্লান হইয়া যাইবে না এই গ্রামোফোনের কাছে! ইহা মনে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

সংসারে যে ইচ্ছা করিলেই সব জিনিষ পাওয়া যায় না তাহা বিশ্বাস করিবার মত বয়স বোধ-করি তখন আমার হয় নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ একবারও মনে হইত আমার মত নিঃস্ব ও পরাশ্রয়ীর পক্ষে ইহা অসম্ভব—বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে যাওয়ার মত। তাই পরের দিন যেন আমার স্বপ্নভঙ্গ হইল। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া আমার কল্পনা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। টাকা কোথায়? কি দিয়া এই কলের গানটি ক্রয় করিব! আর কেই বা দিবে আমায় টাকা?

আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। যেদিকে তাকাই দেখি অন্ধকার। রজতমুদ্রার ক্ষীণতম রশ্মি পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তবে কি কাল ছেলেমানুষের মত শুধু আকাশকুসুম রচনা করিয়াছিলাম? লজ্জায় নিজের কাছে যেন নিজের মুখ দেখাইতে সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অথচ আর সময় নাই—সেইদিন সন্ধ্যায় কমলের বাড়ি নিমন্ত্রণ, তাহাকে উপহার দিতে হইবে।

নিস্তব্ধ দুপুর। জ্যাঠাইমা খাওয়াদাওয়া সারিয়া পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন তাঁহার কোলের মেয়েটিকে লইয়া। শুধু তাহার উপরের ছেলেটি তখন ঘরের মেঝেয় অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। ভুতোরও ছুটি, সে টেস্টের পড়া পড়িবার জন্য হেডপণ্ডিতের কাছে গিয়াছে। অঙ্ক কষিতে কষিতে সহসা আমার

মনে হইল জ্যাঠাইমার কথা। তিনি একদিন বিনা কারণে আমায় চোর অপবাদ দিয়াছিলেন শুধু তাঁর বিছানায় হাত দিয়াছিলাম বলিয়া। তবে কি সত্যিই তিনি বিছানার নীচে টাকা লুকাইয়া রাখেন! কৌতূহল হইল পরীক্ষা করিবার জন্য।

তখন পা টিপিয়া টিপিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। আমার বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ির ঘা মারিতেছিল। বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই আমার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল যদি এখনি ওই পাঁচ বছরের ছেলেটি জাগিয়া ওঠে কিংবা আর কেহ আসিয়া পড়িয়া আমায় এই অবস্থায় দেখিতে পায় তাহা হইলে কি ভাবিবে! একবার মনে হইল দরকার নাই ফিরিয়া যাই কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে পড়িল কমলের কথা! গ্রামোফোন দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে আর তাহা দেখিয়া মধু বিমর্ষ হইয়া পড়িবে। হয়ত কমল এইবার প্রথম বুঝিতে পারিবে যে আমি তাহাকে মধুর চেয়ে বেশী ভালবাসি। আর ভাবিতে পারিলাম না। নিমেষে আমার শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতা, সততা সমস্ত ডুবিয়া গেল। আমি জ্যাঠাইমার বিছানার একোণ ওকোণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শেষে আবিষ্কার করিলাম একটি ছেঁড়া বালিশের ভাঁজ হইতে তিনখানি দশটাকার নোট! কম্পিত হস্তে আমি সেগুলি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বার বার পিছনদিকে তাকাইতে তাকাইতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় একটি ছোট কলের গান ও খানকয়েক রেকর্ড কিনিয়া লইয়া আমি একেবারে সোজা কমলের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। কমল আমাকে ওই অবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি?

বলিলাম, আজকের দিনকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তোকে এইটে উপহার দিলাম।

কমল বলিল, মিছিমিছি তুই এত টাকা খরচ করতে গেলি কেন? আর কোথা থেকেই বা পেলি তুই এত টাকা?

আমি বারদুই ঢোক গিলিয়া বলিলাম, আমার বাবা যে আমার জন্যে টাকা রেখে গিয়েছিল জানিস না? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যে আমার দারিদ্র্যকে কটাক্ষ করিল তাহা চিন্তা করিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল।

কমল আর কোন কথা না বলিয়া আমার হাত হইতে সেটি লইল এবং গান শুনিবার জন্য একখানি রেকর্ড লাগাইয়া দিল। মধুর কণ্ঠে ও করুণ সুরে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বাজিতে লাগিল—

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা
পিয়ো হে পিয়ো
হৃদয় বিদারী হ'য়ে গেল ঢালা
নিয়ো হে নিয়ো।
ভরা যে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারারাতি ধরে
লও, তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙীন হলো
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোল হে তোল।
সে রসে মিশাক তব নিঃশ্বাস
নবীন উষার কুসুম সুবাস
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো॥"

অদ্ভুত সুর ও অত্যাশ্চর্য বাণীর সমন্বয়ে মহাকবির এই গানটি যখন শেষ হইল তখন কাহারো মুখে কথা নাই—কিসের আবেশে যেন সবাই মুহ্যমান! মিনিট কয়েক এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর কমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রথম কথা বলিল, বড় করুণ ভাই, ভালো লাগে না। এই বলিয়া সে কাজে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় যন্ত্রটি বন্ধ করিয়া একটি নিভৃত স্থানে রাখিতে রাখিতে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, খবরদার এতে কেউ হাত দিবিনি, দামী জিনিষ ভেঙ্গে যাবে তাহ'লে।

কমলের ভাল লাগিল না শুনিয়া আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। তবে কি আমার সমস্তই ব্যর্থ হইল! এতকাণ্ড করিয়াও তাহার মন পাইলাম না! ক্ষোভে, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে আমার যেন তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল।

ইহার উপর আরো মর্মান্তিক হইল যখন কমলের ওখান হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ির দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা হইবে পল্লীও নিশুতি কিন্তু তখনো বাড়ির আলো জ্বলিতে দেখিয়া আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। মনে পড়িল, আজ আমি চোর, চুরি করিয়াছি জ্যাঠাইমার টাকা—ইহা আর জানিতে কাহারো বাকী নাই, তাই আমারই জন্য আলো জ্বালাইয়া সবাই অপেক্ষা করিতেছে! তবে কোন্ মুখ লইয়া বাড়িতে ঢুকিব! কম্পিত বক্ষে বাহিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার ফাঁক দিয়া বাড়ির ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সর্বশরীর ভয়ে হিম হইয়া গেল। জ্যাঠাইমা একটি কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া চুপ করিয়া বাহিরের রকে বসিয়া আছেন। ইহা যে আমারই জন্য তাহা বুঝিতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। কি করিব বুঝিতে না পারিয়া আমি সেখান হইতে কিছু তফাতে গিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

এমন সময় হঠাৎ 'কে' বলিতে বলিতে জ্যাঠাইমা আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আবার খিল আঁটিয়া দিতে দিতে আপন মনেই বলিলেন, ওমা মরু কেউ ডাকেনি অথচ আমার মনে হলো যেন কে কড়া নাড়লো! ছোঁড়ার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথার ঠিক নেই। রাত দুপুর হলো, তবু যদি এতটুকু আক্কেল বিবেচনা থাকে!

জ্যাঠাইমার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। চুরি ধরা পড়িয়াছে এবং তিনি যে আমারই জন্য জাগিয়া বসিয়া আছেন তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব রহিল না। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল কমল ও মধুর কথা! তাহাদের কানে একথা কাল সকালেই নিশ্চয় গিয়া পৌঁছাইবে। আর আমারই চোখের সামনে আমারই দেওয়া উপহার লইয়া কত না লাঞ্ছনা তাহারা করিবে। ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। তারপর মনে পড়িল, তাহারা হয়ত স্কুলের অন্যান্য ছেলেদের কাছে বলিবে—তারপর যদি হেডমাস্টারের কানে তোলে—! না, না অসম্ভব ইহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।

আমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী তখন কাঁপিতে লাগিল। সামনে, পিছনে ডাইনে, বামে—যেদিকে চাই দেখি অন্ধকার। আমাকে সান্ত্বনা দিবার, আমাকে 'আহা' বলিবার কেহ নাই। আমি একা যেন অনন্ত মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিয়াছি। তবে কাহার কাছে যাইব—কোথায় যাইব?

ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, না এখানে আমার স্থান নাই। আমি এখান হইতে পালাইব—আজই, এখুনি, এই রাত্রে!

সেই রাত্রে চুপি চুপি বাড়ি ছাড়িয়া, গ্রাম ছাড়িয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। গৃহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুক্তির আনন্দে আমার মনে যেন নূতন বল সঞ্চারিত হইল।

মাঠের পর মাঠ, জঙ্গলের পর জঙ্গল ছাড়িয়া আমি চলিলাম, নতুন রাজ্যে নতুন জীবনের পথে! যেখানে কমল নাই, মধু নাই, জ্যাঠাইমা নাই, যেখানে আমার বলিতে কেহ নাই, যেখানে আমি একা এবং অপরিচিত! কোন আকর্ষণ, কোন মোহ আর আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পরীক্ষা, নিজের ভবিষ্যৎ, লোকলজ্জা সমস্তের চেয়ে তখন আমার কাছে বড় হইয়া উঠিল সেই স্থান ত্যাগ করা।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সেই অন্ধকার রাত্রে একাকী হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যখন ভোরের দিকে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন অভূতপূর্ব আনন্দে আমার প্রাণমন নাচিয়া উঠিল। বাঁধন ছেঁড়ার আনন্দ যে কিরূপ তাহা সেদিন প্রথম অনুভব করিলাম। তারপর বিনা টিকিটে মার্টিন কোম্পানীর ছোট গাড়ীতে চাপিয়া একেবারে হাওড়া ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একে নূতন শীত পড়িয়াছে, তাহাতে ভোরের গাড়ীতে ও-লাইনে বিশেষ যাত্রীও ছিল না। অস্পষ্ট আলোকে যখন স্টেশনে নামিলাম তখন টিকিট চাহিতেও কেহ আসিল না দেখিয়া বাঁচিলাম। পকেটে আমার একটি পয়সাও ছিল না, একেবারে এক কাপড় ও এক জামায় নিমন্ত্রণ বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

(৫)

কতকাল পরে আবার কলিকাতায় আসিলাম! সেই নিবিড় পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া এতদিন পরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শহরের উপর প্রথম সূর্যোদয় দেখিয়া মনে হইল যেন আমি কোন স্বপনরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলো যখন প্রখরতর হইয়া উঠিল তখন সহসা আমার স্বপ্নভঙ্গ হইল। মনে পড়িল, আমি বিদেশে একাকী এবং কপর্দকহীন। কি করিব, কোথায় যাইব, বহুক্ষণ পর্যন্ত রাস্তার ধারে বসিয়া ভাবিলাম কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। শুধু বারবার এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, পরিচিত লোক বলিতে যাহা বুঝায় সেরূপ একজনও আমার এখানে কেউ নাই। অবশেষে দুই একজন ভদ্রলোকের কাছে পরামর্শ চাহিলাম। তাঁহারা রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, আমার পরিচিত লোক কেহ নাই শুনিয়া কেহ পরামর্শ দিল ধর্মশালায় যাইতে, কেহ বা হোটেলে। আমার মূলধন সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের জানাইলাম তখন আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহারা সবেগে প্রস্থান করিলেন পাছে আমি

কিছু চাহিয়া বসি এই ভয়ে। এবং যাইতে যাইতে কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্যও করিতে ছাড়িলেন না যে, আমি কলিকাতায় যে সমস্ত ভদ্রবেশধারী জুয়াচোর ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদেরই একটি ক্ষুদ্রতম সংস্করণ।

ইহা শুনিয়া নিজের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না—পথে যদি না খাইয়া মরিতে হয় তাহাও ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল।

কলিকাতায় রাস্তার অন্ত নাই! একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে কতদূরে যে চলিয়া যাইতাম তাহার ঠিক নাই—সমস্ত দিনেও যেন পথ ফুরাইতে চাহে না। বড় বড় বাড়ি, চওড়া চওড়া রাস্তা, রঙ-বে-রঙের গাড়ীঘোড়া, দিবা-রাত্র জনস্রোত দেখিয়া দেখিয়া আমার যেমন বিস্ময় বোধ হইত, তেমনি আরো দেখিতে ইচ্ছা করিত। পা ব্যথা করিলে কোন এক জায়গায় বসিয়া একটু বিশ্রাম লইতাম তারপর আবার চলিতে শুরু করিতাম। নব নব পথ আমাকে আকর্ষণ করিত নব নব উৎসাহে। শুধু এক পথ হইতে অন্যপথে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে আমার ভাল লাগিত।

একদিন—দুইদিন—তিনদিন কাটিয়া গেল। কিছু না খাইয়া, কাহারো সাহায্য না লইয়া শুধু পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ক্ষুধা পাইলে কলের জল খাইতাম এবং রাত্রে কোনদিন গঙ্গার ঘাটে, কোনদিন বা পার্কের মধ্যে পড়িয়া ঘুমাইতাম। ক্ষুধার জ্বালায় এক একবার মনে হইয়াছে কাহারো কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করি কিন্তু লজ্জায় পারি নাই।

এইভাবে তিনদিন কাটিবার পর চতুর্থদিন আর হাঁটিবার শক্তি ছিল না। দুই চার পা অগ্রসর হইলেই মাথা ঝিমঝিম করে, চোখে অন্ধকার দেখি। অবশেষে কিছুদূর যাইয়া একটা বাড়ির রকে বসিয়া পড়িলাম। বড়লোকের বাড়ি, হঠাৎ যদি কাহারো নজরে পড়িয়া যাই হয়ত আমার জীবনের বহু উন্নতি হইতে পারে—বসিয়া বসিয়া এইসব ভাবিতেছিলাম। বইয়ে ত এইরকমের কত কাহিনী পড়িয়াছি—আমার ভাগ্যে কি একটাও জুটিবে না? এ দিকে ক্ষুধার জ্বালায় চিন্তাশক্তি পর্যন্ত রোধ হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় আমারই সমবয়সী একটি ছেলে সেই বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া আমারি পার্শ্বে রকের উপর বসিয়া একটি বিড়ি ধরাইল। তাহাকে বিড়ি খাইতে দেখিয়া আমার কেমন কৌতূহল হইল। এত অল্পবয়স্ক কোন ভদ্রসন্তানকে ইতিপূর্বে আমি ওই দুষ্কার্য করিতে দেখি নাই তাই বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। ছেলেটির চেহারা ভালো, তবে গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি ও কালো একটা হাফপ্যান্ট পরা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম হয়ত তাহাদের অবস্থা ভাল নয়।

যাহা হউক আমাকে তাহার মুখের দিকে ওই ভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বারকতক খুব জোরে জোরে বিড়িটা টানিয়া লইয়া মুখ হইতে সেই অর্ধদগ্ধ অংশটি লইয়া আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, এই নে, তুই খা ভাই। নেশার জিনিষ একজনকে খেতে দেখলে আর একজনের মুখ চুলকোয়, না?

তাহার এইরূপ ধূমপান-তত্ত্বের দার্শনিক মতবাদ শুনিয়া আমার রাগ হইল। কিন্তু তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমি শুধু বলিলাম, না, আমি বিড়ি খাই না।

সে বলিল, ও আধখানা দিয়েছি বলে রাগ হলো, আচ্ছা নে একটা গোটা দিচ্ছি, এই বলিয়া সে তাহার হাফপ্যাণ্টের পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিতে করিতে বলিল, সকালে এক পয়সার কিনেছি এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল!

তখন বেলা এগারোটা বাজিয়াছে মাত্র। আমি তাহাকে আবার বলিলাম যে, আমি বিড়ি খাই না। প্রথমে সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই কিন্তু কেন জানি না এবারে করিল। তাই একটা ঢোক গিলিয়া সে আমায় প্রশ্ন করিল, তুই কোথায় কাজ করিস ভাই?

আমি বলিলাম, কোথাও না।

সে বলিল, তবে কি করিস্?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমার চোখে তখন জল আসিয়া পড়িল।

ছেলেটি বলিল, আমাদের এখানে কাজ করবি? খেতে পাবি, থাকতে পাবি—এছাড়া আবার মাইনেও পাবি?

চারিদিন ধরিয়া অনাহারে, আশ্রয়হীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার পর থাকা এবং খাওয়ার কথা শুনিয়া আমি আর না বলিতে পারিলাম না। মাহিনার কথা কিংবা কি কাজ করিতে হইবে—তাহাও চিন্তা করিবার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না, তাই বিনা আপত্তিতে সম্মতি জানাইলাম।

ছেলেটি বলিল, চল তবে আমার বাবুর কাছে। এই বলিয়া সে আমাকে লইয়া সেই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, ইহা একটা তামাকের আড়ত। সামনের প্রকাণ্ড লম্বা ঘরখানিতে চারিদিকে তামাকের অসংখ্য টিন ও তাল তাল তামাক খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের কড়িকাঠ হইতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বড় কাঁটা ঝুলিতেছে, তাহাতে মণ মণ তামাক ওজন হইতেছে। সেই ঘরেরই এক কোণে একটা উঁচু গদির উপর একটি লোক বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিল। তাহার কাছে যাইয়া ছেলেটি বলিল, বাবু এ কাজ করতে চায়—ট্যাঁপা ত দেশে গেছে—এখনো ফিরলো না—

লোকটি পূর্ববঙ্গীয় এবং জাতিতে কর্মকার—যেমন কালো তেমনি বেঁটে এবং তেমনি মোটা। পরনে একটি পাঁচ হাতি ধুতি, খালি গা, মহিষের মত সারা গায়ে লোমভরা। হুঁকায় সশব্দে একটা বড় রকমের টান মারিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিরে ছোঁড়া, তোর নাম কিরে?

নাম বলিলাম।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জাতরে তুই?

বলিলাম, ব্রাহ্মণ।

মুখটা বিকৃত করিয়া তিনি বলিলেন, হ্যাঁ সব শালা ব্রাহ্মণ! চুরিটুরি করে পালাবি না ত? কাজ করতে পারবি ত? তারপর আরো গোটা কতক টান হুঁকায় দিয়া বলিলেন, কলকাতায় কোন জানাশুনো লোক আছে, যে তোর হয়ে জামিন থাকতে পারবে?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না।

তিনি বলিলেন, এর আগে কোথায় কাজ করতিস্?

কোথাও না।

তিনি তখন একস্কন্ধে বার আষ্টেক ঘন ঘন টান দিতে দিতে বলিলেন, খাওয়া পরা ও দু'টাকা মাইনে দিতে পারি—পোষায় থাকো, আর না পোষায় পথ দেখো। তবে ভাল কাজ করলে পরের মাস থেকে আরো দু'টাকা মাইনে বাড়বে। এই বলিয়া তিনি এক মুখ ধোঁয়া আমার মুখের উপর ছাড়িয়া দিলেন।

না বলিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। দুইটি ভাত খাইবার জন্য তখন বোধ হয় আমি পারিতাম না এমন কোন কাজ ছিল না পৃথিবীতে। তাই সমস্ত রকমের অপমান ও হীনতা সহ্য করিয়া তাঁহার সর্তেই রাজী হইলাম।

তিনি তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার গদিতে ছোঁড়ারা যেমন খেতে পায় এমন আর কলকাতার কোন্ শালা আড়তদার দেয়, শুনি? এই জন্যে শালা আমার এখানে একবার যে আসে, আর নড়তে চায় না! শুধু পুঁইশাক চচ্চড়ি আর ডাল এখানে পাবে না। দস্তুর মত আলু বেগুনের তরকারী ও দুবেলা মাছ একখানা করে। তাছাড়া ভাতও যত ইচ্ছে খাও অন্য আড়তের মত মাপা নেই যে, দুটি বেশী চাইলে আর পাবে না—তবু শালাদের রস হয়—একবার দেশে গেলে আর আসতে চায় না। ট্যাঁপা শালা সাত দিনের ছুটি নিয়ে গেল অথচ এক মাস হয়ে গেল তবু দেখা নেই। এই বলিয়া আবার এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে ছোঁড়া যখন তখন বাড়িতে যেতে চাইব না ত?

পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম,—না। আমার চাকরী হইল।

আমার মত এবং আমার চেয়ে কিছু ছোট ও বড় আরো সাতজন ছোকরা সেই আড়তে চাকরী করিত। তাহাদের মধ্যে পালা করিয়া এক একজনকে এক একদিন রাঁধিতে হইত। আমিও ইহা হইতে রেহাই পাইলাম না। কি করিয়া রাঁধিতে হয় আমি একেবারেই জানিতাম না, তথাপি কর্তার গালাগালির ভয়ে রান্না চাপাইয়া দিতাম। যে ছেলেটির জন্য আমি এই চাকরী পাইয়াছিলাম তাহার নাম হরিচরণ; বাবু ডাকিতেন 'হরে' বলিয়া—সে-ই আমাকে রান্না দেখাইয়া দিত। ইহা ছাড়া দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার বাবুকে তামাক সাজিয়া দিতে হইত। এখানেও পালা ছিল, একজনের পর আর এক জনকে যাইতে হইত। বাবুর মুখে তামাকের নলটি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। তামাক ফুরাইলেই তিনি হুঙ্কার ছাড়িতেন—'ওরে ছোঁড়ারা তামাক দিয়ে যা' বলিয়া। কাহার পর কে যাইবে—তাহাদের মধ্যে ঠিক করা ছিল, আমাকেও তাহাদের দলভুক্ত হইতে হইল। আমার সমস্ত অন্তর ইহাতে বিদ্রোহ করিয়া উঠিত। এক একবার মনে হইত পলাইয়া যাই কিন্তু কোথায় যাইব? একে অপরিচিত স্থান তাহাতে পয়সা-কড়ি কিছুই নাই সঙ্গে! তবুও এখানে দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইতেছি, কে-ই বা ইহা দিবে? ক্ষুধার যে কি জ্বালা তাহা তিনদিন না খাইয়া বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম—তাই মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতাম।

পরের মাসে আমার মাহিনা হইল চার টাকা। বাবু আমার কাজে সন্তুষ্ট হইলেন। অন্য সকলের মাহিনা আমার চেয়ে বেশী ছিল। কেবল দুইজন ছাড়া অন্য সকলের মাহিনা ছিল আট টাকা করিয়া। ইহারা দুইজন দশ টাকা

(শেষাংশ ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারত ভ্রমণে শ্রীচৈতন্য

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

ভ্রমণ করিলে মন উদার, চিত্ত নির্মল হয়; বিশ্বপ্রেমের আস্বাদ পাওয়া যায়। বহু দেশ ভ্রমণে, নানা প্রকার নরনারীর সংস্পর্শে চিত্তে নব নব জ্ঞান উন্মেষ হয়। ভগবৎতত্ত্ব অন্বেষণকারী মাত্রই তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধি করিতে তীর্থে তীর্থে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, নদ-নদীতে, সাগর-সমুদ্রে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবও সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে ছয় বৎসর সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

"গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ দেশে গিয়া।
লোক নিস্তার করিল আপন ভ্রমিয়া॥"
"জীব নিস্তারিতে প্রভু, ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি উক্তি করিল প্রকাশ॥"

(চৈঃ চ—২৫ পরি-মধ্য)

চৈতন্যদেবের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্ত, মহাপ্রভুর প্রকট কালের পূর্বেচর মুরারী গুপ্তের কড়চা, কবি কর্ণপুরের চৈতন্য চরিতামৃত, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, গোবিন্দ দাসের কড়চা, লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল আদি গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। তাঁহার ভারত ভ্রমণের প্রভাবের কথা প্রবন্ধে পূর্ণ।

ভ্রমণ পঞ্জি

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তিনি ছয় বৎসর ব্যাপীয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

"তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন॥"

(চৈঃ চঃ—২।১।১৯)

১৪৩১ শকাব্দের ২৯শে মাঘ শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই শকে নবদ্বীপ হতে রাঢ়, শান্তিপুর, বরাহনগর, পানিহাটী হইয়া নীলাচলে গমন করেন।

১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিবার জন্য গিয়াছিলেন।

১৪৩৫ শকে সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে বিজয়া দশমীর পর গৌড়ে পুনরাগমন করেন।

(চৈঃ চঃ—২।১৬।৮৫ ও ২-১৬-৯০)

১৪৩৬ শকের বর্ষার পূর্বে বৃন্দাবনের পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নীলাচলে গমন করেন।

১৪৩৬ শকের শরৎকালে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন সময় প্রয়াগে দশ দিন ও কাশীতে দুই মাস অবস্থিতি করেন।

১৪৩৬ শকের (বা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে) চৈত্র মাস পর্যন্ত মহাপ্রভু কাশীতে ছিলেন।

১৪৩৭ শকের প্রথমেই চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করেন।

নীলাচলে যাইবার পূর্বেই পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণে শ্রীচৈতন্য গমন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই পূর্ব ভারত ও আসাম ভ্রমণের বৃত্তান্ত কয়েকখানি অসমীয়া, সংস্কৃত ও বাঙলা গ্রন্থে বর্ণনা আছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন জীবনীতে এ বিষয় ইঙ্গিত পর্যন্তই নাই।

(শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান পৃঃ ৫৫৩)



চৈতন্যঘাট ও মণ্ডপ (কাশী)

প্রথম ভ্রমণ—গয়াধাম

মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর (শ্রীচৈতন্যদেব) নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাসের পূর্বেই ১৪৩০ বা ১৪৩১ শকের প্রারম্ভে গয়াধামে গমন করেন। পথে চোরাগুনক নদে স্নান করিয়া ভাগলপুর জিলার মন্দারে মধুসূদন দর্শন করিয়াছিলেন। নদী পার হইয়া রাজগীর যান, তথা হইতে গয়ায় গমন করেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতে রাজগৃহ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট কেন্দ্র। রাজগীরের সপ্তশৈল বেষ্টিত উপত্যকাভূমিতে এখনও একটি উষ্ণজল প্রস্রবন রহিয়াছে। এই উষ্ণ প্রস্রবন নির্গত জল একটি পুণ্যতম কুণ্ড—ব্রহ্মকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সেই "ব্রহ্মকুণ্ডে চৈতন্যদেব স্নান দান সারিয়া গয়ায় গমন করেন" এ কথা লোচনদাস লিখিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—মন্দার দেখিয়া পুনপুনে (পাটনার নিকট) স্নান ও শ্রাদ্ধাদি সারিয়া মহাপ্রভু রাজগীর যাইলেন। (চৈতন্যঃ ভাঃ ১।১২।১৩২) মহাপ্রভুর গয়া যাইবার পথের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ করিয়াছেন—

অনেক সেবক সঙ্গে হাস পরিহাস রঙ্গে
ইন্দ্রাণী নৈহাটী করি বামে।
অজয় নদী পার হঞা আলকোন ডাইনে থুঞা
উত্তরিলা তিলপুর গ্রামে॥
ডাহিনা বামে রাউতড়া একতালা গৌড়পাড়া
বাহিয়া কানাঞির নাটমালে।
পড়িলা পর্বত তলে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে
তপ্তসিকতা রবিজ্বালে॥
দুর্গম পথ পরিহরি মগধে প্রবেশ করি
রাজগির ঈশ্বরপুরি বসে।
গোপাল মন্ত্র দশাক্ষর প্রেমভক্তি শক্তিধর
ঈশ্বরপুরী কহিল উদ্দেশে॥
ব্রাহ্মণ মহিমা যত কহি সব সজ্ঞাত
কালি হব গয়াক্ষেত্রবাসী॥

মহাপ্রভু যেখানে যেখানে গিয়াছেন, "আপনি আচরি ধর্ম অন্যেরে শিখাইয়াছে" তাঁহার গয়া গমনের প্রভাব এখনও সেখানে প্রতি যাত্রী পরিলক্ষিত করিতে পারেন। জয়ানন্দের মতে মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন পথে মন্দার-এ গমন করেন। তথা হইতে হরিড়াবোড়ি কংস নদ ও বৈদ্যনাথ দিয়া গঙ্গাপার হইয়া নবদ্বীপে আসেন। (পৃঃ—৩৩) এইরূপ একটি পথ প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান আছে। তিনি ১৪৩০ শকের পৌষান্তে গয়া হইতে নবদ্বীপে আসেন।

নীলাচলে গমন

চৈতন্য চব্বিশ বৎসর নবদ্বীপে লীলা ও প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া নীলাচলে গমন করেন এবং শেষ চব্বিশ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করেন। তার মধ্যে ৪ বৎসর দেশ ভ্রমণে যান। তিনি ২০ বার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করেন।

নিমাই ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবস—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী অবির্ভূত হন। (শ্রীচৈতঃ চঃ উপাদান—পৃঃ ২১) মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের ২৭শে মাঘ গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াতে পৌছান এবং ২৯শে মাঘ সংক্রান্তি দিনে পূর্ণিমা থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৎপরে তিন দিন রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়া ফুলিয়া ও শান্তিপুরে অবস্থান করেন। তথা হইতে নীলাচলে গমন করেন।

হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে॥

সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত সিংহগতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি॥"

(চৈঃ ভাঃ—৩।২।৩৮০)

মহাপ্রভুর পুরী যাইবার বর্ণনা বিভিন্ন বিভিন্ন চরিতকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে লিখিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন, মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে আটিসার যান, তথা হইতে ছত্রভোগে গিয়া নৌকা চড়িয়া উৎকলের সীমানার প্রয়াগ ঘাটে (ডায়মণ্ড-হারবারের পরপারে মন্ত্রেশ্বর নদের উপর) পেঁৗছিলেন। তারপরে—

এই মত মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কতো দিনে উত্তরিলা সুবর্ণ রেখাতে॥

(চৈঃ ভাঃ—)

তারপর তিনি—

দেব নদ পার হঞা সেয়াখালি দিঞা
উত্তরিলা তমলিপ্তে।
মন্ত্রেশ্বর কূলে বিষ্ণুহরি দেখিঞা
কহিলা মুরারী গুপ্তে॥

(চৈঃ মঃ—পৃ ৯৬)

সে স্থান হইতে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া বারাসতে উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর দাঁতন, জলেশ্বর হইয়া বাঁশদা ছাড়িয়া রামচন্দ্রপুর দিয়া রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন করেন। রাত্রি শেষে চৈতন্যদেব বাঙালপুরের মধ্য দিয়া অসুরেগড় ডাইনে রাখিয়া ভদ্রকে আসিলেন। ভদ্রক হইতে যাজপুর তৎপর মন্দাকিনী নদী পার হইয়া পুরুষোত্তমপুর মধ্য দিয়া কটকে আসেন। পরে সাক্ষীগোপাল দেখিতে পুরীতে গমন করেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ আজ ৪৮ বৎসর হইয়াছে। তাহার পূর্বে বাঙালীরা এই দুর্গম পথ দিয়া পদব্রজে পুরী যাইতেন।

যাজপুর

যাজপুর উড়িষ্যা প্রদেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর। প্রাচীনকালে যাজপুর বৌদ্ধদিগেরও এক প্রাচীন পবিত্র স্থান ছিল। শৈব প্রধান কেশরী রাজদের সময় উড্র দেশের রাজধানী কিছুকাল ছিল। এক সময় এই স্থানে দশ হাজার ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই স্থানে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই যাজপুরে

"কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
যাইলেন যাজপুর ব্রাহ্মণ নগর॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত—২)

চৈতন্যদেব যখন যাজপুরে গমন করেন, তখন যাজপুর সমৃদ্ধিশালী হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। এই দেশ তখন স্বাধীন রাজ দ্বারা শাসিত হইত। এখন সে রাজ ঐশ্বর্য নাই, সে শত শত দেব-দেউল আর গগন চুম্বন করিতে দণ্ডায়মান নাই, দেবমূর্তি সবই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রের পরলোকগমনের এবং কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলার পর হইতে যাজপুরের মহিমা অন্তর্হিত হইয়াছে।

"লক্ষ লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম।
যাজপুরে আছয়ে সতেক দেব স্থান॥
দেবালয়ে হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥

(চৈঃ ভাঃ—২য় খণ্ড)

মহাপ্রভু বৈতরণীর তীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। তখন এই স্থানে যজ্ঞ-বরাহ মন্দির ছিল না। প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণ রাখিবার জন্য এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। যখন কালাপাহাড় যাজপুরে ধ্বংস করেন, তখন কোন দৈব বলে এই মন্দিরটি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। চৈতন্যের এমনই মহিমা। এখনও বৈতরণীর মাহাত্ম্য, বিরজা দেবীর গরিমা, চৈতন্যদেবের প্রভাব যাজপুরের ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান করিতেছে। এখানের গরুড় স্তম্ভটির উপর গরুড় না



তাঞ্জোর প্রাসাদে সপ্ততল মহল

থাকিলেও স্তম্ভের কারুকার্য দর্শকের প্রীতি উৎপাদন করে।

বৈতরণীর স্নানের শেষে মহাপ্রভু বরাহ দর্শনে গমন করেন।

"তবে প্রভু গেলা আদি বরাহ সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেম রসে॥"

যাজপুর ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেব কটক হইয়া সাক্ষীগোপাল ও ভুবনেশ্বর দেখিয়াছিলেন।

হেনমতে মহানন্দ শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কত দিনে কটক নগর॥
ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষীগোপালের স্থান॥

(জয়ানন্দের চৈঃ মঃ)

মহাপ্রভু যে গড়গড়া ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন, সেইটি এখনও প্রস্তর দ্বারা বাঁধান রহিয়াছে এবং তাহার উপর একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে উড়িষ্যাবাসীদের নিকট এই স্থান একটি পুণ্য তীর্থ।

কটক নগর মহানদী ও কাঠজুড়ার অন্তরবর্তীতে অবস্থিত। রাজা নৃপেন্দ্র কেশরী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই শহর নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং কটকে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপূর্বে ভুবনেশ্বর কেশরী রাজাদের রাজধানী ছিল। কাঠজুড়ার লেটারাইট প্রস্তরের রিভেট্-মেণ্ট (বাঁধ) প্রাচীন কেশরী রাজাদিগের একটি অপূর্ব কীর্তি। বর্তমানকালের পূর্তবিদ্গণের বিস্ময় উৎপাদন করে এই স্থাপত্য কৌশল। বাঁধটি দীর্ঘে এক ক্রোশ।

"তথা হইতে মহাপ্রভু একাম্রবনে বা ভুবনেশ্বর নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শকাব্দে রুদ্রতেজ প্রতাপ রুদ্রের প্রতাপে আফগান বা পাঠানগণ হিন্দু রাজ্যের সীমানায় যাইতে পারে নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একাম্রকাননে দেবপ্রসাদ কোটি অক্ষুণ্ণ দেখিয়াছিলেন। মুরারী গুপ্তের কড়চায় আছে—তথায় সুরম্য প্রাসাদরাজির সমুন্নত শিখর দেশ চঞ্চল পতাকায় সুশোভিত যাহার বহির্দ্বারে সকল সর্ব-সুরাসুলভ ভূষায় বিভূষিত, তথাকার মানবগণ কৃত্রিম ভূষণ ত্যাগ করিয়া মনোহর অনুলেপনাদির (উল্কি) দ্বারা বিভূষিত হইত। অধিক কি সেই প্রাসাদের অধি-বাসিগণকে দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন ইন্দ্রের সহিত স্পর্ধা করিতেছে।" (উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সারদাচরণ মিত্র—পৃঃ ৭১)

ভুবনেশ্বরের দেউল ১২০ হাত বা ১৮০ ফুট উচ্চ এবং তাহার কারুকার্য উড্র-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভুবনেশ্বর মন্দিরই বিশ্ব-শিল্প জগতে হিন্দু স্থাপত্যর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তিনি সেখানে যে শিবাষ্টক উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা মুরারী গুপ্ত নিজ কড়চায় রচিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও লিঙ্গেশ্বর মন্দিরে অনেক পাণ্ডা পাঠ করিয়া থাকে—

নমো নমস্তে ত্রিদশেশ্বরায়
ভূতাদিনাথায় মৃড়ায় নিত্যম।
গঙ্গাতরঙ্গোত্থিত-বাল-চন্দ্র
চূড়ায় গৌরী নয়নোত্সবায়।

ভগবান পিনাকী তীর্থ সকল হইতে বিন্দু বিন্দু বারি সংগ্রহ করিয়া বিরাট 'বিন্দু-সরোবর' নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সরোবর ৮০০ হাতের উপর দীর্ঘ এবং ৫২০ হাত প্রস্থ। তাহার স্বচ্ছ-সুশীতল জলে চৈতন্য-

দেব অবগাহন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

তথা হইতে শ্রীচৈতন্য সাক্ষীগোপাল দর্শন করেন। বিগ্রহের সুশ্রী মূর্তি দেখিয়া ও গোপালের সাক্ষ্য দিবার কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হন। সেই আখ্যান কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের কড়চায় সাক্ষীগোপালের নাম আছে, কিন্তু মুরারী সাক্ষীগোপালের নামমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কবি কর্ণপুর সাক্ষী-গোপালের কথা কিছু কিছু বলিয়াছেন। আমি যখন ১৯৩৬ সালে সাক্ষীগোপালে যাই তখন সেখানে অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, এই স্থান অনেক প্রাচীন চৈতন্য-দেব আগমন করিবার বহু পূর্ব হইতে খ্যাত রহিয়াছে। সেই অঞ্চলের উড়িয়ারা বিশেষত নারিকেল ব্যবসায়িগণ মহাপ্রভুর পরম অনুরাগী এবং নাম সংকীর্তনে বিশেষ আগ্রহান্বিত।

আকুল হৃদয়ে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পুরীধামে ছুটিয়া যান এবং জগন্নাথ দর্শনে তাঁহার প্রেমের যে নিদর্শন পাওয়া যায় ভাবরাজ্যে তাহা দুষ্প্রাপ্য।

মর্তলীলার শেষ চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেই সময় মধ্যেও তিনি নীলাচলে দুইবার রথ উৎসব দর্শন করেন। তিনি বিশবার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করেন বিশ বারই সংকীর্তন ও প্রেমজ্ঞানে নর্তন করিয়া বেড়াইতেন। মহাপ্রভুর এই দীর্ঘ বিশ-বৎসর যাবৎ নীলাচলের লীলার কালে পুরীর মহাত্ম্য অধিক বিস্তার করিয়াছিল।

[illegible] দেশের নরনারী গৌরাঙ্গের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পুরীতে আজও গমন করে। চৈতন্যদেবের লীলাস্থান গম্ভীরা ও সিদ্ধবকুল বর্তমানে কত শত নর-নারীর শ্রদ্ধার স্থান হইয়াছে। এখানে চৈতন্যপ্রভুর ব্যবহৃত কাঁথা ও পাদুকা অতি ভক্তিসহ পূজিত হয়।

পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে হস্তিদ্বারের পূর্বদিকে শীতলার মূর্তি, কৃষ্ণ মূর্তি ও রাধাশ্যাম মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধাশ্যাম মন্দিরের দক্ষিণভাগে ও ভোগ মণ্ডপের ঈশান কোণে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিচারপতি সারদা-চরণ মিত্র তাঁহার 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' পুস্তকের (পৃঃ ১০৮) লিখিয়াছেন,—'তাঁহার মানব দেহ অবসানের কত পরে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে যে (তিরোভাবের) অল্প দিনেরই মধ্যে তাঁহার মূর্তি বিষ্ণু মূর্তির ন্যায় শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে পূজিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে তাঁহার ষড়ভুজমূর্তিও আছে।" সারদাবাবু আরো দেখাইয়াছেন—"পুরীর সমুদ্রকূলে 'স্বর্গ-দ্বার' অতি পুণ্যস্থান। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য স্বর্গদ্বারের নিকট তাঁহার মানবলীলার শেষভাগে বাস করিয়াছিলেন। যে স্থানে তিনি থাকিতেন তাহা স্বর্গদ্বারের সন্নিকট; তাহাই এখন নিমাই চৈতন্যর মঠ তথায় নিমাই চৈতন্য মূর্তি পূজিত হইয়া থাকে।" (ঐ পৃঃ ১২৪)

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"সর্বরাত্রি সিন্ধু তীরে পরম বিরলে,
কীর্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে।
হেন মতে সিন্ধু তীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্বরাত্রি নৃত্য করেন অতি মনোহর।"

পুরীধাম যাত্রীমাত্রই সেই অসীম অনন্ত নীলাম্বুরাশির দিগন্তব্যাপী মহিমায় যেমন পুলকিত হন তেমনই সমুদ্র তীরে বসিয়া নিমাই মঠ ও হরিদাস মঠ হইতে হরিধ্বনি শ্রবণে অপার আনন্দ পাইয়া থাকেন।

চৈতন্য প্রভাবেই পরম বৈদান্তিক সার্ব-ভৌম পণ্ডিত মহান রুদ্র তেজসম্পন্ন সার্বভৌম রাজা প্রতাপ রুদ্র গৌরাঙ্গ প্রেমের দাস হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে

মহাপ্রভু নীলাচলে কিছুদিন থাকিবার পরেই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়া অমর হইয়া আছেন।

১৪৩২ শকাব্দে "বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন" (চৈ চ—২।৭।৫)। মহা-প্রভুর নীলাচলের অন্যতম সহচর শিবানন্দ পুত্র কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন।

"অষ্টাদশ হানিস্ তত্র নীত্বা
বিলোক্য তং দেবমতীবহর্ষাৎ।
প্রচক্রমে চক্রমণীয় নাথো
বিমোহয়ন্ কাংশ্চন বিপ্র যোগৈঃ॥
দৃষ্টা জগন্নাথ মহাপ্রভুং তং
মহাপ্রভু গৌরসুধামরস্বঃ।
আদায় তস্যৈব নিদেশমাহো
অথো প্রমোদাদ দিশি দক্ষিণস্যাং॥

অর্থাৎ অনন্তর চৈতন্যদেব তথায় অষ্টাদশ দিবস অতিবাহিত করিয়া অতি হর্ষের সহিত জগন্নাথ দর্শন ও নিজগণকে বিমোহিত করিয়া তীর্থ ভ্রমণের উদ্যোগ করিলেন। জগন্নাথ দর্শনান্তে তাঁহারই আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

নীলাচলের নীলাম্বুরাশির কূলে কূলে আলালনাথ দর্শন করিয়া নাচিতে নাচিতে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের লীলার স্থান সীমাচলম্ পর্বতে উপস্থিত হন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুর রাজধানী এইস্থানে ছিল। কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের কৃষ্ণ নামোচ্চারণ নিরোধ করিবার জন্য নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে এই সীমাচলম্ পর্বত গিরিশ্রেণীর উপর হইতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই প্রহ্লাদ কৃষ্ণ সর্বজীবে ও বস্তুতে বর্তমান প্রচার করেন। পিতার প্রশ্নের উত্তরে প্রাসাদের স্ফটিক স্তম্ভ মধ্যেও কৃষ্ণ আছেন নির্দেশ করায় হিরণ্যকশিপু তরবারি আঘাতে কৃষ্ণ বধ করিতে যাইয়া স্ফটিক-স্তম্ভ বিদীর্ণ করেন। স্তম্ভ হইতে নরসিংহ অবতার বহির্গত হইয়া হিরণ্য-কশিপু বধ করেন। সীমাচলে সেই নরসিংহ দেবের সুদৃশ্য মন্দির এবং বৃহৎ তাম্র আধার আবৃত নৃসিংহ দেব অবস্থিত।

মহাপ্রভু মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৪৩২ শকে তিনি সীমাচলে গমন করেন।

যে স্থান হইতে তিনি দেবতা দর্শন করেন সেই স্থান পাণ্ডারা এখনও দর্শক-বৃন্দকে দেখাইয়া থাকেন।

মহাপ্রভু দুই বৎসর ব্যাপীয়া দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের উল্লেখও করেন নাই।

সীমাচল ওয়ালটেয়ার হইতে তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পর্বতটি ৮০০ ফিট উচ্চ। তলদেশ হইতে ৭০০ ধাপ বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। দেবালয় বৃহৎ —৬০০ শত বৎসরের পুরাতন।

নৃসিংহ ক্ষেত্রে অহোরাত্র যাপন করিয়া পুণ্যসলিলা গোদাবরী অভিমুখী হইলেন।

গোদাবরী তীরে চলি আইলা কথো দিনে এই গোদাবরীর সাগর সঙ্গম স্থলে রাজমহেন্দ্রী শহর—ইহার প্রাচীন নাম বিদ্যানগর। কোন কোন পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে উৎকলের দক্ষিণ বিভাগের রাজ-ধানী ছিল; এবং রায় রামানন্দ তথায় শাসনকর্তা ছিলেন। মহাপ্রভু গোদাবরীর যে ঘাটে স্নান করেন তাহা এখনও বিখ্যাত রহিয়াছে। এই স্থানে মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেব পরম বৈদান্তিক রামানন্দকে কৃষ্ণ প্রেমানু-রাগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত

সাধ্যনির্ণায়ক প্রশ্ন-উত্তর প্রেম শাস্ত্রের অপূর্ব বিষয়।

গোদাবরী ভারতকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করিয়াছে, আরবসাগর উপকূলে পশ্চিম ঘাট পর্বতশ্রেণীর এম্বক পর্বত (নাসীকের সন্নিকটে) হইতে গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গোপসাগরের কূলে পূর্ব-ঘাট গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া সাগরে সঙ্গ লাভ করিয়াছে। গোদাবরীর দক্ষিণ হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ আরম্ভ।

মহাপ্রভু অতঃপর মাদ্রাজের নিকট চিঙ্গলীপটে জেলার বিষ্ণু কাঞ্চী, শিব কাঞ্চী ও পক্ষিতীর্থ দর্শনে যান। পর্বতোপরে দুইটি শাপভ্রষ্ট শ্বেত পক্ষী প্রত্যহ বেলা দ্বিপ্রহরে আগমন করিয়া স্নান ও আহার শেষে উড়িয়া যান। মহাপ্রভু এই পাখীদ্বয়ের আগমন দেখিয়াছিলেন—আমরাও দেখিয়াছি। কি আশ্চর্য এই পাখী-ভোজন ব্যাপার। কোন বৈজ্ঞানিক এই তথ্যের মূল সত্য বাহির করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ কোলে শ্বেত বরাহ, চিঙ্গলীপটে জেলায় পিতাম্বর শিব এবং শিয়ালী ভৈরবী দেবী দর্শন করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ আসিবার পূর্বে গোদাবরী পার হইয়া গভীর বনমধ্যে পর্বত উপর মল্লিকার্জুন তীর্থে যাইয়া জ্যোতির্লিঙ্গ মহেশ দেখিলেন। তৎপর রামদাস মহাদেব দর্শন করিলেন।এই শিবস্থানের কর্মী ও জ্ঞানিগণ মহাপ্রভুর প্রভাবে পরম বৈষ্ণব হইলেন।

"সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে॥

সেস্থান হইতে অহোবালেম্ নামের তীর্থে সেখানে রামানুজ আচার্যের প্রতিষ্ঠিত মঠে গমন করেন। নৃসিংহদেব দেখিয়া স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। সিদ্ধ বট যাইয়া শ্রীসীতাপতি দর্শন করেন। ত্রিমল্ল তীর্থে ত্রিবিক্রম দেখিলেন। বৃদ্ধ কাশীতে শিব দর্শন করিলেন। তারপর এক গ্রামে গমন করিলেন। এইখানে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। মহাপ্রভু তাঁহাদের সকলকেই তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। সকল পণ্ডিত প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। সেই স্থানে এক প্রভাবশালী মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য বাস করিতেন। তাঁহার নব মত—(১) ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু (২) জগৎ অস্তিত্বহীন, উহা অবিদ্যাজাত; (৩) অহংতত্ত্ব; (৪) পরলোক ও আত্মার ক্রমোন্নতি; (৫) বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির উপায়; (৬) নির্বাণতত্ত্ব (৭) বৌদ্ধদর্শন; (৮) বেদ প্রভৃতি অপৌরুষেয় নয়; (৯) সগুণ ও নির্গুণ বাদ—সমস্তই মহাপ্রভু তর্কের দ্বারা খণ্ডিত করিলেন। মহাপ্রভুর প্রেমে তিনি অভিভূত হইলেন।

মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ত্রিপদী ত্রিমল্লে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করিলেন। মাদ্রাজের চল্লিশ ক্রোশ উত্তরে বেঙ্কটার নামে এক পর্বত আছে। সেই পবিত্র দুর্গম তীর্থেও মহাপ্রভু গমন করিলেন। আর্কট জেলায় ত্রিপতির নামক গিরি শৃঙ্গ উপর রামানুজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাম বিগ্রহ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরম আনন্দ পান।

তাঞ্জোরের বৃহদগেশ্বর শিব দর্শন করিয়া মহাপ্রভু কাবেরী তীরে কুম্ভোকোনাম হ্রদে স্নান করেন। কিম্বদন্তি আছে—



তিরুপটীর দেবালয়ের গোপুরম্

রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলি বসিয়া যে হ্রদ হইয়াছে তাহাই এই হ্রদে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে কুম্ভ-কোনাম দেবভাষা সংস্কৃত পঠন-পাঠের এক প্রসিদ্ধ স্থান।

কাবেরী নদীর কুক্ষিতে যে দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই শ্রীরঙ্গম। শ্রীরঙ্গমের অনন্তশায়ী নারায়ণ শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু প্রেমভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গম তীর্থে মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্ট নামে এক সাধকপ্রবরের আশ্রমে থাকিয়া চাতুর্মাস্য পালন করেন। এইখানে চারিমাস বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনা ও প্রেমরস বিতরণ করেন। এই শ্রীরঙ্গমে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া গীতা পাঠ করিতেন। তাহার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহাকে ঘৃণা করিত কিন্তু মহাপ্রভু তাহার গভীর নিষ্ঠা এবং ভগবানের চরণে একনিষ্ঠতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন।

নীলগিরি পর্বতের অন্যতম শৃঙ্গ ঋষভ পর্বতে মহাপ্রভু গমন করিলেন। মনোহর নারায়ণ দর্শন করেন। তথা হইতে শ্রীশৈলে শিব দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশৈলও নীল-গিরির অপর এক শৃঙ্গ। পুনরায় তাঞ্জোরের উত্তর-পূর্বস্থিত কামকোষ্ঠী (বর্তমান কুম্ভ-কোনম্ নামক) নগরে আগমন করেন। এই স্থান হইতে মাদুরায় গমন করেন। মাদুরার বিশাল মন্দির দর্শনে তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল সৃষ্টিশক্তির কথা উদয় হয়। মহাপ্রভুর আগমনের সময় এই মাদুরা বা দক্ষিণ মথুরা পরম সমৃদ্ধিশালী নগর ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তখন স্বাধীন পাণ্ড্য রাজগণের রাজধানী এই মাদুরা ছিল।

মহাপ্রভু মাদুরা হইতে কৃতমালা নদীতে (বর্তমানে যাহা ভিগে নদীরূপে পরিচিত) স্নান করিলেন। এই নদীর তীরে দুর্বেসন তীর্থ নগর অবস্থিত। এখানে রঘুনাথের বিগ্রহ দর্শন করিয়া মাহেন্দ্র শৈলে পরশু-রামকে বন্দনা করিতে গমন করেন। দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত দেশ যাহা বর্তমানে কেরল প্রদেশ বলিয়া পরিকীর্তিত এই স্থানে পরশুরাম ভারতকে নিক্ষত্রিয় করিয়া আগমন করেন। এই স্থান হইতে তাঁহার কুঠার নিক্ষেপ করেন। যতদূর পর্যন্ত তাঁহার কুঠার নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই পরশুরাম ক্ষেত্র বলিয়া বিদিত।

সেই স্থান হইতে মহাপ্রভু রামেশ্বরাভি-মুখে গমন করেন। রামেশ্বর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর। পাম্বেন নামক একটি প্রণালী ভারতবর্ষ হইতে রামেশ্বর ক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। রামায়ণে কথিত আছে লক্ষ্মণ ধনুকের অগ্রভাগ দিয়া এই যোজক প্রণালী খনন করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহার উপর সুন্দর সেতু নির্মিত হইয়াছে। ট্রেনে তাহার উপর দিয়া যাইবার সময় মনে হয় যেন সমুদ্রের উপর ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছি। মহাপ্রভু রামেশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করেন। রামায়ণের মহাকবি রামেশ্বরে সমুদ্র শাসনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ভারতের ধনু-ষ্কোটি তীর্থে আগমন করিলে একদিকে সমুদ্র রামচন্দ্র দ্বারা শাসিত হইয়া অদ্যাপি নিথর ও স্থির। আর রামেশ্বর ও লঙ্কার মধ্যে সেতুর অপর পার্শ্বে ভারত সাগর উত্তাল তরঙ্গ নৃত্যে অশান্ত হইয়া অসীমের দিকে ধাবিত হইতেছে, আবার

পদে ঊর্মিমালার নর্তনের সহিত ভারত মাতার পদপ্রান্তে আছড়াই পড়িতেছে। প্রকৃতিরাণীর এই লীলা মহাপ্রভুর চিত্ত প্রেমানন্দে আলোড়িত করিয়াছিল। তিনি রাসলীলার কথা স্মরণ করিয়া ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

প্রত্যাবর্তন পথে "মলয় পর্বত কৈলা অগ্যস্ত বন্দন"—নীলগিরির দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পয়স্বিনী তীরে ও ত্রিভন্দ্রম নগরের নিকট অনন্ত পদ্মনাভ দেখিয়া মহাপ্রভু অভিভূত হন। মাল্লার প্রদেশ বা মালাবার দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া পরমানন্দ পাইয়াছিলেন চৈতন্যদেব। তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এমন করিয়া চৈতন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়া নীলাচলে দুই বৎসর পর প্রত্যাবর্তন করেন।

"বৈষ্ণব মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব॥
সেসব বৈষ্ণব মহাপ্রভু দর্শনে।
কৃষ্ণ উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণ নাম সব।"

মাদ্রাজের মংলাপুরে জয়পুরের মহারাজ প্রতিষ্ঠিত বিরাট নবরত্ন গৌরাঙ্গ মন্দির চৈতন্যদেবের প্রভাবের নিদর্শন।

বৃন্দাবন যাত্রা

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বৎসরে চৈতন্য প্রভু বঙ্গদেশ হইয়া বৃন্দাবন গমনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন।

"আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিল পয়ান॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৬)

১৪৩৫ শকের বিজয়া দশমীর দিন বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে নিষ্ক্রমণ হইয়া ভবানীপুরে আসিলেন, সেখানে রামানন্দ, সার্বভৌম আদি সুধীজন এবং উড়িয়া ও গৌড়ীয় ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপর দিনে প্রাতে ভুবনেশ্বর চলিয়া আসিলেন। তথা হইতে কটকে আগমন করিলেন। তথায় বকুলতলায় রাজা প্রতাপ রুদ্রের সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভু মহানদীতে স্নান করিলেন। যেখানে তিনি স্নান করিয়াছিলেন রাজা প্রতাপ রুদ্র তথায় একটি ঘাট ও স্মরণ স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই স্থান পরম তীর্থ স্থান রূপে গণ্য হইয়া আছে।

কটক হইতে বহির্গত হইয়া প্রভু চিত্রোৎপল নদীর ঘাটে স্নান করিলেন। এবং নৌকা যোগে যাত্রা করিলেন। যাজপুর হইতে রেমুণাতে আসিলেন। এই স্থানে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। বালেশ্বরের চৌদ্দ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রক এবং তার তিন ক্রোশ পূর্বে রেমুণা। তথন প্রভু উড্র দেশের সীমায় উপস্থিত হইলেন। এই উড়িষ্যার সীমানা হইতে পিছলদা পর্যন্ত এক দুর্দান্ত যবন রাজা রাজত্ব করিতেন। তার ভয়ে তখন কেহ এই রাজ্য মধ্য দিয়া যাইতে পারিত না। আশ্চর্য মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সেই যবন রাজ চৈতন্য প্রভুর সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহার ধর্ম সম্মানের সহিত মান্য করিলেন। "ম্লেচ্ছ আসিয়া কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে" এবং প্রভুর বঙ্গদেশ যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মন্ত্রেশ্বর নদ পার হইয়া পিছলদা পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে সেই যবন রাজ আসিলেন। তৎপরে নৌকাযোগে মহাপ্রভু পানিহাটী আসিলেন।

"সেই নৌকা চলি প্রভু আইলা পানিহাটি" আজও সেই স্থান পরম বৈষ্ণব তীর্থে পূজিত হয় এবং প্রতি বৎসর বিরাট মেলা হয়। বরাহনগরে পাঠবাড়িতে রামদাস বাবাজী এক বিরাট বৈষ্ণব সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বহু পুঁথি, বৈষ্ণব গ্রন্থ, বহু বৈষ্ণব সাধকের ব্যবহৃত কাঁথা ও জপমালা, বৈষ্ণব তীর্থ রেণু, নানা তীর্থ-বারি ও রজ, চৈতন্যদেব ব্যবহৃত সামগ্রী সংগৃহীত রহিয়াছে।

গৌড়

পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করেন। একদিন থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীনিবাস ঘরে গমন করিলেন। বাসুদেব, শিবানন্দ, বাচস্পতি, মাধব দাস গৃহে সাত দিন থাকিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গমন করিলেন। সে স্থানে শচী মাতাকে দর্শন করেন। সেখান হইতে রামকেলী যান পরে কানাইয়ের নাটশালাতে গমন করেন। যেখান যে রাস্তায় গমন করিতেছেন সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া দর্শনে ভিড় করিতেছে। এই লোকারণ্য মধ্য দিয়া তীর্থ গমন করিলে তীর্থ দর্শনের জন্য চিত্ত বিশুদ্ধ থাকে না। সেই জন্য এই পথ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন এবং নীলাচলে ১৪৩৬ শকের বর্ষার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

১৪৩৬ শকাব্দে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দর্শন করিয়া শরৎকালে কেবল মাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া লুকাইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রসিদ্ধ পথ ছাড়িয়া উপপথে গিয়াছিলেন। কটক ডাহিনে রাখিয়া বনে প্রবেশ করেন। তাঁহার কৃষ্ণনামের প্রভাবে বনের পশুরাও পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।

"পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥"

একদিন পথে এক ব্যাঘ্র শুইয়াছিল তার গায়ে প্রভুর চরণ আবেশে লাগা মাত্রই সেই হিংস্র ব্যাঘ্র পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল। চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন।'

প্রভু কহে, কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥

ছোটনাগপুরের নিকট বিশাল গভীর ঝারিখণ্ড নামক জঙ্গল মধ্য দিয়া প্রভু নেচে গেয়ে চলিয়াছেন। মহাপ্রভু কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মণিকর্ণিকাতে—মধ্যাহ্ন স্নান করিবার সময় তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তপন মিশ্রের বাটিতে আহার করিতেন এবং চন্দ্রশেখরের বাটি রাত্র যাপন করিতেন। তাঁহাদের অনুরোধে দশ দিন কাশী ছিলেন। তথা হইতে মথুরা যাত্রা করেন পথে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করিয়াছিলেন। "মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রাম ঘাটে স্নান। জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম॥"

তখন মথুরা অতি সমৃদ্ধশালী নগর। কেশব মন্দির বৃহৎ স্থাপত্য নিদর্শন ছিল। আওরাংজেব সেই বিশাল ও সুদৃশ্য কারুকার্যময় মন্দির ধ্বংশ করিয়া তাহারই ভগ্নস্তূপের উপর মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছেন।

মহাপ্রভু মথুরা হইতে প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বৃন্দাবনে পদার্পণ হইয়া মহাপ্রভু প্রেমানন্দে অধীর হন। বৃন্দাবন যেন সাক্ষাৎ ভগবানের লীলাভূমি—মহাপ্রভু উপলব্ধি করিয়া ভাগবতের সব লীলা স্মরণ করিয়া তাহার এক অপূর্ব ছবি পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। সেই মতন আজও বৃন্দাবনবাসী ও বৃন্দাবন তীর্থযাত্রীরা ব্রজের খেলা অনুভব করেন।

আধুনিক বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বাঙালীর এক মহৎ উপনিবেশ। বৃন্দাবন ভূমিখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ পাইকপাড়ার ত্যাগী প্রেমিক লালাবাবুর জমিদারী। মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় "মদনমোহন", "গোপীনাথ" ও "গোবিন্দ" বিগ্রহ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ গোস্বামীর যত্নে প্রকট হইয়াছিলেন। বাদশার আমলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সম্প্রীতি জাগরিত হইয়াছিল তাহারই নিদর্শন বিরাট বিশাল "গোবিন্দদেবের" দেউল। সে দেউলের উপরি অংশ আওরাংজেব ধ্বংস করেন। 'গোবিন্দ' বিগ্রহ এখন জয়পুরে পূজিত হইতেছেন।

মহাপ্রভুর প্রভাবে ছয় গোস্বামী—রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, ভট্ট রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণের নানা লুপ্ত লীলা প্রকট করিয়া প্রেমধর্মের যে ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন তাহা চারিশত বর্ষ লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সাধন পথের পাথেয় যোগাইয়া আসিয়াছে।

এখনও বৃন্দাবনে লোকনাথ, যাদব আচার্য, গোবিন্দ, উদ্ধবদাস, মাধবদাস, গোপালদাস, নারায়ণদাস, [illegible]দাস, পুণ্ডরী-

কাক্ষ, ঈশান, হরিদাস আদি ভক্ত গোস্বামী-গণের স্থান, আশ্রম, সমাধি-মন্দির বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর আগমনের প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

তৎকালেও শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড তীর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভু ভাবাবেশে দুইটি ধান্য ক্ষেত্রের গর্তে সেই দুই কুণ্ডের স্বরূপে দর্শন করিয়া স্নান করেন। তাহাই আজ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে খ্যাত এবং তীর্থ স্থানটি যাত্রীদের পরম পবিত্র ও আরাধ্য।

"রাধাকুণ্ড বার্তা প্রভু পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থলুপ্ত জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮)

মহাপ্রভু গিরিগোবর্ধন শিরোপরি গোপাল মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন। গিরিগোবর্ধনের উপর পা দিবেন না—সংকল্প করেন। তখন অপূর্ব ঘটনাবলে গোপাল নিম্ন এক গ্রামে আনীত হয়। চৈতন্য দেব তাঁহার দর্শনে সুযোগ পায়। তৎপরে প্রভু যাবতীয় দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে মহাপ্রভুর পরিক্রমা পদ্ধতি ব্রজপরিক্রমা নীতি রূপে সাধিত হইতেছে।

বৃন্দাবন ভ্রমণ লীলা শেষ করিয়া শ্রীচৈতন্য গংগাতীর পথ অবলম্বন করিয়া প্রয়াগে উপনীত হন। দশ দিন প্রয়াগে থাকিয়া মকর স্নান করেন।

এই মত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা॥

প্রয়াগে রূপ গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর মিলন হয়, তিনি তাঁহাকে বৃন্দাবন লীলা প্রচার জন্য নানা শক্তি উপদেশ, নির্দেশ দিয়া বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ প্রদান করেন। রূপের সংগে তাঁহার ভ্রাতা অনুপমও ছিলেন।

বারাণসী

প্রয়াগ হইতে মহাপ্রভু বারাণসীতে আসিলেন। এখানে তিনি দুই মাস—অর্থাৎ ১৪৩৬ শকাব্দের চৈত্র মাস পর্যন্ত (১৫১৫ খৃঃ মার্চ) অবস্থান করেন। তিনি কাশীবাস সময়ে চন্দ্রশেখরের বাটী আসন পাতিয়াছিলেন এবং তপন মিশ্রের বাটী আহারাদি করিতেন।

যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সংগে ভিক্ষা কাঁহা না করিব॥
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অস্বীকার।
বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯)

এই সময় এই স্থানে সনাতন আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। চন্দ্রশেখরের বাটীর প্রাঙ্গণে বটবৃক্ষতলে বসিয়া সনাতন সহিত মহাপ্রভু রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেম প্রচারের জন্য শক্তি ও নির্দেশ প্রদান করেন।

এই স্থানেই পরম বৈদান্তিক পণ্ডিত স্বামী প্রকাশনন্দকে তর্কে পরাস্ত চৈতন্য দেব করিয়াছিলেন। তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রকাশনন্দ দশ সহস্র শিষ্যসহ মহা-প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করেন। এই প্রকারে শৈব প্রধান বারাণসী ধামেও রাধা-কৃষ্ণ প্রেমবন্যা ছুটিয়া গিয়াছিল। অদ্যাপিও বিশ্বনাথের রাজত্বে রামচন্দ্রের দেশেও গৌড়ীয় রাধা কৃষ্ণ প্রেমের প্রভাব দেখা যায়।

সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্তন।
প্রেমে হাসে নাচে গায়ে করয়ে নর্তন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার॥
(চৈঃ চঃ মধ্য—২৫)

মহাপ্রভুর কৃপায় হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দেখা যায়। সেই সম্প্রদায়ের গোপালদাস বাবাজী যে বটতলায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মহল্লাটি বর্তমানে কাল-ভৈরবের নিকট 'চেতনবড়' বলিয়া পরিচিত। পূর্বে এখানে এক বটগাছ ছিল। সে বটবৃক্ষতলে বসিয়া চৈতন্য দেব ধর্ম উপদেশ দিতেন। ষাট বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সে বটবৃক্ষ এই স্থানের বাসিন্দাগণ দেখিয়াছেন বলিয়া কয়েকটি প্রাচীন ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

পূর্বে এই বটতলা 'চৈতন্যবট' বলে খ্যাত হইত, এখন তাহার কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই স্থান বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির অধিকারে এখানে একটি দুধ-দধির সট্টী (বাজার) নিত্য বসিয়া থাকে। মুরারি গুপ্তের করচায় আছে—মহাপ্রভু নীলাচলের অভিমুখে যাইবার যাত্রাকালে এখানে একজন গয়লার নিকট হইতে 'তক্র' (ঘোল) পান করেন। তদবধি এইখানে দুধ-দৈ-এর কেনা বেচা হয়।

ইহার পশ্চাতে চন্দ্রশেখরের ভীটা ও পার্শ্বে তপন মিশ্রের বাটী ছিল। বর্তমানে, যেখানে তপন মিশ্রের বাটী ছিল এবং তাহার পরে রঘুনাথ চৈতন্য মঠ স্থাপন করে, তাহা এখন এক শিখগুরুদ্বারে পরিণত। এখনও একটি দ্বারের উপরে পাথরের দেবনাগরী অক্ষরে চৈতন্য মঠ খোদিত আছে।

এই সতনবট বা চেতন বটতলা বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির ১৯৩৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী ক্ষসের সভা চৈতন্য দেবের অবস্থান স্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এবং সেই স্থানে একটি চাঁদনী ও ... গোপালদাস বাবাজীর প্রচেষ্টায় নির্মিত হইয়াছে।

সেই চাঁদনীর 'পেরাপেট্' ও আলিসায় বড় বড় বাঙলা অক্ষরে—

"ষড়ভূজ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহাশয়
প্রেমভক্তি যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর,
হরে রাম, হরে রাম,
রাম, রাম, হরে হরে।

লেখা রহিয়াছে। ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশীর প্রধান রাস্তা বিশ্বেশ্বরগঞ্জের সম্মুখ হইতে চৈতন্য বট বেড় দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, বেনারস মিউনিসিপ্যালিটি সেই রাস্তার নাম 'চৈতন রোড' করিয়া দিয়া মহাপ্রভুর কাশীধামে আগমনের স্থানটি দর্শকের মনে জাগরূক রাখিয়াছেন।

কাশী হইতে তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। কাহার কাহারে মত, তিনি নীলাচলে যাইবার পূর্বে আসাম ও পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ গিয়াছিলেন।

এই প্রকারে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ... স্থান তাহার পদস্পর্শে আজ তীর্থে পরিণত হইয়াছে। কত গ্রন্থ তাহার ভ্রমণ বিবরণ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কত সাধক ও কবি তাহার মহিমা কীর্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আজ চারিশত বর্ষ এই বাঙালী জাতি চৈতন্য গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। বাঙালীর স্বাধীনতা নাই, ... নাই, ঐশ্বর্য অপ্রতুল, ধৈর্যলুপ্ত ... কেবল গৌরাঙ্গ নাম। কলিতে নাস্তি কেবলং বলিয়া এখনও জগৎ সভায় মস্তক উত্তোলিত করিতে পারে। সেই মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তনে ও শ্রবণে নর-নারী ধন্য ও পুণ্য হয়।

আসাম ও পূর্ব-ভারত

ভট্টদেব তাঁহার "সৎসম্প্রদায় কথা" (পৃঃ ৩০) চৈতন্যের আসাম ভ্রমণ সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন। কৃষ্ণ-ভারতী 'সন্তনির্ণয়ে' শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ সম্বন্ধে বিবরণ আছে—'শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে কামরূপ মাধব দর্শন করিতে গমন করেন:—এই শানি রত্ন পাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঞি এই মাধবর মনিকূটব গোফাতে আছিল। এখন জগন্নাথক গৈল।"

কৃষ্ণ আচার্য 'সন্তবংশাবলীতে' লিখিয়াছেন।

তেবহন্তে প্রভু কামরূপ গৈলা
মণিকূট গীরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোফাত
চৈতন্য প্রভু রহিলা॥

হয় পাঠক   শরণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা ॥

আধুনিক অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যই দক্ষিণ প্রদেশোতে ধর্মপ্রচার করি তার পরা এবার মণিপুর চলৈ আহি, তাতো ধর্মপ্রচার করি সন্ন্যাসী বেশরে আসাম চলে আহি হাজোতে কিছুদিন আছিল।" (শ্রীশঙ্কর দেব আরু শ্রীমাধব দেব ১২০ পৃঃ)।

হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি। হাজোতে মণিকুট নামে একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহ কুণ্ড। এই গুহাটিকে লোকে 'চৈতন্য ধোপা' বলিয়া থাকে এবং চৈতন্য দেব কিয়ৎকাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩২২ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৮১)।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন, "আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্য কোন সময়ে আসামে গিয়াছিলেন। তিনি যদি তথায় একেবারেই না যাইতেন, তাহা হইলে এতগুলি কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইতে পারিত না।" (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ৫৫৭)

মণিপুর

আমরা যখন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে আসাম ও মণিপুরে ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখনও চৈতন্য দেবের আসাম ভ্রমণের কথা বহু স্থানে শুনিয়াছি, 'চৈতন্য ধোপা' দেখিয়াছি এবং মণিপুরবাসী নর-নারীর চিত্তে শ্রীচৈতন্য দেবের প্রভাব অনুভব করিয়াছি। তিনি আসাম ও মণিপুরে ভ্রমণ না করিলে চৈতন্য দেবের প্রেমধর্মের এত অধিক অনুরাগী অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যাইত না। মণিপুর ত এখনও গোরাপ্রেমে ও নাম সংকীর্তনে ডুবিয়া আছে।

মণিপুরের প্রতি ঘরে তুলসীমঞ্চ বিরাজ করে। মণিপুরের নর-নারী সকলেই শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন, চৈতন্যভক্ত। মণিপুরের রাজবংশ পরম বৈষ্ণব। মণিপুরের মহারাজা নবদ্বীপে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া প্রায় বাস করেন। বর্তমানের মহারাজ বর্তমান কালে নবদ্বীপে বাস করেন। মণিপুরের এক মহারাণী নবদ্বীপের মণিপুরী মহলে 'অনুপ্রভু' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরাঙ্গ প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে সন্ধ্যার সময় হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হইয়া উঠে। মণিপুরের গোবিন্দ দেবের মন্দির ও বিরাট নাটমন্দির (এম্পিথিয়েটার) গোবিন্দ দেবেরই প্রভাবের নিদর্শন।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ উল্লেখ করিয়া বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন—

"তবে কথো দিনে ইচ্ছাময় ভগবান।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং উত্তর পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রেমধর্ম ও নাম সংকীর্তন মহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত উত্তরকালে শত-সহস্র সাধক, গোস্বামী, ভক্ত, পদকর্তা চারিশত বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তীর্থে, কীর্তনে, গীত-কাব্যে, পদাবলী সাহিত্যে অপূর্ব দান করিয়া বাঙালীর প্রাণে অপার শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়াছে।

মহাপ্রভুর অহিংসা, সর্বজন-প্রীতি, ভগবৎ প্রেম আমাদের এই দুঃখময় জীবনে শান্তি

বাঁকাস্রোত

(৬১৬ পৃষ্ঠার পর)

করিয়া পাইত। ইহারা ছিল বাবুর প্রিয়পাত্র। তাঁহার মাথা টিপিয়া দিত, পা টিপিয়া দিত এবং রাত্রে পালা করিয়া এক একজন তাঁহার নিকট থাকিত। বাবু আড়তের উপরে দোতালার একটি ঘরে থাকিতেন; আর আমরা সকলে নীচের একটি ঘরে শুইতাম। মনে মনে অন্য সকলে সেই ছেলে দুটির সৌভাগ্যে হিংসা করিত।

এইভাবে আরো একমাস কাটিয়া গেল। তারপর একদিন হরিচরণ আমায় চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল, বাবু তোর ওপর খুব খুশি হইয়াছেন, তিনি বলছিলেন তুই যদি একটু রাত্রে বাবুর কাছে থেকে তাঁকে দেখিস, তাহলে পরের মাসেই তিনি তোর মাইনে আট টাকা করে দেবেন। ওঃ, তোর ভাগ্যটা খুব ভালো— আমরা তিন বছর চার বছর ধরে চাকরী করেও যা করতে পারিনি তুই দু'মাসে তাই পেয়ে গেলি। যাক আমায় কিন্তু একদিন 'রেষ্টুরেণ্টে' খাইয়ে দিস ভাই।

আমি বলিলাম, দরকার নেই আমার মাইনে বেড়ে—আমি চাইনা বাবুর এই অনুগ্রহ। বাবুর আচার ব্যবহার রীতিনীতি আমাকে দিনরাত পীড়া দিত। তবু সহ্য করিতাম আর উপায় নাই বলিয়া।

হরিচরণ বললে, আরে বোকা, তোকে কোন কাজ করতে হবে না—বাবুর বাতের ধাত কিনা, যেদিন বাড়বে, হয়ত একটু মালিশ ক'রে দিলি, নয়ত একবার দু'বার ওষুধ খাওয়ালি, বাস্— তোফা বাবুর খাটের উপর গদীওলা বিছানায় শুয়ে থাকবি। তোর ত খুব আরাম।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, চাই না আরাম—ও তোরা ভোগ করগে।

হরিচরণ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে স্বেচ্ছায় এই সৌভাগ্যসুখ কেহ ত্যাগ করিতে পারে, তাই ইহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। কয়দিন হইতে মনটা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিল। সর্বদা ভাবিতাম এইভাবে কি আমার দিন কাটিবে— তামাক ওজন করিয়া, বাবুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া, ভাত রাঁধিয়া কতকগুলি মূর্খ ও নীচ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ছেলেদের সাহচর্য করিয়া ? তাহার উপর আবার হরিচরণের নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া সমস্ত অন্তর যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতে সেই কাজ আর আমার ভাল লাগিত না। সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতাম। সহকর্মীরা প্রায়ই প্রশ্ন করিত, বাড়ির জন্যে মন কেমন করিতেছে কিনা; কিন্তু আমি তাহাদের কোন ঠিকমত উত্তর দিতে পারিতাম না।

এমনি করিয়া আরও কয়েকদিন কাটিবার পর হঠাৎ একদিন বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং একটি কাপড়ের পুঁটুলি হাতে দিয়া বলিলেন, সেটি তাঁহার ভায়ের বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে। নিকটেই ছিল তাঁহার ভায়ের বাসা। আমি গিয়া যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাড়ির ভিতরে পা দিতেই কানে আসিল বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র পড়িতেছে। সে এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। তাই চীৎকার করিয়া ইংরেজী পড়া মুখস্থ করিতেছিল। যে অংশটি সে পড়িতেছিল, আমারও সেটি মুখস্থ ছিল। তাহা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভিতরটা কেমন ঘুলাইয়া উঠিল। প্রথমেই মনে হইল আজ কত তারিখ? তারপর হিসাব করিয়া দেখিলাম আর চারদিন বাকী আছে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার।

সেদিন রাত্রে আমার কি হইল কি জানি, কিছুই খাইতে পারিলাম না, চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া রহিলাম। কিন্তু শুইয়াও শান্তি পাইলাম না। কিছুতেই চোখে ঘুম আসিল না, বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলাম।

গভীর রাত্র। কলিকাতার শহর বোধ করি তখন একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল দেশে যাইবার জন্য। সে ব্যাকুলতা এমনই দুর্দমনীয় যে আমি কিছুতেই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। চুপিচুপি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। তারপর নিঃসাড়ে দরজা খুলিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, তামাকের আড়তের মনিব এবং সহকর্মীরা যখন সকলে ঘুমাইতেছে আমি তখন তাহাদের না জানাইয়া একেবারে স্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। কিন্তু স্টেশনে আসিয়া দেখিলাম ভোরের গাড়ি কিছুক্ষণ পূর্বে ছাড়িয়া গিয়াছে—পরবর্তী ট্রেণ সেই বেলা একটায়।

দুপুরের মধ্যে বাড়ি গিয়া পৌঁছাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আরো কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে ভাবিয়া আমার মন যেন অস্থির হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল কমলকে, মনে পড়িল খেঁদীকে, মনে পড়িল জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা, ভুতো প্রভৃতি সকলকে, এমন কি সেখানকার গাছপালা ডোবা পুষ্করিণী, মাঠ ঘাট জঙ্গল সমস্ত দেখিবার [illegible] একসঙ্গে মন কাঁদিয়া উঠিল।

অত্যয়

গুণধম্বর বসু

ইলাবন্তর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে জ্যোৎস্নায় চারিদিক সাদা হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র ভোর হল। বিছানা ছেড়ে ইলাবন্ত উঠে পড়লো—আর শুয়ে থাকলে চলবে না। পাশের ঘর থেকে ছোট্ট দুটি ছেলেকে ডেকে তুললে—ওঠ, বংকু, টোনা; ওরে ওঠ, ওঠ। আর শুয়ে থাকিসনে, ভোর হয়ে গেছে।

পত্নী মৃণালের ঘুম ভেঙে গেল। বয়সের ভারে নয়, সংসারের চাপে আর অভাবের তাড়নায় তার স্বাস্থ্যে ভাঁটা পড়েছে। বয়সের সংগে সংগে মেজাজেও রুক্ষতা আসছে একটু একটু। তার ওপর কাঁচাঘুম ভেঙে যেতেই সে তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো—রাত দুপুরে ওদের ডাকছো কেন বলো ত! যাও শুয়ে থাকো গে। ভোর হলে উঠবেখন।

ইলাবন্ত কিঞ্চিৎ সুর নামিয়ে বললে—তুমিও উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি, আর পরে গেলে ভিড় হয়ে যাবে। ছেলে দুটোকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আসি। আর পথও ত' বড় কম নয়—

মৃণাল তবুও বললে—ভোর এখনও হয়নি; এখন ওরা উঠবে না; আমিও উঠে পয়সা বের করে দিতে পারবো না তোমায়।

ইলাবন্ত অপেক্ষাকৃত জোরে বললে—অর্থাৎ আজকে অফিসে যাই—সেটা তুমি পছন্দ করো না। কেমন?

এরপর আর শুয়ে থাকা চলে না।

মৃণাল বিছানা ছেড়ে সত্যিই উঠে পড়লো। ঘরে চাল নেই,—ছেলে দুটিকে কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে যাবে ইলাবন্ত; কালকে কোথা থেকে দুটি টাকা সংগ্রহ করে এনেছে সে—তাই দিয়ে আজকের সংসারটা চলুক; তারপর সবই ত' ভবিষ্যৎ—আর ভবিষ্যৎ সবই ত' অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুতরাং যা হয় হবে।

মৃণাল বললে—দেখো বাপু, তুমি আর ওদের অতদূর নিয়ে যেয়ো না। আমাদের পাড়ার দোকানে দাঁড় করিয়ে দিলেই ত' চলে।

ইলাবন্তর জীবনে কেমন একটা বীতশ্রদ্ধ নিশ্চেতনার ভাব এসে জমেছে—সব ব্যাপারেই নিরুৎসাহতা এবং অমনোযোগ দেখাচ্ছে তাই। এই পৃথিবীর সবই বিতৃষ্ণার যোগ্য—এমনি একটা বোধ ঢুকেছে ইলাবন্তের মাথায়। তেমনি নিরাসক্তভাবে মৃণালকে বললে—এর মধ্যে একটু পলিসি আছে মৃণাল। পাড়ার লোকেদের চোখের ওপর গণ্যমান্য সাহিত্যিক হয়ে কি করে আমি কণ্ট্রোল থেকে চাল আনতে যাই। দেশের লোক আমার অবস্থা বুঝবে না, কিন্তু আমার দারিদ্র্যের সুযোগে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে ছাড়বে না। সুতরাং বেপাড়ায় খোকাদের দাঁড় করাতে হয় বৈকি!

মৃণাল বললে—কিন্তু খোকাদের পড়াশোনা যে সব গেল। সারাটা সকাল ওরা ওই চালের কণ্ট্রোলেই যদি দাঁড়ায়, তবে কি করে আর পড়াশুনো করে বলো ত'?

ইলাবন্ত বেশ দৃঢ়ভাবেই জবাব দিলে—কিন্তু কণ্ট্রোলে দাঁড়াতেই হবে মৃণাল, নৈলে প্রাণ বাঁচবে না। আজ বংকু-টোনা যাচ্ছে, আর কিছুদিন পরে অবস্থা আরো কিছু সরেস হলে তুমি আমি যাবো।

মৃণাল বিস্মিত হল।

—আশ্চর্যের এতে কি আছে বলো? ইলাবন্ত মুখস্থের মত হড় হড় করে বলে যেতে লাগলো,—কোনো লজ্জা নেই, কোন সরম থাকবে না। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে যেতে হবে। মানী ব্যক্তিরাও যাবেন। কাজেই বিস্ময়ের কি আছে? আর তবু ত' যুদ্ধ এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে হচ্ছে। আসল যুদ্ধ যদি এখানে শুরু হয়—তাহলে অবস্থা কি হবে ভেবেছো?

অতশত ভাববার সময় নেই মৃণালের। তাছাড়া, জীবনধারণের এমন ধারা নীতির সংগে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি কখনো, এমন কি শোনাও যায়নি কোনদিন। মনের বিশ্লেষণ প্রণালী মৃণালের এমনই শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয় যে, তার জন্যে নূতনতর তোড়জোড়ের প্রয়োজন এই পরিস্থিতির সম্যক উপলব্ধি করতে তবু মৃণাল বললে—আচ্ছা তোমাদের অফিসে চাল ডাল দেয় না? সব অফিসেই দিচ্ছে ত'?

ইলাবন্ত হেসে ফেললে, স্বভাবজ এক ঝলক বিদ্রূপের হাসি। হেসে বললে—এখনো তোমার বুদ্ধি পাকলো না মৃণাল। সেটা ভদ্রলোকের জায়গা। সেখানে নিরন্ন কুলী মজুর বা হতভাগ্য দীন দুঃখীদের ভিড় নেই। ফরসা জামা চাপানো পাম্পসু আঁটা ভদ্রলোকদের কাণ্ডকারখানা সেখানে। সেখান থেকে চাল ডাল কেনার চেয়ে বনের বাঘ শীকার করে আনা শুধু সহজ নয়, অনেক সম্মানের।

অফিস থেকে জিনিষ কেনার চেষ্টা একবার করেছিল ইলাবন্ত। প্রথমত লাইনে ঘুষ চালাতে হয় সেখানে এবং ঘুষের অংক রীতিমতো মোটা হলে দুচার বস্তা চাল অনায়াসেই বেরিয়ে আসে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের মতো। দ্বিতীয়ত ঘুষ না চালালে কিছুতেই জিনিষের ওজন খাঁটি পাওয়া যাবে না। তৃতীয়ত সেখানের দ্রব্যাদি এতই খারাপ যে মুখে তোলা যায় না ইলাবন্ত অবশ্য শেষোক্ত দুই জাতীয় অভিজ্ঞতা নেই; প্রথম ধাক্কাতেই সে সরে এসেছে, ঘুষ দেবার মনোবৃত্তি তখনো তার হয়নি, এতদিন সে পৃথিবীর একপিঠের কথা ভেবেছিল, নির্বিত্ত কেরাণীকুল ত' দুএক পয়সা উপরি আয়ই করে বাড়ী নিয়ে যায়—ঘুষ দেবার নীচতা এতদিন স্পর্শ করেনি।

বংকু টেনাকে নিয়ে ইলাবন্ত কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে এসে হাজির হল। এতক্ষণ তার মনে হয়েছিল সে নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি আজ এসেছে। প্রথমেই দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে ছেলে দুটোকে; সকাল সকাল তাদের দুর্ভোগ মিটবে। কিন্তু বিধাতা বাম কিনা কে জানে, কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে মেলা বসে গেছে, ইলাবন্তর মতো আরো দুদশজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এসেছেন,—তাদের ছেলে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়া গা ঢাকা দেবেন এবং তাদের সম্মান বাঁচাবেন। এমনই তাদের নৈতিক চেতনা।

ইলাবন্ত বংকু টোনাকে সাবধান করে দিলে—পয়সা শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখিস বাবা; আমি ওই পাশের গলিতে আছি। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলুনি যেন। রাত তিনটে এখন, জ্যোৎস্নায় পড়তে পারে। বুঝলি?

একটা ভিখারীর ছেলে এসে বংকুর সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে দেখে ইলাবন্ত তার হাত ধরে সরিয়ে দিলে।

ছেলেটা বললে—বারে মশাই, আমি ত' এখানেই ছিলাম। আমাকে টেনে বের করে দিচ্ছেন কেন? এই দেখুন না আমার ইঁট পাতা; আমি বাবুর সংগে দর ঠিক করতে গিয়েছিলাম।

ইলাবন্ত বিস্মিত হল—দর ঠিক করতে? ছেলেটি তৎক্ষণে নিজের জায়গায় বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকে বললে—চারটে ছটা পয়সা দিলে আমরা অন্যের চাল কিনে দিই; তাই বাবুর সংগে দাম ঠিক করে পয়সা আনতে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা, আচ্ছা তুই দাঁড়া, দাঁড়া। দ্যাখ বংকু, সাবধান হয়ে থাকিস, আর ঘণ্টাখানেক পরেই দোকান খুলবে।

ভিখারী ছেলেটি বললে—ঘণ্টাখানেক কি বলছেন বাবু, এখন রাত তিনটে এখনো চার ঘণ্টা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ইলাবন্তর পায়ের তলার মাটি সরে গেল যেন। রাত তিনটে এখন জ্যোৎস্নায় চারিদিক পরিচ্ছন্ন, মনে হ'ল ভোর হয়ে গেছে, কাকও ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। কিন্তু মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলে চাঁদ

সবে পশ্চিম হেলেছে—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ! রাত তিনটেই হবে।

'কেমন যেন মায়া হল ইলাবন্তর। কি হবে এভাবে বেঁচে থেকে? ছেলে দুটোকে এভাবে কষ্ট দিয়ে চার ঘণ্টা এই ভিড়ের মধ্যে পাথরের মতো দাঁড় করিয়ে ইলাবন্ত অন্ন সংগ্রহ করতে এসেছে! এই ত' মৃত্যু! মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দ কেটে যাওয়ার নামই ত' মৃত্যু!

আশ্চর্য! অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হল ইলাবন্তর—এমন নগণ্য বিপর্যস্ত জীবন-যাপন করে যাওয়ার নিরর্থক প্রচেষ্টাকে কেমন ধীরে ধীরে এই সমাজ মেনে নিচ্ছে। নিজেদের সম্মান বাঁচাবার এখনো মিথ্যা একটা জুয়াখেলা চলছে ভেতরে ভেতরে এই বাঁচা মরার টানা-পোড়েনের মধ্যে। বাস্তবিক, ইলাবন্ত বেশ করে দৃষ্টি মেলে ধরলে কন্ট্রোলের দিকে—লেখার বিষয় এবার সে যথেষ্ট নিয়ে যেতে পারবে।

পিছনের টুকরো চিত্র মনে পড়ে গেল একটা। তিন চার মাস আগে হাতিবান্ধা-পোতায় মাছ ধরতে গিয়ে সেখানকার নদী-তীরের একটি দৃশ্য। খেয়াঘাটের পাশে একটি পুকুরে বসে ইলাবন্ত তার ভাই বন্ধু সমীরণ মাছ ধরছিল। মাছ নেই সেখানে। শুধু ধৈর্য বায় করে ওঠবার উদ্যোগ করছে এমন সময় ইলাবন্তর চোখে পড়লো—খেয়াঘাট পার গ্রামবাসীরা হাট করতে চলেছে—অনানুপাতিক স্ফীতোদর চেহারা, হাতে লণ্ঠন। তিন চারটে পয়সা ট্যাঁকে করে খেয়া পার হয়ে চলে যাচ্ছে। খেয়ায় যাবার সময় পয়সা লাগে না, ফেরবার পথে একটা পয়সা দিয়ে যেতে হয়, এই রকম নিয়ম।

এক পয়সার কেরাসিন, আধ পয়সার তামাক, আধ পয়সার মসলা এবং বাকী পয়সার অন্যান্য তরকারী কিনচে—এই হিসাব। ফেরবার সময় তারা কাপড় মাথায় জড়িয়ে, একটা হাত ওপরে তুলে নদী সাঁতরে পার হয়; পাটনী গাল পাড়ে কিন্তু ফাঁকি দিয়ে সরে যায় তারা। তার পর সপ্তাহের বাকী ছটা দিন পুকুর থেকে কলমী তুলে, কোন বাগানের কলা ছিঁড়ে—কাঠ কুড়িয়ে দিন কাটায়। এই জীবন! ইলাবন্তর সেদিন মনে হয়েছিল সে ত' এখনো রাজাই আছে, এই জীবনের তুলনায় আজও সে সিনেমায় যায় মাঝে মাঝে ট্রামে বাসে চেপে অফিস করে—ভাল-মন্দ খাদ্যের গন্ধ পায়। সেদিন তুলনামূলক বৈষম্যের দুরত্বে দাঁড়িয়ে ওই জীবনকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল, ইলাবন্ত—তখন সেখান হতে তার মনে হয়েছিল ওদের তুলনায় কেরাণী ইলাবন্ত রাজা, লেখক ইলাবন্ত দেবতা।

কিন্তু আজ?

স্বপ্ন ভেঙে গেল ইলাবন্তর। রাস্তার পাশে রোয়াকের ওপর বসেই সে ঢুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। পূব দিকটা এতক্ষণে বেশ সাদা হয়েছে, ভিস্তিওয়ালারা ছড় ছড় করে রাস্তায় রাস্তায় জল ছড়িয়ে দিয়ে গেল! বংকু আর টোনা আবার না ভিজে মরে, দুটোরই যা সর্দির ধাত।

বংকু চাল নিয়ে ফিরলো বাবার কাছে; টোনা বংকুর পাশে দাঁড়ালে কি হবে, বেচারী ভিড়ের চাপে লাইন থেকে ছিটকে গিয়েছিল একবার এবং তারপর থেকে ক্রমাগতই ধাক্কা খাচ্ছে। এখনো চাল পায়নি।

ইলাবন্ত বললে—দরকার নেই আর চালের তুই ডেকে নিয়ে আয় ওকে। কাল আবার সকাল সকাল অফিস। বেলা অনেক হয়েছে, চ' ফিরি।

টোনাকে ডাকতে হল না—সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির। ভিড়ের চাপে তার কচি পা পিষ্ট হয়েছে বলে সে কাঁদছে না, তার হাতের পয়সা হারিয়ে ফেলেছে বলেই তার দুঃখ। মার নির্মম প্রহারের আশঙ্কায় তার হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করে উঠছে।

বংকু ধমকালে—হারাবেই ত' পয়সা। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঢুলছে—একবার ত' প্রায় পড়ে যাবার মত হয়েছিল আমি ধরলাম বলে তাই। কোথায় ফেলেছিস পয়সা—চল দেখিগে ফের।

ইলাবন্ত আকাশের দিকে চাইলে। সূর্য মাথার দিকে সরে আসছে রৌদ্রের উত্তাপও বেশ হয়েছে এর মধ্যে।

মৃণাল বললে—এক্ষুণি ননীর মা এসেছিল। জানলে?

ইলাবন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে—জানলাম।

মৃণাল স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কোন ননীর মা বলোত? সামনের বাড়ির গিন্নী ওই অফিসারের বউ।

ইলাবন্ত কিঞ্চিৎ উৎসুক হল, বেশ—তারপর?

বললে কি জানো, মৃণাল ভূমিকা না করেই বলতে লাগলো—উনি আমাদের সুবিধায় চাল দিতে পারেন।

ইলাবন্ত রুষ্ট হল—আমাদের চালের টানাটানি এ সংবাদটা দয়া করে ওনার কানে না তুললেই ভালো হত না? দয়া দেখিয়ে মুষ্টি ভিক্ষা দেবে—তা হাতে তুলতে তোমার মন সরবে? আশ্চর্য!

চোখ কপালে তুলে মৃণাল বললে ভিক্ষে কিগো কিনবো চাল। ওর স্বামী যে অফিসের বড়বাবু, খুব বেশী বেশী চাল ডাল আনে কিনে সস্তায়—তাই ওরা আমাদের কিছু কিছু দিতে পারে তার থেকে—আর অফিসের চালে নাকি খুব কাঁকর, ও চাল খেতে পারে না ওরা—তাই—

ইলাবন্ত জড়ের মত চুপ করে শুনছিল, এইবার কথার পিঠেই ফেটে পড়বার আক্রোশ নিয়ে বলে উঠলো—তাই পরোপকার করবার ব্যাপক বাসনা জেগেছে ওদের মনে! কি জানো মৃণাল, আমাদের উচিত ওদের থেকে চাল ডাল কিছুই না কেনা। ওরা অফিস থেকে আনবেন খুব সস্তা দরে—তার ওপর বেশ কিছু দর চড়িয়ে, বাজারের চেয়ে অল্প সস্তায় সেগুলি আমাদের কাছে বিক্রী করবেন। এ নীতি সর্বত্রই অনুসৃত হচ্ছে। সেখানে যারা জিনিস পাচ্ছে—তারাই শুধু পাচ্ছে; গাড়ি গাড়ি চাল নিয়ে গোদামে চালাচ্ছেন! একদিন এর প্রতিবাদ হয়তো করতে পারতাম; কিন্তু আজ আর তেমন ইচ্ছে নেই এর বিরুদ্ধে কলম চালাবার। আর তাতে লাভও নেই কিছু। আজকাল সকলেই মাসতুতো ভাই।

এক মিনিট ইলাবন্ত ভেবে নিলে মানুষ কিভাবে অধঃপতনের মসৃণ ধাপে ধীরে ধীরে নামছে। আজ জীবন-সংকটের এমন বিশৃঙ্খল দিনে প্রতিবেশীর একি আচরণ! ইলাবন্ত হাঁফ ধরতে থাকে।

সন্ধ্যায় একদিন আকাশে চাঁদ ছিল—মৃণাল ছাদে উঠে কাবা করেছিল তরঙ্গ-ভঙ্গিম সমুদ্রের জ্যোৎস্নায় রঙীণ ফেনার মত কতকগুলি উচ্ছল কথা বলে গিয়েছিল ইলাবন্তর কানে দূরে ওই জামরুল গাছটার মাথার পাশে চাঁদটাকে দেখলেই ইলাবন্তের সেই অভিজ্ঞতা মনে আসে। চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে উঠলে এখান থেকে বসেই জামরুল-পাতার রেখাগুলি দেখা যায়—সাদা কালোর ধূননিগুলো যেন কথা কয়ে ওঠে।

ছাদে ইলাবন্ত পায়চারি করছিল। মৃণাল এসে দেখো বংকু আর টোনাকে বাপু কন্ট্রোলেই তুমি দাঁড় করিয়ে রেখো—ননীর মার বিক্রী করা চাল বড় কম হচ্ছে ওজনে।

ইলাবন্ত হাসলো, ভদ্রলোকের সান্নিধ্য সে দূরে থেকে শ্রদ্ধা করতে পারে—কিন্তু তাদের একান্ত সংস্পর্শে নিজেকে সে নিয়ে যেতে চায় না। সে কথা থাক। ইলাবন্ত আকাশের চাঁদটা মৃণালকে দেখাবে বলে আকাশের দিকে চাইলে কিন্তু আশ্চর্য মেঘের তলায় একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে ডুবে গেছে ওদের দুজনের আকাশের চাঁদ।

ইলাবন্তকে এখনই শুয়ে পড়তে হবে। বংকু টোনা শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। ভোরেইত ছুটতে হবে আবার লাইন সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ইলাবন্ত ঘুমের সাধনায় নীচে নেমে গেল।

সেবাব্রতের সার্থকতা

আজ আপনাদের এখানে এসে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার এ সভা, কাজেই বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি কিংবা জাতীয় জাগরণের দিক থেকে এই মিশনের অবদান যে কত বেশী, সে সম্বন্ধে বড় রকমের আলোচনা এখানে উত্থাপন করা সম্ভব হবে না। ধর্মের কথাই ধরুন। ধর্ম জিনিসটা কি? সেবা ছাড়া, আর কিছুই ধর্ম নয়। ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান আমরা বড় বড় কথা মুখে যতই বলি না কেন; ধর্মজীবন দাঁড়ায় কেবল ঐ সেবাতে। মরণের পরপারে যে অমৃতলোকের কথা আমরা শুনতে পাই, সে লোক সর্বদা 'হরষ এবং অশোক' সেবার ভিতরই তাঁর প্রতিষ্ঠা। মরে গেলে সে লোকে যাওয়া যায় না। সেবার আনন্দে মরণের ভয়কে ভুলতে পারলেই জাগ্রত জীবনের জ্যোতির্ময় সে লোকে স্থিতি হয়। সেবার আনন্দ যার ভিতর সত্য হয় নাই, তার কাছে ধর্ম কেবল লোক-দেখান ব্যাপার বা মান, যশের ব্যবসা মাত্র; দৈন্য দুর্বলতা কিছুই তাতে দূর হয় না। মহাপ্রভুর ধর্ম এই সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত। একটা কথা এক দল লোকের মুখে অবশ্য আমরা শুনতে পাই। এঁরা বলেন, শুধু বাইরে সেবা-শুশ্রূষা নিয়ে থাকলেই কি ধর্মজীবন গড়ে ওঠে? আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, --তা ওঠে। ব্রহ্মোপলব্ধি, আত্মজ্ঞান--এগুলো সেবার ভিতর দিয়ে যত সহজে হয়, সাধনের পথ হিসেবে দেখলেও অন্য উপায়ে তত সহজে সে সত্যকে নিত্য করে পাওয়া সম্ভব হয় না। এজন্যেই মহাপ্রভু জীবে দয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে, মাছ মাংস খেয়ে জীবে দয়া হয় কেমন করে? এর উত্তর এই যে, মাছ মাংস না খেলেই যে জীবে দয়া হয়, এমনও নয়। মাছ মাংস যারা খাচ্ছে না, এমনও দেখা যায় যে, তাদের অন্তরে পরম হিংস্র প্রবৃত্তি শকুনি-গৃধিনীর মতো ক্ষুধা নিয়ে ক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। হীন স্বার্থের পাঁকের মধ্যে পড়ে আছে তাদের অন্তর। এঁরা মাছ মাংস খান না বটে, কিন্তু স্বার্থের দায়ে মানুষের মাংস টেনে ছিঁড়তে কসুর করেন না। মানুষের ওপর ওদের প্রেমের দৃষ্টি এক ছটাকও নাই, অথচ অপরের নিন্দা করবার বেলায় জীবে দয়া বলে মায়াকান্নার রোল তুলে এঁরা কলরব সৃষ্টি করতে সব সময় এগিয়ে আছেন। মাছ মাংস এদের খেতে কেউ বলছে না; কিন্তু মাছ মাংস না খেয়েও যদি জীবে দয়া অর্জন করতে হয়, তবে মানুষের প্রতি সেবাবুদ্ধি আগে জাগানো দরকার; কারণ, দয়া শুধু একটা ব্যবহারিক ব্যাপার নয়, দয়া হৃদয়ের একটা ভাব। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাই উপচে সত্যকার জীবে দয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। মানুষের প্রতি [illegible] নেই, মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতীকার করার জন্যে যার হৃদয় সাড়া দিয়ে ওঠে, যা [illegible] না। মাছ খাওয়াটা তাঁর পক্ষে সংস্কারবশত একটা বিতৃষ্ণা বা ঘৃণার ব্যাপারই হতে পারে। সেখানে সত্যকার দয়া কতটা থাকে—সন্দেহের বিষয়। মহাপ্রভু তো নিজেই বলেছেন, 'নরবপু তাঁহার স্বরূপ'। ভগবান নিজে উদ্ধবকে বলেছেন, মানুষের দেহরূপ দর্পণেই আমাকে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে ভাবের ভিতর দিয়ে নিজের অভাবাত্মক অর্থাৎ তৃষ্ণাত্মক বা হিংসাত্মক স্বভাবকে বদলাতে না পারলে সর্বভূতে ভূতাত্মা বা ভূতভাবনঃ রূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মানুষের সেবার ভিতর দিয়ে আনন্দের একটা ছন্দ হৃদয়কে স্পন্দিত করে সর্বত্র আনন্দময় দেবতার লীলাকে প্রস্ফুরিত করে তোলে। আজ দেহের চাপে এর ভাগিদে হৃদয় পিষ্ট হয়ে পড়ে আছে; এই সেবা রসের স্পর্শ পেলে হৃদয়টা তাজা হয়ে উঠে; তখন আমরা সত্যকার সহৃদয় বা দয়াশীল হতে পারি। এই হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে ধরেই দেবতার লীলা হয়, এখানেই তিনি বসে হেসে বাঁশরী বাজাতে থাকেন। ক্রমে সে বাঁশী বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয় এবং আমার স্বার্থ সংস্কারগত জগৎ ডুবে গিয়ে আনন্দ-লোক উন্মুক্ত হয়। কাজেই সর্বজীবে দয়া যার জেগেছে মানুষের প্রতি প্রেম এবং মানব সেবার প্রবৃত্তিও তাঁর মধ্যে একান্ত হয়ে উঠেছে, এ স্বীকার করতেই হয় এবং গায়ের জোরে তা অস্বীকার করলেও ধর্ম-জীবনের বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে লাভের অঙ্ক নিঃশঙ্কতায় কিছু দাঁড়ায় না। সর্বত্র দর্শন, সকল জায়গায় ভগবানকে দেখা এসব তো বড় কথা। আমাদের বৈষ্ণবতার বিচার যদি সত্যই করতে হয়, তবে আমাদের আগে দেখতে হবে যে, মানুষকে আমরা কতটা প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছি এবং মানুষের দুঃখকষ্টে সমবেদনার ভাব আমাদের ভিতর কতখানি সত্য হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এই পরম সত্যটি আমাদের কাছে উদ্দীপ্ত রেখেছেন। আমি নয়াদিল্লীতে যখন গিয়েছিলাম, সেখানেও দেখে এসেছি; আর এদের পুণ্য সেবাব্রত দেখে ধন্য হয়েছি শ্রীধাম বৃন্দাবনে। নয়াদিল্লীতে এঁরা অযাচিত ভাবে আমার মত বিষয়ীকেও কৃপা করেছেন। কত শ্রদ্ধা নিয়ে সেখানকার মঠের সাধুরা আমার কথা শুনতে আসতেন। এঁরা আমাকে এঁদের মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। নয়াদিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন দেখবার মতো। কত বড় প্রকাণ্ড একটি বাড়ি, এখানকার লাট সাহেবের বাড়ীর মতো হবে। সাধুরা আমার কাছে [illegible] বললেন, এমন কথাও আমাদের শুনতে হয় যে, আমরা মহাপ্রভুকে মানি না। মহাপ্রভুকে না মানলে আমাদের কি চলতে পারে? আমাদের ঠাকুর যে সেই প্রেমের লীলাতেই বিভোর ছিলেন। আমরা শুধু এই কথা বলতে চাই যে, মহাপ্রভু যে প্রেমের ঠাকুর; তাকে বুঝতে হলে, ধরতে হলে, আগে মানুষের সেবার ভিতর দিয়ে হৃদয়ের জোরটা একটু বাড়িয়ে নিতে হয়, নইলে পড়ে যাবার ভয় আছে। শ্রীবৃন্দাবন ধামে এঁরা আমাকে পরম আত্মীয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সেখানকার সেবাব্রত দেখে আমি সত্যই মুগ্ধ হয়েছি। দেখলাম, মিশনের হাসপাতাল এবার আরও বাড়ানো হয়েছে। পুরুষদের জন্যে যে নূতন শুশ্রূষাগারের এবার উদ্বোধন করা হয়েছে, বৃন্দাবনের মতো জায়গায় সে এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার বলতে হবে। রোগী চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সব রকমে সুবিধা এখানে করা হয়েছে, বড় বড় শহরেও সেসব সুবিধা করা কম জায়গাতেই সম্ভব হয়ে উঠে। এই দুর্মূল্যের দিনে এই নূতন শুশ্রূষাগারের বাড়িটি করবার জন্যে মিশনকে জলের মতো টাকা খরচ করতে হয়েছে। অথচ জানতে পেলাম সেখানকার মিশনের স্থায়ী কোন অর্থ ভাণ্ডার নেই; এ জন্য তাঁরা খুবই অভাবের মধ্যে পড়েছেন। সাধুরা বললেন, সেখানকার মিশনের একটা বড় অসুবিধা তাদের পক্ষে হচ্ছে—যমুনার ধারে বাঁধ আর প্রাচীরের। এ না থাকাতে বর্ষার দিনে আশ্রমের ভিতর যমুনার জল এসে পড়ে, আর গ্রীষ্মের সময় যমুনার চড়া থেকে উত্তপ্ত বালুকা রাশির 'লু' এসে আশ্রমের রোগীদের কষ্টের কারণ ঘটায়। তাঁরা বললেন কলকাতার সেবাব্রতী মহানুভব ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যই আমাদের সর্ব-প্রধান ভরসা এবং তাঁদের টাকাতেই বৃন্দাবনের এই সেবাব্রত মুখ্যত চলছে। এঁরা যদি আশ্রমের এই অভাবটি দূর করেন, তবে একাধারে বিপন্নের সেবা এবং শ্রীধামের

সেবা দুই-ই হতে পারে। বৃন্দাবনে মিশনের হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বেশী দেখা গেল; কারণ শহরের লোকসংখ্যা কম নয়; তার মধ্যে বাইরের লোকই বেশী। বৃন্দাবনধামে বাঙালীর সংখ্যাই মোট অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ। আবার এ'দের মধ্যে বোধ হয়, শতকরা ৯৮জনের উপরে নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্র এবং ভিক্ষাজীবী। স্থানীয় কাঙালীদের মধ্যে বেশীর ভাগই বাঙালী। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনে দীননারায়ণদের সেবার জন্যে কত প্রয়োজন রয়েছে, বলে শেষ করা যায় না। কি অসামান্য দৈন্যের মধ্যে বাঙালী বৃন্দাবনবাসীরা অধিকাংশ যে জীবন কাটাচ্ছেন, দেখলে চোখের জল রুদ্ধ করা কঠিন হয়। অধ্যাত্ম রসে আধিভৌতিক দুঃখকষ্ট যেখানে বিলীন হয়ে যায়, সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার মতো কর্মজীব যে অবস্থা ধারণা করতে পারে না। পথে-ঘাটে সর্বত্র বুভুক্ষু বাঙালী নরনারীর দল। রামকৃষ্ণ মিশনই এঁদের বিপদ-আপদের আশ্রয়স্থল এবং রোগে অনন্যোপায় বল ও ভরসা। যাঁদের অর্থ আছে বৃন্দাবন ধামে এই পুণ্য সেবাব্রতে সাহায্য করলে তাদের অর্থের সব চেয়ে সার্থকতা হতে পারে। এই উপলক্ষে তাঁদের কাছে আমার এই নিবেদন। ভদ্রমহোদয়গণ, দেবতা আজ সেবা চাচ্ছেন। দীন হয়ে—দরিদ্র হয়ে তিনিই আজ আপনাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। আজ আমরা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারি, তাঁকে বন্দনা করতে পারি। আজ যেন আমরা ঋষিদের ভাষায় এসব দীন দেবতার সেবায় আত্মনিবেদন করে বলতে পারি, আমাকে কৃপা করবার জন্যই তোমার এ লীলা। তুমি দুঃখ দৈন্যে ভর করে কাঙালের বেশে এসে আমাকে বঞ্চনা করছ। তোমার বেদনা বুকে আমার বেজেছে, আমার ধর্ম হোক আর না হোক, তোমার সেবায় আমি সর্বস্ব নিবেদন করব; এবং তাতে যে আনন্দ—সেইটুকুই এ জীবনে একান্ত সত্য করে পাব। এ আনন্দ থেকে কোন দৈবই আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। অর্থ না থাকে, বিত্ত না থাকে আমার এ দেহ দিয়ে তোমার সেবা করব। আর দেহও যদি অপটু হয়, দেবতা, তোমার দুঃখে আমি অশ্রু বিসর্জন করব। সে অশ্রুতে আমার চিত্তের দৈন্য, কার্পণ্য ধৌত করে তুমি জাগবে। ঋষিরা বলেই দিয়েছেন, তাঁকে দেখা যায়, এই চোখেই দেখা যায়। প্রেমের অশ্রুতে চোখ যদি ঢাকা পড়ে তবে বিশ্বময় ব্যবধানের বাধা ডিঙিয়ে তিনি চোখের সামনে এসে বাহু মেলে দিয়ে আলিঙ্গন নিয়ে দাঁড়ান। নইলে নানারূপ সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে তাঁকে দেখা যায় না। ভিতর থেকে প্রেমময় সে দেবতার স্পর্শ পেয়ে যখন চোখের জল আসছে না, তখন বাইরে থেকেই দেবতার সাড়া পেতে হবে, এ ছাড়া পাকাপাকি রকমে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের আজ এই সত্য বুঝতে হবে যে প্রত্যক্ষতা ভিন্ন ধর্ম নেই। এই প্রত্যক্ষতাকেই 'অনুভব' বলছি, পারিভাষিক পার্থক্য আমি বুঝি না। অনুভব হৃদয়ের ব্যাপার। ধর্মের বিচার হলো হৃদয়টা কতখানি বড় হয়েছে, বুকে কতটা জোর বেড়েছে এই হিসাবে। বুকে যদি জোর না বাড়ে তাদের উপর পাহাড় পড়লে, জাপানীদের বোমা পড়লো এই মনে করে হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনী যদি আরম্ভ হয় তবে ধর্ম কিছুই আমার হয়নি। হৃদয়ের এই জোর বাড়াবার সহজ পথ হল এই সেবার পথ; ধর্মজীবন সুরু হয় এইখান থেকেই। পাতুপাতু করে চলার পথ ধর্ম জীবনের পথ নয় তাকে নিতে হবে না। নিত্যযুক্ত মন বলতে বুঝতে হয় খাঁটি মন অর্থাৎ মন যেখানে অচঞ্চল একটা আশ্রয় পেয়েছে। তাঁর ভিতর দিয়ে যখন আমি আমার 'আমি'কে পাই, তখন বিশ্বজগৎ আমার হয়ে উঠে; আর কেউ পর থাকে না। সকলের জন্য আত্মনিবেদন তখন সত্য হয়। যে আমি দিনে দশবার মরি আমার সে আমি মরে দাঁড়ায়। অথচ অনাহত আত্মতত্ত্বের তখন উপলব্ধি ঘটে। স্বার্থের চাপে, ভোগের চাপে, বিষয় বিচারের কার্পণ্য এবং দৈন্যে হৃদয় চাপা পড়েছে যেখানে সেখানে এই অভয়ত্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটা সম্ভব হতে পারে না। এই জন্যে ঋষিরা বলেছেন, ধর্মজীবন বীরের, শূরের; যারা বীর, তাদের জন্য; যারা শূর, তাদের জন্য। এ বীরত্ব বা শূরত্ব অপরকে আঘাত করার কসরৎ নয়; এ বীরত্ব হল কৃপণতা না থাকাতে দৈন্য না থাকাতে অর্থাৎ পরম প্রেমের অনপেক্ষ আশ্বস্ততে। এসব খুবই বড় কথা। আমাদের পক্ষে এইটুকুই এখন বুঝলে যথেষ্ট হবে যে, সেবাকে সত্য করতে না পারলে চিত্তের দুর্বলতা দূর করবার উপায় নাই। ঋষিরা বলেছেন দুর্বলতাই যদি না গেল ভয়ই যদি না ভাঙল তবে ধর্মের দোহাই দিয়ে যত চেষ্টা করেছি সবই ব্যর্থ হয়েছে। আসুন, আমরা সেবার ভিতর দিয়ে অনপেক্ষ আনন্দময় জীবনের দিকে এগিয়ে চলি। এ পথের কোন চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। মানুষের যদি সেবা করতে পারি মন প্রাণ দিয়ে তবে দেবতা জীবন্ত হয়ে উঠবেন সোজাসুজি আমার জীবনে। কারণ, এ দেবতা জাগ্রত দেবতা। তিনি সকল ভূতে, সকল জীবে রয়েছেন একথা খুবই সত্য; কিন্তু আমার দেহযন্ত্রের সঙ্গে মানুষের মধ্যে যিনি আছেন তাঁরই যোগাযোগ সহজ এবং সার্থক। অন্যত্র তাঁকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু মানুষের ভিতর দিয়ে তাঁকে ধরলে তাঁর সমীক্ষা অনেক সহজ। মানুষের এই যে সেবার পথ এই পথ যদি আমরা ধরতে পারি তবে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ আমাদের তো হবেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসেবেও আমরা জগতের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো। এ জগতে আমাদের মান কোনদিক থেকেই নেই। যিনি আমাদের প্রাণের দেবতা তিনি ছাড়া মান অবশ্য কেউ দিবার নেই। এ পথে এগোলে সে দিককার মান পাবার আশা তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে জগতের জাতি সমাজে আমাদের অপমানের বোঝাও কমবে। ক্লীবত্বই সব চেয়ে বড় পাপ—এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের হাত থেকে কি ইহলোক কি পরলোক কোথায়ও ফাঁকি দিয়ে রেহাই পাবার উপায় নেই। *

---

* 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত।

শাড়ি

শ্রীস্বর্ণকমল রায়

পাশের বাড়িতে আজ সকাল থেকে সানাই বাজছে। ও বাড়ির ছোট মেয়ে রমার আজ বিয়ে। কদিন ধরেই লোকজন কাজ-কর্মে ব্যস্ত; অনবরত যাতায়াত ও হাঁকডাকে বাড়ির আবহাওয়া আজ সকাল থেকেই মুখর হয়ে উঠেছে—কিসের সাড়ায় সারাটা বাড়ি আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তবু এ সমস্ত কোলাহলকে ছাড়িয়ে সানাইয়ের ভৈরবী সুর মনকে উদাস করে তুলতে চাইছে।

এ বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে কমলা চুপ করে সানাই শুনছিল। সুরটা যেন তার মনের কোথায় অনবরত আঘাত করছে—ভাল লাগলেও যে দিনগুলিকে সে হারিয়েছে অতি নিষ্করুণভাবে আজ সেই দিনগুলির কথাই মনে পড়ছে। ওর জীবনেও এমনি একটি দিনে সানাই বেজেছিল—এমনি সুরেই। ওকে কেন্দ্র করে সেদিনের যত কর্মব্যস্ততা যত আয়োজনের ভীড়ের আড়ালে ওর ভীরু মন রমার মতই সংশয় আর আনন্দের দোলায় দোল খেয়েছিল। যে নব-জীবনের সূচনা আজ রমার জীবনে শুরু হতে চলেছে ওরও জীবনে তার রাঙা আলো পড়েছিল তিন বছর আগে। আজ সকালে সানাইয়ের সুরে যেন সেই কথাগুলিই ওর কানে চুপি চুপি বলে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে কমলা পেছিয়ে গিয়েছিল সেই তিন বছর আগেকার জগতে যেদিন স্বপ্নের মত সুন্দর মনে হয়েছিল জীবনকে। সেদিনের যত আশা, যত কল্পনা আজ যেন ঠিক স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে ওর জীবন থেকে। যৌবনের যে সময় মনের শাখায় বসন্তের ছোঁয়াচ লাগে সেই সময় সিঁথিতে প্রথম সিঁদুরের রেখা এঁকে সে এ বাড়িতে এসেছিল ছোট-বৌ হয়ে। কিন্তু বিধাতার বিচারে সে চিহ্ন মুছে ফেলে নিরাভরণ শুভ্রতাকেই বেছে নিতে হয়েছে তাকে। সংযম আর শুচিতার অজস্র বন্ধনে সে আজ নিজেকে সমর্পণ করেছে অসহায়ের মত। তাই বসন্ত আজ ওর দুয়ারে আসলেও তাকে ফিরে যেতে হয় অনাদৃত হয়ে।

কমলার বয়স বেশী নয় এবং হয়তো সেই জন্যেই ওবাড়ির রমার সংগে ওর একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল। যে জগতে ও দাবী হারিয়েছে সে জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনের নিরাশায় সে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল রমার সঙ্গে। ওদের দুজনের পরিচয় খুব বেশী দিনের না হলেও অন্তরঙ্গতা ঘনীভূত হতে ব্যাঘাত পায়নি তাতে।

প্রথম আলাপ হয়েছিল রমারা ওবাড়িতে আসার পরের দিনই। সেদিন সকালবেলা স্নান সেরে নিজের থানের ধুতিখানা ছাদের ওপর মেলতে গিয়ে কমলার চোখ পড়ল রমার দিকে। ফর্সা, সুশ্রী, দোহারা-চেহারার একটি মেয়ে—তার সর্বাঙ্গে যৌবনের পরিচয় ধরা পড়ছে। মাথায় একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে সে-ও একটা লালরঙের শাড়ি মেলতে এসেছিল ছাদে। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল, মনে হল অপরিচিতার প্রথম সাক্ষাতে একটা সংকোচ রমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু কমলা ওকে অবসর দিলে না। প্রশ্ন করলে: আপনিও বুঝি সকালে স্নান করেন?

ওবাড়ির ছাদ থেকে ছোট্ট একটি জবাব ভেসে এলো: হাঁ।

সকাল বেলার কাঁচা রোদে সদ্যস্নাতা রমাকে সত্যই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কমলা খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মনে হল মেয়েটিকে তার সত্যিই খুব ভাল লেগেছে এবং আরও ভাল লাগবে ও যদি কমলার সঙ্গে কথা বলে।

—আপনার নাম?

—রমা।

—বাঃ, ভারী সুন্দর তো!

একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠলো রমার মুখে।

দুটো বাড়ির ছাদের ব্যবধান খুবই সামান্য। ওদের অনুচ্চকণ্ঠের প্রথম সম্ভাষণ সেই সামান্য ব্যবধানকে পেরিয়ে পরস্পরের কাছে পৌঁছুতে দেরী হল না। এই যে একটু দূরে থেকে কথা কওয়া এটা যেন প্রথম পরিচয়ের পথটাকে আরও সহজ করে দিলে। রমাও শাড়িখানা হাতে করে কার্নিশের ধারে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটু হেসে বললে: আপনার নাম বললেন না তো?

—আমার নাম? আমার নাম কমলা। যদিও বরাতটা মোটেই সে রকম নয়। কথাটা বলেই কমলা এমন একটুখানি হাসলে যাতে ওর মনের নিভৃত বেদনার এক টুকরো সকরুণ ইতিহাস পলকের জন্য নিজেকে জানিয়ে দিয়ে গেল।

রমা কমলার দিকে চেয়ে রইলো। সম্পূর্ণ নিরাভরণ দেহে যৌবন তার বদান্যতায় কার্পণ্য করেনি কমলার প্রতি, কিন্তু যে আচ্ছাদন ওর দেহকে ঘিরে রয়েছে তার প্রতি চাইতেই মনে হবে অদৃষ্ট তাকে করেছে নিষ্ঠুর পরিহাস।

রমার দিকে চেয়ে কি জানি কেন কমলার অত্যন্ত ভাল লাগতে লাগলো। সকালবেলা কে যেন আজ তার দুয়ারে এসে দেখা দিয়েছে—মনে হচ্ছে যেন এতদিন কমলা ওরই অপেক্ষা করছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিতা ঐ মেয়েটিকে নিজের কাছে অন্তরঙ্গ করে তোলবার জন্য কমলার সারাটা মন উন্মুখ হয়ে রইলো।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে খুব ইচ্ছে করছে।

—আজ বিকেলে আপনাদের বাড়িতে যাবো'খন। রমা বললে।

—বেশ তো, তখন ভাল করেই আলাপ হবে—নয় কি?

নিশ্চয়ই.....বলতে বলতে গাঢ় লাল রঙের শাড়িখানা কার্নিশের ওপর মেলে দিয়ে রমা আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল। সাদা দেয়ালের ওপর গাঢ় লালরঙের শাড়িখানা একটা আগুনের শিখার মত জ্বলতে লাগলো। যেন আশপাশের সবকিছুকে ম্লান করে দিয়ে শাড়িটা একান্তভাবে নিজেকেই ফুটিয়ে তুলতে চাইছে। লাল শাড়ি, তারই দুপ্রান্ত বেয়ে রূপালী সুতোর ফুলকাটা পাড়খানি বাতাসে দোল খেতে লাগলো কমলার চোখের সুমুখে। থানের ধুতিখানা মেলে দিলে কার্ণিশের ওপর। সাদা দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল ওর ধুতির রঙ—যেমন কমলার অস্তিত্বকে মিলিয়ে দিলে কোন এক বর্ণহীন জগতের ভেতর।

এর পর পরস্পরের সান্নিধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হতে দেরী হয়নি। সংকোচের আবরণ উন্মুক্ত করে ওরা পরস্পরের কাছে হৃদয়কে ব্যক্ত করেছে নিবিড় বন্ধুত্বের আলাপনে। প্রতিদিনের যাতায়াতে, কথা-বার্তায় রহস্যকৌতুকে সে-বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দুজনের ভেতর। কমলা একটু বড় হলেও বন্ধুত্বের ব্যাপারে সেটুকু বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রথম পরিচয়ের 'আপনি' সম্বোধন আজ দুজনের মুখেই 'তুমি'তে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও কমলাকে রমা 'দিদি' বলেই ডাকে।

এর মাঝে ছাদে ওদের বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে, গল্পও হয়েছে অনেক। রমার রঙীন

শাড়ি কমলার চোখের সামনে দোল খেয়েছে সাদা দেয়ালের গা বেয়ে। সেদিন রমার একটা ফিকে বেগুনী রঙের শাড়ি শুকোচ্ছিল। বিকেলের দিকে রমা সেটা তুলতে এসেছিল এমন সময় দুজনের দেখা হয়ে গেল। বেগুনী রঙের জমির ওপর কালো রঙের পাড়—চমৎকার দেখাচ্ছিল শাড়িটা। কমলার মনে পড়ে গেল ওরও একটা এমনি শাড়ি ছিল। স্বামী বহুবার বলেছে ঃ তোমাকে এ শাড়িটা পরলে সত্যি ভারী চমৎকার মানায়......। হ্যাঁ, একদিন রমার মত সে-ও ছাদের ওপর এমনি রঙীন শাড়ি শুকোতে দিয়েছে......ওকে ত নিশ্চয়ই সুন্দর দেখাত......হয়তো রমার চেয়েও......

—অমন করে কি দেখছ বলতো? রমা জিজ্ঞাসা করলে।

—দেখছি তোমার শাড়িখানা কি সুন্দর!

কমলা যেন স্বপন দেখছিল, হঠাৎ চমক ভেঙে নিজের ধুতিখানা কার্নিশের ওপর থেকে তুলে নিলে।

আর একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কমলা চুল আঁচড়াচ্ছিল পেছন থেকে রমা এসে ঢুকলো।

—এখনও কাপড় ছাড়া হয়নি বুঝি কমলাদি?

—না ভাই। একটুখানি বস। আয়নার দিকে মুখ করেই জবাব দিলে কমলা। রমার ছায়া পড়েছে আয়নাতে। সবুজ রঙের জমির ওপর টকটকে লালপাড়ের একটা শাড়ি ওর যৌবনদীপ্ত দেহখানিকে ঘিরে রয়েছে। ঠিক তারই পাশে কমলার নিজের ছায়া পড়েছে। নিজের ছায়ার দিকে একটুখানি চেয়েই কমলা চট করে সরে গেল আয়নার সামনে থেকে।

মার বিয়ে হয়ে চলে গেল। যে সাহচর্যে কমলা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তাকে হারিয়ে একাকীত্বের অন্তরালে ওর মনটা গুমরে মরতে থাকে। রমার বিয়ের অনুষ্ঠানে ওর কোন কিছুতেই অধিকার ছিল না—ও ছিল সামান্য দর্শকমাত্র। তবু সমস্ত অন্তর দিয়ে সে কামনা করেছে রমা যেন সুখী হয়।

কিছুদিন পরে রমা ফিরে এলো। দুজনের দেখা হতেই কমলার একখানা হাত নিজের দুহাতের ভেতর চেপে ধরে একটু হেসে রমা জিজ্ঞাসা করলে ঃ ভাল আছ তো ভাই?

—আছি।

কমলা চেয়ে দেখলে রমার দিকে। ওর নারীসুলভ সৌন্দর্য আজ যেন পরিপূর্ণতায় ভরে উঠেছে। হাতে শাঁখা আর লোহা, সিঁথীতে সিঁদুর, কপালে জ্বল জ্বল করছে বড় একটা সিঁদুরের টিপ। বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচলে বাঁধা একগোছা চাবি পিঠের ওপর ঝুলছে, মাথার কাপড়টা অসতর্কভাবে ঘাড়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। যে রমার সঙ্গে প্রথমে আলাপ হয়েছিল ছাদে, সে রমার সঙ্গে আজকের রমার যেন একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। ছাদের ব্যবধান সামান্য হলেও আজকের ওদের দুজনের দুটো জগতের ব্যবধান বিরাট। এর পর যে সব কথা হ'ল তার মধ্যে কমলা হয়ে রইলো শ্রোতা আর কথার বন্যা বইয়ে দিলে রমা তার নবজীবনের মধুর আস্বাদনের ইতিহাসে।

বছর দেড়েক পরে আবার ফিরে এলো রমা। কিন্তু যে প্রাচুর্যের ভেতর একদিন ও এখান থেকে বিদায় নিয়েছিল আজ ঠিক তেমনি রিক্ততার ভেতর ওর পুনঃপ্রবেশ হ'ল পিত্রালয়ে। সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রমা আজ ফিরে এসেছে আমরণের সঙ্গী বৈধব্যের বোঝা নিয়ে। হঠাৎ হার্ট-ফেল করে ওর স্বামী অফিসেই মারা যায়। সহানুভূতি পেল যথেষ্ট কিন্তু যা হারাল সারাজীবনের লাভের অংশ দিয়েও যে তা মিলবে না—এটা সে বুঝতে ভুল করেনি।

দুজনে আবার দেখা হ'ল তেমনিই এক ভোরবেলা ছাদের ওপর। রমা তার থানের ধুতিখানা মেলে দিয়ে কার্নিশের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দুখানা হাতের ওপর মাথাটি রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কি একটা কালো ছায়া ওর মুখখানাকে একান্ত ম্লান করে তুলেছিল। কমলা ছাদে আসতেই রমা একবার মুখ তুলে চাইলে, তারপর মাথাটা নীচু করে দুহাতের ভেতর মুখখানা লুকিয়ে ফেলল। আজ আর কোনও কথা হ'ল না। একটু পরেই রমা নিঃশব্দে নীচে চলে গেল। ছাদের ওপর ওর সাদা ধুতিখানা শুকোতে লাগলো।

কমলা আস্তে আস্তে নিজের কাপড়খানা মেলে দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। রমার শাড়ির রঙ আজ আর ওর চোখের সামনে আগুনের শিখার মত জ্বলছে না। ওর সাদা ধুতির সম্মুখে রঙের আভা ছড়িয়ে রমার কোনও শাড়ি ওর জীবনকে আর বিদ্রূপ করতে পারবে না। ব্যবধান যেটুকু ছিল আজ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে—দেয়ালের রঙের সঙ্গে রমার কাপড়ের রঙও আজ এক হয়ে মিশে গেছে। বর্ণহীন যবনিকায় ওর ভবিষ্যতে সমস্ত রঙের আনাগোনার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ভাবতে ভাল লাগছে কমলার যে ওরা আজ একই জগতের মানুষ—কোথাও পার্থক্য নেই দুজনের ভেতর। ওদের প্রথম পরিচয়ের আনন্দের চেয়েও কি একটা তীব্রতর আনন্দ কমলা আজ অনুভব করতে লাগলো। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না সে, অধীর হয়ে চলে এলো নীচে। তারপর অকারণ দ্রুততায় নিজের প্রাত্যহিক কাজ শুরু করলে।

দুখানা সাদা কাপড় দুবাড়ির ছাদে থেকে থেকে বাতাসে দুলে উঠতে লাগলো।

অনামী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শাঙ্কল রাতে সংগীত শুনি আজ!
ধূসর স্মৃতির ঘনায়েছে মরু-ঝড়
ওগো গরবিকা, ভিখারীর কেন সাজ?
ফলের ফসিল্ হোক্ আজি উত্তর!

আজিকার রাত ঘুমভাঙা জেগুয়ার,
তারার জোনাকি লাগে অনাবশ্যক;
কাঞ্চন হতে বঞ্চিত কে গো আর?
হিসাবের খাতা সঞ্চিত শস্যক্!

প্রহর-ভাঙানো গানগুলি ফিরে দাও!
বিহ্বলা ওগো বিফল কোরো না রাত,
পাষাণ-শীলায় লীলাশেষ কেন চাও?
অপসরণের স্মরণে পেতেছি হাত!

নব-জাতকের দিব নাকো কোনো নাম।
তোমারি সত্যে এর পরিচয় চাই:
মোউলের মৌ চেনে কোনো পরিণাম?
এই পসরাতে প্রসাধন কিছু নাই!

অতলান্তিক

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়ায় কাঁচের গ্লাসটা ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়লো। সেই শব্দে ঘুম ভাঙল সুনীলের। গম্ভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করেছে সারা কক্ষ। পাশেই তৃপ্তি গভীর ঘুমে অচেতন। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু উষ্ণ নিশ্বাস ঝরছে সুনীলের অঙ্গে। তৃপ্তির চুলে আঙুল চালাতে লাগলো সুনীল। কী কালো গভীর চুল—চুলের অরণ্য যেন!

অনেক অসহ মন্থর রাত্রি আর অসংখ্য প্রতীক্ষা-কাতর দারুণ দুঃসহ মুহূর্ত অতিবাহিত হবার পর অবশেষে একদিন সংগ্রামের অবসান হলো। অনেকের কটাক্ষ অগ্রাহ্য করে অনেক নিদারুণ বিঘ্ন ভস্ম করে যদি ভালবেসে বিয়ে করা যায়, তাহলে নিজেদের বিজয়ী বীরের মতো মনে হয় বৈকি! অন্তত তৃপ্তি আর সুনীলের তাই মনে হলো।

এই—এই, তৃপ্তিকে নাড়া দিল সুনীল।

কি? ঘুমজড়ানো স্বরে তৃপ্তি উত্তর দিল।

এত ঘুমোতেও পারো, সুনীল আবার নাড়া দিল, ওঠ, বড় গল্প করতে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে।

এত রাত্রে? ধন্য তুমি, তৃপ্তি ঘুমের ঘোর কাটিয়ে নিলো।

এমন রাত্রি ঘুমিয়ে কাটানো বোকামি, কতদিন—উঃ, কত দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ কাটাবার পর তোমাকে পেলাম—রাজার মত মনে হচ্ছে আজ নিজেকে।

সুনীলের আর একটু কাছে সরে এসে তৃপ্তি বললো, কিন্তু বড়ো ভয় করে যে আমার!

কিসের ভয় তৃপ্তি?

আগামী দিনের। সেদিনের কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হই—যেদিন তোমার ভুল ভাঙবে, যেদিন মনে হবে আমি তোমার একান্ত অযোগ্য, তুমি আমাকে বড়ো বেশি বাড়িয়ে দেখছো বন্ধু, তাই ভাবি,—তৃপ্তির স্বর ভাবপ্রবণ হয়ে এলো,—তোমাকে সুখী করবো কেমন করে? কোন গুণই যে নেই আমার! বড়ো স্বার্থপর আমি!

তৃপ্তির মাথা বুকে টেনে নিয়ে সুনীল বললো, আমাকে আঘাত দিয়ে কি আনন্দ পাও তুমি তৃপ্তি? কতবার বলেছি, তোমাকে আমি মোটেই বাড়িয়ে দেখিনি, তুমি যা' ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করেছি তোমাকে। সুখী কি কেউ কাউকে চেষ্টা ক'রে করে? তোমার সব কিছুতেই আমার সুখ বন্ধু!

তবু ভয় করে—ওগো বড়ো ভয় করে আমার—একটা বিশ্রী রকম অস্বাভাবিকতা আছে আমার চরিত্রে।

সুনীল বললো, আমি জানি আমার মন, আমি জানি নিজেকে, আর এও জানি, কোনদিন কোন কারণেই তোমার ওপর এতটুকুও অসন্তুষ্ট আমি হবো না, তোমার সঙ্গে মিশেছি বহুদিন ধরে, পেয়েছি তোমার মনের অলি-গলির সন্ধান, তারপর তোমাকে ভালবেসেছি—এ দুদিনের মোহ নয়, এ সারা-জীবনের প্রেম। আজ আমার মনে হয়, এ ছাড়া আর কিছুই যেন হতে পারতো না।

তৃপ্তি কথা বললো না। মন্ত্রমুগ্ধের মত সুনীলের কথাগুলো সে শুনেছিল। ঘরের আবহাওয়া একটু ভারি হয়ে উঠলো যেন। সেটাকে তরল করে দেওয়ার জন্য সুনীল বললো, তোমার জীবনের কথা বলো তৃপ্তি, জানই তো তোমার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল কত গভীর! তোমার জীবনের সমস্ত কথাই আমি শুনতে চাই।

শুনেছো তো সব।

আরো বলো—আরো—আরো, সব কিছু বল।

বল কি বলবো?

মৃদু হেসে সুনীল বললো, অতীতের ইতিহাস, সেই চন্দনবাবুর কথা।

আঃ, বলেছি তো কতবার।

আবার বল, সমস্ত কিছু বল, তোমার সম্বন্ধে তুমি যা জানো, আমিও ঠিক সেই পরিমাণ জানতে চাই। অর্থাৎ,—আবার হাসলো সুনীল—তোমার সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে চাই।

বেশ, তৃপ্তিও হাসলো—বলছি সব, একেবারে প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্তই বলবো, কিছুই বাদ দেবো না।

বল,—সুনীলের কণ্ঠে কৌতূহল।

চারপাশে বড়ো অন্ধকার। ঝড়ো হাওয়ার তীব্র তীক্ষ্ণ প্রহারে পৃথিবী যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তৃপ্তি আরম্ভ করলো।

সেদিনও ঠিক আজকের মতই হাওয়া দিচ্ছিল। তবে অন্ধকার আজকের মত এত ঘন ছিল না, আর আকাশে অসংখ্য তারা ফুটেছিল। সেদিনের হাওয়ায় এমন ভাঙনের বাসনা ছিল না, ছিল মাতিয়ে দেওয়ার নেশা।

ঘরে ঢুকতেই চন্দনদা পড়লো একেবারে আমার মুখোমুখি। একটা নতুন স্যুট পরেছিলেন তিনি। জানোই তো চন্দনদা একটু সাহেবি ধরণের। সাহেবি পোষাকেই ওঁকে মানায়। তাঁকে দেখেই আমি বললাম, দাদা তো বাড়ি নেই।

আসতে না আসতেই তাড়িয়ে দিতে চাও? হেসে বললেন চন্দনদা।

না না, সেকি কথা, বসুন আপনি।

পাশের চেয়ারটায় বসে চন্দনদা বললেন, তারপর, তোমার পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?

কই আর, ইতিহাস একেবারেই পড়া হয়নি।

নিয়ে এসো না, একটু পড়িয়ে দিই, আপত্তি আছে?

একটুও না, নিয়ে এলাম আমি।

ইতিহাস আরম্ভ হলো। কিন্তু লক্ষ্য করছিলাম, আমার মুখের দিকেই চন্দনদার মন বেশি। হঠাৎ এক সময় আমার একটা হাত কোলে তুলে নিলেন তিনি। আস্তে আস্তে আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম। তারপর খাতা থেকে সাঁ করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তিনি আমায় লিখে দিলেন ইংরেজীতে,—আই লাভ্ ইউ।

কিশোরী বয়েস তখন। লজ্জায় আমার গালে রঙ ধরে গেল। কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলাম। সেদিন থেকে একটা মধুর উত্তেজনা দেখা দিল মনে। অনেক রাত্রি অবধি ঘুম এলো না কিছুতেই।

ব্যাপারটা জানাজানি হলো বন্ধু মহলে। তারপর যা' স্বাভাবিক, ভয়ানক ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ করলো তারা। বলতে লজ্জা নেই, সে ক্ষ্যাপানো আমার ভালই লাগতো। কিন্তু ফল হলো এই, চন্দনদাকে দেখলেই আমি পালিয়ে যেতাম। কতবার তিনি আড়ালে আমাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সুবিধে করতে পারেন নি।

একদিন কিন্তু ধরা পড়লাম। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম আর উনি উঠছিলেন। খপ্ করে আমার হাত ধরে ফেললেন তিনি।

আঃ, ছাড়ুন, ছাড়ুন—আমি ঘেমে উঠলাম, বাবা আসছে,—

চালাকি রোজ রোজ? বাবা আসছেন! আসুনগে বাবা, চন্দনদা আমাকে কাছে টেনে নিলেন। ওঁর স্বভাবটা ছিল ডাকাত ধরণের, লুঠ করে নেওয়ার ইচ্ছে সব সময়।

ছাড়ুন এবার—আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল তাঁর ঠোঁটের উত্তপ্ত স্পর্শে। জ্ঞান লুপ্ত হলো যেন আমার. গুলিয়ে গেল সব কিছু। টলতে টলতে ঘরে প্রবেশ করলাম।

অদ্ভুত অপরূপ সেদিন! আজও আমার মনে আছে!

এইবার আলাপ হলো ঘন, দিনে দিনে কেটে গেল সমস্ত সঙ্কোচ। ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনায় অতিবাহিত হলো আমাদের অনেক

মধুর মুহূর্ত। মনে মনে চন্দনদাকে স্বামী বলে মেনে নিলাম।

ব্যাপারটা ছিল আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চন্দনদা দাদার বিশেষ বন্ধু। আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছেলেবেলা থেকে। যখন খুশি তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন, যতক্ষণ খুশি আমার সঙ্গে গল্প করতেন। কেউ কিছুই বলতেন না। একদিন হঠাৎ মা বুঝতে পারলেন সমস্ত ব্যাপারটা। বলছি —কেমন করে!

দুপুর দুটো হবে। ওপরের ঘরে চন্দনদার সঙ্গে খুব গল্প করছি—আমার ছোট বোনকে বেবি-দোলনায় দোলাতে দোলাতে। বাড়িতে আর কেউ নেই, শুধু মা। তিনি নীচে ঘুমোচ্ছিলেন, ওপরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই তাঁর।

বাইরে ঝরছে দারুণ বৃষ্টি। কালো হয়ে গেল দেখতে দেখতে চারদিক। চন্দনদা আমার কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালেন। খুকিকে দোলা দিতে দিতে নিজের মেয়ের কথা ভাবছিলাম। আর কী আশ্চর্য, আমার মনের কথাটা চন্দনদা বুঝতে পারলেন সঙ্গে সঙ্গে।

বললেন, নিজের মেয়ের কথা ভাবছো বুঝি?

যাঃ অসভ্য! আমি মাথা নীচু করলাম।

এখনও লজ্জা? আমার কাঁধে হাত রাখলেন চন্দনদা, আমাদেরও যেন হয় এমনি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে—যাই বল, খুব বেশি ছেলেমেয়ে আমি চাই না কিন্তু—

আমিও না, আস্তে আস্তে বললাম।

হঠাৎ চন্দনদা আমাকে বলে বসলেন তোমাকেও আমার বড়ো দোলাতে ইচ্ছে করছে তপতী—

এই যাঃ—আমার মৃদু আপত্তি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! চন্দনদা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দোলাতে আরম্ভ করলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। মা প্রবেশ করলেন ঘরে। কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হয়েছে এবার? রাগের ভান করে বললাম, অসভ্য কোথাকার!

লজ্জাও নেই চন্দনদার। হেসে বললেন, কি হলো?

বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, লজ্জাও করে না? যেখানে-সেখানে যখন-তখন যা ইচ্ছে—ঠিক হয়েছে, উঃ, কি যে হবে!

ভালই তো হল, সিগারেট ধরিয়ে চন্দনদা বললেন, মা জানতে পারলেন ব্যাপারটা।

আমার ইচ্ছে করছিল সিগারেটটা চন্দনদার মুখ থেকে টান মেরে বাইরে ছুঁড়ে দিতে।

সন্ধ্যেবেলা মা আমাকে নিয়ে পড়লেন। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। জানতাম, মা আমাকে এক সময় ধরবেনই। কিন্তু আমারও জিদ্ চেপে গেছে তখন। যা হবার হোক—ভাবটা এই রকম। ধরা যখন পড়েছি, তখন কিছু লুকোবার চেষ্টা করা বৃথা।

তুমি আজ যে অবস্থায় চন্দনের কাছে ছিলে, মেয়েমানুষ তেমন করে মাত্র একজনের কাছে থাকতে পারে, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে মা বললেন, জানো কার কাছে?

জানি, আমি উত্তর দিলাম।

বলতো কার কাছে? আমাকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে মা বললেন, স্বামীর কাছে, জানো সেকথা?

হ্যাঁ জানি, একটু থেমে আমি বললাম, চন্দনদাকে আমি স্বামীর মতোই মনে করি।

লজ্জা করছে না তোমার? মা গর্জন করে উঠলেন, বেহায়া মেয়ে কোথাকার! চন্দনের সঙ্গে তোমার বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না, অসবর্ণ বিয়ে তোমাদের বংশে কখনও হয়নি, হবেও না।

আমি বললাম, হলে ক্ষতি কি?

আমার মুখে মুখে উত্তর দিও না, চন্দনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তোমায় ত্যাগ করতে হবে আর তোমায় আমি কাল তোমার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, ভীষণ রেগে মা বেরিয়ে গেলেন সে-ঘর থেকে।

ভয় পেলাম আমি খুব। সত্যি যদি মা আমায় মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন! চন্দনদাকে না দেখে থাকবো কেমন করে! কান্না পেতে লাগলো খালি খালি। কিন্তু মামার বাড়ি যাওয়া আমার হল না। তবে চন্দনদার সঙ্গে গল্প করা সুকঠিন হয়ে উঠলো। বাধা পেয়ে আমার প্রেম হল দুর্বার। মনে হল সমস্ত কিছুই যেন আমি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি। একদিন চন্দনদার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিলাম।

বললাম, মা সব জানতে পেরেছেন।

জানি, কি ঠিক করলে তুমি? উনি আমার মুখের দিকে চাইলেন।

আপনি কি ঠিক করলেন বলুন?

এই মুহূর্তে তোমাকে বিয়ে করবো।

আঃ, রাগ হল আমার, বাজে কথা বলার সময় নয় এটা।

বল তবে কি করবো?

আপনার বাড়ির লোক কখনও এ বিয়ে সমর্থন করবে না।

বোধ হয় না, চন্দনদা মাথা চুলকোলেন, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করবো আমি, আমার বাড়ির লোকে নয়, তাই বলছি চলো আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে—

চন্দনদা! আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উনি থেমে গেলেন, শুনুন যা বলি; আপনার ছাত্রজীবন শেষ হতে এখনো দুবছর বাকী তারপর চাকরী পেয়ে স্বাধীন হওয়া, সুতরাং আর একটা বছর হাতে রাখুন, অর্থাৎ আমাদের আরো তিন বছর অপেক্ষা করতেই হবে।

তিন বছর! চন্দনদার মুখ করুণ হয়ে উঠলো। অসহায়ের মতো উনি আমার বুকে মুখ রাখলেন। তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, দুঃখ করবেন না, অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের, কোন উপায়ই যে নেই। হ্যাঁ, আর একটি কথা, আপনি আমার সঙ্গে বেশী দেখা করবেন না, বুঝতেই তো পারেন, দেখা করার কত অসুবিধা এখন, যদি কিছু বলার থাকে চিঠি লিখে জানাবেন, আমিও লিখেই জানাবো আপনাকে আমার যা বলবার।

আজ ভাবি কেন অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম সেদিন! কেন চন্দনদার কথায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করিনি! তাই তো বসন্তের দাগের মতো হয়ে রইল আমার জীবনে সে-প্রেম। কি অদ্ভুত এই বসন্তের দাগ। মনেও থাকে না সেকথা, কোন যন্ত্রণাও দেয় না, কিন্তু আয়নায় মুখ দেখলেই চাপা বিরক্তিতে মন ভরে যায়। আমারও হয়েছে তাই। মনের দিকে চেয়ে বড়ো বেশী সংকুচিত হয়ে উঠি। জল-বসন্তের দাগের মতো সে-ব্যর্থ প্রেম আমার চরিত্রকে কলুষিত করেছে। কিন্তু সেকথা থাক।

চিঠি লেখা আরম্ভ হল। শরীরের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিতে বলে আর নানা উপদেশ দিয়ে সুগৃহিণীর মত প্রচুর চিঠি লিখতে লাগলাম চন্দনদাকে। মনে মনে যেন আমাদের বিয়ে হয়েই গেছে, কাজেই কিছুই লিখতে বাধতো না। এমনি করেই আশা-নিরাশার মাঝে দুবছর কেটে গেল। চন্দনদা পাশ করলেন, চাকরীও পেলেন। এইবার তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেন।

কিন্তু সে-অপেক্ষাই আমার কাল হল। এই দুবছরে আমার বেশকিছু পরিবর্তন হল। এতদিন আমার ভালবাসা ছিল মধুর স্নেহের মতো, নেশার মতো, তাকে বিশ্লেষণ করার মন একেবারে প্রথমে আমার ছিল না। কিন্তু দিনে দিনে আমি ভাবতে শিখলাম, কিশোরী বয়সের ভাবালুতা গেল কেটে। আমার মনে হল—চন্দনদা আমাকে নিয়ে সুখী হবেন কি? ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমাকে সংসারে প্রবেশ করতে হবে তো! আমি যে একটু অন্য ধরণের, আমাকে ভাল করে হয়তো কেউই বুঝতে পারবে না, আর আমাকে যে বুঝতে পারবে না, সে আমায় নিয়ে সুখী হবে কেমন করে? তার জীবন কি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না? আর এর মধ্যেই আমাদের মতের বেশ অমিল হতে আরম্ভ হয়েছিল। আর চন্দনদারও কয়েকটা জিনিস আমি মোটেই সহ্য করতে পারতাম না। দাদার

অন্য কোন বন্ধুদের সঙ্গে আমি হেসে কথা বললে তিনি মুখ গম্ভীর করতেন। একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে স্পষ্টই কয়েকটা কথা জানিয়ে দিলেন।

বললেন, তুমি অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মেশো—আমি তা চাই না।

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার ভাল লাগে না, আমি পছন্দ করি না।

আপনি কি আমায় অবিশ্বাস করেন? আমার চোখ ঠেলে জল এলো।

অবিশ্বাস ঠিক নয়—

তবে?

বললাম তো আমার ভাল লাগে না, আর তুমি মিশো না কারুর সঙ্গে।

ভয়ানক রাগ হল আমার। এত নীচ মন চন্দনদার? এই লোককে নিয়ে আমি দিন কাটাবো কেমন করে? বাড়ির লোককে চটিয়ে একে বিয়ে করে কি লাভ হবে আমার? আর এইরকম স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা তিনি প্রায়ই করতে লাগলেন। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম একদিন, চন্দনদা আমার চরিত্র মোটেই বুঝতে পারেন নি। আমাকে নিয়ে তিনি তো সুখী হবেনই না, আর আমিও মানসিক শান্তি পাবো না তাঁকে নিয়ে। এতদিনে কিশোরী বয়সের ছেলেমানুষী কেটে গেছে, বুঝতে শিখেছি অনেক কিছু। সুন্দর ছেলে দেখলেই এখন আর ভালবাসতে ইচ্ছে করে না। তারপর একদিন চন্দনদা আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন।

তৃপ্তি, এবার তাহলে আমরা বিয়ে করি?

আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম। উত্তর দিলাম না। চন্দনদা আমার মুখের কাছে মুখ এগিয়ে আনতে গেলেন, আমি ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিলাম।

এ কি তৃপ্তি? বোঝা গেল উনি অবাক হয়েছেন।

না, না চন্দনদা—

কেন?

ভালো লাগে না আমার—

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মৃদুস্বরে আমি বললাম, আমাকে নিয়ে আপনি সুখী হবেন না চন্দনদা।

আজ একথা কেন বলছ তৃপ্তি?

আমি বুঝতে পেরেছি সেকথা, একটা বিশ্রী রকম অস্বাভাবিকতা আছে আমার চরিত্রে, একটা অদ্ভুত স্বার্থপরতা—

সেসব জেনেশুনেই তো আমি তোমাকে ভালবেসেছি—

না, আপনি আমাকে বুঝতে পারেন নি, এ ভালবাসা ভেঙে যাবে, আর মা-বাবাকে আঘাত দিয়ে বিয়ে করতেও আমি চাই না—

তৃপ্তি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে না? চন্দনদার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। তাঁকে আঘাত দিয়ে প্রত্যাখান করতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। কতদিন কেটেছে তাঁর সঙ্গে, কত মধুর কল্পনায়। তিনিই তো আমার কৈশোরের অন্তরঙ্গ। কিন্তু কি করবো, উপায় যে নেই। দুটো জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার চেয়ে ক্ষণিকের প্রচণ্ড আঘাত যে অনেক ভালো!

কোনরকমে বললাম, না, আমাকে আপনি ভুলে যান চন্দনদা!

টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

তারপর আমাদের ব্যাপারটি ফুরিয়ে গেল অতি দ্রুত। আর মাত্র একদিন চন্দনদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেদিনের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না! সেই আমাদের শেষ-দেখা।

উনি বললেন, বদলী হলাম, বাইরে চলে যাচ্ছি।

বেচারীর মুখ দেখে ভারী কষ্ট হচ্ছিল আমার। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার ছাপ তাঁর চোখে মুখে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, অনেক ঘুমহীন রাত্রি কেটেছে তাঁর।

আপনি চলে যাবেন চন্দনদা? আমার কণ্ঠে কান্না।

হ্যাঁ, আর কেনই-বা থাকবো এখানে?

কেনই-বা যাবেন?

বুঝতে পারো না সেকথা?

খুব বুঝতে পারি, কিন্তু দয়া করে আমায় ভুল বুঝবেন না, আপনাকে এতটুকু আঘাত দিতে আমি চাই না।

কেন দিচ্ছ তবে?

আমাদের ভালোর জন্যেই এ কাজ আমায় করতে হল, বুকে আমার চাপা কান্না জমে উঠলো। অতিবাহিত হলো কয়েকটি নিদারুণ মুহূর্ত।

তুমি যদি এই ঠিক করেছিলে তৃপ্তি, তাহলে কেন আমায় ফিরিয়ে দাওনি প্রথম দিন? কেন আমায় আশা দিয়েছিলে? তোমাকে যেভাবে ভালবেসেছি, সেভাবে আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবো কি? আমার প্রথম প্রেম কেন এমন করে পায়ে মাড়িয়ে দিলে—

চন্দনদা তুমি যেও না, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি ফিরে এসো, আমাকে ভুল বুঝো না, আজও আমি তোমার তৃপ্তি। চন্দনদা, তৃপ্তি আঁকড়ে ধরলো সুনীলকে।

কি বলছো তুমি তৃপ্তি? গর্জন করে উঠলো সুনীল।

চন্দনদা—চন্দনদা—

তৃপ্তি! উন্মত্ত কণ্ঠস্বর সুনীলের, চুপ করো মুখ বন্ধ করো—তার চীৎকারে মনে হলো এই মুহূর্তে তৃপ্তিকে সে খুন করে ফেলবে। চারপাশে বড় বেশী অন্ধকার। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

বাইরে ঝড়ো হাওয়া!

সন্ধানী

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য

জড়বাদী এই বিশ্বের দরবারে
মানুষ মানে না মানুষের অধিকার
ভীতু সৈনিক আশ্রয় মাগে দ্বারে
প্রাণের জোয়ারে শঙ্কা জেগেছে তার।

বিদ্রোহী মনে কামনার হিমালয়
মাথা উঁচু করি' দাঁড়ায়ে রহিবে তবু
জানে অম্বর কিবা তার পরিচয়
পৃথিবীর কাছে নত হইবে না কভু!

ভীতু হরিণীর অযথা মৃত্যু লাগি
কার্মুকা ছোটে হিংস্র লোলুপ রথে
অজ্ঞেরা থাকে ধর্মে শরণ মাগি'
বিজ্ঞেরা করে কলরব পথে পথে।

বহু শতাব্দী পার হয়ে এনু আমি
কালের প্রবাহে পদে পদে পরমাদ
পলাশীর মাঠে আজিও শুনি যে আমি
ঘন কঙ্কালে করুণ আর্তনাদ।

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, ভূপর্যটক

১১

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ঘরে বাইরে সমান। ইংলণ্ডে গিয়ে দেখেছিলাম সেই আঁকাবাঁকা গলি। গলিপথ, কোথাও বালি জমা হয়ে রয়েছে, আর কোথাও বা অপরিষ্কার, নরনারী কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে। এমন হয় শহর গড়নের দোষে। আমেরিকার কোথাও ইংলণ্ডের মত অপরিষ্কার স্থান নেই। জোহান্সবার্গ গড়ে উঠেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আমলের আগেই, তাই জোহান্সবার্গ এখনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শহরের মাঝখানে মন্দির অথবা মসজিদ দাঁড়িয়ে নেই। ধর্মের বদখেয়ালী কথার গুজব এখানে কেউ দেয় না, কুঁড়ের বৃত্তি এখানে কেউ করতে সাহস করে না। এটা হবার একমাত্র কারণ হলো, বুয়র যুদ্ধের স্মৃতি লোক এখনও মন হতে মুছে ফেলতে পারেনি। যেখানেই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় সেখানেই পুঁজিবাদীর সর্বহারা সাম্রাজ্যবাদীদের আশ্রয় দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। এ অঞ্চলে যুদ্ধ হয়েছিল তাই এখনও বৃটিশ পুঁজিবাদীরা তাদের চাতুর্য দেখাতে সক্ষম হয়নি কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী যে বিষ ঢুকিয়েছে, সে বিষ তার কিছুই নয়, কেননা বুয়র বহুসংখ্যক মুষ্টি ভারতবাসী এখানে এসে কুলির কাজ শুরু করেছে, তাই বুয়রগণ ক্ষেপে গেছে।

যখন আমি প্রিটোরিয়ায় ভ্রমণ করছিলাম তখন জোহান্সবার্গের আশাভাই কোম্পানীর এক প্রতিনিধির সংগে আমার দেখা হয়। তিনি বলেছিলেন যদি জোহান্সবার্গ যাই তবে যেন তাঁদের বাড়িতেই থাকি। সেজন্যই শহরতলী ছেড়ে দিয়ে শহরের অভ্যন্তরে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে থাকে সেখানে কয়েকদিন থাকবার জন্য এসেছিলাম। আশাভাই কোম্পানীর প্রতিনিধির সংগে দেখাও হয়েছিল এবং তাঁদের বাড়িতে থাকতেও পেরেছিলাম। ওদের বাড়িতে এসে প্রথম দু'দিন কোথাও যাইনি, শুধু বিশ্রামই করি। তারপর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করি। জোহান্সবার্গের ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ নানার সংগেও দেখা হয়। নানা কয়েকদিন আমার সংগে বিশেষভাবে মিশতে পারেননি; কারণ, নিকটস্থ এক গ্রাম হতে বুয়রগণ ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার করছিল, মিঃ নানা তারই প্রতিকারে ব্যস্ত ছিলেন। যখন মিঃ নানা প্রতিকার করছিলেন, আমি অনুসন্ধান করছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রগণ কেন গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার করছে।

যে গ্রামে বুয়রগণ অত্যাচার করছিল, সে গ্রাম জোহান্সবার্গ হতে ত্রিশ মাইল দূরে। গ্রামে দু'টি হিন্দু পরিবার ফল বিক্রয় করতো আর ২৭টি মুসলমান পরিবার গ্রোসারি হতে আরম্ভ করে মনোহারি জিনিস পর্যন্ত বিক্রি করছিল। ভারতীয়েরাই গ্রামের সকল রকমের ব্যবসা একচেটিয়া করেছিল। কিন্তু হঠাৎ গ্রামের লোক ক্ষেপে গেল কেন, তাই ছিল আমার জ্ঞাতব্য বিষয়। আমি প্রায়ই মিঃ নানার পাশে বসে থাকতাম এবং মিঃ নানা পলাতক ভারতীয়দের সংগে কি কথা বলেন, তাই শুনতাম। যখনই মিঃ নানা সকল কথা আমাকে শোনাতে রাজি হতেন না, গোপন রাখবার চেষ্টা করতেন, তখনই আমি সরে পড়তাম।

একদিন মিঃ নানার আফিসের কাছে একটি ভারতীয় খাবারের দোকানে বসে আছি, এমন সময় একজন হিন্দু সেখানে এলো। সে পালিয়ে আসেনি। ত্রিশ মাইল দূর থেকে হেঁটে পালিয়ে এসেছে। সেও সেই গ্রামের বাসিন্দা। তাকে ট্রান্সভালের ভারতীয় কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে যে বিবৃতি দিয়েছিল, তারই কথা এখানে বলা হলো। তার সংগে আমি অনেকক্ষণ কথা বলে সেই গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হয়েছিলাম। এই লোকটি সংবাদপত্রে এবং ট্রান্সভালের ভারতীয় কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিল, তার কথা পরে বলা হলো; কিন্তু সে যে সকল কথা প্রকাশ্যে বলেনি, তারই দু-একটা কথা এখানে বলতে বাধ্য হলাম।

অনেকদিন পূর্বে ট্রান্সভালে আর একটি বিল পাশ হয়েছিল. সেই বিলের সারমর্ম ছিল : কোনও ভারতবাসী কোন ইউরোপীয় স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারবে না, যদি তা ঘটে, তবে আইন কখনও তা গ্রাহ্য করবে না। মানুষের গড়া এক রকমের আইন হয়, আর প্রকৃতির গড়া আইন অন্য রকমের। ইউরোপীয়রা বিবাহের দিক দিয়ে প্রাকৃতিক আইনই মেনে চলে, তবুও ট্রান্সভালে এরূপ অ-প্রাকৃতিক আইন প্রচলন হবার কারণ কি, তা বিদেশের লোক মাত্রেই অবগত হতে চায়. ঘটনাস্থলে গিয়ে আমারও তেমনি জানতে ইচ্ছা হয়েছিল।

যে লোকটির সংগে আমার দেখা হয়েছিল, সে তথাকথিত জাতিতে গুজরাটি মৎস্য-ব্যবসায়ী। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের মৎস্য ব্যবসায় করতে দেওয়া হয় না। তাই সে ফলের ব্যবসা করতো। ভারতের মৎস্য ব্যবসায়ী বিদেশে গিয়েও ভারতবাসীর কাছে অপবিত্র ছিল অথচ ভারতবাসীরা দক্ষিণ-আফ্রিকাতে পারিয়ার মত পূর্বেও ব্যবহার পেত এখনও ব্যবহার পাচ্ছে—তবুও দেশের ভাইকে খর্ব করে রাখা—এটা হলো ভারতবাসীর মজ্জাগত দোষ। মৎস্য ব্যবসায়ী ভারতবাসীর কাছে কোন দোকান ভাড়া পাবার সুযোগ পায়নি কিন্তু সে বুয়রদের মাঝে থাকবার সুযোগ এবং সুবিধা পেয়েছিল এবং এখনও সেই সুবিধা পাচ্ছে। সে বিবাহিত। সে তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করছে। তার স্ত্রী বুয়রদের বাড়িতে যায় এবং বুয়র স্ত্রীলোকগণও তাদের বাড়িতে আসতে কোনরূপ ভয় পায় না এবং পূর্বেও ভয় পেত না। কিন্তু সংগ-দোষ অথবা সমাজ-দোষ বড় দোষ, সেজন্য এই ভদ্রলোককে অনেক বছর বড়ই কষ্ট পেতে হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমরা কুলি নামেই পরিচিত। বুয়রগণ আগেকার দিনে কুলিদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে জানত না; কিন্তু বিবাহ বিল প্রচলিত হবার পর কুলিদের মাঝে বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন মতবাদ আছে তা কুলিরাই বলতে এবং বুঝাতে বাধ্য হয়েছিল। প্রাণের দায় বড় দায়, এ দায় হতে রক্ষা পাবার জন্যই কুলিরা একতাসূত্র ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

ভারতীয় প্রথামতে ভারতীয় মুসলমান ভাইরা দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মেয়েলোক চুরি করতে শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মেয়েলোক-চুরি অন্য ধরণেই হতো। ধনী ব্যবসায়ীরা প্রথমত যুবতীদের দোকানে চাকুরি দিয়ে পরে রান্নার কাজে নিযুক্ত করতেন। রান্নাঘর হতে শুরু হতো বিবাহ-সম্বন্ধ। যখন বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়ে যেতো তখন মেয়ের অনেক আত্মীয় বিবাহে বাধা দিতে চাইত। বিবাহে যাতে বাধা না পড়ে সেজন্য ভারতীয় প্রথামতে মেয়েকে এক বাড়ি হতে অন্য বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হতো। তারা এসব বজ্জাতি সহ্য না করতে পেরে আইন অমান্য নয়, আইন নিজের হাতে গ্রহণ করে প্রতিকার এবং

প্রতিশোধও নিত। এতেও যখন কিছুই হলোনা তখন হলো বিবাহ-আইনের প্রচলন, যে আইনের ক্ষমতায় কোনও ভারতবাসী কোন শ্বেতকায় রমণীর পাণি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়েও ভারতীয় মুসলমান বোরখা ব্যবহার পরিত্যাগ করেনি। বিবাহ-আইন প্রচলন হবার পূর্বে বোরখা পরা মেয়েলোক দেখলেই বুয়রগণ মনে করত, এতে কিছু গোপনীয় বিষয় আছেই, তাই তারা আইন নিজের হাতে গ্রহণ করে বোরখা পরা লোক দেখলেই তল্লাস করত। এতে কয়েকজন পুরুষ লোকও পাওয়া গেছে যারা ইমিগ্রেসন আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেশ আনন্দেই দক্ষিণ আফ্রিকাতে বসবাস করছিল। দ্বিতীয় জঘন্য কাজ ছিল অনেক পুরুষ অসদভিপ্রায়ে বোরখা পরে বুয়রদের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করত। এরূপভাবে নানারূপে নাজেহাল হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে নানারূপ বিল পাশ হয়েছে যার ফলে সমুদায় ভারতবাসীই কষ্ট পেতে বাধ্য হয়েছে।

এখন আমি আবার পূর্বের কথায় ফিরে যাব। কেন জোহেন্সবার্গের গ্রামের ভারতীয় লোককে অত্যাচার করা হয়েছিল, তারই কথা বলব।

একটি বুয়র ছেলের সঙ্গে একটি ভারতীয় ছেলের ঝগড়া হয়। ঝগড়া পরিণামে হাতাহাতিতে দাঁড়ায় এবং বুয়র ছেলেটি ভারতীয় ছেলেটিকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং দুঘা লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। ভারতীয় ছেলেটির মাথায় ছিল তুর্কী ফেজ। তুর্কী ফেজটি ভারতীয় ছেলেটির মাথা হতে পড়ে যায়। তুর্কী ফেজটি যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে থাকে কেউ সেই ফেজ উঠিয়ে আনেনি। ফেজটি পড়ে আছে দেখে ভারতীয়দের ধর্মে বড়ই আঘাত লাগে এবং সেই আঘাতের প্রতিশোধ নেবার জন্য যখন বুয়র ছেলেটিই অন্য একটি ভারতীয় দোকানে সওদা নেবার জন্য প্রবেশ করে তখন সেই দোকানী ছেলেটিকে ধরে এরূপ নির্মমভাবে প্রহার করে যে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। যখন সন্ধ্যার সময় এই সংবাদ গ্রামবাসী শুনল তখন তারা সকলে মিলে দোকানীদের আক্রমণ করল। বুয়ররা কারো গায়ে হাত তোলেনি শুধু দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক পরিবারের লোককে এক-একখানা মোটরকার দিয়ে বলে তোমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। ভারতীয় দোকানীরা রাত্রি বেলাই গ্রাম ছেড়ে চলে আসে। যারা ফেজ ব্যবহার করত না তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে কেউ বলেনি এবং যারা ফেজ ব্যবহার করত না তারা গ্রাম ছাড়েওনি। এতে ভারতীয় মুসলমানদের তিনটি পরিবার রেহাই পায়। তারা অনেক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারের আত্মীয় এবং কমিউ-নিষ্ট ভাবাপন্ন। মোট পাঁচটি পরিবার এই জুলুম হতে রেহাই পেয়েছিল।

শিখরা যেমন কেনেডাতে ভারতবাসীর জন্য বদনাম কিনেছে, ভারতীয় সুন্নি মুসলমানগণও দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারত-বাসীর সকল আশাই নষ্ট করেছে যদি বলা হয় তবে দোষ হবেনা। আমি সিয়া-সুন্নিতে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে চাই না, যা দেখেছি তাই বলছি। দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদের অনেক সুন্নি মুসল-মান গ্রাম্সভাল এবং নাটালে থাকে। তারা তাদের স্ত্রীলোকদের যদি স্বাধীনতা দিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে তবে আমাদের অন্য শ্রেণীর মুসলমান ভাইরা তা পারবেন না কেন? এসব হলো তর্কের কথা—কিন্তু আসল বিপদ শুরু হয়েছে পরিবর্তনকে গ্রহণ না করেই। পরিবর্তনের যারা পক্ষপাতী নন তাঁরাই হলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার কংগ্রেস-সেবক। পরিবর্তনের যারা পক্ষপাতী, দক্ষিণ আফ্রিকাতে যারা কুলি নামে পরিচিত না হয়ে ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাস করতে চান, তারা হলেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মেম্বর।

আমি যখন শুনলাম—কি করে গ্রামেতে বুয়রগণ অত্যাচার করেছে এবং কেন করেছে, তখন চুপ করে থাকা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলনা। তবে যেদিন ডাক্তার ডাডো (Dr. Dado) ভারতীয় কালচারেল এসোসিয়েশনে আমাকে লেকচারে আহ্বান করেছিলেন সেদিন আমি স্থানীয় যুবক-গণকে বলেছিলাম—'যদি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকতে চাও তবে "যেইসা দেশ তেইসা বেশ" এই কথাটা মনে রেখে চলাই ভাল। ভারত-বর্ষ এখনও স্বাধীন হয়নি, এখনও দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'হের্জগিন' নিয়ে বেশ টাগ-অব-ওয়ার চলছে আমেরিকান ও বৃটিশের মাঝে। অতএব বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা নেই।'

ডাক্তার ডাডো ধর্মে মুসলমান কিন্তু তিনি সনাতনী নন। তাই ট্রান্সভালের যুবক-সমাজ এবং প্রগতিশীল দল তাঁকেই অগ্রভাগে রেখে যথাসাধ্য সমাজের উন্নতি করছে কালচারেল এসোসিয়েশনের ভেতর দিয়ে।

ক্রমশ

সাহিত্য-সংবাদ

বহুকালাবধি বেদাধ্যয়নাদির সংস্কৃত ভাষার যথাযথ উচ্চারণ বাঙলাদেশে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে—এই বিকৃত উচ্চারণে, কলিকাতা সনাতন ধর্ম্ম সমিতির উদ্যোগে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রত্যেককে আবৃত্তি করিতে হইবে ঃ—

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—একাদশ অধ্যায় (সম্পূর্ণ)

(২) (ক) কালিদাসকৃত "রঘুবংশ" হইতে দ্বিতীয় সর্গের ৩৪নং শ্লোক "অলং মহীপাল!... ..." ইত্যাদি হইতে ৫৯নং "... .. পিণ্ড-মিবামিসস্য" পর্য্যন্ত।

(খ) "শকুন্তলা" নাটকে চতুর্থ অঙ্কের সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্য কর্ত্তৃক উক্ত শ্লোক চতুষ্টয়।

যাঁহারা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা "সনাতন ধর্ম্ম সমিতি কার্য্যালয়" ৩৬নং তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় সম্পাদকের নামে আবেদনপত্র পেশ করিবেন। আবেদনের শেষ তাং ২০শে জুলাই, ১৯৪০। প্রতিযোগিতার তারিখ ও স্থান পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। গুণানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে পুরস্কৃত করা হইবে। উক্ত তারিখের পর আর আবেদন গৃহীত হইবে না।

শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী,
সম্পাদক।

খেলাধূলা

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সকল ডিভিসনের সকল খেলা এখনও শেষ হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে শেষ হইবে। তবে কোন্ ডিভিসনে কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে, তাহা এখনও সঠিক করিয়া বলা যায় না। প্রায় সকল ডিভিসনেই দুইটি করিয়া দল চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা করিতেছে। প্রথম ডিভিসনে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্তমান আছে। উভয় দলেরই অবশিষ্ট প্রত্যেকটি খেলার উপর দলের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ অথবা বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ইস্টবেঙ্গল দলের বর্তমানে একটি ও মোহনবাগান দলের দুইটি খেলা অবশিষ্ট আছে। পূর্বে ইস্টবেঙ্গল দল যেরূপ খেলিতেছিল, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা চলিত যে, অবশিষ্ট খেলায় ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী হইবেই। কিন্তু সম্প্রতি এই দল ভবানীপুর ও পুলিশ দলের সহিত খেলিয়া যেরূপভাবে দুইটি পয়েণ্ট নষ্ট করিয়াছে, তাহাতে অবশিষ্ট খেলায় কাষ্টমস দলের নিকটও পয়েণ্ট হারাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এই দলের আক্রমণভাগ ও রক্ষণভাগের সকল খেলোয়াড়ের মধ্যেই দৃঢ়তার অভাব বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। ফাঁকা গোলে গোল করিতে না পারা আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির ন্যায় দেখা দিয়াছে। রক্ষণভাগে ব্যাক অথবা গোলরক্ষক কেহই আশানুরূপ খেলিতে পারিতেছেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ এইজন্যই তীব্র আক্রমণ করিলেই গোল করিতে সক্ষম হইতেছে। ইস্টবেঙ্গল দলের অতিবড় সমর্থকগণ পর্যন্ত এইজন্য চ্যাম্পিয়ানসিপের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই ইহা বলা চলে না। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান দল অপেক্ষা একটি খেলা বেশী খেলিয়া এক পয়েণ্ট অধিক লাভ করায় লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছে। মোহনবাগান দলের অবশিষ্ট দুইটি খেলার মধ্যে একটি মহমেডান দলের সহিত, অপরটি এরিয়ান্স ক্লাবের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। মহমেডান দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া মোহনবাগান দল যে বিজয়ী হইবেই, ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। মহমেডান দলের খেলা পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। সুতরাং প্রথম খেলার ন্যায় মোহনবাগান দলের মহমেডান দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিবার আশংকা আছে। তাহা ছাড়া এরিয়ান্স ক্লাব প্রথম খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় খেলায় সেইরূপ নৈরাশ্যজনক খেলার পুনরাবৃত্তি করিবে, ইহা ধারণা করা অন্যায় হইবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চ্যাম্পিয়ান হইবার অথবা না হইবার যেরূপ সম্ভাবনা আছে, মোহনবাগান দলেরও সেইরূপ আছে। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থকগণ কেন যে এখন হইতেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা বুঝা গেল না। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় হইতেছে যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দলের বিশিষ্ট কয়েকজন খেলোয়াড় সম্বন্ধে নানারূপ অপবাদ প্রচার করিতেছেন। যে প্রকৃত প্রতারক হয়, সে প্রতিযোগিতার সকল সময়েই দলের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করে। প্রতিযোগিতার অধিকাংশ খেলায় প্রাণপাত করিয়া খেলিল, কেবলমাত্র শেষ কয়েকটি খেলায় সুবিধা করিতে পারিল না—এইরূপ খেলোয়াড়কে প্রতারক বলা চলে না। এইরূপ অপবাদ দেওয়া অর্থে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। ভবিষ্যতে এইরূপ সকল উক্তি শুনিতে না হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল উভয় দলেরই এখনও পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা আছে। এই দুইটি দলের সাফল্য বা অসাফল্য দেখিতে হইলে শেষ খেলাটি পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হইবে। ইহার পূর্বে ফলাফল জানিবার চেষ্টা করিলে কেবল চিত্ত-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করা হইবে।

লীগ তালিকার প্রথম চারিটি দল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	২৩	১৬	৫	২	৫১	১৪	৩৭
মোহনবাগান	২২	১৫	৬	১	৩৪	৬	৩৬
ভবানীপুর	২২	১২	৬	৪	৩৮	১৬	৩০
মহঃ স্পোর্টিং	২২	১০	৬	৬	৩০	১৫	২৬

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের প্রাচীনতম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা ১৫ই জুলাই হইতে কলিকাতায় আরম্ভ হইবে। এই বৎসর মোট ৫৫টি দল ইহাতে যোগদান করিয়াছে। গত দুই বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে অধিক সংখ্যক দল যোগদান করিয়াছে। গত বৎসর মাত্র ৩৮টি দল যোগদান করিয়াছিল। কয়েকটি সৈনিকদল প্রতিযোগিতার নাম দিয়াছে। তবে এই সকল দলের খেলা কিরূপ হইবে বলা কঠিন। ইংলণ্ডের কয়েকজন পেশাদার খেলোয়াড় এই সকল দলে খেলিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। বি আই ব্যাটালিয়ান সম্বন্ধে অনেকেই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছেন। এই দলটি নাকি খুবই শক্তিশালী। পাওয়ার লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। এই লীগ প্রতিযোগিতায় উক্ত দল মোট ২১টি খেলায় ১০৩টি গোল করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিপক্ষে মাত্র চারিটি গোল হইয়াছে। কলিকাতার লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোন দলই এত অধিক গোল করিতে পারে নাই। ইস্টবেঙ্গল দলের সহিত শীল্ড প্রতিযোগিতায় এই দলকে তৃতীয় রাউণ্ডে খেলিতে হইবে। তখনই এই দলের শক্তি পরীক্ষা হইবে। খেলার তালিকা যেরূপভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান—এই দুইটি দলের ফাইন্যালের পূর্বে মিলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন জেলা হইতেও অনেকগুলি দল যোগদান করিয়াছে। বাঙলার বাহিরের দল হিসাবে তরুণ সমিতি (মধুপুর), দালমা ড্রাগন (জামসেদপুর), ওসমানিয়া ক্লাব (পেশোয়ার), মহীশূর ব্লুজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এই সকল দলের কাহারও শক্তি সম্বন্ধে আমাদের জানা নাই। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে এই সকল দল সম্পর্কে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা যে দর্শনযোগ্য হইবে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৫ই জুলাই

রুশিয়ার **১৮০ মাইলব্যাপী মধ্য রণাঙ্গনে** তিন দিক হইতে জার্মান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। ২১০ দিন যাবৎ এই রণাঙ্গনে যে স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল, এই আক্রমণের ফলে তাহা ভঙ্গ হইল। শক্তিশালী জার্মান বাহিনী ট্যাঙ্ক ও বিমানের সহযোগিতায় ওরেল, কুরস্ক ও বিয়েলগোরোদ অঞ্চলে অভিযান শুরু করে—অদ্য রাত্রের সোভিয়েটের এক বিশেষ ইস্তাহারে ইহা ঘোষিত হইয়াছে।

৬ই জুলাই

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে বাঙলা গবর্নমেণ্টের চলতি বাজেটের যে কয়টি ব্যয়-বরাদ্দ গৃহীত হইতে পারে নাই, অদ্য পরিষদের অধিবেশনে সেই ব্যয়-বরাদ্দগুলি উত্থাপিত ও আলোচিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ হইতে এতৎসম্পর্কে এক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় এই দিন উক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী পরিষদে উপস্থাপিত হইতে পারে নাই।

এম এণ্ড এস এম রেলপথের বেজওয়াদা-গুন্টাকাল লাইনে এক ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে ১৮ জন যাত্রী নিহত ও ৪০ জন আহত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত এম এস আণে সিংহলে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭ই জুলাই

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলী বাঙলা গবর্নমেণ্টের বাজেট সম্পর্কে পূর্বদিনে উত্থাপিত বিরোধী দলের প্রশ্ন সমর্থন করিয়া তাঁহার রুলিং দেন। উহাতে তিনি বলেন যে, বিগত বাজেট অধিবেশনে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের যেসব ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই ও বর্তমান অধিবেশনে গবর্নমেণ্ট যাহা উত্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বিধি বহির্ভূত।

অদ্য ঢাকায় পাঁচ ব্যক্তি ছুরিকাহত হইয়াছে। শহরে হাঙ্গামায় এ পর্যন্ত মোট ৪ জন নিহত হইয়াছে। ঢাকায় পুনরায় ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

নিউ জর্জিয়া দ্বীপের দক্ষিণাংশ মার্কিন বাহিনীর করতলগত হইয়াছে।

চুংকিং-এর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্মানী হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সিঙ্গাপুরে উপস্থিতি হইতে এই ব্যাপারটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, জাপান ও জার্মানীর মধ্যে বড় বড় মালবাহী সাবমেরিনযোগে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং যন্ত্র-বিশেষজ্ঞের বিনিময় হইতেছে। প্রকাশ, পূর্বে এই বিনিময় মাদাগাস্কার মধ্য দিয়া হইত। কিন্তু বড় বড় জার্মান সাবমেরিন এখন সরাসরি সিঙ্গাপুরে যাইতেছে।

৮ই জুলাই

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, অভাবের দরুণ বাঙলায় অপরাধের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, রুশ রণাঙ্গনে তিন দিনের যুদ্ধে জার্মানদের ৩০,০০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে, ১৫৩৯টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ৬৪৯ খানি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। বিয়েলগোরদ অঞ্চলে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ফিল্ড মার্শাল গান্থার ফন্ ক্লুগ জার্মানীর নূতন অভিযান পরিচালন করিতেছেন।

মার্কিন বাহিনী নিউজর্জিয়ার জাপ অধিকৃত মুণ্ডা বিমান ঘাঁটির দুই স্থানে অবতরণ করিয়াছে। কুলা উপসাগরে নৌযুদ্ধে ৯ খানি জাপ ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ার জলমগ্ন হইয়াছে।

৯ই জুলাই

কলিকাতা হাইকোর্টে সিভিক গার্ড সংশ্লিষ্ট কোনও এক মামলার শুনানীকালে সিভিক গার্ডদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা হয়। শুনানী শেষে বিচারপতি এজলী ও বিচারপতি দাস রায় দিয়াছেন যে, সিভিক গার্ডগণ সাধারণ নাগরিকের অধিকার ও ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহে। কলিকাতার পুলিশ গেজেটে নোটীশ প্রচার না করিয়া কলিকাতার সিভিক গার্ডদিগকে পুলিশের কার্যে আহ্বান করা হইলে এবং তাহারা সরকারী কর্মচারীর ন্যায় কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে তাহা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া একটি বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

১০ই জুলাই

দিল্লীর জেলা ও দায়রা জজ তিনটি বালককে গুলী করিয়া হত্যা করার অপরাধে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর চারজন আসামীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

জেনারেল আইসেনহাওয়ারের পরিচালনাধীনে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সিসিলিতে অবতরণ শুরু করিয়াছে। অবতরণের আগে মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনী আক্রমণ চালায়। মিত্রপক্ষের নৌবাহিনী অভিযাত্রী সৈন্যদিগকে পাহারা দিয়া লইয়া যায় এবং অবতরণকালে সিসিলির উপকূলরক্ষীদের উপর কামান দাগে।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গত ২৪ ঘণ্টায় কুরস্কের দক্ষিণে যুদ্ধের গতি কিছুটা রুশদিগের প্রতিকূলেই গিয়াছে। বৃহস্পতিবার (৮ই জুলাই) বিরাট জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী কর্তৃক দুইটি স্থানে ব্যূহ ভেদ করিবার ফলে যুদ্ধের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। সুনিয়ন্ত্রিত রক্ষাব্যূহের ভিতর হইতে যুদ্ধ করিবার যে সুযোগ রুশদিগের ছিল, তাহারা তাহা সাময়িকভাবে হারাইয়াছে।

১১ই জুলাই

'রয়টারের' বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, সিসিলির উপর আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী তাঁহাদের প্রাথমিক ঘাঁটি হইতে দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রকাশ, তাহারা ইতিমধ্যে সাইরাকিউজের দক্ষিণস্থ উপকূলবর্তী রেলপথের উভয় পার্শ্ব ধরিয়া পার্বত্য অঞ্চলস্থ এক্সিসপক্ষীয় কামানগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সিসিলির সাতটি স্থানে অবতরণ করিয়াছে এবং আরাগোজা, ক্যানিকাট্টি ও লিকাতা মিত্রপক্ষের হস্তগত হইয়াছে।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কুরস্ক "স্ফীতি মুখের" বিরাট সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। গতকল্য জার্মানেরা বহু ট্যাঙ্ক, বিমান ও স্থলসৈন্য আমদানী করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং "স্ফীতি মুখের' উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে ব্যাপকভাবে নূতন আক্রমণ চালায়। ওরেলের দক্ষিণে এক এলাকায় জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর কয়েকটি দল সোভিয়েট সম্মুখ-ব্যূহ ভেদ করে। কিন্তু পরে উহারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। বিয়েলগোরদ হইতে ২৫ মাইল দূরে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

১২ই জুলাই

শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার বসু বন্দুক চুরি করার অভিযোগে ১৯৪২ সালের ২নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে লিপ্ত নড়াইলের এক স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস আইন অনুসারে তাঁহার পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করা হয়। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সুশীল বসুর দণ্ড নাকচ করিয়া তাঁহার মুক্তির আদেশ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া সাধারণ আদালতে মামলার পুনর্বিচারের নির্দেশ দিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়।

মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, গত ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া ওরেল-কুরস্ক রণাঙ্গনে দুই পক্ষের ট্যাঙ্ক বাহিনী মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

সিসিলিতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সিরাকিউজ, আভোলা, প্যাচিনো, লিকাতা, পোরাজালো, সাকোগালিটি, গেলাইসপিকা, বসোলিনি এবং নটো দখল করিয়াছে। সিসিলি অভিযানের একশত মাইল উপকূলবর্তী রণাঙ্গনের সমস্ত অংশই মিত্রপক্ষের দখলে আসিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ। শনিবার ২৫শে আষাঢ় ১৩৫০ সাল। Saturday 10th July 1943 ।৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

হক সাহেবের অভিযোগ—

মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে কত বড় একটা প্রহসন তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মৌলবী সাহেব যেরূপ তথ্যপূর্ণ প্রমাণ সহযোগে বাঙলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও পক্ষে সেগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে মৌলবী সাহেবের বিবৃতি নিঃসংশয়িতভাবেই প্রমাণিত করিয়াছে যে, বাঙলার গভর্নর নিজে স্বৈরতান্ত্রিকতাসহকারে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত বিধি-বিধানকে লঙ্ঘন করিয়াছেন। মৌলবী সাহেব বলিয়াছেন পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতিতে পরিচালিত কোন দেশে শাসন বিভাগের প্রধান কর্তা যদি এইরূপ কাজ করিতেন, তবে তাঁহাকে স্বপদ হইতে অপসারিত হইতে হইত। তিনি ভর্ৎসিত হইতেন; শুধু তাহাই নয়, তাঁহাকে দণ্ড পর্যন্ত পাইতে হইত। কিন্তু এ দেশ পরাধীন এ **দেশের কথা স্বতন্ত্র।** এ দেশের শাসন-বিভাগের প্রধান কর্তা এইরূপ সব কাজ করিয়াও ভারতসচিবের দ্বারা প্রশংসিতই হইয়া থাকেন। হক সাহেব বলিয়াছেন, স্যার জন হারবার্টকে এদেশে না রাখিয়া অন্যত্র অপসারিত করা উচিত। ভারতের একটি প্রধান প্রদেশে শাসনকর্তার পদ অধিকার করিয়া থাকিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। স্যার জন হারবার্টকে বাঙলা হইতে অন্যত্র সরাইলেই যে বাঙলার অবস্থার প্রতিকার হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই, তবে বর্তমান শাসনতন্ত্রের মর্যাদায় যাঁহারা বিশ্বাসী, ঐ ব্যবস্থার দ্বারা অন্ততঃ তাঁহাদের মনে শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত মর্যাদাবুদ্ধি হয়ত কিছুটা বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান শাসনতন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী নহি; আমাদের মতে সত্যকার প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য লাভ না করা পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক এই প্রহসনের অবসান হইবে না। সিন্ধু, আসাম, উড়িষ্যা সীমান্ত প্রদেশ সর্বত্র এই সত্যই প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙলায় সাম্রাজ্য-স্বার্থের প্রয়োজনে সেই সত্য সর্বাধিক নগ্ন এবং নির্লজ্জ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র।

খাদ্যাভাবের সমস্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে বাঙলা দেশের খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে কয়েকদিন বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্বেও একথা বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও আমাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় যে, এদেশের শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ দেশের লোকের দিক হইতে এই সমস্যার গুরুত্ব ততটা উপলব্ধি করিতেছেন না। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের চাবি-কাঠি রহিয়াছে ইণ্ডিয়া অফিসে এবং তথা হইতে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা এদেশের শাসন-নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং ভারত-শাসনের খোদ কর্তা বলা যায় ভারতসচিবকে। এই সমস্যাটি ভারত-সচিবের দৃষ্টিতে কতটা তুচ্ছ, সম্প্রতি তাঁহার একটি উক্তি হইতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বসন্তকালে প্রচুর গম উৎপন্ন হওয়াতে ভারতে মোটা-মুটি খাদ্যশস্যের অভাব নাই। অভাব নাই, অথচ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে 'হা অন্ন' রব উঠিয়াছে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব এই জবাব দিয়াছেন যে, খাদ্যবস্তু

বণ্টনের . ব্যবস্থাই এজন্য প্রধানত দায়ী। কিন্তু এই বণ্টন ব্যবস্থার জন্য দায়ী কে? ভারতসচিবের মতে নীচের কৃষক হইতে উপরের সকল পক্ষই এজন্য দায়ী; সুতরাং দায়িত্বের বোঝার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কেহই নহে, ভারতসচিবের উক্তির তাৎপর্য ইহাই ধরিয়া লইতে হয়। ভারতসচিব এই-ভাবে এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভারত গভর্নমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সকলের নীতির ভিতর ভারতসচিবের এই মনোবৃত্তিই প্রভাবিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশের মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলার খাদ্য-সমস্যার দায়িত্ব কৃষক এবং মজুত-দারদের উপর চাপাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের মজুত-বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বাঙলার গ্রাম অঞ্চলে ঢুঁড়িয়া বাঙলা দেশে খাদ্য-শস্যের অভাব নাই, তাঁহাদের বহু প্রচারিত এই তথ্যকে তাঁহারা সত্য প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। কারণ, প্রকৃত সত্য এই যে, মজুত শস্য কোথাও বিশেষ কিছু ছিল না, কিছু খাদ্যশস্য অবশ্য বড় বড় পুঁজিপতির গুদামজাত হইয়াছে এবং সেই সব পুঁজিপতিদের মূল ঘাঁটি হইল কলিকাতা ও হাওড়াতে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী বাঙলার বর্তমান এই খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। মজুতবিরোধী আন্দোলনের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে পাকা হিসাব-পত্র তৈয়ারীর মাহাত্ম্যের কীর্তনাংশই স্পষ্ট। মিঃ সুরাবর্দীর কথায় খাদ্য-সম্পর্কিত সেই সব তথ্য সংগ্রহের ফলে ভবিষ্যতে কাজ ভাল হইবে, ইহার একটা প্রতিশ্রুতি মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানের সমস্যা মিটাইবার কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা মিঃ সুরাবর্দী দিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার সব কথাই 'যদি'র আড়ালে ভবিষ্যতের কুহেলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যদি বাহির হইতে খাদ্য শস্য আসে, তবে বাঙলার লোক খাইতে পাইবে, যদি সরবরাহের পাকা ব্যবস্থা করা যায়, তবে শহরে রেসনিংয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে; কিন্তু এই সব 'যদি'র গণ্ডী কাটাইয়া কাজ হইবে কবে? মিঃ সুরাবর্দী সে সম্বন্ধে নিরুত্তর। তাঁহার এই সব ফাঁকা কথায় নিরন্ন দেশের লোকের অন্নের সংস্থান হইবার আপাততঃ কোন আশাই দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গোড়াতে গলদ থাকিয়া যাইতেছে। সাময়িক এতৎসম্বন্ধীয় যত বিধিবিধান, সব এলাইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে যেরূপ দৃঢ়তর, দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন, তাহার পরিচয় আমেরী সাহেবের উক্তির মধ্যে নাই। ভারত গভর্নমেণ্টের অবলম্বিত নীতির মধ্যেও তাহা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু আমাদের পক্ষে এ সমস্যা জীবনমরণেরই সমস্যা; সুতরাং যে মন্ত্রি-মণ্ডল এই সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ না হইবেন, দেশের লোকের সমর্থন তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন না। বাঙলার বর্তমান সমস্যা রাজনীতিক নহে, তাহা নিছক আর্থিক অর্থাৎ সাধারণের অন্ন-বস্ত্রের। স্যার নাজি-মুদ্দিনের মন্ত্রিমণ্ডল এ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই; অধিকন্তু তাঁহাদের আমলে এই সমস্যা পূর্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা হক-মন্ত্রি-মণ্ডলের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আরোপ করিয়াছিলেন, এখন সেই সব অভিযোগ তাঁহাদের নিজেদের উপরই সমধিক গুরুত্বের সহিত আরোপিত হইতেছে। কথার প্যাঁচে এতৎসম্বন্ধীয় দায়িত্ব তাঁহারা এড়াইতে পারিবেন না; কারণ, কথার চালবাজিতে দেশের লোককে সামান্য কিছু-দিনই ভুলাইয়া রাখা যায়, দীর্ঘদিন তাহা সম্ভব হয় না।

ভারত ও পাশ্চাত্য জাতি

মিস পার্ল বাককে এদেশের অনেকেই জানেন। এই বিদুষী মার্কিন মহিলার সব লেখাতেই মানবতার প্রগাঢ় স্পর্শ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহার একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ভারতবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া মিস পার্ল বাক যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—"আমরা ইউরোপীয় এবং মার্কিন জাতি, আপনাদের আধ্যাত্মিকতাকে ততটা বুঝিতে পারি না। মহাত্মা গান্ধী জগতের মধ্যে একজন মহামানব সন্দেহ নাই, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক হইতে তাঁহার গুরুত্বও আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। আমরা সোজাসুজি বুঝি, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে। আপনারা ভারত-বাসীরা, আপনারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন যে, আপনারা আমাদের চেয়ে হীন নহেন এবং যেভাবে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, আমাদিগকে সেইভাবে উহা উপলব্ধি করাইতে হইবে।" সে উপায় কি? মিস পার্ল বাক তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যেভাবেই হউক, হিন্দু-মুসলমানদের প্রশ্ন আপনাদের সমাধান করিতে হইবে এবং আপনাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। আপনাদের স্বাধীনতা লাভের উপর জগতের শান্তি নির্ভর করিতেছে। কারণ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইবে। মিস পার্ল বাকের এই উদ্দীপনাময় আবেদন আমাদের জড়তা দূর করিয়া আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব লাভের বেদনা যদি উগ্র করিয়া তোলে এবং আধ্যাত্মিকতার নামে আমরা যে অবসাদ এবং নির্জীবতার দৈন্য বহন করিতেছি, যদি তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে সমর্থ হই, তবেই সে আবেদন সম্যক সার্থকতা লাভ করিবে।

রুশিয়ায় সংস্কৃত চর্চা

রুশিয়ার কতিপয় সংস্কৃত ভাষাবিদ পণ্ডিত মিলিয়া মহাভারতকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, এই সংবাদে আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহাভারতকে ভারতীয় সভ্যতার হিমাচল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের জ্ঞান ব্যতীত ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিশালতা উপলব্ধি করা যায় না। অধ্যাপক কেলিয়ানফ রুশ দেশের সংস্কৃত ভাষাবিদদের মধ্যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। সম্প্রতি এই সম্পর্কে তিনি বলিয়া-ছেন যে, রুশ দেশের মনীষিসমাজে ভার-তের এই মহাকাব্যের বিশেষ সমাদর আছে; সর্বসাধারণের মধ্যে মহাভারত-সম্পর্কিত জ্ঞান প্রসার লাভ করিলে, সেই পথে ভারতবর্ষের প্রতি রুশিয়ার সৌহার্দের সূত্র দৃঢ়তর হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে; কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমাদের মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা রাখা উচিত নয়। মহাভারত ইতি-পূর্বে ইউরোপের আরও অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহার ফলে বর্তমান পরিপ্রেক্ষার ভিতর জাতি-হিসাবে আমাদের মর্যাদা যে ইউরোপের কাছে বাড়িয়াছে, ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু অতীতের গর্ব কোন জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, মহাভারতের আদর্শের অন্তর্নিহিত বলবীর্যের সাধনা যুগোচিতভাবে আমাদের মনুষ্যত্বকে যদি উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবেই মহাভারতীয় সংস্কৃতির সত্যকার উত্তরাধিকারিত্বের মর্যাদা আমরা মানবসমাজে লাভ করিতে সমর্থ হইব।

বস্ত্র-সমস্যা ও গবর্নমেণ্ট

ভারত গবর্নমেণ্ট সম্প্রতি বস্ত্র ও সুতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বোম্বাইয়ে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের একটি সভায় অধিবেশন হয়। সভাপতি শ্রীযুত মোরারজী তাঁহার বক্তৃতায় বস্ত্র-মূল্য বৃদ্ধির জন্য গবর্নমেণ্টকেই দায়ী করেন। গবর্নমেণ্টের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব না আছে, আমরা এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু বস্ত্র-ব্যবসায়ীরাও যে সে দায়িত্ব হইতে একেবারে মুক্ত এমন কথা বলা যায় না। তাঁহারা সকলে নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া না দেখিয়া দেশের স্বার্থকেই প্রধান বলিয়া বুঝিয়াছেন, এমন স্তাবকতা করিবার মত তথ্য আমাদের জানা নাই। সে যাহা হউক, সভাপতি এক্ষেত্রে আমাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, দেশের লোকেরা যাহাতে সস্তা দরে কাপড় পায়, সেজন্য তাঁহারা গবর্নমেণ্টের সংগে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি, বস্ত্র সম্পর্কে গবর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ফলে বস্ত্রের মূল্য ইতিমধ্যেই কিছু হ্রাস পাইয়াছে। যদিও খুচরা হিসাবে সেই মূল্য হ্রাস খুবই সামান্য, তবু আমাদের আশা আছে যে, যদি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয়, তবে কিছুদিনের মধ্যেই কাপড়ের দাম উল্লেখযোগ্য রকমে কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু বাহিরে রপ্তানির সুবিধা জন্মাইবার জন্য এই নীতি যাহাতে প্রযুক্ত না হয়, তৎপ্রতি সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেশের লোকের সমস্যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, সরকার যদি এ বিষয়ে সচেতন না থাকেন, তবে আমাদের সাময়িক মূল্য হ্রাসজনিত এই আশ্বাস আশংকাতেই পরিণত হইবে। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদিগকে আজ বাধ্য হইয়া ইহাই বলিতে হইতেছে।

সিরাজের স্মৃতি

গত ৩রা জুলাই মৌলবী ফজলুল হকের সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন হলে বাঙলার শেষ-নবাব সিরাজোদ্দৌলার স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, নূতন হাওড়ার পুলটিকে 'সিরাজোদ্দৌলা-সেতু' নামে অভিহিত করা হউক এবং নবাবের সমাধির সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করা হউক আর নবাবের প্রাসাদটিকে একটি মেমোরিয়াল হল করা হউক। জাতীয়তাবাদী বাঙলা নবাব সিরাজোদ্দৌলার বিয়োগান্ত জীবন বহুদিন হইতে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত হয় নাই। আমরা আশা করি, কলিকাতার সভায় গৃহীত এই প্রস্তাব অবিলম্বে যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং সিরাজের স্মৃতিকে ভিত্তি করিয়া বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়া উঠিবে; এবং এই শক্তির জোরেই বাঙালী স্বাধীনতার মর্যাদা পুনরায় লাভ করিতে পারিবে। বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানকে আজ সমভাবে এই সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িকতামূলক পাকিস্থানী নীতির পথ, বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে মৈত্রীর পথ দৃঢ় করিবার উপায় নয়। পাকিস্থানী নীতির অন্তর্নিহিত যে মনোবৃত্তি, সে মনোবৃত্তি পরানুগ্রহের দ্বারাই প্রশ্রয়প্রাপ্ত; সিরাজের স্মৃতিপূজা যদি সত্যই আমরা করিতে চাই, তবে ঐ নীতির অন্তর্নিহিত দাস মনোবৃত্তিকে একেবারে উৎখাত করিতে হইবে।

ভারতের ভবিষ্যৎ

ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল সম্প্রতি লণ্ডনস্থ বিশিষ্ট ভারতবাসী মুসলমানদের সংগে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংবাদে ইহাও প্রকাশ যে, এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে স্যার হাসান সুরাবর্দী এবং মিঃ ইউসুফ আলী ছিলেন। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে এই সব বিশিষ্ট মুসলমানগণ এমন গরজের সহিত নবনিযুক্ত বড়লাটের সঙ্গে কি জন্য দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের আলোচনা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদের স্বতই সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ, স্যার হাসান সুরাবর্দী কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা আমাদের জানা আছে। তিনি জিন্না সাহেবের একজন জবরদস্ত চেলা। কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে একটি বক্তৃতায় তিনি মোস্লেম লীগের ভারত-ব্যবচ্ছেদ নীতিকে জোরের সংগে সমর্থন করেন। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন সম্পর্কে ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলের ব্যক্তিগত ধারণা কি, আমরা জানি না; তবে একথা সত্য যে, জিন্না সাহেব আজ যে নীতির দাবী করিতেছেন, তাহার পশ্চাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সুস্পষ্ট সমর্থন রহিয়াছে। জিন্না সাহেব এবং তাঁহার অনুগত দল যেদিন এই সত্য নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিবেন যে, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকট হইতে তাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবেন না, সেদিন ভারতের শাসনতান্ত্রিক যত সমস্যা, অন্ততঃ ভারতবাসীদের দিক হইতে তাহার সমাধান হইয়া যাইবে। ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই প্রভাবের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার শাসন-সম্পর্কিত নীতি পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবেন কি না, আমরা জানি না, তবে ইহা সত্য যে, যদি এ সম্বন্ধে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদসুলভ সংস্কার মুক্ত হইয়া স্বাধীনচিত্ততা দেখাইতে না পারেন এবং সাহসের সংগে অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তার আদর্শ সংস্থাপিত করিতে সমর্থ না হন, তবে ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁহার সম্বন্ধে যত লোকে যত বড় বড় কথা বলিতেছেন, সবই ব্যর্থ হইবে। ভারতবাসীরা আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চায় এবং এ বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শে সংহতিসূত্র দৃঢ় না হইলে সে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নহে।

ভারতে জনশিক্ষা

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেনসেন এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যত শিশু আছে, সকলে শিক্ষালাভ করিবে, এমন ব্যবস্থা করা হউক এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের নিরক্ষরতার সংখ্যা যাহাতে বিশেষরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক। ভারতসচিব মিঃ আমেরী কৌশলের সংগে এই সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণের ঝুঁকি এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি মামুলী যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, সেজন্য ভারত গভর্নমেণ্টের বিশেষ রকমেই দৃষ্টি রহিয়াছে এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ এ বিষয়ে যতটা সম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। আশ্বাস খুবই ভাল; কিন্তু কতটা সম্ভব, ইহাই হইতেছে প্রকৃত প্রশ্ন। অন্য দেশের পক্ষে যাহা সম্ভব হয়, ভারতের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না কেন? এ সম্পর্কে সম্ভবের মাত্রা ভারতবর্ষে যে নিরিখে মাপা হয়, তাহাতে ভারতের নিরক্ষরতা দূর করা অসম্ভব, এই কথাটা বলিয়া দেওয়াই ভারতসচিবের পক্ষে বরং ভাল ছিল। তবে সোজাসুজি বুঝা যাইত যে, ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীনতা লাভ না করিবে, ততদিন বিপুল নিরক্ষরতার বোঝা ভারতকে বহন করিয়া চলিতে হইবে এবং সেই নিরক্ষরতার বোঝায় ক্লিষ্ট ভারতকে পিষ্ট করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ শোষণের ব্যবস্থা বজায় রাখিবার সুবিধাও থাকিবে।

বাঁকা স্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

২

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছে। এমন সময় একদিন ভুতো আসিয়া বলিল, চল্ আলো আজ মাঠের পুকুরে নাইতে যাই।

পুকুরটি আমাদের বাড়ি হইতে যেমন দূরে, কমলের বাড়ি হইতে তেমনি নিকটে। তখন গরমকাল। 'সকাল-স্কুল' আরম্ভ হইয়াছে। দূরে গিয়া স্নান করিবার মধ্যে কেমন একটা রোমাঞ্চকর আনন্দানুভূতি ছিল। উপরন্তু এই পুকুরটির জল ছিল কাকচক্ষুর মত এবং চারিপাশে নারিকেল, সুপারি ও অন্যান্য ছোট বড় গাছ থাকিবার দরুণ সর্বদা শীতল ও ছায়াচ্ছন্ন থাকিত। সেই জন্য অনেক দূর-দূরান্তর হইতে লোক ইহাতে স্নান করিতে আসিত।

আমরা দুইজনে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কমল ও মধু স্নান করিতেছে ও-পারের স্নানের ঘাটে। কমল মধুর পিঠে সাবান মাখাইতেছে, আর মধু কমলের পিঠে।

আমাদের দেখিয়া তাহারা দুইজনেই উল্লসিত হইয়া ডাকিল, এই তোরা এই ঘাটে আয়—সকলে মিলে সাঁতার কাটবো।

আমরা ও-পারে গিয়া জলে নামিলাম। তখনো তাহারা উভয়ে উভয়ের পিঠে সাবান মাখাইতেছিল। আমার একবার ইচ্ছা হইল কমলকে বলি, আমার পিঠে মধুর মত সাবান ঘসিয়া দিতে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা উচ্চারণ করিতে পারিলাম না, কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল।

এমন সময় খানিকটা সাবানের ফেনা লইয়া মধু চট্ করিয়া কমলের চোখে লাগাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ডুব দিয়া সে মধুর পা দুইটা জলের ভিতর টানিয়া ধরিল। তারপর চলিল ঝটাপটি। মধু তাহার কালো ও বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে কমলকে চাপিয়া ধরিয়া বার বার জলে ডুব দিতেছিল।

ভুতো তাহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কমলকে উদ্ধার করিল। মধু এক ডুব-সাঁতারে একেবারে মাঝখানে পলাইয়া গেল।

আমি তখন কমলকে বলিলাম, ওঃ তোর চোখ দুটো কিরকম লাল হয়ে উঠেছে—মধুটা ইয়ারকি পর্যন্ত দিতে জানে না।

কমল মধুর হাসিয়া বলিল, বেশীক্ষণ জলে থাকলে তোরও এই রকম হবে। তারপর বাড়ি যেতে যেতে সব ঠিক হয়ে যাবে। রোজ আমাদের এই রকম হয়।

ইহা শুনিয়া শুধু একটি কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, রোজ কি মধু স্নান করতে আসে এত দূর থেকে?

কমল বলিল হাঁ, তা নাহলে আমিই-বা এখানে আসবো কেন? আমার বাড়ির সামনে ত পুকুর রয়েছে।

এমন সময় মধু সেখানে আসিয়া তাহার সাবানটা আমার সামনে ধরিয়া বলিল, এই আলো মাখ না সাবান?

কেন জানি না, সে-সাবান আমার স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, থাক, সাবান মাখলে আবার সাহেবরা আমায় ভুল করে ধরে না নিয়ে যায় নিজেদের লোক মনে করে।

মধু বলিল, ওঃ, না হয় ভগবান তোর গায়ের চামড়াটা একটু কটা করেছে, তাই বলে এত অহংকার ভালো নয়। এই বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘাটে যাহারা ছিল সকলেই এই হাসিতে যোগ দিল, শুধু কমলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখে হাসি নাই।

মনে হইল, তবে কি সত্যসত্যই কমল মধুকে এইরূপ ভালবাসে যে সামান্য ঠাট্টা-টুকু পর্যন্ত সহ্য করিতে পারিল না।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত এই চিন্তাই আমার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। একবার মনে হইল, আচ্ছা, কমল মধুর মধ্যে কি দেখিয়াছে? শুধু ফার্স্ট হইয়াছে বলিয়াই কি তাহার সংগে এত—

আর ভাবিতে পারিলাম না। এবার যেমন করিয়া হউক ফার্স্ট হইতেই হইবে, মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করিলাম।

সংকল্প জয়যুক্ত হইল। প্রথম শ্রেণীর অর্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হইলাম। ভুতো আমাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিল। হেড মাস্টার মহাশয়ও গদ গদ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কমল? তাহার উৎসাহ ইহাতে বাড়িল কি কমিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমার বুকের ভিতরে একটা স্থান কেবলি খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

কমলের এই ঔদাসীন্য আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। আমি আবার তাহার সংগে মিশিতে শুরু করিলাম। স্কুলে তাহার পাশে বসিতাম, পূর্বের মত লাইব্রেরী হইতে ভাল ভাল বই লইয়া তাহাকে পড়িতে দিতাম; আবার তাহার সংগে বেড়াইতে যাইতাম।

এই সকল ব্যাপারেই মধু কমলের সংগে থাকিত। আমার সংগেও মধুর কোন অসম্ভাব ছিল না। কমলেরই মত আমিও তাহার সংগে মিশিতাম, গল্প করিতাম, বেড়াইতে যাইতাম। সবই হইত, তবে কমলের মনে মধুর প্রতি স্নেহ ঠিক কতটুকু, তাহা জানিবার জন্য সর্বদা আমার মন উৎসুক হইয়া থাকিত। কেন তাহা আজো বুঝিতে পারি না।

প্রতিদিন হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি হইতে তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করিয়া আমি একেবারে খেলিবার মাঠে গিয়া কমল ও মধুর সংগে মিলিত হইতাম। তারপর যেটুকু সময় থাকিত, তিনজনে একত্রে বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। তিনজনে একসংগে চলিতে চলিতে কত গল্প হইত।

যদি কোন দিন মধু না আসিত বা মামার বাড়ি যাইত, তখন আমার আনন্দ হইত খুব। কমলকে লইয়া একাকী বহুদূরে চলিয়া যাইতাম—ফিরিবার কথা আর মনে আসিত না। এই সময় কত কথা তাহাকে বলিবার ইচ্ছা হইত কিন্তু কমলের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া সকল উৎসাহ নিভিয়া যাইত। মনে বড় রাগ হইত, কমল কি কিছুই বোঝে না!

হয়তো এইরকম কোন দিনে চৌধুরীদের দিঘীর ধারে দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া আছি—পশ্চিম আকাশ হইতে একটুকরো রঙ চুপি চুপি আসিয়া কমলের সুন্দর গালে, চোখে, মুখে লাগিয়াছে, বনফুলের সুন্দর গন্ধের সংগে কদাচিৎ দু'একটা পাখীর কণ্ঠস্বরও ভাসিয়া আসিতেছে। এমন সময় হঠাৎ হয়ত সে বলিয়া উঠিত, জানিস্ আলোক, মধু এখন মামার বাড়ি কি করছে? খুব ডাব খাচ্ছে—ওর এক মামাত' ভাই আছে, তার নাম ঘেঁটু' না কি—ওঃ, কি ওস্তাদ সে ডাব চুরি করতে। একটা লম্বা দড়ি সংগে করে সে গাছে উঠে পড়ে, তারপর এমন কায়দা করে ডাবের কাঁদি নামিয়ে দেয় যে, কেউ জানতেও পারে না! আর জানিস্, মধুরা এক-একজন আটটা-দশটা করে ডাব খায়।

বলিতে বলিতে উৎসাহে তাহার চোখমুখ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। মনে হয় যেন সে নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

আবার কোনদিন হয়ত তাহার একটি

হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া দামোদরের বাঁধের উপর বেড়াইতেছি। অদূরে ক্ষীণ জলরেখা, একপাল গরু পায়ে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেল, ও-পারে ধূ ধূ করিতেছে বালির চর মরুভূমির মত তাহার শেষ প্রান্তে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষের মাথা একটা সবুজ প্রাচীরের মত দেখাইতেছে, সেই দিকে চাহিয়া আছি—এমন সময় কমল বলিয়া উঠিল, জানিস্ আলোক, এইখানে মধুর বাবা একটা সাপ মেরেছিল তাঁর লাঠি দিয়ে। ওঃ পাঁচ হাত লম্বা একটা গখরো সাপ। যদি বেড়াবার লাঠিটা তাঁর হাতে না থাকতো তাহলে কি হতো বল দেখিনি? মধুর বাবার খুব সাহস, না? আমার ভাই সাপ দেখলে গায়ের ভেতর কেমন শি শি করে—তোর ভয় করে না? মধুর কি সাহস জানিস্, হেলে সাপ-গুলোর লেজ ধরে হাতে করে ঘোরায়।

মধু অনুপস্থিত থাকিলে কমলের মুখে তাহারি গল্প শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝালাপালা হইয়া যাইত। আমি চুপ করিয়া সব শুনিয়া যাইতাম। কোন কথা বলিতাম না। এক-একদিন মনে হইত হয়ত তাহার মনে আমার কোন স্থানই নাই। আমিই শুধু তাহার কথা চিন্তা করিয়া মরি। কিন্তু একথা মনে করিতে বুক যেন ভাঙিয়া যাইত। তাই সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতাম হয়ত আমার অনুপস্থিতিতে কমল মধুর কাছে আমার সম্বন্ধে এইভাবে গল্প করে—কে জানে? মনটা আমার সতেজ হইয়া উঠিত। আবার কমলকে ভাল লাগিত।

এমনিভাবে সন্দেহের দোলায় দুলিতে দুলিতে আমার মন এক-একদিন অত্যন্ত দমিয়া যাইত। তখনি নিজের কাছে নিজে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিতাম, আর কোনদিন কমলের সঙ্গে বেড়াইব না; ইহার চেয়ে সেই সময়টা লেখাপড়ার চর্চা করিলে ঢের বেশী উপকার হইবে। এই মনে করিয়া পরের দিন কোচিং পড়ায় বেশী সময় অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু যত বিকাল বাড়িতে থাকে এবং বেড়াইতে যাইবার সময় নিকটে আসে, ততই যেন আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে—কিসের অমোঘ আকর্ষণে আমার মন ছুটিতে থাকে সেইখানে, যে-স্থানটি কমলের কথায়, কমলের হাসিতে, কমলের গায়ের গন্ধে মদির ও বিহ্বল। কমল কিশোর, কমল সুন্দর; সে যেন ধরণীর বুকে প্রথম অরুণোদয়, বিকশোন্মুখ পুষ্পের প্রথম সৌরভ। তাহার রূপ বর্ণনা করা যায় না—সে যেন ধরার মাঝে অ-ধরা, রূপের মধ্যে অ-রূপ!

আমি এইভাবে যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতাম, কমল আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিত, এত দেরি করলি কেন? আমরা তোর জন্যে কখন থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। মধু ত চলে যেতে চাইছিল, বলে তুই আজ আসবি না, কিন্তু আমি তাকে বললুম, নিশ্চয় আলোক আসবে দেখে নিস।

আমার সম্বন্ধে কমলের এই আগ্রহ দেখিয়া আমার সর্বাঙ্গ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। তবুও কথাটা কতদূর সত্য, যাচাই করিবার জন্য বলিতাম, মাইরি?

কমল বলিত জিগ্যেস কর না মধুকে?

মধু সে-কথা সমর্থন করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা কঠিন শপথ করিয়া বসিত। এই ধরণের কথা শুনিলে আমার অবস্থা যে কিরূপ হইত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। তবে যতদূর মনে পড়ে, আমার তখন কোন একটা বীরত্বপূর্ণ কাজ করিবার দারুণ ইচ্ছা হইত। কিন্তু হাতের কাছে যথোপযুক্ত কিছু না পাইয়া শেষে এক হাত মধুর কাঁধে ও অপর হাত কমলের কাঁধে রাখিয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতাম। চলিতে চলিতে অনেক বড় বড় প্ল্যান আমার মাথায় আসিত। আমরা তিনজনে মিলিত হইয়া করিতে পারি এই-রূপ কত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা তখন আমার মনে ভীড় করিয়া আসিত। সেগুলি কমল ও মধুকে তৎক্ষণাৎ না বলিয়া আমি সুস্থ হইতে পারিতাম না। কিন্তু তাহারা শুনিয়া হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিত। বলিত, দূর পাগলা, তোর যেমন মাথা খারাপ!

তথাপি আমার উৎসাহ কমিত না। প্রতিদিন তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিতাম। এইভাবে আবার কমল ও মধুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। প্রত্যহ আমি হেডমাষ্টার মশায়ের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া খেলার মাঠে কমল ও মধুর সঙ্গে মিলিত হইতাম। মধু খেলা করিত আর কমল তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত। খেলাধুলায় মধু ছিল যেমন ওস্তাদ তেমনি ভীরু ছিল কমল। তাই সে নিজে না খেলিয়া অন্যের খেলা দেখিতে ভাল-বাসিত।

আমার কাছে কিন্তু ইহা একদিন সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ লইয়া আসিল। ভাবিলাম কমল শুধু মধুকে খেলায় উৎসাহ দিবার জন্য মাঠে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাই মধুর সৌভাগ্য দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ঈর্ষিত হইলাম। খেলাধুলা জানি না বলিয়া যেন রীতিমত অনুশোচনা হইতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল আমার কি কোন যোগ্যতা নাই? ছেলেবেলা হইতে বহুদিন সাহিত্যচর্চার ফলে কিছু কিছু লিখিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প লিখিয়া স্কুলের এক হাতেলেখা মাসিকপত্রে দিতাম। সহসা মনে হইল যদি একটা এই রকম হস্তলেখা কাগজ আমরা বাহির করি, তাহা হইলে হয়ত কমলকে আমি আরো নিকটে পাইতে পারি। কমল তখন সবে দুই একটা কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছে সে কাহাকেও না দেখাইয়া গোপনে রাখিত। একদিন খাতার ভিতর ইহার একটি আমার চোখে পড়িয়া যাওয়াতে কমল ভীষণ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাই আমার এ প্রস্তাব শুনিয়া কমল প্রথমটা মুখে একটু আপত্তি জানাইলেও শেষে ভীষণ উৎসাহী হইয়া উঠিল। সে বলিল, জানিস আলোক মধু খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে, তা'ছাড়া ওর হাতের লেখাও খুব ভালো।

শুনিয়া মধুর মুখ লজ্জায় বেগুনী হইয়া উঠিল। ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া সে বলিল, না-রে আলোক ওর কথা বিশ্বাস করিসনি। কমল কি সুন্দর কবিতা লেখে তুই দেখিস নি—ওর একটা খাতা ভরে গেছে।

এইবার কমল কণ্ঠে কৃত্রিম রাগ আনিয়া বলিল, এই মধু মিথ্যে কথা বলিসনি—! তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, নারে অনেক নয়—বিশ্বাস করিসনি ওর কথা!

মধু বলিল, তুই কেন আমার নামে মিথ্যে কথা বললি?

তুই ছবি আঁকিস না সত্যি করে বলতো?

ইহার উত্তর না দিতে পারিয়া মধু বলিয়া উঠিল, তুই একগাদা কবিতা লিখিসনি? সেই 'দুষ্ট শশী', 'স্বপ্ন', 'গোলাপের প্রতি', 'বসন্তের ভ্রমর' আরো নাম করবো? জানিস আলো এ ছাড়া আরো অনেক আছে।

যেন আমার কাছে কোন দোষ করিয়া ফেলিয়াছে এইভাবে কমল বলিল, না-রে আলোক, ওর কথা শুনিস্‌নি—আমি বেশী লিখিনি।

এমনি করিয়া তাহারা নিজের মুখে নিজেদের গুণের কথা আমার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। কাগজ বাহির হইতে তখন আর কোন বাধা রহিল না। অবিলম্বে সুন্দর একটি খাতা মধুর আঁকা ছবি ও হাতের লেখায় সুশোভিত হইয়া বাহির হইল। আমার লেখা তাহাতে বেশী থাকিলেও, কমল ও অন্যান্য ছেলেদের আরো রচনা ছিল। সম্পাদক হিসাবে আমার নাম দেওয়া হইল বটে; কিন্তু আমি ইহার সহিত কমলের নামটাও জড়াইয়া দিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এইবার হয়ত কমলকে আমি মধুর চেয়ে বেশি কাছে পাইব, কিন্তু কার্যকালে ফল হইল সম্পূর্ণ উল্টা। কাছে পাওয়া দূরে থাক, সে যেন আরো দূরে চলিয়া গেল। মধু লিখিত আর কমল তাহার সম্মুখে বসিয়া সেইগুলি বলিয়া যাইত। এমনও হইত, পড়িবার নাম করিয়া কমল মধুর বাড়িতে গিয়া দুইজনে রাত জাগিয়া ইহা লিখিত। আমার কিন্তু তাহা আদৌ ভাল লাগিত না। তাই মাস-দুই পরে আসন্ন টেস্ট পরীক্ষার অজুহাত দেখাইয়া পত্রিকা

বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহাতে শুধু কমল যেরূপ ক্ষুণ্ণ হইল, আমি সেইরূপ খুশি হইলাম।

আবার পূর্বপ্রথানুসারে আমরা বিকালে একসঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম। সেই সময় কত গল্প হইত—লেখাপড়ার, খেলাধুলার, আসন্ন পরীক্ষার, আরো এমন সব বিষয়ের যাহাকে কোন সংজ্ঞাতে অভিহিত করা যায় না। কমলের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা ছিল খুব বেশি। আমাকে সে এই সময় নানারকম প্রশ্ন করিত—ভারতের অবস্থা ফরাসী বিদ্রোহের সময় কিরূপ ছিল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথম, সপ্তর্ষিমণ্ডল কাহাকে বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। কমল যখন এই সব প্রশ্ন মধুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাকে করিত, তখন সত্যই আমার বুকটা দশহাত হইয়া উঠিত। তাহা হইলে মধুর চেয়েও লেখাপড়ায় ও জ্ঞানে যে আমি বড়, ইহা কমল বুঝিতে পারিয়াছে?

৩

এইভাবে কমলের সঙ্গে যখন আলোচনায় দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন স্কুলে গিয়া দেখিলাম কমল ও মধু আসে নাই। বৈকালে মাঠে গিয়া দেখিলাম সেখানেও তাহারা নাই। কি হইল, কোথায় গেল চিন্তা করিতে লাগিলাম। অপর ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারও কেহ বলিতে পারিল না। তখন কমলের বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, মধুর খুব অসুখ করিয়াছে বলিয়া কমল স্কুলে যাইতে পারে নাই। সারাদিন রুগীর কাছে বসিয়া আছে।

একথা শুনিয়া আমি রাস্তায় আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, মধুকে দেখিতে যাইব কি না। আমার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা মনুষ্যত্ব বলিল যাওয়া উচিত; কিন্তু মন তাহাতে কিছুতেই সায় দিল না। কেন, তাহা বোধ করি যিনি মানুষের মনকে এমন জটিল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই।

মোট কথা, সেদিন আর আমি মধুকে দেখিতে যাইতে পারিলাম না। কিন্তু পর-দিনও যখন কমল স্কুলে আসিল না, তখন আমি মধুর বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। দুইদিন ক্রমাগত একশো চার ডিগ্রি জ্বর ভোগ করিবার পর সেইদিন দুপুরে সবে জ্বর ছাড়িয়াছে। দেখিলাম, মধুর শয্যার পাশে বসিয়া কমল তাহার মাথায় হাওয়া করিতেছে, ঔষধ-পথ্য দিতেছে। সেবায় কমলের এইরূপ ঐকান্তিকতা দেখিয়া কি-না জানি না, আমি আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না, কিছু খুচরো আলাপ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

পরের দিন কমল স্কুলে আসিল। শুনিলাম, মধুর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, সে ভালো আছে। ও-রকম ম্যালেরিয়া জ্বর পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে হয়, এমন লোক নাই যে ইহাতে ভোগে না। তাই কমলকে প্রশ্ন করিলাম, মিছেমিছি দুটো দিন কেন কামাই করলি, ম্যালেরিয়ার জ্বর এই ত দুদিনেই ছেড়ে গেল, অথচ কত দরকারী জিনিস এই দুদিনে পড়ানো হলো। সামনেই টেস্ট পরীক্ষা, এখন কি কখনো কামাই করে?

কমল বলিল, কিন্তু মানুষের অসুখ হলে পরীক্ষার কথা ভাবতে গেলে চলে না ত? সে ত রোজই আছে। আর রোগের কথা কে বলতে পারে? একটা ভালোমন্দ যদি হয়, তখন? টেস্ট একজামিন বড় না মানুষের জীবনটা বড়? এই বলিয়া সে আমার চোখের দিকে তাকাইল। ভাবপ্রবণতা কমলের একটু বেশি। যখন যাহা বলে, একেবারে তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়ে। তাই মধুর এই সামান্য জ্বর লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সে করিতেছিল মনে হইলেও, কমলের অন্তরটাকে কিন্তু সামান্য বলিয়া কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না। চাঁদ-সদাগরের উপাখ্যানটা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল।—মনসাদেবী সকলের পূজা পাইয়াও খুশি হন নাই, তাই চাঁদসদাগর যিনি পরম শৈব, মহাদেব ছাড়া অন্য কাহাকেও দেবতা বলিয়া মনে করিতেন না, তাঁহার হাতের পূজা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। এইরূপ একনিষ্ঠ ভক্তের হাত হইতে পূজা পাইবার জন্য তাই মনসাদেবী বিচলিত হইয়াছিলেন।

কমলের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আমি আর তাহাকে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। সেদিন ক্লাশে কখন কোন্ মাস্টার আসিলেন, কি পড়াইলেন, কিছুই আমার হুঁশ ছিল না। শুধু কমলের সেই কথাটি সমস্তক্ষণ ধরিয়া আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া পাক খাইয়া মরিতে লাগিল।

সেদিন স্কুল হইতে বাড়িতে ফিরিয়া আমি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কোচিং পড়িতে যাওয়া দূরে থাক, কথা বলিবার উৎসাহ পর্যন্ত যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছিল। আমি একা চুপ করিয়া পশ্চিমের খোলা জানালার দিকে চাহিয়াছিলাম।

বাঁশঝাড়ের মাথার উপর তখনো এক-টুকরো আকাশ দেখা যাইতেছিল। সন্ধ্যা হয় নাই—বিলীয়মান দিবালোকের বিরহে সমস্ত প্রকৃতি যেন ম্লান। সেইদিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম আমার জীবনে কি এতটুকু ফাঁক কোথাও নাই? শুধু অন্ধকার শুধু ব্যর্থতাভরা আমার আকাশ? এ সংসারে আমি একা, আমার আপন বলিতে কেহ নাই। কমল, সে-ও পর। তবে কেন তাহার কথা চিন্তা করিয়া এত সুখ-দুঃখ পাই?

এমন সময় খেঁদি আসিয়া বলিল, আলোদা, তুমি এমন সময় শুয়ে আছ কেন, কি হয়েছে?

বলিলাম, কিছু হয়নি।

সে শুনিল না। বলিল, কিছু হয়নি ত শুয়ে আছো কেন এই ভর সন্ধ্যেবেলায়? তাহার কণ্ঠে একটা ভর্ৎসনার সুর।

কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম আমি, খেঁদি আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়া বলিল, দেখি জ্বর হয়নি ত? সহসা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার কি মনে হইল, আমি ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলাম। খেঁদির সেই ক্ষুদ্র কোমল হাতখানির মধ্যে আমি সেদিন আমার বিরাট বিশ্বকে প্রথম অনুভব করিলাম। মনে হইল, আমিও একা নই। সে ত কোন-দিন আমার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করে নাই। অতীতের দিকে চাহিয়া বরং লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেল। এমনি এক একটা ক্ষণ আসে মানুষের জীবনে, যখন সে নিজেকে সত্য করিয়া দেখিতে শেখে। খেঁদি যে কুরূপা, তাহার কুৎসিত ভাবভঙ্গি, কুরুচিপূর্ণ স্বভাব—সমস্ত যেন সেই পরম-মুহূর্তে মিথ্যা আবরণের মত খসিয়া পড়িল, আর তাহার ভিতর হইতে মানুষের সেই পরমসত্য চিরসুন্দর রূপটি আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

খেঁদি তখন কি ভাবিতেছিল জানি না, হয়ত আমার নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার সে আশা করে নাই। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, কি হয়েছে ভাই আলোদা?

কিছু না—বলিয়া আমি শুধু তাহার হাতখানিকে আরো জোরে মুঠা করিয়া ধরিলাম। আরো কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। তারপর সহসা খেঁদি আমার মুঠা হইতে নিজের হাতখানিকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখুনি তুলসীতলায় পিদিম দিতে হবে—আমি যাই আলোকদা।

আমি হাঁ বা না কিছুই বলিতে পারিলাম না। খেঁদি চলিয়া গেল। শুধু তাহার বিলীয়মান পদধ্বনি, স্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আমার চারি-দিকের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে একটা মৃদু আর্তনাদ করিতে করিতে যেন বিশ্ব-চরাচরে ছড়াইয়া পড়িল।

—(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্র-বাউল ও লালন ফকীর

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী, এম এ

(১)

রতনে রতন চেনে: রবীন্দ্রনাথই সর্ব-প্রথম আমাদের দেশের অখ্যাত অজ্ঞাত এবং তথাকথিত অশিক্ষিত বাউল-দরবেশ ও অর্ধনগ্ন ফকীরদের রচিত গানগুলির মধ্যে যে কি অমূল্যেখনি নিহিত আছে সে বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের চোখ ফুটিয়ে তোলেন। বাউল-সাহিত্যের প্রকৃত মাধুর্য রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল, তাঁর দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর কবিজীবনে বাউল-সংগীতের প্রভাব তিনি নিজে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের হারামণি নামক লোক-সংগীত সংগ্রহ পুস্তকের ভূমিকায় কবিবর বলেছেন:

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল-সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে"। রবীন্দ্রনাথের রচিত বহু গান ও কবিতার সঙ্গে অনেক বাউল-গানের সুর সাদৃশ্য আছে। নিখিল ভারত দর্শন সভার সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ শেখ মদন ফকীর নামক বাউলের যে গানটির কথা উল্লেখ করেছিলেন অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন তাঁর "হারামণি" গ্রন্থে সেই গানটি তুলে দিয়েছেন। গানটির আরম্ভ হ'ল—

"রে নিঠুর গরজী
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি,
সবুর বিহনে?
দেখনা আমার পরমগুরু সাঁই
সে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল,
তাড়াহুড়া নাই।"

এই গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "গীত-মাল্যের" একটি গানের সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানটির আরম্ভ হচ্ছে—

"তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল,
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল,
ওগো ঐ তোমারি ফুল।"

রবীন্দ্রনাথের এই গানটির সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় যে কথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, "গানটির ভাষা সামান্য কিছু অদল বদল করিয়া দিলে অনায়াসে বাউল গান বলিয়া চালান যাইতে পারে।" বাউল গান রবীন্দ্র-বাউলের মনে ও হৃদয়ে যে রেখাপাত করেছিল তাঁর সারাজীবন তা সমুজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করেছে।

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতেম পাখীর পায়।"

কোন এক অজ্ঞাতনামা বাউলের কণ্ঠনিঃসৃত এই কটি কথা কবির কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে বুঝি তাঁর প্রাণ আকুল করেছিল। তাই তিনি কথা কটি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারেননি—কবিবর তাঁর "জীবন স্মৃতির" পাতায় এই ছত্র দুটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন এবং এই ছত্র দুটিই আবার স্থান পেয়েছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "গোরার" একেবারে গোড়াতেই। এই 'অচিন পাখীর' অ-ধরা আনাগোনাকে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছেন 'চিত্র-লিপি" নামক তাঁর চিত্র-সংগ্রহ পুস্তকে। প্রকৃতপক্ষে বাউলের ভাবটি তাঁর বড়ই প্রিয়, চির আদরের। বহু কবিতা ও গানে তিনি বাউলের ভাব ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। "পত্রপুটের" 'সন্ধ্যা এলো চুল এলিয়ে' কবিতায় তিনি এক 'এ-কেলে বাউলের সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। চিত্রটি গোড়ায় হাল্কা কিন্তু শেষের দিকে গম্ভীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে 'অন্ধ বাউলের' ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল সুষ্ঠু, কারণ বাউলের ভাবটি তাঁর যে নিজস্ব, অকৃত্রিম। শুধু কবিজীবনে নয় তাঁর অধ্যাত্ম জীবনেও বাউলের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে কবিবরের নিজের উক্তি উল্লেখ করা সমীচীন।

"তখন আমার নবীন বয়স,—এক বাউল একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল

"কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

কথা নিতান্ত সহজ কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটি উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ,—যাঁকে জানবার সেই পুরুষটিকে জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা, অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত "মানুষের ধর্ম" নামক 'কমলা বক্তৃতায়' এই গানটির উল্লেখ এবং সম্যক আলোচনা করেছেন। উক্ত আধ্যাত্মিক ভাবের কথা বাদ দিয়েও দরদী রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে উপলব্ধি করেছিলেন যে, "বাউল গানের" উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে তা সহজে উৎসারিত হয়েছে বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে।" বাউল জীবনের ও গানের এই সহজ অকৃত্রিম ছন্দ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত তরুণ বয়সেও তাঁর অন্তরের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। এ সত্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'শেষ সপ্তকে'র অন্তস্থ 'পঁচিশে বৈশাখ' চলেছে কবিতায়। সেখানে তিনি বলছেন,—"তরুণ যৌবনের বাউল সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে ডেকে বেড়ালো নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।"

বিগত ১৩২২ বাঙলা সালে মাসিক পত্রিকা প্রবাসীতে 'হারামণি' নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগ সম্বন্ধে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য ছিল এই: 'এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য-কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবত উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্ব-রস মধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জাওয়ালা, জারীওয়ালা বাউল, দরবেশ ফকীর প্রভৃতি অনেকে এই দলের।" লালন ফকীর প্রমুখ বাঙলার অনেক বিশি[ষ্ট] বাউলের রচিত গান সংগ্রহ ও প্রকাশ ক[রে] রবীন্দ্রনাথ এই বিভাগকে সমৃদ্ধ এ[বং] বাঙলা সাহিত্যের অশেষ উপকার কর[ে]ছিলেন। অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সে[ন] মহাশয়ের মতে বাউলগান সংগ্রহের কা[জে] রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমতম ও শ্রেষ্ঠতম। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহে[ব] বলেছেন যে তিনি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রন[াথ] কর্তৃক লালন ফকীরের গান সংগ্রহ দেখে গ্রাম্য গানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

(২)

নদীয়া জেলার শিলাইদহে আগম[ন] রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে এক বিশি[ষ্ট]

অধ্যায়ের সূচনা হয়। শিলাইদহে অবস্থানকালেই রচিত হয় কবিবরের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যে'র বহু কবিতা ও গানের নীচে উল্লেখ আছে শিলাইদহ, পদ্মা, গোরাই নদী, কয়া, জানিপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি নামের। এই সবগুলি জায়গাই শিলাইদহ অঞ্চলে। শিলাইদহে এসে বিশ্বকবির যেমন বাঙলার আকাশ, বাতাস, নদ, নদী গাছপালার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তেমনি এখানেই তিনি ঘনিষ্ঠ পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হন বাঙলার শ্রেষ্ঠ মরমী সাধক কবিদের সাথে। কবিবর নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন, "শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদের সাথে সর্বদাই আমার দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত।" যে বাউলের গানের 'মনের মানুষে'র মধ্যে কবিবর উপনিষদের "অন্তরতর যদয়মাত্মা'র সন্ধান পেয়েছেন সেও শিলাইদহের অধিবাসী, নাম তার গগন হরকরা, আপন মনে গান করে করে চিঠি বিলি করাই ছিল তার কাজ। বাঙলার "ফকীর সমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক" সিদ্ধ বাউল লালন সাঁইজীই কুষ্টিয়া অঞ্চলের লোক। যে গোরাই নদীর বক্ষে বোটে করে রবীন্দ্রনাথ কত বেড়িয়েছেন ও কাব্য রচনা করেছেন সেই 'গোরাই'র তটস্থিত ভাঁড়োড়া বা ভাঁড়াড়া গ্রামেই লালন জন্মগ্রহণ করেন। গোরাই যে হাওয়া বিশ্বকবির মনে জাগিয়ে তুলতো 'মানব জন্ম তরীর মাঝির' কথা সেই হাওয়াই ফকীর লালনের সাধন-পীঠের বেতসকুঞ্জকে আলোড়িত করে তাঁকে 'অধর চাঁদের' চিন্তায় উন্মনা করে দিত। শিলাইদহের অনতিদূরে কুষ্টিয়া শহরের সংলগ্ন সেঁউড়িয়া গ্রামে লালন ফকীরের আখড়া। তাঁর অসংখ্য শিষ্য সেঁউড়িয়া আখড়ায় এসে লালনের পদধূলি নিত এবং এক স্বর্গীয় আনন্দের স্বাদ পেত তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত অমৃত সংগীতে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখনই শিলাইদহে আসতেন তখনই তিনি তাঁর কাছে লালন ফকীরকে নিমন্ত্রণ করে আনতেন, লালনের মধুর সংগীত শ্রবণ করতেন এবং নিভৃতে তাঁর সাথে আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনা করতেন। হারামণির গ্রন্থকার বলেন : "মিসেস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ার নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের শিলাইদহ অবস্থানকালে লালন প্রায়ই তাঁহাদের বোটে আসিতেন। লালনের সুদীর্ঘ বাবরী ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রায় তাঁহাদিগকে গান শুনাইতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত লালনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।" রবীন্দ্রনাথ যে লালন ফকীরের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা আজও সেঁউড়িয়ার গ্রামবৃদ্ধদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সবাই বলে কবিবর নিজে একাধিকবার সেঁউড়িয়া আশ্রমে আগমন করেছেন এবং লালন ফকীরের কবরের উপর যে স্মৃতি-মন্দির গড়া হয়েছে তাতে তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সাঁইজীর অনেক শিষ্য-প্রশিষ্যের কাছে শোনা যায় যে তাঁর নিজের হাতে লেখা স্বরচিত গানের একখানা খাতা ছিল। খাতাখানা ছিল সেকেলে তুলট কাগজের এবং সাঁইজীর হাতের লেখা অক্ষরগুলি ছিল বড় বড় লম্বা লম্বা ধরণের। এদের বিশ্বাস যে সাঁইজীর মহাপ্রয়াণের পর এই খাতাখানি রবীন্দ্রনাথের হাত যায়। এর একটু আভাস কবিবরের নিজের উক্তিতেও পাওয়া যায় : "বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাঁদের পুরাতন খাতা দেখেছি।" রবীন্দ্রনাথকে লালন ফকীরের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ। লালন ফকীর যেমন উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন, তেমনি তাঁর কবি প্রতিভাও ছিল অসাধারণ।

"আমার ঘাড়ীর কাছে আর্শিনগর,
তাতে এক পড়শী বসত করে,
আমি একদিনও না দেখিলাম তাঁরে।"

যাঁর রচনায় এত মাধুর্য তিনি কি সার্থকনামা কবি নন? তাঁর গৌরব কি কোনদিন নিষ্প্রভ হতে পারে? তাই রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছিলেন : "নিঃসংশয়ে জানি বাউল সংগীতের একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক।" রবীন্দ্রনাথ ও লালন ফকীরের অনেক রচনার মধ্যে সাদৃশ্য এবং সমধর্ম-প্রবণতা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্যে"র গানগুলির সম্বন্ধেই একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পরমেশ্বরকে পাওয়ার আকুলতার সুর উভয়েরই সংগীতে সমভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম জীবন-দেবতা, মানবজন্মতরীর মাঝি, লালনের 'মনের মানুষ' অধরচাঁদ, দয়াল কান্ডারীর নামান্তর। উভয়ের কাছে তিনি বড় পাগল ক্ষ্যাপা। দুজনেই তাঁর কাছে চির-অসহায়। লালন যেমন নিজেকে বলেন 'অধম, তেমনই রবীন্দ্রনাথ আপনাকে 'গুণহীন' আখ্যা দিয়েছেন। দুজনেরই ব্যথা এক; লালন গেয়েছেন,

"ও সে নড়ে চড়ে হাতের কাছে......
... ...
(তবু) আমি দেখতে পাইনে তোমার ও মুখ
তাই দেলে ব্যথা বাজে।"

আর রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমার দ্বারের সুমুখ দিয়ে সে জন
করে আসা যাওয়া
... ...
(তবু) আমি দেখি নাই তাঁর মুখ।"

লালন শুনেতে পেয়েছেন,

"আমার মনের কানের কাছে তোমার বাঁশী বাজে"

রবীন্দ্রনাথও বলেন,

"কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।"

লালন আক্ষেপ করে গেয়েছেন—

"...কি আলস্য ঘিরে এল
দেখলিনে খুলে আঁখ"

রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপও অনুরূপ

"সে যে পাশে এসে বসে ছিল
তবু জাগিনি
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।"

লালন জানেন—

"ক্ষ্যাপা তুই যেখানে সেও সেখানে"

তিনি আপন ভুল বুঝতে পেরেছেন

"আমি বাইরে খুঁজে মরি ঘরেরি ধন।"

রবীন্দ্রনাথও জানেন—

"দিন রজনী আছেন তিনি আমাদের এই ঘরে।"

তাই ভুল করে—

"সারাদিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে।"

মুক্তির আশায় লালন ডাকেন

"কোথায় হে দয়াল কান্ডারী।"

রবীন্দ্রনাথের অন্তরও ডাকে সেই একই জনকে,

"ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানব জন্মতরীর মাঝি।"

লালন বলতেন,

"এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে।" ভক্ত কবি চণ্ডীদাসের মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে সবার উপরে মানুষই সত্য। তাই তিনি গেয়ে গেছেন,

"মানুষ তত্ত্ব সত্য হয় যার মনে
সে অন্যরূপ কি মানে।"

রবীন্দ্রনাথও মানুষের নারায়ণকে চিনতে পেরেছিলেন এবং মানুষের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন মুক্তির সন্ধান।

শাশ্বত

অমর সান্যাল

বিকেল থেকে ফুটপাথে ভিড় জমতে শুরু করেছে। চারদিক থেকে দলে দলে আসছে মানুষ নামে পরিচিত শীর্ণকলেবর অর্ধনগ্ন নরনারী। অসহায় পশুর বুভুক্ষা তাদের চোখে। জীবনের সকল বেদনার মূর্তিমান প্রতীক তারাই। তবু তারা বেঁচে থাকতে চায়, নিজেদের অভিশাপের বোঝা বংশ বংশ ধরে সন্তানদের ওপর ন্যস্ত করে যায়। আজ অপরাহ্ণে নিশ্চল ফুটপাথ সজীব হয়ে উঠেছে তাদের কলগুঞ্জনে। সঙ্গে এসেছে শিশুর মেলা। নেংটিপরা এত রোগা যে তাদের দেহের অস্থির প্রত্যেক টুকরাটি গোনা যায়।

সকলের মুখে এক কথা—কাঙালীভোজন হবে। আজ থেকে তিন দিন ধরে। বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধ। দীনতারণবাবুকে কে না চেনে? দরিদ্রভাণ্ডারের সেক্রেটারী তিনি। বিদ্যাসাগরের পরে দরিদ্রদুঃখহারী তাঁর মত আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ। শহরের পনের মাইল দূর থেকেও কাঙালী আসছে। যাযাবরদের মত ডেরাডাণ্ডা তুলে তারা ঘোরাফেরা করে খাবারের খোঁজে। দীনতারণবাবুর বাড়ি কাঙালীভোজন হবে এ বার্তা বস্তিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

মুণ্ডিত মস্তক দীনতারণ ছাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তাঁর আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ পথের দিকে। ফুটপাথে বিচিত্র জনতা মহামানবের মহাতীর্থ। দীনতারণের চোখের পাতা ভিজে এল। —মা অম্বিকে এ তোমার কী লীলা মা! কাউকে তুমি অগাধ ঐশ্বর্য দিয়েছ কাউকে করেছ পথের ভিখারী! ফুটপাথের দৃশ্য দীনতারণের অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি তেতলায় ছেলের ঘরের দিকে গেলেন।

বাবুর বড় ছেলে সুপ্রিয়। বছর একুশ বয়স, বাঙলায় এম-এ পড়ে। নিজের ঘরে বসে শ্রাদ্ধবাসরের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ সে লিখছে। দৈনিক সংবাদপত্রের কলাম ভরে উঠবে দীনতারণের মায়ের মহাপ্রস্থানের ধ্বনিতে। সারা দেশ নিশ্চয়ই উন্মুখ হয়ে আছে সেই মহীয়সী মহিলার মহত্বের কাহিনীর জন্য।

দীনতারণ ছেলের টেবিল থেকে রচনা তুলে পড়তে পড়তে চমকে উঠলেন। ছেলেকে বললেন—যা ভেবেছি তাই! তোদের জ্বালায় আমার সুনামটুকু থাকবে না। কাঙালী ভোজনটা একেবারে বাদ পড়েছে।

সুপ্রিয় লজ্জিত হল, বললো—ওটা শেষে দেব ভাবছি।

—তুমি সব মাটি করবে দেখছি। ওটাই হল কিস্তিমাতের চাল। ওরই জোরে সামনের ইলেকসানে ভবশংকরকে কাৎ করতে হবে। কেটে লেখ আবার।

সুপ্রিয় লিখতে আরম্ভ করল। কাঙালীভোজনের কাহিনীর মধ্যে বাঙলায় এম-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। দু'এক লাইন স্বরচিত কবিতা জুড়ে দিলে কেমন হয়?

এবার দীনতারণ প্রবেশ করলেন গৃহিণীর ঘরে। সে ঘরে তখন সমারোহ ব্যাপার। মেয়ে সুলতা পনেরটা ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি নির্বাচন করছে। গৃহিণীর চোখে মুখে ভ্রূকুটি। দীনতারণকে দেখে মা ও মেয়ে একসঙ্গে ফেটে পড়ল তুবড়ীর মত।

—কাঙালীভোজন ত খুব হচ্ছে! এই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া লোকদের খাইয়ে হবে কি শুনি? গোলমালে টেঁকা যাচ্ছে না বাড়ি।

দূরাগত ক্ষীণ কলরোল ভেসে আসছে বাতাসের সঙ্গে। উচ্চ প্রাচীর ঘেরা প্রশস্ত লনের ওপারেও মিলিতকণ্ঠের কাকলীর অস্ফুট আভাস পাওয়া যাচ্ছে গৃহিণীর ঘরে।

দীনতারণ বললেন মোটে ত এই একটা দিন। অমনই কি ভাল লাগছে বাড়ির সামনে এই বিদঘুটে চীৎকার?

গৃহিণী বললেন—দরোয়ানরা বলে দিক ওদের যে চুপ করে বসে না থাকবে সে খেতে পাবে না।

মেয়ে বললো—কী চীৎকারটাই করছে! যেন ওদেরই নেমন্তন্ন করা হয়েছে! দরোয়ানদের বলে দাও বাবা। যাঁদের নেমন্তন্ন হয়েছে তাঁদের আসবার সময় হয়ে এল।

শহরের সীমানার বাইরে ছোটখাট একটা মাঠের মধ্যে খানকতক কুটিরের ভগ্নাবশেষ। কুটিরের অধিবাসীরা সকাল না হতেই বেরিয়ে যায় বেলাশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে আসে। গোধূলির আলো মিলিয়ে যায়। ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে হাঁড়ির ভাত টগবগ করে ফোটে। উনুনের চারধারে ভিড় করে বসে থাকে এক থেকে আশী বছরের মানুষের পাল। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টা সকলের মুখে একটুখানি তৃপ্তির রেখা ফুটে ওঠে।

শীতলদের রান্না শেষ হয় সবার আগে। শীতলের মা থালায় ভাত বাড়ে। মা ও ছেলে একসঙ্গে খায়।

পাশে রান্না করে নিশুর মা। একগাল হেসে বলে,—কি রান্না হল রে শীতলের মা!

শীতলের মা বলে,—এই চাল কটাই ফুটিয়ে নিলাম। আর কিছু পাইনি আজকে। কালকের নুন ছিল ঘরে খানিকটা।

নিশুর মা হাঁড়ি থেকে একটু তরকারী ফেলে দেয় শীতলদের থালায়। বলে,—খা শেতল খা। নিশুর মার ভাগ্য ভাল। সে সেদিন দুটো পোকায় খাওয়া বেগুন আর তিনটে আধপচা আলু পেয়েছে।

মা ও ছেলের খাওয়া হয়ে যায়। থালাটা চেটে ঝকঝকে করে ফেলেছে তারা। না ধুলেও চলে।

পরদিন সকালে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। শীতলের মা উঠে দাঁড়াতে পারল না। প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন চরম অবসাদে ভরে গেল। তাদের চার বছর ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে মায়ের এ অবস্থার সঙ্গে শীতলের কোনদিনই পরিচয় হয় নি।

শীতল সেদিন নিশুর মার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরুল।

সকাল বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রতিটি লোমকূপ শিউরে উঠছে। ভিখারীর দল ধূলিমলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে শহরে প্রবেশ করছে। লাঠি ঠক ঠক করতে করতে আসছে নিশুর মা। ন্যুব্জদেহ মাথায় একরাশ জটা। পেছনে বুড়ীর মেয়ে নিশুর হাত ধরে শীতল চলেছে।

নিশুর মা বকতে বকতে পথ চলছে,—হতভাগীর জ্বর না হাতী! এ কেবল এই বুড়ীর ঘাড়ে ছেলেটাকে চাপাবার ফন্দী। ওরে ও শেতল তোর মার গলা দিয়ে কাল রক্ত উঠল ত?

শীতল ঘাড় নেড়ে জানাল,—হাঁ। আজ বড্ড শীত করছে দিদিমা।

বুড়ী এবার রেগে গেল। —ওলো ও নিশু, নে না ছেলেটাকে একটু কোলে। আট বছরের কাঁচা ছেলে কি শীত সহ্য করতে পারে?

নিশুও রেগে গেল বললো—তুমি নাও না বাপু! অত জোর নেই আমার গায়ে। আমারি মুখ দিয়ে কাল রক্ত উঠেছে দুবার।

গোলমাল করতে করতে রাস্তার মোড়ে

এসে পেঁাছল তারা। এখান থেকে বেরিয়ে গেছে একটা সুপ্রশস্ত রাজপথ। রাস্তার পিচ আয়নার মত ঝকঝক করছে। দু'পাশে সযত্ন বর্ধিত গাছের সারি। রঙবেরঙের বাড়িগুলি দেখাচ্ছে আকাশে আঁকা চিত্র-পটের মত। এই অভিজাত রাজপথের পদপ্রান্তে ভিখারীদের অদ্ভুত দেখাতে লাগল।

নিশুর মা বললো,—এই পথ ধরে তুই একবার যা শেতল। বড় লোকদের বাড়ি সব। তোর মার অসুখের কথা বলে ভিক্ষে চাইবি।

নিশুর মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলো। সে বললো—হ্যাঁ, শেতলকে রাজা করে দেবে! ওসব বাবুদের গাছপালার ওপর যেটুকু যত্ন আছে, আমাদের মত মানুষের ওপর তাও নেই। শিবপুরের কলওয়ালা বাবুদের কথা তোর মনে নেই মা! সেই যে বাবুর ছেলে চাবুক মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের। সে চাবুকের দাগ আমার পিঠে এখনও মিলিয়ে যায় নি। এই দ্যাখ্ শেতল।

জীর্ণ চিরকুটটা পিঠ থেকে সরিয়ে দিল নিশু। সরু পিঠের ওপর লম্বা একটা দাগ রয়েছে অনেকখানি জুড়ে। মনে হচ্ছে আর একখানা হাড় কে যেন লম্বালম্বি নিশুর পিঠে বসিয়ে দিয়েছে।

পথচলার আর বিরাম নেই। কোমল ঘাসের আস্তরণ বিছান ফুটপাথ দিয়ে শীতল চলেছে। পথটা দেখবে সে শেষ পর্যন্ত। নিশু মাসী ঠিক বলেছিল। একটি দানা চালও শীতলের ঝোলায় পড়ে নি।

দুপুরে রোদে সারা গা ঝিমঝিম করছে। কলের মত পা চলছে তার। আট বছরেই সে পূর্ণবয়স্ক ভিখারীর শক্তি অর্জন করেছে। কত বাড়ি পার হয়ে গেল, শীতলের দৃষ্টি যেন তাদের অন্তরালে প্রার্থিত বস্তু খুঁজে ফিরছে।

সুউচ্চ ঘণ্টাধ্বনিতে তার চমক ভাঙল। সামনে দেবমন্দির। তার পিতলের চূড়া রবিরশ্মিতে সমুজ্জ্বল। মন্দিরে দেবতার মূর্তি। রত্নালংকারভূষিত, সুরভিত। দ্বিপ্রহরের ভোগ শেষ হয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট একদল সন্ন্যাসী প্রশস্ত চত্বরে প্রসাদভক্ষণে রত। ঘৃতপক্ক অন্নব্যঞ্জনের গন্ধে শীতলের বুক ভরে গেল।

ছায়াঘন চত্বর, ধপধপে সাদা, যেন দুধে ধোয়া। চারদিকে শ্রীমণ্ডিত বিশ্রামঘর। মেয়েপুরুষ ভক্তবৃন্দের সমবায়ে গমগম করছে। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল শীতল। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমারোহ এখানে, মুষ্টিভিক্ষা সহস্র হাতে এসে পড়বে তার ঝুলির মধ্যে।

—কে-রে ওখানে! ওমা, একটা বিশ্রী নোংরা ছেলে!—মিহিকণ্ঠের সম্ভাষণে শীতলের তন্দ্রা ভেঙে গেল। সন্ন্যাসী-ভোজন সমাপ্ত হয়েছে কখন, মেয়েভক্তরা বেরিয়েছে আশ্রম প্রদক্ষিণ করতে।

তেড়ে এল আশ্রমবাসীরা।—ওঠ্ ছোঁড়া, খোঁড়িয়ে যা এখান থেকে। এই রামধনিয়া, ধুয়ে দে জায়গাটা।

আবার পথের আশ্রয় পেল শীতল। বিকেল হয়ে আসছে। ফিরতে হবে এবার। কিন্তু শূন্যহাতে মায়ের সামনে দাঁড়াবে কি করে? সেই বা খাবে কি? দেখা যাক্ আর একটু। আজ না হয় খেতে দেরীই হবে। কিন্তু আট বছরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। মাথাটা ঘুরছে, চোখের সামনে কি সব নাচছে কালো কালো ছায়ার মত। পাদুখানা থেকে থেকে দুমড়ে, মুচরে যাচ্ছে। তবু শীতল এগিয়ে চলল।

ঝাপসা দৃষ্টির অন্তরালে অনেক লোক দেখা যাচ্ছে। তারই মত চিরকুট পরা, ক্ষুধিত সকরুণ দৃষ্টি। বড় গেট ওয়ালা বাড়ির সামনে ফুটপাথ জুড়ে বসে গিয়েছে তারা। এতক্ষণে তার একান্ত আপনার লোকের দেখা মিলল। ওই ত কাছেই বাড়িটা। শীতল এগিয়ে চলল।

কাঙালীরা সারি বেঁধে বসে আছে। কেউ কেউ শুয়ে পড়ে বকছে বিড় বিড় করে,—আমাদের এখনও ঢের দেরী, বাবুলোকদের খাওয়া হবে, তবে। মধ্যাহ্নের প্রতপ্ত সূর্যকে উপেক্ষা করে নিঃশব্দে বসে আছে তারা। তাদের ছেলেমেয়েরা শুধু আসন্ন ভোজের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—ওরে ও শেতল, ওদিকে যাস্ কোথা? এই দ্যাখ্, এই যে আমরা।

শীতল গেটের দিকে যাচ্ছিল, ডাক শুনে অবাক হয়ে তাকাল পেছন দিকে। নিশুর মা। বুড়ীর হাতে একটা পচা কমলালেবু।

—খা, শেতল, খা। এই খা এখন। পাস্ নি বুঝি কিছু? তা হয়েছে কি? এখানে যা পাবি, তোদের মা-বেটার চলে যাবে দু'দিন। যাস্‌নে এখন কোথায়ও। আমি যাই দেখি নিশু আবার কোথায় গেল।

নেবুটা খেয়ে এতক্ষণে ক্ষুধার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল শীতল। কী অসহ্য অনুভূতি। বুকের নীচে পেটের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ওখানে যেন একটা গহ্বর গড়ে উঠেছে। ওঃ সে যদি সন্ন্যাসী হত! দেবতার ভোগ খেয়ে এতক্ষণ স্ফটিকস্বচ্ছ মেঝের ওপর শীতল-পাটি বিছিয়ে বিশ্রাম করত।

আরও কত ছেলেমেয়ে এসেছে। পূর্ণোদ্যমে ঝগড়া করছে তারা, কুৎসিত ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি করছে। মুখ নড়ছে প্রায় সকলেরই। পথে পথে আবর্জনার স্তূপ থেকে আহার্য বেছে নিয়েছে তারা। তাদের ভাণ্ডারে জমা আছে বিড়ি সিগারেট থেকে আরম্ভ করে বিলাসের সকল উপকরণ। শীতলকে দেখে তারা তেড়ে এল,—তুই কে রে! ভারী বাহারে কাপড় পরেছিস্ যে! একটা বড়মত ছেলে শীতলের ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাপড়টা ধরে টান দিল। তার দুর্বল দেহ সহ্য করতে পারল না এই নতুন আঘাত। সশব্দে মাটিতে পড়ে সে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠল।

বড় ছেলেটা ভারী অপ্রস্তুত হল। শীতলকে দাঁড় করিয়ে বললো,—আরে, ঠাট্টা বুঝিস্ না তুই? এই নে, বাদাম খা।

বাদাম চিবুতে চিবুতে শীতল গিয়ে দাঁড়াল গেটের কাছে। দরোয়ানদের কাকুতি মিনতি করতে লাগল,—একবার ঢুকতে দাও না বাবু, বড় খিদে।

সমস্বরে বলে উঠল পশ্চিমা প্রহরীর দল,—ভাগ ছোঁড়া, খাবার নিয়ে তোর জন্যে সব বসে আছে, না? যা এখান থেকে, সায়েব দেখলে বকাবকি করবে।

আস্তে আস্তে সরে এল শীতল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মা হয়ত এখনও শুয়ে আছে। ক্ষুধা ও নিষ্ফল প্রয়াসের বেদনায় চোখ ফেটে তার জল পড়তে লাগল। গেটের মধ্যে সে ঢুকবেই। যে বাবু এত কাঙালী ভোজন করাচ্ছে তাঁর দয়াপ্রার্থী হলে সদা সদা আহার নিশ্চয়ই মিলবে। রাতের আঁধার নামবার আগেই সে পেঁাছে যাবে তাদের জীর্ণ কুটিরে।

শীতলের লুপ্ত আশা দীপ্ত হয়ে উঠল। আর একবার চেষ্টা করা যাক। গেটের দিকে আবার এগিয়ে গেল সে। দরোয়ানরা যুবতী ভিখারিণীদের সঙ্গে রসিকতা করছে অদূরে। চুপি চুপি গেটের মধ্যে পা দিল সে। লম্বা-চওড়া কম্পাউণ্ড। রাঙা কাঁকড়ঢালা পথ মাড়িয়ে শীতল এগিয়ে চলল। কৃত্রিম ফোয়ারার জল তার চোখে মুখে এসে লাগছে। হাওয়ায় কী মিষ্ট গন্ধ! বাগানে কর্মব্যস্ত লোকের আনাগোনা। সবার অলক্ষ্যে শীতল নিঃশব্দে দাঁড়াল একটা ঘরের সামনে।

নীচের ঘরে দীনতারণ হিসাবে মগ্ন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ হতে বসেছে। কাঙালীভোজনটা এক দিন করে দেওয়া যাক। কাগজেকলমে তিনদিনই থাকুক। কে আর দেখতে আসছে? খুশিমনে দীনতারণ তাকালেন খোলা দরজার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখের তারা

অসহ্য বিস্ময়ে অস্বাভাবিক বিস্ফারিত হয়ে গেল। এত রোগা ছেলে দীনতারণ জীবনে দেখেন নি। কোমরে ঝুলছে একটা কাপড়ের টুকরো—ঝুলের মত কালো। এত নগণ্য দেখাচ্ছে তাকে যে, তার অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। চোখদুটো শুধু জ্বলজ্বল করছে। কাঙালীদের সংগে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু ও ভুল করেছে। ওদের পর্ব ত সবার শেষে। কিছু বলবে বোধহয় এবার ও। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। মাননীয় অতিথিরা এসে পড়বে এখুনি। দীনতারণ বজ্রকণ্ঠে ডাক দিলেন—দারোয়ান।

চমকে উঠল শীতল। তার কানের কাছে কে যেন সশব্দে কামান দাগল। দীনতারণের হুঙ্কার মিলিয়ে না যেতেই পশ্চিমা হাতের সশব্দে চপেটাঘাতে তার পিঠের হাড় যেন গুঁড়ো হয়ে গেল। শীতলের মনে হল তার গলা যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে: মূক অসহায় পশুর মত, শুধু তার ধূলিমলিন গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। নিশুর কথা মনে পড়ল তার,—ধনুকের মত বাঁকা পিঠে চাবুকের দাগ।

ফিরতে হবে এবার। শীতল নিশুর মাকে খুঁজতে লাগল। অসহ্য ভীড় হয়েছে: আশাপ্রদীপ্ত মুখ সকলের, —যত দেরীই হোক, বাবুর বাড়ির খাওয়া তৃপ্ত করবে সকলকে। ভিখারীর দল এর মধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে: কবে কাদের বাড়ি ঘটা করে কাঙালী ভোজন হয়েছিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা সগর্বে বলে যাচ্ছে তাদের বংশানুক্রমিক ভিক্ষাবৃত্তির ইতিহাস। নিশুর মার গলার পর্দা চড়েছে চারগুণ হয়ে।

—মিত্তিরদের জানিস ত? ওই যে তালপুকুরের মিত্তিররা, যাদের জামাই কলকাতার বড়বাবু। সেই মিত্তিরদের বাড়ি আমার খাতির ছিল কত! নিশুর বাপ তখন জেল খাটছে। বড়গিন্নির পাতের পেসাদ রোজ আমার বরাদ্দ ছিল।

কে একজন বলে উঠল,—মিত্তির বাড়ির ব্যাপার জানা আছে আমাদের। পেসাদ বলতে একমুঠো পাতকুড়ান ভাত আর কাঁটাকুটি। ও ত বেড়ালের খাবার। দেওয়া থোওয়ার হাত ছিল সোনাডাঙগার বাঁড়ুয্যেদের। ছেলের অন্নপ্রাসনে কাঙালীদের লুচি খাইয়েছিল।

নিশুর মা হাত নেড়ে বললো,—লুচির গুমোর করিস নে। সেও ওই ছত্রিশ জাতের পাতের লুচি।

তর্কবিতর্ক সগর্জন বিবাদে পরিণত হল। শীতল ভুলে গেল নিশুর মার কাছে বিদায় নিতে। মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ, দুপক্ষের দুরকম সুর তাকে অভিভূত করেছিল।

কোথা থেকে নিশু এসে উদ্ধার করল তাকে।—ইস, পিঠটা ফুলে উঠেছে যে! খুব মেরেছে বুঝি ওরা? দীনতারণের বাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল নিশু। এতক্ষণ পরে শীতল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পিঠে কে যেন এখনও হাতুড়ি পিটছে!

শীতলের চোখ মুছিয়ে দিল নিশু। বললো,—বেশ করেছে মেরেছে। ভিতরে গিছলি কেন? কাঙালীভোজন কি রাত না হলে হয়! নাও এখন পিণ্ডি গেল। ঝোলমাখা দলা দলা ভাত নিশু আঁচল খুলে বার করে দিল।

শীতলের ক্ষুধিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সদ্য প্রহার-যন্ত্রণা, শয্যাশায়ী রুগ্ন মায়ের কাতরোক্তি,—সব যেন ঝাপসা হয়ে গেল। নিশু বললো,—ও শেতল, আস্তে খা, গলায় বাধবে যে!

ক্ষুধাশান্তির পর চারদিকে তাকাবার অবসর পেল শীতল। সূর্য ডুবে গেছে কখন। দীনতারণের বাড়ি আলোর মালা পরে যেন হাসছে। মোটরের পর মোটর আসছে জগতের দারিদ্র্য ও দৈন্যের বোঝাকে উপহাস করে। সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

খাওয়া আরম্ভ হয়েছে বোধ হয়। ঝুড়ি-বোঝাই এঁটোপাতা পড়ছে ডাস্টবিনে। তার চারধারে ভেঙে পড়েছে বুভুক্ষিত শিশু-জগত। স্তূপাকারে পাতা সংগ্রহ করছে সকলে। খালি পাতা আর কিছু না। পরম তৃপ্তির সংগে পাতা চেটে চলেছে তারা।

নিজের অজ্ঞাতসারে কোন্ এক অস্পষ্ট মোহের আকর্ষণে শীতল আবার চলেছে গেটের দিকে। প্রাচীরের ওপার থেকে শোনা যাচ্ছে আনন্দোচ্ছ্বাসের অস্ফুট শব্দ। দুর্বার কৌতূহল শীতলকে দাঁড় করিয়ে দিল গেটের একপাশে।

বাগানের ভেতরটা এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। খোলা লনে জগতের আনন্দপসারীর দল। শীতলের বয়সী কত ছেলেমেয়ে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী সুন্দর তাদের চেহারা, কী বিচিত্র তাদের পোষাক! ঝগড়া নেই, গোলমাল শোনা যাচ্ছে না, সকলের হাসিমুখে প্রভাতের স্নিগ্ধতা মাখানো—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গেল শীতল। সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। এ জগতে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র পাওয়া যায় কোথায়?

অজানা আনন্দের ঢেউ তার গায়ে এসে লাগছে। অকারণে শিউরে উঠছে সারা গা। বাতাসে আজ কী মাদকতা। তার শ্বাসপ্রশ্বাস এখন বইছে কত সহজভাবে। শীতল ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিল। শুধু পিঠটা দপ্‌দপ করছে এখনও।

গাড়ির পর গাড়ি তেমনি আসছে যাচ্ছে। উল্কার মত তাদের আলো পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গায়ে। তাদের গতিপথে যা-কিছু বাধা সরে যাচ্ছে ঝরাপাতার মত। তন্দ্রার ঘোরে শীতল অনুভব করছে তাদের বেগ, একটার পর একটা তার গা ঘেঁসে ঝড়ের মত বেড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে ক্ষীণ অনুভব করল কী একটা বিরাট চাপ তার পিঠের ওপর। অস্পষ্ট একটা ঘরঘর আওয়াজ শুধু বেড়িয়ে গেল তার গলা দিয়ে। একটা মোটর পথহারা হওয়াতে এক নিমেষে ঘটে গেল এই সামান্য একটা ঘটনা। শুধু কচি প্রাণের তাজা রক্তে গেটের সামনে লাল কাঁকড় আরও লাল হয়ে গেল। মোটরখানা ঠিক তার পিঠের ওপর দিয়েই চলে গিয়েছে।

সে-রাতে ভিখারী কলোনী স্তব্ধতায় ভরা। শব্দ নেই, কোন সঙ্কেত নেই। গাছের পাতা থেকে শুধু ঝরে পড়ছে হিমাক্ত শিশির বিন্দু বিন্দু করে। টুপটাপ শব্দে চমকে উঠছে শীতলের মা। সে আসবে এখুনি, চঞ্চল পা টিপে টিপে। কী দুষ্টুই না ছিল ছেলেটা! এখনও সারে নি সে দুষ্টুমি। শীতলের বাবা বলত, ডাকাত হবে তোমার ছেলে।

অতীতের দু-একটা স্মৃতির টুকরো আজ মার মনে ধাক্কা দিচ্ছে। শহরের সেই গলির মধ্যে বাসাবাড়ি শীতলের জন্ম, একটানা দুঃখের জীবন অফিসের টাকাচুরির অপরাধে শীতলের বাবার কারাদণ্ড, জেলের মধ্যেই তার মৃত্যু। ভিখারীসমাজে তাদের স্থান কবে হ'ল আজ সেকথা সে ভাল করে স্মরণ করতে পারছে না। আজকের ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে সেদিনের সঙ্কোচ নেই একটুও। অনাদিকালের ভিখারী তারা—মা ও ছেলে। ছেলেট দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু। আর তার এই কাশি দলা দলা রক্ত ওঠে, বুকটা যেন খালি হয়ে যায়। ভিক্ষান্নে ক্ষুধা মেটে না সবদিন, ছেলেটাকেও হয়ত ধরবে এই কাল রোগে।

কৃষ্ণপক্ষের সরু চাঁদ ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। বাইরে শোনা যায় কার পায়ের শব্দ। এই বুঝি শীতল এল। মা উঠল। অনেক খাবার এনেছে নিশ্চয়। তাই এত দেরী হ'ল। —না, কিছু না। ঘেয়ো কুকুরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সেখানেই বসে পড়ল। নিশুরাও ফেরে নি এখনও। ভোজের

(শেষাংশ ৬০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অন্নের অনটন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণার অন্নক্ষেত্রে অন্নের নিমিত্ত হাহাকার পড়িয়াছে। ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরার মধ্যে সকল দেশের সেরা, সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙলা দেশের বুকে জল, ফল এবং শস্যের অভাব নাই। তথাপি এই প্রচুর খাদ্য-পেয় প্রসবিনী সোনার বাঙলার অধিবাসীবৃন্দ আজ অন্নাভাবে শীর্ণ এবং বস্ত্রাভাবে অর্ধোলঙ্গ। ইহার কারণ কি?

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইহার নিমিত্ত দায়ী নহে। এই দুঃখ-দুর্দশার নিমিত্ত দায়ী বর্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-সম্ভূত জটিল ও কুটিল পরিস্থিতি এবং তদনুষঙ্গে সরকারের দূরদৃষ্টির অভাব এবং অবিমৃষ্যকারিতা। বিগত মহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের শোচনীয় পরাজয়ের মূলীভূত কারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ, যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভে, অচিরে অবশ্যম্ভাবী আহার্য ও ব্যবহার্যের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যুদ্ধ প্রয়োজনে যুদ্ধোপকরণ এবং যুদ্ধযাত্রীদিগের আহার্য ও ব্যবহার্য সম্পর্কে সরকার যেরূপ অখণ্ড মনোযোগ এবং অপূর্ব কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে অবস্থিত, যুদ্ধ-পরিচালনা কৃতিত্বের প্রধান সহায় ও সম্পদ জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ ও কার্যকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। এমন অতর্কিতে যুদ্ধ বিঘোষিত হইয়াছিল এবং এরূপ শিথিল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে পুঞ্জপ্রমাণ অভাব-অনটন অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষণে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল যে, যুদ্ধোপকরণ এবং যোদ্ধা প্রস্তুত করিতেই সরকারের সর্বশক্তি নিঃশোষিত হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধ-প্রয়োজন ব্যতীত বর্তমানের তাগিদ অতিক্রম করিয়া অদূরভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী অভাব-অভিযোগের প্রতি মনোযোগ দিবার মত মনোবৃত্তির একান্ত নিশ্চেষ্টতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার ইহা নিদর্শন নহে।

যুদ্ধ-প্রয়োজনে সমস্ত ধনিক শ্রমিক ও বণিককে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ-শিল্পে নিযুক্ত করিলে যুদ্ধ পরিধির বহির্ভূত প্রজামণ্ডলীর আহার্য ও ব্যবহার্যের ক্রমবর্ধমান অভাব-অনটন যে অপরিহার্য এবং তৎপ্রতিকারে যথাসময়ে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে যে প্রকৃতিপুঞ্জের সাহস ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায় না, বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রনেতৃগণের তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রগাঢ় ও প্রযত্নশীল প্রচেষ্টা অতীব প্রয়োজন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভ হইতেই, যোদ্ধৃবর্গের সহিত যুদ্ধ-শিল্পে নিযুক্ত এবং সাধারণ জনমণ্ডলীর আহার্য ও ব্যবহার্যের উপযুক্ত সরবরাহের প্রতি রাষ্ট্রনায়কদিগের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিভিন্ন। স্বাধীন দেশের জাতীয় ব্যবস্থার সহিত পরাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবশ্য তুলনা হইতে পারে না।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, প্রাচ্য-ভূখণ্ডের আসন্ন সমর সম্ভাবনা এবং আগষ্ট মাসে জনগণের বৈরিতা সম্পর্কে ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তথাপি ভারত সরকার এবং বাঙলা সরকার প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের অভিঘাতে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে তাহার বিষম ফল কিরূপে প্রকটিত হইবে তদ্বিষয়ে উপযুক্ত চেষ্টা ও যত্ন অবলম্বন করেন নাই। ভারত সরকারের শৈথিল্য হেতু বাঙলা সরকার মালয়-বর্মা প্রভৃতি দেশের আসন্ন বিপদ এবং তাহাদের পতনের ফলে, ভারতের খাদ্য সমস্যা কিরূপ জটিল ও কুটিল পরিস্থিতি অবলম্বন করিবে তদ্বিষয়ে যথাযথ সংবাদ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। অধিকন্তু ভারত সরকারের উপদেশ অনুযায়ী বাঙলা সরকারকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের সরকারী সঞ্চয় এবং অতর্কিতে আগমনে শত্রু যাহাতে চাউলের অধিকার না পায় তদ্বিষয়ে বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। বাঙলা সরকার গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া প্রচুর চাউল অসঙ্গত মূল্যে ক্রয় করেন এবং সমস্ত চাউল প্রদেশের পরিধির বাহিরে প্রেরণ করেন। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে নৌকা চলাচল বন্ধ করিয়া কেবল চাউল নহে সর্বপ্রকার খাদ্য-সামগ্রীর গতাগতি রোধ করেন। কূট-কৌশলী শত্রু কোন সুযোগে দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য কিংবা যাতায়াত সম্পর্কে কোন প্রকার সুবিধা যাহাতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিরোধ করিয়া খাদ্য-সংকটের সৃষ্টি করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন বর্মা হইতে চাউলের আমদানী রুদ্ধ হয় তখনও বাঙলা সরকার আসন্ন অবশ্যম্ভাবী সংকটের প্রতিকারকল্পে কোন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচিন্তিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। পরন্তু, সামরিক প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমাণ চাউলের রপ্তানি হয় এবং আমাদের নিকট প্রতিবেশী সিংহলের সাহায্যার্থেও প্রচুর পরিমাণে চাউল প্রেরিত হয়।

বাঙলায় উৎপন্ন চাউল বাঙলার অধিবাসীদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই অভাব তীক্ষ্ণরূপে অনুভূত হয়। গত চল্লিশ বৎসরে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার ফলে জানা যায় যে, প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যার নিবিড়তা (density) ছিল ৫৪৮। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রতি বর্গ মাইলের নিবিড়তা হইয়াছিল ৭৪০। অর্থাৎ চল্লিশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল প্রতি বর্গ মাইলে দুই শত পরিমাণে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় চাউলের গড়-উৎপাদন ছিল সাড়ে চল্লিশ কোটি মণ। গত চল্লিশ বৎসরে বাঙলায় গড়-উৎপাদন দাঁড়াইয়াছে প্রায় পঁচিশ কোটি মণ। কিন্তু বর্তমানে অন্নরূপে ব্যবহৃত চাউলের পরিমাণ মাত্র উনিশ কোটি মণ। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে হিসাব করিলে অন্নরূপে ব্যবহৃত চাউলের বাৎসরিক ঘাটতির সমষ্টি দাঁড়ায় সাড়ে তিন কোটি মণে। চিড়া ও মুড়ি এবং বীজের নিমিত্ত নির্দিষ্ট চাউলের পরিমাণ যোগ করিলে বাঙলায় চাউলের ঘাটতি দাঁড়ায় সাড়ে ছয় কোটি মণে। ব্রহ্ম, শ্যাম (বর্তমান থাইল্যাণ্ড) এবং জাভা হইতে আনীত তণ্ডুলের দ্বারা এই অভাব পূরণ হইত বলিয়া বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী এবং কৃষি-বিভাগ বাঙলায় ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কিংবা তাহার উৎকর্ষ সাধনার্থ কোন প্রচেষ্টাই অবলম্বন করেন নাই। বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিধানের প্রতি অবশ্য কৃষি-বিভাগের শিক্ষকসুলভ প্রচারমূলক প্রচেষ্টার অভাব ছিল না, কিন্তু চাহিদার প্রয়োজনে উপযুক্ত স্বাবলম্বী সরবরাহের কোন কার্যকরী পরিকল্পনাপূর্ব প্রযত্নশীল প্রচেষ্টা ছিল না। খাদ্যশস্যের প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন হেতু কোন নির্ধারিত নীতি ছিল না; সুতরাং কোন নূতন রীতি প্রবর্তনের প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই। কর্ষণযোগ্য ভূমি বৃদ্ধি কিংবা পতিত জমির উদ্ধার সাধন দূরে থাকুক, সদ্য অর্থপ্রদায়িনী পাটের ফসলের নানা কারণে অযথা বৃদ্ধি হেতু খাদ্যশস্যপ্রদ উর্বরা ভূমির আয়তনে ক্রম-সঙ্কীর্ণতা ঘটে।

আমাদের দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

বিষয়ে সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ ও সংকলনের কোন সুব্যবস্থা নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞানের অনুশীলন আজ কয়েক বৎসর মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন, ব্যয়, ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং আনুমানিক সংখ্যা-সংকলন ব্যাপারে যে সরকারী ও বে-সরকারী হিসাবনিকাশের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। খাদ্যশস্য সম্বন্ধে সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগের কার্যাধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল উড যে সংখ্যা-সমষ্টি প্রকট করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই আমরা সঠিক তথ্য সম্বন্ধে যে কত অসহায়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাঙলায় চাউলের বাৎসরিক গড়-উৎপাদন ছিল ৮১·৮১ লক্ষ টন (১ টন=২৭ মণ)। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন ৬৯·১৬ লক্ষ টন। ইহার সহিত পূর্ব বৎসরের আনুমানিক উদ্বৃত্ত দুই লক্ষ টন যোগ করিলে মোট চাউল হয় ৭১·১৬ লক্ষ টন। সুতরাং বর্তমান বৎসরের ঘাটতি ১০·৬৫ লক্ষ টন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ৩·৫০ লক্ষ টন চাউল বাঙলাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব সরকারী হিসাব অনুযায়ী বাঙলায় বর্তমান বর্ষে চাউলের পরিমাণ পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড়ের তুলনায় ৮৪·৬৬ লক্ষ টন অর্থাৎ ৮৪·৬৬—৮১·৮১=২·৮৫ লক্ষ টন অধিক। চাউল ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার ১·২৭ লক্ষ টন গম ও ·১১ লক্ষ টন ছোলা দিতে প্রতিশ্রুত। সুতরাং সরকারী হিসাবে বর্তমান বর্ষে বাঙলায় মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৮৪·৬৬+১·২৭+·১১=৮৬·০৪ লক্ষ টন, অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৫ লক্ষ টন বেশী।

কিন্তু আমরা জানি বাঙলায় যুদ্ধ-পূর্ব তণ্ডুলোৎপাদনের বাৎসরিক গড় ছিল ১০২·১৭ টন অর্থাৎ মেজর-জেনারেল উডের ৮১·৮১ লক্ষ টনের তুলনায় ২০·৩৬ লক্ষ টন অধিক। বাঙলার নিজস্ব উৎপাদন ব্যতীত আমরা প্রতি বৎসর বর্মা হইতে আমদানী করিতাম দুই লক্ষ টন। অর্থাৎ আমাদের মোট প্রার্থনীয় চাউলের সমষ্টি ছিল ১০২·১৭+২·০০=১০৪·১৭ লক্ষ টন। সুতরাং বর্তমান বর্ষের উৎপাদন ৬৯·১৬ লক্ষ টনের তুলনায় আমাদের ঘাটতি ১০২·১৭—৬৯·১৬=৩৫·০১ লক্ষ টন! যুদ্ধ-পূর্বে বর্মা হইতে পলাতক এবং অতিরিক্ত যোদ্ধৃবর্গের কোন সমস্যা ছিল না। তথাপি আমরা ঐ সময়ে সাধারণত ২·৭০ লক্ষ টন গম এবং ১·০৬ লক্ষ টন ছোলা আমদানী করিতাম। সুতরাং আমাদের মোট খাদ্য-দানার সমষ্টি ছিল ১০২·১৭ + ২·০০ + ২·৭০ + ১·০৬—১০৭·৯৩। অতএব আমাদের ঘাটতি ১০৭·৯৩—৬৯·১৬=৩৮·৭৭ লক্ষ টন। এই ঘাটতির অর্থ, বাঙলায় দুই কোটি লোকের খাদ্যাভাব! অর্থাৎ বাঙলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোকের অনশন! এই শোচনীয় সংকটজনক অবস্থায় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত ২·৮৪ লক্ষ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রেল ও নদীপথে যে কত চাউল বাঙলা হইতে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। এই রপ্তানির অংক বাঙলার বাণিজ্য-সচিব বাঙলার ব্যবস্থা-পরিষদে প্রদান করেন। কিন্তু মেজর-জেনারেল উডের উক্তি এই যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি হইয়াছে মাত্র ৪৮,৪৮০ টন এবং তাহারও অধিকাংশ বাঙলায় উৎপন্ন নহে। উড সাহেব আরও বলেন যে, সামরিক প্রয়োজনে ঐ সময়ে ক্রয় করা হইয়াছিল মাত্র ৭০০০ টন। শত্রু-কবল হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে "অস্বীকার" (denial) নীতি অনুযায়ী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৩০,০০০ টন চাউল ক্রীত হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে ২৭,৪০০ টন বাঙলার অ-সামরিক লোকদিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল, ২৫০০ টন সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল এবং মাত্র ১০০ টন পচিয়া নষ্ট হইয়াছিল। অংকের ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ না হইয়া সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রশ্ন করিবে খাদ্যশস্যের যথার্থ অভাব না ঘটিলে হৃদয়হীন অর্থগৃধ্নু অতিলোভী ব্যবসায়ী কিংবা ভাবী অভাবের আতঙ্কগ্রস্ত সাবধানী গৃহস্থ ও কৃষক গুপ্তসঞ্চয় করিবে কেন? চাউল ধ্বংসশীল খাদ্য-দানা। অধিক দিন গুপ্ত রাখিলে তাহার গুণের ও পরিমাণের বিষম ক্ষতি ঘটে। তদ্ব্যতীত গুপ্তসঞ্চয়ের সাহসের কথা ত্যাগ করিলেও তদুপযুক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ এবং উপযুক্ত স্থান কয়জন সংগ্রহ করিতে পারে?

সাধারণ গৃহস্থ কিংবা উৎপাদক কৃষকের সঞ্চয় কখনও অত্যধিক হইতে পারে না। তবে মধ্যবর্তী অতিলোভী ব্যবসায়ীদিগের প্রকাশ্য অপেক্ষা গুপ্তসঞ্চয়ই বোধ হয় অধিক। মূল্য কিংবা মাল চলাচলের শাসন পরিহার করিবার পূর্বে সরকারের কর্তব্য ছিল, সর্বত্র মজুত মালের পরিমাণ নির্ণয় করা। তাহা না করিয়া তাহার বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবার ফল হইয়াছে এই যে, ইতিমধ্যে বহু মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী এবং কলকারখানা প্রভৃতির শ্রমজীবী-প্রতিপালক মালিকেরা যদৃচ্ছা মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্তমানে গুপ্তসঞ্চয়ের বিরুদ্ধে সরকার যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার এবং মজুত মালের সমষ্টি নির্ণয়ের পরিণামে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি মজুত মাল চাহিদা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে প্রদেশান্তর হইতে এবং সম্ভবমত বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে হইবে এবং বিধিসঙ্গত এবং ন্যায়-সঙ্গত বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মজুত মাল চাহিদার সঙ্কুল যদি হয় তাহা হইলেও যুক্তিসঙ্গত বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বণ্টনের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থার সাহায্যেই অন্যান্য শক্তি-সামর্থ্যশালী দেশ-সকলও এই নিদারুণ যুদ্ধ-সঙ্কটে জন-সাধারণের আহার্য ও ব্যবহার্যের সম্ভবমত ব্যবস্থা করিতে কৃতকার্য হইয়াছে। বর্তমান সর্বসমন্বিত (Totalitarian) যুদ্ধে, সামরিক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ন্যায়, দেশাভ্যন্তরে তাহাদের দৃঢ় অবলম্বন অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ, পরিচ্ছদ সরবরাহকারী জনসাধারণের আহার্য ও ব্যবহার্যের নিয়মিত সরবরাহ প্রয়োজন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অসীম সাহস এবং বীরত্ব প্রয়োজন, গৃহক্ষেত্রেও তেমনি জনসাধারণের সন্তোষ ও অক্ষুণ্ণ সমর্থন আবশ্যক। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র সর্বপ্রকার কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থার অনুকূল। পরাধীন ভারতে পরমুখাপেক্ষী, সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কলুষিত ক্ষীণবল ও হীনবুদ্ধি-মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে কঠোর ও কঠিন ব্যবস্থা দূরে থাকুক, জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইলেও সর্বক্ষেত্রে সমীচীন ব্যবস্থার প্রবর্তনও অসম্ভব। তথাপি ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত হিংসা, দ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি পরিবর্জন করিয়া "বহু জন-হিতায়" যুদ্ধ জয় ও দেশের স্থায়ী কল্যাণ সম্পাদনার্থ প্রযত্নশীল প্রচেষ্টার প্রয়োজন; এবং সে প্রয়োজন মাত্র বর্তমানে নিবদ্ধ হইলে চলিবে না।

বর্তমানের প্রচণ্ড অভাব-অভিযোগের যথাসম্ভব প্রতিকার করিয়া ভবিষ্যৎ দুঃখ দুর্দশার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার নিমিত্ত এখন হইতে উপযুক্ত বিধি-বিধা অবলম্বন করিতে হইবে। অদূর এবং সুদূ ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের এইরূ অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব না ঘটে তাহার শ্রে উপায় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে সদ্য অর্থপ্রদ ফসলের যথাযোগ্য সংক্ষে সাধনপূর্বক অধিকতর খাদ্যশস্যের উ পাদনে প্রয়াসশীল হইতে হইবে। বাঙল সাধারণত ২৬।২৭ কোটি মণ চাউল জন্ম কিন্তু গত বৎসর কিছু কম পৌনে ২ কোটি মণ চাউল জন্মিয়াছিল। ছয় কো বাঙালীর জন্য অন্তত ত্রিশ কোটি মণ চা প্রয়োজন। সম্প্রতি একজন বিশেষজ্ঞ হি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এবার বাঙ

৯৪ লক্ষ টন, অর্থাৎ প্রায় ২৬ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। সুতরাং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিমিত্ত অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন অভিযানের (Grow more food compaign) দ্রুত প্রসার আবশ্যক। চাউল ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। এই নিমিত্ত ভারতের কর্ষিত ভূমির এক-তৃতীয়াংশে ধান্যের চাষ হয়। কৃষিপ্রধান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিসমৃদ্ধ প্রদেশ বাঙলা। ইহার উৎকৃষ্ট পলিমাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও নদী-বাহুল্যের জন্য এই প্রদেশে যত ধানের চাষ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এত হয় না। ধানের পরে পাটের স্থান। আসাম ও বিহার প্রদেশের সামান্য অংশ বাদ দিলে পৃথিবীতে বঙ্গদেশই পাটের একমাত্র উৎপত্তি স্থল। পাট সদ্য অর্থপ্রদ ফসল (Cash Crop) এবং পাট-শিল্পই বাঙলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। বিদেশী বণিকেরা পাটের চাষ ও পাট-শিল্পে মাতোয়ারা। ফলে পাট চাষের প্রসারতার সহিত বঙ্গদেশে ধান্য এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষের প্রভূত অনিষ্টদায়ক সঙ্কোচ ঘটিয়াছে এবং আমরা চাউলের নিমিত্ত বর্মা, শ্যাম ও জাভা প্রভৃতি দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া ছিলাম।

অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কর্ষিত ভূমিতে ধান্যের চাষের যে সঙ্কোচ ঘটিয়াছে, তাহার প্রসারণ করিতে হইবে এবং অকর্ষিত জমির কর্ষণ ও পতিত জমির উদ্ধার সাধনপূর্বক তাহাতে ধান্যের এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের ফসল ফলাইতে হইবে। এখনও বঙ্গদেশে ও তথা ভারতবর্ষে অনেক ভূমি অকর্ষিত ও পতিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নের অংক তালিকা হইতে প্রত্যেকের আয়তন বোধগম্য হইবে।

(ভূমির পরিমাণ লক্ষ একরে ১ একর=৩ বিঘা ৫ কাঠা)

	নিট্ উপ্ত	বর্তমানে পতিত
বাঙলা	২৪৭.২৮	৪৬.৪০
বৃটিশ ভারত	২১৩৪.৯৩	৪৫৩.৯৩

	কর্ষণোপযোগী অন্যান্য পোড়ো	চাষের জন্য প্রাপ্তব্য নহে	অরণ্য
বাঙলা	[illegible]২.৫৮	৯৬.৪৯	৪৪.৮২
বৃটিশ ভারত	১৯.৬৮	৯২৪.৪১	৬৮০.০১

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙলায় তথা বৃটিশ ভারতে এখনও প্রচুর পোড়ো ও পতিত জমি আছে, যেখানে আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা করিলে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে পারা যায়। ১৯২৮-২৯ এবং ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে কি পরিমাণ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯২৮-২৯ একর (লক্ষ)	১৯৩৭-৩৮ একর (লক্ষ)
ধান্য	৮১১·৩১	৬৯৪·৫৫
গোধূম	২৪৯·২৫	২৬৬·৩২
যব	৭৫·৩২	৬৩·১১
জোয়ার	২০৫·৩৪	২০৭·০১
বজরা	১২৯·৫১	১২৪·৯৭
রাগি	৩৯·০৩	৩৪·৭৫
ভূট্টা	৬০·১২	৫৬·৩৩
ছোলা	১৩৬·২৫	১৩৬·৬১
ডাইল প্রভৃতি	২৯৬·৫১	২৮৩·৯২
মোট	২০০২·৬৮	১৮৬৭·৬১

বাঙলায় ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ধান্যের উৎপত্তি হইয়াছিল ৯০·৩৭ লক্ষ টন, অর্থাৎ ২৪·৩৯ কোটি মণ। এই ধান্য হইতে যে চাউল জন্মিয়াছিল, তাহা দুই-তৃতীয়াংশের অধিক নহে, সুতরাং প্রয়োজন অপেক্ষা বহুলাংশে কম। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে চাউল জন্মিয়াছিল ২৬·৭ লক্ষ টন, অর্থাৎ ৭২ কোটি মণ। তৎপূর্ব বৎসরের, অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি মণ। ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে মোট চাউলের পরিমাণ ছিল ৮৬·৮ কোটি মণ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের প্রধান খাদ্য-শস্য চাউলের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে। কেবল যে আমাদের দেশে এইরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে, যুদ্ধের অভিঘাতে সর্বদেশে যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের নিমিত্ত কৃষি-শিল্পের প্রভূত সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। অপরিসীম লোকক্ষয় সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব-অনটন অনুভূত হইতেছে। এই নিমিত্ত সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চুয়াল্লিশটি সম্মিলিত জাতির একটি খাদ্য-বৈঠক (food conference) বসিয়াছিল। যুদ্ধান্তে সর্ব-জাতির খাদ্যাভাব বিদূরণ এবং প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের অবাধ যোগান এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল। এই বৈঠকে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে অধিকতর এবং সুপ্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদনের সর্ববিধ বিজ্ঞানসম্মত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কৃষিপ্রধান হইলেও অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় ভারত আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রয়োগে পশ্চাৎপদ। ভারতের কৃষক-কুল অশিক্ষিত এবং অতি দরিদ্র। যাহারা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, প্রয়োজনের তাগিদে বীজ ধান্যও খাইয়া ফেলে, তাহাদের পক্ষে ব্যয়সাধ্য বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগে কৃষিকার্য আকাশকুসুমের কল্পনার ন্যায় অসম্ভব। উন্নত প্রণালীতে ক্ষেত্র কর্ষণ কিংবা সার প্রদান তাহার অর্থ ও সামর্থ্যের বহির্ভূত। উত্তরাধিকার আইন প্রথার ফলে জোত জমিগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশে বিখণ্ডিত। সমবায় প্রথা ব্যতীত বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য অসম্ভব। তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা এবং সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু এতাবৎকাল সরকারী কৃষি-বিভাগ কাগজে-কলমে বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং দুটি একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োগ-পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র (Experimental farms) ব্যতীত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কোন কৃতিত্বই প্রদর্শন করেন নাই। কৃষিজ উৎপাদনের দ্রুত উন্নতি ও প্রসারের সহিত ভারতের পল্লীজীবনের ও কৃষককুলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সহায়-সম্পদের ক্রমোন্নতি ব্যতীত ভারতের অন্নাভাব ও অর্থাভাব বিদূরণ অসম্ভব। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের বর্তমান বড়লাট লিনলিথগোর নেতৃত্বে যে রাজকীয় কৃষি তদন্ত সমিতি ভারতে দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলে সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেও এইরূপ দৃঢ় সুপারিশ ছিল।

জগতের কৃষিজ পণ্য বিপণিতে ভারতের কৃষিজ উৎপাদনের বিশিষ্ট স্থান। নিখিল কৃষিজ উৎপাদনের বিশিষ্ট স্থান। নিখিল জগতের সমস্ত পাট শতকরা ৬০ অংশ চা শতকরা ৫০ অংশ তৈলবীজ শতকরা ২৫ অংশ তুলা ভারত সরবরাহ করে। এই মর্যাদার তুলনায় ভারতের কৃষকের দুরবস্থা শোচনীয়। কিন্তু ভারতের উন্নতি যে কেবলমাত্র কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিবে, তাহা সমীচীন নহে। যেমন অন্যান্য দেশে তেমনি ভারতেও বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা অন্তর্বাণিজ্যের দাবী সর্বাধিক প্রবল—বিশেষত কাঁচা মালে। ভারতের অভ্যন্তরে কৃষিজ পণ্য, বিশেষত খাদ্যশস্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং তাহার সরবরাহও তদনুরূপ হইবে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ হইতেছে না এবং যুদ্ধের অভিঘাতে গত তিন বৎসর তাহার সমূহ ক্ষতি ঘটিতেছে। খাদ্য এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বহু ব্যক্তি পুনঃপুনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের অধিকাংশ লোক উপযুক্ত আহার্য পায় না এবং যথেষ্ট পরিমাণ ধান্য গোধূমাদির অভাবে তাহাদের জীবনীশক্তি ও কার্যকুশলতা ক্ষীণ। সুতরাং রপ্তানি বাণিজ্য খর্ব করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারত অতি বিশাল ও বিস্তৃত দেশ। তাহার বিপুল কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র হইতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। এইরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানের ব্যয় বিপুল এবং

(শেষাংশ ৬০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সে যে আমি, সে-ই আমি

শ্রীহাসিরাশি দেবী

শিমুলপুরের হাট ফেরৎ চন্দোর বৈরাগী যেদিন ওর তিপ্পান্ন বছরের জরাগ্রস্ত **দেহের কাঁধে প্রায় পাঁচিশ** সের বোঝা বয়ে **অতি কষ্টে** বাড়ি ফিরছিল, সেদিন **ঝড়জলের** রাত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ **চমকাচ্ছিল; সেই** বিদ্যুতের আলোয় **পথের** পাশে সাদা মত কি একটা পড়ে থাকতে দেখে সে চমকে উঠলো: জিজ্ঞাসা করলেঃ—"ওখানে কে ও?"

যে ছিল, সে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উত্তর দিলেঃ—

"আমি, আমি গো—"

নারী কণ্ঠ।

নির্জন গ্রামান্তরের পথ কোন প্রান্তরে বিলীন হ'য়ে গেছে. এ পাশে ও পাশে লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই: এখানে এ সময় নারীকণ্ঠের উত্তরে চন্দোর সন্দেহাকুল হ'য়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলে আবার :—

—"বলি আসছো ক'থেকে? এত রাত্তিরে যাবেই বা কোথায় শুনি?"

এবার নারী মূর্তি তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো :—

"আসছি অনেক দূরে থেকে কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই; তুমি যেই হও, আমায় একটু জায়গা দিয়ে বাঁচাও. নইলে মরবো, তোমার পায়েই আজ মাথা কুটে মরবো।"

চন্দোর সত্রাসে দু'পা পেছিয়ে গেল: কী সর্বনাশ! নারীহত্যা; রাধে গোবিন্দ! রাধে গোবিন্দ! একটু ইতঃস্তত ক'রে চন্দোর বললে :—

"তুমি তো মেয়েছেলে দেখছি কিন্তু আমার ঘরে তো মেয়েলোক কেউ নেই—"

মেয়েটি এ কথায় প্রতিবাদ করলে না: বিদ্যুতের আলোতেই দেখা গেল সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সম্মুখের জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চন্দোর আর একবার বলতে গেল :—

"তাই তো—"

কণ্ঠস্বরের শেষ সুরটুকু তার কেঁপে গেল সজল হাওয়ায়, শস্যশূন্য মাঠের ওপোর দিয়ে শুকনোঝরা পাতার মর্মর ধ্বনি ভেসে এলো কোন বনস্পতির কাতর আর্তনাদের মত...........।

চন্দোর ব'ললেঃ—

বেশ, তবে চলো।.....

একখানি ঘর, তাও গোলপাতায় ছাওয়া। তার মাটির দেওয়ালের খানিকটা অংশ আবার ভেঙে প'ড়েছে কবে কোন দিনের বর্ষায়. তার জায়গায় জোড়াতাড়াভাবে তালি দেওয়া হয়েছে ছ্যাঁচার বেড়ার।.....

সেই বেড়ার দরোজার চাবী খুলে,— হাতড়ে হাতড়ে চন্দোর আলো জ্বাললে— ধূম্র ধূসর হ্যারিকেনে।.....সেই হ্যারিকেনের আলোয় চন্দোর দেখলে, যে এসেছে সর্বাঙ্গে তার মলিনতার ছায়া জড়িয়ে থাকলেও সে সুন্দরী। কৈশোর শেষের লাবণ্য তার দেহের কানায় কানায় উপছে প'ড়ছে। বড় বড় চোখ দুটো মেলে সে মুখের দিকে তাকাতে আজ এই তিপ্পান্ন বছর বয়সেও চন্দোর শিউরে উঠলো যেন কবে কোন গত বসন্তের বর্ষাকে স্মরণ ক'রে। কবে কোন পথে ঢাকা ধূলোর বিবর্ণতা আজ হঠাৎ কালবৈশাখীর হাওয়ায় পড়ে উড়ে যেতেই চোখে পড়লো তার এতটুকু হরিৎ বর্ণ. ভেসে এলো সেই ঝরা-বকুলের একটু গন্ধ!......

চন্দোর স্মরণ ক'রলে :—......

শ্রীরাধে গোবিন্দ......শ্রীরাধে গোবিন্দ!

রাত্রের অন্ধকারে আবার তার বহু দিনের একতারাটা বেজে উঠলো:—কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠলো......

কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই,
ধবলী চরাই মুই,
আমি তোমার প্রেমের কিবা জানি
রাখাল বইতো নই।

রাধে.......

যে এসেছিল,—তার হারানো নাম— মীরা। অনেক আশায় অনেক কল্পনার স্বপ্ন দেখেই অভিভাবিকা বিদ্যুৎ তাকে দিয়েছিল একটী মেয়ে স্কুলে: বোর্ডিংয়ে থেকেই তার শিক্ষা এগিয়ে চ'লেছিল জ্ঞান হওয়া অবধি।

কয়েক বছর পরে হঠাৎ তাই একদিন মীরাকে বোর্ডিং থেকে নাম কাটিয়ে ফিরতে দেখে বিদ্যুৎ আশ্চর্য হ'য়ে হ'য়ে গেল; জিজ্ঞাসা করলেঃ—

"তুমি যে,—হঠাৎ?

মীরার উত্তর দেবার আগে উত্তর দিয়ে এগিয়ে এলো একটি প্রিয়দর্শন যুবক।

সর্বাঙ্গে তার আভিজাত্যের পরিচয়—।

জানালে—সে-ই বিবাহ করতে চায় মীরাকে, তাই প্রার্থনা করতে এসেছে শুধু বিদ্যুতের অনুমতি,—আর কিছু নয়।.....

ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেঙে গেল বিদ্যুতের

অতীত জীবনকে ঘিরে যেটুকু অভাব, যতটুকু অতৃপ্তি তাকে আজও পীড়া দিত.—সে যেন তার প্রতিশোধ নিতে চায় তারই মত আর একটি নারী জীবনের উপর দিয়ে।...তাই তার ভবিষ্যতের সমস্ত উৎসব সমস্ত সমারোহ ধূলিস্মাৎ হতেই সে যেন ফেটে পড়লো বোমার মত; কিন্তু চীৎকার ক'রলে না,—নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেঃ—

বটে! কিন্তু—পৃথিবীতে আসা ত ওর সংসারের কল্যাণ করতে নয়,—সংসারকে নিয়েই সর্বনাশের খেলা খেলতে ওর জন্ম।

যে কল্পনাকে রঙীন আশায় এ'কে একটি নূতন জীবন এসেছিল সংসারপথের যাত্রী হ'তে. সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল আর সেই দিনই রাত্রের অন্ধকারে মুখ ঢেকে মীরা করলে বিদ্যুতের গৃহত্যাগ।......

আর তার খোঁজে বিদ্যুৎ দিলে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন!......

পুরস্কার ঘোষণা করলে—নগদ পাঁচ শো টাকা।...

সেই মীরাই আজ হ'য়ে উঠেছে চন্দোর বৈরাগীর ঘরের পদ্ম।

আবার যেন মন জড়াতে চায় নূতন ক'রে এই সংসারের সীমায়.—ঐ নিজের ও পরের হিসাবনিকাশের কড়াক্রান্তি ভাগবখরা করতে' তাই চন্দোরও বসেছিল কতকগুলো বাঁশ বাখারী আর [illegible] কাটরী নিয়ে বেড়া দিতে।

নিজের মনে বেড়া দেওয়া শেষ ক'রে ডাকলেঃ—

পদ্ম ও পদ্ম—

পদ্ম বোধ হয় ঘাটেই গিয়েছিল, জল আনতে।

জলের কলসীটাকে দাওয়ায় নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেঃ—

"এমন হাঁকাহাঁকি বাধিয়েছ যে, তিন-খানা গাঁয়ের লোক জড়ো হ'তে পারে; ব্যাপার কি বলো তো!"......

চালের খড়ে এসে পড়া রৌদ্রের ঔজ্জ্বল-তার দিকে, আঙুল বাড়িয়ে চন্দোর বললে, "বেলা কি রকম বেড়ে চলেছে দেখেছ,? আবার বাজারে যেতে হবে তো!"

"বাজারে যেতে হয়,—যাও না।"

চন্দোর যেন আকাশ থেকে পড়লো—

"বা-রে! বাজার থেকে কি আনবো, তা বলবে না?"

পদ্ম হাসলো।

"আশ্চর্যের মানুষ তুমি বৈরাগী; আমি যখন না ছিলাম, তখন তুমি কি বাজার করতে না?"

চন্দোর হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লো; পদ্মর দিকে তাকিয়ে মনে হলো—এমন সুন্দরী মেয়ে বোধ হয় সে ঐ বাবুদের বাড়ি ছাড়া আর জীবনে দেখে নি।

চন্দোর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পদ্মর কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটি টিপ! স্নান করার পর ভিজে চুলগুলো পিঠে, কাঁধে লুটোপুটি খাচ্ছে অনাদরে, অবহেলায়। মুখে ওর রহস্যময় হাসি, চোখে অজানা আলো। পদ্মর নীচের হাতে দুটো রবারের লাল রুলি' তাকিয়ে তাকিয়ে চন্দোরের মনে হলো, রুলি দুটো পদ্মর হাতে ঠিক মানাচ্ছে না; দু'গাছা চাঁদির যব-দানা না হয় দু'গাছা নারকেল ফুল, আর কানে দুটো পাশ-মাকড়ী হ'লে যেন দেখতে আরো ভালো দেখায়।

এবার সে তাই গড়াতে দেবে মানিক স্যাকরার কাছে; তা সে ধার করেই হোক আর কিছু বন্ধক-বিক্রী করেই হোক।

চন্দোরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পদ্ম এবার উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠলো; বললে,—"অমন ক'রে তাকিয়ে দেখছো কি, শুনি।"

থেমে থেমে চন্দোর বললে,—"ভাবছি তোমায় তো আমার এ কুঁড়ে ঘরে মানায় না পদ্ম, মানায় রাজার ঘরে।"

"তবে তাই দিয়ে এসো, আর নয়— মালাবদল করে ঘরে রাখো; তোমাদের বোষ্টমের ঘরে তো সে ব্যবস্থা একচেটে।"

ও আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো, কিন্তু চমকে উঠলো চন্দোর। মনের কোন একটী গোপন তারে অতর্কিতে একটা ভীষণ ধাক্কা পেয়েই যেন ওর হাত-পা সব অবশ হয়ে এলো, অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলে,—

"রাধে গোবিন্দ! রাধে গোবিন্দ!......

বর্ষার পর বসন্ত কেটে গেল ধীরে ধীরে; আবার একদিন আকাশে মেঘের মাদল বেজে উঠলো।

পুকুরঘাটে বাসন মাজতে বসেছিল পদ্ম; পানাপুকুর ও সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে জল দেখা যাচ্ছিল পুকুরের, সে জল যেমন কালো—তেমনি স্বচ্ছ। পদ্মর গৌরবর্ণ তাতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল আরো সুন্দর, আরো অপরূপ হয়ে।

হঠাৎ সে চমকে উঠলো, ...কাছাকাছি কোথাও কার হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠলো এক ঝাঁক গাঙ-শালিককে লক্ষ্য করে। তাই মুখ তুলেই পদ্ম চমকে উঠলো,—সামনে দাঁড়িয়ে ও কে? ও অচেনা নয় তার।

ও যে সেই—সে! যে সমাজের শাসন লঙ্ঘন করেও তাকে গ্রহণ করতে চেয়ে-ছিল মানবতার ধর্মে! —ও সেই.....

ওরও দৃষ্টি পড়েছিল এইদিকে তাই শুকনো পাতার ওপরে ভারী বুটের প্রতিধ্বনি তুলে পুকুরের পাড় বয়ে এইদিকে এগিয়ে এলো; ক্ষণকাল নীরব থেকে ডাকলে,—"মীরা!"

মোহ কেটে গেল মুহূর্তে। শিউরে উঠে পদ্ম জবাব দিলে,—"মীরা নেই সে মরে গেছে; আমি পদ্ম"

মাজা বাসনের গোছা হাতের ওপর তুলে নিয়ে সে দর্পিত পদক্ষেপে অদৃশ্য হলো ঘাটের পথ ধরে।

কেউ জানলো না, তাদের এই পুনঃ-দর্শনের কাহিনী, শুনলে না তার ইতিহাস; —শুধু কোন সাথী-হারানো পাখী আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলো নির্জন পুকুরঘাট মুখর করে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙে চন্দোর দেখলে পদ্ম নেই। মনে হলো কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে যেন কার কান্না শুনে ভেবেছিল,—ও বুঝি বাদল হাওয়া।

পথঘাট খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত হয়ে ফিরে এলো চন্দোর। বারান্দায় উঠে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে গত রাত্রের অন্ধকার আকাশ থেকে নিশ্চিহ্নে মুছে গেছে, তার জায়গায় হেসে উঠছে উজ্জ্বল রৌদ্র।

মনে পড়ে আর একটি বর্ষা-রাতের কথা, যেদিন না চাইতেই পদ্মকে সে কুড়িয়ে পেয়েছিল শিমুলপুরের হাট-ফেরতের পথে,—আর আজ? .....আজ সে সকল চাওয়া উপেক্ষা করে তেমনি সজল রাত্রে হারিয়ে গেল হৃদয়ের বেচাকেনার জনারণ্যে। চন্দোর আজ আর একবার ওর একতারাটায় সুর তুলতে চেষ্টা করলো,—

রাধে,—আমি প্রেমের কিবা জানি.....

—রাখাল বই তো নই।

ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার

ডাঃ সরসীলাল সরকার, এম-এ

পরিণত বয়সেই ডাঃ সার নীলরতন সরকার পরলোকগমন করিয়াছেন, তথাপি এ কথা একান্তভাবেই বলিতে পারি যে, তাঁহার এই মহাপ্রয়াণে বাঙলাদেশ এমন একজন মনীষীকে হারাইয়াছে যাঁহার অভাব পূর্ণ হইবার নহে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা সর্বজন বিদিত। কিন্তু কেবল প্রতিভা নয়, তাঁহার এমন একটি আদর্শ ছিল, যে আদর্শ তিনি নিজে অনুসরণ করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন এবং অন্য চিকিৎসকমণ্ডলীর সম্মুখেও সেই আদর্শ তাঁহার জীবন-সাধনার প্রতীক স্বরূপে দান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ে পসার বাড়াইবার জন্য কখনও সাহেব ডাক্তারদের অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কার্যপ্রণালী সর্বদাই সহজ ও সরল ছিল। রোগীদের আরোগ্য করিবার যাহা কিছু উপায় তাহাই তিনি নিয়ত অনুধ্যান করিতেন, কদাপি পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে রোগীকে বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেন না। বাহিরের আড়ম্বরের তিনি একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহার এই আদর্শে অনেক আড়ম্বরপ্রিয় চিকিৎসক পরিশেষে আড়ম্বর প্রদর্শনের পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বাঙালী সুলভ পরচর্চা ও পরনিন্দা তিনি একেবারেই বর্জন করিয়াছিলেন। বৃথা সময় নষ্ট করা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহা নিজের সম্বন্ধেই হউক বা পরের সম্বন্ধেই হউক। যখন যে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা তাঁহার নিজের সর্ব শক্তি ও একান্ত মনোযোগ দিয়া সফল করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেকটা এই কারণে রোগ নির্ণয় ও রোগের প্রতীকার পন্থা নির্ণয়ে তিনি চিকিৎসক সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। রোগীর উপর তাঁহার সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা এমনভাবে প্রকটিত হইতে দেখা যাইত যাহা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়জনের পক্ষেই সম্ভব। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি যেমন নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতেন তেমনি অপরের সম্মানও অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। তরুণ চিকিৎসকগণকেও তিনি এই আত্মসম্মানবোধ সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। যে কার্য তাঁহার নিকট অসত্য বা অন্যায় বলিয়া বোধ হইত, সে কার্যের দিক দিয়াও তিনি



ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার

যাইতেন না। এই শেষোক্ত বিষয়ে এখানে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতেছি।

কলিকাতায় যখন একবার Indian medical congress বা নিখিল ভারতীয় চিকিৎসা মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখন কয়েকজন তরুণ বয়স্ক চিকিৎসক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। ডাক্তারী বিষয়ের মধ্য দিয়া যে সমাজ সংস্কার করিবার পন্থা আছে, এইটি তাহার মধ্যে একটি প্রধান পন্থা ইহাই ছিল তাঁহাদের যুক্তি।

সার নীলরতন এই প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে, এইরূপ প্রস্তাব যদি উপস্থিত করা হয়, তবে তাঁহাকে মেডিক্যাল কংগ্রেস ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তরুণ চিকিৎক দল সার নীলরতনের এই কথায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন।

সার নীলরতন ইহার পর প্রস্তাব করিলেন যদি ডাক্তারী শাস্ত্রের দিক দিয়া সমাজের উন্নতির চেষ্টা করা হয়, তবে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এই মহাসভায় আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাবটি কয়েকজন ডাক্তার ছাড়া অধিকাংশ ডাক্তারই উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আদমসুমারীর গণনার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যে যে প্রদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, সেই সেই দেশে প্রসূতির ও শিশুর মৃত্যু অধিক হয় ; জীবিত শিশু ও প্রসূতিগণেরও যে বাল্যবিবাহই স্বাস্থ্য হানির একটি বিশেষ কারণ ইহাও প্রমাণিত হইল। সুতরাং একদিক দিয়া বাল্যবিবাহই জাতির দুর্বলতার একটি কারণ। ইহার পর যখন সর্দা আইন প্রবর্তিত হয় তখন সার নীলরতন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, দেশবাসী হাতে কলমে কার্যতৎপর হয়, যাহাতে দেশের বাণিজ্যের ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমৃদ্ধি বর্ধিত হয়, সেদিকেও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁহাকে গুরুতর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে তিনি কখনও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। বরং ইহাই বলিতেন, এই সকল ক্ষতিও নিরর্থক নয়, এই ক্ষতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য ব্যবসায়ীরা অধিকতর সতর্কতা ও দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালন করিতে সক্ষম

হইবে। যাহাতে দেশের কাঁচা চর্ম বিদেশে রপ্তানি না হইয়া এ দেশেই শিল্প কার্যে প্রযুক্ত হইতে পারে সেজন্য তিনি ন্যাশনাল টেনারি নামক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্যার নীলরতন ক্যাম্বেল স্কুলে ঢুকিয়াছিলেন এবং যেন সরস্বতীর বর লাভ করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ উপাধি এম. ডি এবং প্রাণীতত্ত্ব বিদ্যাতেও সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ডাক্তারী কার্যে অবসর খুব কম থাকিলেও তিনি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত এসোসিয়েশন ফর কালটিভেসন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন প্রাণীতত্ত্ববিদ্যার ক্লাস খুলিয়া বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। এই বক্তৃতাগুলি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইত।

যখন ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন সংস্থাপিত হইবার চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময় ডাঃ সার লিওনার্ড রোজার্স এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তিনি নিজেও এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক অর্থ প্রদান করেন এবং জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিবার বিষয়ে মনোযোগী হন। আমাকেও তিনি এই অর্থ সংগ্রহের চেষ্টার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি জানিতেন সংবাদপত্রসেবিগণের সহিত আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে। আমার কিন্তু এভাবে অর্থ সংগ্রহের দিকে আগ্রহ ছিল না। আমি সার নীলরতন সরকার মহাশয়কে একদিন এ সম্বন্ধে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। আমি বলিলাম, "এই যে অর্থ আমাদের দেশ হইতেই সংগৃহীত হইবে দেশবাসী ইহার কতটুকুই বা ফলভোগী হইবেন? নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং ইংরেজরাই ইহার বড় বড় পদগুলি দখল করিয়া লইবে। আমরা তাহাদেরই অধীনস্থ কর্মচারী হইয়া যে এ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম, তাহাই থাকিব।"

সার নীলরতন বলিলেন, "আমাদের পক্ষে ইহাতো নূতন কিছু নয়। তবে আমাদের কাজ শিখিয়া মানুষ হইতে হইবে। এ্যাসিস্ট্যান্ট হইয়াও কাজ শিখিবার কিছু সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে এবং সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া যতটা জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করা যায় ততটুকুই আমাদের লাভ। ইহা ছাড়া বর্তমানে আর মানুষ হইয়া উঠিবার কোন উপায় আছে কি? গভর্নমেন্টের চিকিৎসা বিভাগে বর্তমানে ভারতবর্ষীয়েরা সকলেই এ্যাসিস্ট্যান্ট, তাহাদের কি বড় বড় অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা করিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে? তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি এইসব বিষয়ে ইংরেজ চিকিৎসকদিগের অপেক্ষাও অধিক কৃতিত্ব দেখাইতেছে না? যদি ভারতবাসী এইভাবে উন্নতি অর্জন করিতে পারে, তবে তাহারা নিজের স্থান জয় করিয়া লইতে পারিবে, চিকিৎসা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আসন ইহারা স্বতঃই অধিকার করিবে, কেহই তাহাদের পিছনে রাখিতে পারিবে না। আর আরও একটি ভাবিবার বিষয় আছে, সেটি এই যে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম সাধনার মধ্য দিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের নব নব পথ আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহাতে রোগমুক্তির উপায় হয়, যাহাতে দুরারোগ্য রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হয়, চিকিৎসকগণ যাহাতে রোগীকে নিরাময় করিবার অধিকতর শক্তি লাভ করেন, সে বিষয়ে দেশবাসীর কি সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত নয়? আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলেন যে, রোগীকে যে চিকিৎসক রোগমুক্ত করিতে পারেন, সেই চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং সেই ঔষধই শ্রেষ্ঠ ঔষধ যাহাতে রোগ আরোগ্য হয়। সুতরাং এই দিক দিয়াও আমাদের এই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করা নিশ্চয়ই কর্তব্য।"

কাজের দিক দিয়া চলিবার পথে তিনি উদ্যোগ ও আয়োজনের জন্য সময় নষ্ট করিতে চাহিতেন না। একবার কারমাইকেল কলেজে একটি গবেষণাগার স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছিল: আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কত অর্থ সংগ্রহ হইল? তিনি বলিলেন, "চারিটি দেয়াল খাড়া করিবার মত অর্থ পাওয়া গিয়াছে, ছাদ তুলিবার অর্থ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। আমি বলি যে, আর অপেক্ষা না করিয়া দেওয়াল তুলিতে আরম্ভ করিয়াই কাজ অরম্ভ করিয়া দেওয়া ভাল, তাহা হইলে দেওয়াল গড়িয়া উঠিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজও গড়িয়া উঠিবে। কাজের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে তবে তাহা আপন হইতেই গড়িয়া উঠে, ছাদের অভাবে তাহার রূপ গ্রহণের বাধা হয় না।"

তিনি অসাধারণ কর্মী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কর্মসাধনা তাঁহার রসানুভূতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তিনি যখন সেকালের গল্প করিতেন তখন কথা বলিবার ভঙ্গীতে তাঁহার পর্যবেক্ষণ শক্তির এবং রসানুভূতির ক্ষমতা সম্যক প্রকাশিত হইত। তিনি একবার সেকালের যাত্রা সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব। সেকালের যাত্রার অভিনয় এবং যাত্রার দলের কার্যকলাপের সম্বন্ধে তিনি এত জানিতেন যে, তাহা সংগ্রহ করিলে একখানি পুস্তক হইতে পারিত।

সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সাহিত্যসেবীর ভিতরে যে দলাদলি আছে, ইহা তিনি হাস্যকর বলিয়া মনে করিতেন। এই দলাদলি ব্যাপারের হাস্যকারিতার উদাহরণস্বরূপ তিনি আমাদের এই ভাবের একটি কাহিনী শুনাইয়াছিলেনঃ—"সেনেটে সিটিং শেষ হইয়া গিয়াছে, আমরা কয়জন বসিয়া গল্প করিতেছি। সেই সিটিংএ মিস্টার পেডলার ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হারাণচন্দ্র রক্ষিতকে বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট বাঙলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্য 'রায় সাহেব' খেতাব দিতে চান, এই ভদ্রলোকটি বাঙলা ভাষায় কি কি পুস্তক রচনা করিয়াছেন? আমি বলিলাম, তিনি সেক্সপিয়ারের অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা আমি জানি, কিন্তু সে অনুবাদ সেক্সপিয়ারের মূল গ্রন্থের অনুবাদ নয়, তাহা "ল্যাম্ব" লিখিত সেক্সপিয়ারের গল্পের অনুবাদ। তিনি অন্য কি কি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। আমার এই কথায় সভাস্থ অনেকেই অসন্তুষ্ট হইলেন, কেননা তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল আমি হারাণবাবুর সুখ্যাতি করি। সেই মিটিংএ একজন ভদ্রলোক পেডলার

সাহেবকে বলিলেন, "মিষ্টার পেডলার, হারাণবাবু সম্বন্ধে ডাক্তার নীলরতনের এরূপভাবে কথা বলিবার বিশেষ কারণ আছে। ডাক্তার নীলরতন কংগ্রেস দলের লোক এবং হারাণবাবু কংগ্রেসের বিরুদ্ধ দলের লোক, সেই জন্য ইনি তাঁহার সুখ্যাতি করিতে ইচ্ছুক নহেন।" আমি এইভাবে কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিতে দেখিয়া একটু হাসিলাম মাত্র।

তাঁহার এই কাহিনী হইতে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, পেডলার সাহেব তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহার সঠিক মতটিই জানাইয়াছিলেন, এ বিষয়ে তিনি আত্মীয় স্বজনের খাতিরেও তাহার পক্ষ টানিয়া বলিবার পাত্র ছিলেন না।

তাঁহার অর্থলালসা ছিল না, তবে ইংরেজ ডাক্তারগণের অপেক্ষা কম ভিজিট নেওয়া তিনি আত্মসম্মান হানিকর মনে করিতেন। অনেক লোকের কাছে তিনি মোটেই ভিজিট লইতেন না এবং যাহারা অপারগ এরূপ অনেককে তিনি বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিয়াছেন।

শাশ্বত

(৫৯৫ পৃষ্ঠার পর)

সন্ধান পেয়েছে বোধ হয় কোথায়ও। আঃ, ভাবতেও আরাম হচ্ছে। সুখাদ্য পেটে পড়বে অনেকদিন পরে।

আবার স্মৃতির নেশা ভুলিয়ে বসল তাকে। প্রথমটা কী সংকোচই না হ'ত লোকের কাছে হাত পাততে। তার যৌবনের ম্লান দীপ্তি সেদিন প্রলুব্ধ করেছিল কত লোককে। বাড়িওয়ালা কোন এক ব্যাংকের কর্তা, জজ, ব্যারিস্টার কলেজের ছাত্র। দু-একবার লোভও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু ওই ছেলেটা। ওর স্নেহ দাঁড়াল এক দুর্ভেদ্য ব্যবধানের মত। ওকে কেন্দ্র করে কত আশা, আকাঙ্ক্ষা তার সাময়িক দুর্বলতাকে চূর্ণ করে দিল।

চাঁদের আলো ম্লান হয়ে আসছে। মা তাকাল আকাশের দিকে। শীতের দীর্ঘ রাত্রি বোধ হয় শেষ হয়ে এল। দূরে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেক। মৃদু কথাবার্তা কানে আসছে। কথার সুরে যেন বেদনার আভাস। আজকের ভোজ ভাল হয়নি নিশ্চয়।

সে উঠে দাঁড়াল। শীতল এসে ডাকবে এখনি। নিশুর মার কান্না শোনা যাচ্ছে। বুড়ির তাহলে পেট ভরেনি। এই ত বুড়ি এসেছে। কাঁধে ওর কাপড়ে জড়ান ও কী!

ভিড় জমে গেল শীতলের মার ঘরের সামনে। নিশুর মা পরম সমাদরে তার বোঝা শুইয়ে দিল মাটিতে। ন্যাকড়া জড়ান হাল্কা দেহ, শুধু মুখটা খোলা। ছোট্ট মুখ, রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে তখনও। রক্তরাঙা মুখখানা ভোরের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

অন্নের অনটন

(৫৯৮ পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রগুলির পক্ষে তাহার নির্বাহণ অসম্ভব। অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ যে শাসন শক্তির অধীন একমাত্র সেই শাসনতন্ত্রই ঋণ-দাদন, চলতি মুদ্রার প্রয়োজনানুযায়ী সংযত প্রচলন এবং দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা তাহা সংসাধন করিতে পারেন।

কৃষিপ্রধান ভারতে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকর্মের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কেহ কেহ বলেন, এই কৃষির অতিশয্যই ভারতের দুঃখ দুর্দশার কারণ, চিরদারিদ্র্যের নিদান। মিশর ও শ্যামের ন্যায় এমন অনেক দেশ আছে, যাহাদের অভ্যুদয় নির্ভর করে কৃষি এবং একমাত্র ফসলের উপর। কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে কৃষিজ দ্রব্যমূল্য শিল্পজ দ্রব্যমূল্যের সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন নহে। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও রাশিয়াকে 'আদর্শ' লইয়া, উন্নতিশীল প্রবর্ধমান কৃষির সহিত বিবিধ ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। গত কয়েক বর্ষে রাশিয়াতে একই কালে উভয়েরই যুগপৎ উন্নতি ও বিস্তার সাধিত হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ তদন্ত সমিতি (Famine Commission) ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্নমুখী শিল্পের অনুষ্ঠান সুপারিশ করিয়াছিলেন। বর্তমান যন্ত্রযুগে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতি ও প্রসার ব্যতীত জাতির কল্যাণ নাই। আমাদের অর্থ-বিধানকে (Economy) সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর, সুসঙ্গত, সুসমঞ্জস ও সুনিয়ন্ত্রিত না করিলে জনসাধারণের জীবন-যাত্রার ধারা কখনই উন্নত হইতে পারিবে না। কৃষিই প্রধান অবলম্বন; কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনার্থ আনুষঙ্গিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার প্রয়োজন।

খেলার নেশায়

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এস্-সি

আত্মতৃপ্তি, আনন্দ এবং কৌতুক এই অনুভূতিত্রয়ের একত্র সমাবেশ যাহার মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহাই 'খেলা' নামে অভিহিত। খেলা করিয়া অথবা খেলা দেখিয়া আমরা এই অপূর্ব অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হই। তাই আমরা খেলা ভালবাসি। খেলার মধ্য দিয়াই সজীবতার ছবিখানি মূর্ত হইয়া উঠে।

শিশু যেমন তাহার খেলনা লইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে, প্রকৃতিদেবী তেমনই তাঁহার এই সমগ্র সৃষ্টিকে লইয়া খেলার নেশায় মাতিয়া আছেন। ধ্বংস এবং সৃজন—এই ভাঙাগড়ার চিরন্তন খেলা আজ আর আমাদের কাছে তেমন বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় না,—মনে হয়, এ যে প্রকৃতির মজ্জাগত, এই তো স্বাভাবিক।

প্রকৃতির বরপুত্র মানুষ সব কিছুর মধ্য হইতেই এই খেলার অনুভূতি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। তবে বিভিন্ন রুচির উপর এই খেলার প্রকারভেদ নির্ভর করিয়া থাকে। শিশু যখন তাহার খেলনা লইয়া আপন মনে খেলা করে মাতা তখন পরম কৌতুকে মুগ্ধ-নেত্রে তাঁহার ক্রীড়াচপল বালককে দেখিতে থাকেন, অথবা তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার কুসুম-পেলব সুকুমার ওষ্ঠ-দ্বয়ে স্নেহচুম্বন অঙ্কিত করিয়া কৌতুকে আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠেন—শিশুকে লইয়া খেলা করিতে করিতেই নবীনা জননীর সময় যেন জলের মত দ্রুতগতিতে বহিয়া চলে। শ্রাবণের ঘনঘটায় ভাব-বিলাসীর চিত্ত উন্মনা হইয়া উঠে—কবি তাঁহার লেখনী লইয়া খেলা করিতে বসিয়া যান। দয়িতের প্রেমলীলায় নবোঢ়া বধূর লাজারুণ আননে সোহাগ-সুখের মধুর হাসিটি ফুটিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণাগারে বার্নার, টেস্ট-টিউব, নানা রাসায়নিক পদার্থ, ছুরি কাঁচি, স্লাইড, অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাহিতচিত্তে প্রকৃতির সহিত খেলায় অতিবাহিত করেন। আবার ফুটবল, তাস, পুতুল প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্রীড়নকের সাহায্যেও অনেকে খেলার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।

মানবজীবনে সকল কার্যের সহিত খেলাও এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে কবে কেমন করিয়া এই খেলার জন্ম হইল, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে আমাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। প্রত্নতত্ত্বের এবং আধুনিক আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও পাশাখেলার ন্যায় অনুরূপ একটি খেলার প্রচলন ছিল। আপাতদৃষ্টিতে খেলাকে এক সহজাত প্রবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খেলার জন্মকথা অথবা কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পূর্বে সকল প্রাণীই খেলা করে কিনা জানিতে হইবে।

মানুষের মধ্যেই খেলার চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হয় বটে, তবে পিপীলিকা, পাখী ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর সকল প্রাণীর মধ্যেও এই খেলার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন জীবের মধ্যে আজ পর্যন্ত খেলার প্রবৃত্তি বা অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় নাই।

জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের অনন্ত নীল জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিতে যিনি ভালবাসেন, তিনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ক্রীড়ারত একদল ডলফিন অথবা শুশুককে দেখিয়াছেন। ইহারা আপনমনে বড় সুন্দর খেলা করিতে থাকে—অর্ধ-বৃত্তাকারে একবার করিয়া জলের নীচে ডুব দেয়, আবার পরক্ষণেই ভাসিয়া উঠিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে। সহসা কোন জাহাজ দেখিলে ইহারা সেইখানে আসিয়া জড় হয় এবং জাহাজের চতুর্দিকে অথবা পোতাগ্রভাগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লাফালাফি করিতে থাকে। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা খেলার পর পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহারা জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, মাছও অনুরূপভাবে খেলা করিয়া থাকে। অনেক মাছ মাঝে মাঝে জলের উপর লাফাইয়া উঠে এবং অনেক হাঙর জাহাজের আশেপাশে ঘোরাফেরা করিতে থাকে। আমাদের মতে ইহাকে খেলা বলা চলে না। কোন কারণে ভয় না পাইলে মাছ জলের উপর লাফাইয়া উঠে না এবং হাঙর শুধু আহারের সন্ধানেই জাহাজের আশেপাশে ঘুরিয়া থাকে। এই প্রকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাজকে আমরা ঠিক খেলা বলিতে পারি না। প্রথম হইতেই খেলার উদ্দেশ্য যেখানে শুধু খেলার মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া অপর কোন বৃহত্তর লাভের আশায় ধাবিত হইয়াছে, সেখানে কেমন করিয়া আনন্দ, কৌতুক এবং আত্মতৃপ্তি এই অনুভূতিত্রয় একত্রে ফুটিয়া উঠিবে? লেখক যখন শুধু ব্যবসায়ের খাতিরে লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার লেখাকে আমরা খেলা বা বিলাসমাত্র বলিতে পারি না। তবে কখন কখন খেলার সহিত অন্য অনুভূতিও সংযুক্ত হইতে পারে। স্তন্যপায়ী ডলফিন বা শুশুক হাঙরের ন্যায় খাদ্যপ্রাপ্তির আশায় জাহাজের কাছে লাফালাফি করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে খাদ্যের টুকরা জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহারা যে আরও খুশি হয়, একথা ঠিক।

প্রাণিগণের মধ্যে বিড়ালশাবকই সর্বাপেক্ষা ক্রীড়াপ্রবণ হইয়া থাকে। জানালার ধারে বসিয়া বৌদিদি তাঁহার খুকির জন্য সোয়েটার বুনিতেছিলেন; সহসা কোন জরুরী কাজে তাঁহাকে আরব্ধ কার্য ফেলিয়া রাখিয়া কক্ষান্তরে গমন করিতে হইয়াছে। এমন সময়ে পুষি বিড়ালের দুরন্ত বাচ্চাটা জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পা লাগিয়া পশমের গুলিটা একটু গড়াইয়া গেল। আর যায় কোথায়!—সারা ঘরময় সে পশমের গুলিটাকে গড়াইয়া গড়াইয়া থাবা মারিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে অনতিপরে ঘরে ঢুকিয়া বৌদিদির একেবারে চক্ষুস্থির! অনেক সময় হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বস্ত্রের দোদুল্যমান প্রান্তভাগ লইয়া টানা-টানি করিতে বিড়ালশাবক বড় ভালবাসে। জামার হাতার ভিতরে হাত লুকাইয়া রাখিয়া আপনি যদি আস্তিনটি ঈষৎ নাড়িতে থাকেন, তাহা হইলে সে খেলার ছলে ছুটিয়া আসিয়া আপনার জামার আস্তিনের উপর লাফাইয়া পড়িবে। বিড়ালশাবকের এইরূপ চপলতা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে এবং পরিশেষে একমাত্র ইঁদুর ধরা ছাড়া অপর সকল দুষ্টামি বা খেলাই অন্তর্হিত হয়। বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, আবার অনতিপরেই তাহার শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই ইঁদুর-ধরা খেলায় সে প্রচুর আমোদ পায়। এইভাবে বারবার ইঁদুর ধরিয়া ও ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে তাহাকে মারিয়া ফেলে।

কুকুরশাবকও বিড়ালশাবকের ন্যায় প্রায় সমান ক্রীড়াপ্রবণ; তবে তাহারা একা একা তেমন খেলা করিতে পারে না। যদিও কোন কোন কুকুরছানা একপাটি জুতা অথবা এক-টুকরা কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড চিবাইয়া চিবাইয়া কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া একরূপ মজার খেলা অনুভব করে, তথাপি দু-তিনটি শাবক একত্রে মিলিয়া খেলা করিতেই বেশি ভালবাসে। ছোট ছোট ছেলেরা যেমন মিলিয়া-মিশিয়া ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, ইহারাও ঠিক তেমনি করিয়াই খেলা করিয়া থাকে। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রতি ছোট ছোট ছেলেদের বেশ আগ্রহ দেখা যায়, কুকুরশাবকও পরস্পরে যুদ্ধাভিনয় করিয়া আমোদ অনুভব

করে দেখিবেন, একটি হয়ত খানিকটা পিছু হটিয়া গেল পরক্ষণেই পরস্পরে পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—আঁচড়কামড়ের অভিনয় করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া যেন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া ইহারা রাগের ভান করে বটে, অথচ কেহ বিন্দুমাত্রও রাগান্বিত হয় না কিংবা কাহাকেও কিছুমাত্র আঘাত করে না। পরিণত বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল ছেলেমিজনক খেলা হইতে বিরত হয় এবং শান্ত গম্ভীর হইয়া পড়ে; কিন্তু চাপল্য বয়সের সঙ্গে কমিয়া গেলেও কুকুর কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই খেলার নেশায় মাতিয়া উঠে। খেলার মধ্যে কুকুর একপ্রকার রসিকতাও অনুভব করে। হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন, সময়ে সময়ে আপনার নিক্ষিপ্ত বলটি মুখে লইয়া সে খানিক দূরে ছুটিয়া যায় এবং তাহা মাটিতে ফেলিয়া হাঁপাইতে থাকে। আপনি বলটি লইবার জন্য যখন তাহার কাছে আগাইয়া আসেন, তখন পুনরায় সে তাহা মুখে লইয়া ছুটিয়া পলাইয়া যায় এবং এইভাবে বেশ কৌতুক বোধ করে।

কুকুর বিড়ালের ন্যায় সিংহ, মেষ, বাছুর, খরগোস, বানর প্রভৃতি সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই কিছু না কিছু খেলার ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়।

পাখীরাও খেলা করে বটে, তবে তাহাদের খেলা এ-ধরণের নয়। শূন্যে উড়িতে উড়িতে ডিগবাজি খাইতেই পায়রা প্রভৃতি অধিকাংশ পাখি ভালবাসে—ইহাই তাহাদের প্রধান খেলা। ময়ূর মাঝে মাঝে পেখম মেলিয়া নাচিতে থাকে। বক, করমোরাণ্ট প্রভৃতি পাখিরা জলের দ্রুতসন্তরণশীল মাছ ধরিয়াই আমোদ পায়। এই করমোরাণ্টের সাহায্যে চীনদেশে অনেক লোক মাছ ধরিয়া থাকে। কোন কোন পাখি একটুকরা আগাছা লইয়া লম্বা ঠোঁট দিয়া উচ্চে ছুঁড়িয়া দেয় এবং পরক্ষণেই সেই পতনশীল আগাছাকে আপন চঞ্চুদ্বারা লুফিয়া লয়।

পাখিদের মধ্যে এডেলী পেঙ্গুইন অনেকটা মানুষের ন্যায় খেলা করে। আমরা যেমন অশ্বারোহণ করিয়া, মোটরে চড়িয়া অথবা দোলায় উঠিয়া আমোদ পাই, লেভিক (Levick) বলিয়াছেন, এই পেঙ্গুইনরা তেমনই প্রবল স্রোতে ভাসমান বরফস্তূপের উপরে উঠিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। ইহাদের আবাসস্থলের পাশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ-খণ্ড মেরুসাগরের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে আর ইহারা সাঁতার দিয়া সেই বরফখণ্ডগুলির উপর লাফাইয়া উঠিয়া প্রায় মাইলখানেক দূরে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং পুনরায় সাঁতার দিয়া আর একটি স্তূপে উঠিয়া পড়ে। এইভাবে তাহাদের আরোহণ-খেলা চলিতে থাকে।

পিপীলিকা লইয়া হুবার (Huber) অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, পিপীলিকাগণ কুকুরশাবকের ন্যায় দ্বন্দ্ব-ক্রীড়া করিয়া থাকে—একে অপরের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয় এবং পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া গড়াইয়া পড়ে।

এইবারে খেলার কারণ অথবা উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বিষয়টি সহজ-বোধ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "Play is an outlet for surplus energy,"—খেলা অতিরিক্ত তেজের একটি নির্গমদ্বার। দেহ-মনের কানায় কানায় ভরিয়া যে অতিরিক্ত শক্তি বা তেজঃপুঞ্জ ছাপাইয়া উঠিতে চায়, তাহাই খেলার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে। যে তেজঃ-প্রবাহকে ধরিয়া রাখিয়া আপনার কাজে লাগাইবার মত ক্ষমতা দেহ-মনের নাই, তাহাই খেলার জন্ম দিয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহারা কুকুর এবং পাখীর খেলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে খেলার কোন সার্থকতাও নাই কিংবা কোন উদ্দেশ্যও নাই। ইঁহাদের যুক্তি একেবারে অবিশ্বাস না করিলেও আমাদের মন পরিপূর্ণভাবে এ কথায় সায় দেয় না। শীর্ণকায় রুগ্ন শিশুর কতটুকুই-বা শক্তি, যে-শক্তির অপব্যয় সে সহিতে পারে? তথাপি সে অল্পাধিকতর খেলা করিতে ভালবাসে। বিড়াল যে ইঁদুর লইয়া খেলা করে, তাহা আপাত দৃষ্টিতে খেলামাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই খেলার মধ্যেই ভবিষ্যৎ দক্ষ-শিকারীর সম্ভাবনাটুকু নিহিত রহিয়াছে। আমাদের বল-খেলা ও তাস-খেলার অন্তরালেও দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন আছে। কার্ল গ্রুস (Karl Groos) বলিয়াছেন, জীবনধারণের পক্ষে খেলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। জীব-জগতে এই খেলার দান অকিঞ্চিৎকর নহে। এবং যখন ইহা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখন অন্যান্য প্রয়োজনীয় দেহ-সংগঠন ও কার্যপ্রণালী যেভাবে কোন সাধারণ নির্বাচন-নীতি অনুসারে উদ্ভূত হইয়াছে, খেলারও অনুরূপভাবে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইচ জি ওয়েলস (H. G. Wells) যাহা বলিয়াছেন, আমরাও তাহা সমর্থন করি। তিনি লিখিয়াছেন—

"From the point of view of its evolution and its biological meaning, play seems to have a double origin. There is the play which is biologically useful as a preparation for adult life; This is play in the strict sense. And there is the play which results from a mere surplus of energy being directed into pleasurable or exciting outlets; this, if we want to distinguish it, we can call sport. The former is more characteristic of young animals, the latter of adults; the former predominates in the mammals, the latter among birds."

খেলার বিকাশের এবং জৈব-অর্থের দিক হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় ইহার দুইটি উৎপত্তিস্থল আছে। এমন খেলা আছে যাহা পরিণত জীবনের প্রস্তুতির জন্য জীবের প্রয়োজনীয়; প্রকৃতপক্ষে ইহার নাম খেলা। আবার এমন খেলা আছে যাহা শুধু এক অতিরিক্ত শক্তি হইতে উৎসারিত হইয়া আনন্দময় অথবা উত্তেজনাময় নির্গম-মার্গে পরিচালিত হইয়া থাকে; ইহাকে আমরা পার্থক্য নিরূপণের জন্য ইচ্ছা করিলে ক্রীড়া (বা খেলা-ধুলা) বলিতে পারি। প্রথমটি বিশেষভাবে শিশু-প্রাণীর এবং শেষেরটি পরিণত বয়স্কের বৈশিষ্ট্য; প্রথমটি স্তন্যপায়ী প্রাণিগণের মধ্যে এবং শেষেরটি পক্ষিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

স্তন্যপায়ী প্রাণী এমন অসম্পূর্ণ দেহ-মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে তাহার শৈশব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই সময়ে খেলার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সে পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। স্তন্যপায়ীর জীবনে খেলা তাই অপরিহার্য অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে খেলারও প্রায় পরিসমাপ্তি ঘটে—বালসুলভ চাপল্য অন্তর্হিত হইয়া স্নিগ্ধ প্রশান্তি বিরাজ করিতে থাকে। পাখীর বেলায় কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। জড়প্রায় ক্ষণস্থায়ী শৈশবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাখী এক উচ্ছল প্রাণাবেগে মাতিয়া উঠে—দেহের উষ্ণ শোণিত-ধারায় বুঝি নীলাকাশের আহ্বান মর্মরিত হইয়া উঠি। এত শক্তি এত তেজ ক্ষুদ্র পাখী আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভূপৃষ্ঠ পরিত্যাগকালীন বিমান-পোতের ন্যায় থরথর করিয়া তাহার পাখা দুটি কাঁপিয়া উঠে; পক্ষ-সঞ্চালন করিয়া সে আকাশে সন্তরণ করিতে ছুটিয়া যায়।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন ডাক-টিকিট সংগ্রহ করিয়া খেলা করেন, কৃপণ যেমন যক্ষের ন্যায় ধনরাজি সঞ্চিত করিয়া আমোদ পায়, তেমনই অনেক প্রাণীও খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সঞ্চিত করিতে ভাল-বাসে। কিন্তু প্রাণিগণের এই প্রকার সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করাকে খেলা না বলিয়া বরং

(শেষাংশ ৬০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খাদ্য সমস্যাঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাঙলা দেশে বর্তমানে খাদ্যাভাব যে স্তরে আসিয়া পেঁীছিয়াছে, তাহাতে তাহার তীব্রতা বুঝাইবার জন্য কোনপ্রকার যুক্তি অথবা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। লক্ষ লক্ষ নহে, কোটি কোটি লোকের প্রতিদিনের জীবনে ইহাই আজ কঠোরতম সমস্যা। এই নিদারুণ অভূত ও অশ্রুতপূর্ব ভয়াবহ অবস্থার কারণ ও ইহার প্রতিকারের কথা সরকারী ও বে-সরকারী উভয় পক্ষের বহু লোকেই আলোচনা করিতেছেন। যদিও আজও কার্যকরী ও ফলপ্রদ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই এবং শীঘ্র যে হইবে এমন কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। কারণ, ইহার প্রতিকারের শেষ ব্যবস্থা যাহাদিগের হাতে এবং যাহাদিগের অস্তিত্বের পক্ষে ইহার প্রতিকার অপরিহার্য—এই উভয় পক্ষের স্বার্থ এক নহে। তবুও আলোচনার প্রয়োজন আছে এবং যাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন, তাহাদিগকেও বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা লোককে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত অন্নাভাবের করাল ছায়া দীর্ঘতর হইয়া যেন দেশকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও বোধ হয় বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনীয় নহে। এক প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা ব্যতীত এমন কোন দুর্দৈব নাই,—বিশেষত যাহার সহিত মানুষের কাজের সম্পর্ক আছে,—যাহা অতীতকালে বর্তমানের ন্যায় ব্যাপক ও তীব্র আকারে দেখা দিতে পারিত।

অতীতকালে কোন প্রকার দুর্দৈব স্বল্পস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত, বর্তমানের ন্যায় বিস্তার লাভ করিতে পারিত না। মানুষের কোন ভুলের ফলে এত বহুব্যাপক অনর্থের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রব্যবস্থা এত সংহত ছিল না—যোগাযোগের ব্যবস্থা খুবই অকিঞ্চিৎকর ছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। রাষ্ট্রব্যবস্থা একদিকে যেমন সংহত, অন্যদিকে তাহার সংগঠনব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ ও বহু বিস্তৃত। আভ্যন্তরীণ সংহতি ও সুব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র যেমন একজন মানুষের ন্যায় কাজ করিতে পারে, অন্তর্বিরোধ ও শিথিলতার জন্য শক্তিক্ষয়ও তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। সংগঠনও তাহার এত বিস্তৃত ও সুসম্পূর্ণ যে দূরবর্তী ক্ষুদ্রতম পল্লী পর্যন্ত তাহার দান সমভাবে বিস্তৃত। সমাজের সমষ্টি-শক্তি রাষ্ট্রের মধ্যে যতই কেন্দ্রীভূত হয়, ততই যেমন তাহার কল্যাণের শক্তি বর্ধিত হয়—তেমনই তাহার সামান্য বিপর্যয়ে বহু-ব্যাপকভাবে দারুণ অকল্যাণের সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের ন্যায় পরাধীন দেশের লোকের পক্ষে রাষ্ট্রের এই কল্যাণকর শক্তির সহিত অধিক পরিচয় থাকিবার সম্ভাবনা বেশী নাই। কিন্তু ইহার ভুল ও অব্যবস্থার ফলে যে কত বড় ও কত ব্যাপক দুর্দৈব দেখা দিতে পারে বাঙলার বর্তমান খাদ্যসঙ্কট তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তীব্রতা ও ব্যাপকতায় পূর্ববর্তী কোন দুর্ভিক্ষের সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা হইতে পারে না।

বাঙলাদেশে যে চাউল জন্মে তাহাতে বাঙলাদেশের লোকের আহার-সংস্থান হয় না—ব্রহ্মদেশের চাউল এ পর্যন্ত বাঙলাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—এই উৎস বন্ধ হওয়ায় বর্তমান অন্নাভাব দেখা দিয়াছে—প্রভৃতি কথা আমাদের অবস্থা যে কতটা অসহায়, তাহারই পরিচায়ক।

বাঙলাদেশের লোকের সাম্বৎসরিক প্রয়োজনের পক্ষে বাঙলাদেশে উৎপন্ন চাউল যে যথেষ্ট নহে, তাহা সত্য কথা। কিন্তু তাহার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা ব্যতীত এত বড় অন্নাভাব দেখা দিতে পারে না। খাদ্য সম্পর্কে বাঙলাদেশ পরমুখাপেক্ষী কিন্তু গ্রেট-ব্রিটেন তদপেক্ষা অনেক অধিক পরমুখাপেক্ষী। যুদ্ধের প্রথম দিকে গ্রেট-ব্রিটেনকে অনেক অধিক অবরোধের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজন ও চাপ এবং আক্রমণের আশঙ্কা তখন সেখানে কিছুমাত্র কম ছিল না। কার্যত দীর্ঘকাল অতি প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে সেখানে নাগরিক জীবনের শৃঙ্খলা প্রায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। তবু সেখানে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। অনাহারে জাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয় নাই। অধিক খাদ্যশস্যোৎপাদন সম্পর্কে ফলপ্রদ সরকারী ব্যবস্থা সত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেন এখনও খাদ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। গ্রেট ব্রিটেন সম্পর্কে যাহা সত্য, ইউরোপের যুদ্ধরত অনেক দেশ সম্পর্কেও সে কথা সত্য। সর্বব্যাপী ধ্বংস ও বিনাশের মধ্যেও এতবড় খাদ্যাভাবের কথা সেখানে কল্পনাতীত। গৃহযুদ্ধের আকারে সেখানে যখন বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলিতেছিল, তখন সেখানকার শিশুদের দুগ্ধাভাব মিটাইবার জন্য সমগ্র বিশ্বে আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা এই স্তর বর্তমান সঙ্কটের অনেক পূর্বেই পার হইয়া আসিয়াছি।

কাজেই বর্তমান সঙ্কটের কারণস্বরূপ যে সকল অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা ইহার অব্যবহিত কারণ হইতে পারে, কিন্তু মূল কারণ নহে। ইহার মূলে রহিয়াছে শক্তিশালী সুগঠিত রাজশক্তির অব্যবস্থা আর সেই অব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে এদেশের লোকের কল্যাণ সম্পর্কে নির্বিকার ঔদাসীন্য। কাজেই পূর্ববর্তী যে-কোন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সহিত বর্তমান দুর্ভিক্ষের বড় পার্থক্য এইখানে যে, পূর্বকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত—স্থানবিশেষে তাহার তীব্রতা যতই হোক বহুবিস্তৃত স্থানে তাহা ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা কম থাকিত এবং তাহার স্থায়িত্ব সাধারণত বৎসরাধিক কাল হইত না। নূতন ফসলের সঙ্গেই লোকের অন্নাভাব দূর হইত। কিন্তু বর্তমান অবস্থার মূলে যে রাষ্ট্রিক অব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা সহসা দূর হইবার আশা নাই। কাজেই নূতন ফসল উঠিলেই যে লোকের দুরবস্থা ঘুচিবে এমন সম্ভাবনা কম। যে অব্যবস্থার ফলে খাদ্যাভাবের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে অব্যবস্থা তখনও কার্যকরী থাকিবে এবং বাড়তি ফসল স্বাভাবিক উপায়ে মাত্র দেশের লোকের মধ্যে বণ্টিত হইতে পারিবে না।

তদ্ব্যতীত পূর্বকালের দুর্ভিক্ষ হইতে ইহার আর একটি মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্বে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই খাদ্যের অনটন দেখা দিত। দেশে স্বভাবত কোন খাদ্যাভাব ছিল না। অজন্মাজনিত খাদ্যাভাব সুজন্মা হইলে দূর হইত। সাময়িক খাদ্যাভাব সাময়িক সমস্যার সীমা ছাড়াইতে পারিত না। বর্তমান সময়ের ন্যায় খাদ্যের জন্য বাঙলা বা ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী ছিল না। বর্তমানে রাষ্ট্রিক অব্যবস্থার সহিত ঘাটতিও রহিয়াছে। এই ঘাটতির পূরণ ফসল বাড়াইয়া হউক অথবা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া হউক, করিতে না পারিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। তদ্ব্যতীত বণ্টনের প্রশ্ন তখনকার দিনে ছিল না বলিলেই হয়। বাঙলা অবশ্য চিরদিনই পৃথিবীর ধান্য উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলির অন্যতম। তাহা হইলেও এখানকার ভূমি ব্যবস্থা এমন যে, ধান্য উৎপাদনের

জমি সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত ছিল। বলিতে গেলে প্রায় সকলেরই বাৎসরিক খাইবার ধান নিজ নিজ জমিতে ফলিত। বাজারের চাউলের উপর সাধারণত লোকে নির্ভর করিত না। যাহারা কুটীর-শিল্পের দ্বারা সমজের প্রয়োজন মিটাইত এবং চাষবাসের সময় পাইত না বা যাহাদের চাষ করিবার জমিজমা ছিল না, তাহারাও সাধারণত নিজ নিজ প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কতকগুলি পরিবারের নিকট হইতে বাৎসরিক প্রয়োজনীয় ধান্য গ্রহণ করিত। যাহাদের অভাব হইত, তাহারা ধনী বা মাহাজনদের নিকট হইতে ঋণস্বরূপ ধান্য গ্রহণ করিত এবং ধান্যের দ্বারাই আবার সেই ঋণ পরিশোধ করিত। অর্থের বিনিময়ে ধান্যের ক্রয়-বিক্রয় যাহা হইত, সমগ্র অবস্থার তুলনায় তাহাকে নিতান্তই সামান্য বলা যাইতে পারে।

যে সমস্যা এখন সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্ব এবং যাহা লইয়া এত আলোড়ন আলোচনা বিতর্ক ও নানাবিধ পরিকল্পনা, সেই বণ্টনের প্রশ্ন সেদিন ছিল না বলিলেই হয়। ভাল ফসল জন্মিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ভাল ফসল হইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। বাহির হইতে যে চাউল আমদানী হইত, তাহা হইবার আশা প্রায় নাই বলিলেই হয়। তদুপরি বাহির হইতে বহু আশ্রয়প্রার্থী এখানে আসিয়াছে। এদেশে যাহারা কায়িক শ্রম করে, তাহারা সাধরণত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অনেক অধিকসংখ্যক শ্রমিক কাজ পাইয়াছে, তাহাদের আয় বাড়িয়াছে এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে সরবরাহ পাইতেছে। ফলে, চাউলের খরচ বর্দ্ধিত হইবে। জনসংখ্যাও প্রতি বৎসর দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অবশ্য একথা সত্য যে, আমাদের ঘাটতির পরিমাণ খুব অধিক নহে এবং মোট উৎপন্নের সহিত তুলনা করিলেও তাহা খুব বেশী হইবে না। বাঙলা দেশে উৎপন্ন চাউলের বার্ষিক গড় ৮০ লক্ষ টনের উপর ধরা যাইতে পারে এবং বাহির হইতে বাঙলা দেশে সাধারণ বৎসরে যে চাউল আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ এক হইতে পাঁচ লক্ষ টনের অধিক হইবে না। ইহা খুব বেশী নহে, কিন্তু মোট চাউলের অনুপাতে আমদানী চাউলের পরিমাণ বেশী না হইলেও আমাদের বাজারের উপর ইহার প্রভাব অনেক বেশী। যুদ্ধ-পূর্ব কয়েক বৎসরে বাজারে মোট চাউলের অনুপাতে রেঙ্গুন-চাউলের পরিমাণ যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তিনি এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অর্থাৎ চাউলের বাজার সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মোট যে চাউল উৎপন্ন হয় এবং বাজারে যে চাউলের ক্রয়-বিক্রয় হয়, এই উভয়ের পরিমাণ এক নহে। উৎপন্ন চাউলের সামান্য অংশই বাজারে উঠিতে পারে।

বাঙলা দেশে ভূমিব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, একথা সত্য অনেক অ-কৃষকের হস্তে বহু জমি সঞ্চিত হইয়াছে একথাও সত্য। কিন্তু তবুও বলা যাইতে পারে যে, এই ভূমিব্যবস্থার মূল চরিত্র এখনও এই রহিয়া গিয়াছে যে, চাষযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বহু কৃষক ও অ-কৃষকের কার্য বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। দেনার দায়ে বৎসরের খোরাকী ধান না রাখিয়াই বাজারে ধান তুলিতে কৃষক বাধ্য হয় বটে, তবুও উৎপন্ন ধান্যের প্রধান অংশ ভূমি-বণ্টনের পথ ধরিয়া জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়। কাজেই বাঙলার শহর ও মফঃস্বলের বিভিন্ন বাজারে মোট যে চাউল আমদানী হয়, তাহার মধ্যে বাহির হইতে আমদানী চাউলের পরিমাণ কম নহে। এই অবস্থায় বাহির হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইলে চাউলের বাজারে যে বিপর্যয় দেখা দিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে!

জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতে থাকায় ভূমির সহিত সম্পর্কহীন বাজারের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে আবার কৃষকদের একাংশ নানা কারণে ভূমিহীন হইয়া পড়ায় ও প্রথমে ফসল বিক্রয় করিয়া পরে কিনিয়া খাইতে বাধ্য হওয়ায় বাজার-বিপর্যয়ের সঙ্গে অভাব সর্বশ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে। যতদিন যুদ্ধের সংকট রহিয়াছে, যে কোন উপায়ে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অন্য ফসলের চাষ কমাইয়া এবং সরকারী সাহায্যে পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা করিয়া বর্তমান ঘাটতির কতকাংশ পূরণ করিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের সমস্যা সাময়িক নহে। যুদ্ধের সংকট উত্তীর্ণ হইলেও আমাদের এই সমস্যা রহিয়া যাইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের জমিতে ফসলের পরিমাণ অনেক কম। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইলে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই ঘাটতির কতকাংশ বা সম্পূর্ণ পূরণ হইবে। কিন্তু এই কল্পিত সমাধানে নিশ্চিন্ত থাকা ভুল হইবে; কারণ, ইহার জন্য ভূমি-ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন দরকার, জনস্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থাপনের জন্য যে প্রকার রাষ্ট্রের প্রয়োজন, তাহার সহিত আমাদের স্বাধীনতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তদ্ব্যতীত ঘাটতি আমাদের যাহা দেখা যাইতেছে, প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। কারণ, যে বহু-সংখ্যক লোক বর্তমানে স্বল্পাহারে থাকিতে বাধ্য হয়, ইহাদের পূর্ণাহারের ব্যবস্থার কথা ভাবিতে হইবে। কাজেই, ফসল বৃদ্ধির সহিত প্রয়োজন বৃদ্ধি প্রায় পাল্লা দিয়া চলিবে।

এই সমস্যা সমাধানের কথা যেদিক দিয়াই চিন্তা করা যাক, দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত ইহা কোথায়ও সম্পর্কশূন্য নহে। যুদ্ধের সময় খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইয়া সমস্যার আশু সমাধানের চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পক্ষে ইহা একটি সস্তা স্লোগান মাত্র। সস্তা স্লোগান এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, খাদ্যশস্যের ঘাটতি আছে, কাজেই খাদ্য-শস্যের চাষ বাড়াও, এই কথার দ্বারা সাধরণ লোকের মন আকৃষ্ট করা খুবই সহজ। প্রকৃতপক্ষে তাহাতে স্থায়ী সমাধান হইবে কি না এবং তাহা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কি না, সেকথা লোকে ভাবিয়া দেখিবার বিশেষ অবসর পাইবে না।

পৃথিবীর যে সকল দেশে খাদ্যশস্যের অনটন আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। খাদ্যশস্য সমাধানের জন্য এই সকল দেশে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যও সেই সকল সমাধানের কথা ভাবিতে হইবে। কোন সস্তা উপায়ের দ্বারা সমাধান হইবে না—জাতীয় স্বার্থও রক্ষিত হইবে না।

খনিজ, কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির পরিবর্তে ভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্য আনাইবার ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতের খাদ্য সমাধান চেষ্টা আমাদের এই পথেই করিতে হইবে।

খনিজ সম্পদে বাঙলা দেশ অবশ্য সমৃদ্ধ নহে। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাট এখনও বাঙলার এক বিশিষ্ট সম্পদ। সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এবং অন্য উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র প্রেরণের জন্য পাট হইতে প্রস্তুত নানা প্রকারের চট থলে প্রভৃতি অপরিহার্য। পাটের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন কোন দ্রব্য আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। অবশ্য পাটের বাজারের চাহিদার ও দরের কিছু স্থিরতা না থাকায় পাট চাষ করিতে যাইয়া বাঙলার চাষী অনেকবার ঠকিয়াছে। ইহার জন্য চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন আছে পাটের বাজারকে বৈদেশিক এবং তাহাদের তাঁবেদার এদেশীয় ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত

হইতে মুক্ত করা এবং পাট উৎপাদনকারীদের স্বার্থের অনুকূলে বাজার নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু বাজারে বিদেশী ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত এদেশীয় সরকারের মারফতেই কার্য করে। কাজেই বাজারের উপর কর্তৃত্ব একান্তই আবশ্যক।

যে সকল দেশে খাদ্যশস্যের স্বল্পতা আছে, তাহারা প্রধানত কারখানা শিল্পের সহায়তায় এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন এবং আমাদিগকেও এই সমস্যা সমাধানের জন্য সেইদিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। অন্য দেশে মাল রপ্তানির কথা যদি আমরা না-ও ভাবি তবুও কারখানাজাত বিদেশ হইতে আমদানী যে সকল দ্রব্য অনুক্ষণ আমাদের প্রয়োজন হয় এবং যাহার জন্য প্রচুর অর্থ বিদেশকে আমাদের দিতে হয়, এদেশে কারখানা শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলে যদি শুধু সেই টাকাটাই আমাদের বাঁচিয়া যায়, তবে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ক্রয় করা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না। যুদ্ধোত্তর কর্মাভাব ও বেকার-সমস্যারও তাহাতে সমাধান হইবে।

কিন্তু কারখানা শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে কি করিয়া বিদেশী বণিক প্রভাবিত সরকারই তাহার পক্ষে বড় বিঘ্ন। এমন কি যুদ্ধের প্রয়োজনের চাপও তাঁহাদিগকে দমাইতে পারে নাই। কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যই ত সাম্রাজ্যের প্রয়োজন। এইভাবে যদিক দিয়াই দেখা যাক জাতীয় মুক্তির চেষ্টা বাদ দিয়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অলস কল্পনা মাত্র।

খেলার নেশায়

(৬০৫ পৃষ্ঠার পর)

এক প্রকার আবেশ বলা চলে। কাঠবিড়াল স্বপ্নাবিষ্ট অথবা যন্ত্রচালিতের ন্যায় দিনের পর দিন ফলমূল বীজ প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহার গুপ্ত ভাণ্ডারে লুকাইয়া রাখে। কিন্তু মজা এই যে কিছুদিন পরেই সে তাহার গুপ্ত ভাণ্ডারের অবস্থানটি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় এবং আর একটি নূতন ভাণ্ডার নির্মাণ করে। প্রকৃতির এই শক্তির অপব্যয় দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হই—ভাবি এ কেমন ছেলে-খেলা। কিন্তু শক্তির এই আপাত অপব্যয়ের অন্তরালে এক কল্যাণকর সৃষ্টির অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে। নানা গাছের বীজ এইভাবে কাঠবিড়ালের দ্বারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেগুলি তাহার সঞ্চয় প্রবৃত্তির ফলে পুনঃপ্রোথিত হইয়া কালক্রমে সুপুষ্ট মহীরুহে পরিণত হয়। কাঠ বিড়াল এখানে প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র—আসলে ইহা প্রকৃতিরই খেলা।

সাহিত্য-সংবাদ

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন
চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন
সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন

বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে ২৪শে ও ২৫শে জুলাই কলিকাতায় বৈষ্ণব সম্মিলনীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে চারিটি বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইবে যথা—(১) সাহিত্য, (২) দর্শন, (৩) কাব্য ও (৪) কীর্তন। সম্মেলনের অধিবেশনের ঠিকানা ও কার্যতালিকা যথা-সময়ে সংবাদপত্র মারফত বিজ্ঞাপিত হইবে। বিভিন্ন শাখার পাঠোপযোগী প্রবন্ধ ও কবিতা সাহিত্যিক কবি ও ভক্তবৃন্দের নিকট আহ্বান করা যাইতেছে। মহিলা-বৃন্দের সহযোগিতাও প্রার্থনীয়। প্রবন্ধাদি আগামী ২২শে জুলাই তারিখের মধ্যে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীকুঞ্জ-কিশোর ভাগবতভূষণ ২৭ আটাপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ইতি (স্বাঃ) শ্রীবঙ্কিম-চন্দ্র সেন ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী সভাপতি ও শ্রীকুঞ্জকিশোর ভাগবতভূষণ, সম্পাদক অভ্যর্থনা সমিতি, বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন।

খেলাধুলা

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ডিভিসনের সকল খেলা এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হইবে। আই. এফ. এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলাও আরম্ভ হইয়া যাইবে। সুতরাং ইতিমধ্যে বিভিন্ন ডিভিসনে কোন্ কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহাও স্থির হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য বৎসর এইরূপ সময় ক্রীড়ামোদিগণ তাহা স্থির হইয়াছে এরূপই দেখিয়াছেন। কিন্তু এই বৎসর তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। অন্যান্য ডিভিসনের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রথম ডিভিসনে কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা জোর করিয়া এখনও বলা যায় না। ইস্টবেঙ্গল এতদিন মোহনবাগান দলকে তিন পয়েন্টে পশ্চাতে ফেলিয়া লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছিল। বর্তমানে এই দুই দলের পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র এক সংখ্যায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা মোহনবাগান দল ইস্টবেঙ্গল দলকে লীগের দ্বিতীয়বারের খেলায় পরাজিত করায় সম্ভব হইয়াছে। উভয় দলের তিনটি করিয়া খেলা বাকী। মোহনবাগান দলকে যে তিনটি খেলায় যোগদান করিতে হইবে তাহার মধ্যে একটি মাত্র খেলায় পয়েন্ট হারাইবার সম্ভাবনা আছে। অপর দুইটিতে এই দল অনায়াসেই বিজয়ী হইবে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল একটি খেলায় বিজয়ী হইবেই, ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। অপর দুইটি খেলায় কি ফল প্রদর্শন করিবে কেহই বলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় এই দুইটি দল শেষ পর্যন্ত সমান সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করিলেও করিতে পারে। সমান সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করিলে পূর্বে গোলের গড়পড়তায় বিজয়ী স্থির হইত, কিন্তু বর্তমানে উভয় দলকে শেষ মীমাংসার জন্য একটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। সুতরাং গোল গড়পড়তায় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান অপেক্ষা ভাল ফল প্রদর্শন করিলেও খেলায় যোগদান করিতে বাধ্য হইবে। তবে এইরূপ অবস্থা যে হইবেই তাহা এখন হইতেই ধারণা করা অন্যায় হইবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সম্বন্ধে ইতিঃপূর্বে যাহা বলা হইল ফলত তাহা না হইতেও পারে। গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি যাহাতে না হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। মোহনবাগান ক্লাবের নিকট পরাজিত হইয়া তাহারা নিজ দলের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছে তাহার পরিবর্তনের জন্য যে তাহারা চেষ্টা করিতেছে, স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধের খেলা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই খেলাটি মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার একদিন পরেই অনুষ্ঠিত হয়। ইস্টবেঙ্গল দল ঐ খেলায় ৪—১ গোলে শোচনীয়ভাবে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে পরাজিত করিয়াছে। এইরূপ ফলাফল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে প্রদর্শন করিবে ইস্টবেঙ্গলের বড় সমর্থকও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, মোহনবাগান দলের নিকট পরাজিত হইয়া ইস্টবেঙ্গল দলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। এবং তাহারা পরবর্তী সকল খেলাতেই পয়েন্ট হারাইবে। কিন্তু ফলত তাহা হয় নাই। সুতরাং যে দুইটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল পয়েন্ট হারাইবে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে, দেখা যাইবে অনায়াসেই সে-সকল পয়েন্ট সে লাভ করিল। অপরদিকে মোহনবাগান যে দুইটি খেলায় সকল পয়েন্ট পাইবেই বলিয়া দৃঢ়তার সহিত ঠিক করা হইয়াছে, তাহার ফলাফল বিপরীতও হইতে পারে। ইহা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে কোন খেলার ফলাফল সম্পর্কেই পূর্ব হইতে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। তবে ইহা সকল ক্রীড়ামোদিকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বৎসর প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া শেষ পর্যন্ত তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বহু বৎসর কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় এরূপ পরিদৃষ্ট হয় নাই।

অধিকাংশ তরুণ বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত কালীঘাট দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের পরেই লীগ তালিকায় স্থান পাইবে বলিয়া ধারণা করা গিয়াছিল। কিন্তু গত কয়েকটি খেলায় এই দলের খেলোয়াড়গণ খুবই নৈরাশ্যজনক ক্রীড়া-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত এই দল তালিকায় চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই মনে হয়। তবে ইহাতে এই দলের পরিচালকগণের হতাশ হইবার কিছুই নাই। বাহিরের অ-বাঙালী খেলোয়াড় আনাইয়া দলের শক্তি বৃদ্ধি না করিলেও ফল যে খুব খারাপ হয় না, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আগামী বৎসরে ফল আরও ভাল হইবে। ভবানীপুর দল শেষ সময়ে ভালই খেলিতেছে। লীগ তালিকায় ইহাদের তৃতীয় স্থান হইতে কোন দলই বঞ্চিত করিতে পারিবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিত করিয়া বলা চলে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলও তরুণ খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত এবং সেই হিসাবে এই দলের ফলাফল প্রশংসনীয়। মহমেডান স্পোর্টিং দল শেষ সময় উচ্চ বিভাগে স্থানলাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। পূর্ব হইতে এইরূপ খেলিলে এই দলের স্থান এত নিম্নে হইত না। ভারতীয় দলসমূহের মধ্যে একমাত্র এরিয়ান্স্ ক্লাবই সকলকে হতাশ করিয়াছে। লীগের দ্বিতীয়বারের বিভিন্ন খেলায় এই দল উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে হতাশ বাক খেলার অবতারণা করিল। এইরূপ অবস্থার মধ্যে খেলোয়াড়গণ যে কেন পতিত হইল বুঝা গেল না। বাঙলার প্রাচীনতম ভারতীয় দলের এই পরিণাম খুবই দুঃখের। শীল্ডের খেলায় এই দলের উন্নতি দেখিলে আমরা খুবই খুশী হইব। নিম্নে লীগ তালিকায় চারিটি দলের ৬ই জুলাই পর্যন্ত যে ফলাফল হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল:—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	২১	১৬	৩	২	৪৮	১১	৩৫
মোহনবাগান	২১	১৪	৬	১	৩৩	৬	৩৪
ভবানীপুর	২১	১২	৫	৪	৩৮	১৫	২৯
কালীঘাট	২১	৮	৮	৫	২৩	১৯	২৪

আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতা ১৩ই জুলাই হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গেল। বাহিরের কয়েকটি বিশিষ্ট দল এইবার প্রতিযোগিতা করিবে ইহাও কর্তৃপক্ষীয়গণ প্রচার করিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়—খুবই ভাল। বাহিরের দলের খেলা দেখিবার সকলেরই সৌভাগ্য হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৯শে জুন

বাঙলার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায় গত ২৭শে জুন নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে তাঁহার নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

৩০শে জুন

"আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে"র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অদ্য প্রাতে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর ২৭শে আগস্ট তারিখে ভারতরক্ষা বিধানে ১২৯ ধারা অনুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে নিরাপত্তারক্ষার্থ বন্দী হিসাবে আটক ছিলেন।

ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল আর্ল উপাধি লাভ করিয়াছেন।

লণ্ডনের গিল্ড হলে মিঃ চার্চিলকে লণ্ডনের স্বাধীন নাগরিক সম্মানে ভূষিত করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে মিঃ চার্চিল এইরূপ আভাষ দেন যে, শরৎকালের অবসানের পূর্বেই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এবং অন্যত্র ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে।

জার্মান ওভারসীজ রেডিও হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটিশ ব্যাটলশিপ "নেলসন" ও "রডনী" বিমানবাহী জাহাজ "ফরমিডেবল" সহ ১২খানি বৃটিশ ও দুইখানি ফরাসী রণতরী বর্তমানে জিব্রাল্টারে রহিয়াছে।

১লা জুলাই

ভারতের খাদ্যাভাব সম্বন্ধে তাঁহার কোন তথ্য আছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী অদ্য কমন্স সভায় ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি জানান যে, পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। এই বসন্তকালে প্রচুর গম উৎপন্ন হওয়ায় মোটামুটি খাদ্যশস্যের অভাব নাই। কিন্তু তথায় খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যবস্থা অতিশয় খারাপ; ইহার জন্য নীচে কৃষক হইতে উপরস্থ ...ন্ত পক্ষই দায়ী।

মিঃ ডি ভ্যালেরা পুনরায় আয়ারের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ৬৭ এবং বিপক্ষে ৩৭ ভোট হইয়াছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী নিউগিনির উত্তর উপকূলে নাসাউ উপদ্বীপ এবং ট্রোবিয়াণ্ড ও উডলার্ক দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে। মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা নিউ-গিনিতে সালামাউয়ার নিকটে এক স্থানে অবতরণ করিয়াছে। তাহারা এখন নিউ জর্জিয়া দ্বীপপুঞ্জেও আক্রমণ চালাইতেছে।

২রা জুলাই

ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় গত রাত্রে জনৈক বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাত করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত কৃষ্ণরাজ এম ডি থ্যাকারসে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, দেশের সর্বত্র শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ তাঁতে সকল শ্রেণীর উপযোগী বহু ও বিভিন্ন প্রকারের স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহার মতে কাপড়ের পাইকারী মূল্য তাহাদের সর্বোচ্চ মূল্য হইতে শতকরা ২৫, হইতে ৪০, টাকা পর্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন বাহিনী ৩০শে জুন রেনডোভায় অবতরণ করে এবং তথাকার জাপ সৈন্যদলকে ধ্বংস করিয়া সাফল্যের সহিত রেনডোভা দখল সম্পূর্ণ করে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, সমগ্র বল্কান এলাকার জন্য এখন সোফিয়ায় এক্সিসপক্ষের হেড কোয়ার্টার্স স্থাপিত হইয়াছে।

৩রা জুলাই

অদ্য ঢাকায় আর এক ব্যক্তিকে ছোরা মারা হয়; আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে গবর্নমেণ্ট যে অর্থ সাহায্য দানের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কংগ্রেস ইতিপূর্বে তাহা ভেটো দিয়ে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে কংগ্রেসের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতিনিধি পরিষদ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিয়াছেন।

৪ঠা জুলাই

মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় নিউ জর্জিয়া দ্বীপমালা হইতে নিউগিনি এবং নিউগিনি হইতে টিমর ও ডাচ ইণ্ডিজের সেলিবিস পর্যন্ত বিস্তৃত দুই সহস্র মাইল রণাঙ্গন জুড়িয়া অদ্য আকাশ যুদ্ধ ও বিরাট বিমান আক্রমণ শুরু হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির জন্য তিন দিনব্যাপী যুদ্ধে এই প্রথমবার মার্কিন ও জাপ নৌবহরের মধ্যে সংঘর্ষ হইল।

রোম বেতারে বলা হইয়াছে যে, পালেরমোতে এমনভাবে বোমা ফেলা হইয়াছে যে, শহরটি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৫ই জুলাই

অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই দিন ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এবং বিগত মন্ত্রিসভায় তাঁহার অপর তিনজন সহকর্মী শ্রীযুত সন্তোষ-কুমার বসু, শ্রীযুত প্রমথনাথ ব্যানার্জি ও মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ তাঁহাদের পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিগত মন্ত্রিসভাকে আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া মন্ত্রিত্বের গদী হইতে নিয়মতন্ত্র-বিরুদ্ধ উপায়ে অপসারিত করা হয়, তাহার কাহিনী বিবৃত করিয়া বিস্তৃত ৪টি বিবৃতি দেন।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মান সৈন্যেরা গ্রীক থ্রেসের উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং তুরস্কের সীমান্তে অবস্থিত শহরগুলি দখল করিয়াছে। পূর্বে এই এলাকা বুলগেরিয়ান সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

গতকল্য মিত্রপক্ষের বিমান বহর সিসিলিতে প্রতিপক্ষের বিমান ঘাঁটিসমূহে আক্রমণ চালায়।

পোলিশ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল সিকোরস্কি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়

মৌচাক:—সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার; প্রকাশক—এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা মূল্য পাঁচ আনা।

মৌচাক ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বর্তমানে ২৪ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই দীর্ঘ বৎসরের সাহিত্য সাধনায় বাঙলা শিশু সাহিত্যে 'মৌচাক' মাসিক পত্রিকার দান অফুরন্ত।

এই পত্রিকার বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য এই যে, বাঙলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সকল লেখকই নিয়মিতভাবে 'মৌচাকে'র মধুভাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের লেখায়, সম্পাদকের সম্পাদনায় এবং প্রকাশকের ঔদার্যে পত্রিকাখানি স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আজও পর্যন্ত বাঙালী এবং প্রবাসী ছেলেমেয়েদের প্রিয়পাত্র হইয়া রহিয়াছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় এই সংখ্যা যাঁহাদের লেখায় সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসুনির্মল বসু, শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় প্রভৃতি।

আলোচ্য বৎসরের 'মৌচাকে' বাঙলা সাহিত্যের তিনজন খ্যাতনামা লেখকের যে ধারাবাহিক লেখা বাহির হইতেছে, তাহা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস এবং শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ কাহিনী। বর্তমান সময়ে কোন মাসিক পত্রিকাতেই এইরূপ তিনজন বিশিষ্ট লেখকের সমন্বয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমরা ছেলেমেয়েদের এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচার এবং আর্থিক উন্নতি কামনা করি।

দেশ

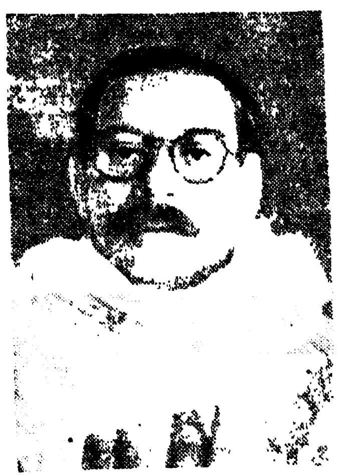
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ। শনিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৫০ সাল। Saturday, 3rd July, 1943. [৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের মুক্তি

গত ১৫ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত বৎসর ২৭শে আগস্ট তারিখে ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারানুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বন্দী অবস্থায় মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহাকে কয়েক মাস পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজে রাখা হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থার বিশেষ কোনরূপ উন্নতি ঘটে না। মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্যের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি আমরা বারংবার বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। শুধু স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিয়াই বহুদিন পূর্বেই তাঁহাকে মুক্তিদান করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, এতদিন পরেও যে বাঙলা সরকার তাঁহাকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও অত্যন্তই শোচনীয়। তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া বর্তমানের এই সংকট-



শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার

কালে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হউন, আমরা ভগবানের কাছে ইহাই প্রার্থনা করি।

খাদ্য সম্মেলন

বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে বাঙলা দেশকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য গভর্নমেন্টের নিকট দাবী করা হইয়াছে। 'দুর্ভিক্ষ' এই কথাটা এদেশের শাসকবর্গের পক্ষে চিরদিনই শ্রুতিকটু। তাঁহারা কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহেন না। তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা এই যে, দেশের লোকের ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এত বেশী এবং ঘাস পাতা প্রভৃতির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার দক্ষতা এমনই স্বাভাবিক যে, এদেশের শব্দকোষে 'দুর্ভিক্ষ' কথাটির প্রয়োগ একরূপ অবান্তর। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এদেশের শাসকবৃন্দের এমন মনোভাবের প্রধান কারণ এই যে, কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিলে সে অঞ্চলের লোকের অন্ন-সংস্থানের ভার গভর্নমেন্টের উপর আসিয়া পড়ে। তাঁহারা

ইহাতে রাজী হইতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাঙলা দেশের অবস্থা বর্তমানে যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও যদি দুর্ভিক্ষের অবস্থা না হয়, তবে দুর্ভিক্ষ যে কিসে হইতে পারে ইহা ধারণা করা যায় না। দেশের লোকের প্রতি গভর্নমেন্টের যদি কোন কর্তব্য থাকে তবে লোককে অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখা তাঁহাদের সব চেয়ে বড় কর্তব্য। খাদ্য সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার অভিভাষণে সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন যে কি ভারত গভর্নমেন্ট কি বাঙলা দেশের প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট উভয়েই এই দায়িত্বকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সমর বিভাগের অভাব মিটানোই যেন তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সমর বিভাগের শৃঙ্খলা বিধান এবং সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিবার কর্তব্য গভর্নমেন্টের না আছে এমন নয়; কিন্তু দেশের লোকের অন্নসংস্থান সমর বিভাগের স্বার্থের দিক হইতেও একটা বড় ব্যাপার। যুদ্ধের সময় সব দেশের গভর্নমেন্টই এদিকে প্রথমে লক্ষ্য রাখেন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার গভর্নমেন্ট কর্তৃক সেই সেই দেশে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহই এ পক্ষে বড় নজীর রহিয়াছে। কিন্তু এদেশে সে ভাবনা কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে নাই; কিংবা এখনও করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এই যে ঐ সব দেশের গভর্নমেন্ট জাতীয় গভর্নমেন্ট; অর্থাৎ যে সব গভর্নমেন্ট দেশের লোকের দ্বারা দেশের স্বার্থের জন্য পরিচালিত হইয়া থাকে। এদেশে যদি সেইরূপ জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত তবে তাঁহারা নিদারুণ এই খাদ্য সমস্যা যাহাতে দেখা না দিতে পারে পূর্ব হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া তৎসম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করিতেন। তাঁহারা এ সমস্যাকে চাপা দিয়া সমধিক জটিল করিয়া তুলিতেন না। আজ যে বাঙলা দেশ জোড়া অন্নাভাবে এমন হাহাকার উঠিয়াছে, ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ এই যে এ সমস্যাকে আগাগোড়া অনেকটা উপেক্ষার মনোভাব লইয়া কেবল চাপা দিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

কাজ চাই

শাসকবর্গের মুখে আমরা আগাগোড়া এই একই কথা শুনিয়াছি যে, দেশে খাদ্যের অভাব নাই এবং সেজন্য চিন্তাও নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদেশের লোকের সহিত [illegible] সম্পর্কযুক্ত নহেন, সেই সব সিভিলিয়ান রাজকর্মচারী; কেবল ভারত সরকারের দপ্তর হইতে আমাদিগকে এমন কথা শুনাইতেছেন ইহা নয়; এদেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের গর্ব যাঁহারা করেন, সেই সব মন্ত্রীর মুখেও আমরা ঐ কথা শুনিয়াছি। বাঙলার খাদ্যসচিব সেদিন পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, বাঙলা দেশে খাদ্যের অভাব নাই; বাঙলার বর্তমান অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ও খাদ্যসচিবের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, খাদ্য সমস্যার অচিরেই সমাধান হইবে এবং এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, বড় জোর তিন সপ্তাহের মধ্যেই চাউলের দর নামিয়া যাইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তিন সপ্তাহের পর, আরও তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, চাউলের দাম কিছুই কমিল না। মজুত-বিরোধী অভিযানের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া খাদ্যসচিবকে অবশেষে স্বীকার করিতেই হইল যে, বাঙলা দেশে সত্যই চাউলের অভাব ঘটিয়াছে। এই অভাব মিটাইবার জন্য তিনি সোজাভাবে মণ্ড খাইবার উপদেশ দিলেন; কিন্তু সে মণ্ড প্রস্তুতের উপাদানও যে কোথা হইতে আসিবে দেশবাসীকে তাহার কিছু সন্ধান দিলেন না। বর্তমান যুদ্ধের মত একটা ব্যাপক যুদ্ধের অবস্থায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে এইটুকু জ্ঞান যাঁহাদের নাই এবং দেশের লোককে এমন অবস্থায় মণ্ড খাইবার ব্যবস্থা দিয়া যাঁহারা কর্তব্য পালন করিতে চাহেন, তাঁহাদের উপর লোকে কিরূপে আস্থা-স্থাপন করিতে পারে? বাঙলার মন্ত্রীদিগকে এই সহজ সত্যটি আজ উপলব্ধি করিতে হইবে এবং দেশের লোকের অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। খাদ্য সমস্যা বাঙলা দেশের বর্তমানে প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, শুধু তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য দেশের লোকে তাঁহাদের মোটা বেতন যোগাইতে প্রস্তুত নহে।

সমাধানের উপায়

চাউলের যখন অভাব ঘটিয়াছে, তখন তাহা যোগাইব কোথা হইতে? এমন কথা বলিয়া দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। আজ সোজাসুজি স্বীকার করিতে হইবে যে, চাউলের অভাব ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে বাঙলা দেশ জোড়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দেশের লোককে অন্ন দিয়া বাঁচাইতে হইবে; সেজন্য সর্বপ্রথমে এ দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য বিদেশে দাতব্য একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এদেশের লোক না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, এমন অবস্থায় আরব, পারস্য, তুরস্ককে অন্ন বিতরণ করিবার অবসর এদেশের লোকের নাই। শুধু ইহা করিলেই চলিবে না, বিদেশ হইতে যে সব সৈন্য এদেশে আসিতেছে, তাহাদের খাদ্য-সংস্থানের ব্যবস্থাও অন্য দেশ হইতে করিতে হইবে। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি যে সব দেশে এখনও খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, সৈন্যদের জন্য সেই সব দেশ হইতে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। প্রদেশের এই নিদারুণ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত ব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা এবং সমর্থন থাকা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা উপদলীয় স্বার্থকে সরকারী নীতি হইতে নির্মমভাবে উৎখাত করিয়া ফেলিতে হইবে। মন্ত্রীবিশেষের বা কর্মচারীবিশেষের সদিচ্ছা কিংবা সাধুতাই এক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে পারে না। ব্যক্তিগত বিচার বা সতর্ক দৃষ্টি এক্ষেত্রে কোনক্রমেই নীতিগত ত্রুটি হইতে নির্মুক্ত হইতে সমর্থ নয়; এক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থায় দেশের সর্ব সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ সর্বদলীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার। বাঙলা দেশ জীবন-মরণ সমস্যায় পতিত হইয়াছে এবং পরীক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করিবার দিন আর নাই।

মাইকেল মধুসূদন

গত মঙ্গলবার মাইকেল মধুসূদনের সপ্ততিতম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হইয়াছে। ৭০ বৎসর পূর্বে বাঙালী যে মানুষটিকে হারাইয়াছে বাঙলা সাহিত্যে এবং বাঙলা দেশের সংস্কৃতিতে তাঁহার অবদান যে কত বেশী ছিল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মধুসূদন বাঙলা দেশকে কি দিয়াছেন, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, বাঙলা দেশের সংস্কৃতির মর্মমূলে তিনি দুরন্ত আবেগময় একটা বৈপ্লবিক প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অধীনতার অবসন্ন জীবনে তিনি জাগাইয়াছিলেন প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভিমুখে জাতির অন্তরে আলোড়ন; সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বৃহত্তর অনুভূতির আত্যন্তিক এবং উদগ্র বেদনা। প্রচলিত ধর্ম সংস্কারের মাপকাঠিতে মাইকেলের এই অবদানের স্বরূপ উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে কঠিন

বৈকাস্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

১

পরের দিন হইতে আমার যেন কি হইল। খাইয়া, শুইয়া স্কুলে গিয়া লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া কিছুতেই আর শান্তি পাই না। সর্বক্ষণ মনের ভিতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মনে হয় এমন একটা কি বস্তু হারাইয়া ফেলিয়াছি যাহা আমার সমস্ত প্রাণশক্তিকে দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত। হেডমাস্টার মশায় পড়াইতে পড়াইতে কত-দিন সতর্ক করিয়া দিয়াছেন আমি নাকি পড়াশুনায় অমনোযোগী হইয়া পড়িতেছি। পড়িতেও কোথায় কোনরূপ রুচি খুঁজিয়া পাই না, হাতের মধ্যে পয়সা রাখিয়া সারা বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই তোটাইয়া তিনটে জিনিষ কিনিতে গিয়ে হয়ত দুইটা আনি একটা ভুলিয়া যাই এবং অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া আনিয়া বকুনি খাই।

ইহার উপর বাড়িতে বেশীক্ষণ ভাল লাগে না অথচ বাড়িরে গিয়েও থাকিতে পারি না। শান্তিদের দলের মেয়েরা খেলিবার জন্য আমাকে ডাকে কিন্তু তাহাদের মধ্যে গিয়া মন আরো খারাপ হইয়া যায় —শান্তি যে নাই সেই কথাটি কেবল বারিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে। তাই তাহাদের সঙ্গে যেমন মিশিতে পারিতাম না তেমনি আবার একা থাকিতেও ভাল লাগিত না, কেবল চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িতাম।

বকুল গাছের তলা দিয়া আর হাঁটিতে পারি না যে সমস্ত ফুলগাছ হইতে শান্তিকে ফুল পাড়িয়া দিতাম এমন কি যে সব ফুল ছিল তাহার খুব প্রিয় তাহাদের দিকে চাহিলেই যেন চোখে জল আসিয়া পড়িত। কেন আমার এমন হয়? অন্য সকলে যখন হাসিতেছে খেলিতেছে, পড়িতেছে লিখিতেছে আমি তখন কেন পারি না? কেন এই সব চিন্তা আমায় অস্থির করিয়া তোলে?

মাতৃস্নেহের জন্য আমার অন্তরে নিদারুণ হাহাকার ছিল কিন্তু ইহা যেন তাহার চেয়েও বৃহত্তর মহত্তর কিছু, যাহা পাইবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণ ও মন একসঙ্গে লালায়িত হইয়া উঠিল। আমার কিশোর মনে কোন্ বীণায়, কি সুর সে বাজাইয়া গেল যাহা কখনো শুনি নাই —কোথাও দেখি নাই। তাই নির্জন স্থানে বসিয়া একাকী হৃদয়ের দ্বারে কান পাতিয়া থাকিতাম যদি কখনও তাহার অনু-রণন শুনিতে পাই। ভাল লাগিত না কোন সঙ্গী কোন সাথী। মনে হইত এই জগত সংসারে আমি একা আমার মনের কথা বুঝিবার কেহ নাই।

মানুষের মন পদ্মানদীর মত তাহাতে কখন ভাঙ্গন ধরে বাহির হইতে বোঝা শক্ত। তাই ইহার কিছুদিন পরে প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি সাধারণ ছেলের মত নম্বর পাইয়া উঠিলাম তখন আমার চেয়েও বেশী লজ্জা পাইলেন বুঝি হেডমাস্টার মহাশয়। তাঁহার ঘাড় হেঁট হইয়া গেল সকলের কাছে কেননা আমার সম্বন্ধে তিনি বড় মুখ করিয়া অনেকের কাছে অনেক কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। তবু কিন্তু তিনি দমিলেন না। অপর শিক্ষক-মহাশয়দের বলিলেন যে ছেলে হাফ-ইয়ার্লী পরীক্ষায় এ রকম আশ্চর্য নম্বর পায় সে কখনো 'এ্যানুয়েলে' এত কম নম্বর পেতে পারে?

হেড পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে আমরা পাচ্ছি মাস্টার-মশায়। আপনি যে ওকে কি চোখে দেখেছেন জানি না। যে ছেলে এক এক একজামিনে এক এক রকম নম্বর পায় তার ওপর কি করে আপনি এত আস্থা রাখেন বুঝতে পারি না। আমাদেরও মনে হয় বইটই টুকে কিংবা কোন অসাধু উপায়ে নম্বর পেয়েছিল আগের পরীক্ষায় এবার সুবিধা করতে পারেনি হয়ত; কি বলেন আপনারা? বলিয়া তিনি উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়দের দিকে চাহিলেন।

কেহ কেহ তাহাতে ক্ষীণকণ্ঠে সায় দিলেন কেহ বা শুধু ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন অবশ্য এ রকম মনে করলে যে বিশেষ অন্যায় করা হবে তা নয়—তবে অন্য কোন কারণ যে একেবারে থাকতে পারে না তাও বলা যায় না।

হেডমাস্টার মহাশয় এই শেষোক্ত মন্তব্য শুনিয়া খপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, কি হয়েছিল আমি খোঁজ নিচ্ছি। এই বলিতে বলিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেই দিনই তিনি চুপি চুপি আমাকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন কি হয়েছে তোর সত্যি করে বল, আমি জানি তুই কিছুতেই এরকম কম নম্বর পেতে পারিস না!

আমি কোন উত্তর না দিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তখন তিনি আমায় বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন কি হয়েছে বল বাবা, আমার কাছে লুকোতে নেই—শিক্ষক গুরু —পিতৃস্থানীয়—বল কি হয়েছে?

এইবারও তেমনি নীরব রহিলাম, শুধু দুই ফোঁটা জল আমার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আমার কান্না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তারপর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, আমি কিছু-দিন থেকে লক্ষ্য করছি তুই বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে থাকিস।........আমার কাছে গোপন করিসনি বাবা বল কি হয়েছে; তোর ত সব জানা ছিল তবে লিখতে পারলি না কেন?

বলিলাম, আমার ভাল লাগে না কিছু, স্যার।

কেন? তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তা বলতে পারবো না স্যার, আমার মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হুঁ, বলিয়া হেডমাস্টার মশায় তাঁহার চশমার মোটা কাঁচের ভিতর দিয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বুঝেছি ফিজিক্যাল এক্সার-সাইজের অভাব।...তুই কতক্ষণ করে রোজ খেলাধূলা করিস?

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, একদম না।

তিনি যেন লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তা হবে না, কাল থেকে তুই রোজ স্কুলে খেলতে আসবি?

বলিলাম খেলতে যে আমি জানি না স্যার।

তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, জানি না কি শিখে নিবি। কাল থেকে আমি রোজ মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, তুই আমার সামনে খেলবি। কোচিং পড়া এখন বন্ধ থাক—কিছুদিন পরে হবে।

তখন হইতে প্রত্যহ তিনি মাঠে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং আমার খেলার অপটুতা দেখিয়া অন্য ছেলেরা যখন হাসিয়া উঠিত তাহাদের ধমকাইতেন। পাছে আমি লজ্জা পাইয়া আর না খেলি এই ভয়ে তিনি নিজে যেন আমায় পাহারা দিতেন।

এইভাবে মাস তিন চার কাটিয়া যাইবার পর হেডমাস্টার মশায় আবার আমায় কোচিং পড়াইতে লাগিলেন। তবে এবার সময় খুব কমাইয়া দিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে রোজ যাহাতে কিছুক্ষণ করিয়া বেড়াইতে পারি সেদিকে তিনি কড়া নজর রাখিলেন। পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ একসময় তিনি বলিয়া উঠিতেন, আর নয় থাক আজ এই পর্যন্ত—আমিও উঠিয়া দাঁড়াইতাম। তখন তিনি একবাটি দুধ আমায় খাইতে দিতেন। ইহা তাঁহার বিকালের খাদ্য, বাহিরের ঘরে বই চাপা থাকিত। আমি দুধ খাইতে আপত্তি করিতাম। বৃদ্ধ ও দরিদ্র শিক্ষককে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য মুখে তুলিতে কেমন যেন লজ্জা করিত। কিন্তু তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা, নিজে বাটিটা আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিতেন, তুই জানিস্ না, দুধ খেলে 'মেরিট' খুব বাড়ে।

অগত্যা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পন করিতে হইত। আজ ভাবি, হায় সেদিন যদি তিনি আমার মাথাটার কথা চিন্তা না করিয়া মনটার দিকে মনোযোগ দিতেন তাহা হইলে হয়ত জীবনের ইতিহাস অন্যরকম হইয়া যাইত।

যাহা হউক এইভাবে কোচিং পড়িয়া কোনদিন বিকালে বেড়াইতে যাইতাম কোনদিন বা ভাল লাগিত না—চুপচাপ বাড়িতে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। একদিন চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় খেঁদী আসিয়া কতকটা যেন গায়ে পড়িয়া এই সংবাদটি দিয়া গেল, জানো আলোকদা, শান্তিরা সকলে এখান থেকে কাল চলে যাবে—তার মামা কলকাতায় একটা ভাল চাকরী পেয়েছে, তাই বাসা করে সেখানে থাকবে, এখানে আর আসবে না।

হঠাৎ মনটা খুব দমিয়া গেল। তাহা হইলে আর শান্তির সঙ্গে দেখা হইবে না? এতদিন তবু মনের কোণে তিল তিল করিয়া যে বাসনা জমা হইয়াছিল, আজ তাহা খেঁদী যেন নির্মম হস্তে ভাঙিয়া চুরিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়া গেল। শান্তির বর দিল্লীতে ভাল চাকরী করিত। তাই বিবাহের পর সেখানে সে চলিয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, এক বৎসর পরে ছুটি লইয়া তাহারা নাকি আবার জোড়ে আসিবে। তবু একদিন দেখা হইবে—গোপনে আমার মন বুঝি সেই দিনটিরই হিসাব গুণিতেছিল। তাই আর তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না, এই কথা চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের সমস্ত রক্ত যেন এক সঙ্গে মাথার দিকে ছুটিতে লাগিল। আমি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম বাড়ি হইতে।

প্রথমেই সেই বকুলতলায় গিয়া দাঁড়াইলাম। গাছে ফুল ছিল না তবু সেই গাছটার দিকে চাহিয়া আমার চোখ যেন জুড়াইয়া গেল। ইহারই তলায় বসিয়া কতদিন শান্তি ফুল লইয়া মালা গাঁথিয়াছে, খেলা করিয়াছে—কত হাসিয়াছে, কত দুরন্তপানা করিয়াছে সেদিনের সেইসব স্মৃতি যেন গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় তখনো কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে। শান্তিকে আবার দেখিতে পাইব, এই আশা যতদিন মনে ছিল ততদিন এই গাছতলায় আসিতে পারিতাম না, মনের ভিতরটা যেন হু হু করিয়া উঠিত। অথচ আজ যখন শান্তিকে দেখিতে পাইবার আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল তখন সেই স্থানটাই কেমন মধুর বোধ হইতে লাগিল। তাহার পরের দিন হইতে যেসব স্থানে শান্তি খেলা করিত, যে ফুল ভালবাসিত, কোন অদৃশ্য শক্তি যেন সেইদিকে আমার মনকে অহরহ আকর্ষণ করিত। তাহারা যেন আমার কাছে তাহার স্মৃতির মত প্রিয় হইয়া উঠিল। আমি চুপি চুপি সেইসব স্থানে গিয়া বসিয়া থাকিতাম।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া যাইবার পর একদিন আমি রায়বাগানের ভিতর দিয়া, চৌধুরীদের দীঘির ধারে আসিয়া বসিলাম। জায়গাটি যেমন নির্জন তেমনি মনোরম। একদিকে দীঘির উচুঁ পাড় যেন পাহাড়ের মত উঠিয়া গিয়াছে; তাহাতে পলাস শিমুলের ঠেলাঠেলি। নববসন্তের অনুরাগে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সর্বাঙ্গ। অন্যদিকে—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু ছোট বড় অসংখ্য তরুশ্রেণী তাহাদের বক্ষে নবকিশলয় ধারণ করিয়া কিসের আবেশে বারবার শিহরিয়া উঠিতেছে। আসেপাশে ছোট ছোট কাশের গুচ্ছ—তাহাদের মাথায় এখন ফুল নাই, কিন্তু তবুও পশ্চিম আকাশ হইতে অস্তগামী সূর্যের শেষ আভাটুকু আসিয়া পড়িয়া রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। এইসবের মধ্যে শান্তি লুকোচুরি খেলিত। সেইসব দিনের কথা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, আমার পিছনে যেন কাহারা কথা বলিতেছে মৃদুস্বরে। ঘাড় ফিরাইলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অথচ মনুষ্য কণ্ঠস্বর তখনো কানে আসিতেছিল। আমার ঠিক পিছনে কতকগুলি কাশের গুচ্ছ একত্রে জড়াজড়ি করিয়া একটা পরিখার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমি হাত দিয়া কাশের কতকগুলি ধারালো পাতা ফাঁক করিতেই দেখিলাম, অদূরে কমলের কোলে মাথা রাখিয়া মধু শুইয়া আছে। তাহারা কথা বলিতেছে কিন্তু উভয়ের মুখ হাসিতে-খুসীতে যেন উদ্ভাসিত। ঠিক ঐ জায়গায় একদিন শান্তিকে কমলের মত বসিয়া থাকিতে আমি দেখিয়াছিলাম। কমলকেও ইতঃপূর্বে কতবার দেখিয়াছি—বোধহয় প্রত্যহই; কিন্তু আজ মনে হইল যেন নূতন করিয়া তাহাকে দেখিলাম। নিমেষে যেন একটা বিদ্যুতের শিখা আমার সমস্ত দেহকে সচকিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কমল আমার চোখের সামনে নূতন হইয়া উঠিল। এযেন সে কমলই নয়—যাহাকে আমি এতদিন এতবার দেখিয়াছি। কোন শিল্পীর খেয়ালে একই মানুষ এমন করিয়া সহসা চোখের সামনে অন্যরূপ ধরিয়া আসে তাহা বোধ হয় মানুষের জ্ঞানের অতীত। তাই যে কমলকে এতদিন স্বেচ্ছায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহাকেই আবার আপন করিবার জন্য সেদিন আমার অন্তরে এক দুরন্ত বাসনা জাগিল। আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'কমল' বলিয়া ডাকিয়া একেবারে তাহাদের নিকটে গিয়া হাজির হইলাম।

কমল ও মধু বোধ হয় এতক্ষণ কোন একটা মধুর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিল তাই হাসিতে ও আনন্দে তাহাদের চোখমুখ অমন উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আমি তাহাদের মধ্যে যাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। যদিও তাহারা দুইজনেই আমায় সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিল তবুও যে হাসি তাহাদের মুখে এতক্ষণ দেখিয়াছিলাম, আমার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্ধানে আমার মনটা বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কি এমন কথা তাহারা কহিতেছিল যাহার আনন্দ আমাকে দেখিয়া তাহাদের মন হইতে বিলুপ্ত হইল! তবে কি আমি তাহাদের আনন্দের সাথী নহি?

ইহা লইয়া আমি যখন মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছিলাম তখন কিন্তু তাহারা দুইজনে আমায় নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিল—'কিরে হঠাৎ আজ এদিকে কি মনে করে' -আজ মেয়েদের সঙ্গে খেলা করলি না? 'রোজ বিকেলে এখন কোথায় যাস্"

কার সঙ্গে বেড়াস্ ইত্যাদি ইত্যাদি এক ঝুড়ি প্রশ্ন এক সঙ্গে করিয়া বসিল।

আমি মুখে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকিলেও মনে মনে কিন্তু উপলব্ধি করিতেছিলাম যে ইহার মধ্যে কোথায় যেন মৃদু খোঁচা রহিয়াছে।

কমল বলিল, এতদিন পরে কি আমাদের কথা মনে পড়লো?

কমলের দেহ ছিল সুন্দর, ভঙ্গুর ও কমনীয়। মাথায় বড় বড় চুল—স্বপ্নালস দীর্ঘ চোখ, মিষ্টভাষী ও ভাবপ্রবণ। তখন তাহার মুখ হইতে এই কথাটি শুনিয়া বেশ ভাল লাগিল। তাই একটু মিষ্টি করিয়াই জবাব দিবার ভাষা খুঁজিতেছিলাম,—এমন সময় মধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে আনন্দের চেয়ে বিদ্রূপই যেন বেশী বলিয়া আমার মনে হইল। বলিলাম, এইদিকে বেড়াতে এসেছিলুম হঠাৎ তোদের দেখতে পেয়ে এলুম।

মধু খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিল ওঃ তাহ'লে আমাদের কথা মনে পড়েনি? মনে হইল বলি অন্ততঃ তোমার কথা মনে পড়ে নাই কিন্তু পারিলাম না। আমি বলিবার আগেই কমল সহসা তাহার ডান হাতখানা মধুর মুখে চাপিয়া ধরিল তারপর উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া নীরবে কি বলিল জানি না তবে মধু সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। সে থামিল বটে কিন্তু তাহার উপর আমার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমরাও ত আমার কোন খোঁজ নাও না?

আমার মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিবে ইহা যেন তাহারা আশা করে নাই। সেই জন্য আবার মধু ও কমল উভয়ে শুধু উভয়ের সঙ্গে একবার নীরবে দৃষ্টিবিনিময় করিয়া চুপ করিয়া গেল।

ইহা লক্ষ্য করিয়া আমার অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহাদের মধ্যে কোথায় কি একটা গোপন কথা আছে যাহা আমি জানি না—যাহাতে আমার অধিকার নাই।

আমি বিস্মিত হইলাম। একদিন আমার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যাহারা উন্মুখ হইয়া থাকিত তাহাদের একি পরিবর্তন? তখন বুঝিতে পারি নাই যে ইহার জন্য দায়ী একমাত্র আমি। আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় বসিয়া নিজের অন্তরে বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার পর এই জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছি যে কোন মানুষই কাহারো, বিশেষ করিয়া কোন প্রিয়জনের অবহেলা সহ্য করিতে পারে না। প্রত্যেকেই চাহে তাহার প্রতিটি ভাবভঙ্গী স্নেহভালবাসার প্রতিটি কার্যকলাপে [illegible] অন্যের কাছে উপযুক্তভাবে সমাদৃত হয়। তাই আয়নায় মুখ দেখিবার মত যাহার ভিতরে লোক নিজেকে দেখিতে পায় সেইখানে বাঁধা পড়ে। এই বন্ধনের নাম স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, প্রেম। বস্তু এক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করে। একের যেন বহু রূপ।

আজ ভাবি দোষ আমার নিজের তাহাদের নহে। আমার অবজ্ঞা তাহাদের দুইজনকে আরো নিবিড় আরো ঘনিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ ছোটই কি আর বড়ই কি—কেহ একলা থাকিতে পারে না। তাই বৃদ্ধরা বৃদ্ধের সঙ্গ কামনা করে—যুবকরা যুবকের, বালকরা বালকের, ইহা যে মানুষের প্রকৃতি—স্বভাবের ধর্ম!

যাহা হউক এই সব বড় বড় কথা চিন্তা করিবার মত বয়েস বা বুদ্ধি তখন আমার হয় নাই সেই জন্য অভিমানটা কমলের উপরই হইল বেশী। ভুতোর কথা তখন আমার স্মরণ হইল। সে একদিন বলিয়াছিল কমলকে আমার চেয়ে সে ভালোভাবেই চেনে। বাস্তবিক তাহার কথাই সত্য। সেদিন তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়া আজ অনুতাপ হইতে লাগিল। তবু আরো কিছুক্ষণ দুই চারিটা বাজে কথা কহিবার পর আমি বলিলাম আচ্ছা তবে আসি ভাই।

কমল ও মধু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, আমরাও যাবো, এখানে আমরা থাকতে আসিনি।

এই বলিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা তিনজনে তখন একসঙ্গে বাড়ির পথে হাঁটিতে লাগিলাম। মনে পড়িল আগে এই পথ দিয়া তিনজনে একত্রে বেড়াইয়া ফিরিতাম, সেইদিনের সঙ্গে আজকের কত তফাৎ। তখন মনে হইত যেন তিনজনের অন্তরে কোথাও কোন ফাঁক নাই আর আজ মনে হইতেছে তাহাদের মধ্যে আমি যেন প্রক্ষিপ্ত। তাহারা দুইজনে হাসিয়া হাসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল তবুও যেন এ হাসির সঙ্গে সেদিনের অনেক তফাৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই প্রভেদটুকুর কথা স্মরণ করিয়া কেন জানি না সারাপথ আমার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল। সেইদিন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর ইহাদের সঙ্গে কোনদিন বেড়াইবার নাম করিব না। একাই আমার ভালো।

বাড়িতে আসিয়া আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলাম। একে আমি বাড়িতে বেশী কথা কহিতাম না তাহার উপর পরীক্ষায় এইরূপ আশাতীত কম নম্বর পাইয়া নিজেই যেন সর্বদা নিজের কাছে লজ্জিত হইয়া থাকিতাম। অবশ্য জ্যাঠামহাশয় ইহার জন্য কিছুই আমায় বলেন নাই বরঞ্চ তাঁহার এই ঔদাসীন্যই আমার মনকে বেশী পীড়া দিত। ইহা ছাড়া জেঠাইমা ইদানীং কেমন হইয়া গিয়াছিলেন, আমার প্রতি কোন অভিযোগই আর তাঁহার ছিল না। শুধু ভুতোকে দিনরাত চোখে চোখে রাখিতেন, লেখাপড়ায় কিসে তাহার উন্নতি হয় এই চিন্তা করিতেন। সকলের মধ্যে থাকিয়াও আমি যেন ছিলাম একা। এক এক সময় মনে হইত ইহার চেয়ে জেঠাইমার ভৎসনা ছিল শতগুণে ভাল।

সেদিন ঘরে বসিয়া চুপচাপ এই সব কথাই ভাবিতেছিলাম এমন সময় ভুতো কতকগুলি বই হাতে করিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধপাস্ করিয়া সেইগুলি বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল এই নে আলোক এতে ইংরেজী বাংলা ও সংস্কৃতের 'মেড ইজি' আছে, এইগুলো মুখস্থ করে ফেল দেখি। তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিল, মধুটাকে তুই মারতে পারছিস্ না, দূর তুই কোন কাজের না—ওঃ দুবার ফার্স্ট হয়েছে বলে কি চাল! মাটিতে যেন পা পড়ে না। আর কমলটা—ওর আজকাল কি রকম চাল বেড়েছে দেখেছিস,—এরকম ত আগে ছিল না?

ভুতো যেন আমার ক্ষতস্থানে নুন দিল! তাহার পরিকল্পনা শুনিয়া মনে মনে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম যেমন করিয়া হউক এবার মধুকে পরীক্ষায় মারিতেই হইবে। শুধু যে তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা নহে, কমলের মনে যে আমার স্থান আর নাই বিশেষ করিয়া তাহার জন্য। না হয় মধু বড়লোকের ছেলে ফার্স্ট হইয়াছে তাই বলিয়া কি আমাকে এতটা উপেক্ষা করা উচিত? প্রতিহিংসা লইবার জন্য মুহূর্তে আমার চোখ দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে ভুতো আমার অন্তরের কথা বুঝিতে পারে তাই তাড়াতাড়ি তাহা চাপা দিয়া বলিলাম কিন্তু তুই পড়বি না এইগুলো—একজামিন ত এসে গেল?

সে বলিল তুই ভারী বোকা এই জন্যে তোর কিছু হলো না। আরে যদি বই পড়ে মুখ ব্যথা করবো তবে স্কুলের মাস্টারকে প্রাইভেট টিউটর রাখতে গেলুম কেন? শুধু কয়েকটা ইমপরট্যাণ্ট মুখস্থ ক'রে যাবো বাস আর আমায় পায় কে?

ভুতোর এই কথার কি অর্থ তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। যাহা হউক সেই দিন হইতে আমি বাজে কথা চিন্তা না করিয়া, অন্য কোন দিকে মন না দিয়া একান্তভাবে শুধু নিজেকে লেখাপড়ার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলাম। এইভাবে আবার আমার পূর্বেকার মত উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। হেডমাস্টারমশায় ইহা দেখিয়া মনে মনে খুশি হইয়া উঠিলেন তাঁহার উপদেশে আমি হাতে হাতে ফল পাইয়াছি ভাবিয়া। ক্রমশঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস ভূপর্যটক

(১০)

সাহেব-প্রীতি যাদের ছোটবেলার একমাত্র শিক্ষা তথাকথিত ধর্ম যাদের স্বর্গে যাবার একমাত্র পথ, টাকা উপার্জন যাদের একমাত্র কাম্য তাঁরা যখন শুনল রামনাথকে ইমিগ্রেসন বিভাগ বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে বেশিদিন থাকা চলবে না তখন কংগ্রেসী দলও রামনাথকে অবহেলা করতে লাগল। কেউ কথা বলে না পথে চলার সময় এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করে। নানারূপ বদনামের সৃষ্টি করার চেষ্টা ক'রে যাতে যুবকের দলও আমার সংগে কথা না বলে তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, এমনি সময় আসল অন্য শ্রেণী হতে আমার ডাক। সেই শ্রেণী হলো বানতু। বানতুরা হলো নতুন উদীয়মান জাত। যতই তারা লেখা পড়া শিখছে ততই তারা জাতি গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারা অন্যকে আপন করছে জাপানী প্রথায়। একজন বানতু জাপানে গিয়ে তাই শিখে এসেছে এবং জাতের মাঝে প্রচারের কাজ করছে।

এখন আমি বলব বানতুদেরই কথা। তারপর বলব তারা আমাকে কেন ডেকেছিল। বানতুরাও নিগ্রো। তাদের মাঝেও নানারূপ কুসংস্কার আছে। শূদের মাঝেও গোলামী ভাব আছে তবে তারা এসব পরিত্যাগ করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় উঠবেও।

জাপানী প্রথায় পরকে আপন করাটা কি তাই বলব বানতুদের কাজকর্মের ভেতর দিয়ে। অর্ধ নিগ্রো সুমালী ইণ্ডিয়ান, চীনা ডাচ বৃটিশ ফরাসী এসব জাতের লোক যখন অর্থাভাবে এসে পথে দাঁড়ায় তখন বানতুরা এদের তাদের নিজের ঘরে স্থান দেয়, সেবা করে এবং তাদের গ্রামেতে তার ব্যবস্থা করে দেয় এমন কি যাতে করে এসব লোক একরূপ বিনা কাজ করেই জীবন কাটাতে পারে তার ব্যবস্থা করে। রূপ কাজের ফলে বানতু সমাজ বৈদেশীক ভ্যতার আওতায় আসে এবং অনেক নতুন থা নতুন কাজ এবং নতুন ভাবধারার ংগিত পেয়ে নিজের গঠন কাজ করতে বিধা পায়। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ছেলে য়েরা যাতে কিছুটা সভ্যতার আলো পায় রও ব্যবস্থা করে।

বানতুদের আমি জাপানীদের সংগে লনা দিয়েছি। যদি ইতিহাসের পাতা উলটান যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে জাপানীরাও একদিন অসভ্যই ছিল। তাদের মাঝে জাতি গঠনের একটা প্রেরণা এসেছিল এবং সেই প্রেরণার দ্বারা চালিত হয়ে তারা তাদের ধন ত ছোট কথা প্রাণও দিত। বানতুরা অনুরূপ কাজ করতে শুরু করেছে। সমুদয় আফ্রিকাতে আজ বানতুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যেখানেই ধনের দরকার সেখানে ধন দিচ্ছে আর যেখানে প্রাণের দরকার সেখানে প্রাণও দিচ্ছে। যারা ধন প্রাণ দিতে পারে তারা কখনও পেছনে পড়ে থাকে না; তাই আজ বানতুরা অন্যান্য ছোট ছোট কমিউনিটিকে একত্র করে বৃহৎ সমাজ করবার চেষ্টা করছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই এক শ্রেণীর জীব দেখা যায় ওদের বলা হয় এপ্রোভার। এপ্রোভার যারা হয়েছে তাদের একজনকেও এজীবনে দেখিনি তবে নাম শুনেছি। পৃথিবীতে এমন জাত নেই যাতে এপ্রোভার হয়নি। কিন্তু বানতু জাতের মাঝে আজ পর্যন্ত কেউ এপ্রোভার হতে রাজি হয়নি। আমরা সকলেই জানি কি দুঃখে মানুষ কোনও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। হয় প্রাণের দায়ে নয় অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে। বানতুরা যেমন অত্যাচার সহ্য করতে পারে তেমনি তারা প্রাণকে এমন একটি ছোট জিনিস ভাবে যে পিপিলিকার প্রাণ হতেও তাদের প্রাণ নগণ্য। এরূপ যাদের মনোবৃত্তি তারা যে এখনও পেছনে পড়ে আছে তার একমাত্র কারণ হলো প্যান ব্লেক এসোসিয়েশন।

আজ তাদের সভা। সভা প্রকাশ্যেই হচ্ছে। সভায় তিল ধরবার স্থান নেই। সভার লোক নিস্তব্ধ। কলতার ইনভারসিটি ইনষ্টিটিউটে যেমন গণ্ডগোল হয় তেমন কিছুই নেই। যারা বসবার স্থান পেয়েছে তারা বসেছে, যারা বসবার স্থান পায়নি তারা দাঁড়িয়ে আছে। সভার কাজ রাতে ঠিক দশটার সময় শুরু হবে। হল ঘর আলোর মালা দিয়ে সাজান হয়েছে। প্রত্যেকের মুখ প্রত্যেকে দেখছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ এরই মাঝে এসে পড়েছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টার যারা এসেছেন তারা সবই ইউরোপীয়। যারা লেকচার দেবেন তারা গেলারীতে বসে আছেন। যেই দশটা বাজল অমনি সভাপতি এসে সভার আসন গ্রহণ করে কাজ শুরু করলেন। পুলিশের কোন রিপোর্টার ছিল না একথাটা আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম।

সভাপতি একজন ভদ্রলোকের নাম করলেন, সেই ভদ্রলোক উঠেই তার বক্তব্য ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন। তিনি প্যান ব্লেক এসোসিয়েশনের পক্ষেই বলতে লাগলেন। তারপর একজনের পর অন্যজন যখন লেকচার দিচ্ছিলেন আমার ইচ্ছা হচ্ছিল সভা ত্যাগ করে চলে যাই, কিন্তু লসমনের জন্যই চলে যেতে পারছিলাম না। এখানে এসকি মতবাদীদের সংখ্যা বেশি। ওরা যা বলছিলেন আমার তা মোটেই ভাল লাগছিল না। শেষটায় সভাপতি মহাশয় তার ভাষণ দিলেন। সভাপতিও দেখলাম এসকাইতদের মতেই মত মিলিয়ে কথা বললেন। সভার কাজ যখন সমাপ্ত হলো তখন বক্তার এবং আমার মত দু-একজন বৈদেশীক লোক থাকলাম। আমাদের জন্য কাফের বন্দোবস্ত হয়েছিল। হল ঘরে বসেই কাফে খেতে হয়েছিল।

কথা প্রসংগে যখন আমি জানালাম যে এখানে এসকি মত মেনে নেবার কি দরকার ছিল আপনারা আফ্রিকার কথা চিন্তা করবেন অন্য দেশের কালো লোকের কথা চিন্তা করবার সময় এখনও আসেনি। যদি পারেন ত সমুদয় আফ্রিকা ব্যাপিয়া আপনারা একটা রিপাবলিক গঠন করুন তাতে কেউ আপত্তি তুলবে না। প্যান ইসলাম, এসকি মতবাদ এসব যেমন হাওয়াতে গড়ে এবং হাওয়াতেই ভাঙ্গে আপনাদের প্যান ব্ল্যাক এসোসিয়েশনও তেমনি ভেঙ্গে যাবে, এবং আমার মনে হয় আপনাদের কাজ কর্ম শুধু আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ রাখা দরকার। সভ্যগণ কেউ আমার কথা শুনলেন আর কেউবা হেসে উড়িয়ে দিলেন। যেমন করেই হউক পরের দিন রাত দশটার সময় আমার লেকচারের বন্দোবস্ত হলো এবং সেদিন রাত তিনটার সময় এসে ঘুমোতে হয়েছিল।

আমার হলো ভ্রমণ কথা। ভ্রমণ কথা শুনার জন্য নিগ্রোদের আগ্রহ দেখে আশ্চর্য হতে হয়েছিল। এরা যেন আমার প্রত্যেকটি কথা গিলতে চায়। প্রায় দুশো লোক কাগজ কলম নিয়ে আমার লেকচার লিখছিল। উপসংহারে যখন বলেছিলাম প্যান ব্লেক এসোসিয়েশন যা করছেন তাতে লোকক্ষয় এবং ধনক্ষয় উভয়ই হচ্ছে তার চেয়ে আফ্রিকাতে যেখানে নিগ্রোদের বাস বেশি সেখানে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হউক এবং এই নতুন রাষ্ট্রে শরীরের রং-এর কোন ইজ্জত থাকবে না

এবং গুণ অনুযায়ী লোকের সম্মান দেওয়া হবে, তবেই হবে সত্যিকারের দেশসেবা। প্যান ইসলাম, প্যান এসিয়া, প্যান আমেরিকা এসব হলো সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সোপান, তখন চারিদিক হতে সবাই আমাকে সমর্থন করেছিল এবং ধানতুদের প্যান্ ব্ল্যাক এসোসিয়েশনের ভাষণও ধরেছিল। এসম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতবাদ পরে দেওয়া হবে, কারণ এসম্বন্ধে আমাকে বারান্তরে আরও অনেক কথা বলতে হবে।

প্রিটোরিয়ায় আমার শেষ লেকচার সমাপ্ত হবার পরের দিনই আমি সকলের কাছ হতে বিদায় নিয়ে জ্যাহোন্সবার্গের দিকে রওনা হই। জ্যাহোন্সবার্গ প্রিটোরিয়া হতে মাত্র বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। পথটা ক্রমাগত চড়াই। বত্রিশ মাইল পথ চলতে আমার ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল। কেতলীতে করে জল এবং খাবারের ও প্রচুর খাদ্য নিয়ে গিয়েছিলাম। এদিকের লোক প্রায়ই শ্বেতকায় এবং ইণ্ডিয়ানদের মোটেই দেখতে পারে না।

দশ মাইল পথ যাবার পর আমার কেতলীর জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। জল পিপাসায় ছটপট করছিলাম। পথের পাশে একটি ছোট্ট রেস্তোরা। রেস্তোরার এক পাশে একটি জলের পাইপ। পাইপ হতে কেতলীতে জল ভরতে গিয়ে যখন বসলাম তখন একজন রেস্তোরা বয় এসে বলল,—

এ জল তোমাদের জন্য নয়, জলের দরকার হলে আমাদের বলতে হয়, আমরা এসে তোমার কেতলী ভর্তি করে দিতাম, তোমরা অপবিত্র এবং অসভ্য, তোমরা পাইপে হাত দিলে তা অপবিত্র হয়ে যায় একথা কি জান না?

আমি কেতলীটা জলে-ভর্তি করে উঠে দাঁড়ালাম এবং লোকটার কাছে গিয়ে বললাম আমরা dirty আর তোমরা clean এ-কথা কে বলল তোমায়? তোদের পাইপ হতে জল নেওয়াই আমার পাপ হয়েছে, বিদেশে এসেছি তাই কি আর করব, দেশেতে তোদের জল ছুঁলে আমরা স্নান করতে বাধ্য হই। এই কথাটি বলেই পথে এসে পড়লাম। জানতাম যদি দাঁড়াই এবং পশুর দল যদি হয়েছে—স পড়ে তবে এখানেই আমার ভ্রমণ সমাপ্ত হবে। এরা হলো ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট। এরা না করতে পারে এমন কাজ নেই। এরা মিশ্রিত জাত। এদের ভাষা ইংলিশ এরা পরিচয় দেয় বুয়ার বলেই।

পথ চড়াই। সাইকেল চলছিল না। যদিও প্রাণপণেই সাইকেল চালাচ্ছিলাম পাছে এরা এসে আক্রমণ করে এই ভয়ে কিন্তু আমার মনে একটি কথা ক্রমাগতই ধ্বনিত হচ্ছিল—ভারতের অচ্ছুৎ যেমন ব্যবহার পায়, ভারতের বাইরে ভারতের ব্রাহ্মণ তেমনি ব্যবহার পায় বিদেশীর কাছ থেকে। এটাকেই বলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন অপমানের প্রতিফল অপমান। আমি তাই ভাবিতেছিলাম আর কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

বেলা তখন সাড়ে চারটা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, জ্যাহোন্সবার্গ এসে পড়েছি। আর চলতে পারছিলাম না। একটা দোকানে অরেঞ্জ স্কোয়াস বিক্রি হচ্ছিল। আমিও তা কেনবার জন্য গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানী বোতলটা খুলে আমার হাতে বোতলটা দিয়ে বলল ঐ পথের ওপাশে খালি স্থানটাতে গিয়ে বসে খাও তারপর বোতলটা এনে ফিরিয়ে দিও। আমি দোকানীর হাত হতে বোতলটা নিয়ে তারই সামনে ঢক ঢক করে খেয়ে ফের বোতলটা তার কাউণ্টারে রেখে দিলাম। দোকানী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বিজয়ী বীরের মত পথ ধরলাম। পথে আবার সেই কথা ভাবতে লাগলাম। যদি আমাদের দেশের অচ্ছুৎরা স্থান বিশেষে অত্যাচারীর ওপর অত্যাচার করে তবে হয়ত তার ফল ভালই হতে পারে।

(ক্রমশ)

অভিযাত্রিক

ভ্লাডিমির মেইকভস্কি
অনুবাদক—রাখাল তালুকদার

খটখটে পাথুরে রাজপথ পায়ে মাড়ান!
তার উপরে বিদ্রোহীদের উদ্ধত গোঁয়ারে-শির!
যানভাসি উপগ্রহ-নগরী দ্বিতীয় মহাপ্রলয়ের মুখে উপড়ে পড়ে,
আমরা দমকা বন্যার ধাক্কায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবো।

সর্বরিক্ত দিন।
টানাহেঁচড় দারুণ দুর্বৎসর।
তবু, আমাদের অভিযান সার্থক।
চওড়া সিনায় রুদ্র দামামার বোল।

কারা তুলনা করবে আমাদের সোনায় কত আলো ঝল্সায়?
হুল ফোটাবে কি বোল্তার মতো বুলেটের শর?
হাতিয়ার ছড় গেয়ে প্রতিঘাত হানবো আমরা।
সোনার গাদা—না, আমাদের বাজপড়া গলার আওয়াজ।

ময়দান সবুজে রঙে ছেয়ে ফেলে দাও
কার্পেটে ঢাকো দিন—নবদূর্বাশ্যামল;
জিন আঁটো দ্রুতগতি, বছরগুলির,
রামধনু-ঝুঁকি লয়ে ঊর্ধ্ব আকাশ।

দূর নভে হানো চোখ, গুমোট ফাঁকা;
আমাদের সংগীতে সে-স্বর্গও নাই।
শুধু চাই, অধিকার—আর অধিকার,
আমৃত্যু শুধু বাঁচতে।

ফুর্তির মৌতাত! হাসি গুলজার!
রক্তে জোয়ার-ছোটা-বসন্ত দিন।
উল্লাস মাতোয়ারা ঢিব ঢিব বুক!
কাঁসরবাজা দরাজ আমাদের-ই বুক।

মায়ামৃগ

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে আর বেশী দেরী নাই। শীতের সন্ধ্যা—ইহারই মধ্যে ভ্রমণবিলাসীর দল একে একে বাড়ি ফিরিতে শুরু করিয়াছে। ইডেন গার্ডেন প্রায় ফাঁকা হইয়া আসিয়াছে। এক প্রান্তে একটা বড় গাছের নীচে দুইজন তরুণ-তরুণী একখানা বেঞ্চির উপরে বসিয়া আলাপে রত।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। দূরে রাজপথের আলোগুলি একে একে জ্বলিয়া উঠিল। তরুণ-তরুণীর গৃহে ফিরিবার ব্যস্ততা নাই—তাহারা যেন এই নিঃশব্দ অন্ধকারে পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু সমগ্র অন্তর দিয়া উপভোগ করিতে চায়। তরুণী ক্ষণকাল তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "অশোক, তুমি আমায় সত্যি ভালবাসো?"

তরুণের মুগ্ধ দৃষ্টি তরুণীর মুখের উপর নিবদ্ধ। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "আজ কেন ওকথা জিজ্ঞাসা করছ, ইলা? তুমি কি মনে কর আমার এ ভালবাসা শুধু অভিনয়?"

"না, তা ঠিক করি না। তবে ভালবাসার পরিচয় আত্মত্যাগে—যেদিন আমার জন্যে নিজের সুখ উপেক্ষা করতে তুমি দ্বিধাবোধ করবে না সেইদিনই বুঝবো তোমার ভালবাসায় খাদ নেই।"

"জানি না আমার জীবনে সেই পরীক্ষার দিন আসবে কি না—যদি আসে জেনো আমি সে পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হবো।"

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের আলো গাছের পাতার মধ্য দিয়া বেঞ্চির উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলো রাত হয়েছে। ও আলোচনা আজ থাক আর একদিন হবে।"

দুইজনে ময়দান পার হইয়া নীরবে রাজপথের দিকে অগ্রসর হইল।

মাস দুই হইল ইলার সহিত অশোকের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। পূজার সময় অশোক দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে এক গানের আসরে ইলার সহিত পরিচয়। ইলা শিক্ষিতা রূপসী রুচিসুমার্জিত, প্রথম দর্শনেই অশোকের মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কলিকাতায় ফিরিবার পর হইতে অশোক প্রায় প্রতিদিনই বালীগঞ্জে ইলাদের বাড়ি একবার করিয়া ঘুরিয়া আসে। ইলাদের সংসারে তাহার এক বৃদ্ধা মাসীমা ছাড়া আর কেহ নাই। তিনিই ইলার অভিভাবিকা। অশোকের সহিত ইলার ঘনিষ্ঠতা যাহারা লক্ষ্য করিয়াছে, তাহারা ভাবে ইলা অশোককেই স্বামিত্বে বরণ করিবে। অশোক ধনীর সন্তান, সুপুরুষ—শিক্ষার আভিজাত্যও তাহার আছে। এতকাল সে সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়া সভাসমিতি করিয়া কাটাইয়াছে, বিবাহের কথা একদিনের জন্যও তাহার মনে উঁকি দেয় নাই। আত্মীয়-স্বজন বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে সে অসন্তোষই প্রকাশ করিয়াছে, বলিয়াছে নারীর অঞ্চল ধরিয়া থাকে বলিয়াই বাঙালীর আজ এই দুর্গতি। কিন্তু ইলাকে দেখিবার পর হইতে তাহার মনের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন সে বন্ধু সমাজে নারী জাতির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, বলে নারীই পুরুষের শক্তি।

(২)

দিন চার পাঁচ পরের ঘটনা। ইলার জন্মতিথি উৎসবে ইলার বহু বান্ধব-বান্ধবী নিমন্ত্রিত হইয়াছে। অশোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছে। সারাদিন আনন্দে কাটিবার পর সন্ধ্যায় বন্ধুরা বিদায় নিলে অশোক ও ইলা বারান্দায় আসিয়া বসিল।

বারান্দার এক পাশে নানা জাতীয় ফুলের টব সাজানো। ফুল ফুটিয়াছে অজস্র, তাহাদের মিষ্ট সৌরভে মদিরতার আবেশ। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিবার পর অশোক বলিল, "ইলা, তোমায় একদিন বলেছি বিবাহ করবার ইচ্ছা ছিল না আমার—মেয়েদের বরাবরই আমি এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে আমার মনের গতি বদ্‌লে গেছে। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমার এখন মনে হয় তোমায় না পেলে আমার জীবন হয়তো ব্যর্থ হয়ে যাবে—আমার সমস্ত মনটাই থাকে শূন্য হয়ে। পুরুষের ভালবাসা তোমরা হয়তো সন্দেহের চোখে দেখো, কিন্তু সব পুরুষ যে সমান নয় একথা তোমরা ভুলে যাও।"

ইলা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "পুরুষ ভালবাসতে পারে না একথা আমি বলি না। বরং পুরুষের ভালবাসার এমন পরিচয় আমি একদিন পেয়েছি যা খুব কম মেয়েই হয়তো পেয়েছে।"

"তাই নাকি? সে কথা তো তুমি একদিনও আমায় বলোনি।" ঔৎসুক্যের সুরে অশোক বলিল।

"বললে তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে না। মানুষ যে এমন একান্তভাবে ভালবাসতে পারে স্বচক্ষে না দেখলে কেউই তা বিশ্বাস করতে পারবে না।"

"সে তো আর তোমার জন্যে আত্মহত্যা করেনি? অনেকে যে প্রণয়িনীর জন্যে......"

বাধা দিয়া ইলা বলিল, 'আত্মহত্যা করা হয়তো সোজা ক্ষণিকের উত্তেজনায় মানুষ তা করে বসে। সে যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল সত্যিই তার তুলনা হয় না।"

অশোক বিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিল কি যে উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। ইলা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল "ভেবো না আমি একটা গল্প রচনা করছি নিজের দাম বাড়াবার জন্যে। তুমি যদি শুনতে চাও আমার বলতে আপত্তি নেই।"

"সত্যিই ব্যাপারটা শোনবার জন্য আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।

ইলা এক মুহূর্ত কি ভাবিল তারপর বলিতে শুরু করিল, "বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে যে বছর সে ফিরল সেই বছরই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তার ছোট বোন আর আমি এক সঙ্গে ডায়োসেসন কলেজে পড়তুম। নাম করলে তুমি তাকে চিনতে পারবে হয়তো—নির্মল রায়। দু-তিন বছরের মধ্যেই বারে সে বেশ নাম করেছিল।"

চাকর দুই কাপ চা আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়া ইলা বলিতে লাগিল 'নির্মল আমাকে বিয়ে করবার জন্যে অস্থির হয়েছিল। কিন্তু তার বাপ মা রাজী হননি। বনেদী জমিদার বংশ—বড় ঘরে তাঁরা ছেলের বিয়ে দিতে চান। নির্মল রাগ করে বলে বসল সে বিয়েই করবে না—বাপ মা অনেক বুঝিয়েছিলেন কিন্তু ছেলের মন ফেরাতে পারেননি।

নির্মল প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত। আমায় সুখী করবার জন্য তার চেষ্টার বিরাম ছিল না। নিউ মার্কেট থেকে নিত্য সে হরেক রকমের শাড়ি কিনে আনত আমায় উপহার দেবার জন্যে—আপত্তি করলে শুনত না। আমাকে নিত্য নূতন আভরণে সাজিয়ে কী আনন্দ যে সে পেত তা ধারণা করতে পারবে না।

দিনগুলো আমাদের বেশ আনন্দেই কাটছিল এমন সময় দুর্দৈব এল ঘনিয়ে। হঠাৎ একটা 'কেসে' দিন কতকের জন্যে নির্মলকে বাইরে যেতে হল, ফিরে এল অসুখ নিয়ে। প্রথম প্রথম অসুস্থ শরীর নিয়েই সে কাজকর্ম করত- ক্রমে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন বাইরে কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে। ছোট ভাইকে সঙ্গে করে নির্মল মধুপুর চলে গেল। রোগশয্যা

থেকেও সপ্তাহে দু-তিনখানা করে চিঠি সে আমায় লিখত—প্রতি চিঠিতেই জানাতো, সেরে উঠেই সে কলকাতায় ফিরে আসবে, একদিনও বিলম্ব করবে না।

বেশ মনে আছে একদিন সন্ধ্যায় আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমায় যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে নির্মলের ভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নীচে নেমে আসতেই নির্মলের ভাই বললে, তার দাদার অসুখ হঠাৎ খুব বেড়েছে, বাঁচবার আশা নেই, আমায় একবার দেখতে চায়। তখনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না কিন্তু নির্মলের অবস্থার কথা ভেবে মধুপুর রওনা হলুম। পথে নির্মলের ভাইয়ের মুখে শুনলুম, তার দাদা ক্যানসারে ভুগছে। বুঝলুম, পাছে আমি উদ্বিগ্ন হই এই ভয়ে নির্মল আমার কাছে তার রোগের স্বরূপটা গোপন করেছিল। সে যে কী নিদারুণ যাতনা ভোগ করছিল, তার বিন্দুবিসর্গও আমায় জানতে দেয়নি।

নির্মলের বাড়ি যখন পৌঁছলুম তখন রাত বারোটা। নির্মলের ভাই আমায় নির্মলের ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। সেইমাত্র তাকে মর্ফিয়া ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে—ইনজেকশান ছাড়া তার যাতনার উপশম হয় না, যাতনায় সে চীৎকার করতে থাকে, বিছানায় তাকে ধরে রাখা শক্ত হয়।

চেহারা তার এমনি বিশ্রী হয়ে গেছে যে তাকে আর চেনা যায় না। দেহ অস্থিচর্মসার চোখ কোটরগত। সত্যি বলতে কি কাছে যেতে আমার পা উঠছিল না—ঘৃণা ও বিরক্তিতে সর্বাঙ্গ যেন সংকুচিত হচ্ছিল। অতি কষ্টে আমি তার খাটের কাছে এগিয়ে গেলুম। আমায় দেখতে পেয়ে নির্মল আর সকলকে চলে যেতে ইসারা করলে। একা নির্মলের সঙ্গে ঐ ঘরে থাকতে আমার কেমন ভয় করছিল, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলুম না। মনে হচ্ছিল, নিভৃতে আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে নির্মল যদি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে তাহলে হয়তো আমার সামনেই ওর মৃত্যু ঘটবে। একা মুমূর্ষু রোগীর সঙ্গে থাকা যে কি ভয়াবহ তা তুমি ধারণা করতে পারবে না অশোক। ওঃ আজও সেকথা মনে পড়লে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে।

নার্স আমার কাছে এসে মৃদুস্বরে বললে আপনি থাকুন তাহলে—যাতনা বাড়লেই খবর দেবেন, ইনজেকশান করে দিয়ে যাব।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। যারা ঘরে ছিল সবাই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ভেবেছিলুম আমায় একান্তে পেয়ে নির্মল তার আবেগ দমন করতে পারবে না—তার অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমায় শোনাতে শুরু করবে সালঙ্কারে। কিন্তু অদ্ভুত তার আত্মসংযমের শক্তি। ধীর শান্তভাবে সে আলাপ শুরু করলে আমাদের সংসারের কথা আমার পড়াশুনার কথা সব সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে। শেষে আমার একখানা হাত ধরে বললে আমি তোমায় কিছু দিয়ে যেতে চাই—বল নেবে?

আমি চুপ করে রইলুম। বালিশের তলা থেকে একখানা খাম বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে এতে বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে, সব তোমার নামে 'এনডোর্স' করে দিয়েছি।

কথা বলতে বলতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল তাকে আমি অনুরোধ করলুম বিশ্রাম করবার জন্য। তারপর শেলফ থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলুম।

কিন্তু বেশীক্ষণ পড়তে পারলুম না। একে ট্রেনে এসে শরীর ক্লান্ত, তার উপর নির্মলের ঐ ভয়াবহ অবস্থা দেখে মনও নিস্তেজ—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। মিনিট কয়েক পরেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম।

ঘুম যখন ভাঙল দেখি ঘর অন্ধকার—বাতি নিবে গেছে চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ—এমনকি, রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যায় না। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে ঘরে ঢুকেছে। আমার কেমন গা ছম ছম করছিল। আস্তে আস্তে উঠে সন্তর্পণে এগিয়ে গেলুম খাটের কাছে।

হঠাৎ আমার মনটা আলোড়িত হয়ে উঠল। ব্যথা বাড়লে নার্সকে ডেকে দেবার কথা ছিল, কৈ তাকে তো ডাকতে পারিনি—গভীর ঘুমে কেটে গেছে সারা রাত। হয়তো নির্মল আমায় ডেকেছিল শুনতে পাইনি—নার্স এসে ইনজেকশন দিয়ে গেছে। অপরিসীম লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে মন আমার ভরে গেল।

খাটের কাছে এগিয়ে আসতেই আমার অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে গেল। বিছানা শূন্য পড়ে আছে—রোগী নেই!

ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম। নার্স ছুটে এল, রোগীকে শয্যায় না দেখে সেও রীতিমত বিচলিত হল। তবু আমাকে ভরসা দিয়ে বললে, ভয় করবার কিছু নেই এতে, রাতে রোগীর চীৎকার একবারও তার কানে আসেনি—রোগী আছে কোথাও নিকটেই।

হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি পড়ল মেঝের কার্পেটের উপর, কার্পেটে কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত! রক্তের দাগ অনুসরণ করে আমরা বারান্দায় এসে উপস্থিত হলুম। এদিক ওদিক তাকাতে দেখতে পেলুম বারান্দার শেষ প্রান্তে নির্মলের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখ তার বিকৃত, চোখের তারা বিস্ফারিত!......

ব্যাপারটা অভাবনীয় নয় কি? বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করেছে তবু আমার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেনি। ভাবো একবার অসহন যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে নীরবে সে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু আমার এতটুকু কষ্ট হয় এ সে সইতে পারেনি।" —

ইলা এক মুহূর্ত থামিল তারপর অশোকের দিকে চাহিয়া বলিল 'হ্যাঁ একেই বলে ভালবাসা—প্রণয়িনীর সামান্যতম কষ্টের বিনিময়েও নিজের স্বাচ্ছন্দ্য সে উপেক্ষা করলে।" ইলার কণ্ঠে গর্বিত উল্লাসের সুর।

অশোক ক্ষণকাল ইলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নির্মলের অপূর্ব আত্মত্যাগ যে ইলার মনকে বাথিত করে নাই ইহা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। ইলার চোখে বেদনার চিহ্নমাত্র নাই আছে পরিতৃপ্ত অহঙ্কারের অভিব্যক্তি। অশোকের মনে হইল, হয়তো এই আত্মসুখসর্বস্ব নারী তাহারও বেদনার কাহিনী বিজয়-গর্বে অপরের নিকট বর্ণনা করিবে যেমন নির্মলের মৃত্যু-বরণের প্রেমের ইতিহাস আজ সে তাহার নিকট বিবৃত করিয়াছে। হঠাৎ রূঢ়স্বরে সে বলিয়া উঠিল 'তুমি ঠিকই বলেছ ইলা—নির্মলের ভালবাসাই সত্যিকার ভালবাসা। কিন্তু তার ভালবাসা নাস্ত হয়েছিল অপাত্রে - তুমি তার ভালবাসার যোগ্য নও।"

ইলা বিমূঢ় দৃষ্টিতে অশোকের পানে তাকাইল।

"আশ্চর্য হয়ো না ইলা কথাটা রূঢ় হতে পারে কিন্তু মিথ্যা নয়। হৃদয় বলে তোমার কিছু নেই মাটির প্রাণহীন পুতুল তুমি—তোমাকে যারা ভালবাসে তারা শুধু প্রতারিত হয়। ভেবেছিলে তোমার ঐ গল্পটা শুনে আমার আকর্ষণ আরও বেড়ে যাবে, কিন্তু সে তোমার ভুল। আমার চোখ তুমি খুলে দিয়েছ, তোমার স্বরূপটা আজ চিনে ফেলেছি।......যাক বিদায় নেবার আগে তোমায় একটা উপদেশ দিয়ে যাই—মনে রেখো। নির্মল যে টাকাটা দিয়েছে সেটা খুব সাবধানে রেখো—আবার ঐ রকমের শিকার বহুদিন নাও জুটতে পারে।"

ইলার উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া অশোক সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। ইলা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

ইমাম গাজ্জালির আত্মবিকাশের ধারা

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম গাজ্জালীর স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। তিনি জগতের চিন্তাশীল লেখকগণের মধ্যে অন্যতম মহাপুরুষ বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত। তাঁহার মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি অন্যান্য দেশে ও যুগে বহু হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, জীবন ও নীতির মধ্যে তিনি এমন এক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেন, যাহা বহু মহাপণ্ডিতের মধ্যে দেখা যায় না। যাহা কিছু তিনি চিন্তা করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অন্তরের ক্রমবিকাশের ধারার সহিত পরিচিত হইলে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উপকৃত হইবেন। তাঁহার আত্মদর্শনের গোপন কথা তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "আলমানকিজ মিনাদদালা" (অর্থাৎ "অহংকার হইতে মুক্তি") হইতে পাওয়া যাইবে। ইহাতে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারাগুলি সুনিপুণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা একখানি দার্শনিক 'আত্ম-স্বীকারের' (confession) গ্রন্থ। তাঁহার যুগের বিভিন্ন দার্শনিক আদর্শ ও মতবাদের গোলকধাঁধার মধ্যে তিনি কি ভাবে একাকী ভ্রমণ করিয়াছেন গ্রন্থখানি তাহারই নিখুঁত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থখানিকে সেন্ট অগাস্টেটর confession অথবা নিউম্যানের "Grammar of Assent"-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বানিয়ানের (Bunyon) "Grace Abounding"-এর সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মত সত্য-জিজ্ঞাসার ইহা এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই প্রবন্ধে ইমাম গাজ্জালীর আত্মবিকাশের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করিব।

ইমাম গাজ্জালী ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি প্রথমে একজন ধর্মপরায়ণ সুফীর নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। তৎপর জুরজানে আবুনসর আল ইসমাইলের নিকট উচ্চশিক্ষালাভের জন্য গমন করেন। এখানে কিছুদিন পড়াশুনা করিয়া ইমামুল হারামায়েনের নিকট পাঠের জন্য নিশাপুরে চলিয়া আসেন। নিশাপুরের নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমামুল হারামায়েন অধ্যাপক ছিলেন। ইমাম গাজ্জালী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অল্প দিন পরে তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ইমাম সাহেব গাজ্জালীর প্রতিভা দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তখনই তিনি তাঁহাকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়াছিলেন। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি গাজ্জালীকে তাঁহার সহকারীরূপে মনোনীত করিলেন। ইমাম হারামায়েনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত গাজ্জালী তাঁহারই নিকট ছিলেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থাকিয়া গাজ্জালী নানা শাস্ত্র পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ধর্মতত্ব, ব্যবহার শাস্ত্র (ফিকাহ), বিজ্ঞান দর্শন, তর্কবিদ্যা, সুফীতত্ব, ইতিহাস, ভূতত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিলেন। ইমাম হারামায়েনের মৃত্যুর পর তিনি নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠাশ বৎসর। এই সময় তাঁহার মত বিদ্বান ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি মুসলিম জগতে আর কেহ ছিলেন না। কিছুদিন পরে তিনি মন্ত্রী নিজামুল মুল্কের দরবারে গমন করিলেন। মন্ত্রী তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের পদ প্রদান করিলেন। এত অল্প বয়সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এতাবৎ কেহই এই সম্মানিত পদ পান নাই। এই সময় সমগ্র দেশে তিনি যে সম্মান ও গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি বিদ্বান হিসাবে ত অতুলনীয় ছিলেনই, তাছাড়া রাজনীতি বিষয়েও তাঁহার গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। নিজামুল মুলক বহু বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

কিন্তু এত সম্মান ও প্রতিপত্তির মধ্যেও গাজ্জালী আত্মতৃপ্তি পাইলেন না। তাঁহার মনের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ দেখা দিল। তিনি নিত্য একটা আধ্যাত্মিক অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িল। চিকিৎসকগণ বলিলেন ইহা শারীরিক ব্যাধির জন্য নহে। কোন মানসিক ব্যাধিতে তিনি ভুগিতেছেন। এই মানসিক অশান্তির মধ্যে তিনি সিরিয়া চলিয়া গেলেন এবং সিরিয়ার প্রধান নগর দামেস্কে কয়েকদিন ধরিয়া নীরবে সাধনা করিলেন। তাহাতেও কোনরূপ শান্তি পাইলেন না। অতঃপর জেরুজালেমে আসিলেন। সেখানেও কিছুদিন নির্জনে বসিয়া সাধনা করিলেন। তারপর মক্কা ও মদিনাতে গিয়া বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। হৃদয়কে আরও দৃঢ় করিলেন এবং মনে মনে তিনটি শপথ গ্রহণ করিলেন, —(১) তিনি কদাপি রাজার দরবারে যাইবেন না; (২) রাজার নিকট হইতে কখনও কোনওপ্রকার সাহায্য লইবেন না এবং (৩) তিনি কোন বাগবিতণ্ডায় অংশ গ্রহণ করিবেন না। এইভাবে সত্যের সন্ধানে দশ বৎসর নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই যুগে মুসলিম সুধী-সমাজে গ্রীক সভ্যতা অবাধে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দেখিলেন, এই গ্রীক সভ্যতা অবাধে চলিতে থাকিলে ইসলামের সারল্য ও ঈশ্বরানুরক্তি লোপ পাইবে। তাই তিনি সমস্ত শক্তি দিয়া গ্রীক সভ্যতার স্রোত প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী তাঁহাকে আবার নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। স্বগ্রামে তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেইখানেই শিক্ষাদান করেন।

১১১১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। ইমাম গাজ্জালীর আত্মবিকাশের ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখাই আমার এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ এখানে দিতে বিরত রহিলাম। সে-যুগে আরব জগতের সর্বত্র গ্রীক সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিসটোটল প্রমুখ দার্শনিক সুধিগণ আরবের সর্বত্র সমাদৃত। বহু যুবকগণ কোরআন-হদীসের চর্চা অপেক্ষা গ্রীকদর্শন আলোচনাতেই অধিক আনন্দ উপভোগ করিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইমাম গাজ্জালীর প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। তিনি সংকল্প করিলেন, গ্রীক প্রভাবের গতি রোধ করিবেন। বরাবরই ইমাম গাজ্জালীর হৃদয়ে একটা অজেয় বদ্ধমূল সত্যানুসন্ধানের পিপাসা লাগিয়াছিল। অন্য কোন প্রভাবের সম্মুখীন না আসিলে এবং স্বচ্ছন্দভাবে পথ চলিবার সুযোগ পাইলে তিনি নিজের চিন্তা ও প্রতিভার বলেই একজন বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতেন। প্রথম বয়সে তিনি যে ভিত্তির উপর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি একজন সুফী ও ধর্মগুরু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য প্রথমে অতি সহজে তিনি আধ্যাত্মিকতার দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি তাঁহার 'আত্ম-স্বীকারে' বলিতেছেন : "বাল্যকাল হইতে জ্ঞানের পিপাসা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, ইহা যেন আমার অন্তরে খোদাপ্রদত্ত দ্বিতীয় স্বভাব। বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইবার পরই আমি প্রচলিত আচারপদ্ধতির বাঁধাবাঁধির শৃঙ্খল ভাঙিয়া দিলাম এবং সমাজগত আজন্মলব্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলাম। যেসব কথা লোকমুখে শুনিয়া আসিতে ছিলাম, তাহাকে বিশ্বাস করা ছাড়িয়া দিলাম। "তাকলিদ" অর্থাৎ পরানুকরণে বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিতে প্রস্তুত

হইলাম না।" ইমাম গাজ্জালীর পিতা ছিলেন একজন সাধু ও দরবেশ। তিনি স্বোপার্জিত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ গ্রহণ করিতেন না। যাঁহারা ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি কেবল তাঁহাদেরই সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহাদের সংগে থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি অঝোর নয়নে রোদন করিতেন এবং খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেন: "হে খোদা, আমাকে এমন পুত্রসন্তান দান কর, যিনি দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ফকীহ্ বা ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিত হইতে পারেন।" খোদা তাঁহার এই আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র গাজ্জালী একজন প্রথম শ্রেণীর ফকীহ্ বা ব্যবস্থাদাতা হইয়া উঠিলেন। তিনি ইমাম বলিয়াও সম্মান ও মর্যাদা পাইলেন। পিতা নিজের আদর্শমত পুত্রকে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ইমামুল হারামায়েনের হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার দেন। এই ইমামের শিক্ষা দীক্ষা ও আদর্শ গাজ্জালীকে গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সব প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে গাজ্জালী সূফী-মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য ধর্মবাদের যখন তিনি কোথাও কোনওরূপ সান্ত্বনা পাইতেন না, তখন সূফী মতবাদই তাঁহাকে শেষ সান্ত্বনা দিয়াছিল। ইমাম গাজ্জালীর মনের মানসিক বিকাশের ধারার প্রতি একবার লক্ষ করা যাক। বলিয়াছি, প্রথম হইতেই তাঁহার মনে জ্ঞানের প্রবল পিপাসা জাগ্রত ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:—"প্রথম হইতে আমার মনে জ্ঞানের পিপাসা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছিল। ইহা ছিল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মত। আমার বাল্যকাল অবস্থা উত্তীর্ণ হইবামাত্র আমি গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলাম এবং সর্বপ্রকার জন্মগত বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইলাম।" অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানলাভের সময় হইতে একটা আদর্শকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহারই ভিত্তিতে ধর্মবিশ্বাস গড়িয়া তোলার প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অনুমান কুড়ি বৎসর বয়সের সময় তিনি ধর্মের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন সমাজে ধর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে নানা বিভিন্নতা দেখা দিয়াছে। নানাবিধ মতবাদ এবং দল ও উপদল মানুষকে পৃথক করিয়া দিতেছে। এই সব দেখিয়া তাঁহার প্রাণে নিদারুণ ব্যথা লাগিল। গভীর সমুদ্রে ভগ্ন জাহাজখণ্ড যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে এই সব পার্থক্য তাঁহার নিকট সেইরূপ বোধ হইল। প্রত্যেক দল ও উপদল দাবী করে—চরম সত্য তাহার মধ্যে আছে। "যুবক বয়স হইতে অর্থাৎ কুড়ি বৎসরের পূর্ব হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যখন আমি পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছি তখন পর্যন্ত আমি পুনঃপুন এই মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছি। আমি নির্ভীকভাবে ইহার তলদেশে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। অধ্যবসায়ী ডুবুরির মত ইহার অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছি। ইহার অবশ্যম্ভাবী বিপদ ও গভীরতাকে ভয় না করিয়া অবিরত সাধনা করিয়া বেড়াইয়াছি। আমি প্রত্যেক মতবাদকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছি, মিথ্যা হইতে সত্য বাছিবার চেষ্টা করিয়াছি। মিথ্যা হইতে সত্যকে পৃথক করিবার প্রচেষ্টার সময় দেখিলাম যে সর্বত্র নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী ভাব ও চিন্তা আছে। এই সব দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম এবং নিম্ন-প্রকার চিন্তায় উপনীত হইলাম:—যখন সত্যের সন্ধানলাভই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, তখন সত্য জিনিসটা কি তাহাই দেখা হইল আমার প্রথম কর্তব্য। তারপর আমি দেখিলাম যে সত্য ও নিশ্চয়তা হইতেছে—প্রত্যেক বস্তুর পরিষ্কার ও পূর্ণ জ্ঞান—এরূপ জ্ঞান, যাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না।"

সমাজের সর্বত্র দল উপদল ও মতবাদের মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্নতা দেখিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তিনি সত্য ও নিশ্চয়তা পাইতে চান। এতাবৎ যে সব জ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছিলেন সেগুলির আসল মূল্য তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে সেগুলির কোনটাই পরীক্ষায় দাঁড়াইতে পারে না। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, ইন্দ্রিয় অনুভূতি (Sense Perception) ও যুক্তি-অনুভূতি (Rational Perecpiton) এই দুইটি সুনিশ্চিত। তিনি আরও বুঝিলেন যে, আমরা প্রত্যেক বিষয়ে চরম সত্য পাইতে পারি না। কেবল সেই সব বিষয়ে পারি যাহা স্বতঃসিদ্ধ—যাহা নিজেই নিজের প্রমাণস্বরূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতি এবং অভ্রান্ত যুক্তি-অনুভূতিতে। অতএব এইগুলিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পর তিনি অনুভূতি (Sense)এর স্বীকৃত বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু সযত্ন পরীক্ষার ফলে এইগুলির উপর তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হইয়া গেল। কারণ, তাঁহার মতে যুক্তির প্রভাবে এই সব স্বীকৃত বিষয় ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। তারপর তিনি মৌলিক নীতির (Necessary principle) প্রতি মন দিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, "যেহেতু আমি আমার অনুভূতিকে বিশ্বাস করিতে পারি না, সেইহেতু আমাকে মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিসঞ্জাত ধারণাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। যেমন দশ (১০) সকল সময় তিন (৩) বা চার (৪) অপেক্ষা অধিক। কোন বস্তু একই সময়ে ও একই অবস্থায় 'হাঁ' ও 'না' হইতে পারে না। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রিয় অনুভূতির (Sense perception) সম্বন্ধে এই সন্দেহ তাঁহার মনের যুক্তির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাইয়া দিল। কে বলিতে পারে যে অনুভূতির প্রমাণ অপেক্ষা যুক্তির পক্ষে প্রমাণাদি অধিক অভ্রান্ত? তখন তাঁহার মনে হইল, যুক্তির উপরেও অন্য একজন বিচারক আছেন। যদি তিনি সামনে উপস্থিত হন তবে তিনি যুক্তিকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিবেন। যদিও এই অজ্ঞাত বিচারক এখনও উপস্থিত হন নাই তবুও ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে, তাঁহার কোন অস্তিত্ব নাই।"

এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে নানারূপ সন্দেহ তাঁহার মনে জাগিল। কিন্তু এই সব সন্দেহ হইতে ইমাম গাজ্জালী কোনও মুক্তির পথ পাইলেন না। স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা এই সন্দেহকে আরও গভীরতর করিয়া তুলিল। তিনি উপলব্ধি করিলেন নিদ্রার সময় মনে হয় স্বপ্নে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি সবই অভ্রান্ত। ভয় আনন্দ বিস্ময় এ সব বহুল অনুভূতি মানুষ তখন পাইয়া থাকে। কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেই মনে হয় স্বপ্ন একটা ভিত্তিহীন মরীচিকা। কে তোমাকে সেই সব বিষয়ের ধারণা বা অনুভূতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে পারে যাহা তুমি জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় হইতে ও যুক্তি হইতে পাইতে পার? তোমার জ্ঞানের বর্তমান ধারণার তুলনায় সেগুলি তোমার নিকট সত্য মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব নয় যে, কিছু পরে তুমি আর একটা অবস্থায় উপনীত হইতে পার যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত তোমার বর্তমান অবস্থার যে সম্বন্ধ তখন তোমার সেই অবস্থাটা বর্তমান অবস্থার মত হইতে পারে? অর্থাৎ বর্তমানে তোমার নিকট স্বপ্নটা যেমন অলীক ও মিথ্যা সেই উন্নত ও মানসিক অবস্থাটা পাইবার সময় তোমার বর্তমান জাগ্রত অবস্থার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিও স্বপ্নবৎ মনে হইতে পারে। সেই নূতন ও উন্নত অবস্থায় উপনীত হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও যুক্তির সিদ্ধান্ত একটা মায়া-মরীচিকা মাত্র। ইমাম গাজ্জালী বলেন মৃত্যুটা সেই উন্নত অবস্থা হইতে পারে। অথবা যে অবস্থাকে সুফিগণ

'হাল' (বা ecstasy) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই অবস্থা হইতে পারে। তখন ইন্দ্রিয় চেতনা অথব যুক্তি-বোধ স্তব্ধ হইয়া নিজের মধ্যেই ডুবিয়া যায়। সেই অবস্থায় প্রকৃত সাধক ও সুফী অনুভূতি ও যুক্তির অতীত লোকে চলিয়া যাইতে পারেন।

ইমাম গাজ্জালীর এই সব চিন্তা অলস ও ভিত্তিসূত্রহীন চিন্তা নহে। এগুলি অশান্ত ও অতৃপ্ত হৃদয়ের সরল ও গভীর সন্দেহ, সত্যানুসন্ধিৎসুর অনন্ত জিজ্ঞাসা। দিনের পর দিন ইমাম গাজ্জালী এই ধরণের সন্দেহে ব্যথাতুর হইয়া পড়িলেন। কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তিনি পরিপূর্ণ সন্দেহবাদী (Sceptic) হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার পদতল হইতে সমগ্র পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন থাকে নাই। দুই তিন মাস পরে তাঁহার অন্তরাকাশ হইতে সমুদয় মেঘ কাটিয়া গেল। কিভাবে তাঁহার অন্তর লোক হইতে এই মেঘ কাটিয়া গেল তাহা এইবার বলিব।

এই ধরণের চিন্তা করিতে করিতে ইমাম গাজ্জালী যেন একটা গভীর গর্তের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলেন আর এক-পা অগ্রসর হইলেই তিনি গর্তের তলহীন প্রদেশে পড়িয়া যাইবেন। এইরূপই তখন তাঁহার অবস্থা। কোন বিষয়ে তাঁহার নিশ্চয়তা নাই—কোন বিষয়ে তাঁহার যেন বিশ্বাস নাই। এই অবস্থা হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন—তাহা চিন্তার দ্বারা নহে তর্কের দ্বারা নহে, অথবা কতকগুলি ন্যায়ের যুক্তি ও তর্ক দ্বারাও নহে। এই প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী বলেন: তিনি মুক্তি পাইলেন সেই আলোকের সেই জ্যোতি বা নূরের' দ্বারা যাহা পরম করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার সন্দেহাকুল হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিলেন। ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিক ডেকার্টও (Descartes) ঠিক এই ধরণের সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। তিনিও তাঁহার জ্ঞানকে (sense) অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন। অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত জ্ঞানকে তিনি অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিষয়কে সন্দেহ করিতে করিতে অবশেষে তিনি চিন্তায় আসিয়া থামিলেন এবং Cogito ergo sum (I think therefore I am—আমি চিন্তা করি অতএব আমার অস্তিত্ব আছে।) এই বিখ্যাত প্রস্তাবে উপনীত হইয়া একটা নিশ্চয়তা পাইলেন। এই প্রস্তাবকে তিনি তাঁহার সমস্ত দর্শনের ভিত্তি করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বহু পূর্বে ইমাম গাজ্জালীও এই ধরণের সন্দেহ করেন এবং এইভাবে সব কিছুকে সন্দেহ করিয়া এবং সমস্ত 'দলিল' বা প্রমাণকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ডেকার্ট যেমন 'Cogito ergo sum' এই প্রস্তাবে উপনীত হইয়া তাহাকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ইমাম গাজ্জালী সেখানেও কোনও নিশ্চয়তা পাইলেন না। তিনি ডেকার্ট অপেক্ষা আরও একপা অগ্রসর হইলেন। তিনি চিন্তাকেও গভীরভাবে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কে বলিল যে আমি চিন্তা করি? আমার চিন্তা করাটাও অলীক হইতে পারে। জ্ঞানের উৎস যে চিন্তা ইহা তিনি স্বীকার করিলেন না। ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া "will to believe' (বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা) এই আদর্শের মধ্যে তিনি সত্য ও নিশ্চয়তা পাইলেন। চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া ডেকার্ট ঈশ্বর পর্যন্ত পোঁছিতে চাহেন নাই। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া একেবারে 'ঈশ্বরে' গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই দুইজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের মধ্যে আর একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখা দিল। ডেকার্ট বিবেচনা করেন যে, দর্শনের কর্তব্য হইতেছে ধর্মকে ব্যাখ্যা করা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। অন্যপক্ষে ইমাম গাজ্জালী কান্টের (Kant) মত যুক্তিকে অবিশ্বাস করেন এবং যুক্তিকে ধর্মের সত্যতা বুঝাইতে অক্ষম মনে করেন।

ইমাম গাজ্জালী অতঃপর বলিতেছেন যে, যখন তিনি ঈশ্বরের সেই আলোকের দ্বারা এই অবস্থা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন, যে আলোক মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিলে তাহার হৃদয়ে নির্মল বুদ্ধি ও ভার-সাম্য ফিরে আসে, তখন তিনি যুক্তি বা Reasonএর প্রাথমিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিধিগুলিকে অত্যন্ত কঠোরতার সহিত বিচার করিয়া গ্রহণ করিলেন। তাহার পর যাঁহারা সত্যের অনুসন্ধানে রত রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন: (১) স্কলাসটিক ঈশ্বরবিদ (Scholastic Theologians); (২) সাধারণ দার্শনিকগণ; ও (৩) সুফিগণ।

ইমাম গাজ্জালী বলেন, যাঁহারা সত্যের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা এই তিন শ্রেণীর লোকের নিকট সত্য পাইতে পারেন। সেই জন্য তিনি একে একে ইঁহাদের স্বরূপ উদঘাটন করিতে লাগিলেন। প্রথমে Scholastic দার্শনিকদের নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহাদের Premise আগে স্বীকার করিলে তবেই তাঁহারা তর্ক করিতে পারেন। কিন্তু Premise অস্বীকার করিলে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া যান। তারপর ইমাম গাজ্জালী দার্শনিকদের লইয়া পড়িলেন এবং তাহাতে তিনি তিন বৎসর আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রথম দুই বৎসর তিনি দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন পাঠ ও আলোচনায় কাটাইলেন এবং তৃতীয় বৎসর সেগুলিকে লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মীমাংসায় উপনীত হইলেন। এই সমস্ত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও তৎবিষয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি তাঁহার একখানি বিখ্যাত গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম "তাহাফাতুল ফালাসিফা" (Refutation of Philosophy)। কি উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা তিনি উহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন। এই সময় গ্রীক দর্শন মুসলিম জগতের উপর অপার দিতে চাহিয়াছিলেন এবং মুসলমান সুধিগণের হৃদয়ে গ্রীক দর্শন দৃঢ়ভাবে আসন পাতিয়াছিল। তিনি সেই আসন টলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন এবং মুসলমান সুধিগণকে ইসলামের দিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। সেই সময় মুসলিম সমাজে এমন একদল দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখকের উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহারা বর্ণে বর্ণে গ্রীক পণ্ডিতদিগকে অনুসরণ করিতেন। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, আরিসটোটল যাহা পছন্দ করিতেন না বা যাহা অনুসরণ করিতেন না, তাঁহারাও তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডগুলি প্রতিপালন করাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গোঁড়া মতের দিক হইতে তাঁহারা নামেই মুসলমান ছিলেন। নামাজ--রোজা প্রভৃতি পালন করিতেন না বরং সেগুলিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিতেন। তাই ইমাম গাজ্জালী তাঁহার 'তাহাফাতুলফালাসিফা' নামক পুস্তকে তাঁহাদিগকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন এবং গ্রীক দর্শনের অসারতা প্রদর্শনের জন্য সবিস্তার আলোচনা করেন। তিনি ইহাতে গ্রীক দর্শনের সারাংশ প্রদান করেন; তাহাকে কুড়িটি প্রস্তাবে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে খণ্ডন করেন। তিনি দেখাইলেন যে গ্রীক দর্শন নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রমাণ করিতে পারে নাই,—(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব; (২) তাঁহার একত্ব; (৩) পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন কি না। এই গ্রন্থে তিনি দার্শনিকগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন এবং দার্শনিকগণের অস্ত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া ও

তাঁহাদেরই Premise লইয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের পদ্ধতিতে কখনও কোনও বিষয়ে নিশ্চয়তায় উপনীত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে মানসিক সন্দেহে তিনি কান্টকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং হিউমের (Hume) সাত শত বৎসর পূর্বে তিনি Casualityএর (প্রথম কারণ) বন্ধনকে dialectic-এর অস্ত্র দিয়া কাটিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা cause and effect সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারি না। কেবলমাত্র এই জানিতে পারি যে একটি ঘটনা অপর একটির পরে ঘটিয়া থাকে; একে অপরকে অনুসরণ করে মাত্র। কারণ দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়কে কখনও জানিতে পারি না। প্রকৃতির নিয়মাদি অভ্যাসগত ঘটনার বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। হিউম ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলেন নাই। দার্শনিকদের যুক্তি ও প্রমাণের মধ্যে বিরোধী ভাব (contradiction) দেখাইয়া ইমাম গাজ্জালী কান্টের অগ্রদূতরূপে পূজিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। ইমাম গাজ্জালী দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, যুক্তি চরম সত্তাকে (Ultimate Substance) বাহির করিতে পারে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, Scholastic theologians ও Philosophersদের কেহই ইমাম গাজ্জালীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না; তাঁহার মতে তাঁহাদের সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। অতঃপর তিনি সুফী মতবাদের দিকে মনঃসংযোগ করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই বিষয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য গভীরভাবে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং একান্ত অভিনিবেশ সহকারে উহার সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তিনি অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রধান প্রধান সুফীদের বিষয়ে ও সুফী-মতবাদ বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং এ সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করিলেন। বহু অধ্যয়ন ও আলোচনার পর তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইল যে সুফিগণই সত্যের প্রকৃত সন্ধানী মহাপুরুষ। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে সুফী-মতবাদের আসল ভিত্তি হইতেছে অভিজ্ঞতা; এবং জ্ঞান এখানে অচল। সুতরাং সার সত্য পাইবার জন্য তিনি নিজে সুফী হইলেন, এবং তাঁহাদের মত জীবন যাপন করিতে ও তাঁহাদের মত সাধনার বিভিন্ন আচার ও পদ্ধতি পালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপ করার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সুফী মতবাদের উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মাকে প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে মুক্ত করা—আত্মাকে সমস্ত পাশবিক অন্যায় আকর্ষণের মোহ হইতে এমনভাবে মুক্ত করা—যেন স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের এই পবিত্রীকৃত আত্মার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতে পারেন।

সুতরাং প্রকৃত সুফী হইবার জন্য তিনি সম্মান ও অর্থ পরিত্যাগ করিলেন এবং সমস্ত প্রকার পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন। সুফী মতানুসারে অনুসন্ধান করিতে হইলে ইহাই তাহার পরিণতি। এক্ষণে তাঁহার ভাবনা হইল—সুফী মতবাদে কি-ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন? সে মানুষ—সে সুফী কোথায় আছে? বহুদিন পর্যন্ত তিনি একদিকে পার্থিব বৃত্তি এবং অন্যদিকে ধর্মের আবেদন—এই দুইটি বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ তাঁহার হৃদয় অনুসন্ধান করিলেন।

তিনি এই সম্পর্কে বলেন: "নিজেকেই শিক্ষক হিসাবে আমার ব্রতের উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলাম এবং দেখিলাম যে, ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার পরিবর্তে আমার মন পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। দেখিলাম যে, আমি এক অনলকুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। যদি আমি পথ-পরিবর্তন না করি, তাহা হইলে অনন্ত অনলে পুড়িয়া মরিব। তথাপি আমি কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া একদিন বোগদাদ শহর পরিত্যাগ করিতে এবং তৎসহ প্রত্যেক বস্তু পরিত্যাগ করিতে স্থির করিলাম। কিন্তু পর দিবস এই সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। আমি চিন্তা করিতে করিতে আর এক ধাপ অগ্রসর হইলাম। পরে আবার পিছাইয়া গেলাম। সকালে উঠিয়া স্থির করিলাম, ভবিষ্য জীবন লইয়া সময় কাটাইব। আবার সন্ধ্যাকালে নানা-প্রকার পার্থিব চিন্তা আমার সংকল্পকে শিথিল করিয়া দিল। পার্থিব বাসনা ও প্রলোভন আমাকে শিকল দিয়া বাঁধিল। আবার অন্যদিকে ধর্মের আহ্বান চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল: "উঠ, উঠ! জীবন ত শেষ হইতে চলিয়াছে। অথচ তোমাকে বহুদূরে যাইতে হইবে।" ইহার পর আমার সংকল্প স্থির ও দৃঢ় হইয়া গেল। আমি সমস্ত প্রলোভন ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে মনস্থ করিলাম। তৎপর প্রলুব্ধকারী (শয়তান) আমাকে বলিল: তুমি একটা অস্থায়ী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছ, তাহাতে কিছুতেই হাল ছাড়িও না; ইহা শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। ইহাকে স্বীকার কর যদি এই সম্মানজনক মর্যাদাটা ছাড়িয়া দাও এবং এই মোটা বেতনের চাকরীতে ইস্তফা দাও, তবে পরে তুমি অনুতাপ করিবে। তখন সংশোধনের আর পথ থাকিবে না। কিন্তু আমি ইহাতে ভুলিলাম না। সর্বশেষে আমার দুর্বলতা বুঝিতে পারিয়া আমার আত্মার এই দীন ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি আমার শেষ-অবলম্বন ঈশ্বরের নিকট আশ্রয় লইলাম। যে-মানুষের নিজের সব শেষ হইয়াছে, যাহার অন্য কোন অবলম্বন নাই, অর্থাৎ যে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরগতপ্রাণ হইয়াছে, আমি সেই প্রকার মানুষের মত হইয়া গেলাম।" অতঃপর ইমাম গাজ্জালী সমস্ত পার্থিব সম্মান পরিত্যাগ করিলেন। অর্থ, আত্মীয়স্বজন—জড়ের সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিলেন। অবশেষে বোগদাদ শহর পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়া, হেজাজ, মিশর প্রভৃতি দেশে দশ বৎসর ফকীরের মত ভ্রমণ করিয়া জীবন কাটাইলেন। বহু তীর্থ ও মসজিদ পরিদর্শন করিলেন। মরুভূমিতে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিলেন এবং সর্বত্র ধর্মের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনা করিলেন। এই আত্মচিন্তা ও অধ্যাত্ম-সাধনার সময় তাঁহাকে অনেক প্রলোভন দেখান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আর তিনি বিভ্রান্ত হইলেন না। এইভাবে সাধনার পথে তিনি দিব্যচক্ষু পাইয়া বুঝিলেন যে, সুফিগণই ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতে পারে—এই পথই সত্যিকারের পথ। সুফীদের হৃদয়ই আলোকিত—ঈশ্বরের নিকট হইতে যে আলো আসে, সেই আলোতে আলোকিত।

যখন তিনি এইভাবে পথের সন্ধান পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "এহ্‌য়া-উল-উলুম" রচনা করেন। ইহার অর্থ ধর্ম-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মুসলিম সুধিগণের মত এই যে, যদি ধর্মগ্রন্থ কোরআন বিনষ্ট হইয়া যায়, আর এই গ্রন্থখানি বর্তমান থাকে, তবে ইসলামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। একজন ইউরোপীয় লেখক বলেন যে, এই গ্রন্থের মৌলিকতার জন্য ইহা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় নাই। তাই আরব পণ্ডিতগণ ব্যতীত অপরে ইহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই। ডেকার্টের 'discourse on method" নামক পুস্তকের সহিত ইহার এত সামঞ্জস্য আছে যে, সেই সময় যদি ইউরোপীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ থাকিত তাহা হইলে লোকে বলিত যে, ডেকার্ট তাঁহার উক্ত পুস্তকে ইমাম গাজ্জালীর এই গ্রন্থের হুবহু নকল করিয়াছেন।

এইভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি অবশেষে স্বগ্রাম তুস নগরে ফিরিয়া

(শেষাংশ ৫৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পদধ্বনি

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বসন্ত আর অনুভা একটা বাগানের একান্তে বসেছিল। বড় রাস্তার ধারে কোম্পানীর বাগান, নানা রঙের ফুলে লতায় পাতায় বর্ণে সমুজ্জ্বল। মাঝখানে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা দিয়ে জল উৎসারিত হয়ে বৃত্তাকারে চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। বাগানের একপাশে একটি দোলনা—তাতে তরুণীর দল একজনের পর একজন দোল খাচ্চে আর তাদের তরল লঘুকণ্ঠের হাসিতে সান্ধ্য হাওয়া মুখরিত হয়ে উঠচে।

এরি মধ্যে একটু নিভৃতে একটি কুঞ্জের মধ্যে বসন্ত আর অনুভা বিষণ্নমুখে উপবিষ্ট—অনুভা গাঢ়স্বরে বললে, তা হলে এই মেইলে তোমার বিলেত যাওয়া সাব্যস্ত হ'ল?

বসন্ত বললে, হাঁ, অনু, সবই ঠিক হয়ে গেছে, এখন কাল সকালেই এখান থেকে রওনা হয়ে বোম্বে পৌঁছুতে হবে—তারপর, জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দেব।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। বসন্ত তারপর জিজ্ঞাসা করলে তোমাদের পরীক্ষার ফল বেরুতে কত দিন দেরি?

বোধ হয় মাস দুয়েক মধ্যে পরীক্ষার ফল বেরুবে।

তারপর কি করবে ঠিক করেছ?

অনুভা একটুখানি ভেবে বললে সংসারের খরচ ত তুমি সবই জান। বাবা ভাল থাকলে আমাদের কোন অভাবই হ'ত না। কিন্তু তাঁর উপার্জ্জন ত বন্ধ হয়েই গেছে অধিকন্তু তাঁর জন্যে প্রতি মাসে ৬০।৭০, টাকা রাঁচি পাঠাতে হয়। সেই-জন্যে আমাকে চাকরি নিতে হবে।

বসন্ত অনুভার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে সবই বুঝলুম। কিন্তু আমার প্রার্থনাটা যেন মাঠে মারা না যায়। যতদিন না আমি বিলেত থেকে ফিরি, বল তুমি অপেক্ষা করবে?

অপেক্ষা করার প্রশ্নটা অবান্তর। কিন্তু সত্যি তোমার ক' বছর লাগবে?

বসন্ত অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বললে, না না অপেক্ষা করার প্রশ্নটা আদৌ অবান্তর নয় বরঞ্চ ঐটি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অত্যন্ত relevant আমি জানি তোমার চারিপাশে অনেক ভক্ত নৈবেদ্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। কাজেই তোমার কাছ থেকে একটা আশ্বাস না পেলে ও-দেশে গিয়েও আমি স্বস্তি পাব না। আমার প্রশ্নের উত্তরটা ও-রকম করে এড়িয়ে যেয়ো না, অনু। কথা আমাকে দিতেই হবে।

অনুভার দীর্ঘায়ত চক্ষু স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে উঠলো। রাস্তা দিয়ে প্রবাহমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে সে বললে, অপেক্ষা করার প্রশ্ন যে অবান্তর বলেছি সেটা অত্যুক্তি নয়, বসন্ত। নিজের মনের গভীরে বহুবার নেমে দেখেচি সেখানে একটিমাত্র মানুষের ছায়া পড়েছে, তার বেশি নয়। কাজেই ঘর বাঁধার কল্পনা যদি কোনদিন বাস্তবে পরিণত হয়, তবে সে ঐ একটি মাত্র মানুষের হাত ধরেই হবে। আশে পাশে অগুণতি ছায়া আছে স্বীকার করি—কিন্তু তারা ঐ চলচ্চিত্রের জীবের মত, যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বেশ; কিন্তু সামনে থেকে সরে গেলেই আর নেই।

বসন্তের শরীর এবং মন এক অপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সে মনে করলে প্রেমের জগতে এর চেয়ে বড় কথা সে আর শোনে নি। বললে, ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখচি, তোমার মন জানতে আমার বাকি নেই। কিন্তু যৌবন অনেক সময় হঠকারী হয় বলেই আমি সাবধান হতে চেয়েছিলুম। দেখচি তার দরকার ছিল না।

অনুভা পূর্ব্বের কথার অনুবৃত্তি করে বললে তোমার ফিরতে কতদিন লাগবে তা ত বললে না?

বসন্ত বললে, দু'বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে।

বাপরে, সে ত কম দিন নয়।

বসন্ত সান্ত্বনা দিয়ে বললে তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে অনু। মনে করো ত আমাদের ছোটবেলার কথা বোধ হয় যেন এই সেদিন; কিন্তু দেখতে দেখতে এর মধ্যেই দশটা বছর কেটে গিয়েছে।

অনুভা বললে চল আজ তা হলে আমরা উঠি। কিছুদিনের মত এইখান থেকেই এবার আমাদের বিদায়।

বসন্ত রুদ্ধকণ্ঠে বললে বি-দা-য়।

রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে তখন বিজলি বাতি জ্বলে উঠেচে।

দুই

পূর্ব্ব আখ্যায়িকার পর এক বছর কেটে গেছে। অনুভা বি এ পাশ ক'রে এখন একটি মেয়েদের ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষয়িত্রীর কাজ ক'রছে। বড় বোন সুপ্রভা ইতিপূর্ব্বেই বি এ পাশ ক'রে উক্ত কলেজে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছিলেন পরীক্ষার ফল বেরুতেই ছোট বোনকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। দুই বোনে একসঙ্গে কলেজের বোর্ডিংয়ে থাকেন। বসন্ত তখন কেমব্রিজে পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত। অবশ্য প্রতি মেইলে চিঠি লিখতে তার আলস্য নেই।

অনুভা এই কলেজে যোগ দেওয়ার পর মেয়েদের মধ্যে খুব পপুলার হ'য়ে পড়েছে। সব মেয়ের মুখেই অনুদির নাম। অনুদি অঙ্কের প্রফেসর—মেয়েরা বলে, অনুদি যে রকম সহজ ক'রে অঙ্ক বুঝিয়ে দেন, ও-রকমটি আর কেউ পারেন না। কিন্তু শুধু কি অঙ্ক, সব বিষয়েই অনুদির ডাক পড়ে। ছবি আঁকা ভাল হয়েছে কিনা বিচার করবেন অনুদি। কলেজের সাম্বাৎসরিক উৎসবে নাচ শেখাতে হবে, শেখাবার ভার অনুদির উপর। চামড়ার উপর চিত্রাঙ্কন ক'রে কিভাবে মণিব্যাগ বানাতে হয় তা দেখিয়ে দেবেন অনুদি। এমনকি পাল-পার্ব্বণে কিভাবে ঘরের মেঝেয় কিংবা দেয়ালে আলপনা দিতে হয় তা-ও দেখিয়ে দেবেন অনুদি। নাটক অভিনয় হবে, মেয়েদের কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার ভার অনুদির উপর।

সুপ্রভা দেখেন, আর হাসেন। বলেন তোর মধ্যে এত গুণ ছিল আমরা ত আবিষ্কার করতে পারিনি, অনু।

অনু বলে গুণ ত ভারি। চেষ্টা করলে সকলেই সব কাজ পারে; কেবল সত্যি কারের চেষ্টা চাই।

অনুভা বাঙালী অ-বাঙালী সব অধ্যাপিকা এবং ছাত্রীদের মন জয় ক'রে নিয়েছিল।

হঠাৎ সেবারে টাইফয়েডের এপিডেমিক শুরু হ'ল। দুরন্ত বর্ষার পর ঘরে ঘরে জ্বরজ্বারি—দেখতে দেখতে কয়েক ক্ষেত্রে জ্বর টাইফয়েডে দাঁড়ালো।

অনুভা একদিন জ্বর নিয়ে কলেজ থেকে বোর্ডিংয়ে ফিরলো। সুপ্রভা চারিদিকের আবহাওয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গোড়া থেকেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল—কলেজের ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা ক'রে ওষুধ লিখে দিয়ে গেলেন। ডাক্তার বিশেষ যত্ন নিয়ে প্রতিদিন রোগিণীকে দেখে ওষুধ দিতে লাগলেন—কেননা ডাক্তারের মেয়ে অনুভার ছাত্রী এবং তার মুখে অনুভার প্রশংসা আর ধরে না। সুপ্রভা তাঁদের ঘরের দরজায় মোটা পর্দা টাঙিয়ে দিলেন, চাকরকে দিয়ে ঘরদোর ধুইয়ে-পুঁছিয়ে ঝক্‌ঝকে ক'রে ফেললেন মাঝখানের টেবিলে ফুলদানিতে রাখলেন ফুল এবং মাঝে মাঝে ধূপ পোড়ানো হ'তে লাগলো। কে বলবে যে রোগীর ঘর।

কিন্তু জ্বর ক্রমশ বাঁকা পথই ধরতে

লাগলো। চার অবধি ওঠে দুইয়ের কম আর নামে না—জ্বরের বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই। দিন আষ্টেক পরে পেট ছেড়ে দিলে—বার বার দাস্ত হ'তে লাগলো এবং সেই সঙ্গে রক্ত। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো—সুপ্রভা মাকে আসার জন্য তার পাঠালেন।

ইদানীং অনুভা জ্বরের ধমকে বেহুঁস হয়েই প'ড়ে থাকতো—একদিন হঠাৎ দাস্তের সঙ্গে রক্ত দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলো, বসন্তর চিঠি এসে পেঁছিলো কি দিদি?

সুপ্রভা বিষণ্ণমুখে হিসাব ক'রে জানালেন যে বিলাতের মেইল আসতে কয়েক দিন দেরী আছে।

মা ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছলেন। সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটিই ছিল না—তবু মা নিজের হাতে সব তুলে নিলেন। মেয়ের শিয়রে অতন্দ্র হ'য়ে বসে রইলেন। হঠাৎ কাসির সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগলো—রোগিণীর সামনে ডাক্তার বললেন, দাঁতের পাশ দিয়ে রক্ত আসছে কিন্তু তাঁর গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হ'ল। তিনি ইঞ্জেকশান দিলেন।

এগারো দিনের ভোর রাত্রে জ্বর হঠাৎ একেবারে ৯৭ ডিগ্রীতে নেমে এলো এবং খুব ঘাম হ'তে লাগলো। মা প্রমাদ গণলেন এবং ছোট ভাই ছুটে ডাক্তারকে ডাকতে গেল।

ডাক্তার যখন এসে পৌঁছুলেন তখন রোগিণী অনেকটা সামলেছে। বললেন, এখন ভয়ের কোন কারণ দেখছি না যা চলছে ঐ ওষুধ চলুক। আমি দুপুরে আবার দেখে ওষুধের ব্যবস্থা করবো।

মা সুপ্রভাকে একান্তে ডেকে বললেন, শেষ রাত্রের দিকে চোখের পাতা বুজে এসেছিল, তখন এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি প্রভা।

সুপ্রভা রুদ্ধনিঃশ্বাসে বললে কি স্বপ্ন, মা?

মা বললেন দেখলুম চারিদিকে দারুণ অন্ধকার আর ধোঁয়া—সেই অন্ধকারের মধ্যে আমাকে পিছন থেকে একজন কালো লোমশ লোক তাড়া ক'রে আসছে আর আমি তার ভয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছি কিন্তু পালাতে পারছি না। সে যেন ক্রমশঃই আমাকে ধরে ফেলছে, আর আমি আতঙ্কে ত্রস্ত এবং উত্তেজনায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। এমন সময় উনি যেন রাঁচি থেকে এসে আমার হাত ধরে তুললেন মুখে প্রশান্ত হাসি বললেন, বড় ভয় পেয়েছ নয়? ও-লোকটা ঐ রকম, সময় নেই অসময় নেই পৃথিবীর যত ভাল লোকের পিছনে লেগেই আছে। তাদের জ্বালাতন করাই ওর কাজ।

আমি বললুম তা হবে। কিন্তু তুমি এসেছ, এখন আর আমার কোন ভয় নেই।

উনি বললেন, না, তা ব'লে এতটা নিশ্চিন্ত হ'য়ো না। ও যখন পিছনে লেগেছে তখন একজনকে নিয়ে ছাড়বেই। একজনকে তোমার দিতেই হবে—হয় স্বামী নয় সন্তান।

আমি অবাক হ'য়ে বললুম তার মানে? একজনকে দিতেই হবে কেন?

স্বামী বললেন বললুম ত ঐ ওর কাজ। একজনকে নিতেই ও এসেছে। এখন তুমি বেছে নাও কাকে দেবে—স্বামী না সন্তান!

আমি কাঁদতে লাগলুম—বললুম ওগো, এ তুমি কি বলছ? আমি কাকে দেব? স্বামী আর সন্তান—দুই-ই ত আমার কাছে সমান প্রিয়।

স্বামী ব্যস্ত হ'য়ে বললেন দেখ আর সময় নেই। আমাকে এখুনি যেতে হবে। এখনো তুমি মন স্থির করে বলো তুমি কাকে চাও স্বামী না সন্তান?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললুম ওগো, তুমি আমাকে এ কি পরীক্ষায় ফেললে? স্বামী আমি কি ক'রে ছাড়বো? সন্তানের মায়া সে এক রকম—স্বামীর জন্য ব্যথা সে আর এক রকম। দুটো যে দু জাতের জিনিস।

এই কথা বলতে বলতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম তুমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলছ মা অনুর টেম্পারেচার ৯৭ ডিগ্রি নেমে গেছে'

* * * *

বেলা এগারটা হবে- হঠাৎ অনুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হ'ল। ছোট ভাইটি ডাক্তারের জন্য চারিদিকে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলো। যে ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি কলে বেরিয়ে গেছেন। কাছে পিঠে আর দু'একজন ডাক্তার যাঁরা ছিলেন তাঁরা আসছি বলে আশ্বাস দিলেন কিন্তু শেষ নাগাদ এসে পৌঁছুতে পারলেন না।

অনুকে ধরে রাখা গেল না—তার হৃৎস্পন্দনটুকু হঠাৎ এক সময় বন্ধ হ'য়ে গেল।

মনে হয়েছিল এমন শোচনীয় মৃত্যুতে বাড়িটা হয়ত কান্নায় ভেঙে পড়বে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোথাও কান্নার অস্ফুট-ধ্বনিটুকুও শোনা গেল না। মা হাতের অসমাপ্ত কাজটুকু হাতে নিয়েই কাঠ হ'য়ে বসে রইলেন।

সুপ্রভা বাইরে এসে বললেন অনুকে ভাল ক'রে সাজিয়ে দিতে হবে। তার জন্যে চাই ভাল খাটিয়া তোষক বিছানার চাদর, বালিশ। দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধতে দেবো না। আর চাই রাশীকৃত ফুল চন্দন পাওডার

সুপ্রভা নিজের হাতে নিপুণভাবে বোনকে শ্মশানযাত্রার সাজিয়ে দিলেন। কপালে দিলেন শ্বেতচন্দনের আলিম্পন, মুখ পাওডার দিয়ে মেজে দিলেন। নতুন শাড়ি পরে চন্দনচর্চিত মুখে আলতা পরা পায়ে পুষ্পাস্তীর্ণ শুভ্র বিছানায় শুয়ে অনুভা ঘুমন্ত রাজকন্যার মত শোভা পেতে লাগলো। কলেজের ছাত্রীরা সকলেই খবর পেয়ে বোর্ডিংয়ের দরজায় এসে জমা হয়েছিল—তারা দুই লাইনে দাঁড়িয়ে সমানে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো।

মায়ের হাত থেকে যখন কন্যাকে টেনে নিয়ে বাইরে আনা হ'ল তখন মুহূর্তের জন্য তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো—এক হৃদয়-বিদারক চীৎকার ক'রে তিনি সম্বিৎ হারালেন।

তিন

আরও এক বছর কেটে গেল। বসন্ত কেম্ব্রিজ থেকে ট্রাইপস নিয়ে পাশ করেছে। এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চাকরী সংগ্রহ ক'রে দেশে ফিরে এল।

প্রারম্ভে যে বাগানের উল্লেখ আছে সেখানে সেদিন সন্ধ্যায় বসন্ত এসে ব'সে আছে। তার আজও কুঞ্জ যেমন প্রথম দিনে ছিল—তফাতের মধ্যে কেবল এই যে আজ তারা দু'জনেই পুরুষ। সঙ্গে তার বন্ধু অম্বিকা। অম্বিকা তার কেম্ব্রিজের সহধ্যায়ী

অম্বিকা বললে কিন্তু এটা তুমি বড় ভুল করছ বসন্ত you are nurturing an old sorrow. এর কোন মানে হয় না। Old love is a sacred memory I admit কিন্তু তা নিয়ে ত জীবন চলে না। জীবনে পাগলামোই কি তোমার কাম্য?

বসন্ত বললে কেন পাগলামো কেন?

অম্বিকা বললে তা নয় ত আবার কি? তুমি ত সন্ন্যাসী নও জীবনও তোমার বার্ধক্যে এসে পৌঁছয় নি। তোমার সামনে তোমার অবগুণ্ঠিত ভবিষ্যৎ জীবন প্রসারিত—এখানে চলতে হ'লে প্রেরণা লাভ করবার জন্য একজন সঙ্গিনীর দরকার তা না হ'লে অসম্পূর্ণ জীবন নিয়ে তুমি চলবে কি করে?

বসন্ত বললে কিন্তু সঙ্গিনী যে আমার নেই এ কথা তোমাকে কে বললে? সঙ্গিনী কি সব সময়েই রক্ত মাংসের শরীর ধারিণী হওয়া চাই?

অম্বিকা উত্তেজিত হয়ে বললে অবশ্য হওয়া চাই। I believe in flesh and blood. তোমাদের ও-সব ফাঁকা আইডিয়ালিজম দু'দিন চারদিন চলে কিন্তু জীবন-ভোর চলে না। ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও—যা practical তাই কর।

বসন্ত বললে তুমি জানো না অম্বিকা,

(শেষাংশ ৫৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমরা কি চাই

আপনারা আমার কাছে ধর্মকথা শুনতে চান; তাই এত দূরে দূরে থেকে এখানে এসেছেন; আর এসেছেন আমার মতো একজন সামান্য লোকের কাছে। এর কারণ কি, তাই আমার মনে হচ্ছে। ধর্মের সঙ্গে আমাদের এমন কি মনের টান রয়েছে? এ বুঝতে হলে সোজাসুজি এই কথা স্বীকার করতে হয় যে, আমরা যে অবস্থায় পড়েছি, সে অবস্থায় ধর্ম আমাদের একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। আমরা অভাবের মধ্যে পড়েছি, আর অভাবই—ভয় বলুন, উদ্বেগ বলুন, যত অশান্তি—সকলের কারণ। ধর্মের সত্যকার দরকার হলো আমাদের এই অভাব মিটাবার জন্যে। ধর্মের যদি এ অভাব মিটাবার শক্তি না থাকে তবে সে জিনিস পরোক্ষ হ'য়ে পড়ে, আর পরোক্ষ বস্তু কোন দিন একান্ত হতে পারে না এবং যা একান্ত নয় সে জিনিস অনেকটা অবান্তর। সে বস্তু নিয়ে মুখে বড়াই যতই করি না কেন, প্রাণের অন্দর মহলে তাকে আমল দেওয়া চলে না। সে জিনিস বাজেই থেকে যায়; তা কোন দিন কাজে আসে না। সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনে কতটা কাজে আসে—এ নিয়ে ধর্মের বিচার কর্তে হয়। কথাটা একটু অস্পষ্ট হ'লো এবং এতে আমাদের অনেকের ভুল বুঝবার সম্ভাবনাও আছে। অনেকে বলতে পারেন ভোগ সুখ এই সব তো বাস্তব, তবে কি পার্থিব এই সব ভোগ সুখ—একেই বলতে চান ধর্ম? এমন প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' 'না' দুই-ই বলতে হয়। পার্থিব ভোগ সুখ বলতে আমরা যে জিনিস বুঝি সে জিনিস এক হিসাবে ধর্ম অবশ্য নয়; কিন্তু অন্য হিসাবে একেবারে যে নয়—তাও বলা চলে না। ধর্ম যে বস্তু সে বস্তু সদা এবং সকল পার্থিব ভোগ সুখের ত্রুটি হ'লো এই যে এগুলো ক্ষণস্থায়ী এবং সকল নয় অর্থাৎ পূর্ণতা তাতে নেই। অপূর্ণতার এই যে অভাব আমরা পাই পার্থিব রসের ভিতর এর দ্বারা বুঝতে হয় যে পূর্ণতার সঙ্গে তার সংযোগ রয়েছে; সুতরাং এগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হ'তে পারে না। এই অপূর্ণতার পরিপূর্ণ স্বরূপকে বুঝেই পূর্ণতার রসকে জীবনে প্রদীপ্ত করে তোলা যায়, এর অন্তর্নিহিত অবি-তৃপ্তির অবসাদে চিত্তকে প্রতপ্ত করেই তবে অনুভবে অধিরূঢ় হতে হয়। কিন্তু আমাদের ধর্ম সাধনা ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়িয়েছে অন্য রকমে। ধর্ম বলতে আমরা এ জগৎ ছাড়া অন্য কোন জিনিস বুঝতে চাই। ধর্মের স্বরূপ তত্ত্ব বলতে আমরা যে ভগবানকে বুঝি, আমরা ধরে নিয়েছি যে, তিনি এ জগতে নেই, বাইরে কোন লোকে বিরাজ করছেন। এর ফলে পৃথিবীর সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব বা বিরোধের ভাব নিয়ে আমাদের ধর্ম সাধনা করতে হয় এবং ফলে সে সাধনা কৃচ্ছ্র হয়ে উঠে। পার্থিব এই অভাবাত্মক দেহের বোঝা ঘাড়ে করে বহন করে আমাদের স্বর্গলোকে ইন্দ্রলোকে ছুটতে হয়, বোঝা ঘাড়ে থাকতে নিরুদ্বেগ কোথাও নেই। আমরা যদি দয়াময় কৃপাময় আমাদের ভগবানকে পৃথিবীতে পাই পাই ষোল আনা নির্ভরযোগ্য আপনার লোককে, তবে দেহের বোঝা তাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি; কিন্তু এই পৃথিবীতে দেহটি কাউকে দিয়েই আমাদের বিশ্বাস হয় না; সকলকেই আমরা দেখছি পর; এমন অবস্থায় দেহের দিকেই কেবল নজর রাখতে হয়; কেবল ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়; এ দেহের কখন কি হয়, এই মনে করে। এ দেহের বোঝা ঘাড়ে থাকতে শান্তি কোথাও নেই। প্রকৃত ধর্মজীবন এমন নয়; শান্তির পথও এ নয়। শান্তির পথ হ'লো ত্যাগে। ত্যাগ বলতে দেহের বোঝা কাটানোই স্থূল-ভাবে বুঝতে হয়, রসের বিচার অন্য দিক দিয়ে। আমি যদি এই পৃথিবীতে আত্মীয়ের সন্ধান পাই, সকলকে আপনার ক'রে দেখতে পারি; তবে দেহের জন্য চিন্তাও আমার থাকে না; এ বোঝা কেটে গিয়ে অনায়াস জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমি যতকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে আত্মীয়তার প্রতিবেশ না পাচ্ছি, দেহটি ঠিক ততদিনই বোঝা ব'লে মনে হয়; আত্মীয়তার প্রতিবেশের মধ্যে পড়লে এ দেহ সে আত্মীয়তার আস্বাদনে সেবা রসে যখন উদ্দীপ্ত হয় তখন এই দেহই আনন্দময় হয়ে উঠে; সুতরাং সেক্ষেত্রে ত্যাগ বলতে ঠিক বোঝার মত কোন জিনিস ছাড়া বুঝায় না। সে অবস্থায় সাধকের পক্ষে অভাবাত্মক কোন অনুভূতিই থাকে না শুধু এ পর্যন্ত বলা যেতে পারে। যে অনুভূতির দ্বারা আনন্দ রসে দেহধর্ম এমনভাবে নির্যাপিত হয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাকেই ধর্ম-জীবন বলা হ'য়েছে। চারিদিকে অভাবের খোঁচায় খোঁচায় আমরা প্রতিপদে বুঝছি কেবল মরণকে জীবনের স্বাদ পাচ্ছি না; প্রকৃতপক্ষে আমরা যাকে জীবন বলছি, তা কেবল মরণ-ঘড়ির কাঁটার টিক টিকানী শোনা ছাড়া অন্য কিছুই নয় মরণের দিক থেকে আমাদের গতির জীবনের দিকে যা ঘুরিয়ে দিতে পারবে আমাদের প্রয়োজন তেমন জিনিসের; আমরা চাই তেমন ধর্ম। তেমন ধর্মতত্ত্বে যিনি আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন আমাদের দরকার সেরূপ ভগবানের। কথাটা সোজাসুজি ভেঙে বললে দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীকে তুচ্ছ মনে করে, যে ভগবান উচ্চে বসে আছেন, তেমন ভগবান আমাদের অভাব মিটতে পারবেন না; পৃথিবীর মধ্যে যে ভগবানের প্রেমের-লীলা সত্য হয়ে উঠেছে; তেমন ভগবানেরই আমার প্রয়োজন। এখানকার জীবনে ভাব বা ভালবাসা সত্য হয়ে উঠে যে ভগবানের লীলাকে আশ্রয় করে তেমন ভগবানই আমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারেন এবং শান্তি দিবার সামর্থ তিনিই রাখেন। ভগবানের শক্তি, ঐশ্বর্য এ সব বড় বড় কথা শুনলে আমার বাস্তব জীবনে কোন লাভ নেই, আমার দরকার তেমন ভগবানের যিনি আমার ভয় ভেঙে অভয় দিতে পারেন। আমাকে অভয়ত্ব দিতে হ'লে এই ভবের হাটে যিনি ভাবের, স্রোত বহাতে পারেন, আমি চারিদিকে পরবোধের বেড়ার মধ্যে পড়ে যে শঙ্কিত অবস্থায় রয়েছি, এই পরবোধের বেড়া, প্রেমের প্লাবনে ভেঙে দিয়ে অনাবিল আত্মস্থিতির রাজ্যে নিয়ে যাবার মত যাঁর অনৈশ্বর্য মধুর ঔদার্য আছে তেমন ভগবানেরই আমার প্রয়োজন। সুতরাং সাধক উন্নত জীবনের অধিকার যতই লাভ কর্তে থাকেন ভগবানের সম্বন্ধে বড় বোধ ততই তাঁর পক্ষে আর বড় থাকে না। বিষ্ণু-পুরাণে আমরা দেখতে পাই গোবর্ধন ধারণের পর গোপগণ যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দেখে স্তব্ধ হ'য়ে তাঁর স্তব করছেন, তখন ভগবান বলছেন, গোপগণ অনুগ্রহ তোমরা আর আমাকে বড় বলো না এতে আমি বড় ব্যথা পাই। ত্রিজগতের যেখানেই আমি যাই সকলেই আমাকে বড় বলে বিদায় করে দেয়; আমাকে ঘরে ডেকে নেয় না, আমাকে আপনার করতে পারে না। আমি দেবতা নই আমি গন্ধর্ব নই আমি যক্ষ নই, আমি কিন্নর নই আমি তোমাদের আপনার। আমাকে তোমরা আপনার করে নেও।

কিন্তু ভগবানকে 'আপনার ক'রে নেও' বললেই তাঁকে আপনার করা যায় না। ভগবানের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরোক্ষ এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা ব্যবহিত। বাস্তব জীবনে যে কাম আমরা তৃপ্ত করতে পারি নে, সেই কামের হিসাবেই ভগবানকে দেখি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের অনেকেরই ভগবানের সম্বন্ধে ধারণা টাকা-পয়সার হিসেবে। মহাপ্রভু বললেন, 'ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে

সব জগৎ মিশ্রিত।' ঐশ্বর্য জ্ঞান নিয়ে ভগবানের চিন্তা যেখানে সেখানে আত্মীয়তা নেই; জড় জগতের অভাবের বোঝাই আমরা সেখানে ধর্মের নামে ব'য়ে নিয়ে চলেছি। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ভয়, জয় কুত্রাপি নেই। ভাগবতে ঋষভদেব বললেন, ভগবানের তত্ত্ব যদি আত্মতত্ত্ব না হয়, তবে পরাভব সেখানে থাকবেই। সাধনার প্রধান কথা হ'লো দেশ-কাল এবং পাত্রের বেড়াকে ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ভগবানকে অব্যবহিত এক ক'রে পাওয়া। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এ স্তর বিচারের স্তর নয়; আমার সঙ্কল্প-প্রভব কাম যেখানে অনুপাতের দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে, বিচার সেখানেই যেখানে পূর্ণ করে পাওয়া, একেবারে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের আধারকে ভর্তি করে পাওয়া সেখানে আর কোন বিচার থাকে না। সেখানে আমার চাওয়াই লোপ হ'য়ে যায়। সেখানে রসের স্রোতে আমার ব্যক্তি সত্তা ভেসে যায় ডুবে যায়। সেখানে আমার কৃতার্থতা। এই যে রাজ্য, এ রাজ্য প্রসাদের রাজ্য; দর্শনের ভাষায় ভূমার রাজ্য, অল্পের দৈন্য অতিক্রম করে ভূরি দানের এ ভূমি। সবই তিনি দিচ্ছেন। আর তাঁর সেই যে দেওয়া—তাঁর নিজেকেই সঁপে দেওয়া অর্থাৎ তিনিই দেওয়ার ভিতর দিয়ে নিজে হওয়া হয়ে আছেন, এই অনুভূতির এই রাজ্য। এ রাজ্য লীলারই রাজ্য—রসেরই রাজ্য। উপনিষদ এই তত্ত্বেরই নির্দেশ করে বললেন ব্রহ্মকে জানো। কেমন ব্রহ্ম? আনন্দময় ব্রহ্মকে জানো; তা হলেই আর কোথায়ও ভয় থাকবে না।

শুদ্ধ মাধুর্যময়, আনন্দময়—কেবলানন্দ-ভবানন্দ সন্দেহস্বরূপে এই যে ভগবানের তত্ত্ব মহাপ্রভুর লীলায় বাঙলার সাধক এই তত্ত্বকেই ব্যক্ত দেখলেন। গদা ধরে চক্র ধরে ভগবানও যেন ভয়ের মধ্যে ছিলেন অভাবের মধ্যে ছিলেন তিনিই ভাবে ভরে উঠলেন। গদা চক্রের ভিতরকার ভয় এ লীলায় তাঁর আত্মীয়তার ছন্দে আচ্ছন্ন হ'ল মাধুরী হ'ল অপাবৃত। তাঁর আয়ুধ এবং ঐশ্বর্য যা আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত কচ্ছিল সে সব তাঁর প্রেমময় এবং রসময় অঙ্গের অঙ্গীভূত হ'য়ে প্রেমালিঙ্গনের স্পন্দনে তর্ক এবং বিচারকে দূরে করে আনন্দকে সর্বতোভাবে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুললো এবং সাধকের অন্তরকে প্রসাদ রসে পূর্ণ করে অবসাদের কারণ একেবারে লোপ ক'রে দিল। সাধক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভগবানের প্রসাদ উপলব্ধি করলেন, অর্থাৎ আগে যে কথাটা বলেছি—ভগবানকেই উপলব্ধি করলেন কারণ আমি এবং আমার সম্পর্কিত বস্তু যেমন দুই জিনিস, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রে উপলব্ধিজাত সে জিনিস তেমন দুই বস্তু হ'তে পারে না। সোনার কদর যে একবার বুঝতে পেরেছে, সোনার গহনার মূল্যেও তার কাছে অন্যরূপ হয় না। তেমনই ভগবান আর ভগবানের জগতেও ভিন্ন রস থাকে না; কারণ ঋষিদের মতে এক্ষেত্রে জগতের মধ্যে ভগবানকেই আত্মতায় অনুপ্রবিষ্ট উপলব্ধি হয় এবং সাধকের জীবনে সকলই মধুময় হ'য়ে উঠে। অমৃতের প্লাবনের মধ্যে তিনি অসংশয়িত এবং অসংমূঢ়ভাবে অবস্থিত হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যান। ভেবে দেখবার বিষয়। বিষয়টা হ'লো এই যে, বেদে যে সত্য গুপ্ত ছিল মহাপ্রভুর লীলায় তাই ব্যক্ত হ'ল; শুধু ব্যক্ত হ'ল বললেই সব কথা বলা হয় না। পৃথিবীতে বাস্তব হ'লো সত্য হ'লো; যা ছিল পরোক্ষ তা হ'লো প্রত্যক্ষ; যা ছিল সমুদ্দিষ্ট তা হ'ল নির্দিষ্ট। এই সত্যকে লীলার ভিতর উপলব্ধি করেই বাঙলার সাধক বৃন্দাবনদাস জগাই মাধাইয়ের মুখ দিয়ে মহাপ্রভুর বন্দনার ছন্দে বললেন, —"আজি সে হৈল বেদ মহাবলবন্ত।"

আপনারা যাঁর মহিমা কীর্তনের জন্যে এখানে সমবেত হয়েছেন প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাও মহাপ্রভুর সেই লীলার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বৃন্দাবনের মাধুর্য তত্ত্ব না বুঝলে যেমন আমরা মহাপ্রভুকে বুঝতে পারবো না। তেমনই মহাপ্রভুকে না বুঝলে প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সে রস সাধনা নিগূঢ়। কিন্তু এর একটা বাস্তব ব্যক্ত দিকও রয়েছে। আমাদের যদি মানুষ হিসেবে জাতি হিসেবে বাঁচতে হয় তবে এ লীলাকে বুঝতে হবে। দেশের পীড়িত, অবজ্ঞাত এবং দীন-দরিদ্রের জন্যে যে তাপ তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর জীবনে, সে তাপ আমাদের অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। শুধু বহিরাচারের নকলনবিশীতে অন্তর সাড়া দেয় না, প্রয়োজন রসোপলব্ধির। সুতরাং নিত্য রসের উৎসের সঙ্গে যদি আমরা চিত্তকে যুক্ত করতে না পারি তবে প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলার এই যে মানুষকে ভালবাসার দিকটা শুধু ব্যবহারিক রাজনীতিক সূত্রের দিক থেকে আমরা তা জীবনে সত্য ক'রতে পারবো না। সুতরাং প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁর জীবনে যে শিক্ষা দিলেন, তার অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণতাও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে; অর্থাৎ যে স্পর্শ পেয়ে দীন-দরিদ্রের সেবার এই রস তাঁর জীবনে উথলে উঠেছিল, সেই স্পর্শের রাজ্যে আমাদের যেতে হবে। শুধু উপদেশ এ রাজ্যে নিতে পারে না; বাঙলার সাধকদের ভাষায় সেই উপদেশের সঙ্গে পতিতপাবন লীলার বিভঙ্গীর অনুধ্যান লাভ করা প্রয়োজন। সে লীলারই কীর্তন, শ্রবণ প্রভৃতি সাধনাঙ্গ অবলম্বন করা আবশ্যক। আজ আমাদের চারদিকে মহাভয় জেগে উঠেছে। আমাদের সকল সম্বল যেন এলিয়ে পড়ছে; কোন দিক থেকে জাতির কোন কর্ম-সাধনাই দানা বেঁধে উঠতে পাচ্ছে না। সব ছাড়া ছাড়া ভাব। একমাত্র প্রেমের রসই আমাদের এই বিচ্ছিন্ন জীবনে অপরিচ্ছিন্ন ঐক্যের বার্তা আনতে পারে। অন্য কোন পথ নেই। কি ঐহিক কি পারত্রিক এ ছাড়া কোন দিক দিয়ে বাঁচবার পক্ষে আমরা কোন পথ দেখতে পাচ্ছি নে। প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলা কথা শ্রবণ, কীর্তনের পথে সেই প্রেম সাধনাকে সত্য করে আপনারা দেশের জাতির একটা মহৎ উপকার সাধন কচ্ছেন। জানবেন, জগৎকে এই পথেই আসতে হবে। ভারতের ঋষিরা এ সব কথা বলে গেছেন; জগতে আজ যা ঘটছে বা ঘটবে তাঁরা তা বুঝতে পেরেছিলেন শুধু ইতিহাসের ধারা ধরেই সে জ্ঞানটা আজ ফুটে উঠেছে, এ মনে করবেন না। ভারতের ঋষিরা জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে সব দিক দিয়ে অখণ্ডভাবে সকল সম্ভাবনাকে সত্য ক'রেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা বলেছেন, ভারতের বাইরের লোকেরা দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে পারে; কিন্তু শান্তি তাতে পাবে না; চাকা উল্টো দিকেই ঘুরবে। অশান্তি এবং অতৃপ্তি তাতে বেড়ে উঠবে। তার পর একদিন ভারত ভূমির অবদান আত্ম তত্ত্বেরই আশ্রয় নিতে হবে। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে নারদের মুখে এ কথা আমরা শুনতে পাই। জগতে আজ বিপুল পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলছে। এত বড় ভাঙ্গার খেলা জগৎ আর কোন দিন দেখে না, আর সেই ভাঙ্গার ভিতর দিয়ে জগৎজুড়ে অখণ্ডভাবে মানুষের জাগরণের সম্ভাবনাও এমনটা কোন দিন দেখা দেয় নি। দেশের, কালের এবং পাত্রের দূরত্ব ও ব্যবধান ভেঙ্গে আজ জগতের বিভিন্ন অংশের ভিতর নৈকট্য ঘনীভূত হয়ে উঠছে। আত্মীয়তার ভাব এতে বাড়বে এবং আত্মীয়তার মাধুর্যময় লীলার নিত্যতাও আমাদের দৃষ্টিতে অধিকতর পরিস্ফূর্ত হবে। আপনাদের এ সাধনা এ দিক থেকে যুগোচিত সাধনা এবং যুগের গতির বিরুদ্ধতার গোঁড়ামী সনাতন ধর্ম হ'তে পারে না; কারণ যা উদার বীর্যে আমাকে অধিষ্ঠিত করে না সে সঙ্কীর্ণতা ধর্ম নয়, তা ভয়াবহ এবং অধর্ম। আপনাদের এই যুগোচিত সাধনা জয়যুক্ত হোক।*

*যশোহর জেলার কালিয়া থানার অন্তর্গত ফুলবদিনা গ্রামে হরিশ্চন্দ্র আশ্রমে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা।

মার্ক্সের অর্থনীতি

গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল এম-এ

বহুদিন পর্যন্ত মার্ক্স বিদ্যায়তনের অর্থনীতিবিদ মহলে অবজ্ঞাত ছিলেন। ইতিহাস-বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্রদর্শনে তাঁর অবদান কিছু কিছু স্বীকৃত হলেও অর্থনীতিতে তাঁকে কোনো স্থানই দেওয়া হত না। আবেগ-দুষ্ট শ্রেণীবিদ্বেষের দ্বারা অর্থনীতি চিরকাল উপেক্ষিত হত। সাম্প্রতিক অর্থনীতিতে সে ভাবটা কেটে যাচ্ছে বলে মনে হয়। বিদ্যায়তনের গণ্ডীতে সর্বপ্রথম অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি যেমন সত্যকার মর্যাদা দিয়ে মার্ক্সের রাষ্ট্র-দর্শন আলোচনা করেন, তেমনি কেমব্রিজের অধ্যাপক মরিস ডব (Maurice Dobb) আলোচনা করেন তাঁর অর্থনীতি। সুচিন্তিত এবং বিস্তৃত বহু আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি মার্ক্সীয় অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা সকলের সামনে তুলে ধরেন। Political Economy and Capitalism নামক গ্রন্থে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সনাতনী অর্থনীতিকদের সঙ্গে মার্ক্সের পার্থক্য কোথায় এবং মার্ক্সের অর্থনীতির সত্যকার তাৎপর্য কি। তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন মার্ক্সের অর্থনীতি অবৈজ্ঞানিক মনে করে দূরে ঠেলে রাখবার বস্তু নয়—জীবনের গভীর বাস্তবতার মধ্যেই তার মূল নিবদ্ধ আছে।

সনাতনী অর্থনীতিকেরা সমগ্র অর্থনীতিকে সমাজ-সম্বন্ধের প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পণ্য বিনিময়ের যান্ত্রিক পদ্ধতি হিসাবে দেখেছিলেন। তাই মরিস ডব বলেছেন,—

"A political economy which used as its constants properties of objects abstracted both from individuals and the class-circumstances of these individuals could deal only with surface appearance, could afford only a partial analysis of phenomena and hence pastulate tendencies which were not merely incomplete but also contradictory and false." অর্থাৎ যে অর্থনীতি মানুষ এবং মানুষের শ্রেণী-সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুকেই একান্তভাবে দেখে তা সমস্যার মর্মস্থলে না পৌঁছে ওর বাহ্য দিকটাই লক্ষ্য করবে, তার বিশ্লেষণ হবে অসম্পূর্ণ এবং তা এমন সমস্ত সূত্র ও নিয়ম গড়ে তুলবে যা শুধু অসম্পূর্ণই নয়, স্ব-বিরোধী এবং অসত্য।"

মুনাফার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাই মার্ক্সীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুনাফা কোত্থেকে আসে? অন্য শ্রেণীর হাতে না গিয়ে এটি একটি বিশেষ শ্রেণীর হস্তগত হয় কেন? মুনাফা কি মজুরীর মধ্যে এসে মিলিয়ে যেতে পারে? এ সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সনাতনী অর্থনীতিকেরা দিতে পারেন নি। তাঁরা কেউ বললেন মুনাফা মূলধনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুণে সৃষ্টি হয়েছে, কেউ বললেন মূলধন সঞ্চয়ের পশ্চাতে যে একটি বিশেষ প্রকারের ত্যাগ বর্তমান আছে মুনাফা তারই মূল্যস্বরূপ। মার্ক্সের মতে মুনাফা মূলধনের কোনো একটি স্বকীয় ক্ষমতা-গুণে সৃষ্টি হয় নি অথবা ওটি পুঁজি-পতির "ত্যাগ" বা "উৎপাদন-প্রয়াসের" মূল্যস্বরূপও নয়। সম্পত্তিবান নিয়োগ-কর্তা এবং ওদের নিয়োজিত সম্পত্তিহীন শ্রমিকের বিভেদপূর্ণ সমাজ-সম্বন্ধের মধ্যেই মুনাফার রহস্য উপলব্ধি করতে হবে। পণ্য বিনিময়ের বাজারের বাহ্যিক সাম্যাবস্থা এবং ব্যবসায়িক চুক্তিসমূহের বাহ্যিক স্বাধীনতার অন্তরালে শ্রেণী-বিভেদ অসাম্য এবং দাসত্বের জ্বলন্ত বাস্তবতা লুক্কায়িত আছে। এই বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেই মুনাফার প্রকৃত তাৎপর্য বোধগম্য হবে। মুনাফা শ্রমিকেরই সৃষ্ট মূল্যের অংশ বিশেষ। সমস্ত মূল্য সমাজ-চালিত শ্রমই সৃষ্টি করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের শ্রম-শক্তি পুঁজিপতির কাছে পণ্যের মত বিক্রীত হয়। শ্রম-শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যা প্রয়োজন শ্রমিকেরা ততটুকুই তাদের শ্রম-শক্তির মূল্য হিসাবে পায়। কিন্তু নিজেদের কারখানায় এই শ্রম-শক্তি থেকে পুঁজিপতি শিল্পোৎপাদকেরা যে পরিমাণ শ্রম বের করে নেয় তার মূল্য শ্রম-শক্তির মূল্য অপেক্ষা অধিক; এই অতি-রিক্ত মূল্যাংশই মুনাফার উৎস। জীবিকার জন্য আপন শ্রম-শক্তির বিক্রয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল একটি শ্রেণীর উপস্থিতি না থাকলে শিল্পপতিরা এই অতিরিক্ত মূল্যাংশকে কোনো মতেই আত্ম-সাৎ করতে সমর্থ হত না অর্থাৎ এটি শিল্পপতির "উপার্জন" হিসাবে উদ্ভূত হতে কখনই দেখা যেত না।

মূলধন বা উৎপাদন-যন্ত্র যে ধন সৃষ্টি করে একথা অস্বীকার করার মতলব মার্ক্সের কোনো কালেই ছিল না। তিনি Critique of Political Economy-তে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, একমাত্র শ্রমই ধন সৃষ্টি করে না; কিন্তু ধনোৎপাদন করে বলেই এটা সত্য নয় যে, জমি এবং উৎপাদন-যন্ত্র মূল্যও সৃষ্টি করে। ধন এবং মূল্য পৃথক জিনিস। প্রকৃতপক্ষে মূল্য একান্তভাবে বস্তুর মধ্যেই নিহিত কোনো পদার্থ নয়। ওটা মানুষের সমাজ-সম্বন্ধেরই অভিব্যক্তি। বস্তুত লেনিনের ভাষায়ঃ—

Where the bourgeois economists saw a relation of things (the exchange of one commodity for another), Marx revealed a relation of men." (Selected Works of Lenin) অর্থাৎ 'ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকেরা পণ্য-সম্পর্কই (অর্থাৎ এক পণ্যের সহিত আর এক পণ্যের বিনিময়) লক্ষ্য করেছিলেন, মার্ক্স দেখেছিলেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সমাজ-সম্বন্ধ।" দৃষ্টি-ভঙ্গীর এই পার্থক্যের মধ্যেই ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতির সঙ্গে মার্ক্সীয় অর্থনীতির পার্থক্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি আধুনিক কালের একজন সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিক জোয়ান রবিনসন (Joan Robinson) তাঁর An Essay on Marxian Economics (1942) নামক এক পুস্তকে মার্ক্সের প্রতি অতি উদার মনোভাবই দেখিয়েছেন। সনাতনী অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে মার্ক্সের তুলনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, সনাতনী অর্থনীতি এবং মার্ক্সীয় অর্থ-নীতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমত সনাতনীরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম বলে ধরে নিয়েছেন মার্ক্স কিন্তু [illegible] সমাজ প্রথা থেকে সমাজ-তন্ত্রের পথে সমাজ বিবর্তনের মধ্যবর্তী একটি স্তর হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত সনাতনীরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটি সম্প্রীতি ও সামঞ্জস্য কল্পনা করে নিয়েছিলেন; মার্ক্স কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে [illegible] শ্রেণী সম্পত্তিশালীর সঙ্গে [illegible] সম্পত্তিহীন শ্রমিকের সংগ্রাম হিসাবেই দেখেছিলেন। সনাতনীরা চিরন্তন [illegible] সন্ধানের চেষ্টায় চালিত হয়ে প্রবহমান ইতিহাসের বিশেষ একটি স্তরের [illegible] বাস্তবতাকে লক্ষ্যের মধ্যে আনেন নি। সমান সমান মূলধনের মালিকের [illegible] অধ্যুষিত সনাতন ধনতন্ত্রের অর্থনীতিকে তাঁরা পূর্ণ বিকশিত ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও টেনে এনেছিলেন। সমতার ভিত্তিতে অবাধ প্রতিযোগিতার অবাস্তব কল্পনা তাই তাঁদের পেয়ে বসেছিল এবং এই কারণেই সনাতনী অর্থনীতি আধুনিককালের বাস্তব সমস্যা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। একথা বর্তমানকালের সুবিখ্যাত অর্থ-নীতিক কেইনস্‌ও স্বীকার করেছেন :

"....its (classical theory of economics) tacit assumptions are seldom or never satisfied with the result that it cannot solve the economic problems of the actual

world." (The General Theory of Employment, Interest and Money) অর্থাৎ "সনাতনী অর্থনীতির প্রচ্ছন্ন অনুমানগুলি কখনই সত্য হতে দেখা যায় না বলে সনাতনী অর্থনীতি বাস্তবজগতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানে মোটেই কার্যকরী হয় না।" অপরপক্ষে মার্ক্সের অর্থনীতি বাস্তবতার প্রগাঢ় উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতনী অর্থনীতিকেরা সামাজিক ভারসাম্যের অবস্থাটা ধরে নিয়ে তার মধ্যেই নিজেদের গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। মার্ক্স দেখেছিলেন আর্থিক-জগতের উত্থান-পতন, জোয়ার-ভাঁটাটাই বাস্তব সত্য এবং ওর কার্যকারণ নির্ধারণেই তাঁর অর্থনীতিকে নিয়োজিত করেছিলেন। সমাজ যদি স্থিতিশীল না হয়ে গতিশীল হয় তাহলে তার গতির ছন্দগুলি যে অর্থনীতি রূপায়িত করবে তাই হবে সত্যকার অর্থনীতি। আর কল্পিত স্থিতিশীলতার উপর [illegible] করে যে অর্থনীতি গড়ে উঠবে, তা হবে অ[illegible]—বাস্তবজীবনের আসল সমস্যার সমাধান তাতে পাওয়া যাবে না। মার্ক্সের মূল্য-দর্শন [illegible] সামাজিক গতিবিজ্ঞানেরই (Social Dynamics) অঙ্গ; এর মধ্যে সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিবর্তনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থসংকটের ব্যাখ্যাও এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বস্তুত মার্ক্সের মূল্য-দর্শনের মধ্যে শ্রেণী-সম্বন্ধের গতি (movement of class-relations) এবং অর্থ-সংকটের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বলেই তার সার্থকতা। সুপরিচিত সাম্যবাদী John Strachey-র ভাষায়:—

"The function of the Marxian Theory of value is to enable us to establish the law or laws which govern the historical movement of the capitalist system as a whole. By the use of these laws alone shall we be able to attack our special problem of the cyclical crisis of capitalism." (Nature of The Capitalist Crisis)

অর্থাৎ "সমগ্র ধনতান্ত্রিক প্রথার ইতিহাস যে পদ্ধতি অনুসারে পরিণতি লাভ করছে, তা নির্ধারণে সাহায্য করাই মার্ক্সীয় মূল্য-দর্শনের কাজ। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোকেই আমরা চক্রমণশীল অর্থসংকটের মর্ম উদ্ঘাটন করতে পারি।"

মার্ক্সের অর্থনীতি থেকে আমরা জানতে পারি ধনতান্ত্রিক প্রথার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী মূলধন (constant capital) অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্র বাবদ নিয়োজিত মূলধন পরিবর্তনশীল মূলধনের (variable capital) অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরী বাবদ নিয়োজিত মূলধনের অনুপাতে যতই বাড়ে, মূল্য সৃষ্টির পরিমাণ কমে গিয়ে পুঁজিপতির মুনাফার হারও তত কমে যায়; কারণ মার্ক্সের মূল্য-দর্শনে আমরা দেখতে পাই, শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে, সুতরাং উৎপাদনে শ্রম-বিনিয়োগ স্থায়ী মূলধনের তুলনায় যতই কমবে, উদ্বৃত্ত মূল্য হ্রাস পেয়ে মুনাফাও সেই পরিমাণ কমে যাবে। অবশ্য এর বিপরীতমুখী কতকগুলি প্রক্রিয়াও দেখতে পাওয়া যায়। তাহলেও ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হার যেভাবে ক্ষয় পেতে থাকে, তা রোধ করা সম্ভব হয় না। মুনাফাই ধনতন্ত্রের মেরুদণ্ড; সুতরাং মুনাফার ক্ষয়িষ্ণুতাই ধনতন্ত্রকে সংকটের মুখে টেনে আনে। এই ব্যাপারটাই উৎপাদন-শক্তির পরিমাণের সঙ্গে সমাজের ক্রয়ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হিসাবে উৎকটভাবে দেখা দেয়: পুঁজিপতি কর্তৃক বঞ্চিত হয়ে সমাজের অধিকাংশই দরিদ্র,—সমাজের বিরাট উৎপাদনশক্তি পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়াতে পারে, তা খরিদ করিবার সামর্থ্য সমাজের নেই। কাজেকাজেই, উৎপাদন অচল অবস্থায় এসে পৌঁছয়। তাই মার্ক্স বলেছেন,—

"The real barrier of capitalist production is capital itself." অর্থাৎ "পুঁজিই পুঁজিতন্ত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।"

Mrs. Robinson ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিণতির বিশ্লেষণ হিসাবে মার্ক্সীয় অর্থনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি প্রায় উচ্ছ্বসিতভাবেই বলেছেন:—

"Marx, however imperfectly he worked out the details, set himself the task of discovering the law of motion of capitalism, and if there is any hope of Progress in Economics at all, it must be in using academic methods to solve the problems passed by Marx." (An Essay on Marxian Economics) অর্থাৎ "সূক্ষ্ম বিচারের দিক দিয়ে মার্ক্সের দর্শন যতই অসম্পূর্ণ হ'ক না কেন, তিনি ধনতন্ত্রের গতিবিজ্ঞানের সূত্র [illegible] আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অর্থনীতির প্রগতি যদি কিছু ভরসা থাকে, তবে তা বিদ্যায়তনের রীতি অনুসারে মার্ক্স নির্দেশিত সমস্যাগুলির পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই সম্ভব হবে।"

ইমাম গাজ্জালির আত্মবিকাশের ধারা

(৫৭৩ পৃষ্ঠার পর)

আসিলেন। এতদিন ধরিয়া মনের সন্তোষ ও আত্মার তৃপ্তি তিনি খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বহু সাধনার পর তিনি তাহা পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সত্য-সন্ধানের বিবরণকে তিনি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—এমন কোন দার্শনিক নাই, যাঁহার দর্শনশাস্ত্র আমি পাঠ করি নাই। এমন কোন Theologian নাই, যাঁহার জটিলতা আমি ভেদ করিতে পারি নাই। সুফী মতবাদের এমন কোন রহস্য নাই, যাহার ভিতর আমি প্রবেশ করি নাই। ঈশ্বরের পরম প্রেমিকগণ আমার নিকট তাঁহাদের কৃচ্ছ্রসাধনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের কারণগুলি আমার নিকট গোপন করেন নাই। এইভাবে অনুসন্ধান করিয়া তিনটী বিষয়ে আমার গভীর বিশ্বাস হইয়াছে—যথা—ঈশ্বর, প্রত্যাদেশ (ওহি') এবং শেষ বিচার-দিন। ধর্মের এই তিনটি মূল তথ্য আমার মনে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রমাণের দ্বারাই যে এই সব বুঝিয়াছি, তাহা নহে—এগুলি বুঝিয়াছি এমন কতকগুলি ঘটনা, কারণ ও অনুভূতির সাহায্যে, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

এইবার তাঁহার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিল। তাঁহার মৃত্যুর দৃশ্য যেমন মধুর তেমনি তেজোব্যঞ্জক। সেদিন সোমবার। সকালে উঠিয়া তিনি 'ওজু' করিলেন এবং যথারীতি নামাজ পড়িলেন। পরে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন: "আমার জন্য 'কাফন' (Coffin) আনয়ন কর।" কাফন আনীত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, তাহাকে চুম্বন করিলেন, এবং চোখে বুলাইলেন। তারপর বলিলেন: "আমি আমার প্রভুর আদেশ শুনিতেছি যে, তিনি যেন আমাকে আহ্বান করিতেছেন।" পরে পদদ্বয় ছড়াইয়া দিলেন। তারপর সব শেষ। তিনি হাসিমুখে তাঁহার দয়িতের নিকট চলিয়া গেলেন।

ইমাম গাজ্জালী সম্বন্ধে একজন জার্মান পণ্ডিত বলিয়াছেন: "এমন সত্যিকারের ঈশ্বরভক্ত লোক জগতে দুর্লভ। তিনি ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বিখ্যাত সাধক Arigen-এর সহিত এক আসন দেওয়া যাইতে পারে। তিনি তাঁহারই মত পণ্ডিত ও মহৎ ছিলেন এবং সত্য প্রকাশে সেইরূপই সিদ্ধহস্ত ছিলেন।"

ভাঙন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সংসারের আয় ধারে ধারে কমে আসতে লাগলো, কিন্তু ব্যয়ের ফর্দ সামনে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন মন্দাকিনী। এর থেকে কোন্ অংশকে বাদ দিয়ে আর কোন্ অংশ কমিয়ে এনে তিনি আয় আর ব্যয়ের মাঝখানে সঙ্গতি আনবেন।—কি করে চালিয়ে নিয়ে যাবেন শৃঙ্খলার সঙ্গে তাঁর সংসার—এতোটুকু অসঙ্গতি ধরা পড়বে না কারো চোখে সামান্যতম অনুযোগের আভাস পাওয়া যাবে না কারো কথায়! এ সংসারে এখন আর তিনি নতুন বধূ নন—কখন যে তাঁর মসৃণ ললাটে চিন্তার ছাপ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো আর কানের পিঠে চুলের গুচ্ছে পড়লো সোনালী আভাস তা তিনি নিজেই হয়তো সঠিক জানেন না। এতোদিন অভ্রান্তভাবে সংসার চালিয়ে আজ শুধু তিনি নির্ভুল বলে দিতে পারেন আয়ব্যয়ের খাতায় কোনখানে কতটুকু অদলবদল করলে কার মনে কতখানি উত্তাপ জমে উঠবে কার স্বাভাবিক কথাবার্তার পিছনে আত্মগোপন করে থাকবে নিশ্চিত শ্লেষের ইঙ্গিত।

আমরা জানি মন্দাকিনীর মনে এ সব কোনো দাগ কাটতে পারে না। যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন এ সংসারে তখনো এ সব প্রাত্যহিক ধূলিমলিন স্পর্শ থেকে সন্তর্পণে নিজেকে তিনি বাঁচিয়ে চলতেন এখনো তাই চলেন—তবু একটু যেন পার্থক্যের আভাস আছে জীবনের এই দুই পরিচ্ছেদের মাঝখানের পাতাগুলোয়। একদিন নিজের জীবনের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তাতে ছিলো না এদের কোনো স্থান; এখনো তিনি এদের উপেক্ষাই করেন, কিন্তু অস্বীকার আর করেন না।

কি করেই বা এদের তিনি অস্বীকার করবেন? ভারী বিশ্রী একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাতে। তার চাইতে অনেক ভালো এবং ঢের সহজ পথ হল তাদের প্রত্যেকটি স্পন্দনের সঙ্গে সায় দিয়ে চলা;—নিজের স্বামী ছেলেমেয়ে আর দেওরদের একটু অযত্ন হয় তাতে, কিন্তু তা হোক।

হিসেবের ফর্দটা সামনে ধরে নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকবার পর হঠাৎ যেন তিনি মরীয়া হয়ে উঠলেন। ভাবলেন গোয়ালাকে কাল থেকেই এক সেরের বেশী দুধ দিতে নিষেধ করে দেবেন নীপুর মাস্টার মশাইকে আগামী মাস থেকে অন্য জায়গায় টুইশানি খুঁজতে বলবেন আর জামাইষষ্ঠীতে এবার আর পারবেন না তিনি আগেকার মতো সমারোহ করতে। কিন্তু তারপরেই যেন তিনি নিভে গেলেন একেবারে। দুধের অভাবে ছোট মেয়ে রাণুর গলার হাড় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে চামড়ার নীচে পাঁজরার হাড়গুলো গোণা যাবে তার, অঙ্ক ফেল করে শুকনো মুখে সারা বাড়ি চোরের মত লুকিয়ে বেড়াবে নীপু আর জামাইষষ্ঠীর আয়োজনের সামান্যতায় বড়ো মেয়ে কল্যাণীর মুখখানা বিষাদ ম্লান হয়ে আসবে। মন্দাকিনী জানেন এর চেয়ে রূঢ় সত্য আর কিছু নেই, এর বেশী চিন্তা করতে তিনি ভয় পান এইই যথেষ্ট তাঁর পক্ষে।

এক এক সময় মন্দাকিনীর এ সমস্ত ভালো লাগে না, ভালো লাগে না দিবারাত্রি এই বিরাট সংসারের ঝুঁকি সামলাতে; শুধু এইজন্যই কি এখানে তিনি এসেছিলেন? একরাশ লোক সব সময়ে গিসগিস করছে সারা বাড়িতে বেশীর ভাগই তাদের অনাত্মীয়। প্রাণপাত পরিশ্রম করেও এদের মনের নাগাল পাওয়া যাবে না, অথচ সামান্য ত্রুটিতেই কুঞ্চিত হয়ে আসবে এদের ভুরু—অসন্তোষের ঝড় উঠবে এদের চোখে। সংসারের দিকে নির্লিপ্তর প্রাচীর তুলে মন্দাকিনীর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে সামান্য একটু সহানুভূতির প্রত্যাশায়। ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে, মন্দাকিনীর ইচ্ছে করে তাদের নিবিড় করে বেঁধে রাখতে। কিন্তু এখন বোধ হয় আর তা সম্ভব নয়। অজস্র পরভোজীদের সামান্য তুষ্টি সাধনের জন্যে যখন তিনি ব্যগ্র সেই সময় তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই একে একে খসে পড়েছে তাঁর কক্ষপথ থেকে; আকর্ষণের ক্ষমতাই যদি পৃথিবীর না রইলো তবে কি করে সে বেঁধে রাখবে উপগ্রহদের!

তবু কি আশ্চর্য, হেমন্ত এখনো মাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। মাকে বাদ দিয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ভাবতেও বোধ হয় হেমন্তের ভয় করে।

"মা, তোমার কুটনোগুলো একটু কুটে দেবো মা?"

মন্দাকিনী হয়তো বলে উঠেছেন, "কি পাগল! ছেলেরে তুই হেম? পুরুষ মানুষ হয়ে তোর লজ্জা করে না ও কথা বলতে? যা, পালা রান্নাঘর থেকে।"

ভীরু গলায় হেমন্ত প্রতিবাদ করতে যায় মাঝে মাঝে। "তা পুরুষ মানুষ তো হয়েছে কি তাতে? একদিন [illegible] একটু সাহায্য করলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি! দেবো মা এই আলুগুলোর খোসা ছাড়িয়ে?"

এর উত্তরে মন্দাকিনী হঠাৎ কাঠিন্যই উঠেছেন—"তর্ক কোরো না, উপরে যাও হেম;—পরীক্ষার আগে আর কুটনো কুটে মাকে সাহায্য না করেও চলবে। যাও—অবাধ্য হোয়ো না।"

অবাধ্য হেম হয় না, হওয়ার সাহস তার নেই; কিন্তু মন্দাকিনীর বুকে তবু যেন মুষড়ে পড়ে।

পাশের ঘরে হেম পড়চে—সামনেই তার বি এ পরীক্ষা; মন্দাকিনীর কানে এসে জড়িয়ে যাচ্ছে তারই একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। বড্ড বেশী পড়াশুনো করে ছেলেটা মন্দাকিনী ভাবলেন—দিন দিন ভয়ানক রোগা হয়ে যাচ্ছে হেমন্ত। স্বাস্থ্যই যদি না রইলো তবে কি হবে দিনরাত এত বইখাতা ঘেঁটে!

হেমন্ত মুখ ফুটে কখনো কিছু বলবে না কিন্তু মন্দাকিনী জানেন যে, তাকে এ মাসে একটা পাঞ্জাবি না করে দিলেই নয়। হেমন্তের জুতোয় যে গোটাতিনেক তালি পড়েছে তাও মন্দাকিনীর চোখ এড়ায় না। কিন্তু তবু কি করতে পারেন তিনি! পাশের বাড়ির ছোটবৌকে প্রায় তিন চার মাস আগে গোটা-কুড়ি টাকা ধার দিয়েছিলেন, এখনো সে তা শোধ করলো না আদৌ করবে কি না তাই বা কে জানে। এখন যদি টাকা কটা পাওয়া যেতো—ভারী উপকার হতো তবে মন্দাকিনীর। অনায়াসেই হেমন্তকে তা হলে জুতো আর পাঞ্জাবির দামটা তিনি দিয়ে দিতে পারতেন। আর নাইবা ছোটবৌ টাকা ফেরত দিলো, কই, সে কটা টাকার জন্যে তো সংসারের অন্য কোনো কাজ আটকে নেই। হেমন্তও কি জোর করে এসে নিজের দাবী জানাতে পারতো না? আর মন্দাকিনীও তাতে খুশিই হতেন।

ধীরে ধীরে যেন কি রকম অন্যমনস্ক আর আশ্চর্যভাবে নির্লিপ্ত হয়ে উঠছে হেমন্ত; দিনের পর দিন ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরে কলেজে যাচ্ছে, তবু এতোটুকু হুঁস নেই, জামার বোতামগুলো ছিঁড়ে গেছে তবু মন্দাকিনীকে দিয়ে নতুন বোতাম লাগিয়ে নেবে না। মন্দাকিনী যেন আজকাল আর হেমন্তকে ঠিক চিনতে পারছেন না—যেন একটা অচেনা স্তব্ধ গভীরতা সব সময় তাকে ঘিরে রয়েছে এতোটুকু উচ্ছ্বাস নেই—আর এই বয়সেই ও কি করে হারিয়ে ফেললো সমস্ত তরল উচ্ছলতা!

দিন কয়েক আগে হেমন্ত বলছিলো,

"একটা ট্যুইশানি পেয়েছি মা: রোজ দু'ঘণ্টা করে একটি ছেলেকে ইংরেজী পড়াতে হবে। নেবো? মাসে পঁচিশ টাকা করে দেবে কিন্তু......"

মন্দাকিনী বিস্মিত হয়েছেন,

"তুই কেন ট্যুইশানি করবি হেম? দু মাস বাদে পরীক্ষা তোর, সে কথা কি আমিই তোকে মনে করিয়ে দেবো? আর তা ছাড়া তোর আবার অভাব কিসের?"

হেমন্ত বলেছে,

"ঠিক অভাবের জন্যে নয় মা, এমনি একটা খেয়াল হলো।" হেমন্তের কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত শোনায়। এইটুকু বয়সে আর কোন খেয়াল হোলো না, খেয়াল হোলো ট্যুইশানি করবার! মন্দাকিনী স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, হেমন্ত যেন আস্তে আস্তে ধরা ছোঁয়ার অতীত হয়ে উঠছে, ওর নিজস্ব সত্তা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে সেখানে অন্য এক হেমন্ত গড়ে উঠছে। হেমন্তের সে রূপকে মন্দাকিনী চেনেন না,—কেমন যেন একটা অস্পষ্ট আবছা আভাস। ভয়ানক অস্বস্তি লাগে মন্দাকিনীর।

হেমন্ত ফের বলেছে,

"[illegible] ট্যুইশানি] যে মা? এ তো আর অস্বীকার করবে না যে বেশ একটা অভিজ্ঞতা হবে এতে?"

"কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতাটুকু কি পরীক্ষার ঠিক আগেই সঞ্চয় না করলে চলতো না হেম?"

"পরীক্ষার জন্যে ভেবো না মা, ও ঠিক পাশ করে যাবো দেখে নিও তুমি; আর তা ছাড়া......" একটু ইতস্তত করে হেমন্ত বলে ফেলেছে, "অনার্স তো আমি ছেড়ে দিয়েছি মা। এমনি পাশ কোর্সে পাশ করা এমন কি আর শক্ত হবে!"

চমকে উঠেছেন মন্দাকিনী,—"বলিস কিরে, অনার্স ছেড়ে দিয়েছিস মানে? কে তোকে এ দুর্বুদ্ধি দিলো?"

"ঠিক আমি ছাড়িনি মা; আসল কথা অনার্স আমি রাখতে পারলাম না। আর তা ছাড়া প্রফেসাররাও আমাকে অনার্স ছেড়ে দিতেই বললেন। কি জানো মা, আমাদের মত বোকা ছেলেদের পক্ষে পাশকোর্সই ভালো।"

মন্দাকিনীর মনে পড়ে গেল দু বছর আগেকার কথা; আই-এতে হেমন্তের স্কলারশিপ পাওয়ার খবর যেদিন বেরুলো সেদিন কি আনন্দ সারা বাড়িতে! আজ নাকি অনার্স রাখবার মতো মেধা হেমন্তের নেই! হেমন্তের চুলগুলি কি রুক্ষ, আর এই বয়সেই সমস্ত কমনীয়তা মুছে গিয়ে কি রকম কঠিন হয়ে আসছে ওর মুখ! * * *

আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে এলো। বাবু এখনো স্কুল থেকে ফিরলো না। যা ভীষণ গাড়ি ঘোড়া রাস্তায়—মন্দাকিনীর একটু ভয় করে বৈ কি! আকাশের লাল পাঁশুটে রঙ দুচোখে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়। একটু আগে রাস্তায় জল দিয়ে গেছে; জলের ঠাণ্ডা স্পর্শে পিচ ঢালা রাস্তা থেকে ভাপের ধোঁয়া উঠতে থাকে, আর ধুলোর গন্ধ। ও ঘরে হেমন্ত পড়ছে মন্দাকিনীর কানে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে তার একটানা ক্লান্ত সুর। ছেলেটাকে একটু ডাকলে হয়।

মন্দাকিনীর ডাকে হেমন্ত এসে বাইরে দাঁড়ালো।

"আমাকে ডাকছো মা"

"একটু বোস্ না হেম? সব সময়েই তো খালি পড়িস। তোদের পরীক্ষা কবে-রে?"

হেমন্ত হেসে বললো,—"সে তো আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো মা; আমি তো শুধু বইগুলোর পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে। যেদিন পরীক্ষা হবে বোলো, ঠিক গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসবো।"

মন্দাকিনীও এবার আর গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারলেন না।—"কথা শোনো ছেলের, মাঝে মাঝে তোকে পরীক্ষার কথা মনে করিয়ে দিই বৈ ত নয়। কেন, পরীক্ষার নাম শুনতে তোর ভালো লাগে না?"

"খুব ভালো লাগে, পড়াশুনো তৈরী করা থাকলে আরো ভালো লাগতো।"

"তোর কি পড়াশুনো তৈরী করা নেই নাকি? সব সময় তবে কি পড়িস্ ও সব?"

"ওগুলো পরীক্ষার বই নয় মা"।

"কি তবে?"

একটু ম্লান হেসে হেমন্ত বললো,—"তুমি বুঝবে না মা।"

মন্দাকিনী হয়তো সত্যিই বোঝেন না; এ হেঁয়ালী তাঁর কাছে দুর্বোধ। দিনের পর দিন পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, অথচ হেমন্ত রাত জেগে জেগে এমন সব বই পড়ছে যা তার পরীক্ষা-ব্যাপারে কিছুমাত্র কাজে আসবে না। তবে কেন ও এমনি করে নিজের শরীর ক্ষয় করে চলেছে, কেন ও তিলে তিলে নিঃশেষ ক[illegible] দিচ্ছে নিজেকে?

হেমন্তের চেয়ার টেবিল বিছানা সব জায়গায় এলোমেলো ছাড়াছাড়াভাবে রাশীকৃত বই ছড়িয়ে পড়ে আছে। মন্দাকিনী একদিন তুলে নিয়েছিলেন একখানা, বাঙলাতেই লেখা, তবু এত শক্ত লাগলো তার! বই ছাড়াও এখানে ওখানে অবিন্যস্তভাবে স্তূপীকৃত হয়ে আছে লাল কালিতে ছাপা অসংখ্য ইস্তাহার, একটু সহজ বাঙলায় লেখা। এগুলি থেকে মন্দাকিনী শুধু অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু বুঝতে পারেন হেমন্তকে; ও চায় পৃথিবীর সব মানুষ সমান হবে—সমান অধিকার ভোগ করবে। বসন্তের ছোঁয়া লেগে ওর চোখের সামনে মুকুলিত হয়ে উঠছে শীতের সর্বহারা পৃথিবী।

মন্দাকিনীর জমি থেকে হেমন্ত যেন এবার অনেক দূরে সরে গেছে, কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে ওর সমস্ত শরীর; মন্দাকিনীর শুধু দৃষ্টি ওকে আর চিনে নিতে পারে না। কেমন যেন একটা ভয় এসে আশ্রয় করেছে মন্দাকিনীকে। হেমন্তের চোখের দৃষ্টি যেন ধারালো হয়ে আসছে আজকাল মিশ কালো পাতলা চুল-গুলিতে মরচে-পড়া লোহার রঙ ধরছে; শীর্ণ মুখে জোর করে একটা পরিচিত হাসি টেনে না রাখলে হেমন্তকে যেন অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হতো।

হেমন্তের ঘর থেকে আবার একটা মৃদু গুঞ্জন অলসভাবে ভেসে আছে; কখন যে সে সামনে থেকে চলে গেছে মন্দাকিনী টেরও পাননি। তিনি শুধু বুঝতে পারেন, একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বই পড়ে যাচ্ছে, তার সমস্ত চেতনা যেন সব কিছু জেনে নেবার তীব্র ক্ষুধায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। হেমন্ত কি ধীরে ধীরে প্রস্তর মূর্তিতে পরিণত হতে চললো!

* * *

মন্দাকিনী বড্ড বেশী আহত হতেন আগে হেমন্তের স্তব্ধতায়, ওর গাম্ভীর্য মন্দাকিনীর মনে অজানা একটা আশঙ্কা বয়ে আনতো। আজকাল সব যেন সয়ে আসছে আস্তে আস্তে। হেমন্তও মার সামনে সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে। আগে ও মাকে ভালোবাসতো খুব, তবে ভয় করতো আরো বেশী। আজকাল আরো প্রবলভাবে মাকে ভালোবাসে, কিন্তু ভয় আর করে না। কখন যে হেমন্ত বাড়িতে আসে আর কখন যে বেরিয়ে যায় আবার—মন্দাকিনী তা টের পান না। স্নান খাওয়া দাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। ভাতের থালা সামনে রেখে মন্দাকিনী বসে থাকেন, হঠাৎ হয়তো এক সময় এসে হেমন্ত বলে—"ভাত দাও মা; একটু তাড়াতাড়ি, আমার জন্য আর সবাই অপেক্ষা করছে ও দিকে,—এক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়তে হবে যে।"

প্রথম প্রথম মন্দাকিনী হেমন্তকে খুঁটিনাটি সমস্ত প্রশ্ন

ফিরতেন আজকাল আর করেন না। মন্দাকিনী বুঝেছেন কারা যে হেমন্তের জন্যে অপেক্ষা করচে আর কেনই বা এত তাড়াতাড়ি তাকে আবার বেরিয়ে যেতে হবে সে সব প্রশ্নের উত্তর জেনে তাঁর বিন্দুমাত্র লাভ নেই। আর তা ছাড়া—হেমন্তের চোখের জ্বালাময় দীপ্তিকে মন্দাকিনী এখন আর ভয় করেন না ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস প্রগাঢ় হয়ে উঠ্‌চে।

হেমন্ত জানে যে মন্দাকিনীর কিছু অজানা নেই, তবু এ পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে মার কাছে সে ধরা দেয়নি। আজ হঠাৎ মন্দাকিনীকে অবাক করে দিলো সে,—

"গোটা আশী টাকা ধার দিতে পারো মা? কি বললে অত হবে না এখন তোমার কাছে?" এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে হেমন্ত বললো "আচ্ছা বেশ পঞ্চাশই দাও। ওতেই আমাদের কাজ চলে যাবে এখন।"

"বাস্ত হোসনে হেম টাকা ঠিকই পাবি। কিন্তু কি জন্যে টাকাটা নিচ্ছিস তাও কি আমাকে একবার বলবি না-রে?"

স্পষ্ট বোঝা গেল হেমন্ত ইতস্তত করছে। মন্দাকিনী সস্নেহে সুরে বললেন,—"তোর যদি বলতে কোনো বাধা থাকে তবে না হয় থাক।"

"না না তা কেন হবে? আসল কথা আজকে আমরা একটা মিটিং-এর আয়োজন করেছি এমন কি সমস্ত কাগজে জানানি দেওয়া হয়ে গেছে পর্যন্ত। অথচ এখনো পর্যন্ত টাকার যোগাড় করে উঠতে পারিনি। শুধু হল ভাড়া দিতেই তো সত্তর টাকা বেরিয়ে যাবে. তুমি যদি গোটা পঞ্চাশেক টাকা এখন দাও তা হলেই কোনো-মতে আমরা চালিয়ে নিতে পারবো আজকের মতো। দেবে মা?"

"কিন্তু এ যে আমাকে সংসারের খরচার টাকা থেকে দিতে হবে হেম?"

"কিছু ভেবো না মা, দিন তিনেকের ভিতরেই টাকাটা তুমি ফেরত পেয়ে যাবে। মাঝে এ কটা দিনের ধাক্কা কি তুমি কোনোমতে সামলাতে পারবে না?"

মন্দাকিনী একটু অন্যমনস্ক হলেন।

"আচ্ছা, বিকেলেই তা হলে নিস্ টাকাটা।"

"তাই নেবো কিন্তু দেখো মা......"

কাজের ফাঁকে দুপুরে এসে বার দুয়েক টাকাটার কথা হেমন্ত মাকে স্মরণ করিয়ে দিলো।

"সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের মিটিং শেষ হবে,—গোটা সাতেকের সময় টাকা নিতে আসবো আমি। তুমি আবার ভুলে যেও না যেন!"

"পাবিরে, নিশ্চয় পাবি এ কি আমি ভুলতে পারি?"

মন্দাকিনী প্রত্যেকবারেই একটু হেসে আশ্বাস দিয়েছেন ওকে। সত্যিই তো কি করে ভুলবেন তিনি! যে ভাঙনের নেশা দিনরাত ঝলমল করছে হেমন্তের চোখে তাকে কি ভুলে থাকা চলে?—হেমন্ত আরো রোগা হয়েছে আরো শীর্ণ হয়েছে ওর মুখ,—কিন্তু তাতে কি এসে যায়? পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওদের বিদ্রোহ, সব কিছুকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়বার নেশা ওদের রক্তে সে কথা কি ভুলতে পারেন মন্দাকিনী! পারবে দুস্তর উজান ঠেলে নিশ্চয় ওরা টিঁকে থাকতে পারবে।

আজকের সভায় কি হেমন্ত বক্তৃতা দেবে? এই মুহূর্তে হেমন্তের বক্তৃতা শুনতে ভারী ইচ্ছে করছে মন্দাকিনীর। কপালের উপর উড়ে এসে কাঁপছে অবিন্যস্ত বাঙ্কা চুল প্রত্যেকটি কথা অসম্ভব জোর দিয়ে উচ্চারণ করছে হেমন্ত একটা অসহ্য আবেগের চাপে সে কি এতক্ষণে দুর্নিবার হয়ে উঠছে? জনমণ্ডলী অভ্যাস ... ভুলে গেছে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা—... কথা তাদের কানে এসে বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠে আর সেই বিদ্যুতের উপর দিয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটে ... হেমন্ত।

অনেক রাত হয়ে গেছে কিন্তু হেমন্ত তো এখনও ফিরলো না? কোথায় যেন এক রাশ হাস্নাহেনা ফুটেছে বাতাসের গায়ে জড়িয়ে গেছে তার মৃদু সৌরভ। বড় রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে রিক্সার ঠুং ঠাং শব্দ কানে আসে। সারা বাড়িতে এতক্ষণ হয়তো কেউই জেগে নেই কিন্তু হেমন্ত যে ফিরলো না এখনও? হেমন্ত হয়তো আজ রাতে ফিরবে না কাল ও না—সাম্রাজ্য-রক্ষার আইন কানুন ভারী কড়া—হেমন্ত হয়তো কোনোদিনই ফিরবে না আর!

কিন্তু কি করবেন মন্দাকিনী কি করতে পারেন তিনি!—তাঁর দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে......

পদধ্বনি

(৫৭৫ পৃষ্ঠার পর)

কেন না তুমি ভালবাসো নি। 'অনু নেই' আমার কাছে এ কথা সত্য নয় সে আছে, এখানকার আকাশে বাতাসে লতায়পাতায় বর্ণে-সুষমায় আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে সে মিশে আছে। তুমি কল্পনা করতে পারবে না অম্বিকা কিন্তু বিশ্বাস করো আমি এখানে তার পদধ্বনির অপেক্ষায় বসে আছি। এই বাগানে আমাদের দু'জনের অনেক সন্ধ্যা কেটেছে, অনেক স্মৃতিতে আমাদের মন বোঝাই। অনেক দিন সে আগে এসেছে, আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে, আমি পরে এসেছি। আবার কতদিন আমি আগে এসেছি তার জন্যে অপেক্ষা করেছি, সে পরে এসেছে। আজো আমি তাই তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি—সে আসবে, তার আসার শব্দ শোনবার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি!

অম্বিকা বললে কিন্তু তুমি এই নিয়ে কি করে জীবন কাটাবে? বসন্ত বললে, এতে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমার এ সম্বল ত কম নয়। এ যে আমার কাছে সত্য।

খেলাধুলা

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের বা ডিভিসনের সকল খেলা শেষ হইতে এখনও দুই সপ্তাহ বাকী আছে। এই দুই সপ্তাহের মধ্যে যোগদানকারী বিভিন্ন দল কিরূপ ফলাফল করিবে তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে প্রথম ডিভিসন সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলের পুনর্বার চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা বিশেষভাবেই দেখা দিয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দল লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহনবাগান অপেক্ষা তিন পয়েন্ট অগ্রগামী আছে। এই দলকে এখনও স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহনবাগান, ভবানীপুর, প... ও কাস্টমস এই পাঁচটি দলের সহিত খেলিতে হইবে। লীগের প্রথম খেলায় ... পাঁচটি দলের মধ্যে কোন দলই ইস্ট বেঙ্গল দলকে পরাজিত করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বারের খেলায়ও যে উক্ত দলসমূহ ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করিতে পারিবে ইহা ধারণা করিবার কোনই কারণ নাই। ইহাই যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ইস্টবেঙ্গল দল বর্তমানে লীগ তালিকায় যে স্থানে অবস্থিত আছে সেইখানেই থাকিবে ও চ্যাম্পিয়ান হইবে এইরূপ আশা করাও খুব অন্যায় হইবে না। তবে এই দলের পরিচালকগণ সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় প্রতিদিন নূতন নূতন খেলোয়াড় দলভুক্ত করিবার দিকে মনোযোগ দিয়া বিশেষ ভাল করিতেছেন না বলিয়া মনে হয়। এই নীতি লীগের সূচনায় অনুসরণ করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় এইরূপ করা বুদ্ধিমানের কার্য হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে নিশ্চিত জয়লাভের পরিবর্তে পরাজয় হইলেও হইতে পারে। তাহা ছাড়া দলে নূতন খেলোয়াড় লইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। পূর্বে যে-সকল খেলোয়াড় খেলিতেছিলেন, তাঁহাদের উপরই অবশিষ্ট খেলাগুলি নির্ভর করিলে ফল ভালই হইবে। দলের সাফল্যলাভের যখন সম্ভাবনা আছে, তখন অহেতুক পরিচালনার ত্রুটির জন্য সেই সাফল্য হইতে দলকে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না। তিন পয়েন্টে দল অগ্রগামী হইয়াছে বলিয়া চ্যাম্পিয়ান হইবেই, এইরূপ দৃঢ়মত ধারণা করা অন্যায় হইবে। মোহনবাগান ক্লাব পশ্চাতে পড়িলেও যে-কোন সময়েই পয়েন্ট সমান করিতে পারে। কারণ মোহনবাগান দলকে বর্তমানে পাঁচটি খেলা খেলিতে হইবে এবং এই পাঁচটি দলের মধ্যে তিনটি দলকে সে পরাজিত করিতে পারিবে, ইহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে। অপর দুইটি দল হইতেছে মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল। ইহার মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ এই দলের খেলোয়াড়গণ চ্যাম্পিয়ান বা রানার্স আপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বিশেষ উৎসাহ সহকারে খেলিতেছেন না। কোনরূপে লীগের অবশিষ্ট খেলাগুলি শেষ করিতে পারিলেই যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় এই দল মোহনবাগানের ন্যায় উৎসাহী দলের সহিত সমানে লড়িতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও মোহনবাগান দলকে দ্বিতীয়বারের খেলায় সহজে পরাজিত করিতে পারিবেন না। প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল একরূপ সৌভাগ্যবলেই বিজয়ী হইয়াছিলেন। মোহনবাগান পরাজিত হইলেও ইস্টবেঙ্গল দলকে খেলার অধিকাংশ সময়ই আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। গতবারের সেই অভিজ্ঞতা মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়গণকে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলিতে দ্বিগুণ উৎসাহদান করিবে। এইরূপই যখন অবস্থা, তখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরিচালকগণের দল গঠন নীতি বিশেষ চিন্তা করিয়াই অনুসরণ করা উচিত। নিম্নে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের লীগের বর্তমান অবস্থার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

লীগ তালিকার দুইটি দল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৫	৩	১	৪৩	৮	৩৩
মোহনবাগান	১৯	১২	৬	১	৩০	৬	৩০

খেলার পরে অশিষ্ট আচরণ

ফুটবল খেলার সময় কলিকাতায় প্রতি বৎসরই কোন না কোন খেলোয়াড়কে অশিষ্ট আচরণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু খেলার পর কোন বৎসর কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে মারিতে উদ্যত হইয়াছেন, অথবা অশোভন ভাষায় গালাগালি দিয়াছেন, এইরূপ শোনা যায় নাই। এই বৎসর ইহাও আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। কোন এক বিশিষ্ট দলের খেলোয়াড়গণ মাঠ ত্যাগ করিবার সময় প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়গণকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়াছেন, এমনকি, মারিতে পর্যন্ত উদ্যত হইয়াছিলেন। দুই দলের মধ্যেই হাতাহাতি হইত, কোন ... শান্তিকামী লোকের প্রচেষ্টায় তাহা শেষ পর্যন্ত হয় নাই। শোনা যাইতেছে যে, যে দলের খেলোয়াড়গণ নির্যাতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিচালকগণ এই বিষয়টি আই এফ এর নিকট জানাইয়াছেন ও বিহিত-ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। হয়তো আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষ ভিতরে ভিতরে উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাট যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ইহা করা খুব যুক্তিসঙ্গত হইবে না। প্রকৃত খেলোয়াড় যিনি হইবেন, তিনি খেলার মাঠে বা বাহিরে খেলোয়াড়ী মনোভাবেরই পরিচয় দিবেন। সেই খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি আয়ত্ত করিবার শিক্ষা দিতে হইলে এই সকল দোষী খেলোয়াড়দের শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৯শে জুন

রোমের এক সংবাদে প্রকাশ যে, সিসিলির বড় বড় শহরে নিতান্ত প্রয়োজনীয় লোকজন ছাড়া আর সকলকে ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে শহর ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মুসোলিনী ফোগিয়া, বারি, ব্রিন্দিসি, লেচ্ছে; টরান্টো, কোসেঞ্জা ও কাটাঞ্জারোকে যুদ্ধ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বৃটিশ ও মার্কিন বিমানবহর গতকল্য [illegible] ভাগে সিসিলি দ্বীপে কোমিসো ও বিস্কারী [illegible] ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। [illegible] ক্ষেত্রে প্রায় আড়াই লক্ষ পাউন্ড বোমা [illegible] হয়।

২০শে জুন

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীযুত বি সি চাটার্জি মাত্র অল্প কয়েকদিন রোগে ভুগিয়া তাঁহার ২৯নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ ভবনে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

বাঙলার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৬-৭ মাস যাবৎ উদরী রোগে ভুগিতেছিলেন।

২১শে জুন

[illegible] বেতারে জানান হইয়াছে যে, তুরস্কের আদানাজার শহরটি ভূমিকম্পের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। মৃতের সংখ্যা ১৫ হাজার হইবে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কয়লা-খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট সংক্রান্ত ব্যবস্থার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধর্মঘটের ফলে মার্কিন কয়লা উৎপাদন শিল্প অচল অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক তাহাদের কার্যে যোগ দিবার ব্যবস্থা করিবার অপেক্ষায় আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের আক্রমণের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসে মস্কো রেডিওতে এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, দুই বৎসরের যুদ্ধে জার্মানীর ৬৪ লক্ষ সৈন্য নিহত ও বন্দী হইয়াছে।

সিসিলি, সার্দিনিয়া ও দক্ষিণ ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর বোমা বর্ষণ করে। বহু সংখ্যক মার্কিন বিমান ইতালীর দক্ষিণপ্রান্তে রেজ্জো দি কালাব্রিয়া ও সানজোভানিতে আড়াই লক্ষ পাউন্ড বোমা বর্ষণ করে।

২২শে জুন

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কন্ট্রোলের দোকানগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং শীঘ্রই কলিকাতায় চারিশত ও শহরতলীতে চারিশত সরকারী দোকান খোলা হইবে।

২৩শে জুন

ডেট্রয়েটে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে দাঙ্গায় ২০ জন নিহত এবং সাত শতাধিক লোক আহত হইয়াছে।

জার্মান রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য স্থল অভিযানের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত দুইখানি বৃহদাকার বৃটিশ জাহাজ জিব্রাল্টারে পৌঁছে এবং অবিলম্বে ভূমধ্যসাগর অভিমুখে যাত্রা করে।

২৪শে জুন

ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে আটক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যদ্বয় শ্রীযুত বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি এবং শ্রীযুত নিশীথনাথ কুণ্ডু প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ২৭-২৬ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

২৫শে জুন

আয়র্ল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচনের ফলে মিঃ ডি ভ্যালেরার 'ফিয়ানাফেল' দল ৬৭টি আসন লাভ করিয়াছেন এবং বিরোধী দল সমূহ সম্মিলিতভাবে ৭১টি আসন লাভ করিয়াছেন।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণের ফলে ১৪ খানি এক্সিস জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ধর্মঘট বিরোধী বিল অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। উক্ত বিল অনুমোদনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অস্বীকৃত হওয়ায় কংগ্রেসে এ সম্বন্ধে সেনেটের ভোট গৃহীত হইলে দেখা যায়—বিলের পক্ষে ৫৬ ভোট এবং বিপক্ষে ২৫ ভোট হইয়াছে। অতঃপর বিলটি প্রতিনিধি সভায় প্রেরণ করা হইলে সেখানেও বিলের পক্ষে ২৪৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১০৮ ভোট হয়। ফলে বিলটি আইনে পরিণত হয় এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরাজয় ঘটে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রেনার গিরিবর্ত্মমুখে পাহারা দিবার জন্য দশ ডিভিসন জার্মান সৈন্য উত্তর ইতালীতে প্রেরিত হইয়াছে। ইউরোপে মিত্রপক্ষীয় অভিযানে বাধা দিবার জন্য জার্মানেরা যে দুর্গ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে, ক্রমেই তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

২৬শে জুন

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে নিখিল বঙ্গ খাদ্য-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব বাণিজ্য ও খাদ্য সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার উহাতে সভাপতিত্ব করেন। খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধানের নিমিত্ত শ্রীযুত সরকার [illegible] অভিভাষণে এক কর্মপন্থার নির্দেশ দেন।

কলিকাতায় বাড়ি-ভাড়ার হার নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। আদেশে বলা হইয়াছে—১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কোন বাড়ির ভাড়ার পরিমাণ যাহা ছিল, অথবা ঐ তারিখে বাড়ি খালি থাকিলেও, উহা ভাড়া হইলে যে ভাড়া পাওয়া যাইত, তাহার শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত ভাড়া অপেক্ষা অধিক ভাড়া কোন বাড়িওয়ালা লইতে পারিবেন না। এই আদেশের প্রয়োগ আরম্ভ হইবার পর কোন বাড়ি সম্পর্কে কোনরূপ ভাড়া বৃদ্ধি করা চলিবে না।

জোহান্সবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

২৭শে জুন

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ খাদ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় ও শেষ দিনের অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বাঙলাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করা হউক। সমগ্র [illegible] জনসাধারণের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইবার জন্যও গভর্নমেন্টের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

'হিন্দুস্থান টাইমসের' [illegible] ঐ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী ও অপর কয়েকজন আদালত অব[illegible] অভিযোগে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিলেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থান টাইমস যে আপীল করিয়াছিলেন, প্রিভি কাউন্সিল তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং দণ্ডাদেশ বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

আলজিয়ার্স বেতারে আজ সর্বপ্রথম [illegible] অধিকৃত ফরাসী এলাকাকে অভিযান [illegible] নির্দেশ করিয়া ঐ সব অধিবাসীবৃন্দকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জার্মান বেতারে উদ্ধৃত হাইকম্যান্ডের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যের [illegible] [illegible] তিনটি স্থানে জার্মান ব্যূহ [illegible] ভেদ করে। ব্যূহ ভেদ হয় ওরেলের দক্ষিণ-পূর্বে, ওরেলের উত্তরে এবং ভেলিকিলুকির পশ্চিমে।

২৮শে জুন

দক্ষিণ ইতালীর প্রায় সমস্ত বড় বড় শহর হইতেই অধিবাসীবৃন্দকে সরাইয়া লওয়া হইতেছে। হিটলার জার্মান ইউবোট বহরের অধিনায়ক ইউবোটের তাহাদের জার্মান ও ইতালীয়ান ঘাঁটিসমূহে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন। মিত্রপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ ঐ সকল ঘাঁটিকে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

আমেরিকান ব্যাটেলশিপসমূহ ভূমধ্যসাগরে পৌঁছিয়াছে ও বৃটিশ নৌবহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

ভিসি বেতারে প্রকাশ, জার্মানীর তিন ডিভিসন সৈন্য নরওয়েতে, ৪০ ডিভিসন ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং হল্যান্ডে, ১৫ ডিভিসন ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ফরাসী অঞ্চলে, ইতালীতে ১৫ ডিভিসন ও বল্কানে ১৫ ডিভিসন সৈন্য রহিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসের [illegible] একটি প্রস্তাবে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের সহিত ভারত গবর্নমেন্টের সকল কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের দাবী জানান হইয়াছে।